شَيْخُ الْحَدِيْثِ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ حَبِيْبُ الرَّحْمٰنِ

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রহ.

স্মৃতিস্মারক



শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রহ.

স্মৃতিস্মারক

شَيْخُ الْحَدِيْثِ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ حَبِيْبُ الرَّحْمٰنُ

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রহ.

স্মৃতিস্মারক

সম্পাদক
মো. আবদুল আউয়াল হেলাল

সম্পাদনা সহকারী
মো. ফদ্বলুর রহমান
মো. আবদুল বাকী খালেদ

আল হাবীব ফাউন্ডেশন

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

স্মৃতিস্মারক

সম্পাদক
মো. আবদুল আউয়াল হেলাল

সম্পাদনা সহকারী
মো. ফদ্বলুর রহমান
মো. আবদুল বাকী খালেদ

প্রকাশকাল
প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঈসায়ি, রজব ১৪৪৫ হিজরি

প্রকাশনায়
আল হাবীব ফাউন্ডেশন
ডাক: থানাবাজার-৩১৯০, উপজেলা: জকিগন্জ, জেলা: সিলেট।
ফোন: ০১৭১৫ ৪৫৩৯৯৯, ০১৭১৫ ৫৭১০৭০, ০১৭৫১ ৬৯৮৯৫০
www.alhabibfoundation.com

প্রচ্ছদ: আবু তাসনিয়া

গ্রাফিক্স: আর্টিস্টিক, ০১৭১৭ ২৫৪২৫৪

মুদ্রণ: প্রিন্ট ওয়ান

মূল্য: ১০০০.০০ টাকা

Shaikhul Hadis Allama Muhammad Habibur Rahman (R.)
Smrity Sarok
[Memorial of Shaikhul Hadis Allama Muhammad Habibur Rahman (R.)]
1st Edition February 2024
Published by Al Habib Foundation. Price £20.00 $25.00
ISBN 978-984-94552-4-0

সূচি

মুরশিদে বরহক আল্লামা মো. ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী বড় ছাহেব কিবলাহ এর দু'আ / ১৫

সম্পাদকের কথা / ১৬

জীবন ও কর্ম

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ : সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য -মো. আবদুল আউয়াল হেলাল / ১৮

কয়েকজন বিশেষব্যক্তির অনুভূতি

فضيلة الشيخ السيد عاصم عدي يحيى حفظه الله، من المدينة المنورة / ৭৬

মাওলানা শাহ সুফি সায়্যিদ জুনাইদ আহমদ মাদানী হাফিযাহুল্লাহ / ৭৮

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুক্বাদ্দাস আলী হাফিযাহুল্লাহ / ৭৯

আলহাজ হাফিজ আহমদ মজুমদার / ৮০

শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মুসাব্বির হাফিযাহুল্লাহ / ৮১

ইকবাল আহমদ তাপাদার / ৮২

স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন

শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান (র.) : গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলিমে দ্বীন -অধ্যক্ষ আল্লামা মো. নজমুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী / ৮৪

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী / ৮৬

বন্ধুবর সহপাঠী শায়খুল হাদীস মাওলানা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -অধ্যক্ষ মাওলানা বশীরুদ্দীন আহমদ চৌধুরী / ৮৮

স্মৃতি-বিস্মৃতির কতকথা -কালাম আজাদ / ৯২

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান / ৯৬

ধর্মজ্ঞানের এক দুর্লভ কষ্টি ও পরশ পাথর হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ -প্রফেসর ড. আহমদ আনিসুর রহমান / ১০০

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ একজন জ্ঞানসাধকের কথা -অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ / ১৪৩

تقريظ وتعريف موجز عن العلامة المحدث القدوة محمد حبيب الرحمن البنجالي- فضيلة الشيخ د. يسري رشدي السيد جبر الحسني / ১৪৮

إيقاظ الوسنان بذكر شيخ الحديث محمد حبيب الرحمن- فضيلة الشيخ الدكتور: ناجي بن راشد بن حسن العربي / ১৫০

শায়খুল হাদীস মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক / ১৫৫

স্মৃতিতে সমুজ্জল শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -আল্লামা হাফিয মুহাম্মাদ আবদুল জলিল / ১৫৮

স্মৃতিতে ভাস্বর আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী / ১৬২

প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ মুহাদ্দিস ছাবের জন্য অশেষ শ্রদ্ধা -ইউসুফ শরীফ / ১৬৪

আমাদের মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর -মুফতি মাওলানা ইলিয়াছ হোসাইন / ১৬৮

মুসলিম বিশ্বের উজ্জলতম নক্ষত্র শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম / ১৭৩

হাদীসশাস্ত্রের মহান সাধক মুহাদ্দিস মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -ড. সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ আল মারুফ / ১৭৯

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ একজন কিংবদন্তি আলেমে দ্বীন ও ইসলামের নিরলস খাদেম -ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল- মারুফ আল- মাদানী / ১৮২

ইলমে হাদীসের মহান জ্যোতিষ্ক -অধ্যক্ষ মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ নুমান / ১৮৮

ফখরুল মুহাদ্দিসীন, উস্তাযুল উলামা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি -অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুন নূর / ১৯৩

رأيت جمالا في كماله - أبو سهيل محمد فخر الهدى / ১৯৭

দ্বীনের মহান মুবাল্লিগ আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ ছরওয়ারে জাহান / ১৯৮

ইলমে হাদীসের কিংবদন্তি সুপুরুষ এক মহান ব্যক্তিত্ব -অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আব্দুল আলীম / ২০১

اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ مِنْ حَيَاةِ عَلَّامَةِ الزَّمَانِ مُحَمَّد حَبِيْبِ الرَّحْمن عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّضْوَانُ - أبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّد عَيْنُ الهُدى / ২১৩

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব -ড. সৈয়দ শাহ এমরান / ২১৭

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ও ধর্মীয় জ্ঞানে তাঁর উচ্চ সনদ: একটি পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ -ড. মুহাম্মদ নুরুন্নবী আল আযহারী / ২২৪

আমার স্মৃতিতে হাদীস জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র -মাওলানা মুহাম্মদ হবীবুর রাহমান / ২৪২

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ আমার পাওয়া-আমার মূল্যায়ন -অধ্যাপক মাওলানা মোখলেসুর রহমান / ২৪৯

একজন নায়িবে নবী আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা শেহাব উদ্দিন গোটারগ্রামী / ২৫৪

ইলমে হাদীসের এক উজ্জল নক্ষত্রের বিদায় -মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদী / ২৫৭

দূর আকাশের তারা -মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম / ২৬২

স্মরণের আবরণে আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -অধ্যাপক এম এ সোবহান / ২৬৫

স্মৃতির আয়নায় রারাইর মুহাদ্দিস সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি -মাওলানা সালেহ আহমদ সালিক / ২৭০

শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিনয়ের এক অনন্য নাম মুহাদ্দিস সাহেব কিবলাহ -অধ্যক্ষ মোঃ মাজেদ আহমেদ চঞ্চল / ২৭২

উপমহাদেশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ - মুফতি মাওলানা মোঃ আব্দুর রহমান নেজামী / ২৭৭

তাঁকে মেরে ফেলা কিংবা জীবিত রাখা প্রসঙ্গে -মুসা আল হাফিজ / ২৮০

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ভদ্রতা যার ভূষণ ছিল -মুফতি মাওলানা আবুল হাসান / ২৮৬

আমার দেখা আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা মোঃ আব্দুল জব্বার / ২৮৮

ক্ষনজন্মা কিংবদন্তি মুহাদ্দিস মাওলানা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা আ, জ, ম, অহিদুল আলম / ২৯০

স্মৃতির আয়নায় হাদীস জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, উস্তাযুল আসাতিযা, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা আবু নছর মোঃ কুতুবুজ্জামান তাফাদার / ২৯৮

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে তাঁর অবদান -ড. মাওলানা মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজ / ৩০৪

তিনি ছিলেন ইলমে হাদীসের এক আলোক বর্তিকা -মাওলানা মোঃ নজরুল ইসলাম / ৩১৩

হাদীসে নববীর এক উজ্জল নক্ষত্র -মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান / ৩১৭

অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা -উপাধ্যক্ষ মাওলানা মো. ছালেহ আহমদ (বেতকোণী) / ৩২১

হাদীসে নববীর মহান খাদিম হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ কিছু স্মৃতি কিছু কথা -অধ্যক্ষ মাওলানা শিহাবুর রহমান চৌধুরী / ৩২৭

কিছু স্মৃতি কিছু কথা -মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মতীন চৌধুরী শাহবাগী / ৩৩২

স্মৃতিতে অম্লান আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -ড. এনামুল হক চৌধুরী / ৩৩৫

একজন 'বাহরুল উ'লুম', তাঁর অকৃত্রিম জীবনবোধ ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্য -মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীকুর রহমান চৌধুরী / ৩৩৮

হারিয়ে খুঁজি তাঁরে -মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী / ৩৫০

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সাথে আমার কিছু স্মৃতি -মাওলানা মুহাম্মদ ফরিদ ফরিদগঞ্জী / ৩৫৩

মানুষ গড়ার কারিগর আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ -হাফিজ মাওলানা মোঃ হেলাল উদ্দিন / ৩৫৯

হাদীসে নববীর অনন্য ভাষ্যকার শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান / ৩৬২

ফুলতলি মসলকের শীর্ষস্থানীয় আলিম ইছামতির মুহাদ্দিস ছাহেব -আবদুল মুকিত মুখতার / ৩৬৮

আল্লামা হবিবুর রহমান ছিলেন বহুভাষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব -সাঈদ চৌধুরী / ৩৭৭

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -সৈয়দ মবনু / ৩৮১

স্মৃতির মণিকোঠায় আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -আশরাফ হাসান / ৩৮৪

فخر المحدثين العلامة حبيب الرحمن رحمه الله تعالى- مولانا فريد الدين اطهر / ৩৮৬

মানসপটে চির অম্লান থাকবে যার স্মৃতি -অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ শেহাব উদ্দিন আলীপুরী / ৩৯৫

আমার দেখা আল্লামা মুহাদ্দিস হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান / ৩৯৯

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ইলমে নববীর এক মহান পরিবাহক -মাওলানা মারজান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী / ৪০৪

A great Muhaddith of our time -Moulana Muhammad Abdul Qahhar / ৪১১

The Ghazzālī of our Age -Ed Husain / ৪১৯

অনন্য রাহবার -মো. মাহতাব উদ্দিন / ৪২২

আমার অনুভবে আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি -আব্দুল খালিক তাপাদার / ৪২৫

ডালপালা বিছানো এক মহীরুহ -মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন / ৪২৭

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর সান্নিধ্য -মোঃ নজরুল ইসলাম / ৪২৯

আধ্যাত্মিক রাহবার : আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল / ৪৩৪

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর খেদমতে উপস্থিতির সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ -মাওলানা আবু বকর তাওহীদ / ৪৩৯

মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. এর সোহবতস্মৃতি : কিছু কথা -মাওলানা মুহাম্মাদ হবিবুর রহমান / ৪৪১

হাদীসের আলোকে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ'র মাহাসিনসমূহ: একটি পর্যালোচনা -মাওলানা আবু সালেহ্ মুহাম্মাদ মামুন / ৪৫৪

ইসনাদে আ'লী : একটি স্মৃতিময় সফর -মাওলানা মোয়াজ্জেম হোসাইন সিদ্দীকি / ৪৫৮

আমার দেখা আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা মুহাম্মাদ সদরুল আমিন (জগন্নাথপুরী) / ৪৬৫

নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্থতার প্রতীক আমাদের গরীবখানায় প্রথম দেখা হয় হুজুরের সাথে -অলিউল্লাহ নোমান / ৪৬৮

মুসালসাল হাদীস শরীফের শেষ দারস আল হাবীব জামে মসজিদে কান্নার রোল -মাওলানা মোঃ ফদ্বলুর রহমান / ৪৭১

শিষ্টাচার-সৌজন্যতার বে-নজীর উপমা যিনি -মাওলানা মনজুরে মাওলা / ৪৮৭

আমাদের মুহাদ্দিস সাব শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -মাহমুদ রহমান / ৪৯১

মহান তপস্বীর শিয়রে একদিন -সরওয়ার ফারুকী / ৪৯৩

ইছামতির নাবিক একজন মুহাদ্দিস সাহেব -লুৎফুর রহমান / ৪৯৫

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের শেষ বৃটেন সফর, আমার কিছু স্মৃতি -মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ / ৪৯৭

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ কিছু স্মৃতি কিছু অনুভূতি -উপাধ্যক্ষ মাওলানা পিয়ার মাহমুদ / ৫০১

অন্তরে গাঁথা স্মৃতি -হাফিয মাওলানা কয়েছুজ্জামান / ৫১০

বাল্য স্মৃতির আয়নায় উস্তাযুনাল মোকাররাম মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ -উপাধ্যক্ষ মাওলানা মো. আব্দুল জলিল / ৫১৪

ناموس رسالت کے عظیم پاسبان - مولانا مفتی عبد المنتقم / ৫১৯

অগোছালো কিছু স্মৃতি ও বেদনায় আল্লামা মুহাদ্দিস সাব রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা রফীকুল ইসলাম মুবীন / ৫২৪

কিয়ৎক্ষণের অবলোকন -মাওলানা মোঃ আবদুল হামিদ লাল / ৫২৫

স্মৃতির পাতায় চিরভাস্বর শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা মো: ওহীদুজ্জামান চৌধুরী খছরু / ৫২৯

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা মুহাঃ মনিরুল ইসলাম / ৫৩৫

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ কিছু স্মৃতি এবং দারসে হাদীস প্রসঙ্গ -মাওলানা মো. কুতবুল আলম / ৫৪১

আগমন অবস্থান প্রস্থান -মোহাম্মদ খছরুজ্জামান / ৫৪৬

حضرت محدث صاحب کا علمی اور روحانی مقام - حافظ مولانا سید مراد احمد المدنی / ৫৫১

স্মৃতির পাতায় শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি -মাওলানা মোঃ মাহবুবুর রহমান চৌধুরী / ৫৫৩

সুলতানুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ কিছু স্মৃতি : কিছু কথা -মাওলানা মোঃ মাহবুবুর রহমান নু'মানী / ৫৫৫

ক্ষণজন্মা মনীষী শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রাহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি -মাওলানা মশতাক আহমদ / ৫৬০

শায়খুনা ও উস্তাযুনা হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা মোঃ ফারুক আহমদ / ৫৬৩

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ইলমে হাদীসের অনন্য সাধক -মাওলানা আব্দুল হান্নান তুরুকখলী / ৫৬৬

একজন ওলীর চেহারার প্রভাব -মাওলানা রুহুল আমীন সাদী / ৫৭২

স্মৃতিকথা উস্তাযুল মুহাদ্দীসিন আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা মোঃ রেদ্বাউল করীম / ৫৭৩

তিনি ছিলেন আমাদের রূপকথার এক জীবন্ত মহারাজা -সিরাজুল ইসলাম শাহীন / ৫৭৭

অনুসরণীয় এক মহান মনীষী -মাওলানা আব্দুস সবুর / ৫৭৯

আমাদের 'মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর' -মোহাম্মদ মিফতাহুল ইসলাম তালহা / ৫৮২

অদেখা উস্তাযের স্মরণে -আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব / ৫৮৪

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ সালফে সালেহীনের বাস্তব নমুনা যিনি -মাওলানা ইব্রাহিম আরিফ / ৫৮৯

একজন শায়খুল হাদীসের স্মৃতিচারণে কিছু কথা -অধ্যক্ষ মাওলানা আজিজ আহমদ / ৫৯২

তিনি একজন মুহসিন বান্দা ছিলেন -মুফতি মাওলানা ইহসান আহমাদ / ৫৯৪

এনর ফাউগড়ী বড় টাইট অইছে -মাওলানা নিয়াজ উদ্দিন আল আযহারী / ৫৯৭

Shaykh-ul-Hadith Allama Habibur Rahman (R.): An Eminent Hadith Scholar's Departure -Hafiz Wahi Ahmad Chowdhury / ৬০৬

Shaykh al-Hadith Allamah Habibur Rahman – A Servant of Hadith -Maulana Maruf Ahmed / ৬১১

Learning from the teachings of a Hadith master -Maulana Foysal Ahmed / ৬১৪

যাকে কখনো ভুলা যাবে না -মাওলানা শিহাব উদ্দিন আহমদ / ৬১৬

আমাদের মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর -হাফিয মাওলানা মুহাম্মাদ ফখরুল ইসলাম / ৬২১

نبذة من حياة شيخ الحديث العلامة حبيب الرحمان المشهور بمحدث صاحب رحمه الله تعالى- مولانا شاه جهان محمود / ৬২৩

অনন্যসাধারণ অধ্যক্ষ আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি -মো. নিয়াজ উদ্দীন / ৬২৮

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর কিছু স্মৃতিচারণ -মাওলানা মোঃ মাহবুবুল আলম / ৬৩১

কিছু স্মৃতি কিছু কথা -নূর হোসেন তালুকদার / ৬৩৫

যত বেশি সনদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তত বেশি মজবুত সম্পর্ক -মাওলানা এম. জুয়েল আহমাদ লতিফী / ৬৩৯

ইলমে নববীর প্রকৃত ওয়ারিশ আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা মাহবুবুর রহীম / ৬৪৫

বিনয়ী এক মহিরুহ -শাহ সুহেল আহমদ / ৬৪৭

An Inspiration to Millions -Abu Saeed Ali Haidar Jubair / ৬৪৯

হৃদয়ের মণিকোঠায় অম্লান যে স্মৃতি -মো. মাহবুবুর রহমান ফরহাদ / ৬৫২

জ্ঞান আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র বিদায় নিলেন -ইকবাল হোসেন / ৬৫৭

হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সান্নিধ্যে -হাফিয মাওলানা মোহাম্মদ শামছুদ্দীন সাবেল / ৬৬০

একজন কিংবদন্তির সান্নিধ্যে -কামারুম মুনির তানজীব / ৬৬৩

In Honore – Allamah Habibur Rahman Rahimahullah -Musleh Uddin / ৬৬৬

আমার দেখা দাদা ছাহেব কিবলাহ -মাওলানা এ টি এম শাকের / ৬৬৮

স্মৃতিতে উজ্জ্বল মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর -আলী ফজল মোহাম্মদ কাওছার / ৬৭০

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর জানাযা -সাকিবুল ইসলাম / ৬৭২

কিতাব প্রেমিক আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর -অধ্যক্ষ মাওলানা ছমির উদ্দিন / ৬৭৪

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সুহবতে কিছু সময় -মাওলানা মোঃ মাহমুদুল হাসান / ৬৭৬

মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান স্মরণে -ফজলুর রহমান ফজলু / ৬৭৯

সাক্ষাৎকার

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সাক্ষাৎকার -মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী / ৬৮১

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতাওয়া

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ প্রদত্ত একটি ফাতাওয়া / ৭০২

শায়খুল হাদীস ছাহেব প্রণীত কয়েকটি গ্রন্থ পর্যালোচনা

শায়খুল হাদীসের বয়ানে বাংলাদেশে ফসলের জাকাত -অধ্যাপক ফরীদ আহমদ রেজা / ৭১০

الإسهامات العلمية للشيخ المحدث العلامة محمد حبيب الرحمن الماتريدي الحنفي الصوفي البنغلاديشي في ضوء كتابه المنتخب السنن والآثار- الشيخ الدكتور سيف الإسلام الأزهري / ৭১৭

আসহাবে বদর গ্রন্থটি বিশ্বমানের একটি বদরকোষ -মামুন সুলতান / ৭২৭

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ রচিত হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক কতিপয় গ্রন্থ: একটি পর্যালোচনা -আব্দুল্লাহ যোবায়ের / ৭৩৫

আত তুহফাতুল লাতীফাহ ফী আহাদীসিল মুসালসালাতিল মুনীফাহ একটি পর্যালোচনা -মাসুক আহমেদ / ৭৩৯

صفوة من كتابي صلاة التراويح و مسائل العشر والخراج لشيخ الحديث العلامة حبيب الرحمن رحمه الله -أبو سادات محمد أفهم الأزهري / ৭৪৬

পরিবার পরিজনের স্মৃতিকথা

আমার ভাইছাব -মাওলানা শুয়াইবুর রহমান / ৭৫২

একজন মহাপুরুষের মহাপ্রয়ান -অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সালাম আল মাদানী / ৭৫৫

স্মৃতিতে চিরঞ্জীব আমার অভিভাবক শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ -মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন / ৭৬০

مرشدنا وأستاذنا-الحاج مولانا ابو الكلام ازاد / ৭৬২

অশ্রু ঝরা স্মৃতি আব্বা আম্মার বিদায় -রোকিয়া বেগম / ৭৬৪

একজন আদর্শ বাবা -রাহিমা খাতুন হুছনা / ৭৬৮

আব্বার স্মৃতি -মো. আবদুর রব বিলাল / ৭৭১

এই শূন্যতা থেকেই যাবে -ছালমা খাতুন / ৭৭৫

আমার আব্বা আমার স্মৃতি -মো. আব্দুল বাকী খালেদ / ৭৭৭

আমার চোখে বাবা -সায়মা খাতুন / ৭৮২

তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ অভিভাবক -জুবায়ের আহমদ / ৭৮৪

কিছু স্মৃতি, কিছু অনুভূতি -সালওয়া জান্নাত লুৎফা / ৭৯১

যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীর সান্নিধ্যে শেষ কয়েক মাস -মাহফুজ আহমাদ মিনহাজ / ৭৯৭

স্মৃতিতে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ উসওয়াতুন হাসানার সর্বোত্তম প্রতিচ্ছবি -মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ / ৮১৪

দূর হতে দেখা -সহুল আহমদ / ৮১৭

তারিখে দিমাস্কের আফসোস রয়ে যাবে আজীবন.... -মাসউদ আহমদ / ৮২১

আজ মঙ্গলবার -মোঃ জিল্লুর রহমান / ৮২৬

নানার স্মৃতি -হুমায়রা যাকিয়া / ৮২৮

কামিল বুযুর্গের প্রতিচ্ছবি -লবীব আনওয়ার / ৮৩০

নানার হিরণ্ময় স্মৃতি -গালিব আশরাফ / ৮৩২

এক অনন্য নানার নাতনি আমি -ডা. বুশরা নাবিলা / ৮৩৮

আমার নানা -মারজানা আক্তার পান্না / ৮৩৯

আমাদের নানা -সাকিব আদনান / ৮৪২

নানার স্মৃতি -নাকিব আফজাল / ৮৪৪

এই আফসোস থেকেই যাবে -মো. মকছুদ আহমেদ / ৮৪৬

My memories of my Dadazi -Nabeela Al- Habib / ৮৫০

আমি সৌভাগ্যবান -সাফওয়ান আল হাবীব / ৮৫১

বয়স নয় মানুষ বেঁচে থাকে আপন কর্মে -খুবায়ব আহমদ / ৮৫৩

My memories of my Dadazi -Wali un nabi Alawi Al Habib / ৮৫৫

নানার শানে -সাওদা আছিমা / ৮৫৬

নিবেদিত কবিতা

শায়খুল হাদীস ছাহেব প্রণীত গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র ও সার্টিফিকেট

শায়খুল হাদীস ছাহেবের হস্তলিপি

স্মৃতি এলবাম

মুরশিদে বরহক আল্লামা
মো. ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী বড় ছাহেব কিবলাহ এর

দু'আ

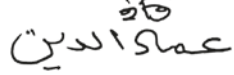
الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على
سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين

আমার পীর ও মুর্শিদ আমার ওয়ালিদ মুহতারাম আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.) এর অন্যতম খলিফা আল্লামা হাবিবুর রহমান মুহাদ্দিছ ছাহেব (রহ.) দুনিয়ার সফর শেষ করে চলে গেছেন; কিন্তু মনে হয় আমাদের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে তিনি বিরাজিত। তাহার নূরানী ফয়েজ আমাদের উপর জারী আছে।

যখনই কোন ইলমি মশকিল বিষয়ে সমাধান চাইতাম মুহাদ্দিছ ছাহেবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে সে বিষয়ে আলোচনা করতাম। তিনি হাসি মুখে আমার প্রশ্নের উত্তর দান করতেন।

আমার ওয়ালিদ মুহতারাম মুহাদ্দিছ ছাহেবকে নিজের ছেলের মত স্নেহ করতেন। ছাহেব কিবলাহ (রহ.) আমানত দারুল কিরাতের জন্য তিনি সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন। তার মুরিদগণকে তরিকতের সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

মুহাদ্দিছ ছাহেবের স্মৃতি ভুলিয়াও ভুলা যায়না। তাহার যে পবিত্র স্মৃতি আমার অন্তরের অন্তস্থলে আছে তাহা যেন অম্লান ও অক্ষয় থাকে।



সম্পাদকের নিবেদন

بسم الله الرحمن الرحيم

মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আ'লামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি অসংখ্য অগনিত দুরুদ ও সালাম।

মুহাদ্দিস ছাহেব নামে সর্বমহলে পরিচিত উস্তাযুল উলামা, কুদওয়াতুল ফুদালা, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর জীবনকাল ছিলো প্রায় নব্বই বছর। ছাত্রজীবনে তিনি যেমন ছিলেন আসাতিযায়ে কিরামের স্নেহধন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী মেধাবী ছাত্র, ঠিক তেমনি কর্মজীবনে বহুমূখি কর্ম তৎপরতা দ্বারা উলামা মাশায়েখ ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের ভরসাস্থল। সমাজের সর্ব শ্রেণির মানুষের ইহ পরকালীন কল্যাণ কামনা ছিলো তাঁর সব কাজের মূল লক্ষ্য। এ কারণেই আজীবন তিনি মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পেয়েছেন।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের বিশাল কর্মবহুল জীবনের উপর একটি বৃহৎ পরিসর স্মৃতিস্মারক তুলনামূলক কম সময়ের মধ্যে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করছি।

এই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন সবার প্রতি অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে যে সকল গুণীজন লেখা দিয়ে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর প্রতি নিজেদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন সকলের ঋণ স্বীকার করছি।

স্মারকগ্রন্থখানা নির্ভুল করতে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিলো। তদুপরি ছাপাজনিত ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আমরা সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছে অগ্রিম ক্ষমা প্রার্থী।

দু'টি বিষয়ে শ্রদ্ধেয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমতঃ এই স্মারকে এমন কিছু লেখকের লেখা অন্তর্ভূক্ত করেছি যারা লেখক হিসেবে একেবারে নবীন। এমনকি স্মারকে অন্তর্ভূক্ত লেখাটি তাঁর জীবনে প্রথম লেখা। এক্ষেত্রে আমরা লেখার মান নয় বরং হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর প্রতি প্রকাশিত আবেগ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকে মূল্যায়ন করেছি।

দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের বানানরীতির ক্ষেত্রে আমরা সচেতনভাবে বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত বানানরীতি অনুসরণ না করে বহুলাংশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর বানানরীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। আশা করি কোন সম্মানিত লেখক মনক্ষুন্ন হবেন না।

এই স্মারকগ্রন্থ সময়ের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশেষজ্ঞ ও হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একনিষ্ঠ খাদিমের সুবিশাল ও বরকতময় কর্মজীবন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত মাত্র। আশাকরি ভবিষ্যতে তাঁর অনুসরণীয় জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা হবে।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর দ্বিতীয় ইন্তেকাল বার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের এ উদ্যোগ আল্লাহপাক কবুল করুন।

মো. আবদুল আউয়াল হেলাল

জীবন ও কর্ম

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

মো. আবদুল আউয়াল হেলাল

সিলেটের জকিগন্জ উপজেলার সহিদাবাদ মৌজার ১১৮নং তালুকের অধিকারী ছিলেন সহিদাবাদ গ্রামের মীনা খা ও মামদ খা দুই ভাই। মামদ খা ছিলেন চার পুত্র সন্তানের জনক। তারা হলেন- ইয়াজ মুহাম্মদ, তাজ মুহাম্মদ, নাজ মুহাম্মদ ও জলিল মুহাম্মদ।

ইয়াজ মুহাম্মদ সহিদাবাদ গ্রাম থেকে এসে রারাই গ্রামে বসত করেন। তাঁর পুত্র কলিম মুহাম্মদ ওরফে কনাই মিয়া। কলিম মুহাম্মদ দুই পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র মিরজান আলী ও মাওলানা মুমতায আলী রাহিমাহুল্লাহ।

এই মাওলানা মুমতায আলী রাহিমাহুল্লাহ সাত পুত্র এক কন্যা সন্তান রেখে ১৯৬৬ সালে ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা মুমতায আলী রাহিমাহুল্লাহ এলাকায় খ্যাতিমান একজন মুত্তাকী আলিমে দ্বীন ছিলেন। তিনি মুরাদাবাদের (উত্তর প্রদেশ, ভারত) প্রখ্যাত বুযুর্গ হাফিয মাওলানা আবদুর রাহমান মুজাদ্দিদী মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বিশিষ্ট ছাত্র ও মুরীদ ছিলেন। তাঁর সন্তানগণ হলেন, মাওলানা নজিবুর রহমান (ইন্তেকাল ১৯৯৯ ঈ.), আযীযুর রহমান (ইন্তেকাল ১৯৯৬ঈ.), শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান (ইন্তেকাল ২০২২ ঈ.), মাওলানা খলিলুর রহমান (ইন্তেকাল ২০০৫ ঈ.), সুফিয়া বেগম (ইন্তেকাল ২০২০ ঈ.), ফয়জুর রহমান (ইন্তেকাল ২০০৬ ঈ.), মাওলানা শফিকুর রহমান (ইন্তেকাল ২০১৪ ঈ.) ও মাওলানা শুয়াইবুর রহমান হাফিযাহুল্লাহ।

মাওলানা মুমতায আলী রাহিমাহুল্লাহ এর সন্তানগণের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন উস্তাযুল উলামা, কুদওয়াতুল ফুদালা, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ।

মাওলানা মুমতায আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আপন সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষায় সর্বোচ্চ শিক্ষিত করতে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন এর একটি উদাহরণ শায়খুল হাদীস ছাহেবের জবানীতে শোনা যাক। তিনি বলেন, বাবার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিলো ফজরের নামায শেষে মসজিদ থেকে এসে ঘরের বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে দীর্ঘ সময় উচ্চ স্বরে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। তিলাওয়াত ও ওযীফা পাঠ শেষে বাড়িতে থাকা সন্তানদের সাথে নিয়ে নাস্তা করতেন। বড় ভাই সাহেব তখন বাদেদেওরাইল ফুলতলী মাদ্‌রাসায় এবং আমি সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় কর্মরত। অন্য ভাইয়েরা তখনও

ছাত্র। একবার গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বাড়িতে ছিলাম। দৈনন্দিন অভ্যাসমত একদিন ভোর বেলা বাবার সাথে নাস্তায় বসেছি। তিনি বড় ভাই এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিছু জমি বিক্রি করবো। তোমরা দু'জন কিনবে। আমরা একে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে আছি। কিছুই বুঝতে পারছি না। বাবাকে জিজ্ঞেস করার সাহসও কারো নেই। নাস্তা শেষে আমরা দু'জন মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, বাবা এসব কী বলছেন, আমরা হয়তো কোন ভুল করেছি। মায়ের কাছ থেকে আমাদের চিন্তার কারন জানতে পেরে বাবা আমাদের ডাকলেন। বললেন, তোমরা আমার কথা বুঝতে পারোনি। তোমরা কোন ভুল করোনি। আসলে আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। আমি চাই আমার কাফন দাফন, শিরনী সাদকা ইত্যাদি হবে নিজ উপার্জিত সম্পদ থেকে। কারন আমি সব সময় আল্লাহর কাছে এই দুআ করেছি, হে আল্লাহ! আমার সন্তানদের ইলমে দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছার তাওফিক দাও। আমি এদের থেকে দুনিয়ার কোন ফায়দা নেবো না। আখিরাতে যেন এরা আমার কাজে লাগে। আল্লাহ তা'লা আমার দুআ কবুল করেছেন। তোমরা দু'জন আলিম হয়েছো। আমি জানি তোমরা মৃত্যুর পর তোমরা সাধ্যমত ভালো কাপড়ে আমার কাফন দেবে, আমার জন্য সাদকা খয়রাত করবে। কিন্তু ভয় হচ্ছে যদি তোমাদের টাকার কাফন নিয়ে কবরে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞেস করেন তুমি তো বলেছিলে সন্তানদের থেকে দুনিয়ায় কোন উপকার ভোগ করবে না; অথচ তাদের টাকার কাফন নিয়ে কবরে এসেছো। আমি জবাব দিতে পারবো না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার উপার্জনের টাকায় ক্রয় করা জমি তোমাদের কাছে বিক্রি করবো। এই টাকা আমাকে দিতে হবে না। তোমাদের কাছেই রাখবে। মৃত্যুর পর এই টাকা দিয়েই আমার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করবে, আমার জন্য শিরনী সাদকা করবে। আর তোমরা দু'জন এ পর্যন্ত তোমাদের উপার্জনের যে টাকা দিয়েছো এর এক টাকাও আমি নিজের জন্য ব্যয় করিনি। তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিয়েছি।

জন্ম

১৯৩৪ ঈসায়ী মুতাবেক ১৩৫২ হিজরিতে রারাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর পিতা মাওলানা মুমতায আলী রাহিমাহুল্লাহ যেমন একজন মুত্তাকী আলিম হিসেবে এলাকার সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, ঠিক তেমনি তাঁর মা আমিনা খাতুন (ইন্তেকাল ১৯৯৪ ঈ.) একজন আবিদা, যাহিদা বিদুষী মহিলা ছিলেন। সময়ের হিসেবে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। কারণ গ্রামাঞ্চলে তখনকার সময় কোন কোন পরিবারে মেয়েদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু উর্দু শিক্ষার প্রচলন থাকলেও বাংলা শিক্ষার প্রচলন একেবারেই ছিলো না। কিন্তু শায়খুল হাদীস ছাহেবের মা উর্দু, সিলেটি নাগরী এবং বাংলা ভালোভাবে পড়তে পারতেন। শেষ বয়সে তিনি ফজরের পর দীর্ঘ সময় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। এরপর আশপাশ

বাড়ির কিছু মহিলা তাঁর কাছে জড়ো হতেন। তিনি তাদেরকে উর্দু তা'লিমুল ইসলাম, বেহেশতি জেওর এবং বাংলা মকসুদুল মুমিনীন, কাসাসুন নবী এবং সিলেটি নাগরী হালতুন্নবী পড়ে শোনাতেন। এটি তাঁর দৈনন্দিন রুটিন ছিলো।

এই মহিলা কতটুকু মুত্তাকী ছিলেন এর নমুনা পাওয়া যায় একটি ঘটনায়। একবার রাতের বেলা মাওলানা মুমতায আলী রাহিমাহুল্লার ঘর চুরি হয়। গভীর রাতে সিঁদেল চোর ঘরে ঢুকে সব মালামাল নিয়ে যায়। ভোরবেলা জানাজানি হলে গ্রামের লোকজন মাওলানা সাহেবের বাড়িতে এসে খুঁজ খবর নিচ্ছেন। অন্দর মহলে আশপাশ বাড়ির মহিলারাও ছুটে এসেছেন। তারা দেখলেন মাওলানা সাহেবর পত্নী বেশ কান্নাকাটি করছেন। সবাই তাকে সান্তনা দিতে গেলে তিনি বললেন, চোর মালামাল নিয়েছে তাতে আমার কোন আফসুস নেই। কিন্তু গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় চোর ঘরে ঢুকেছে, আমি কোন অবস্থায় ছিলাম জানিনা। চোর যদি আমাকে বেপর্দা অবস্থায় দেখে যায় আর এতে যদি আল্লাহ আমার উপর নারাজ হন, সেই ভয়ে আমার কান্না আসছে।

এই ঘটনা দীর্ঘদিন গ্রামের মুরব্বিদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে শোনা যায়।

বাল্যকাল

যতটুকু জানা যায়, বাল্যকাল থেকেই তিনি ব্যতিক্রমী স্বভাবের ছিলেন। সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা হৈ হল্লায় তেমন একটা অংশ নিতেন না। তাঁর প্রায় সমবয়সী চাচাতো ভাই মরহুম কুতুব আলী ছিলেন তাঁর শৈশবের খেলার সাথী। দু'জনের খেলা বলতে ছিলো, উভয়ে বাড়ির বিভিন্ন গাছ থেকে ঝরে পড়া পাতা একত্রিত করতেন। তারপর শুকনো সে পাতাসমুহ কোনটি কোন গাছের পাতা তা শনাক্ত করতে চেষ্টা করতেন। দু'টি গাছের পাতার মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে তা খুঁজে বের করতেন। কে কত বেশি পাতা শনাক্ত করে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে সেটিই ছিলো প্রতিযোগিতা। প্রায় প্রতিদিনই একাজে উভয়ের সময় কাটতো।

তাঁর বড় ভাই মরহুম মাওলানা নজিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন বর্তমান ভারতের বদরপুর সিনিয়র মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নরত। অল্প বয়সে ছোট ভাইকে তিনি সেখানে নিয়ে ইবতেদায়ী শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। কিন্তু সেখানে তাঁর মন টেকেনি। বাড়িতে চলে আসার জন্য প্রায়ই কান্নাকাটি করতেন। এমতাবস্থায় বড় ভাই তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। নয় দশ বছর বয়সকালে পিতা তাঁকে পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থিত হাফিয মাওলানা আবদুল গণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতিষ্ঠিত ইছাপুর হাফিযি মাদ্‌রাসায় ভর্তি করে দেন। অত্র এলাকায় কুশিয়ারা নদীর ওপার থেকে শরাফত আলী নামক একজন মজযুব প্রায়ই আসা যাওয়া করতেন। একদিন এই মজযুব এসেছেন, মানুষ তাঁকে ঘিরে ধরেছে। সবাই বলছে, আমাকে কিছু দিন। মানুষের দেখাদেখি বালক শায়খুল হাদীস ছাহেবও বললেন, আমাকে কিছু দিন। মজযুব কাউকে কিছু না দিলেও

রাস্তার পাশ থেকে ভাটি গাছের পাতা ছিঁড়ে তাঁকে দিলেন। তিনি সেই পাতা পকেটে রাখেন। পরবর্তীতে পকেটে রাখা সেই শুকনো পাতা চিবিয়ে খেয়ে ফেলেন। এরপরই বিপত্তি দেখা দেয়। তিনি প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। জ্ঞান ফিরলে অপ্রকৃতস্তের মতো কথা বলতেন। এমতাবস্থায় তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। তাঁর পিতা হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র পরামর্শে এক বছর পর্যন্ত তাঁকে কোথাও পড়তে না দিয়ে বাড়িতে রাখেন।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা

পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে পূর্ব সিলেটের অন্যতম প্রাচীন ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কানাইঘাট উপজেলাধীন সড়কের বাজার আহমদিয়া মাদ্‌রাসায় (প্রতিষ্ঠা : ১৯১৪ ঈ.) ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। এখানে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। প্রখর মেধা ও উন্নত চরিত্র মাধুর্যের কারনে এসময় তিনি শিক্ষকগণের মনযোগ আকর্ষণে সক্ষম হন। সড়কের বাজার মাদ্‌রাসায় ছাত্র থাকাকালীন শিক্ষকগণের উৎসাহে পার্শ্ববর্তী প্রাইমারি স্কুল থেকে জেলা ভিত্তিক প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বৃহত্তর সিলেট জেলার মেধাতালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়ার সময়ই তিনি আরবী, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বড় ভাই মাওলানা নজিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অবদান আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন। তিনি বলেন, বড় ভাই সাহেব সড়কের বাজার মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার পাশাপাশি একটি গ্রামের মসজিদে ইমাম হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। সেই মসজিদের অবস্থান ছিলো আমার লজিং থেকে দুই আড়াই মাইল দূর। প্রতিদিন শেষরাতে তিনি পায়ে হেঁটে এসে আমাকে জাগ্রত করে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় নাহু সারফ, উর্দু ও ফার্সি ব্যায়করণের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের কিতাবাদি পড়াতেন। আমাকে তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ফিরে গিয়ে তিনি ফজর নামাযে ইমামতি করতেন। বড় ভাই ইন্তেকাল করলে দাফন শেষে বাড়িতে ফিরে তিনি বলেছিলেন, আজ ইলমের এক ভাণ্ডার নিজ হাতে দাফন করে আসলাম।

সড়কের বাজার আহমদিয়া মাদ্‌রাসায় তাঁর পঠিত বিষয় ছিলো - আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন কিতাব। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো, মীযান মুনশাইব, হেদায়াতুন নাহু, কাফিয়া, মীযান মানতিক ও পান্দেনামা। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তাঁর উস্তাযগণের মধ্যে রয়েছেন, বড় ভাই মাওলানা নজিবুর রহমান (ইন্তেকাল ১৪২০ হি. ১৯৯৯ ঈ.), মাওলানা সিকন্দর আলী, মাওলানা মুনঈম উদ্দিন, মাওলানা ইমতিয়ায আলী, কারী তজম্মুল আলী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমূখ।

উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

১৯৫৪ সালে সিলেটের অন্যতম প্রাচীন ইসলামি বিদ্যাপীঠ গাছবাড়ি জামেউল উলুম

কামিল মাদ্‌রাসায় (প্রতিষ্ঠা : ১৯০১ ঈ.) ভর্তি হন। ১৯৫৫ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ডের অধীন আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য যে, সে বছর বৃহত্তর সিলেট জেলায় মাত্র চারজন ছাত্র প্রথম বিভাগে আলিম উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাদের একজন সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে, একজন ঝিংগাবাড়ি ফাযিল মাদ্‌রাসা থেকে, দুইজন গাছবাড়ি জামিউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা থেকে। গাছবাড়ির দুইজনের একজন শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ, অপরজন তাঁর সহপাঠী কর্মজীবনে গাছবাড়ি জামিউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা বশীরুদ্দীন আহমদ চৌধুরী হাফিযাহুল্লাহ। একই মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৫৭ সালে ফাযিল পরীক্ষায় তিনি বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সে বছর ফাযিল পরীক্ষায় বৃহত্তর সিলেট জেলায় মাত্র দুইজন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি এবং তাঁর সহপাঠী মাওলানা বশীরুদ্দীন আহমদ চৌধুরী। ১৯৫৯ সালে হাদীস বিভাগে কামিল পরীক্ষায় বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করে তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

নিজের পরীক্ষার এত ভালো ফলাফল প্রসঙ্গে কথা উঠলে তিনি বলতেন, মায়ের কাছে শুনেছি, প্রত্যেক ফাইনাল পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে এলে প্রতিদিন শেষরাতে জায়নামাযে বসে বাবা আমার ভালো ফলাফলের জন্য দীর্ঘ মুনাজাত করতেন। আর আমার মা কয়েক মাসব্যাপী ধারাবাহিক নফল রোযা রাখতেন। মূলতঃ মা বাবার এই দুআর বারাকাতে এমন ফলাফল হয়েছে।

গাছবাড়ি জামিউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় আলিম, ফাযিল ও কামিল স্তরে তাঁর উস্তাযগণের মধ্যে রয়েছেন শামসুল উলামা আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী, মাওলানা শামসুল হুদা বলরামেরচকী, মাওলানা কমর উদ্দিন আগিরামী, শায়খুল হাদীস মাওলানা শফিকুল হক বুলবুল, শায়খুল হাদীস মাওলানা সাঈদ আলী, চারাবই, মুফতি মাওলানা আবদুল গণী, মাওলানা ইদরীস আহমাদ শিবনগরী, মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ বানিগ্রামী, মাওলানা আমির আহমাদ সাতবাকী, মাওলানা মুনতাযিম আলী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা শাহিদ আলী সোহরাবপুরী রাহিমাহুমুল্লাহ।

আলিম জামাতে পঠিত কিতাবাদি - তরজমায়ে কুরআন, মিশকাতুল মাসাবীহ, নুরুল আনোয়ার, শরহে বেকায়া, দুরুসুল বালাগাত, শারহুত তাহযীব ফিল মানতিক, সিরাজী ফিল মীরাছ, দেওয়ান হামাসা (আরবী সাহিত্য), মুসাদ্দাসে হালী (উর্দু সাহিত্য), রুকআতে আলমগিরী (ফার্সি সাহিত্য)।

ফাযিল জামাতে পঠিত কিতাবাদি- তাফসীরে জালালাইন, মিশকাতুল মাসাবীহ, নুরুল আনোয়ার, আল হিদায়া, শারহে আকাঈদে নাসাফী, সাবআ মুআল্লাকাহ, মুসাল্লামুস

সুবুত, আল মুসতাতরাফ, হিদায়াতুল হিকমাত, সুল্লামুল উলুম, মুখতাসারুল মাআনী, আইনুল ইলম (তাসাউফ)।

যাঁদের কাছে সিহাহ সিত্তাহ পড়েছেন

এক. **শায়খুল হাদীস আল্লামা সাঈদ আলী (চারাবইর হুজুর) রাহিমাহুল্লাহ (১৯০৭-১৯৬৪ ঈ.)**

তাঁর কাছে শায়খুল হাদীস ছাহেব সহীহ বুখারী প্রথম খণ্ড, সহীহ মুসলিম প্রথম খণ্ড এবং সুনান আবু দাউদ প্রথম খণ্ড পড়েছেন।

দুই. **শায়খুল হাদীস আল্লামা শফিকুল হক (বুলবুল ছাহেব হুজুর) রাহিমাহুল্লাহ (১৯২৮-২০০১ ঈ.)**

তাঁর কাছে সহীহ বুখারী দ্বিতীয় খণ্ড, সহীহ মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ড এবং সুনান তিরমিযী (সম্পূর্ণ) পড়েছেন।

তিন. **শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল গণী (মুফতি ছাহেব হুজুর) রাহিমাহুল্লাহ (১৯২০-১৯৮৭ ঈ.)**

তাঁর কাছে সুনান ইবনু মাজাহ ও সুনান নাসাঈ পড়েছেন।

চার. **শায়খুল হাদীস আল্লামা ইদরীস আহমাদ (শিবনগরী হুজুর) রাহিমাহুল্লাহ (১৯২৪-২০০৭ ঈ.)**

তাঁর কাছে সুনান আবু দাউদ দ্বিতীয় খণ্ড এবং মিশকাতুল মাসাবীহ (ফাযিল জামাতে) অধ্যয়ন করেন।

উল্লিখিত উস্তাযগণের কাছে সিহাহ সিত্তাহ ছাড়াও তাফসীরে বাইদাওয়ী, তাফসীরে কাশশাফ, আল ইতকান, আল ফাউদুল কাবীর ও তারীখুল ইসলাম প্রভৃতি অধ্যয়ন করেছেন।

প্রত্যেক উস্তাদের কাছ থেকেই উল্লিখিত হাদীসের কিতাবসমূহের ইজাযাহ ও সনদ লাভ করেছেন। তাঁর উস্তাযগণ প্রদত্ত বিস্তারিত সনদ তিনি স্বীয় তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব تحفة اللبيب باسانيد الحبيب গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ যেমন প্রখর মেধাবী ছাত্র ছিলেন তেমনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। কামিল ক্লাসের দুই বছর সকাল দশটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত (নামায ও দুপুরের খাওয়ার বিরতী ছাড়া) একটানা ক্লাস চলতো। সিলেবাসের কিতাবাদির বাইরে এই দুই বছরে তিনি ফাতহুল বারী শারহে সাহীহ বুখারী, উমদাতুল

কারী শারহে সাহীহ বুখারী, আওজাযুল মাসালিক, লামআতুত দিরায়া প্রভৃতি কিতাব আদ্যোপান্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রজীবনে তিনি মাদ্‌রাসা লাইব্রেরির কিতাব ছাড়াও উস্তাযগণের কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ কিতাব চেয়ে নিয়ে পড়তেন। সে সময় সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসার একজন বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন মাওলানা ফজলে হক (ফাজিল ছাহেব) রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর বাড়ি গাছবাড়ি এলাকায়। তিনি প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে যাওয়ার সময় সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি থেকে নতুন কোন কিতাব নিয়ে শায়খুল হাদীস ছাহেবকে পড়ার জন্য দিতেন। একান্ত পরিবেশে তিনি কোন কোন সময় বলতেন, ছাত্রজীবনে কখনও তিন থেকে চার ঘণ্টার বেশি ঘুমাইনি। চারাবইর হুজুর মাঝে মধ্যে একান্তে ডেকে নিয়ে বলতেন, ঘুমের পরিমাণ বাড়াও, স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলবে।

কামিল জামাতে সহপাঠীগণ

১। মাওলানা বশীরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী, কানাইঘাট, সিলেট।
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গাছবাড়ি জামিউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা।

২। মাওলানা আবদুস সাত্তার, লাকসাম, কুমিল্লা।

৩। মাওলানা আফাজ উদ্দিন, কচুয়া, কুমিল্লা।

৪। মাওলানা মাহমুদ ফেদা, কানাইঘাট, সিলেট।

৫। মাওলানা আবু নছর মো. আবদুল গণী, লাকসাম, কুমিল্লা।

৬। মাওলানা ফয়জুল বারী, কানাইঘাট, সিলেট।

৭। মাওলানা হাসানুজ্জামান, লাকসাম, কুমিল্লা।

৮। মাওলানা মঞ্জুর আহমদ, কানাইঘাট, সিলেট।

৯। মাওলানা খিজির আহমদ, কমলগঞ্জ, মৌলবী বাজার।

১০। মাওলানা আবদুস সুবহান, কানাইঘাট, সিলেট।

১১। মাওলানা মুজম্মিল আলী, সদর, সিলেট।

১২। মাওলানা আবদুল জলিল, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

সেই ছাত্রজীবনে বিজ্ঞ উস্তাযগণের স্নেহ সান্নিধ্য ও ইলমি পরিবেশ তাঁর মাঝে জ্ঞান অর্জনের প্রতি যে অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলো আমৃত্য সেই আগ্রহ ও ব্যাকুলতা সমানভাবে অব্যাহত ছিলো। তাই দেখা যায় জীবনের নানা বাঁকে তিনি দেশ বিদেশের বরেণ্য উলামায়ে কিরামের কাছে ছুটে গেছেন। তাঁদের কাছ থেকে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে ইজাযাহ ও সনদ লাভ করেছেন। ক্লাসের বাইরে শায়খুল হাদীস

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ যেসকল বরেণ্য উস্তাযের কাছ থেকে হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে ইজাযাহ ও সনদ গ্রহণ করেছেন তাঁদের সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

এক. শামসুল উলামা আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ (১৯১৩-২০০৮ ঈ.)

শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ গাছবাড়ি জামিউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় শামসুল উলামা আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ এর কাছে আলিম ও ফাযিল ক্লাসে উসূলে ফিকহ'র বিখ্যাত কিতাব নুরুল আনোয়ার পড়েছেন। কিন্তু হাদীসের কোন কিতাব পড়ার সুযোগ হয় নি। কারণ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা ১৯৫৬ সালে গাছবাড়ি মাদ্‌রাসা থেকে চলে যান। পরবর্তীতে তিনি ফুলতলী ছাহেব কিবলার কাছে বুখারী শরীফ পড়ে ইজাযাহ ও সনদ লাভ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি তুহফাতুল লাবীব গ্রন্থের ذكر المشايخ الذين أروي عنهم بأسانيدهم الصحاح الست وغيرها من كتب الحديث অধ্যায়ে বলেন-

فمنهم زبدة العارفين، قدوة السالكين، شيخنا ومرشدنا شمس العلماء مولانا محمد عبد اللطيف الفولتلي السلهتي نفعنا الله بأنفاسه القدسية . قرأت عليه أحاديث من أول الجامع الصحيح فأجازني بجميع مروياته- (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب، الصفحة ٦١)

অর্থাৎ, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যুবদাতুল আরিফীন, কুদওয়াতুস সালিকীন, আমাদের উস্তায ও মুরশিদ শামসুল উলামা মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল লতিফ ফুলতলী সিলেটী। তাঁর কাছে আমি সাহীহ বুখারীর প্রথম থেকে কিছু হাদীস পড়েছি। অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর যাবতীয় সনদের ইজাযাহ প্রদান করেছেন।

(তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃষ্ঠা ১৬)।

এরপর তুহফাতুল লাবীব কিতাবে তিনি হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ এর হাদীসের দুই উস্তায আল্লামা খলিলউল্লাহ রামপুরী ও আল্লামা ওয়াজিহ উদ্দিন রামপুরী রাহিমাহুমাল্লাহ প্রদত্ত ইমাম বুখারী পর্যন্ত মুত্তাসিল (অবিচ্ছেদ্য) সনদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

দুই. শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ (১৯০৮-১৯৮১ ঈ.)

১৯৬০ সালে ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতাকালীন সময়ে শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসার তৎকালীন মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ এর কাছ থেকে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন-

فمنهم شيخنا مولانا عبد الواحد المحدث بالمدرسة العالية بسلهت ، قرأت عليه من أول الجامع الصحيح للإمام البخاري وأجازني بجميع مروياته (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب ، الصفحة ٩١)

অর্থাৎ, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের শায়খ মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ, তিনি সিলেট আলিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন। আমি তাঁর কাছে সাহীহ বুখারীর প্রথম থেকে পড়েছি। তিনি আমাকে তাঁর যাবতীয় সনদের ইজাযাহ দিয়েছেন। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃষ্ঠা ১৯)।

শায়খ আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ শায়খ মুশতাক আহমদ কানপুরী, শায়খ ওয়াসিউদ্দিন ও শায়খ জামিল আনসারী রাহিমাহুমুল্লাহ এর কাছ থেকে সাহীহ বুখারীসহ অন্যান্য কিতাবের সনদ লাভ করেন। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত এ দুই শায়খের মুত্তাসিল সনদ তুহফাতুল লাবীব গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ এর কাছ থেকে ইলমে হাদীসের সনদ গ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশে ইলমে হাদীস চর্চার ইতিহাসে যে সকল মনীষী অবদান রেখে স্মরণীয় হয়ে আছেন শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁদের অন্যতম। তিনি সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আমি গাছবাড়ি জামিউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নরত ছিলাম, তাই নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্লাসে তাঁর কাছে পড়ার সুযোগ হয়নি। কিন্তু উনার মত একজন প্রাজ্ঞ আলিমের সাহচর্য এবং তাঁর কাছ থেকে সনদ গ্রহণের আন্তরিক ইচ্ছা সব সময়ই ছিলো। আলহামদুলিল্লাহ! একসময় সে সুযোগ পেয়ে যাই। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ইছামতি দারুল উলুম মাদ্‌রাসার শিক্ষক হিসেবে সে বছরের আলিম ফাইনাল পরীক্ষার্থী ছাত্রদের নিয়ে তখনকার পরীক্ষা কেন্দ্র সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসায় যাই। পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ। সহজেই তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ হয়। একসময় উনার খিদমতে কিছু হাদীস পড়ে সনদ গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করি। তিনি খুবই আগ্রহভরে সুযোগ দেন। একদিন বাদ মাগরিব আমার উস্তায শায়খুল হাদীস আল্লামা ইদরীস আহমদ (শিবনগরী হুজুর) রাহিমাহুল্লাহর সাথে উনার বাসায় যাই। দীর্ঘ সময় উনার খিদমতে সাহীহ বুখারী শরীফ থেকে পড়ি। ৩ যিলহাজ্জ ১৩৭৯ হিজরি মোতাবেক ২৯ মে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ রবিবার তিনি নিজ হাতে লিখে এই অধমকে সনদ প্রদান করেন। (পাণ্ডুলিপি প্রকাশন থেকে ২০২৩ সালের বই মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত মাওলানা মো. সঈদুল হাসান রচিত ও আশরাফ হাসান সম্পাদিত শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ (রহ.) গ্রন্থে প্রদত্ত ২৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখে স্বাক্ষরকৃত অভিমত, পৃষ্ঠা ২৯)।

তিন. বাহরুল উলুম আল্লামা মুহাম্মাদ হুসাইন সিলেটী রাহিমাহুল্লাহ (১৮৯০-১৯৭২ ঈ.)

শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ কর্মজীবনে সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে অধ্যাপনাকালে সিলেটের কিংবদন্তি আলিমে দ্বীন, কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার সাবেক মুহাদ্দিস, সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বাহরুল উলুম আল্লামা মুহাম্মাদ হুসাইন সিলেটী রাহিমাহুল্লাহ এর সিলেট শহরের বাসায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এ সময় তিনি বাহরুল উলুম ছাহেবের কাছে কিছু হাদীস পড়ে তাঁর কাছ থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেন। তিনি বলেন-

ومنهم شيخنا بحر العلوم العلامة محمد حسين السلهتي (المتوفى ١٩٧٣ م) وهو يروي عن الشيخ ناظر حسن عن الشيخ أحمد على السهارنفوري عن الشيخ الشاه محمد اسحاق عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي عن الامام الشاه ولي الله الدهلوي بالسند المتقدم (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب، الصفحة ١٨-١٩)

অর্থাৎ, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাহরুল উলুম মুহাম্মাদ হুসাইন সিলেটী (ইন্তেকাল ১৯৭৩ ঈ.)। তিনি শায়খ নাজির হাসান থেকে, তিনি শায়খ আহমাদ আলী সাহরানপুরী থেকে, তিনি শাহ ইসহাক দেহলবী থেকে, তিনি শাহ আবদুল আযীয দেহলবী থেকে, তিনি ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী থেকে পূর্বে উল্লেখিত সনদে বর্ণনা করেছেন। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃষ্ঠা ১৮-১৯)।

উল্লেখ্য যে, বাহরুল উলুম ছাহেব সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শায়খুল হাদীস ছাহেব বলতেন, তিনি একজন বেমিছাল আলিম ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত কিতাবাদির সংগ্রহ এতো সমৃদ্ধ ছিলো যা কল্পনাও করা যায় না। তাঁর বাসায় বিভিন্ন মাসলাক মাশরাবের উলামা নিয়মিত আসতেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন জঠিল প্রশ্নাদি উত্থাপন করতেন। বাহরুল উলুম ছাহেব সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলতেন, ঐ আলমিরা থেকে অমুক কিতাব বের করে এত নাম্বার পৃষ্ঠা থেকে এত নাম্বার পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ুন, আপনার জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে যাবেন। তাঁর ঘরে বসে যেকোন কিতাব যে কেউ পড়তে চাইলে তিনি সুযোগ দিতেন। তবে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতেন না। কিন্তু আমাকে প্রায় প্রতি সপ্তাহে নতুন কোন কিতাব হাতে তুলে দিয়ে বলতেন, পড়া শেষ করে আগামী সপ্তাহে ফেরত দিয়ে যাবে। কিতাব ফেরত দেয়ার সময় এই কিতাবে আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতেন। কোন বিষয় বুঝার ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি থাকলে খুব সহজ সাবলীলভাবে বুঝিয়ে দিতেন।

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বাহরুল উলুম ছাহেব আমাকে প্রায়ই বলতেন, হযরত ফুলতলী ছাহেবকে বলবে সঠিক আকীদা এবং দ্বীনী শিক্ষা টিকিয়ে রাখতে বিভিন্ন স্থানে যেন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার দিকে মনযোগি হন। অন্যতায় দ্বীনী শিক্ষা ও সঠিক আকীদা সংরক্ষন করা মুশকিল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, বাহরুল উলুম মুহাম্মাদ হুসাইন সিলেটী রাহিমাহুল্লাহ ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন। এই সময়কালে তাঁর অনেক ছাত্রের মধ্যে অন্যতম প্রিয় একজন ছাত্র ছিলেন উপমহাদেশের বিখ্যাত আলিম, আরবি ও উর্দু ভাষায় দুইশত পঞ্চাশটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব প্রণেতা মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী রাহিমাহুল্লাহ। মুফতি ছাহেব তাঁর রচিত বিভিন্ন কিতাবে শ্রদ্ধেয় উস্তায বাহরুল উলুম ছাহেবের হাওয়ালায় বহু কথা সন্নিবেশ করেছেন। এমনকি তাঁর প্রকাশিত কোন কোন কিতাবে এই উস্তাযের তাকরীয বা অভিমতও যুক্ত করেছেন।

চার. মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী রাহিমাহুল্লাহ (১৯১১-১৯৭৪ ঈ.)

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনাকালে মাদ্‌রাসা ই আলিয়া ঢাকা এর হেড মাওলানা, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররাম এর প্রথম খতীব, ফিকহুস সুনান ওয়াল আছারসহ অসংখ্য কিতাব প্রণেতা মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী রাহিমাহুল্লাহ এর কাছ থেকে ইজাযাহ ও সনদ গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন-

فمنهم شيخنا المعظم المفتي السيد عميم الإحسان المجددي البركتي رئيس الأساتذة بالمدرسة العالية دكا ، صاحب التألفات القيمة. قرأت عليه الحديث المسلسل بالأولية واحاديث من الجامع الصحيح فأجازني بجميع مروياته، وهذا في الغرفة المخصوصة له بالمدرسة المذكورة. وكان سيدنا الفولتلي والرئيس المولوي عبد البصير والقاري شمس الدين الكونا كرامي شاهدين في ذلك المجلس، فالحمد لله رب العالمين (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب، الصفحة ١٩-٢٠)

অর্থাৎ, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের সম্মানিত উস্তায, মাদ্‌রাসা ই আলিয়া ঢাকা এর প্রধান উস্তায, বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণেতা মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী। প্রাগুক্ত মাদ্‌রাসায় তাঁর জন্য নির্ধারিত কক্ষে আমি তাঁর কাছে হাদীসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়্যাহ এবং সাহীহ বুখারী থেকে কিছু হাদীস পড়েছি। তিনি আমাকে তাঁর যাবতীয় সনদের ইজাযাহ প্রদান করেন। সেই মজলিসে সায়্যিদিনা ফুলতলী, মৌলবী দেওয়ান আবদুল বসির এবং কারী শামসুদ্দিন কোনাগ্রামী উপস্থিত ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃষ্ঠা ১৯-২০)।

মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী রাহিমাহুল্লাহ শায়খ বারাকাত আলী শাহ, শায়খ মুহাম্মাদ হুসাইন সিলেটী, শায়খ মুশতাক আহমাদ কানপুরী, মুহাদ্দিসুল হিজায শায়খ মুহাম্মাদ ইবন উমর হামদুন রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ চৌদ্দজন উস্তাযের কাছ থেকে হাদীস এবং অন্যান্য বিষয়ে সনদ ও ইজাযাহ লাভ করেন। মুফতি ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় উস্তাযগণ প্রদত্ত সনদ বিস্তারিতভাবে স্বীয় মিন্নাতুল বারী নামক সনদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধেয় উস্তায মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ'র স্মৃতিচারণ করতেন। মুফতি ছাহেব রাহিমাহল্লাহ তাঁর উস্তাযের প্রতি কতটুকু ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এর নজির পেশ করতে গিয়ে বলেন, সে সময় যেকোন প্রয়োজনে ঢাকায় গেলে মুফতি ছাহেবের সাথে দেখা করতাম। একবার রাতের ট্রেনে ঢাকা যাবো, বিকেলে বাহরুল উলুম মুহাম্মাদ হুসাইন সিলেটী রাহিমাহুল্লাহ'র বাসায় গেলাম। বাহরুল উলুম ছাহেব তাঁর প্রিয় ছাত্র মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ'র প্রতি একটি চিঠি লিখে আমার কাছে দিলেন। ঢাকা যাওয়ার পর মুফতি ছাহেব হুজুরের বাসায় পৌঁছে দেখলাম তিনি বৈঠকখানায় তাঁর নির্ধারিত চেয়ারে বসে কি যেন লিখছেন। সালাম ও কদমবুসির পর বললাম, বাহরুল উলুম ছাহেব এ চিঠি দিয়েছেন, বলে পকেটে হাত দিচ্ছি দেখে তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষনের মধ্যে ফিরে এসে আমাকে তাঁর চেয়ারে বসতে বললেন। আমি রাজি হচ্ছিনা দেখে বললেন, তুমি হুজুরের পত্র বাহক, হুজুরের চিঠি আসা আর হুজুর নিজে আসা একই কথা। যেহেতু তুমি হুজুরের চিঠি নিয়ে এসেছো তাই তোমাকে এই চেয়ারে বসেই চিঠিখানা দিতে হবে। অপারগ হয়ে হুজুরের নির্ধারিত চেয়ারে বসে বাহরুল উলুম ছাহেবের চিঠি মুফতি ছাহেবের হাতে তুলে দিলাম। চিঠি হাতে নিয়ে তিনি প্রথমে চুমু খেলেন, তারপর চোখে ও মাথায় লাগিয়ে বুক পকেটে রাখলেন। এবার আমি চেয়ার ছেড়ে সরে আসলাম। তিনি বসেই জিজ্ঞেস করলেন, প্রথমে হুজুরের চিঠি না নিয়ে ভেতরে কেনো গিয়েছিলাম বুঝেতে পেরেছো? আমি না সূচক জবাব দিলাম। বললেন, আমি কোনদিন অজু ছাড়া কোন উস্তাদের সামনে যাইনি। হুজুর নিজে আসা আর হুজুরের চিঠি আসা আমার দৃষ্টিতে সমান। ঐ মুহূর্তে আমার অজু ছিলো না। তাই ভেতরে গিয়ে অজু করে এসে হুজুরের চিঠি হাতে নিয়েছি।

পাঁচ. ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী আল মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ (১৯৪২-২০০৪ ঈ.)

১৪ এপ্রিল ১৯৯৯ ঈসায়ী, ১ মুহাররাম ১৪২০ হিজরি বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাযের পর মক্কা শরীফের রুসাইফা এলাকায় অবস্থিত বাসায় গিয়ে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন বিষয়ে এক'শ বিশটি কিতাব প্রণেতা ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে প্রথম সাক্ষাত করেন। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিপুল সংখ্যক উলামার উপস্থিতিতে সেদিন শায়খ সুনান আবু দাউদ কিতাব থেকে কিছু হাদীসের সংক্ষিপ্ত দারস প্রদান করেন। শায়খের বাসায় জুমুআর রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) সাধারণতঃ কাসীদায়ে বুরদা খতম এবং মীলাদ শরীফ মাহফিল হতো। সেদিনও সংক্ষিপ্ত দারস,

কাসীদায়ে বুরদা খতম ও মীলাদ শরীফ শেষে মেহমানগণকে আপ্যায়ন করা হলো। আগত মেহমানগণ ক্রমান্বয়ে বিদায় নিলে শায়খুল হাদীস ছাহেব তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে শায়খের সাথে একান্ত সাক্ষাত করেন। সেই বৈঠকে তিনি শায়খের কাছ থেকে ইজাযাহ ও সনদ প্রাপ্ত হন। তিনি বলেন-

فمنهم شيخنا المكرم محدث الحرم المكي ، حامل لواء أهل السنة، صاحب التألفات القيمة، الإمام السيد محمد بن علوي المالكي المكي . سمعنا منه بعض الأحاديث المسلسلات أيام سفر الحج في مدة إقامتنا بمكة المكرمة ، فكتب لنا الإجازة برواية الصحاح الست وجميع مروياته من كتب الحديث والتفسير والفقه والشمائل وسائر مؤلفاته، وأهدى الينا كتبا مفيدة في مختلف الفنون، وشرفني بعطيات كريمة من عمامة وغيره فجزاه الله عنا أحسن الجزاء ومتعنا بفيوضه وبركاته. (تحفة اللبيب باسانيد الحبيب ، الصفحة ٢٠-٢١)

অর্থাৎ, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের শায়খ হারামে মক্কার মুহাদ্দিস, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পতাকাবাহী, বহু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব প্রণেতা ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী মাক্কী। হজ্জের সফরকালীন মক্কা মুকাররামায় অবস্থানকালে আমরা তাঁর কাছ থেকে কতিপয় মুসালসাল হাদীস শ্রবণ করি। তিনি আমাদেরকে সিহাহ সিত্তাহ এবং হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, শামাঈল এর বিভিন্ন কিতাব এবং উনার প্রণীত যাবতীয় কিতাবের ইজাযাহ লিখে দেন। আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিতাব হাদিয়া দেন। আমাকে পাগড়ীসহ কিছু বিশেষ উপহার সামগ্রী দিয়ে সম্মানিত করেন। আল্লাহপাক আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তম বদলা দিন। তাঁর ফায়েয ও বারাকাত দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করুন। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃষ্ঠা ২০-২১)।

ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ হিজায (মক্কা ও মদীনা শরীফ), ইয়ামান, সিরিয়া, মিশর, মরক্কো, আলজেরিয়া, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, সুদান, ভারত ও পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের সাতচল্লিশ জন শায়খের কাছ থেকে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ে ইজাযাহ ও সনদ লাভ করেন। তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন, তাঁর পিতা মুহাদ্দিসুল হিজায সায়্যিদ আলাওয়ী ইবন আব্বাস আল মালিকী মাক্কী, শায়খ হাসান আল মাশশাত, শায়খ মুহাম্মাদ তিজানী, হাবীব সালিম ইবন আহমাদ, শায়খ ইবরাহীম খুতানী, শায়খ হাসান ইয়ামানী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।

সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সকল উস্তায কর্তৃক প্রদত্ত সনদ *আততালিউস সাঈদ আল মুনতাখাব মিনাল মুসালসালাতি ওয়াল আসানীদ* এবং *ইকদুল ফারীদ আল মুখতাসার মিনাল আছবাতি ওয়াল আসানীদ* নামক কিতাবদ্বয়ে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, সেই ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ জীবিত থাকাকালীন শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ যতবার হজ্জ অথবা উমরা পালন উপলক্ষে মক্কা শরীফ গিয়েছেন সব সময়ই তিনি রুসাইফাস্থ বাসায় গিয়ে শায়খের সাথে সাক্ষাত করতেন।

ছয়. সুলতানুল উলামা হাবীব সালিম ইবন আবদুল্লাহ শাতিরী আশ শাফিঈ ইয়ামানী রাহিমাহুল্লাহ (১৩৫৯- ১৪৩৯ হি.)

২০১৪ সালে শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ দারুল হাদীস লতিফিয়া, লণ্ডন থেকে টাইটেল উত্তীর্ণ এবং ইয়ামানের হাদারামাউতে অবস্থিত দারুল মুস্তাফায় অধ্যয়নরত হাফিয মাওলানা মুহিব আল কাসিম এর মাধ্যমে আরবী ভাষায় নিজের লিখিত هدية اللبيب في نبذة من سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم নামক সংক্ষিপ্ত সীরাতের কিতাবখানা আহলে বাইতের প্রখ্যাত বুযুর্গ মুহাদ্দিস, সুলতানুল উলামা শায়খ হাবীব সালিম ইবন আবদুল্লাহ শাতিরী শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ'র কাছে প্রেরণ করেন। সেই সাথে তাঁর কাছ থেকে ইলমে হাদীসের সনদ গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। শায়খ হাবীব সালিম ইবন আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ মাওলানা মুহিব আল কাসিম এর মাধ্যমে ২ আগস্ট ২০১৪ সালে তাঁকে সনদ প্রদান করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন-

فمنهم سلطان العلماء الشيخ الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري الشافعي اليمني ، وهو أجازني إرسالًا بالصحاح الست وجميع مروياته من كتب الحديث والتفسير والفقه. وأسانيده المفصلة المتصلة جمعها وألفها تلميذه الشيخ فارس محمد بن محمد أبو بارعة (تحفة اللبيب بأسانيدالحبيب، الصفحة ٢٢-٢٣)

অর্থাৎ, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, সুলতানুল উলামা, শায়খ হাবীব সালিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমার শাতিরী শাফিঈ ইয়ামানী। তিনি বাহক মারফত আমাকে সিহাহ সিত্তাহসহ হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ'র বিভিন্ন কিতাবের তাঁর যাবতীয় সনদের ইজাযাহ প্রদান করেছেন। তাঁর অবিচ্ছেদ্য সনদসমুহ বিস্তারিতভাবে তাঁরই ছাত্র শায়খ ফারিস মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আবু বারিআ একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করেছেন। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃষ্ঠা ২২-২৩)।

শায়খ হাবীব সালিম ইবন আবদুল্লাহ শাতিরী নিজ দেশ ইয়ামান এবং মক্কা আল মুকাররামার ত্রিশজন বরেণ্য শায়খের কাছ থেকে হাদীস, তাফসীর, ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে ইজাযাহ ও সনদ লাভ করেছেন।

সাত. শায়খ ড. আসআদ সাগিরজী হানাফী দিমাশকী রাহিমাহুল্লাহ (১৯৪২-২০১৫ ঈ.)

শায়খুল হাদীস ছাহেব ২০০৫ সালে সিরিয়ার প্রখ্যাত ফকীহ, আল ফিকহুল হানাফী ওয়া আদিল্লাতুহু (৩ খণ্ড) সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণেতা শায়খ ড. আসআদ ইবন

মুহাম্মাদ সাঈদ সাগিরজী রাহিমাহুল্লাহ এর কাছ থেকে সনদ গ্রহণ করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালে শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর সিরিয়া সফরকালে শায়খ আসআদ সাগিরজী রাহিমাহল্লাহ উনার কাছ থেকে ইজাযাহ ও সনদ গ্রহণ করেছেন। শায়খুল হাদীস ছাহেব এ সম্পর্কে বলেন-

ومنهم فقيه الشام الشيخ الدكتور أسعد الصاغرجي بن محمد سعيد الحنفي السوري الدمشقي رحمه الله تعالى. حصل لي لقاءه بلندن في مجلس الشيخ الدكتور محمد طاهر القادري (عام ٢٠٠٥م) ، وكان ولدي محمد عبد الأول هلال معي أن ذاك، فأجازني بجميع مروياته (وهو أخذ مني الإجازة والسند عند ما زرت دمشق في بيته عام ٢٠٠٨م) . (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب ، الصفحة ٢٢)

অর্থাৎ, আর তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শামের ফকীহ ড. আসআদ সাগিরজী ইবন মুহাম্মাদ সাঈদ হানাফী দিমাশকী রাহিমাহুল্লাহু তা'লা। ২০০৫ সালে লণ্ডনে শায়খ ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী'র মজলিসে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। সেদিন আমার ছেলে মো. আবদুল আউয়াল হেলাল সাথে ছিলো। সেখানে তিনি আমাকে তাঁর যাবতীয় সনদের ইজাযাহ প্রদান করেন। ২০০৮ সালে আমার দামেশক সফরকালে তিনি তাঁর ঘরে আমার কাছ থেকে ইজাযাহ ও সনদ গ্রহণ করেন। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃষ্ঠা ২২)।

শায়খ ড. আসআদ সাগিরজী রাহিমাহুল্লাহ নিজ দেশ সিরিয়ার প্রখ্যাত বুযুর্গ আলিম সায়্যিদ ইবরাহীম ইয়াকুবী এবং মক্কা শরীফের শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুমাল্লাহসহ বেশ কিছু উলামার কাছ থেকে ইজাযাহ ও সনদ লাভ করেন। তিনি একদিকে যেমন একজন বিখ্যাত হানাফী ফকীহ ছিলেন অপর দিকে শাযুলী তরীকার একজন মহান বুযুর্গ মুরশিদ ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ লণ্ডনে শায়খ সাগিরজী রাহিমাহুল্লাহ'র কাছ থেকে যেদিন ইজাযাহ ও সনদ গ্রহণ করেন সেদিন সৌভাগ্য বশতঃ উনার সাথে ছিলাম, ঠিক সেভাবে শায়খ সাগিরজী রাহিমাহুল্লাহ যেদিন দামেশকে শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ'র কাছ থেকে ইজাযাহ ও সনদ গ্রহণ করেন সেদিনও সাথে ছিলাম। সেই সনদ গ্রহণের পূর্বাপর কিছু কথা আজও আমাকে চমকিত করে। দামেশক যাওয়ার ঠিক আগের দিন বিকেল বেলা শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সনদের কোন কপি কি তোমার কাছে আছে? বললাম, আছে। একটু সময় নিয়ে বললেন, কাল যাওয়ার সময় সফরের ব্যাগে একটি কপি নিও। যাত্রা পথে উড়োজাহাজে বসেও সনদের কপি নিয়েছি কি না জিজ্ঞেস করলেন। রাতের বেলা দামেশক পৌঁছে হোটেলে রাতযাপন করে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী ব্যস্ত দিন কাটলো। পরের রাত শায়খ সাগিরজী নৈশভোজের দাওয়াত দিয়ে রেখেছেন আগে

থেকেই। ইশার পরপরই শায়খ সাগিরজীর বাসার পথে রওয়ানা দেয়ার প্রাক্কালে বললেন, সনদের কপিটি সাথে রেখো। শায়খ সাগিরজীর বাসা সংলগ্ন মসজিদের পার্শ্ববর্তী একটি হলে বিশাল নৈশভোজের আয়োজন। দামেশকের প্রচুর উলামা উপস্থিত হয়েছেন। খাওয়ার টেবিলে যাওয়ার আগে একটি রুমে শায়খ সাগিরজী শায়খুল হাদীস ছাহেবকে নিয়ে বসেছেন। সাথে আমি ও মাওলানা আবদুল কাহহার সাহেব। এসময় শায়খ সাগিরজী শায়খুল হাদীস ছাহেবের কাছে ইজাযাহ ও সনদ চাইলেন। তিনি বললেন, শায়খ আপনি হয়তো ভুলে গেছেন, আমি ২০০৫ সালে লণ্ডনে আপনার কাছ থেকে ইজাযাহ ও সনদ গ্রহণ করেছি। শায়খ বললেন, মনে আছে। তবে আপনার কাছ থেকে ইজাযাহ ও সনদ গ্রহণের জন্য আমাকে হুকুম করা হয়েছে। আপনি তো রাজি হবেন না, তা নাহলে আপনার জুতা মাথায় নিয়ে দামেশক শহরে একটি চক্কর দিতাম। সাথে সাথে শায়খুল হাদীস ছাহেব আসতাগফিরুল্লাহ! বলে শায়খের দুই হাত চেপে ধরলেন। তখন ইশারায় আমাকে সনদের কপিটি দিতে বললেন। আমি সনদ বের করে দিলাম। শায়খ নিজের পকেট থেকে কলম বের করে শায়খুল হাদীস ছাহেবের হাতে দিলেন। তিনি সনদে শায়খ সাগিরজীর নাম লিখে স্বাক্ষর করে দিলেন।

আট. শায়খ ড. সায়্যিদ আজ্জাজ আল খাতীব দিমাশকী রাহিমাহুল্লাহ (১৯৩২-২০২১ ঈ.)

২০০৮ সালে সিরিয়া সফরকালে শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ দামেশকের বিখ্যাত মুহাদ্দিস, আসসুন্নাতু কাবলাত তাদওয়ীনসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব প্রণেতা শায়খ ড. সায়্যিদ আজ্জাজ আল খাতীব রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে তাঁর বাসায় গিয়ে সাক্ষাত করেন। এ সময় তিনি শায়খের কাছ থেকে ইজাযাহ ও সনদ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন-

ومنهم الشيخ السيد عجاج الخطيب الدمشقي رحمه الله تعالى، حصل لي لقاءه بدمشق في بيته عام ٢٠٠٨م ، وكان ولدي محمد عبد الأول هلال معي أن ذاك، وهو أجازني برواية الصحاح الست وجميع مروياته من كتب الحديث والتفسير والفقه. (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب، الصفحة ٢٣)

অর্থাৎ, আর তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, শায়খ ড. সায়্যিদ আজ্জাজ আল খাতীব দিমাশকী রাহিমাহুল্লাহু তা'লা। তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয় ২০০৮ সালে দামেশকে তাঁর বাসায়। সেসময় আমার ছেলে মো. আবদুল আউয়াল হেলাল সাথে ছিলো। তিনি আমাকে সিহাহ সিত্তাহ এবং হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ'র অন্যান্য কিতাবের ইজাযাহ প্রদান করেন। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃষ্ঠা ২৩)।

নয়. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী (জ. ১৯৫১ ঈ.)

২০০৫ সালে শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিচিত, বিভিন্ন বিষয়ে আরবি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় ছয় শতাধিক গ্রন্থ প্রণেতা শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী হাফিযাহুল্লাহ এর কাছ থেকে ইজাযাহ ও সনদ গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন-

ومنهم شيخ الإسلام العلامة الدكتور محمد طاهر القادري الباكستاني . حضرت عدة مجالسه وسمعت منه من الجامع الصحيح وغيره، فأجازني بالصحاح الست وجميع مروياته من كتب الحديث والتفسير والفقه والشمائل والآداب وسائر مؤلفاته (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب ، الصفحة ٢١)

অর্থাৎ, আর তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী। আমি তাঁর বিভিন্ন মজলিসে অংশগ্রহণ করেছি। তাঁর কাছ থেকে সাহীহ বুখারী এবং অন্যান্য কিতাবের হাদীস শুনেছি। তিনি আমাকে সিহাহ সিত্তাহ এবং হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, শামাঈল ও আদাব বিষয়ের কিতাবাদী এবং তাঁর লিখিত যাবতীয় কিতাবের ইজাযাহ ও সনদ দিয়েছেন। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃষ্ঠা ২১)।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের জঙ্গ শহরে জন্মগ্রহণকারী শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী হাফিযাহুল্লাহ নিজ দেশ ছাড়াও ভারত, হিজায, ইরাক, মিশর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লিবিয়া, মরক্কো প্রভৃতি দেশের পঞ্চাশজন যুগবরেণ্য শায়খের কাছ থেকে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, সীরাহ প্রভৃতি বিষয়ে ইজাযাহ ও সনদ লাভ করেছেন। শায়খগণ প্রদত্ত বিভিন্ন বিষয়ের সনদ তিনি আল জাওয়াহিরুল বাহিরাহ ফী আসানীদিত তাহিরাহ গ্রন্থে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। আরবি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রণীত এক হাজারের বেশি গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে সাত শতাধিক গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ১৯৫৯ সাল থেকে হাদীসে নববীর অধ্যাপনা শুরু করেছেন। হিসাব মতো শায়খ কাদিরী তখন মাত্র আট বছরের শিশু। বয়সের এই বিশাল পার্থক্য থাকার পরও শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ কেবলমাত্র ইলমের প্রতি গভীর সম্মান ও আগ্রহের কারণে শায়খ কাদিরীর বিভিন্ন মজলিসে আগ্রহভরে অংশগ্রহণ করতেন। শায়খ কাদিরীও তাঁকে গভীর সম্মান ও মূল্যায়ন করতেন। ইংল্যান্ডের বারমিংহাম শহরের একটি মসজিদে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত শায়খ কাদিরীর দাওরায়ে সাহীহ বুখারী অনুষ্ঠানে শায়খুল হাদীস ছাহেব খুবই গুরুত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন। প্রতি দিন সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১ টা এবং বাদ মাগরিব

থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত ধারাবাহিক অনুষ্ঠান চলে। তিন দিনের সে দাওরার প্রতিটি সেশনে শায়খুল হাদীস ছাহেব নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। দাওরা শেষে শায়খ কাদিরীর অনুরোধে শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ আখেরী মুনাজাত করেন।

লক্ষনীয় যে, উলুমে হাদীসের কিতাবাদিতে رواية الاكابر عن الاصاغر অর্থাৎ, বয়সে ছোটদের কাছ থেকে বড়দের হাদীস বর্ণনা তথা ইলম গ্রহণ সম্পর্কে পৃথক অধ্যায় রয়েছে। সেখানে এর বৈধতা, পদ্ধতি ও উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

দশ. শায়খ হাবীব আসিম ইবন আদী আল মাদানী হাফিযাহুল্লাহ

২০১১ সালে শায়খুল হাদীস ছাহেব মদীনা শরীফের বাসিন্দা আইলে বাইত এর বুযুর্গ আলিম হাবীব আসিম ইবন আদী হাফিযাহুল্লাহ এর কাছ থেকে ইজাযাহ গ্রহণ করেন। একই বৈঠকে হাবীব আসিম ইবন আদী হাফিযাহুল্লাহও উনার কাছ থেকে কতিপয় মুসালসাল হাদীসের ইজাযাহ ও সনদ গ্রহণ করেন।

এ সম্পর্কে শায়খুল হাদীস ছাহেব বলেন-

ومنهم الشيخ الحبيب عاصم بن عدي بن محمد بن يحيى المدني امتع الله به وأطال عمره في عافية. وهو أجازني جميع مروياته عن مشائخه (وهو أخذ مني الإجازة والسند بعض الأحاديث المسلسلات) .

؛ (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب ، الصفحة ٢٣)

অর্থাৎ, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, হাবীব আসিম ইবন আদী ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া আল মাদানী, আল্লাহ তাঁকে সুস্থতার সাথে দীর্ঘজীবি করুন। তিনি তাঁর শায়খগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় সনদের ইজাযাহ আমাকে দিয়েছেন। অপরদিকে তিনিও আমার কাছ থেকে কতিপয় মুসালসাল হাদীসের ইজাযাহ ও সনদ গ্রহণ করেছেন। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃষ্ঠা ২৩)।

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ কামিল জামাতে অধ্যয়নকালীন চারজন এবং পরবর্তীতে দশজন, মোট চৌদ্দজন শায়খের কাছ থেকে সিহাহ সিত্তাহ (ةتسلا بتك) ছাড়াও ইমাম দারিমী রাহিমাহুল্লাহ (১৮১-২৫৫ হি.) এর সুনান দারিমী, ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ (২১০-২৭৯ হি.) এর শামাঈলে তিরমিযী, ইমাম হাকিম রাহিমাহুল্লাহ (৩২১-৪০৫ হি.) এর আল মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন, ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ (৬৩১-৬৭৬ হি.) এর রিয়াদুস সালিহীন, কিতাবুল আযকারসহ তাঁর সকল কিতাব এবং ইমাম সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ (৮৪৯-৯১১ হি.) এর জামিউস সাগীর (এবং যাবতীয় কিতাব) প্রভৃতি কিতাবের ইজাযাহ ও সনদ লাভ করেন।

ইলমে হাদীসে উচ্চ সনদ

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সংযুক্ত সনদ পরম্পরায় বর্ণনাকারীর সংখ্যা তুলনামূলক কম হলে সেই সনদকে الإسناد العالي বা উচ্চ সনদ বলা হয়। মুহাদ্দিসীনে কিরামের কাছে উচ্চ সনদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আসলাম তুসী (১৮০-২৪২ হি.) রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

قرب الإسناد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب اليه قرب إلى الله عز وجل (مقدمة ابن الصلاح ، الصفحة ١٥٠)

অর্থাৎ, সনদের নিকটত্ব হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটবর্তী হওয়া। আর তাঁর নিকটবর্তী হওয়া মানে মহান আল্লাহপাক এর নৈকট্য লাভ করা। (মুকাদ্দিমাহ ইবনিস সালাহ, পৃ.১৫০)।

উচ্চ সনদের এই অপরিসীম গুরুত্বের কারণেই পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসীনে কিরাম উচ্চ সনদ লাভের জন্য দূর দূরান্তে সফর করতেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف (الجامع لأخلاق الراوي و أدب السامع، المجلد ١، الصفحة ١٢٣)

অর্থাৎ, উচ্চ সনদ অনুসন্ধান করা পূর্ববর্তীগণের সুন্নাহ (রীতি) ছিলো। (আল জামিউ লিআখলাকির রাওয়ী ওয়া আদাবিস সামি', খ. ১, পৃ. ১২৩)।

পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসীনে কিরামের সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহও উচ্চ সনদ লাভে মনযোগী হয়েছেন। তিনি তাঁর মক্কা শরীফের উস্তায শতাধিক কিতাব প্রণেতা ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ এর কাছ থেকে প্রাপ্ত الإسناد العالي বা উচ্চ সনদ তুহফাতুল লাবীব কিতাবে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সনদটি হলো-

شيخ الحديث العلامة محمد حبيب الرحمن رحمه الله تعالى > محدث الحرم المكي الشيخ السيد محمد بن علوي المالكي > محدث الحجاز السيد علوي بن عباس المالكي > الشيخ احمد بن صالح السويدي البغدادي > الحافظ السيد مرتضى الحسيني الزبيدي > الشيخ محمد بن سنة الفلاني > الشيخ احمد بن محمد العجل اليمني > الشيخ المعمر قطب الدين محمد ابن احمد النهروالي > الشيخ أبي الفتوح احمد بن عبد الله الطاوءوسي > الشيخ المعمر يوسف الهروي > الشيخ ابو عبدالرحمن بن شاذ بخت الفارسي الفرغاني > الشيخ ابو لقمان يحيي بن عمار بن مقبل شاهان الختلاني > الامام ابو عبد الله محمد بن يوسف الفربري > امير المؤمنين في الحديث الامام ابو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري > مكي بن إبراهيم > يزيد بن ابي

عبيد > سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
(تحفة اللبيب بأسانيدالحبيب ، الصحفة ٢٣)

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো.হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ > মুহাদ্দিসুল হারাম আল মক্কী শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী > মুহাদ্দিসুল হিজায সায়্যিদ আলাওয়ী ইবন আব্বাস আল মালিকী > শায়খ আহমাদ ইবন সালিহ সুওয়াইদি আল বাগদাদী > হাফিয সায়্যিদ মুরতাদা আল হুসাইনী আযযাবিদী > শায়খ মুহাম্মাদ ইবন সানাহ আল ফাল্লানী > শায়খ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল ইয়ামানী > শায়খ আল মুআম্মার কিতবুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ নাহরাওয়ালী > শায়খ আবুল ফুতুহ আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ তাউসী > শায়খ আল মুআম্মার ইউসুফ আল হারাওয়ী > শায়খ আবু আবদির রাহমান ইবন যায় বখত আল ফারিসী আল ফারগানী > শায়খ আবু লুকমান ইয়াহইয়া ইবন আম্মার ইবন মুকবিল ইবন শাহান আল খাতলানী > ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল ফিরাবরী > আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী > মাক্কী ইবন ইবরাহীম > ইয়যীদ ইবন আবি উবায়িদ > হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু।

উপরোল্লিখিত সনদে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ থেকে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ সমেত মোট ১৩ জন বর্ণনাকারী রয়েছেন। আর ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ থেকে ছুলাছী সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ৩ জন বর্ণনাকারী রয়েছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর নিরবিচ্ছিন্ন (১৩+৩=১৬) ষোলজন বর্ণনাকারী পরম্পরা রয়েছে। বর্তমান সময়ে এমন الإسناد العالي বা উচ্চ সনদ খুবই বিরল। বিশেষ করে বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে এমন উচ্চ সনদের অধিকারী দ্বিতীয় কোন মুহাদ্দিস আছেন বলে আমাদের জানা নেই।

তাফসীরের বিভিন্ন কিতাবের সনদ

তাফসীরে তাবারী

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী রাহিমাহুল্লাহ (২২৫-৩১০ হি.) প্রণীত তাফসীরে তাবারী নামে খ্যাত জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন হচ্ছে একটি মৌলিক তাফসীর গ্রন্থ। ইমাম তাবারী রাহিমাহুল্লাহ কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের উক্তি সনদসহ উল্লেখ করেছেন। শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ মুহাদ্দিসুল হারাম আল মাক্কী সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী এবং সুলতানুল উলামা সায়্যিদ সালিম ইবন আবদুল্লাহ শাতিরী শাফিঈ আল ইয়ামানী রাহিমাহুমাল্লাহ এর কাছ থেকে তাফসীরে

তাবারী এর সনদ লাভ করেছেন। তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব (পৃ. ৫১-৫২) গ্রন্থে ইমাম তাবারী পর্যন্ত উভয় শায়খের অবিচ্ছেদ্য (متصل) সনদ বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাফসীরে কুরতুবী

ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ (ইন্তেকাল ৬৭১ হি.) প্রণীত তাফসীরে কুরতুবী নামে অধিক পরিচিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ জামিউ আহকামিল কুরআন। শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ মুহাদ্দিসুল হারাম আল মক্কী সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ এর কাছ থেকে তাফসীরে কুরতুবী'র সনদ লাভ করেন। তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব গ্রন্থে (পৃ.৫৩) বিস্তারিত সনদ গ্রন্থিত আছে।

তাফসীরে ইবনু কাসীর

ইমাম আবুল ফিদা ইমাদুদ্দিন ইসমাঈল ইবন কাসীর (৭০১-৭৭৪ হি.) রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত তাফসীরে ইবন কাসীর নামে খ্যাত তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ব্যাপক পঠিত একটি বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ। শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ সুলতানুল উলামা সায়্যিদ সালিম ইবন আবদুল্লাহ শাতিরী আশশাফিঈ আল ইয়ামানী রাহিমাহুল্লাহ এর কাছ থেকে তাফসীরে ইবনু কাসীর এবং ইমাম ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত যাবতীয় কিতাবের সনদ লাভ করেন। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃ.৫৪)।

তাফসীরে জালালাইন

ইমাম জালালুদ্দিন মাহাল্লী (৭৯১-৮৬৪ হি.) ও ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (৮৪৯-৯১১ হি.) রাহিমাহুমাল্লাহ প্রণীত বিখ্যাত কিতাব তাফসীরে জালালাইন। শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ মুহাদ্দিসুল হারাম আল মক্কী সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী ও সুলতানুল উলামা সায়্যিদ সালিম ইবন আবদুল্লাহ শাতিরী আশশাফিঈ আল ইয়ামানী রাহিমাহুমাল্লাহ এর কাছ থেকে তাফসীরে জালালাইন এর সনদ লাভ করেন। (তুহফাতুললাবীব বিআআসানীদিল হাবীব, পৃ.৫৫)।

চার মাযহাবের ইমামগণের সনদ

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ বাংলাদেশের সমসাময়িক কালের একজন বিখ্যাত হানাফী মাতুরিদী প্রাজ্ঞ আলিম ছিলেন। ফিকহে হানাফীর উপর তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো প্রবাদ প্রতীম। সেই সাথে অন্য তিন মাযহাবের কিতাবাদিতেও তাঁর দখল ছিলো অপরিসীম। কামিল জামাতে সহীহ বুখারী ও সুনান তিরমিযী পাঠদানকালে কোন হাদীসের প্রেক্ষিতে ফিকহি মাসয়ালা আলোচনায় তিনি চার মাযহাবের অভিমত ব্যাপকভাবে তুলনামূলক আলোচনা করে কোন কোন কারনে কোন দলীলের ভিত্তিতে

হানাফী মাযহাবের অভিমত প্রাধান্য পাবে তা বলে দিতেন।

চার মাযহাবের ইমামগণের সাথে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সনদসূত্র রয়েছে। যেমন-

১। ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ (৮০-১৫০ হি.)

ইমাম আযম আবু হানীফা নু'মান ইব সাবিত রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর দুই ধারায় মুত্তাসিল (অবিচ্ছেদ্য) সনদ রয়েছে। প্রথম সনদ মুহাদ্দিসুল হারাম আল মক্কী সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ এর নিকট থেকে। দ্বিতীয় সনদ শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহির আল কাদিরী হাফিযাহুল্লাহ এর নিকট থেকে। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃ.৩৪-৩৫-৩৬)।

২। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ (৯৩-১৭৯ হি.)

ইমাম মালিক ইবন আনাস রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ তিনজন শায়খের সূত্রে মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। তাঁরা হলেন-মুহাদ্দিসুল হারাম আল মক্কী সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ, সুলতানুল উলামা সায়্যিদ সালিম ইবন আবদুল্লাহ শাতিরী আশশাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ ও শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহির আল কাদিরী হাফিযাহুল্লাহ। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃ.৩৭-৩৮)।

৩। ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ (১৫০-২০৪ হি.)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে উপরোল্লিখিত তিনজন শায়খ সূত্রে শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃ.৩৯-৪০)।

৪। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ (১৬৪-২৪১ হি.)

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে প্রাগুক্ত তিনজন শায়খ সূত্রে শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ এর মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃ.৪১)।

এতদ্বতীত শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ মুহাদ্দিসুল হারাম আল মক্কী সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ ও শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহির আল কাদিরী হাফিযাহুল্লাহ এর কাছ থেকে ইমাম কাযী আয়ায (৪৯৬-৫৪৪ হি.) রাহিমাহুল্লাহর বিখ্যাত কিতাব আশশিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুসতাফা এবং ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি.) রাহিমাহুল্লাহর ইহইয়া উলুমুদ্দিনসহ তাঁর যাবতীয় কিতাবাদির ইজাযাহ ও সনদ লাভ করেন।

ইলমে কিরাত

সড়কের বাজার আহমাদিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালীন তিনি কারী তজম্মুল আলী রাহিমাহুল্লাহ'র কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে ইলমে কিরাত ও তাজবীদ শিক্ষা লাভ করেন। ১৩৮৬ হিজরির রামাদান মাসে (১৯৬৬ ঈ.) স্বীয় পীর ও মুরশিদ রঈসুল কুররা, শামসুল উলামা আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ'র কাছে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শুনিয়ে তিনি ইলমে কিরাতের সনদ লাভ করেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন-

اما القرآن الكريم فقرأته على رءس القراء والمفسرين ، استاذ المحدثين، شيخنا شمس العلماء العلامة الشاه محمد عبد اللطيف الفولتلي السلهتي من اول سورة الفاتحة الى آخر سورة الناس مجوداً، واجازني في شهر رمضان المبارك عام ١٣٨٦ ه.

(تحفة اللبيب باسانيد الحبيب، الصفحة ١٣)

অর্থাৎ, আমি কুরআনুল কারীম সুরা ফাতিহার প্রথম থেকে সুরা নাস এর শেষ পর্যন্ত তাজবীদ সহকারে পড়েছি রঈসুল কুররা ওয়াল মুফাসসিরীন, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন, শামসুল উলামা আল্লামা শাহ আবদুল লতিফ ফুলতলী সিলেটী রাহিমাহুল্লাহ এর কাছে। তিনি আমাকে ১৩৮৬ হিজরির রামাদান মাসে ইজাযাত (সনদ) প্রদান করেন।

(তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃষ্ঠা ১৩)।

তুহফাতুল লাবীব গ্রন্থে শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ শামসুল উলামা আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ এর ইলমে কিরাতের তিন উস্তায মাওলানা শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (ইন্তেকাল ১৯৫৮ ঈ.), মাওলানা আবদুর রউফ করমপুরী (ইন্তেকাল ১৯৬৯ ঈ.) ও রঈসুল কুররা আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ হিজাযী মাক্কী (ইন্তেকাল ১৩৮১ হি.) রাহিমাহুল্লাহ'র বিস্তারিত সনদ উল্লেখ করেছেন।

ইলমে তাসাউফ

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ একনিষ্ঠভাবে তাসাউফরের অনুসারী একজন যুগশ্রেষ্ঠ সুফি আলিম ছিলেন। কামিল প্রথম বর্ষে অধ্যয়নকালীন সময়ে তিনি মুজাদ্দিদে যামান, আয়নায়ে জামালে আহমাদী, শামসুল উলামা আল্লামা আবদুল চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ এর হাতে বাইআত হন। এসম্পর্কে তিনি বলেন-

بايعت على يد قدوتنا ومرشدنا شمس العلماء العلامة محمد عبد اللطيف الفولتلي رحمة الله تعالى عليه في شهر رمضان ٧٧٣١ ه ، وهو أجازني في ذوالقاعدة ٥٨٣١ ه، عن شيخه قطب الأولياء الشيخ مولانا ابي يوسف محمد يعقوب البدرفوري، عن قدوة العلماء العارفين الشيخ مولانا حافظ أحمد الجونفوري، عن والده قدوة العلماء وزبدة المفسرين

والمحدثين الشيخ كرامت على الجونفوري، عن زبدة العارفين قدوة السالكين أمير المؤمنين الشيخ السيد أحمد بن عرفان البريلوي ، عن زبدة العلماء والمحدثين الشيخ عبد العزيز الدهلوي ، عن والده حجة الله على العالمين الشيخ الشاه أحمد ولي الله الدهلوي، عن والده الشيخ مولانا عبد الرحيم الدهلوي . وللشيخ عبد الرحيم الدهلوي حصلت البيعة والإجازة عن شيوخ متعددين في طرق متعددة. (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب ، الصفحة ٦١)

অর্থাৎ, আমি ১৩৭৭ হিজরির রামাদান মাসে কুদওয়াতুনা, মুরশিদুনা শামসুল উলামা আল্লামা আবদুল লতিফ ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর হাতে বাইআত গ্রহণ করি। ১৩৮৫ হিজরির যুলকা'দা মাসে তিনি আমাকে ইজাযাহ প্রদান করেন তাঁর মুরশিদ কুতবুল আউলিয়া মাওলানা আবু ইউসুফ মুহাম্মাদ ইয়াকুব বদরপুরী থেকে। তিনি কুদওয়াতুল উলামা ওয়াল আরিফীন মাওলানা হাফিয আহমাদ জৌনপুরী থেকে। তিনি তাঁর পিতা কুদওয়াতুল উলামা ওয়াল মুফাসসিরীন ওয়াল মুহাদ্দিসীন মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী থেকে। তিনি যুবদাতুল আরিফীন কুদওয়াতুস সালিকীন, আমিরুল মু'মিনীন সায়্যিদ আহমাদ ইবন ইরফান বেরেলবী থেকে। তিনি কুদওয়াতুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিসীন শায়খ আবদুল আযীয দেহলবী থেকে। তিনি তাঁর পিতা হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন শাহ আহমাদ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী থেকে। তিনি তাঁর পিতা মাওলানা আবদুর রহীম দেহলবী থেকে। শাহ আবদুর রহীম দেহলবী বিভিন্ন তরীকার ইজাযাহ লাভ করেছেন বিভিন্ন শায়খের কাছ থেকে। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃষ্ঠা ৬১)।

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় মুরশিদ প্রদত্ত চিশতিয়া, কাদিরিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া এবং চিশতিয়া নিযামিয়া তরীকার সনদ তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব গ্রন্থে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন (পৃষ্ঠা ৬১-৬৫)।

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন সময় একান্ত আলাপচারিতায় হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ'র কাছে বাইআত হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। দীর্ঘ সে আলাপচারিতার সারসংক্ষেপ হলো, ফাযিল জামাতে অধ্যয়নকালীন সময় পর্যন্ত তিনি ইলমে তাসাউফ অস্বীকার না করলেও কুরআন হাদীস পড়ার পর পৃথকভাবে ইলমে তাসাউফ শিক্ষা প্রয়োজন মনে করতেন না। এই সময়ে খাজা আবদুল আযীয দাব্বাগ রাহিমাহুল্লাহ'র খলীফা মরক্কোর বিশিষ্ট ফকীহ, আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন মুবারক সাজলামাসী আল মালিকী (ইন্তেকাল ১১৫৬ হি.) রচিত আল ইবরীয মিন কালামি সায়্যিদী আবদুল আযীয দাব্বাগ কিতাবখানা পড়ে তাঁর চিন্তার জগতে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এরই মধ্যে একটি স্বপ্ন দেখে চিন্তার জগতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। তিনি ইলমে তাসাউফ শিক্ষার জন্য একজন মুরশিদের দারস্থ হওয়ার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কামিল প্রথম বর্ষের শুরুতে তিনি হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ'র কাছে বাইআত গ্রহণ করেন। সে বছর (১৩৭৭ হি., ১৯৫৮ ঈ.) রামাদান মাসে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা সিলেট শহরের শেখঘাট মসজিদে ইতিকাফ রত ছিলেন। হযরত মাওলানা কারী আবদুল লতিফ খাদিমানী রাহিমাহুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে শায়খুল হাদীস ছাহেবও হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ'র সাথে ইতিকাফে শরীক হন। ইতিকাফের প্রথম দিনই তিনি হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ'র হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। এর পর থেকে মুরশিদ কিবলার নির্দেশনা মত তাসাউফের বিভিন্ন সবকাদি কঠোরভাবে পালন করতে শুরু করেন। মুরশিদ কিবলার সাথে একাধিকবার বিভিন্ন চিল্লায় (বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদাত বন্দেগীর জন্য পাহাড় জঙ্গলে নির্জন বাস) অংশগ্রহণ করেন। আট বছর কঠোর সাধনার পর ১৩৮৫ হিজরির যিলকায়দাহ মাসে মুরশিদে বরহক হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে খিলাফাত প্রদান করেন।

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ খুবই উঁচু মাকামের একজন সুফি সাধক ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত কঠোরতার সাথে নিজের এই অবস্থানকে আড়াল করে রাখতে পছন্দ করতেন। তাঁর হাতে বাইআত হয়ে যারা তাযকিয়ায়ে নাফস এর মেহনত করেছেন একান্ত তারা ছাড়া সাধারণভাবে কেউ তাঁর তরীকা তাসাউফ চর্চা সম্পর্কে জানার সুযোগই পেতো না।

দালাইলুল খাইরাত এর সনদ

ইমাম সায়্যিদ আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সুলাইমান আল জাযুলী (ইন্তেকাল ৬০৭ হি.) রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপকভাবে পঠিত দুরূদ শরীফের একটি ওযীফা দালাইলুল খাইরাত। এ কিতাবের পূর্ণ নাম দালাইলুল খাইরাত ওয়া শাওয়ারিকুল আনওয়ার ফী যিকরিস সালাতি আলান নাবিয়্যিল মুখতার। দুনিয়ার দেশে দেশে প্রচলিত প্রতিটি মাকবুল তরীকার বুযুর্গানে কিরাম দুরূদ শরীফের এই ওযীফা নিজেরা নিয়মিত পড়েছেন এবং নিজেদের মুরিদগণকে ইহা নিয়মিত পড়ার নির্দেশ দিয়ে ইজাযাহ ও সনদ প্রদান করেছেন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ আপন মুরশিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ'র কাছ থেকে এ কিতাবের ইজাযাহ ও সনদ লাভ করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন-

حصلت لي إجازة دلاءل الخيرات من سيدي وسندي ومرشدي العلامة الشاه محمد عبد اللطيف الفولتلي السلهتي، وحصلت له الإجازة من شيخنين جليلين. (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب ، الصفحة ٦٦)

অর্থাৎ, আমি দালাইলুল খাইরাত এর ইজাযাহ লাভ করেছি সায়্যিদি ওয়া মুরশিদি ওয়া

সানাদি আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ আবদুল লতিফ ফুলতলী সিলেটি এর কাছ থেকে। তিনি দুইজন সম্মানিত শায়খের কাছ থেকে ইজাযাহ প্রাপ্ত হয়েছেন। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃষ্ঠা ৬৬)।

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমালুল্লাহ যে দুইজন শায়খের কাছ থেকে দালাইলুল খাইরাত এর ইজাযাহ ও সনদ লাভ করেছেন তাঁদের একজন তাঁর মুরশিদ কুতবে যামান মাওলানা শাহ আবু ইউসুফ মুহাম্মাদ ইয়াকুব বদরপুরী, অপরজন হলেন তাঁর হাদীসের উস্তায শায়খ আল্লামা খলীলউল্লাহ রামপুরী রাহিমাহুমাল্লাহ। শায়খুল হাদীস ছাহেব তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব গ্রন্থে (পৃ.৬৬-৬৭) হযরত ফুলতলী ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ থেকে দালাইলুল খাইরাত প্রণেতা ইমাম সায়্যিদ জাযুলী রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য সনদ লিপিবদ্ধ করেছেন।

দালাইলুল খাইরাত ছাড়াও তিনি হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ এর কাছ থেকে আরো কয়েকটি ওযীফা নিয়মিত পড়ার ইজাযাহ লাভ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন-

وكذٰلك حصلت لي من شيخنا هذا اجازة كتاب الحصن الحصين للإمام الجزري وكتاب الحزب الأعظم للشيخ الملا علي القاري ودعاء حزب البحر للقطب ابي الحسن الشاذلي رحمهم الله تعالى ومتعنا بفيوضهم وبركاتهم (تحفة اللبيب بأسانيد آلحبيب، الصحفة ٦٧)

অর্থাৎ, অনুরূপ আমি আমাদের শায়খ (ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ) এর কাছ থেকে ইমাম জাযারীর আল হিসনুল হাসীন, ইমাম মোল্লা আলী কারীর আল হিযবুল আযম ও ইমাম শাযুলীর হিযবুল বাহর এর ইজাযাহ লাভ করি। আল্লাহ তা'লা উনাদের উপর রহম করুন, তাঁদের ফয়েয ও বারাকাত আমাদেরকে নসীব করুন। (তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃ.৬৭)।

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ আহলে বাইত এর দুইজন বিশিষ্ট বুযুর্গ আলিমের কাছ থেকেও দালাইলুল খাইরাত এর ইজাযাহ ও সনদ লাভ করেছেন। একজন হলেন ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী মক্কী, অপরজন সুলতানুল উলামা হাবীব সালিম ইবন আবদুল্লাহ শাতিরী শাফিঈ ইয়ামানী রাহিমাহুমাহুল্লাহ। ইমাম জাযুলী রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত উল্লিখিত দুই শায়খের বিস্তারিত সনদ শায়খুল হাদীস ছাহেব নিজ সনদ গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। (পৃ. ৬৭-৬৮)।

প্রাতিষ্ঠানিক কর্মজীবন

ইছামতি মাদ্‌রাসা (প্রথম বার)

১৯৫৯ সালের ৩ আগস্ট তিনি ইছামতি দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় সহকারী মাওলানা পদে

যোগদান করেন। ইছামতি মাদ্‌রাসায় যোগদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কামিল পরীক্ষার পর বাড়িতেই ছিলাম। একদিন বলরামেরচকী হুজুর এলেন। আমার বাবাকে বললেন, আপনার ছেলেকে ইছামতি মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিতে চাই। বাবা বললেন, আপনারা পড়িয়েছেন, যদি যোগ্য মনে করেন তবে নিতে পারেন। বাবার অনুমতি নিয়ে পরদিনই যোগদান করি। শিক্ষকতা জীবনে প্রথম দিন প্রথম ক্লাস ছিলো ফাযিল জামাতে। প্রথম ক্লাস নেয়ার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কোন কোন সময় তিনি বলতেন, শিক্ষকতা জীবনের প্রথম ক্লাস, তাও ফাযিল জামাতে আরবী সাহিত্যের কঠিন কিতাব। আমার মধ্যে অজানা এক ভীতি কাজ করছিলো। একেতো এ কিতাবের কোন শরাহ (ব্যাখ্যা গ্রন্থ) নেই, যারা ছাত্র ছিলেন তাদের মধ্যে মাওলানা শুয়াইবুর রাহমান বালাউটি, মাওলানা আবদুল হক নয়াগ্রামী ও মাওলানা আজিজুর রাহমান হাইদ্রাবন্দী ছিলেন প্রখর মেধাবী এবং তাদের বয়সও আমার কাছাকাছি। যদি ক্লাসে গিয়ে লজ্জিত হতে হয় এই দুশ্চিন্তায় মধ্যরাত পর্যন্ত ঘুমই এলো না। একটু ঘুম আসতেই স্বপ্নে দেখি শিবনগরী হুজুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করছেন, তুমি এত চিন্তিত কেনো, কী হয়েছে? বললাম, কাল ক্লাসে গিয়ে কী পড়াবো ভেবে পাচ্ছি না। এই কিতাবের কোন শরাহও নেই। হুজুর বললেন, শরাহ লাগবে কেনো, আমি যেরকম তোমাদেরকে পড়িয়েছি সেভাবেই পড়াবে। মাথা নিচু করে বললাম, হুজুর কিছু মনে করতে পারছি না, ভুলে গেছি। হুজুর ধমক দিয়ে বললেন, বলো কি, তোমার মতো ছাত্র ভুলে গেলে কার উপর ভরসা রাখবো। হুজুরের ধমকে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। বিছানা ছেড়ে উঠে বসলাম। বসে বসে স্বপ্নের কথা ভাবছি, হুজুর এই কিতাব পড়ানোর সময় যা যা বলেছিলেন ধীরে ধীরে সব স্পষ্ট মনে পড়লো। আলহামদুলিল্লাহ! পরদিন সফলভাবে ক্লাস নিতে পারলাম।

উল্লেখ্য যে, ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা তখন ফাযিল পর্যন্ত ছিলো। তবে মুহতামিম ছাহেব (মাওলানা মুতিউর রহমান চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) অনিয়মিতভাবে কিছু ছাত্রকে হাদীস পড়াতেন। এসময় হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নির্দেশে শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ইছামতি মাদ্‌রাসায় হাফিয মাওলানা নুরুল হক বিলপারী ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এবং আরও কয়েকজন ছাত্রকে হাদীসের কিতাবাদি পড়িয়েছেন।

ফুলবাড়ি মাদ্‌রাসা

১৯৬৩ সালের ১০ এপ্রিল তিনি সিলেটের প্রাচীনতম ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফুলবাড়ি আজিরিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসায় (প্রতিষ্ঠা ১৮৬০ খ্রী.) যোগ দেন। এখানে মাত্র ৭ মাস সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন। এ প্রতিষ্ঠানে স্বল্প সময়রে শিক্ষকতাকালে তাঁর একজন ছাত্র ছিলেন সিলেট শহরের জামেয়া মাদানিয়া কাজির বাজার মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ।

সৎপুর মাদ্‌রাসা (প্রথম বার)

১৯৬৩ সালের ২৩ নভেম্বর স্বীয় পীর ও মুরশিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশে তিনি সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭৪ সালের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সেখানে অধ্যাপনা করেন। প্রায় ১১ বছর অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে সেখানে আবু দাউদ শরীফ, ইবনু মাজাহ শরীফ, তিরমিযী শরীফ ও বুখারী শরীফ অধ্যাপনা করেন।

উল্লেখ্য, সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় তাঁর মাধ্যমেই প্রথম কামিল জামাতের পাঠদান শুরু হয়। পশ্চিম সিলেটের বিখ্যাত এ মাদ্‌রাসায় তিনি ছিলেন প্রথম প্রধান মুহাদ্দিস। সেসময় অন্য দু'জন মুহাদ্দিস ছিলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল জব্বার গোটারগ্রামী (গোটারগ্রাম, জকিগন্‌জ) ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুতাহির আলী (বাল্লাহ, জকিগন্‌জ)। কামিল জামাতের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন মরহুম মাওলানা ইরশাদ হুসাইন গোয়াহরী (সাবেক অধ্যক্ষ, বুরাইয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ছাতক), মাওলানা আনোয়ার আলী (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ভাদেশ্বর সিনিয়র মাদ্‌রাসা, গোলাপগঞ্জ), মাওলানা আরশাদ আলী প্রতাবপুরী (সাবেক সুপার, তেলিকোনা মাদ্‌রাসা, বিশ্বনাথ) ও মরহুম মাওলানা আবদুর রাহমান কাইমগঞ্জী।

সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায় হাদীস শরীফ পড়ানোর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একান্ত আলাপচারিতায় শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ ১৯৬৩ সালের শেষ দিকে সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা গোলাম হুসাইন সৎপুরী (মুহতামিম ছাহেব) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দিয়ে সেখানে কামিল জামাত শুরু করান। ছাহেব কিবলার নির্দেশে আমি ফুলবাড়ি মাদ্‌রাসা থেকে বিদায় নিয়ে ২৩ নভেম্বর সৎপুর মাদ্‌রাসায় যোগদান করি। কামিল প্রথম বর্ষে সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনু মাজাহ ও সুনানে তিরমিযী পড়াই। দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস শুরুর আগে মুহতামিম ছাহেবকে জানিয়ে দেই আমার পক্ষে বুখারী শরীফ পড়ানো সম্ভব নয়। আপনি ছাহেব কিবলাকে বলে একজন মুহাদ্দিস আনার ব্যবস্থা করুন। এরই মাঝে একদিন সংবাদ পেয়ে ছাহেব কিবলার খিদমাতে হাজির হলাম। বললেন, তুমি নাকি বুখারী শরীফ পড়াতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছো? বিনয়ের সাথে আরজ করলাম, বুখারী শরীফ পড়ানোর যোগ্যতা আমার নেই। এছাড়া একমাত্র আইনী ছাড়া অন্য কোন শরাহও এখানে নেই। তিনি বললেন, তোমার চাহিদা মত কিদাবাদী সংগ্রহ করে দিতে মুহতামিম ছাহেবকে বলে দেবো। আর সব ইলম তো কিতাবে থাকেনা। স্মরণ করো, তরীকতের সবকের সময় আখফা লতিফার একটি বিশেষ সবক দিয়েছিলাম। সেই সবকের দিকে খেয়াল করো। আল্লাহর আরশের নিচের দিকে একটি সবুজ রঙের নুকতাহ (বিন্দু) আছে। এটি নুকতাতুল ইলম। বুখারী শরীফ পড়ানোর

সময় তোমার যা দরকার কাশফ করলে সেখান থেকে তোমার দিলে আসবে। আল্লাহর উপর ভরসা করে পড়াতে শুরু করো।

কামিল দ্বিতীয় বর্ষে সবক প্রদান উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলার সাথে হযরত বদরপুরী ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্য দুই খলিফা বারগাত্তার ছাব (হযরত মাওলানা শাতির আলী) ও কুলাউড়ার হাফিয আত্তর খান ছাহেব রাহিমাহুমাল্লাহকেও দাওয়াত করা হয়। হযরত ছাহেব কিবলা উনাদের সাথে নিয়ে বুখারী শরীফের একটি নুসখা আমার হাতে তুলে দেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমার ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নেক নজর এবং অন্যান্য বুযুর্গানে কিরামের দুআর বরকতে সেদিন থেকেই বুখারী শরীফের দারস দিতে শুরু করি। পরবর্তীতে একবার গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বাড়িতে অবস্থানকালে খাদিমানী ছাহেবকে সাথে নিয়ে ফুলতলীতে যাই। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। দুপুরের পর ছাহেব কিবলা সাদা গেঞ্জী পরিহিত অবস্থায় বাংলাঘরে বসেছেন। আমরা দু'জন খিদমতে আছি। কথা প্রসঙ্গে বললেন, একটি বিশেষ স্বপ্ন দেখে সৎপুর মাদ্‌রাসায় কামিল জামাত শুরু করিয়েছিলাম। হাদীস শরীফ পড়ানোর মত যোগ্য মুহাদ্দিস খুঁজতে গিয়ে পেরেশানীতে পড়ে যাই। একদা বাড়িতে অবস্থানকালে রাতে তন্দ্রা অবস্থায় দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ইশারায় সৎপুরে কামিল জামাত শুরু করেছি। কিন্তু হাদীস শরীফ পড়ানোর মত কাউকে পাচ্ছি না। তখন আঙ্গুল মুবারক দিয়ে একজনের দিকে ইশারা করে বলেন, উনাকে দিয়ে দাও। ইনশাআল্লাহ! খিদমত হবে। আমি আঁড়চোখে দেখলাম সেখানে তুমি আছো। একারণেই তোমাকে ফুলবাড়ি থেকে সৎপুর পাঠিয়েছি। আমি চমকে উঠলাম। চোখে পানি চলে এলো, ছাহেব কিবলার পায়ের কাছে বসে দুআ চাইলাম।

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় কামিল দ্বিতীয় বর্ষে সহীহ বুখারী শরীফ পাঠদান শুরু করার অল্প দিনের মধ্যে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখেন। ইন্তেকালের কয়েকবছর পূর্বে তিনি একান্ত আলাপে একদিন সেই স্বপ্নের কথা বলেছেন। একরাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন হযরত খিযির আলাইহিস সালাম তাঁকে একটি দুরূদ শরীফ শিক্ষা দিয়ে বলছেন, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা এটি নিয়মিত বেশি বেশি পড়লে ইলম হাসিল করা সহজ হবে। সেই মাহাত্ম্যপূর্ণ দুরূদ শরীফ হলো-

اللهم صل على سيدنا محمد منبع الجود والكرم، وصل علي سيدنا محمد مخزن العلوم والحكم وصل علي سيدنا محمد مطلع الأنوار وصل على سيدنا محمد مظهر الأسرار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ সব সময় ছাত্রদেরকে উক্ত দুরূদ শরীফ শিক্ষা দিতেন। কিন্তু স্বপ্নের রহস্য সম্পর্কে সাধারণতঃ কিছু বলতেন না। তবে একান্ত পরিবেশে

কোন কোন সময় শুধু এতটুকু বলতেন, এক ব্যক্তিকে স্বপ্নযোগে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম এটি শিক্ষা দিয়েছেন। ইলমের সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য এটি খুবই উপকারী।

ইছামতি মাদ্‌রাসা (দ্বিতীয় বার)

১৯৭৪ সালের ১৫ জানুয়ারি তিনি ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করে ১ বছর ৭ মাস দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় থেকেই ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় নিয়মিত কামিল জামাতের ক্লাস শুরু হয়। যদিও কামিল স্তরে সরকারী স্বীকৃতি ও মঞ্জুরী আদায় হয়েছে বহু বছর পর।

সৎপুর মাদ্‌রাসা (দ্বিতীয় বার)

১৯৭৬ সালের ১১ অক্টোবর তিনি সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন।

উল্লেখ্য যে, সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা গোলাম হুসাইন সৎপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে তিনি ইন্তেকাল করলে বিখ্যাত এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সমস্যায় পতিত হয়। বিশেষ করে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ নিয়ে দুই পক্ষে সৃষ্ট জঠিলতা এমন আকার ধারণ করে যে, প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। অনাকাঙ্খিত এই সমস্যা নিরসন কল্পে জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের অনুরোধে ১৯৭৬ সালের ১১ অক্টোবর শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ সেখানে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে অল্প দিনের মধ্যে মাদ্‌রাসার স্থিতিশীলতা ফিরে এলে ১৯৭৭ সালের ২ এপ্রিল তিনি সেখান থেকে চলে আসেন।

আরব আমিরাতে

১৯৭৭ সালে সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসা থেকে চলে আসার কিছুদিন পর তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে গমন করেন। প্রথমে উম্মুল কুওয়াইন শহরে একটি মসজিদে ইমাম ও খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অল্প দিনের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সে দেশের বিচার বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৮২ সালের মধ্যভাগে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি উম্মুল কুওয়াইন কোর্টে বিচারক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পাশাপাশি পূর্বোল্লোখিত মসজিদে খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, আরব আমিরাতের কর্মজীবনে সরকারি ছুটির দিনে তিনি মরুচারী বেদুঈনদের অবৈতনিক শিক্ষাদান করতেন। বিশেষ করে বয়স্ক বেদুঈনদের কুরআন শরিফ সহিহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখাতেন।

আরব আমিরাতে বিচারক হিসেবে যোগদান প্রসঙ্গে শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মূলত কোর্টে যোগদান করার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিলো না। যে মসজিদে ইমাম হিসেবে ছিলাম সেখানে মুসল্লি ছিলেন কোর্টের দুইজন বিচারপতি এবং একজন প্রাশাসনিক কর্মকর্তা। তাঁরা মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামাযে নিয়মিত আসতেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁদের সাথে ভালো সম্পর্ক হয়ে যায়। প্রায় দিন মাগরিব নামায শেষে তাঁরা বাসায় না গিয়ে ইশা পর্যন্ত মসজিদের অফিস রুমে বসতেন। এসময় তাঁদের সাথে ইলমি বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ হতো। এক পর্যায়ে তিন জনের সাথেই ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একদিন একজন বিচারপতি একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কপি এবং আবেদেন পত্রের নির্ধারিত ফরম নিয়ে এলেন। বললেন, কোর্টে বিচারক নিয়োগ হবে আপনি আবেদন করুন। আমি ইতস্তত বোধ করছি দেখে তিনি গুরুত্ব দিয়ে পাশে বসে ফরমপূরণ করালেন আর বললেন, আগামীকাল গিয়ে জমা দিয়ে আসুন। তাঁর কথামত ফরম জমা দিলাম। অল্প দিনের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের চিঠি পেলাম। নির্ধারিত তারিখে লিখিত পরীক্ষা দিলাম। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে আমি প্রথম হলাম। নির্দিষ্ট তারিখে মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিলাম। তিনজন পরীক্ষক দীর্ঘ সময় নানা বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু ফলাফল স্থগিত হয়ে গেলো। পুনরায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে সেই বিচারকের জুরালো অনুরোধে আবারো ফরম জমা দিয়ে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রথম হলাম। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল আবারো স্থগিত করা হলো। এমতাবস্থায় একদিন সেই বিচারক একান্তভাবে বললেন, আসলে আপনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়ায় ফলাফল আটকে দেয়া হচ্ছে। বিষয়টি জেনে মনে খুবই কষ্ট পেলাম। তাৎক্ষণিক চিঠি লিখে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বিস্তারিত জানালাম। তিনি চিঠির উত্তর দিয়ে আমাকে শান্তনা দিলেন। লিখলেন, তুমি ধৈর্য হারাবে না। আল্লাহপাক ইমাম আযমকে কী মর্যাদা দিয়েছেন তুমি তা দেখবে। যেদিন ছাহেব কিবলার চিঠি পাই সে রাতেই স্বপ্নে দেখি বিশাল মরুভূমির এক প্রান্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আবছা দেখা যাচ্ছে অপর প্রান্ত থেকে সবুজ পাগড়ী পরিহিত সৌমকান্তি দুই ব্যক্তি আমার দিকে আসছেন। দু'জনকে কাছ থেকে দেখার আগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছু সময়ের মধ্যে উভয়ে আমার কাছাকাছি চলে এলেন। দেখলাম একজন আমার ছাহেব কিবলা। অপরজনকে চিনলাম না। ছাহেব কিবলা আমাকে দেখিয়ে সাথের বুযুর্গকে বললেন, আমার এই বাচ্চার কথাই আপনাকে বলেছিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন। স্বপ্নের মধ্যেই আমার মনে হলো ইনি ইমাম আযম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ঘুম ভেঙ্গে গেলো। মনে খুবই প্রশান্তি অনুভব করলাম। এই স্বপ্ন দেখার কয়দিনের মধ্যে আবার ইন্টারভিউর ডাক পেয়ে উপস্থিত হলাম। সেদিনই আমাকে বিচারক হিসেবে নিয়োগপত্র দেয়া হলো।

উল্লেখ্য যে, আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরে আসার পর এক বছর পর্যন্ত সে দেশের

সহকর্মীগণ বারবার চিঠি দিয়ে তাঁকে আবারো সেখানে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি ভীনদশে উচ্চ বেতনে বিচারকের পদের চেয়ে নিজ দেশে থেকে হাদীস শরীফ শিক্ষাদানকে প্রাধান্য দেন।

আবারও ইছামতি মাদ্‌রাসায়

আরব আমিরাত থেকে ফিরে আসার অল্পদিনের মধ্যে ১৯৮২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি আবারও ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অধ্যক্ষ হিসেবে প্রাশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি নিয়মিত কামিল জামাতে সহীহ বুখারী ও সুনানে তিরমিযী পাঠদান করতেন। অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর নিয়মতান্ত্রিকভাবে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরও ২০১৪ সাল পর্যন্ত (এক যুগেরও বেশি সময়) তিনি নিয়মিত কামিল জামাতে সহীহ বুখারী শরীফের পাঠদান অব্যাহত রাখেন। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিলে তিলে ইছামতি মাদ্‌রাসা পূর্ব সিলেটের শ্রেষ্ঠতম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। তাঁর একক প্রচেষ্টায় মাদ্‌রাসার অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়। ইছামতি মাদ্‌রাসার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে তাঁর সোনালী স্মৃতি।

প্রথমবার ইছামতি মাদ্‌রাসায় থাকাকালীন (১৯৫৯-১৯৬৩ ঈ.) মাদরারাসাটির আলিম ও ফাজিল ক্লাসের সরকারি মঞ্জুরি এবং স্বীকৃতি আদায়ে তিনি বিশেষ ভুমিকা রাখেন। ১৯৭৪ সালে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদানের পর তিনি কামিল জামাতে নিয়মিত ক্লাস শুরু করেন। দীর্ঘদিন সরকারী মঞ্জুরী ও স্বীকৃতি ছাড়াই পাঠদান অব্যাহত রাখেন। ছাত্ররা এখানে লেখাপড়া করলেও অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে বোর্ডের ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নিতো। ১৯৯৫ সালে তাঁর একক প্রচেষ্টা এবং এলাকার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগিতায় ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা কামিল স্তরে সরকারী স্বীকৃতি ও মঞ্জুরী লাভ করে। ইছামতি মাদ্‌রাসার সুনাম সুখ্যাতির পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। অত্র মাদ্‌রাসার ইতিহাসে তাঁর নাম সোনালী অক্ষরে লিখা থাকবে।

পরবর্তীতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি এ মাদ্‌রাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মাদ্‌রাসায় নিয়মতান্ত্রিক পাঠদান এবং প্রতিষ্ঠানের বাইরে জীবনের প্রায় তেষট্টি বছর ইলমে হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত এ মনীষী অধ্যাপনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত তাফসীরুল কুরআন ও দারসে হাদীস প্রদান করেছেন।

কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্র

শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ জীবনের প্রায় তেষট্টি বছর সিলেটের দু'টি বিখ্যাত মাদ্‌রাসা

এবং প্রতিষ্ঠান ছাড়া হাদীসে নববী অধ্যাপনা করেছেন। এই অর্ধ শতাব্দীরও অধিককালের অধ্যাপনাকালে তাঁর কাছে অসংখ্য ছাত্র হাদীস শরীফ পড়ার সুযোগ লাভ করেছেন। বিভিন্ন সময় তিনি তাঁর ছাত্রদের আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে সনদ প্রদান করেছেন। বৃহত্তর সিলেটের অধিকাংশ সরকার অনুমোদিত মাদ্‌রাসায় তাঁর ছাত্রগণ প্রিন্সিপাল, সুপার অথবা শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। সেই বিপুল সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলেন-

১। হযরত মাওলানা শিহাব উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

২। হযরত মাওলানা মুফতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

৩। হযরত হাফিয় মাওলানা নূরুল হক বিলপারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

৪। অধ্যক্ষ মাওলানা শুয়াইবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জালালপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা।

৫। হাফিয মাওলানা নূরুল হক (বিলপারী ছাহেব) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

৬। অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল ফজল মুহাম্মাদ ইরশাদ হোসাইন গোয়াহরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সাবেক অধ্যক্ষ, বুরাইয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

৭। অধ্যক্ষ মাওলানা আনোয়ার আলী
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ভাদেশ্বর সিনিয়র মাদ্‌রাসা।

৮। অধ্যক্ষ মাওলানা মাশুক আহমদ মামদরচকী রাহমাতুল্লাহি
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা।

৯। শায়খুল হাদীস মাওলানা আসাদ্দার আলী চানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
অবসরপ্রাপ্ত মুহাদ্দিস, ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা।

১০। শায়খুল হাদীস মাওলানা শামসুল হুদা ছিরামপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
অবসরপ্রাপ্ত মুহাদ্দিস, ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা।

১১। অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল কাইউম সিদ্দিকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, মৌলবীবাজার টাউন সিনিয়র (কামিল) মাদ্‌রাসা।

১২। শায়খুল হাদীস মুফতি হারিস উদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সাবেক মুহাদ্দিস, ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা।

১৩। অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হাই ছাতকী
সাবেক অধ্যক্ষ, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসা।

১৪। অধ্যক্ষ মাওলানা শফিকুর রহমান
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসা।

১৫। অধ্যক্ষ মাওলানা মুফতি আব্দুল খালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বুরাইয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

১৬। শায়খুল হাদীস মাওলানা রইছ উদ্দিন
সাবেক উপাধ্যক্ষ, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসা।

১৭। অধ্যক্ষ মাওলানা নূরুল ইসলাম
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জকিগনজ ফাযিল সিনিয়র মাদ্‌রাসা।

১৮। অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুন নুর
সাবেক অধ্যক্ষ, ফেঞ্চুগন্‌জ মুহাম্মাদিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

যারা বিভিন্ন দারসে অংশ নিয়ে হাদীস শরীফের সনদ গ্রহণ করেছেন

১। শায়খ সায়্যিদ ইউসুফ হাশিম রিফাঈ, কুয়েত

২। শায়খ ড. আসআদ সাগিরজী, সিরিয়া

৩। শায়খ সায়্যিদ আসিম বিন আদী, মদীনা শরীফ

৪। শায়খ ড. নাজী বিন রাশীদ, বাহরাইন

৫। শায়খ মানসুর আল বুখারী, মদীনা শরীফ

৬। মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান, ঢাকা

৭। শায়খ ড. আহমদ আনিসুর রহমান, ঢাকা

৮। শায়খ ড. সাইফুল ইসলাম আল আযহারী, চাঁদপুর

৯। মাওলানা মনিরুল ইসলাম, মাগুরা

বিঃদ্রঃ শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর নিয়মিত এবং অনিয়মিত ছাত্রগণের পূর্ণ তালিকা সংরক্ষিত নেই। তবে ১৯৮৬ সালে প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ বিতরণ উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ স্মারকে সনদ গ্রহণকারীদের তালিকায় পাঁচ শতাধিক মানুষের নাম ছিলো। ২০০৮ সালে দ্বিতীয়বার আনুষ্ঠানিক সনদ বিতরণ উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ স্মারকে প্রায় আট'শ মানুষ তালিকাভুক্ত ছিলেন।

তাফসীর মাহফিল

দীর্ঘ দিন তিনি জকিগন্জ উপজেলার কালিগনজ বাজার জামে মসজিদে সপ্তাহে একদিন বাদ মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত তাফসীর পেশ করতেন। এছাড়া একই উপজেলার রতনগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ, বাবুর বাজার জামে মসজিদে প্রতি মাসে দুইদিন এবং থানাবাজার জামে মসজিদে প্রতি সপ্তাহে একদিন বাদ মাগরিব থেকে তাফসীর পেশ করেছেন। ১৯৯৭ থেকে ২০০৯ দীর্ঘ বারো বছর তিনি বিয়ানীবাজার উপজেলা সদরের উত্তর জামে মসজিদে প্রতি মাসের প্রথম ও শেষ বৃহস্পতিবার বাদ যোহর থেকে আসর পর্যন্ত নিয়মিত তাফসীর পেশ করেছেন। বড়লেখা উপজেলার চান্দগ্রাম জামে মসজিদে প্রতি মাসে দুই দিন এবং জকিগন্জ ফাযিল সিনিয়র মাদ্রাসা সংলগ্ন আলম নগর জামে মসজিদে মাসে দুই দিন তাফসীর মাহফিল করেছেন।

নব্বই এর দশকের কোন এক সময় বৃটেন সফরকালে লন্ডন শহরের ঐতিহাসিক ব্রিকলেন জামে মসজিদে এক মাসব্যাপী সপ্তাহে একদিন তাফসীর পেশ করেন। সেখানে পূর্ণ সুরা লুকমান এর তাফসীর করেছিলেন। এখনও সে তাফসীরের অডিও রেকর্ড কোন কোন মুরব্বির কাছে পাওয়া যায়।

দারসে বুখারী

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ সহীহ বুখারী শরীফের দারস মাদ্রাসার ক্লাসরুমে আটকে না রেখে সর্বজনিন করতে পেরেছিলেন। কাজটি খুব সহজ ছিলো না। কারণ একজন উস্তায ক্লাসে ছাত্রদের সহীহ বুখারী দারস দেয়ার সময় যে উচ্চাঙ্গের বিষয়সমুহ আলোচনা করেন সেসব বিষয় সাধারণের মানুষের দারসে উপস্থাপনের কোন সুযোগ নেই। তাই একজন উস্তায ক্লাসে হাদীসের দারসের ক্ষেত্রে যত দক্ষ হোন সাধারণ মানুষের সামনে তাদের মত সহজবোধ্য করে সেই একই হাদীসের কিতাবের দারস উপস্থাপন ততটা সহজসাধ্য নয়। আল্লাহপাক শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সেই যোগ্যতা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সময়ে একদিকে সহীহ বুখারী শরীফের একজন শ্রেষ্ঠ উস্তায হিসেবে সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্রাসা ও ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। অপরদিকে সাধারণ মানুষকেও তিনি সহীহ বুখারীর দারস প্রদান করেছেন।

১৯৮২ সালে আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরে আসার অল্পদিনের মধ্যে স্থানীয় উলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রবল আগ্রহে সিলেটের ফেঞ্চুগনজ বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দারসে বুখারী শুরু করেন। প্রতি মাসে দুইদিন সেখানে দারস হতো। সেই দারসে নিয়মিত অংশগ্রহণকারী ফেঞ্চুগনজ ডিগ্রী কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও খ্যাতিমান কবি কালাম আজাদ দারস সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন, আমার ধারণা ছিল বিশ-ত্রিশ জন আলিম উলামার খুসুসী এক সম্মেলন হবে হয়তো। কিন্তু দেখা গেল

ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে প্রত্যেক শ্রেণি পেশার মানুষের অংশগ্রহণে মহাসমাবেশে পরিণত হল সে দারস। আমিএই দারসে হাজির হয়ে ইসলামী ইতিহাস শিখলাম এবং এটা অনুভব করলাম- হাদীস শাস্ত্র ব্যতীত 'তারিখে ইসলাম' বা ইসলামের ইতিহাস হতে পারে না বরং 'মুসলমানদের ইতিহাস' বা 'মুসলমান শাসকদের ইতিহাস' হতে পারে। সাধারণ মানুষের মধ্যে বুখারী শরীফের মত আগাগোড়া ইলমী কিতাবের প্রভাব যে এত সুদূর প্রসারী হতে পারে তা আমি তখনই টের পেতে শুরু করি।

১৯৯৭ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ঊনিশ বছর তিনি প্রতি ইংরেজি মাসের শেষ শুক্রবার বাদ জুমুআ থেকে আসর পর্যন্ত দক্ষিণ সুরমার রাখালগনজ বাজার জামে মসজিদে সহীহ বুখারীর দারস প্রদান করেন। সে দারসেও বিভিন্ন মাদ্‌রাসার ছাত্র শিক্ষক ছাড়াও স্কুল কলেজের ছাত্র শিক্ষক ও সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমাগম হতো।

জীবনের শেষবার বৃটেন সফরকালে ৪ জুলাই ২০২০ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত একাধারে বিশ দিন বিকেলে দেড় থেকে দুই ঘণ্টা সহীহ বুখারী শরীফ দারস প্রদান করেন।

শামাঈলে তিরমিযী, রিয়াদুস সালিহীন ও আদাবুল মুফরাদ এর দারস

২০০৯ সালে বৃটেন সফরকালে প্রায় নয় মাস অবস্থান করেন। এ সময় প্রতি শনিবার বাদ মাগরিব থেকে পূর্ব লন্ডনে অবস্থিত হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতিষ্ঠিত দারুল হাদীস লতিফিয়ায় ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ সংকলিত শামাঈলে মুহাম্মাদিয়্যা (শামাঈলে তিরমিযী) নামক হাদীসের কিতাব পূর্ণ দারস প্রদান করেন। দারস শেষ হলে প্রায় আড়াই'শ উলামাকে শামাঈলে তিরমিযী ও মুসালসাল হাদীসের সনদ প্রদান করেন। এরপর প্রতি শনিবার ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ সংকলিত বিখ্যাত হাদীসের কিতাব রিয়াদুস সালিহীন এর দারস শুরু করেন। প্রায় অর্ধেক কিতাব দারস শেষ হলে তিনি দেশে ফেরত যান। শামাঈলে তিরমিযী ও রিয়াদুস সালিহীন এর সাপ্তাহিক দারসে বিভিন্ন মাসলাক মাশরাবের বিপুল সংখ্যক উলামা ও সাধারণ মানুষ নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন।

বিভিন্ন সময় বৃটেন সফরকালে কয়েকটি শহরে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ সংকলিত হাদীসের কিতাব আদাবুল মুফরাদ এর দারস প্রদান করেন।

জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি বাড়ির পাশে নিজের প্রতিষ্ঠিত আল হাবীব জামে মসজিদে প্রতি মঙ্গলবার বাদ মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত দারসে হাদীস প্রদান করতেন। সাপ্তাহিক এই মাহফিলে معارج السنن للنجاة من الضلال و الفتن নামক হাদীসের কিতাব দারস দিতেন। আশপাশ এলাকা ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে উলামায়ে কিরাম এবং বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ সে দারসে অংশগ্রহণ করতেন। সাপ্তাহিক সে দারস আল হাবীব ফাউন্ডেশন ফেইসবুক পেজ এ নিয়মিত লাইভ সম্প্রচার করা হতো। এতে বাংলাদেশের

বিভিন্ন প্রান্ত এবং ইউরোপ আমেরিকা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ দারসে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতেন।

ওয়াজ মাহফিল

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনাকালে প্রথমদিকে সাধারণত: কোন ওয়াজ মাহফিলে যেতে চাইতেন না। এক সময় বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বিশেষ নির্দেশে ওয়াজ মাহফিলে যাওয়া শুরু করেন। তবে মাদ্‌রাসার ক্লাস শেষ করে মাহফিলে যেতেন। মাহফিলের কারনে কখনও ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেন নি। দূরবর্তী কোথাও মাহফিলে গেলে পরের দিন ক্লাস শুরুর আগেই মাদ্‌রাসায় উপস্থিত হতেন। মাহফিলে যাওয়ার সময় পরের দিন পাঠদানের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় কিতাব সাথে নিয়ে যেতেন। মাহফিল শেষে গভীর রাত পর্যন্ত মুতাআলা করতেন।

তাঁর বয়ানে সব সময়ই ইলমি ও আমলী বিষয় প্রাধান্য পেতো। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শান-আযমত ও সীরাতের বিভিন্ন দিক এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনের শিক্ষনীয় বিষয়াবলী হতো বয়ানের মূল প্রতিপাদ্য। প্রতিটি বয়ান হতো বিষয় ভিত্তিক। দেড় দুই ঘণ্টাব্যাপী নির্দিষ্ট বিষয়ে বয়ান পেশ করতেন। যে বিষয়ে বয়ান করতেন সে বিষয় সংশ্লিষ্ট কুরআন শরীফের আয়াত এবং হাদীস উল্লেখ করে তা ব্যাখ্যা করতেন।

সাধারণত: বয়ানে তিনি ইখতিলাফি বিষয় পরিহার করতেন। প্রসঙ্গক্রমে কোন ইখতিলাফি বিষয় চলে এলে সাধারণ মানুষের বুঝার উপযোগী মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় বিষয়টি বিস্তারিত বলে দিতেন। এক্ষেত্রে কারো মত খণ্ডনের প্রয়োজন হলে তাও করতেন। তবে বিরোধী মত খণ্ডনের বেলায় সাধারণত: তিনি এভাবে বলতেন, আমাদের কোন কোন দোস্ত বিষয়টি এভাবে বলেন। এ বিষয়ে অমুক অমুক কিতাবে আলোচনা আছে। আমি উক্ত কিতাবসমুহ মুতাআলা করে বিষয়টি এভাবে বুঝেছি। এই বলে তিনি পুরো বিষয়টি উপস্থাপন করতেন। প্রয়োজনে কিতাবের ইবারাত উদ্ধৃত করতেন। বিরোধী মত খণ্ডনের ক্ষেত্রে কখনো তিনি আক্রমনাত্মক ভাষা ব্যবহার করতেন না। এতে দেখা যেতো বিভিন্ন মাহফিলে তাঁর বয়ানের সময় ভিন্ন মাসলাক মাশরাব ও ভিন্ন মতের অনুসারী উলামাগণও শ্রোতা হিসেবে বসতেন। এমনকি কেউ কেউ খাতা কলম হাতে নিয়ে বসে বিভিন্ন বিষয় নোট করে নিতেন।

ইলমে কিরাতের খিদমাত

১৩৮৬ হিজরিতে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট থেকে ইলমে কিরাতের সনদ লাভের পর থেকে তিনি প্রতি বছর রামাদান মাসে ইলমে

কিরাত শিক্ষা দানে নিয়োজিত থাকতেন। প্রথম দিকে বেশ কয়েক বছর দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট এর প্রধান কেন্দ্র ফুলতলী ছাহেব বাড়িতে খিদমাত আনজাম দেন।

ইলমে কিরাত শিক্ষাদান এবং প্রসারের জন্য হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর একনিষ্ঠতা এবং অপরিসীম ত্যাগ সম্পর্কিত আলাপচারিতায় শায়খুল হাদীস ছাহেব বলেন, হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট গঠনের পর রামাদান মাসে নিজ বাড়িতে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষাদান শুরু করেন। প্রথম দিকে বেশ কয়েক বছর মাসব্যাপী সমবেত ছাত্রদের খাবার রান্না করার জন্য বাবুর্চি না রেখে নিজ হাতে রান্না করতেন। হযরত ছাহেব কিবলার নিকট থেকে ইলমে কিরাতের সনদ লাভের পর তাঁর নির্দেশে বেশ কয়েক বছর রামাদান মাসে ফুলতলীতে থাকতাম। দিনের বেলা রুটিন মত ক্লাস নিতাম। আর রাতের বেলা রান্নার কাজে ছাহেব কিবলাকে সহযোগিতা করতাম। রান্না বান্নার কষ্টসাধ্য কাজ করার সময় ছাহেব কিবলা খুব উত্ফুল্ল মেজাজে থাকতেন। মাঝে মাঝে বলতেন, দুআ করো আল্লাহ তা'লা যেন তাঁর কালামে পাকের শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের মেহনত কবুল করেন। একবার রান্না করতে গিয়ে অসতর্কতা বশত: হযরত ছাহেব কিবলার হাত পুড়ে যায়। তাৎক্ষণিক আমি ঔষধের ব্যবস্থা করতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন, ঔষধের জন্য ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কালামে পাকের জন্য করা এই ত্যাগের চিহ্ন নিয়ে আমি কবরে যেতে চাই। হযরত ছাহেব কিবলার ইন্তেকালের পর গোসল করাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই। তখন তাঁর ডান হাত মুবারকে পুড়া কালচে দাগ দেখে সেদিনের কথা বারবার মনে পড়ে যায়।

১৯৮২ সালের রামাদান মাসে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায় দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের শাখা কেন্দ্র চালু করা হয়। ক্লাস শুরুর প্রথম দু'একদিনের মধ্যেই কিছু অনাকাঙ্খিত সমস্যা দেখা দেয়। সংবাদ পেয়ে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা শায়খুল হাদীস ছাহেবকে উক্ত শাখা পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনায় পূর্ণ রামাদান মাস শান্তিপূর্ণভাবে দারুল কিরাত সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা শাখা পরিচালিত হয়।

১৯৮৩ সালে সিলেট শহরের সুবহানীঘাটে ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত শাহজালাল দারুসসুন্নাহ ইয়াকুবিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে চার রুমের একটি টিনশেড ঘর তৈরী করে মাদ্রাসাটির যাত্রা শুরু হয়। মাদ্রাসা শুরুর পর প্রথম রামাদানেই সেখানে দারুল কিরাতের শাখা কেন্দ্র চালু হয়। প্রথমদিকে কয়েক বছর এই শাখা কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব ছিলো তাঁর উপর। দিনের বেলা তিনি নিয়মিত ক্লাস নিতেন। আর রাতের বেলা শহরের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সাথে ব্যাপক

যোগাযোগ ও দেখা সাক্ষাত করে দারুল কিরাতের পাশাপাশি মূল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে সবাইকে এতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেন।

এছাড়া দারুল কিরাত ইছামতি মাদ্‌রাসা শাখা, থানাবাজার মাদ্‌রাসা শাখা এবং জোবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় শাখা পরিচালনায় তিনি দীর্ঘ দিন সরাসরি জড়িত ছিলেন।

তরীকতের খিদমাত

১৩৮৫ হিজরির যিলকাদ মাসে (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ ঈ.) হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহকে খিলাফত প্রদান করেন। প্রথমদিকে কয়েক বছর তিনি বাইআত করাতেন না। পরবর্তীতে মুরশিদ কিবলার কঠোর নির্দেশে তিনি বাইআত করাতে শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রথমদিকে দীর্ঘদিন আমি বাইআত করাতে সাহস করতাম না। একবার বড়লেখা থেকে বাড়িতে ফেরার পথে শেওলা ফেরীঘাটে ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে দেখা হয়। তিনিও এ পথে কোথাও থেকে ফিরছিলেন। হঠাৎ ফেরী বিকল হয়ে পড়ায় ফেরীঘাটের দুই দিকে প্রচুর যাত্রীসহ গাড়ি আটকে আছে। প্রচণ্ড গরমের দিন। একটি গাছের ছায়ায় চেয়ার দিয়ে ছাহেব কিবলাকে বসানো হয়েছে। অনেক মানুষ ভীড় করে আছে। ছাহেব কিবলা এখানে আছেন জানতে পেরে আমি এগিয়ে যাই। সালাম কদমবুসি করে চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছি। এক সময় ইশারায় কাছে ডেকে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, অনেক মানুষ আমার কাছে অভিযোগ করছে তুমি নাকি বাইআত করাতে চাও না। বিনয়ের সাথে বললাম, আমি সাহস করতে পারি না। আমার দ্বারা হক আদায় হবেনা। তখন কিছুটা ধমকের সুরে বলেন, আমি যোগ্য মনে করেই ইজাযাত দিয়েছি। এখন থেকে কোন মানুষ বাইআত করতে চাইলে ফেরত দেবে না।

এরপর থেকে দেশ বিদেশে বহু মানুষ তাঁর কাছে বাইআত হয়ে তাযকিয়ায়ে নাফস এর মেহনত করেছেন। তবে তিনি সব সময় তরীকতের তা'লিম তারবিয়াতের কাজে গোপনীয়তা রক্ষা করা পছন্দ করতেন। যারা তাঁর কাছে তরীকতের মেহনত করে চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতেন তাদেরকে তিনি নিজে ইজাযাত না দিয়ে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর খিদমতে সোপর্দ করে দিতেন। আমাদের জানা মতে তরীকতের ক্ষেত্রে তিনি কোন খলিফা রেখে যাননি। তবে বিশেষ কারনে মাত্র কয়েকজন মানুষকে তাওবার ইজাযাত দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, তাওবার ইজাযাত আর খিলাফাত এক বিষয় নয়। যাদেরকে তিনি তাওবার ইজাযাত দিয়েছেন বিষয়টি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। যেভাবে মুসালসাল হাদীসের সনদ প্রদানের সময় পরিষ্কার বলে দিতেন, এই সনদ কেবলমাত্র আমার দুই উস্তাযের কাছ থেকে প্রাপ্ত মুসালসাল হাদীসসমূহের ইজাযাত ও সনদ। সিহাহ সিত্তাহ বা কোন হাদীসের কিতাবের সনদ নয়।

হজ্জ ও উমরা আদায়

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ মোট কতবার হজ্জ ও উমরা আদায় করেছেন এর সঠিক পরিসংখ্যান সংরক্ষিত নেই। তবে তিনি প্রথম হজ্জ আদায় করেন ১৯৭৮ সালে। আর জীবনের শেষবার উমরা আদায় করেন ২০২০ সালে। সে বছর ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত হারামাইন শরীফাইনে অবস্থান করেন। এই ৪২ বছরের (১৯৭৮ থেকে ২০২০) মধ্যে প্রায় প্রতি বছরই তিনি হজ্জ অথবা উমরা আদায়ের জন্য হারামাইন শরীফাইন সফর করেছেন।

বিভিন্ন দেশে দাওয়াতি সফর

যুক্তরাজ্য

১৯৮১ সালে স্বীয় পীর ও মুরশিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রহমতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশে তিনি আরব আমিরাত থেকে প্রথমবারের মতো যুক্তরাজ্য সফর করেন। মাত্র পনেরো দিনের সফরে তিনি ছাহেব কিবলার সাথে সে দেশের বিভিন্ন শহরে আয়োজিত বিভিন্ন মাহফিলে বয়ান পেশ করেন। স্বল্পদিনের সফর শেষে ছাহেব কিবলার সাথে হজ্জ পালন শেষে আপন কর্মস্থল আমিরাতে ফেরত যান।

প্রথমবার যুক্তরাজ্য সফরের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একান্ত আলাপচারিতায় তিনি বলেন, আমি আরব আমিরাতে কর্মরত ছিলাম। ১৯৮০ সালে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বৃটেন সফরে যাওয়ার পূর্বে আমাকে চিঠি দিয়ে জানান আমি মাসখানেকের জন্য বৃটেন সফরে যাচ্ছি। তোমার মন চাইলে সুযোগ করে চলে আসতে পারো। যেহেতু সরাসরি নির্দেশ দেন নি, তাই সেবছর আমি যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিনি। ১৯৮১ সালে ছাহেব কিবলা বৃটেন সফরে যাওয়ার পূর্বে আবারো চিঠি দিয়ে বৃটেন যাওয়ার জন্য সরাসরি নির্দেশ প্রদান করেন। চিঠি পাওয়ার পর আমি কোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটির আবেদন করি। প্রক্রিয়াগত কারনে কিছু বিলম্ব হলেও ছুটি মঞ্জুর হয়। নির্ধারিত তারিখে হিথ্রো এয়ারপোর্ট পৌঁছে দেখি ছাহেব কিবলার খাদিম কারী মশাহিদ ছাব, হযরত মাওলানা মুজাহিদ উদ্দিন চৌধুরী দুবাগী ছাহেব, আলহাজ রজব আলী, আলহাজ মোস্তফা আলী ও আলহাজ বশির উদ্দিন আহমদ আমার জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছেন। আমি ফিসফিস করে কারী মশাহিদ ছাহেবকে বলি এত মানুষ নিয়ে কেনো এসেছেন, আপনি একা এলেই তো হতো। তিনি বললেন, স্বয়ং ছাহেব কিবলা আপনাকে এগিয়ে নিতে এয়ারপোর্ট এসেছেন, তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আশ্চর্য হয়ে তড়িগড়ি এগিয়ে গেলাম। একে তো সৈয়দপুরের দুঃখজনক ঘটনার পর প্রথম দেখা আর আমার জন্য কষ্ট করে এয়ারপোর্টে এসেছেন। আবেগে আমার কান্না চলে এলো। ছাহেব কিবলা আমাকে শান্তনা দিয়ে বললেন, আমি মাওলানা মুমতায আলীর ছেলেকে নেয়ার জন্য এয়ারপোর্ট আসিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র হাদীসের একজন খাদিমকে ব্রিটেনের জমিনে স্বাগত জানাতে এসেছি। এই জমিনে একজন হাদীসের খাদিমের কদর আমার চেয়ে কে বেশি বুঝবে।

এরপর থেকে তিনি প্রায় প্রতি বছরই যুক্তরাজ্য সফর করেন (কখনো হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সফরসঙ্গী হয়ে আর কখনো একা)। এসব সফরে তিনি গ্রেট ব্রিটেনের উল্লেখযোগ্য প্রতিটি শহরে বিভিন্ন মাহফিলের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্রিটেনে বসবাসরত তাঁর ছাত্রগণের অনুরোধে ২০০৯ সালে তিনি একাধারে প্রায় নয় মাস সে দেশে অবস্থান করেন। সে সময় প্রতি শনিবার লন্ডনস্থ দারুল হাদীস লতিফিয়ায় শামাঈলে তিরমিযী নামক বিখ্যাত হাদীসের কিতাব সম্পূর্ণ দারস পেশ করেন। নিয়মিত সে দারসে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর থেকে প্রচুর সংখ্যক উলামা এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করতেন। দারস পূর্ণ হলে দুই শতাধিক আলিমকে শামাঈলে তিরমিযীর সনদ প্রদান করেন। যুক্তরাজ্য সফরকালে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শহরে রিয়াদুস সালিহীন এবং আদাবুল মুফরাদ নামক বিখ্যাত হাদীসের কিতাবেরও দারস প্রদান করেছেন।

শেষ বারের মত ব্রিটেন করেন ২০২০ সালে। সে বছর মার্চ মাসের ৬ তারিখ উমরা আদায় শেষে ব্রিটেন পৌঁছেন। করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়লে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লকডাউন ঘোষিত হয়। ১৯ মার্চ ব্রিটিশ সরকার দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করে। ফলে বিভিন্ন শহরে পূর্ব নির্ধারিত সব প্রোগ্রাম স্থগিত হয়ে যায়। তাই শেষ সফরে লন্ডন শহরের বাইরে কোথাও যাওয়া হয়নি। সে সফরে তিনি পূর্ব লন্ডনের যে বাসায় অবস্থান করেন সেখানে রামাদান মাসে প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে আসর পর্যন্ত আবদুল করিম নামক এক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফ পড়ান। শেষ রামাদান পর্যন্ত সেই ব্যক্তি তাজবীদ সহকারে পূর্ণ কুরআন শরীফ তাঁর কাছে শুনাতে সক্ষম হন।

লকডাউন কিছুটা শিথিল হলে ৪ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেলে বুখারী শরীফের দারস প্রদান করেন। লকডাউনজনিত বাধ্যবাধকতার কারনে মাত্র চারজন মাওলানা শিহাব উদ্দিন গোটারগ্রামী, মুফতি ইহসান আহমদ, মাওলানা মুহিব আল কাসিম ও আমি (নিবন্ধকার) সরাসরি সেই দারসে অংশ নেন। আর জুম লিংকের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর থেকে আশি নব্বইজন আলিম নিয়মিত সে দারসে অংশগ্রহণ করতেন।

যুক্তরাষ্ট্র

১৯৯৫ সালে আমেরিকায় অবস্থানরত তাঁর ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের আমন্ত্রণে তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। সে সময় বিভিন্ন শহরে মাহফিলসমূহে যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভন্ন শহরে তাঁর প্রেরণা ও নির্দেশনায় বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামি সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সিরিয়া

২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি সিরিয়া সফর করেন। সে সময় দামেশকের বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদগণের সাথে ব্যাপকভাবে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। সে সফরে দামেশকের প্রখ্যাত হানাফী আলিম, আল ফিকহুল হানাফী ওয়া আদিল্লাতুহুসহ বহু মূল্যবান কিতাব প্রণেতা শায়খ ড. আসআদ মুহাম্মাদ সাঈদ সাগিরজি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কাছ থেকে ইলমে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন। সনদ গ্রহণ উপলক্ষে শায়খ সাগিরজি দামেস্কের উল্লেখযোগ্য উলামার উপস্থিতিতে ২৯ অক্টোবর ২০০৮ নৈশভোজের আয়োজন করেন। এ ছাড়া বহু গ্রন্থপ্রণেতা শায়খ ড. সায়্যিদ আজ্জাজ আল খাতিব আল হুসাইনী রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ হিশাম বুরহানি রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ আবদুর রাহমান হাম্মামি প্রমুখ তাঁর সাথে একান্তভাবে ইলমি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে শায়খ হাম্মামি পুরো সফরে নিজে ড্রাইভ করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনে নিয়ে যান।

শায়খুল হাদীস ছাহেব দামেশক সফরকালে সাহাবীগণের মধ্যে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ২০ হি.), হযরত আবিদ দারদা আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৩২ হি.), হযরত দেহইয়া ইবন খালিফা আল কালবী রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৫০ হি.), হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৮৫ হি.) প্রমুখের কবর শরীফ যিয়ারত করেন। এছাড়া ইমাম আবান ইবন উসমান (ওফাত ১০৫ হি.), ইমাম আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (ওফাত ১১৮ হি.), ইমাম ইবনু আসাকির (ওফাত ৫৭১ হি.), ইমাম ইবনু আবিদীন (ওফাত ১২৫২ হি.), ইমাম বদরুদ্দিন হুসাইনী (ওফাত ১৩৫৪ হি.), ইমাম জামালুদ্দিন মিযযী (ওফাত ৭৪২ হি.) রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ এর যিয়ারত করেন।

মরক্কো

২০১০ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মরক্কো সফর করেন। এ সময় মদিনাতুল আউলিয়া নামে খ্যাত মারাকাশ শহরে দালাইলুল খাইরাত প্রণেতা ইমাম জাযুলী রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম কাযী আয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম সুহাইলি রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখের মাজার জিয়ারত করেন।

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ একটি বিশেষ কারনে মরক্কো সফর করেন। সময়ের প্রেক্ষিতে সেই বিশেষ কারন বিবৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অনুমতিক্রমে শায়খুল হাদীস ছাহেব ইমাম জাযুলী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত দালাইলুল খাইরাত নামক বিখ্যাত দুরূদ শরীফের কিতাবখানা তাহকীক এবং দৈনন্দিন ওযীফা আকারে পড়ার বিন্যাস কাজ সম্পন্ন করেন ২০০৮ সালে। আল হাবীব ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিতাবখানা প্রকাশের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে তিনি বারণ করেন। প্রায় দুই বছর গত হয়, কিন্তু তিনি ছাপানোর অনুমতি

দিচ্ছেন না। অথচ দালাইলুল খাইরাত প্রকাশিত হবে মর্মে পূর্ব ঘোষণার প্রেক্ষিতে প্রতিদিন বিভিন্ন মানুষ বিলম্বের কারন জানতে চাচ্ছেন; কিন্তু নির্দিষ্ট কোন কারন বলা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় ২০১০ সালে তিনি ব্রিটেন সফরে এলে একান্ত পরিবেশে দালাইলুল খাইরাত এর ব্যাপক চাহিদার কথা উল্লেখ ছাপানোর অনুমতি চাই। তখন বলেন, যার কিতাব তাঁর অনুমতি না নিয়ে ছাপানো সমীচীন হবে না। তুমি চেষ্টা করে মরক্কোর ভিসা ব্যবস্থা করো। আমি ইমাম জাযুলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর যিয়ারত করতে চাই। কিছু দিনের মধ্যে ভিসা ব্যবস্থা করা হলে তিনি মরক্কো সফর করেন। তিনি মদিনাতুল আউলিয়া খ্যাত মরক্কোর মারাকাশ সফরে যাচ্ছেন জেনে অনেকে সফরসঙ্গী হন। সেই সফরে তিনি সফরসঙ্গীদের নিয়ে ইমাম জাযুলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মাযারের পাশে বসে দালাইলুল খাইরাত খতম করেন। যেদিন সফর থেকে লন্ডন ফিরে আসেন সেদিনই একান্তে ডেকে নিয়ে বলেন, অনুমতি পাওয়া গেছে, দালাইলুল খাইরাত ছাপায় দিতে পারো।

ভারত

ভারতের আসাম প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি বিভিন্ন সময়ে ব্যাপক সফর করেন। সেসব সফরে মাহফিলে যোগদান ছাড়াও উলামায়ে কেরামের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে বুখারী শরিফের দারস প্রদান করেন।

মিশর

২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি মিশর সফর করেন। সেই সফরে কায়রো শহরে সাহাবি উকবা ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাজার প্রাঙ্গণ, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ'র মাজার প্রাঙ্গণ এবং ইতিহাসখ্যাত আল-আজহার মসজিদে হাদীস শরীফের দরস প্রদান করেন।

আল আযহার ইউনিভার্সিটি সংলগ্ন মসজিদে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু সংশ্লিষ্ট স্থানে ইমাম মাথা মুবারক এর কবর যিয়ারত করেন। উক্ত মসজিদ সংযুক্ত একটি বিশেষ রুমে শায়খ ড.সায়্যিদ ইউসরি রুশদী হাফিযাহুল্লাহ এর সাথে একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। এছাড়া ইমাম শাফিঈ, ইমাম লাইছ ইবন সা'দ, ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী, ইমাম যাকারিয়া আল আনসারী, ইমাম বদরুদ্দিন আইনী, ইমাম কুসতুল্লানী, ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখের মাকবারা যিয়ারত করেন।

ইসকান্দারিয়া শহরে নবী দানিয়াল আলাইহিস সালাম, হযরত লুকমান হাকীম আলাইহিস সালাম এর রওযা যিয়ারত করেন। ইমাম বুসিরী রাহিমাহুল্লাহ এর মাযারের পাশে বসে কাসীদা বুরদা শরীফ খতম করেন।

রাজনৈতিক জীবন

শিক্ষকতা ও দাওয়াতি কার্যক্রমের পাশাপাশি একসময় তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীতে তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির সিলেটের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নেজামে ইসলামের মনোনয়নে তিনি তখনকার সিলেট ৭ আসনে (জকিগন্জ, বিয়ানীবাজার ও কানাইঘাট) এমএনএ (Member of National Assembly) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সম্মানজনক ভোট পান। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল-ইসলাহ'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে আঞ্জুমানে আল-ইসলাহ মনোনীত ও সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে তিনি জাতীয় নির্বাচনে সিলেট পাঁচ আসনে (জকিগন্জ-কানাইঘাট) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ আজীবন ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন স্থানে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মান উন্নয়নের নেপথ্যে রয়েছে তাঁর প্রচ্ছন্ন ভূমিকা। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের সরকার অনুমোদিত অধিকাংশ মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল বা সুপার এবং বেশিরভাগ শিক্ষক হয়তো সরাসরি তাঁর ছাত্র অথবা ছাত্রের ছাত্র। এজন্য সব সময় মাদ্‌রাসাসমূহের বিভিন্ন সমস্যা সংকট নিরসনে তাঁরা একজন দরদী অভিভাবক ও ভরসাস্থল হিসেবে তাঁর দারস্থ হতেন।

আনজুমানে মাদারিসে আরাবিয়া

১৯৬৪ সালে মুজাদ্দিদে যামান শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শীর্ষ কয়জন খলিফা হযরত মাওলানা গোলাম হোসাইন সৎপুরী, হযরত মাওলানা ইসহাক আহমদ চৌধুরী বিশ্বনাথী এবং শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান, শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল জব্বার গোটারগ্রামী ও হযরত মাওলানা আবুল ফজল মুহাম্মাদ ইরশাদ হোসাইন গোয়াহরী রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে পরামর্শ করে প্রতিষ্ঠা করেন আনজুমানে মাদারিসে আরাবিয়া। সরকার অনুমোদিত মাদ্‌রাসা শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন এবং মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের বহুমূখি উন্নয়নে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ সংগঠন যুগান্তকারী বহু পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।

১৯৮২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি উক্ত সংগঠনের বোর্ড কমিটির সভায় শায়খুল হাদীস আল্লামা মো.হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহকে সংগঠনের চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়। দীর্ঘদিন তিনি নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর দায়িত্বকালে এ সংগঠনের কার্যপরিধি ব্যাপক বিস্তৃত হয়। বিশেষ মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় আয়োজিত শিক্ষক প্রশিক্ষণে তিনি নিজে প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করতেন।

মাদরসা শিক্ষা বোর্ডের সদস্য

১৯৮৩ সালে অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান রাহিমাহুল্লাহ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এ সময় বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল থেকে শায়খুল আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহকে বোর্ড কমিটির সদস্য মনোনীত করা হয়। তিন বছর তিনি সদস্য হিসেবে বোর্ড কমিটির সকল সভায় উপস্থিত থাকতেন। এ সময় তিনি মাদ্‌রাসার পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস প্রণয়ন, বোর্ডের আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মাদ্‌রাসাসমূহের সরকারী মঞ্জুরী ও স্বীকৃতি আদায় সহজীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পত্রিকা প্রকাশ

১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর সম্পাদনায় সিলেট শহর থেকে মাসিক শাহজালাল নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বল্প সময়ে সিলেট অঞ্চলে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করলেও ১৯৯৩ সালে নানা কারণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

কিতাব প্রীতি

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে একজন অনন্য পাঠক ছিলেন। যারা তাঁর কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হয়েছে প্রত্যেকেই তাঁর কিতাব প্রীতি সম্পর্কে কম বেশি অবহিত আছেন। তিনি যেকোন বিষয়ের বই কিতাব মনযোগ সহকারে পড়তেন। তবে তাঁর আগ্রহের মূল কেন্দ্র ছিলো হাদীস, উলূমুল হাদীস, তাফসীর, সীরাত ও ফিকহ এ বিষয়সমূহ।

বই কিতাব অধ্যয়নে তাঁর অলিখিত দৈনন্দিন রুটিন ছিলো। বাড়িতে হোক কিংবা সফরে তিনি রুটিন মত অধ্যয়ন করতেন। সফররত অবস্থায় চলন্ত যানবাহনে প্রচুর অধ্যয়ন করতেন। একবার লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পথে সাথে ছিলাম। যাত্রা শুরুর ঘণ্টাখানেক পর ব্যাগ থেকে কিতাব দিতে বললেন। হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। লক্ষ করলাম কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে কিছু সময় চোখ বন্ধ রেখে আবার পড়া শুরু করেন। দেখে মনে হলো তাঁর কষ্ট হচ্ছে। অথচ সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারছি না। দীর্ঘ সময় এরকম চলার পর মনে মনে ভাবছি এত কষ্ট করে না পড়লে এমন কী হতো। এ সময় বললেন, প্রতিদিন কিছু না পড়লে মনে স্বস্তি পাই না। শান্তিতে ঘুম হয় না। তাই কষ্ট হলেও পড়ি। তবে আগের মত যানবাহনে বেশি পড়তে পারি না। কিছু সময় পর পর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মাথা ঝিম ঝিম করে।

ছাত্রজীবনে তিনি সিলেবাসভুক্ত কিতাবাদি ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর বই কিতাব পড়তেন। এসময় তিনি বাইবেল, বেদ, পুরান ও যিন্দাবেস্তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। কোন কোন সময় একান্ত ঘরোয়া আলাপচারিতায় ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে

তিনি উল্লিখিত গ্রন্থগুলো পাঠের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন। এই গ্রন্থগুলোর কোন অধ্যায়ে মৌলিক কী অসঙ্গতি রয়েছে তাও বলতেন।

তিনি যখন যা পড়তেন গভীর মনযোগ সহকারে পড়তেন। মনে হতো যেন কিতাবের মধ্যে ডুবে আছেন। চারপাশে যাই হোক মনে হতো যেন তিনি এ জগতের কেউ নয়। এখানে একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য।

১৯৯১ সালের কথা। আমি তখন আলিম ক্লাসে পড়ি। খুব সম্ভব গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বাড়িতে অবস্থান করছি। পাঁচ দিন সফর শেষে সন্ধ্যার সময় তিনি বাড়িতে ফিরেছেন। এশার নামাযের পর ঘরের সবাই একসাথে রাতের খাবার সেরে যে যার রুমে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি ডাকলেন। তড়িঘড়ি করে গেলাম। বললেন, একটি কিতাব খুঁজে বের করবো, তোমাকে হারিকেন ধরতে হবে। (তখন আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ ছিলো না।) কিতাবের রুমে ঢুকে আলমিরা খুলে কিতাবটি খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ একটি কিতাব বের করে পড়তে শুরু করলেন। দুই হাতে হারিকেন উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। একেতো গরম তার উপর মশার উৎপাত। তিনি নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে চলেছেন। এক সময় বিভিন্ন মসজিদ থেকে ফজরের আযানের ধ্বনি ভেসে আসতে লাগলো। যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। আফসোসের সুরে বললেন, তোমাকে ঘুমাতে দিলাম না। যাও নামায সেরে ঘুমিয়ে পড়।

একবার কথা প্রসঙ্গে আরব আমিরাত অবস্থানকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, আদালতে নির্ধারিত কাজ ছাড়া বাকী সময় লাইব্রেরিতে কাটাতাম। আদালতের লাইব্রেরি ছিলো খুবই সমৃদ্ধ। আইন বিষয়ক গ্রন্থাদি ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের বিপুল সংখ্যক কিতাবের সংগ্রহ ছিলো। পরিবার সাথে ছিলো না এবং অন্য কোন পিছুটানও নেই। তাই এই কয়টি বছর বেশ কিতাবাদি অধ্যয়নের সুযোগ হয়। এ সময় মনস্তত্ত্ব (সাইকোলজি) বিষয়ে বেশ কিছু কিতাব পড়ি। আদালতে সঠিকভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতে মনস্তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরী। কারন যে কোন মামলার আর্জিতে লিখিত যাই থাকুক না কেন, বাদী যখন বিবাদী পক্ষের আইনজীবির জেরার মুখে কথা বলে, তখন তার চেহারার অবস্থা ও বাচনভঙ্গি থেকে পুরো বিচার প্রক্রিয়ার মুড ঘুরিয়ে দেয়ার মত বিষয়ও বেরিয়ে আসতে পারে। ঠিক তেমনি একজন অভিযুক্ত মানুষ যখন কাঠগড়ায় দাঁড়ায় তখন তার দাঁড়ানো, কথা বলার ধরন, চেহারার অবস্থা ইত্যাদি থেকে অনেক কিছুই বুঝা যায়। আর এসব বুঝতে হলে মনস্তত্ত্ব বা ইলমুল নাফস (সাইকোলজি) জানা থাকা আবশ্যক।

রামাদান মাসে তিনি বেশি বেশি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। সেই সাথে তাফসীরের যে কোন কিতাব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার চেষ্টা করতেন। আমাদেরকে খুব গুরুত্ব সহকারে বলতেন, রামাদান হলো নুযুলে কুরআন এর মাস। এ মাসে যত

বেশি সম্ভব তিলাওয়াত করবে। আর আগে থেকে ঠিক করে রাখবে যেন একটি তাফসীরের আউয়াল আখের পড়তে পারো। অন্য যে কোন মাস থেকে এ মাসে তাফসীর পড়লে বেশি উপকৃত হতে পারবে।

মহিমান্বিত রবিউল আউয়াল মাস শুরু হলে দৈনন্দিন দুরুদ শরীফ পড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করতেন। অন্য মাসের তুলনায় মাহে রবিউল আউয়ালে রোজ অনেক বেশি পড়তেন। সেই সাথে নতুন সংগৃহীত সীরাতের কোন কিতাব সম্পূর্ণ পড়তেন। নতুন কোন কিতাব রবিউল আউয়াল মাসের আগে সংগ্রহ করতে না পারলে পূর্বে সংগৃহীত কয়েকটি কিতাবের বিভিন্ন অধ্যায় তুলনামূলক পাঠ করতেন।

রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে আশপাশের সবাইকে যেকোন ভাষায় প্রণীত গ্রহণযোগ্য কোন সীরাতের কিতাব পড়ার তাগিদ দিতেন।

ইন্তেকালের পূর্বে চরম অসুস্থ শরীর নিয়ে শয্যাশায়ী অবস্থায়ও তিনি প্রায় প্রতিদিন কিছু সময় কিতাব অধ্যয়ন করেছেন। শেষ কিছুদিন যখন শয্যাশায়ী অবস্থায় কিতাব ধরে রাখার সক্ষমতা ছিলো না, তখনও খিদমতে কেউ একজন কিতাব ধরে রাখতো। তিনি পড়তেন। এমনও হয়েছে, চোখ খোলা রেখে যখন কিতাব পড়তে পারছেন না, তখন কাউকে পড়ে শোনাতে বলতেন। কোন শব্দ ভুল পড়লে শুধরে দিতেন। শেষ ক'দিন খাওয়ার রুচি একেবারেই ছিলো না। ক্ষুধায় কষ্ট করতেন, কিন্তু কিছু খেতে চাইতেন না। একদিন দুপুরে তরল জাতীয় একটু খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করলে খেদমতে থাকা মাহফুযকে (তাঁর ভাতিজা) বললেন, খাবার তো এনেছো অথচ আজকে সারাদিন কিছু পড়া হয়নি, কিছু শেখা হয়নি। এই অবস্থায় খাওয়া কি হালাল হবে? এরপর শিয়রের পাশে থাকা একটি কিতাবের দিকে ইশারা করে মাহফুযকে কিছু পড়ে শোনাতে বলেন। মাহফুয কিছু পড়ে শোনালে বলেন, এবার খাওয়া হালাল হবে।

রচনাবলী

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ আজীবন দারস তাদরীস, ওয়াজ ইরশাদ ইত্যাদিতে দেশ বিদেশে ব্যস্ত সময় পার করেছেন। এই চরম ব্যস্ততার ফাঁকেও তিনি হাদীস, সীরাত, ফিকহ ও ইতিহাস বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা রেখে গেছেন। তন্মধ্যে ১৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশিত গ্রন্থ

১. **দোয়ায়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফযিলত**

এটি শায়খুল হাদীস ছাহেব রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। দৈনন্দিন জীবনে পঠিতব্য হাদীস শরীফে বর্ণিত দোয়ার সংকলন। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। ২০২২ সালে আল হাবীব ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাংলা ভাষায় লেখা এ

কিতাবের ১৬তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ২০১২ সালে লন্ডন থেকে এ কিতাবের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

২. **আল কাউলুল মাকবুল ফী মিলাদির রাসূল**

القول المقبول في ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم

মাহফিলে মিলাদের ইতিহাস বিষয়ে উর্দু ভাষায় লেখা এ কিতাব ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৮ সালে কিতাবখানা বাংলা অনুবাদ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক শায়খুল হাদীস ছাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মাওলানা মো. আবদুর রব বিলাল।

৩. **মাসআলায়ে উশর : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ**

শরিয়তের দৃষ্টিতে ভূমি দুই প্রকার, উশরি ও খিরাজি। উশরি ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের একদশমাংশ যাকাত হিসেবে দেয়া ফরজ। বাংলাদেশের ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের হুকুম সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে এ বইয়ে। ২০০৫ সালে ব্রিটেন সফরকালে রচিত এ বই ২০০৬ সালের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

৪. **দুরূদ শরীফের ফযীলত ও ওযীফা**

এ বইখানা ১৯৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০০০ সালে।

৫. **যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা (ফযীলত ও নিয়ম)**

১৯৯৯ সালে এ বই প্রকাশিত হয়। পরিমার্জিত ও বর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

৬. **আসহাবে বদর**

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন সাহাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্বলিত এ গ্রন্থ ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০১৫ সালে। তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

৭. **ওযীফা**

কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে বর্ণিত দোয়া সম্বলিত পকেট সাইজের এ বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে ৫ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ২০২১ সালে পরিমার্জিত ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

৮. **হজ্জ ও যিয়ারত (সংক্ষিপ্ত আহকাম ও নিয়ম)**

সংক্ষিপ্ত পরিসরে হজ্জের প্রয়োজনীয় মাসাঈল এবং রওজা শরীফ যিয়ারতের নিয়ম ও আদাব সম্বলিত পকেট সাইজ বই। ১৯৯৯ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৯. **হাদিয়াতুল লাবীব ফী নাবযাতিম মিন সীরাতিন নাবিয়্যিল হাবীব**

هدية اللبيب في نبذة من سيرة النبي الحبيب

আরবী ভাষায় লেখা সংক্ষিপ্ত সীরাতের কিতাব। ২০১১ সালে ব্রিটেন সফরকালে তিনি এ কিতাব রচনা করেন। ২০১২ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছে। সীরাতে হাবীবে খোদা নামে এ কিতাবের বাংলা অনুবাদ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০১২ সালের আগস্ট মাসে। শায়খুল হাদীস ছাহেবের প্রথম পুত্র মো. আবদুল আউয়াল হেলাল কর্তৃক অনূদিত সীরাতে হাবীবে খোদা বর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৯ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংস্করণ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

১০. **যাখীরাতুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী ফাদায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন**

ذخيرة الأحاديث الأربعين في فضاءل سيد المرسلين

বঙ্গানুবাদসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র ফযিলত বিষয়ক চল্লিশ হাদীস। ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে।

১১. **কানযুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যিল আমীন**

كنز الأحاديث الأربعين في مناقب اهل بيت النبي الأمين

বঙ্গানুবাদসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজনের মানাকিব বিষয়ক চল্লিশ হাদীস। প্রথম প্রকাশ ২০১১ সাল।

২০১০ সালে ব্রিটেন সফরকালে চল্লিশ হাদীসের এ দুই কিতাব তিনি প্রণয়ন করেন।

১২. **তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব**

تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب

আরবি ভাষায় রচিত এ কিতাব ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে।

এ কিতাবে তাঁর সনদ বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ, ইলমে কিরাত, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকহ, ইলমে তাসাউফ ও ইলমে তাফসীরে তাঁর উস্তাদ ও শায়খগণ প্রদত্ত সনদ এ কিতাবে গ্রন্থিত হয়েছে।

১৩. আত তুহফাতুল লাতীফাহ ফী আহাদীসিল মুসালসালাতিল মুনীফাহ

التحفة اللطيفة في احاديث المسلسلة المنيفة

আরবী ভাষায় রচিত এ কিতাব ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এ কিতাবে তাঁর শায়খগণ প্রদত্ত মুসালসাল হাদীসসমুহের সনদ গ্রন্থিত হয়েছে।

১৪. দালাইলুল খাইরাত

دلاءل الخيرات

দালাইলুল খাইরাত ইমাম জাযুলী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত দুরূদ শরীফের একটি বিখ্যাত কিতাব। দুনিয়ার দেশে দেশে ব্যাপকভাবে পঠিত ও সমাদৃত কিতাব দালাইলুল খাইরাত তাহকীক এবং ওযীফা আকারে পড়ার বিন্যাস করেছেন শায়খুল হাদীস ছাহেব। ২০১০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০২১ সালের মার্চ মাসে।

১৫. আল হিযবুল আ'যম

الحزب الاعظم

ইমাম মোল্লা আলী কারী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত এ কিতাব তাহকীক করেছেন শায়খুল হাদীস ছাহেব। ২০১৬ সালে কিতাবখানা প্রকাশিত হয়েছে।

স্বীয় তাহকীককৃত আল হিযবুল আ'যম কিতাবের ভূমিকায় শায়খুল হাদীস ছাহেব বলেন, ইমাম মোল্লা আলী কারী প্রণীত আল হিযবুল আ'যম الحزب الأعظم والورد الأفخم কিতাবখানা আমাদের বুযুর্গানে কিরামের সিলসিলার একটি নিয়মিত ওযীফা। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত: আমরা অনেকেই এ ওযীফা নিয়মিত পড়ি না। মুরশিদে বরহক হযরত ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক বছর পূর্বে নিয়মিত পড়ার তাকিদসহ এ অধমকে ওযীফাখানা পড়ার ইজাযাত প্রদান করেন। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় ইজাযাত প্রদানের পূর্বাপর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করছি।

১৯৬০-৬৫ সালের মধ্যে কোন এক সময়ের কথা (সঠিক সময়কাল এখন মনে করতে পারছি না)। হযরত ছাহেব কিবলাহ মুমিনছড়ায় (ঘিলাছড়া, ফেঞ্চুগন্জ) চিল্লায় বসেছিলেন। চিল্লা থেকে বের হওয়ার পর মারাত্মক অসুস্থ পড়েন। পাঁচ সপ্তাহ পর ক্রমান্বয়ে সুস্থ হন। ইতোমধ্যে দেওয়ান আবদুল বছির সাহেবের দাওয়াতে ঢাকা যাওয়ার দিন তারিখ ধার্য করেন। যাওয়ার একদিন পূর্বে অধম খাদিমকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। হুকুম করেন-ঢাকা পৌঁছে আনওয়ারুল করিম সাহেবকে বলবে আমার জন্য একটি সাদা পাগড়ি যেন কিনে রাখেন। তিনি ঢাকা পৌঁছার পরদিন ভোরবেলা আমাকে স্নেহভরে কাছে ডেকে বলেন, বাবা! আমার

অধিক ব্যস্ততা ও বেখেয়ালীর কারনে আমাদের সিলসিলার দু'টি ওযীফা বিলুপ্ত হওয়ার পথে। তুমি চকবাজার গিয়ে এমদাদিয়া কুতুবখাল থেকে আল হিসনুল হাসীন এবং আল হিযবুল আ'যম কিতাব দু'টি নিয়ে এসো। আমি গিয়ে কিতাব দু'টি নিয়ে এলাম। দেওয়ান আবদুল বছির সাহেব ও আমাকে কাছে বসিয়ে কিতাব দু'খানা পড়ালেন এবং ইজাযাত দিলেন। এরপর পূর্বে খরিদ করিয়ে রাখা সাদা পাগড়ি আমি অধমের মাথায় পরিয়ে দিলেন।

আজ জীবন সায়াহ্নে এসে মুরশিদ কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর রেখে যাওয়া আমানত বর্তমান এবং অনাগতকালে এ সিলসিলার অনুসারীগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার মানসে আল হিযবুল আ'যম কিতাবখানা প্রকাশে অনুপ্রানিত হই। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত এ কিতাবের বিভিন্ন নুসখা তুলনামূলক পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলো।

১৬. দারসে হাদীস-১

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছে দারসে হাদীস সিরিজের প্রথম গ্রন্থ। এতে হাদীসে নিয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নসব তথা বংশ মর্যাদা বিষয়ক একটি হাদীসের উপর প্রদত্ত দারস গ্রন্থিত হয়েছে।

১৭. সালাতুত তারাবীহ

القول الراجح في صلاة التراويح

এ গ্রন্থে বিশ রাকাত তারাবীহ এর প্রমানাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা নিয়ে কথিত আহলে হাদীস তথা লা-মাজহাবিদের ছড়ানো ফিতনা নিরসনে গ্রন্থখানি সহায়ক হবে। ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

১৮. মুনতাখাবুস সুনান ওয়াল আছার

منتخب السنن والاثار

সংক্ষিপ্ত হাদীস সংকলন। কিতাবুল ঈমান, কিতাবুস সালাত ও কিতাবুল ফিতান এ তিন অধ্যায়ে বিন্যস্ত কিতাবে দুইশ' তিনটি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এ কিতাব প্রণয়ন ও প্রকাশনা সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করতে চাই। ২০২০ সালের ৬ মার্চ হারামাইন শরীফাইন সফর শেষে তিনি লণ্ডন সফরে আসেন। সিদ্ধান্ত ছিলো মাস দেড়েক পর দেশে ফিরবেন। কিন্তু ইতোমধ্যে করোনা ভাইরাস ইতিহাসের ভয়াবহতম মহামারি আকারে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন দেশ লকডাউন ঘোষণা করে। ১৯ মার্চ ব্রিটেনে লকডাউন

ঘোষিত হয়। সঙ্গত কারণে সবাই গৃহবন্দী হয়ে পড়তে হয়। সেই সফরে তিনি পূর্ব লণ্ডনের ওয়াপিং এলাকায় তাঁর এক ভাতিজীর বাসায় অবস্থান করেন। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বন্ধ থাকায় লকডাউনের কড়াকড়ি উপেক্ষা করে প্রায় প্রতিদিন আমি (নিবন্ধকার) পরেনেরো বিশ মিনিট পায়ে হেটে উনার খিদমাতে যেতাম। এসময় তিনি বিষয়ভিত্তিক একটি বৃহৎ পরিসর হাদীস সংকলন করার পরিকল্পনা করেন। এ কিতাবে কোন কোন বিষয়ে হাদীস সংকলিত হবে তা নিয়ে প্রায় দিনই আলাপ করতেন। হাদীস সংকলনের নাম মুন্তাখাবুস সুনান ওয়াল আছার منتخب السنن والآثار ঠিক করে একটি অসম্পূর্ণ খসড়া সূচিপত্রও প্রণয়ন করেন। আমাকে সেই সূচিক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন কিতাব থেকে হাদীস সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। ২০২০ সালের ১৯ জুলাই ব্রিটেন সরকার লকডাউন তুলে দিলে সীমিত পরিসরে লন্ডন সিলেট ফ্লাইট চালু হয়। ২৬ জুলাই তিনি দেশে ফেরত যান। বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ইতোমধ্যে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। ২০২১ সালের আগস্ট মাস থেকে ক্রমান্বয়ে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে দেশে যাই। তখন তিনি শয্যাসায়ী হয়ে পড়েছেন। ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে একদিন সকালে কথা প্রসঙ্গে মুনতাখাবুস সুনান ওয়াল আছার সম্পর্কে কথা তুললাম। জিজ্ঞেস করলেন, কতটুকু হয়েছে? বললাম, তিন অধ্যায়ে দুই'শ তিনটি হাদীস জমা করা হয়েছে। কিছুক্ষণ নিরব থেকে বললেন, যেভাবে চেয়েছিলাম তা হলো না, আর কিছু করার সময়ও আমার নেই ; বলেই চোখ বন্ধ করে নিলেন। দেখলাম গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। একটু পরে চোখ খুলে বললেন, বাবা! যদি সময় সুযোগ করে পারো তবে যেটুকু হয়েছে কিতাব আকারে ছাপিয়ে নাও। এই ছোট কিতাব যাদের হাতে পৌঁছবে তারা যেন সাক্ষী দিতে পারে আমি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস প্রচার প্রসারের চেষ্টা করেছি। সেদিন থেকে প্রতি রাতে একটানা কাজ করতে লাগলাম। প্রতি রাতের কাজ দিনে উনার সামনে পেশ করতাম। তিনি তিনটি باب (অধ্যায়) পৃথক فصل (পরিচ্ছেদ) আকারে বিন্যাসের নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশনানুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে জানুয়ারির (২০২২) মধ্যভাগে ছাপার জন্য ঢাকায় পাঠাই। এক সপ্তাহের মধ্যে ফাইনাল প্রুফ দেখার জন্য কপি আসে। শয্যাশায়ী অবস্থায়ও তিনি প্রুফ দেখে মুকাদ্দিমা অংশে কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করে দেন। দ্রুত ছাপার কাজ শেষ হয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় কিছু কপি হাতে পৌঁছে। একটি কপি নিয়ে রুমে গিয়ে দেখলাম চোখ বন্ধ করে আছেন। মূলতঃ ৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার বিকাল থেকে তাঁর অবস্থা বেশ নাজুক। হাতে থাকা কপিটি শয্যাপাশে রেখে দিলাম। কিন্তু ছাপাকৃত মুনতাখাবুস সুনান ওয়াল আছার কিতাবখানা হাতে নিয়ে দেখার সুযোগ তাঁর হয়নি। এদিনই বাদ মাগরিব তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

অপ্রকাশিত গ্রন্থ

১. নির্বাচিত প্রবন্ধ

এ গ্রন্থে শায়খুল হাদীস কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে লিখিত ও বিভিন্ন ম্যাগাজিন সাময়িকীতে প্রকাশিত ত্রিশটি প্রবন্ধ গ্রন্থিত হয়েছে। শায়খুল ছাহেবের বড় পুত্র মো. আবদুল আউয়াল হেলাল কর্তৃক সংকলন, সম্পাদনা ও টীকাকৃত এ প্রবন্ধ গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

২. দারসে মাওলিদে বারযানজি

درس المولد للإمام البرزنجي

মাওলিদে বারযানজি নামে পরিচিত ইকদুল জাওহার ফী মাওলিদিন নাবীয়্যিল আযহার কিতাবখানা এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী উলামা ও সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় এবং ব্যাপক পঠিত একটি কিতাব। আমাদের দেশে মীলাদুন্নবী মাহফিলসমূহে এ কিতাবের বৃহৎ একটি অংশ পড়া হয়। কিতাবখানা উচ্চাঙ্গ আরবী ভাষায় কাব্যাকারে লেখা।

শায়খুল হাদীস ছাহেব বিভিন্ন সময়ে ব্রিটেন এবং বাংলাদেশে এ কিতাবের দারস প্রদান করেন। সর্বশেষ দারসে মাওলিদে বারযানজি অনুষ্ঠিত হয় আল হাবীব জামে মসজিদে। এ দারস ফেসবুকে লাইভ সম্প্রচার করা হয়। ভিডিও ধারণকৃত সে দারস শ্রুতিলিখন ও টীকা সংযোজন করেন মাসউদ আহমদ। সম্পাদনা করেন মো. আবদুল আউয়াল হেলাল। দারসে মাওলিদে বারযানজি গ্রন্থটির শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

এছাড়া বিভিন্ন স্থানে শায়খুল হাদীস ছাহেব প্রদত্ত তাফসীর, দারসে হাদীস এবং বিভিন্ন ওয়াজ শ্রুতিলিখন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে।

হিফযুল কুরআন মাদরাসা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা

২০০০ সালে থানাবাজার লতিফিয়া ফুরকানিয়া মাদরাসা সংলগ্ন স্থানে তিনি জমি ক্রয় করে একটি হিফযুল কুরআন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। হিফযুল কুরআন মাদরাসার জন্য রারাই গ্রামের মরহুম হাজী আবদুর রাহমান ও তাঁর ভাই হাজী আবদুল মান্নান কিছু জমি দান করেন। পরবর্তীতে এ মাদরাসার নামকরণ করা হয় থানাবাজার হাবিবিয়া হিফযুল কুরআন মাদরাসা। ২০১১ সালে তিনি হিফজুল কুরআন মাদরাসার সাথে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

উল্লেখ্য যে, ২০০০ সালে হিফযুল কুরআন মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর তিনি থানাবাজার দাখিল মাদরাসার দুইটি একাডেমিক ভবন, শিক্ষক মিলনায়তন, সুপার ও অফিস

সহকারীর পৃথক অফিস রুম, ছাত্রীদের জন্য পৃথক কমন রুম ও নামাযের কক্ষ নির্মাণ করে দেন।

উল্লেখ্য যে, তাঁর নির্দেশনা এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় লালারগাঁও হাবিবিয়া হাফিযিয়া মাদরাসা (সদর সিলেট), রায়সন্তুষপুর হাবিবিয়া হাফিযিয়া মাদরাসা (ছাতক, সুনামগনজ) ও ভুরকী হাবিবিয়া হাফিযিয়া দাখিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মসজিদ প্রতিষ্ঠা

ইছামতি মাদরাসা মসজিদ

ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদরাসার পশ্চিম দিকের একাডেমিক ভবনের দক্ষিণ পাশে ছোট মসজিদ ছিলো দীর্ঘদিন। মাদরাসা চলাকালীন নামাযের সময় ছাত্র-শিক্ষকগণের স্থান সংকুলান হতো না। এই চাহিদার প্রেক্ষিতে এককভাবে তিনি উদ্যোগী হয়ে গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকায় অবস্থানরত তাঁর ছাত্র এবং শুভাকাঙ্খীদের অনুদানে মাদরাসার পূর্ব দিকে ঈদগাহের জন্য নির্ধারিত স্থানে সুপরিসর মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

থানাবাজার মসজিদ

২০০০ সালে এলাকাবাসী এবং মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকের চাহিদার প্রক্ষিতে তিনি থানাবাজার লতিফিয়া ফুরকানিয়া দাখিল মাদরাসা সংলগ্ন পুরাতন ছোট মসজিদের স্থলে সুপরিসর বৃহৎ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

আল হাবীব জামে মসজিদ

২০১৬ সালে নিজ বাড়ি সংলগ্ন স্থানে নতুন একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এ মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে আল-হাবীব জামে মসজিদ। অসুস্থ হয়ে শয্যাসায়ী হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার বাদ মাগরিব থেকে এই মসজিদে তিনি হাদীস শরীফের দারস প্রদান করেছেন।

আল হাবীব গ্রন্থাগার

২০১৯-২০ সালে আল হাবীব জামে মসজিদের পাশে দ্বিতল বিল্ডিং এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে مكتبة الحبيب আল হাবীব গ্রন্থাগার। মূলতঃ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা আরবী ও উর্দু ভাষার প্রায় পাঁচ হাজার কিতাব নিয়ে এ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রন্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

এই গ্রন্থাগারকে একটি বৃহত গবেষণা কেন্দ্রে রূপদানের স্বপ্ন ছিলো শায়খুল হাদীস ছাহেবের। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে গ্রন্থাগারে বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থাবলী যুক্ত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু বাংলা গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

আল হাবীব ফাউন্ডেশন

২০০০ সালে শায়খুল হাদীস ছাহেবে নির্দেশনায় তাঁর তত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয় আল হাবীব ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় শায়খুল হাদীস ছাহেবের প্রতিষ্ঠিত হিফযুল কুরআন মাদরাসা, এতীমখান, আল হাবীব জামে মসজিদ, আল হাবীব গ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে।

আল হাবীব ফাউন্ডেশন এর প্রকাশনা বিভাগ থেকে শায়খুল হাদীস ছাহেব প্রণীত সকল গ্রন্থ ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে।

এছাড়া শায়খুল হাদীস ছাহেবের চালুকৃত সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন গৃহ নির্মান, অসহায় গরীব মিসকিনদের বিভিন্ন সময় সাহায্য, গরীব ছাত্রদের শিক্ষা উপকরণ প্রদান ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রম আল হাবীব ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছে।

সংসার জীবন

১৯৬৫ সালে শায়খুল হাদীস ছাহেব বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা গ্রামের (বর্তমানে বিয়ানীবাজার পৌরসভাধীন সুপাতলা গ্রামের বাসিন্দা) আলহাজ শফিকুল হক সাহেবের প্রথমা কন্যা মরহুমা আনওয়ারা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

তাঁদের সন্তানগণ হলেন-

১। রুকিয়া বেগম
স্বামী : মাওলানা আবদুস সালাম আল মাদানী
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গোবিন্দ নগর ফাযিল মাদরাসা, ছাতক, সুনামগনজ।

২। মো. আবদুল আউয়াল হেলাল
শিক্ষক, দারুল হাদীস লতিফিয়া, লন্ডন, বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

৩। মো. আবদুর রব বিলাল
যুক্তরাজ্য প্রবাসী।

৪। ছালমা খাতুন
স্বামী : মাওলানা ইমাদ উদ্দিন
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী।

৫। মো. আবদুল বাতিন ফয়সল
ব্যবসায়ী।

৬। মো. আবদুল বাকী খালেদ
গ্রন্থ প্রণেতা।

৭। সায়মা খাতুন
স্বামী : মাওলানা ছালিক আহমদ
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সালিশ ব্যক্তিত্ব।

ইন্তেকাল

৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যা ৬:১৮ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরদিন বাদ যোহর লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর জ্যাষ্ঠ পুত্র মো. আবদুল আউয়াল হেলাল। বাড়ির পাশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আল হাবীব জামে মসজিদ ও আল হাবীব গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

তথ্যসূত্র

১. জালালাবাদের কথা
দেওয়ান নুরুল আনওয়ার হোসেন চৌধুরী
প্রকাশক : বাংলা একাডেমি

২. হাদীস চর্চায় বাংলাদেশী মুহাদ্দিসগণের অবদান
ড. মাওলানা মোরশেদ আলম সালেহী
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

৩. চলমান জালালাবাদ : ইসলামী রেনেসাঁর অনন্য যারা
শায়খ তাজুল ইসলাম আউয়াল মহল্লী

৪. প্রসঙ্গ জকিগন্জ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য
মো : হান্নান মিয়া (সম্পাদক)
প্রকাশক: উপজেলা পরিষদ, জকিগন্জ

৫. জকিগন্জ মনীষা
সম্পাদক : মো. আবদুল আউয়াল হেলাল, অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল হাকীম
প্রকাশক: জকিগন্জ লেখক পরিষদ

৬. জালালাবাদে ইসলামী আন্দোলন
জামায়াত ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা
অধ্যাপক ফজলুর রহমান

৭. আহবাব (সনদ বিতরণ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক ২০০৮)
সম্পাদক : অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুন নূর

৮. আল হাবীব
(শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রথম ইন্তেকাল বার্ষিকী উপলক্ষে নিউজার্সি, আমেরিকা থেকে প্রকাশিত বিশেষ স্মারক)
সম্পাদক : অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুন নূর

কয়েকজন বিশেষব্যক্তির অনুভূতি

أتقرب إلي الله بتعريف عن هذا العلامة

بقلم :فضيلة الشيخ السيد عاصم عدي يحيى حفظه الله، من المدينة المنورة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله القائل في محكم تنزيله : { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ } ....

قال أهل العلم والتفسير ، هو انتقال وفقد العلماء ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما، القائل :(بَلِّغُوا عَنِّي ولو آيَةً)

وقد أكرمني الله بالإجتماع بشيخ الحديث العلامة محمد حبيب الرحمن عليه رحمة الرحيم الحنان المنان ...

فرأيت على قصر نظري ولست ممن يجرؤ على الكلام عن الأكابر من الرجال الكرام أهل العلم والفضل أهل الله ، ولكن رأيت أن أدلو بدلوي وأتقرب إلي الله بتعريف عن هذا العلامة الذي رأيت فيه معنى حديث رسول الله صل الله عليه وآله وصحبه وسلم : (نَضَّرَ اللَّهُ امرَءًا سمعَ مقالتي فأداها كما سمعها ، فربَّ مبلَّغٍ أوعى لَهُ من سامِعٍ) فالشيخ العلامة محمد حبيب الرحمن عليه الرحمة والرضوان كان رحمه الله قليل الكلام إلا في علم وتعليم ونصح وإرشاد محبا لله ورسوله وآل بيته صل الله عليه وآله وسلم حريصا على نفع الأمة وإرشادها رحيما بها

وقد شرفت بزيارته في بيته في بنجلادش ثم بزيارته لي في منزلي كان رحمه الله بشوشا كثير التبسم وقورا محبا لطلبة العلم ومساعدا ومعينا لهم، وله من المؤلفات العلمية الكثيرة التي استفاد منها طلبة العلم في كثير من البلاد، وله يد في التعليم في معاهد وجامعات بنجلادش وكذلك في دار الحديث اللطيفية في لندن بدولة بريطانيا

رحمه الله وأخلفه في أهل بيته وطلابه ومريديه ومحبيه والأمة الإسلامية جميعا بخير، وبارك في أهل بيته وبالأخص إبنه الشيخ محمد عبد الأول الهلال وأحفاده أبناء وبنات وسائر من أخذ عنه وأجازه وأذن له

أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه أعلى فراديس الجنان في جوار حبيبه المصطفى صل الله عليه وآله وصحبه وسلم آمين يارب العالمين

روى الترمذي عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . (سنن الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ، حديث ٧٥٦٢)

وعنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ . ثَلاَثٌ لاَ يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومِ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ " . (سنن الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ، حديث ٨٥٦٢)

ভারত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাবেক প্রেসিডেন্ট, উজানডিহি দরবার শরীফের সম্মানিত পীর ছাহেব

মাওলানা শাহ সুফি সায়্যিদ জুনাইদ আহমদ মাদানী হাফিযাহুল্লাহ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، امابعد

কিয়ামতের সময় ঘনিয়ে এলে আল্লাহ তা'লা ক্রমান্বয়ে ইলম উঠিয়ে নেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور

الرجل، ولكن يقبض العلم بموت العلماء،

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা মানুষের কাছ থেকে এক ঝটকায় ইলম ছিনিয়ে নেবেন না বরং উলামায়ে কিরামের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন।

মুহাদ্দিস ছাহেব হিসেবে সর্ব মহলে খ্যাত শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের সময়ে উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন ইলমে শরীয়তে বেমিছাল ব্যক্তিত্ব ছিলেন ঠিক তেমনি ইলমে ইলমে মা'রিফাতের এক অনন্য খাজানা কামিল মুকাম্মাল ওলী ছিলেন।

সালফে সালিহীন এর পরিপূর্ণ নমুনা হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ইন্তিকালে উপমহাদেশের ইলমি অঙ্গনে যে শুন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পুরণ হবার সম্ভাবনা দেখি না।

আল্লাহ তা'লা তাঁর মাকবুল বান্দাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে আ'লা মাকাম দান করুন। তাঁর রেখে যাওয়া ইলমি খিদমাতের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখুন। আমীন।

জামেয়া ইসলামিয়া ফয়েজে আম মুনশাবাজার মাদরাসার সম্মানিত মুহতামিম

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুক্বাদ্দাস আলী হাফিযাহুল্লাহ

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। আমাদের একে অপরের প্রতি যথেষ্ট মুহাব্বাত ছিলো। দ্বীনি কার্যক্রম আঞ্জাম দিতে গিয়ে তিনি যথেষ্ট ভালোবাসা ও উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। উনার সাথে আমার কিছু ফুরুয়ি মাসয়ালাগত ভিন্নতা থাকলেও কখনো তা বিতর্কের পর্যায়ে পৌঁছায়নি। এসব ক্ষেত্রে তিনি সবসময় সবচাইতে বেশি উদার এবং সহনশীল ছিলেন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস হিসেবে ছিলেন কামিল মাকবুল ও মুখলিস।

মুহাদ্দিস সাহেবের জীবনী স্মারক প্রকাশ হচ্ছে শুনে আমি খুবই আনন্দ প্রকাশ করছি।এ স্মারকের মাধ্যমে এই মক্ববুল অলির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্ম জানার সুযোগ পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিশিষ্ট শিল্পপতি, পূবালী ব্যাংক এর সাবেক চেয়ারম্যান, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সাবেক চেয়ারম্যান, সিলেট ৫ (জকিগনজ-কানাইঘাট) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য

আলহাজ হাফিজ আহমদ মজুমদার

মাওলানা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব আমাদের এলাকার একজন বিখ্যাত ও বিচক্ষণ আলিম ছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো। বিভিন্ন সময় এলাকায় গেলে কোন সময় প্রয়োজনে আর কোন সময় নিছক সৌজন্যতার জন্য তাঁর সাথে দেখা করতাম। তাঁর মাদ্‌রাসা এবং বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি। এমনকি তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেও বাড়িতে গিয়ে শয্যাশায়ী অবস্থায় দেখে এসেছি।

তিনি মানবিক গুণ সম্পন্ন একজন বিনয়ী,ভদ্র এবং মার্জিত রুচির সতর্ক মানুষ ছিলেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে তিনি মূল্যায়ন করতেন। মানুষের সুখ দু:খে পাশে থাকতেন।

তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত একটি স্মারক প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। এরকম মহৎ মানুষের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মকে জানানোর স্বার্থে এ ধরনের প্রকাশনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্মারক প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন।

জামেয়া ইসলামিয়া ফয়জে আম মুনশীবাজার মাদরাসা এর নির্বাহী মুহতামিম

শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মুসাব্বির হাফিযাহুল্লাহ

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। তাঁর সাথে আমার অত্যন্ত মুহাব্বাতের সম্পর্ক ছিলো। অত্যন্ত খলিক্ব এই মহান ব্যক্তির সাথে লন্ডন এবং বাংলাদেশে আমার কিছু মধুর স্মৃতি আছে।

উভয়ের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হলেও একে অন্যের খোঁজ খবর রাখতাম। দেশ জাতি ও ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা বিভিন্ন সময় একসাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইস্যুতে দীর্ঘ মত বিনিময় হয়েছে।

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, খলিক, মুখলিস এবং মাকবুল মুহাদ্দিস ছিলেন। জীবনের দীর্ঘ সময় পবিত্র হাদীস শরীফের খিদমাত করেছেন। আল্লাহ তাঁর কবরকে জান্নাতুল ফিরদাউস হিসেবে কবুল করুন।

মহান এই ব্যক্তির জীবন ও কর্ম কেন্দ্রীক স্মৃতিস্মারক প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। এই প্রকাশনাকে আল্লাহ তা'লা কবুল করুন।

আমার ভাবনায় মুহাদ্দিস ছাহেব

ইকবাল আহমদ তাপাদার

সাবেক চেয়ারম্যান, জকিগনজ উপজেলা পরিষদ।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বিন আরব আমিরাতের সাবেক বিচারপতি ওলিকুল শিরমনী হযরত আল্লামা হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব (রঃ) কে নিয়ে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে দুটি কথা লিখতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। হযরত আল্লামা হাবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব ছিলেন অসাধারণ গুণধর ও বিনয়ী জ্ঞানের ভান্ডার। আমি পৃত্রিতুল্য এই গুণধর মহাপুরুষের কাছ থেকে অনেক স্নেহ ভালোবাসা ও দোয়া পেয়েছি। আমার আব্বা ডাঃ আব্দুল কাদির সাহেবের সাথে মুহাদ্দিস ছাহেবের বন্ধুতৃবপুর্ণ সম্পর্ক ছিলো কিন্তু আমার আব্বা মুহাদ্দিস ছাহেবকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন, আমাদের প্রায় সময় আসতে আল্লাহর এই ওলী, তিনি আমার দাদির জানাজার নামাজ পড়িয়েছেন, তাঁর রেখে যাওয়া গুণধর সন্তানেরা স্বস্ব অবস্থান থেকে ইসলামের খেদমত করে আসছেন। আমি মনে করি মুহাদৃ

স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন

শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান (র.):
গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলিমে দ্বীন

অধ্যক্ষ আল্লামা মো. নজমুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা হবিবুর রহমান (মুহাদ্দিস ছাহেব) এর ছোট ছেলে আমার স্নেহভাজন খালেদ আমাকে বললেন যে, মুহাদ্দিস ছাহেবের জীবন ও কর্মের উপর একটি স্মারক বের করা হচ্ছে। এতে আমি যেন একটি লেখা দেই। আমারও মনে হলো, এই মনীষীর সাথে দীর্ঘদিন একসাথে উঠাবসা করেছি, দেশে ও বিদেশে সফর করেছি বিধায় অনেক স্মৃতিকথা হৃদয়পটে জমা হয়ে আছে, এর কিছুটা লিখি। কিন্তু ব্যস্ততাহেতু জানা সত্ত্বেও বিশেষ কিছু লেখা সম্ভব হলো না। অতি অল্প স্মৃতিকথা এখানে উল্লেখ করলাম। শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা হবিবুর রহমান (র.) ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও জ্ঞানের অন্বেষায় সদা সচেষ্ট আলিমে বা-আমল, মুত্তাকী ও মুরশিদের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর ঘরোয়া বৈঠকের আলোপ-আলোচনার এক বিরাট অংশই থাকতো তাঁর মুরশিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর কথা। মুরশিদের প্রতি কত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা যে তাঁর হৃদয়ে জমা ছিল তা আল্লাহই ভালো জানেন। তাঁকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এমন একজন মুরশিদ পেয়েছি, যার কাছে ইলমে হাদীস, ইলমে কিরাত, ইলমে তাসাওউফ একত্রে জমা হয়েছে এবং যার আখলাক একান্তভাবে অনুসরণীয়। তিনি বলেন, একবার আমি কয়েকজন সঙ্গীসহ ফুলতলী গেলাম। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) আমাদের খেতে বসালেন। আমি তখন বাতরোগে আক্রান্ত। বাতের প্রকোপে আমার উভয় হাতের তালু ফেটে গেছে। ছাহেব কিবলাহ আমার পাতে অনেক টুকরো গরুর ভূনা গোশত তুলে দিলেন। আমার কাছে তখন গরুর গোশত বিষবৎ ত্যাজ্য। পাশের মৌলানা সাহেব বললেন, আরে সর্বনাশ! আমি কিন্তু সবটুকু গোশত খেয়ে ফেললাম। সেদিন থেকে আমার অসুখ কমতে লাগলো। আমি আল্লাহর দয়ায় ভালো হয়ে গেলাম।

ডাক্তার কহিলেন
গো-মাংস বিষবৎ ত্যাজ্য
আজিকে শুধুই
গো-মাংস আমার ভোজ্য।
বন্ধু কহে- থামো তুমি
এ যে সর্বনাশ!
আমি বলি- এতেই হবে মোর
অসুখ নাশ।

(ছন্দোবদ্ধ পংক্তিগুলো লেখকের নিজস্ব)

১৯৭০ সালে কামিল পরীক্ষার পর কিছুদিন আমি সৎপুর কামিল মাদরাসায় শিক্ষকতা (অবৈতনিক) করেছিলাম। এসময় তিনি সৎপুর মাদরাসার মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি মাদরাসার দ্বিতল গৃহের দক্ষিণ দিকের একটি কামরায় থাকতেন। যতবার তাঁর কামরায় গিয়েছি তাঁকে গভীর মনযোগ সহকারে কিতাব পড়তে দেখেছি। সারাজীবনই তিনি যেমন দক্ষতার সাথে হাদীসের দারস দিয়েছেন তেমনি নিষ্ঠার সাথে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি অতি উঁচুমানের একজন চিন্তাবিদ ও ভাবুক ছিলেন। আমাদের কালে গুলিস্তা, বোস্তা, ফরীদুদ্দীন আত্তার ইত্যাদি কিতাব পাঠ্য তালিকায় ছিল। আমরা ফার্সি পড়েছি কিন্তু তিনি আমাদের চাইতে বয়সে প্রবীণ এবং তাঁর শিক্ষাজীবনও আমাদের আগে বিধায় ফারসী ভাষা আমাদের চাইতে তিনি অনেক বেশি জানতেন। অনেক সময় ফার্সী কবিতার দার্শনিক ব্যাখ্যা ও ভাবরস তাঁর নিকট থেকে লাভ করেছি। তাঁর মধ্যে ইলমের সাথে ভাবরসের সংমিশ্রণ ছিল। আর ইলমের সাথে ভাবরসের সংমিশ্রণ মানুষের অন্তরকে সজীব করে।

১৯৭৮ সালে আমার বাবার সাথে হজ্জ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন তিনিও আমাদের সাথে ছিলেন। এছাড়া আরো কয়েকবার হজ্জ ও ওমরা সফরের সময় আমরা একসাথে ছিলাম। এসব সফরের পুণ্যস্মৃতি হৃদয়পটে জমা আছে। তিনি ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর একান্ত স্নেহভাজন ও খলীফা ছিলেন বিধায় আমাদের সাথে সবসময় তাঁর স্নেহ-মমতা ও আন্তরিকতা ছিল আমাদের যোগ্যতা ও প্রাপ্যতার উর্ধ্বে।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে দীর্ঘ হায়াত দান করেছিলেন। এ দীর্ঘ সময় তিনি সৎপুর কামিল মাদরাসা, ইছামতি কামিল মাদরাসায় হাদীসের খিদমত করেছেন। ইছামতি কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসরে যাওয়ার পরও পার্টটাইম মাদরাসায় হাদীসের দারস প্রদান করেছেন। শেষ বয়সে ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত নিজ বাড়িতে হাদীসের দারস দিয়েছেন। তিনি ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর কাছে যথারীতি কিরাত শিক্ষা করেছেন এবং আজীবন দারুল কিরাতের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি সারাজীবন মানুষের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করেছেন। এর মাধ্যমে জনসাধারণ যেমন হিদায়াতের পথনির্দেশনা পেয়েছে তেমনি শিক্ষিত সমাজও এ মনীষীর জ্ঞানগর্ভ অকৃত্রিম বয়ানে উপকৃত হয়েছে। আল্লাহ তাঁর সকল নেক খিদমাত কবূল করুন এবং এর ধারা কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখুন। আমীন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বাদেদওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা,সিলেট।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন আমাদের অন্যতম শ্রদ্ধেয় আকাবির, প্রিয় রাহবার। বিশাল কর্মময় এক দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে তিনি ২০২২ সনের ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে পাড়ি জমান পরপারে। লক্ষ মানুষ সেদিন অশ্রুসজল নয়নে শেষ বিদায় জানায় প্রিয় এই রাহবারকে। মানুষ অনেক স্মৃতি পেছনে রেখে যায় নিজ নিজ সাফল্যের ক্ষেত্রে। এর মধ্যে দ্বীন দুনিয়ার সাফল্য নিয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট পৌঁছা সবচেয়ে কঠিন ও প্রকৃত কামিয়াবী। এই প্রকৃত বিষয়টি অনেকে জেনেও না জানার ব্যর্থতা নিয়ে পাড়ি জমান আখিরাতে। জ্ঞানের অভাবই এই ব্যর্থতার মূল কারণ। এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ছিলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ প্রকৃত অর্থে একজন জ্ঞানী, গুণী, আমলী, আখলাকী, আদর্শবান, মুখলিস ও মুত্তাকী ছিলেন। তাঁর জাগ্রত মেধা, বিবেক ও সতর্কতার কারণে তিনি জীবনের প্রতিটি স্তরে যেমন শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তেমনি দ্বীন ও দ্বীনি শিক্ষার জগতে এক আলোকবর্তিকা ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণে সজাগ ও সফল তাঁর এই বর্ণাঢ্য জীবন নিজের জন্যই কেবল সাফল্য ছিল না; তিনি লক্ষ লক্ষ দ্বীনদার মানুষের আদর্শও ছিলেন নিঃসন্দেহে। তিনি হাদীসে নববীর খিদমতে বিশেষ অবদানের জন্য শায়খুল হাদীস বা মুহাদ্দিস হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসুল, ইলমুল কিরাত, আরবী সাহিত্য, সীরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সীরাতে সাহাবা, সীরাতে আউলিয়া ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাঁর পাণ্ডিত্য শীর্ষস্থানীয় ছিল। ইলমে তাসাওউফের চর্চা, ইলমে হাদীস ও ইলমে দ্বীনের তা'লিম-তরবিয়ত দানে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। তিনি হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর মুরীদ ও খলিফা-ই কেবল ছিলেন না; ছিলেন নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি। যিকির, মোরাকাবা, চিল্লা-খিলওয়াতসহ সবধরণের রিয়াযত-মেহনতে পরিপূর্ণ ছিল তাঁর জীবন। হজ্জ ও উমরাহ ছাড়াও ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ভ্রমণ এমনকি দুবাই-এ সরকারী চাকুরীও বাদ যায়নি তাঁর জীবনে। প্রতিষ্ঠান গড়া, পরিচালনা, শিক্ষকতা, দারস প্রদান, ওয়াজ মাহফিল, খানেকা পরিচালনা, যাহেরী-বাতেনী চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়াসহ মানুষের কল্যাণকামিতায় তিনি ছিলেন অগ্রণী। আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য প্রিয় নবীর সুন্নাত পালনে সর্বদা ছিলেন নিবেদিত।

মা-বাবা, প্রিয় মুর্শিদ, উস্তাযগণ, সকল সম্মানী মুরব্বীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধের অভাব ছিল না তাঁর মধ্যে। একইভাবে আলিম উলামা, সহপাঠি, শাগরিদবৃন্দসহ সকল ছোটদের প্রতি তাঁর স্নেহ মমতা ছিল নজরকাড়া। প্রিয় নবীজির এই আশিক চাল-চলন, আচার-আচরণ, কথা-বার্তায় সর্বদা সুন্নতে নববীর আদর্শ ধারণ করে চলতেন সতর্কতার সাথে। মিষ্টভাষী, সদালাপী, কোমল, নিরহংকারী এই মনীষী জ্ঞানের গভীর ভাণ্ডার হওয়া সত্ত্বেও অকারণে তর্কে জড়ানো বা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা পছন্দ করতেন না। যখন যা বলতেন, যা করতেন অত্যন্ত চিন্তা ভাবনা করেই করতেন। ফলে কেবল আলিম ওলামাই নয়; সর্বসাধারণের নিকট তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। নীতি বাক্য দিয়ে নীতিজ্ঞান কীভাবে প্রচার করতে হয় তা তিনি জানতেন। আদর্শবান এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এই বুযুর্গ নীতির প্রশ্নে সর্বদা ছিলেন আপোষহীন। দ্বীন প্রচার, দ্বীনি আন্দোলন ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের ত্যাগী জীবন ছিল তাঁর। প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে মুরশিদে বরহক হযরত আল্লামা ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত সহীহ ঈমান-আকীদা, তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি, এশায়াতে দ্বীন ও খিদমতে খালক এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন আনজুমানে আল ইসলাহ এর সভাপতির মহান ও শীর্ষ দায়িত্ব পালন করেন। সাহসী ও সঠিক নেতৃত্বগুণ ছিল তাঁর মাঝে। দুই-দুই বার জাতীয় সংসদ নিবার্চনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছিলেন।

সবমিলে আল্লাহ তায়ালার খাঁটি বান্দা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আশিক ওয়ারিস, পীর ও মুরশিদের বিশ্বস্ত ও স্নেহভাজন খলীফা, পরিবারের স্নেহশীল অভিভাবক, শাগরিদগণের আর্দশ উস্তায, আল্লাহর নৈকট্য লাভে মুরীদানের আশ্রয়স্থল, সর্ব সাধারণের বিশ্বস্ততার মানুষ ছিলেন আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ। তিনি এই দুনিয়ার সফর শেষ করে মাওলার দরবারে চলে গেলেও সর্বস্তরে রয়েছে তাঁর স্মৃতি অম্লান।

পরিশেষে বলতে হয়, কোনো লেখা বা স্মারকগ্রন্থে তাঁর পরিচয় যথাযথ তুলে ধরা সম্ভব নয়; তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রমী প্রতিভার অধিকারী আল্লাহর মকবুল ওলী। দয়াময়ের নিকট ফরিয়াদ করি তিনি তাঁর বান্দাকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমাদেরকে এই পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করুন।

লেখক: সংসদ সদস্য, সিলেট-০৫ (জকিগন্জ-কানাইঘাট); সভাপতি, বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ; বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

বন্ধুবর সহপাঠী
শায়খুল হাদীস মাওলানা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

অধ্যক্ষ মাওলানা বশীরুদ্দীন আহমদ চৌধুরী

১৯৫৪ ইসায়ী সনের জুলাই মাসের ৫ তারিখ আমি গাছবাড়ি জামিউল উলূম কামিল মাদ্‌রাসায় গিয়ে তখনকার আলিয়া চাহারম জামাতে ভর্তি হই। আমার ভর্তির মাত্র এক সপ্তাহ আগে আমার বন্ধু ও সহপাঠী শায়খুল হাদীস মাওলানা মো. হবিবুর রহমান সাহেব রাহিমাহুল্লাহও গাছবাড়ি মাদ্‌রাসার আলিয়া চাহারম জামাতে ভর্তি হন। তখন তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। তখন থেকে ১৯৫৯ ঈসায়ী সনে কামিল ফাইন্যাল পরীক্ষা পর্যন্ত একসাথে লেখা পড়া ও চলাফেরা করি। গাছবাড়ি থেকে বাড়িতে যাওয়ার সময় এক সাথেই যেতাম। তখনকার সময় গাড়ি না থাকায় হেঁটে হেঁটে বাড়ি যেতে হতো। দু'জনের লজিংও পাশাপাশি থাকায় সর্বদা একসাথে মাদ্‌রাসায় যাওয়া আসা করতাম ও লেখাপড়ায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকতাম।

১৯৫৫ ঈসায়ী সনে আমরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা বকশি বাজারে অবস্থিত মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম ফাইন্যাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। ঐ পরীক্ষায় বৃহত্তর সিলেট জেলা থেকে মাত্র ০৪ জন প্রথম বিভাগে পাশ করেন। একজন সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে, একজন ঝিংগাবাড়ি ফাজিল মাদ্‌রাসা হতে এবং দুই জন গাছবাড়ি জামিউল উলূম কামিল মাদ্‌রাসা হতে। উক্ত পরীক্ষায় মরহুম মাওলানা মো. হবিবুর রহমান সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করেন। আমি ঐ পরীক্ষায় স্টাইপেন্ডসহ ১ম বিভাগে পাশ করি।

১৯৫৭ ঈসায়ী সনে মাদরারাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ফাজিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে সিলেট জেলা হতে দুইজন প্রথম বিভাগে পাশ করেন। এ দু'জনই গাছবাড়ি জামিউল উলূম কামিল মাদ্‌রাসার ছাত্র ছিলেন। একজন মাওলানা মো. হাবিবুর রহমান রহ. ও অপর জন আমি অধম। বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় মরহুম মাওলানা মো. হবিবুর রহমান তৃতীয় স্থান লাভ করে ১ম বিভাগে পাশ করেন। আমিও উক্ত ফাজিল পরীক্ষায় ১৬তম স্থান লাভ করে ১ম বিভাগে পাশ করি।

১৯৫৯ ঈসায়ী সনে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত কামিল হাদীস বিভাগের পরীক্ষায় গাছবাড়ি জামিউল উলূম কামিল মাদ্‌রাসা হতে তিন জন ১ম শ্রেণিতে পাশ করেন। মরহুম মাওলানা মো. হবিবুর রহমান ঐ পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করে ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ২য় জন মরহুম মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব ও ৩য় জন মরহুম মাওলানা এফাজ উদ্দিন সাহেব। আমি ঐ কামিল হাদীস পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে পাশ করি।

কামিল ক্লাসে পড়ার সময় তিনি ও আমি একসাথে উস্তাযজীর পাশে বসতাম। ১৯৫৮ ঈসায়ী সন হতে ১৯৫৯ ঈসায়ী সন পর্যন্ত সকাল দশ ঘটিকা হতে রাত নয় ঘটিকা পর্যন্ত আমাদের হাদীসের ক্লাস চালু থাকতো। এ দু'বছর দুপুরে খাওয়ার সময় আমাদের উস্তায শায়খুল হাদীস মরহুম মাওলানা শফীকুল হক বুলবুল (রহ.) আমরা উভয়কে তাঁর রুমে নিতেন। আমরা তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতাম। শ্রদ্ধেয় উস্তায আমাদের খাওয়ার জন্য টিফিনে সামান্য খানা রাখতেন এবং বলতেন, তোমরা উভয়ে তা খেয়ে নাও। এভাবে দু'বছর যাবৎ আমরা উভয়ে তাঁর রেখে দেয়া অবশিষ্ট খাবার খেতাম। কামিল ক্লাসে পড়ার সময় শ্রদ্ধেয় ওস্তাযদী বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজে যেতেন। প্রত্যেক ওয়াজে যাবার সময় আমরা উভয় ছাড়া ক্লাসের অন্য কাউকে সঙ্গে নিতেন না। এভাবেই আমি ও আমার সহপাঠী মরহুম মাওলানা মো. হবিবুর রহমান সাহেব কামিল জামাতের লেখাপড়া সমাপ্ত করি।

ছাত্র জীবনে দু'জনের মধ্যে খুবই আন্তরিকতা থাকায় স্বপ্নেও দু'জন কেন্দ্রিক গুরুত্বপূর্ণ একটি স্বপ্ন দেখি কামিল আউওয়াল জামাতে পড়ার সময়। হঠাৎ একদিন রাতে স্বপ্ন দেখি, আমি ও মরহুম মাওলানা মো. হবিবুর রহমান কানাইঘাটের নন্দিরাই গ্রামের পূর্বমূখী রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। রাস্তার উত্তর পাশে দড়পড়ি নদী। নদীর এপার থেকে ঐ পারে বড় একটি চাউর গাছ ফেলা। আমি ঐ চাউর গাছ দিয়ে সে পারে চলে যাই। আর তিনি পূর্বমূখী রাস্তা দিয়ে অনেক দূর চলে গেলেন। তখন মাদ্‌রাসার শিক্ষক নারাইনপুর নিবাসী তাবলীগ জামাতের আমীর মাওলানা হরমুয উল্লাহ সাহেব স্বপ্নের তা'বীর ব্যাপারে খুবই জ্ঞানী ছিলেন। আমি স্বপ্নটির তা'বীর জানার জন্য তাঁর কাছে যাই এবং স্বপ্নটির তা'বীর জানতে চাই। তিনি বললেন, তোমরা দু'জনের মাসলাক ভিন্ন ভিন্ন হবে। বাস্তবেও তাই হয়েছে।

আমার ও তাঁর শ্রদ্ধেয় উস্তায ছিলেন বিয়ানীবাজারের জিড়খাই গ্রামের মাওলানা কমর উদ্দিন সাহেব রহ.। ১৯৫৯ ঈসায়ী সনে কামিল পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে তিনি ইছমতি মাদ্‌রাসার পরীক্ষার্থীদেরকে নিয়ে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসায় এসেছিলেন। পরীক্ষার হলেই তিনি আমাকে বললেন, পরীক্ষার পরে আমার সাথে দেখা করবে। পরীক্ষা পরে দেখা করলে তিনি আমাকে ইছামতি মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করার প্রস্তাব দেন। পরবর্তীতে আমি যেদিন ইছামতি মাদ্‌রাসায় যাই সেখানে গিয়ে মাওলানা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহকেও দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম তাঁকেও ইছামতি মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার জন্য ডাকা হয়েছে। তিনি তখন মারাত্মক চর্ম রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর তখন চিকিৎসা করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই অসুবিধায় তিনি অপারগতা প্রকাশ করে চলে গেলেন। আমাকে উস্তায সাহেবগণ জোর করে কামিল হাদীস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকতায় তাঁদের সহযোগিতা করার জন্য বাধ্য করলেন।

আমি তাঁদের আদেশ অমান্য করতে না পেরে কর্মজীবনের প্রথম ইছামতি মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা শুরু করি।

এর মাত্র ০১ মাস ১৩ দিন পর গাছবাড়ি কামিল মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করার জন্য প্রিন্সিপাল সাহেবের নিকট থেকে আমার কাছে একটি পত্র আসে। সম্ভবতঃ তাঁর কাছেও পত্র এসেছিল প্রিন্সিপাল সাহেবের নিকট থেকে গাছবাড়ি কামিল মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করার জন্য। তাই আমি গাছবাড়ি চলে যাই। সেখানে গিয়েও মাওলানা মো. হবিবুর রহমান সাহেবকে দেখতে পাই। বুঝতে পারলাম তাকেও ঐ মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার জন্য ডাকা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ আমাকে শিক্ষক হিসেবে মনোনীত করলেন। আর তাঁকে পরে জানাবেন বলে বিদায় দিয়ে দিলেন। ফলে আমি গাছবাড়ি মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা শুরু করি আর তিনি ইছামতি মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা শুরু করলেন। পরবর্তীতে আমি গাছবাড়ি মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস ও অধ্যক্ষ পদে আসীন হই।

আর তিনি ১৯৫৯ ঈসায়ী সনে কামিল পাশ করার পরপরই ইছামতি দারুল উলূম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় সহকারী মৌলভী পদে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালের ১০ই এপ্রিল সিলেটের প্রাচীনতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ঐ মাদ্‌রাসায় তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, কাজির বাজার জামেয়া মাদানিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ও শায়খ আল্লামা ইসহাক আল মাদানী। এর পর পশ্চিম সিলেটের বিশ্বনাথ থানার সৎপুর মাদ্‌রাসায় কামিল জামাত খোলার জন্য মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামীম হযরত মাওলানা গোলাম হোসাইন (রহ.) চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। কিন্তু কামিল জামাতে হাদীস পড়ানোর উপযুক্ত উদ্ভায না পাওয়ায় হযরত মাওলানা ফুলতলী (রহ.) এর শরনাপন্ন হলে তিনি তখনকার তরুণ আলিম হযরত মাওলানা মো. হবিবুর রহমান সাহেবকে শায়খুল হাদীস হিসেবে প্রেরণ করেন ১৯৬৩ ঈসায়ী সনে। উক্ত মাদ্‌রাসায় তিনি সুদীর্ঘ এগারো বছর যাবৎ শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এরপর ১৯৮২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ইছমতি মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হওয়াতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইছামতি মাদ্‌রাসা পূর্ব সিলেটের শ্রেষ্ঠতম ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। তাঁরই একক প্রচেষ্টায় মাদ্‌রাসার অবকাঠামোগত অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়। মাদ্‌রাসা বোর্ড হতে মাদ্‌রাসাটির ফাজিল ও কামিল ক্লাসের মঞ্জুরী ও স্বীকৃতি আনয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মাদ্‌রাসার বিল্ডিং এবং সুবিশাল মসজিদ তাঁর নীরব সাধনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি উক্ত মাদ্‌রাসার প্রধান

পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী, সুমিষ্টভাষী ও বিনয়ী এবং আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী। আমরা দু'জনের প্রায়ই সাক্ষাৎ হতো। আমরা সর্বদা একজন আরেকজনের খরব নিতাম। শেষ জীবনে তিনি অনেকদিন যাবৎ খুবই অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতার সময় তাঁকে মাঝে মধ্যে দেখতে যেতাম ও ছাত্র জীবনের বিভিন্ন স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করতাম।

তিনি ২০২২ ঈসায়ী সনের ৭ ফেব্রুয়ারি রোজ সোমবার সন্ধ্যা ৬.১০ ঘটিকায় আপনজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মহান আল্লাহর দরবারে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم اعذه من عذاب القبر و عذاب النار اللهم لقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياه بالماء الثلج و البرد اللهم ادخل روحه في مقعد صدق عند مليك مقتدر و اجعل الجنة الفردوس مثواه و ما واه

লেখক: মুহাদ্দিস ছাহেবের একমাত্র জীবিত সহপাঠী; অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ- গাছবাড়ি জামিউল উলূম কামিল মাদ্‌রাসা, কানাইঘাট, সিলেট।

স্মৃতি-বিস্মৃতির কতকথা

কালাম আজাদ

তিনি আমার মুর্শিদ ছিলেন। বলছি মুহাদ্দিস ছাহেব হিসেবে খ্যাত শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র কথা। আজ পচাত্তরোর্ধ স্মৃতি বিভ্রান্ত জীবনে এসে তাঁর কথা গুছিয়ে লেখা বা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সম্পাদক মহোদয়কে অনুরোধ আমার কথাগুলোকে যৌক্তিক শুদ্ধতায় আপনার ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে দেবেন।

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ হলেন শামসুল উলামা (জ্ঞানীদের সূর্য)। আমি উনার প্রতিবেশী। সূর্য বলয়ের নিকটে থাকলে স্বভাবত অন্য গ্রহ নক্ষত্র গুলোকে ছোট মনে হয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বিষয়টা ভিন্ন। ছাহেব কিবলাহ তো ছাহেব কিবলা। কিন্তু আলিম হিসেবে বাপ-চাচাদের মুখে মুহাদ্দিস ছাহেবের প্রশংসা শুনে শুনে বড় হয়েছি। হুজুর যখন গাছবাড়ি মাদ্‌রাসার ছাত্র, তখন থেকেই বিভিন্ন মুনাযিরায় অংশগ্রহণ, ইলমী পন্ডিতদের সাথে তর্ক-বিতর্কে স্বনামধন্য ছিলেন। পরবর্তীতে ফুলতলী ছাহেবের মত মানুষ যাকে 'ছাব' শব্দ যুক্ত করে 'মুহাদ্দিস ছাব' অভিধায় ডাকতেন। এক পর্যায়ে ছাহেব কিবলাহ আমাকে প্রায় বলতেন 'মুহাদ্দিস ছাহেবের নিকট যাবে, বসবে'। হুজুর সম্পর্কে এই ধরনের স্তুতি বাক্য শুনে শুনেই আমাদের বেড়ে ওঠা। সত্তর বছরের বেশি জীবনে দেখা পুরো জকিগন্‌জের মধ্যে এরকম মেধাবী দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না এবং এখনো নেই বলেই আমার বিশ্বাস।

ইছামতি মাদ্‌রাসায় কর্মের সুবাধে হুজুরের সাথে আমার প্রথম পরিচয়ের সুযোগ হয়। আমরা তখন ছাত্রজীবনের উন্মাতাল সময় পার করছি। আমার মত জেনারেল পড়ুয়া কিশোরের কাছে তখন মাওলানা মওদুদীর চিন্তাধারা ব্যাপক প্রভাবক ছিল। আমি প্রায়ই হুজুরকে মাওলানা মওদুদী সাহেবের বই নিয়ে প্রশ্ন এবং যুক্তি তর্কের অবতারণা করতাম। ভিন্ন মতের সমালোচনায় তাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পেত। সমালোচনা করেও তাঁর মতামত থাকত সর্বজন গৃহীত। ব্যক্তিগত আক্রমণ নয় বরং পারস্পরিক সম্মানপূর্বক ক্রিটিকাল আলোচনায় তাঁর জুড়ি ছিল না। সর্বক্ষেত্রে বেনজীর ব্যক্তি ছিলেন আমার হুজুর। কখনো তাঁর মুখে কারও নিন্দা শুনিনি, আর অন্যের মুখেও তাঁর নিন্দা কর্ণগোচর হয়নি।

কোন মানুষই সর্বজ্ঞ নয়। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর যখন দেখতেন কোন বিষয়ে তাঁর রায় প্রকাশ জরুরী নয় তখন তাঁর অভ্যাস ছিল 'অমুক কিতাব পড়েন সমাধান পেয়ে যাবেন'। অর্থাৎ, নিজের রায় কিতাবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতেন। এটা হল জ্ঞানীর স্বভাব।

আমার মত অগভীর হলে কিতাব দেখিয়ে হয়তো বলতো 'এই নেন দলীল চোখ নাই আপনার?'

প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক সাহেব ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক; নিজের লেখা বইপত্র একেবারেই নেই। তাঁর শিষ্য আহমদ ছফা তাঁকে নিয়ে লিখেছিলেন 'যদ্যপি আমার গুরু'। বহু জ্ঞানীগুণী লোকজন ওনার তত্ত্বাবধানে পিএইচডি করেছেন। ওনার অভ্যাস ছিল, উনি কেবল গল্প করতেন ছাত্রদের সাথে। তাদের হাতে বইয়ের ফিরিস্তি ধরিয়ে দিতেন, আলোচনা করতেন। এভাবে পিএইচডি গবেষক তৈরি করেছিলেন তিনি। কথা বলতেন আঞ্চলিক ভাষায়, 'শুদ্ধ' ভাষাকে 'বানানো' ভাষা সাব্যস্ত করতেন। একইভাবে মুহাদ্দিস ছাহেবের গল্পজুড়ে লেগে থাকতো কিতাবাদির নাম তালিকা ইত্যাদি। আমাদের শিক্ষিত এলিটরা কাজ করেন একটা শ্রেণীর জন্য। মাটির বা শিকড়ের সাথে আমাদের নূন্যতম সম্পর্ক নেই। আমাদের শিক্ষা আমাদেরকে মাটি থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছে। অথচ আমার হুজুর (মুহাদ্দিস ছাহেব) কোনো একটা শ্রেণীর জন্য কাজ করেননি। একই সময়ে কাজ করেছেন সকল শ্রেণীর সাথে। একদিকে কৃষক, দিনমজুর থেকে শুরু করে সাধারণ শিক্ষিতদের জন্য ছিল পরম যত্নে হাড়কাপানো শীতের রাতের ওয়াজ মাহফিল। আমজনতার সামনে অভিনব সহজ ভাষায় পেশ করতেন নবীজীর সিরাত। আবার, আলেম উলামাদের জন্য ছিল মসজিদভিত্তিক দারসে বুখারীর মত ইলমের গভীর পাঠের মজলিস। এর পাশাপাশি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক ও আইন পেশায় জড়িত উকিল, বিচারপতিগণের সাথে ছিল তাঁর দারুণ পর্যালোচনামূলক বৈঠক।

আশির দশকের গোড়ার দিকে ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে আসরের নামাযের পর দারসে বুখারী অনুষ্ঠিত হত। তখন উনারা একটা স্মারকও বের করেছিলেন। আমার ধারণা ছিল বিশ-ত্রিশ জন আলিম উলামার খুসুসী এক সম্মেলন হবে হয়তো। কিন্তু দেখা গেল ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে প্রত্যেক শ্রেণি পেশার মানুষের অংশগ্রহণে একটা মহাসমাবেশে পরিণত হল সে দারস।

আমি ইসলামী ইতিহাস তখন বুঝতাম না। মোটাদাগে আমাদের দেশে যে ইতিহাস পড়ানো হয় সেটা 'মুসলমান শাসকদের ইতিহাস'। কোথাও কোন জায়গায় ইসলামী ইতিহাসের মূলধারার সোর্স কিতাবগুলোর কোন প্রামানিক উদাহরণ দেশীয় কিতাবগুলোতে পাওয়া দুষ্কর। পিকে হিট্টি, আমির আলীময় এই ইতিহাসগুলোকে আর যাই বলা হোক না কেন ইসলামী ইতিহাস বলা যাবে না। আমি এই দারসে হাজির হয়ে ইসলামী ইতিহাস শিখলাম এবং এটা অনুভব করলাম- হাদীস শাস্ত্র ব্যতীত 'তারিখে ইসলাম' বা ইসলামের ইতিহাস হতে পারে না, বরং 'মুসলমানদের ইতিহাস' বা 'মুসলমান শাসকদের ইতিহাস' হতে পারে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে বুখারী শরীফের মত আগাগোড়া ইলমী কিতাবের প্রভাব যে এত

সুদূর প্রসারী হতে পারে তা আমি তখনই টের পেতে শুরু করি। ফেঞ্চুগঞ্জ ঘিলাছড়ার একজন সৈয়দ সাহেব ছিলেন। হুজুরের দারসে বুখারীতে শরীক হওয়ার জন্য তিনি যোহরের পর থেকেই মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হতেন। একবার বৃষ্টির কারণে হুজুর সিদ্ধান্ত নিলেন আজকে দারসে যাবেন না। ফোনের যুগ ছিল না তাই এটা তড়িত জানানোর পদ্ধতি নেই। কিন্তু পরমুহুর্তেই সিদ্ধান্ত বদলে দারসে হাজিরির উদ্দেশ্য যাত্রা করলেন। দারস শেষে ঘরোয়া পরিবেশে সৈয়দ সাহেবকে বললেন. 'উপস্থিত হবার নিয়ত ছিল না। কিন্তু মদিনাওয়ালা জানালেন আপনি অপেক্ষমান, তাই আর বিলম্ব না করেই দারসে চলে এসেছি'।

ওলী আল্লাহ কে জানেন? যার দিকে তাকালে আল্লাহ এবং রাসুলে পাকের ইয়াদ হয়। 'আমার হুজুরের' দিকে তাকালে আমাদের আল্লাহ পাকের কথা স্মরণে আসত, আল্লাহর রাসূলের ইশক মনের গহীনে উকি দিত।

একবার ফেঞ্চুগনজ মোহাম্মাদীয়া মাদ্‌রাসার এক অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছেন,তখন শিক্ষকদের বলেছিলেন, "আমি শিক্ষকদেরকে গাভীর সাথে তুলনা করি। গাভী রাত্রে ওলানে দুধ জমায় এবং সকালে অস্থির হয়ে যায় বাচ্চার মুখে বাট তুলে দেওয়ার জন্য। আপনারা শিক্ষকগণও রাত্রে জ্ঞানের সমুদ্র চষে মুক্তামালা জমিয়ে রাখবেন, দেখবেন সকাল হতে না হতেই ছাত্রদের বুকে এই মণি মাণিক্য ভরে দেওয়ার জন্য অস্থিরতা আপনাকে পেয়ে বসবে।' যদি কোন শিক্ষকের মাঝে জ্ঞান বিতরণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি না হয় তবে সেটা কোন জ্ঞানই নয়।

আমি শিংগাইকুড়ি ছাহেবের নিকট মুরিদ হলেও তাঁর ইন্তেকালের পর মুহাদ্দিস ছাহেবের হাতে বায়াত হই। যদিও হুজুরের নিকট বায়াতের আবদার করলে হুজুর ছাহেব কিবলার অনুমতির জন্য সময় নেন এবং ছাহেব কিবলার অনুমতিতে মুহাদ্দিস ছাহেবের নিকট আমি বায়াত হই। আমার হুজুর যখন কর্মসূত্রে আরব আমিরাতে চলে যান তখন শিংগাইকুড়ী ছাব প্রায়ই আফসোস করতেন আর বলতেন, 'মুহাদ্দিস ছাবের মত মানুষ টাকা পয়সার জন্য যদি আরবে চলে যান তাহলে এতদঞ্চলে ইলমের খেদমত কে করবে? আর ফুলতলী ছাহেবও কীভাবে এতে সম্মতি দিলেন'? প্রকৃতপক্ষে শিংগাইকুড়ী ছাব আলেমদের রুটি রুজির জন্য মধ্যপ্রাচ্যে গমন করাকে খুব অপছন্দ করতেন এবং এই অপরাধে তাঁর বড় ছেলের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

আমাদের সময়ে আলেম সমাজ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় উদাসীন ছিলেন। কিন্তু হুজুর ছিলেন রাজনীতি সচেতন এবং সক্রিয়ভাবে প্রয়োজন মোতাবেক রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিত্ব।

আমি তিন মহীরুহ যেমন- আমার আব্বা মরহুম, ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ এবং শিংগাইকুড়ী ছাহেবের মুখ থেকে মুহাদ্দিস ছাহেবের এত প্রশংসা শুনেছি যাতে করে

সহজেই যৌবনে তাঁর প্রতি অস্বাভাবিক ভাবে ঝুকে পড়েছিলাম। একসময় মানসিক বিপ্লব আমাকে পেয়ে বসেছিল এবং চাকুরী বাকুরী, সামাজিক জীবন থেকে হতাশ হয়ে তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম- 'আপনার দরবারে আমাকে কবুল করুন, আমার বাকি জীবন আপনার পদতলে খাদেম হিসেবে সুযোগ করে দিন, আমার গর্দান আপনার কদমে মঞ্জুর করুন'। হুজুর তখন আমাকে চিঠির জবাব না দিয়ে সরাসরি সাক্ষাতে শুধু এটা বলেছিলেন, 'আল্লাহপাক যার নিকট থেকে যতটুকু প্রয়োজন খেদমত নেওয়ার তাই নেবেন, বেশিও কেউ পারবে না আবার কমও না'। ব্যাস এতটুকুতেই আমার আত্মা প্রশান্তিতে ভরে যায়।

ছাহেব কিবলাহ আমাকে বলতেন, 'সারাজীবন নাফতর কাম করলায়, এখন মুহাদ্দিস ছাবর গালাত বইও, তানরে সময় দিও'। আমি হুজুরকে প্রায় জিজ্ঞেস করতাম, ছাহেব কিবলাহ থেকে কি শিখেছেন আপনি? হুজুর উত্তরে বলতেন, 'মদিনা শরীফ একবার কিছু আজওয়া খেজুর আসলে ছাহেব নির্দেশ করেন সবাই ওযু করে এসে যাতে খেজুর খায়। কারণ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজওয়া খুব পছন্দ করতেন। আমিও কিতাবে অনুরূপ বহু বর্ণনা পেয়েছি। কিন্তু ওযু করে আজওয়া খেতে হবে, এই আদব ও তা'যীমের দীক্ষা ফুলতলী ছাহেবের নিকট থেকে প্রথম পাই, কোন কিতাবের পাতা থেকে নয়'। তাই আমি বলি- 'মুহাদ্দিস ছাহেবের বাপ ছিলেন শামসুল উলামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমাদের এতদাঞ্চলে আল্লামা মুশাহিদ বাইয়মপুরী, ফুলতলী ছাহেব এবং মুহাদ্দিস ছাহেব একই বাতির তিনটি প্রতিবিম্ব ছিলেন। যেখানে ফুলতলী ছাহেব মুহাদ্দিস ছাহেবের কথা বলতেন আর মুহাদ্দিস ছাহেব গান গাইতেন ফুলতলী ছাহেবের।

হুজুরের জীবনের শেষ উমরাহ সফরে অধম তাঁর সফরসঙ্গী হওয়ার সুযোগ হয়েছিলো। উনাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে তাওয়াফ শুরু করলাম। এক চক্কর দিয়েই নেমে পড়লেন হুইল চেয়ার থেকে এবং আমাকে তাঁর হুইল চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। আমি বাকি ছয় চক্কর দিলাম হুজুরের চেয়ারে বসে আর বার্ধক্যের শেষ মাথায় দাঁড়ানো এই বটোবৃক্ষ তখনো হেটে হেটে আমাদেরকে ছায়া দিয়ে তাওয়াফ শেষ করলেন। এভাবেই তাঁর সাথে সফরের পরিসমাপ্তি ঘটলো আমাদের। ময়দানে মাহশারে আবার রাব্বে কারীমের করুণা হলে তাঁর সাথে শুরু করব সফর।

লেখক: কবি, শিক্ষাবিদ; অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ফেঞ্চুগনজ ডিগ্রী কলেজ; অধ্যক্ষ, সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, সিলেট।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান

ইলমে হাদীসের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, বহু উস্তাদের উস্তায শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ চিরদিনের মতো এই নশ্বর জগৎ থেকে চলে গেছেন। মুহাদ্দিস ছাহেব অভিধায় খ্যাত এই বুযুর্গ গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সোমবার সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে সিলেটের জকিগন্জস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। পরদিন ৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিশাল জানাযা-জামাত শেষে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদের পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। পরম পরিতাপের বিষয়, এর মাত্র সপ্তাহখানেক আগে তাঁর সহধর্মিনীও দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

খবরটা শুনেই যেন বজ্রাহত হলাম। যেন তীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ হল বুকের মাঝখানে। প্রচণ্ড যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে পড়লাম। অজান্তেই চোখ থেকে ঝরতে লাগল বেদনা-অশ্রু। মাত্র কদিন আগেই শেষবারের মত সাক্ষাৎ করে এসে ছিলাম তাঁর সঙ্গে। মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় সিলেটের একটি বাড়িতে শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। উঠতে ও বসতে পারেন না। অবস্থা বড়ই করুণ মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের। বেশ কিছুদিন ধরে সাঙ্ঘাতিক অসুস্থ তিনি। ঢাকা থেকে গিয়ে উপস্থিত হলাম তাঁর সজ্জা পাশে। সেখানে পেলাম তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলালকে, লন্ডন থেকে সদ্য আগত মুফতী ইহ্সান এবং হুজুরের ভক্ত, মুরীদ ও এককালীন ছাত্র আরো অনেককে। তাদের কেউ কেউ হুজুরের এই করুণ অবস্থা দেখে চিৎকার দিয়ে কাঁদছিলেন। সবার চোখে অশ্রু। আমি বসলাম শয্যাশায়ী হুজুরের বুকের কাছে। এ অবস্থায়ও হুজুর শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন। তাঁর সৌম্য স্নিগ্ধ চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল নূরের জ্যোতি। কণ্ঠস্বর ছিল স্বাভাবিক, অকম্প, সুস্পষ্ট। মৃদু স্বরে তিনি সবাইকে সান্ত্বনা দিলেন, নসীহত করলেন এবং দুআ ও মুনাজাত করলেন। অতঃপর মাওলানা হেলালের নিকট তলব করলেন হাদীসের মুদ্রিত সনদপত্র। তিনি যথাস্থানে আমার নাম লিখে দিলেন হুজুরের হাতে। হুজুর স্বহস্তে স্বাক্ষর করে পরম আদরে সেটি তুলে দিলেন আমার হাতে। আমি হাতে নিয়ে চুম্বন করে দুহাত দিয়ে সেটি জড়িয়ে ধরে চেপে রাখলাম আমার বুকের সাথে। মনে হচ্ছিল এর চেয়ে পরম পাওয়া আর কিছুই হতে পারে না।

হুজুর আমাকে ছোট ভাইয়ের মত একান্ত স্নেহ করতেন। তাঁর সাথে দেশে এবং বিদেশে অনেক সফর করেছি। তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছি। ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলে তাঁর সাথে যোগদান করেছি, শরীক হয়েছি তাঁর দেয়া দারসে হাদীসের মজলিসে। তাঁর কণ্ঠে ইলমে হাদীসের মুহাক্কিকানা তাকরীর শুনেছি। তাঁর সাথে বৃটেনে সফর করেছি কয়েকবার। বৃটেনের বিভিন্ন শহরে রয়েছেন তাঁর অনেক সাবেক ছাত্র যারা মুহাক্কিক আলিম। সে দেশে গেলে ছুটে আসতেন প্রবাসীদের অনেকে হুজুরের খিদমতে। আবেদন করতেন দারসে হাদীসের মজলিস করার। হুজুর সাগ্রহে তাতে সায় দিতেন। মজলিসে হাজির হয়ে দারস দিতেন।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এরকম কয়েকটি মজলিসে যোগদান করার, দারস নেয়ার। হুজুর ইলমে হাদীসের ওপর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মুহাক্কিকানা তাকরির করতেন।

২০০৮ সালের ৩০ জানুয়ারি সিলেট হযরত শাহজালাল ইয়াকুবিয়া মাদ্‌রাসা কম্পাউণ্ডে আয়োজন করা হয় এক শানদার সনদ বিতরণী সভা। যারা হুজুর থেকে হাদীসের সবক নিয়েছেন তাদেরকে প্রদান করা হয় সনদ। আমিও আমন্ত্রণ পেলাম সেই সভায় যোগদানের। যোগদান করলাম। হুজুর তাঁর স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করলেন ইলমে হাদীসের ওপর সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা। দারস দিলেন বেশ কয়েকটি হাদীসের এবং বিতরণ করলেন পবিত্র সনদপত্র। আমি কি কারণে যেন তখন সনদপত্র গ্রহণ করতে পারলাম না। আমার তা মনে না থাকলেও হুজুরের কিন্তু তা মনে ছিল। দোয়া শেষে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে যাব, তখন তিনি বললেন আর একটু বসুন। মাওলানা হেলালকে বললেন, হাদীসের সনদপত্রের একটি কপিতে উনার নাম লিখে নিয়ে এসো। তিনি নিয়ে আসলেন। হুজুর তাতে নিজ হাতে তাঁর নাম দস্তখত করে পরম স্নেহে তা' তুলে দিলেন আমার হাতে।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ যেমন ছিলেন ইলমে শরীয়তের প্রখ্যাত আলিম, তেমনি ছিলেন ইলমে মারিফতেরও শায়খে কামিল। তিনি ছিলেন ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী আল্লামা আবদুল লতীফ চৌধুরী রাহিমাহুল্লাহ এর অন্যতম খলীফা। তিনি যেমন তাঁর কাছ থেকে ত্বরিকতের সবকাদি গ্রহণ করেছেন তেমনি তাঁর সাথে কয়েকবার চিল্লাও করেছেন। আদাবুশ শায়খের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাহ এর সাবেক সভাপতি। বর্ণাঢ্য তাঁর জীবন-ইতিহাস। অত্যন্ত মেধাবী এই মনীষী ছাত্র হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে, মুহাদ্দিস হিসেবে, প্রিন্সিপাল হিসেবে, মুবাল্লিগ-ওয়ায়েজ হিসেবে, বিভিন্ন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, কোর্টের বিচারক হিসেবে প্রখর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। দেশে এবং বিদেশে রয়েছে তাঁর অগনিত গুণগ্রাহী, ভক্ত, অনুগামী ও অনুসারী।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমানের জন্ম সিলেটের জকিগন্‌জ উপজেলার রারাই গ্রামে, ১৯৩৪ সালে। তাঁর পিতা ছিলেন এলাকার প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা মুমতায আলী রাহিমাহুল্লাহ। পড়ালেখা শুরু করেন তিনি সড়কের বাজার আহমদিয়া মাদ্‌রাসায়। এখানে অধ্যয়ন করেন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত। এরপর গাছবাড়ি জামিউল উলুম মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া করেন এবং সেখান থেকে ১৯৫৫ সালে আলিম, ১৯৫৭ সালে ফাযিল ও ১৯৫৯ সালে হাদীস বিভাগে কামিল পাশ করেন। তিনি তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ডের প্রতিটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর শুরু হয় তার কর্মজীবন।

১৯৫৯ সালে তিনি ইছামতি দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় শুরু করেন শিক্ষকতা। ১৯৬৩ সালে তিনি সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। এরপর ১৯৭৪ সালে ইছামতি দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় তাঁকে প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা হয়। সেখানে যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি চলে যান সংযুক্ত আরব আমিরাতে। সেখানে প্রথমে উম্মুল কুওয়াইন নামক শহরের একটি জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব নিযুক্ত হন। সেখানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের

সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বিচার বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৮১ সাল পর্যন্ত উম্মুল কুওয়াইন কোর্টে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আবার তাঁর পুরাতন কর্মস্থল ইছামতি মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে অত্যন্ত সুনাম-সুখ্যাতি ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ঐ তারিখেই তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে অবসর গ্রহণ করেন এ দায়িত্ব থেকে।

মাদ্‌রাসার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও ইলমে হাদীসের খিদমত থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হননি কখনও। হাদীসের প্রচার, দারস-তাদরীস, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান, ওয়াজ নসীহত, তরিকতের তালিম ও তলকীন জারি রেখেছেন আজীবন। এমন কি মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থাতেও তিনি আগ্রহী প্রার্থীদের সবক দিয়েছেন, সনদ দিয়েছেন, নসীহত করেছেন। তাঁর জীবন ছিল দ্বীনের জন্য কুরবান। ইলমী তাজকিরা থেকে তিনি বিরত থাকেননি কখনও। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্ব সচেতন, সময় সচেতন, ওয়াক্তের পাবন্দ, নীতিনিষ্ঠ, কর্তব্যনিষ্ঠ। আমি (নিবন্ধ লেখক) দেশে ও বিদেশে বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে তাঁর সাথে অনেক সফর করেছি, মাহফিলে-মজলিসে যোগদান করেছি। তাঁর সান্নিধ্যে যে দিনগুলো কাটিয়েছি তা অবিস্মরণীয়। আমি কখনো তাঁকে গাল-গল্প করে অযথা সময় নষ্ট করতে দেখিনি, শুনিনি কারো সমালোচনা করতে, কারো বিরুদ্ধে মন্দবাক্য উচ্চারণ করতে। তিনি ছিলেন উদার, মহৎ ও সবার কল্যাণকামী। তিনি যেমন নিজে বেশকিছু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছেন তেমনি এসব কাজে অপরকেও উদ্বুদ্ধ করেছেন, সহযোগিতা করেছেন। তিনি ছিলেন সকল কাজে সুন্নতের পাবন্দ। তিনি বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সিরিয়া, মরক্কো, ভারত, সৌদি আরব সফর করেছেন। সে সব দেশের মশহুর মুহাক্কিক উলামা-মাশায়িখদের সাথে বৈঠক করেছেন, ইলমী আলোচনা করেছেন, হাদীসের সনদ আদান-প্রদান করেছেন।

১৯৯১ সালে তাঁর সম্পাদনায় সিলেট থেকে 'মাসিক শাহজালাল' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বিভিন্ন দ্বীনী কিতাব প্রণয়ন করে গেছেন তিনি।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে আল কাউলুল মাকবুল ফী মীলাদির রাসূল, দোয়ায়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফযীলত, মাসআলায়ে উশর প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, দরূদ শরীফের ফযীলত ও ওযীফা, যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা (ফযীলত ও নিয়ম), আসহাবে বদর, ওযীফা, হজ্জ ও যিয়ারত (সংক্ষিপ্ত আহকাম ও নিয়ম), হাদীয়াতুল লাবীব ফী নাবযাতিম মিন সীরাতিন নাবিয়্যিল হাবীব, যাখীরাতুল আহদীসিল আরবাঈন ফী ফাদায়িলি সায়্যিদিল মুরসালিন, কানযুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যিল আমীন, তুহফাতুল লাবীব ফী আসানীদিল হাবীব, আত তুহফাতুল লাতীফাহ ফী আহাদীসিল মুসালসালাতিল মুনীফাহ, দালাইলুল খাইরাত (তাহকীক ও বিন্যাস), আল হিযবুল আযম (তাহকীক), সীরাতে হাবিবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্যাদি। প্রায় ষাট বছর ধরে ইলমে হাদীসের খিদমতে নিরলসভাবে নিয়োজিত ছিলেন এই মনীষী। তিনি হাদীস শরীফের যে দারস দিয়ে গেছেন তা এক অমূল্য সম্পদ। আশার কথা, বিক্ষিপ্ত সে দারসসমূহ সংকলিত করে 'দারসে হাদীস' শিরোনামে প্রকাশনার কাজ শুরু করে দিয়েছেন তাঁর সুযোগ্য ছাহেবজাদা বিশিষ্ট

আলেমেদ্বীন ও সুলেখক মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল। ইতোমধ্যে এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছে 'আল হাবীব ফাউন্ডেশন' থেকে। মাওলানা হেলাল মুহাদ্দিস হুজুর প্রণীত কিছু আরবি গ্রন্থের সফল অনুবাদও করেছেন। 'দারসে হাদীসে'র এ খিদমতটিও তিনি চালিয়ে যাবেন বলে আমরা আশা করি।

মুহাদ্দিস হুজুর আজ নেই, তাঁর অনেক কৃতী ও স্মৃতি এখনও বিদ্যমান। এগুলো সংকলন করা, সংরক্ষণ করা, সম্প্রসারণ করা তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারীদের কর্তব্য। আল্লাহ তাদের তাওফীক দান করুন এবং মুহাদ্দিস হুজুরকে দান করুন জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব; খতীব, মসজিদে গাউসুল আযম, ঢাকা; সিনিয়র সহ সভাপতি, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেসীন; বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

ধর্মজ্ঞানের এক দুর্লভ কষ্টি ও পরশ পাথর
হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ

প্রফেসর ড. আহমদ আনিসুর রহমান[১]

তাঁকে নিকটজনরা 'মুহাদ্দিস ছাব', তথা মুহাদ্দিস ছাহেব বলে জানত। আনুষ্ঠানিক ভাবে লেখা, বা কখনো কখনো বলা, হ'ত, 'শায়খুল হাদীস'- খুব বেশি হলে কখনো কখনো, 'আল্লামা'। কিন্তু ইলম, তথা ধর্মজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের বহুবিধ শাখা প্রশাখাময় বিস্তৃত বিশাল ব্যপ্তি জুড়ে তাঁর অগাধ বিশেষজ্ঞতায় তাঁর যে অত্যুচ্চ মর্যাদা খুব কমই বুঝতে পেরেছেন বলেই দেখতে পাচ্ছি। আমিই বা কতটুকু তার বুঝতে পেরেছি! মিষ্টি পানির এক মহাসমুদ্রের তীরে দাঁড়ানো এমন এক তৃষ্ণার্তের মত, যে তা থেকে এক কাতরারও কম পান করে সয়রাব হয়ে আশ্চর্য অনুভবে হতবিহ্বল হয়ে তাঁর পানে তাকিয়ে কিছু বুঝবার চেষ্টা করছে।

এখানে সেই থেকে, কমবেশী দেড় যুগে তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় দেখা, ও যখন তা সম্ভব হয়নি, তখন দূর থেকেই কথা বলাসহ নানাভাবে যোগাযোগ রাখার মধ্যমে সম্পর্ক। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভেতর দিয়ে তাঁকে যতটকু দেখেছি, তার বর্ণনা দিতে চেষ্টা করব।

আমি ঘটনাচক্রে এক প্রকারের বিজ্ঞানী[২] এবং তার পটভুমিরূপে আশৈশবেরই বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গির কারণেই হয়ত আমার লেখা প্রবন্ধাদি সাধারণতঃ বিজ্ঞানীসুলভ এমন কঠোরভাবে নৈর্ব্যক্তিকভাবে হয়ে থাকে যে তাতে নিজের কথা ত দূরে থাক, লেখক হিসেবে নিজের নাম পরিচয়টুকুও যতটুকু না হলেই নয়, তার চেয়ে বেশি থাকে না। কিন্তু এই বিশেষ লেখাটিতে সেই আঙ্গিক ত্যাগ করে অত্যন্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনামূলকভাবে লিখেছি বিভিন্ন কারণে।

---

১ ফখরুদ্দীন আহমদ আনীস আব্দুর রহমান খান আল-শরীফী - বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ ও ভাষায় দীর্ঘ নামের সংক্ষেপায়নে এক বা অন্য অংশ বিশেষ দ্বারা পরিচিত; বাংলায় সাধারণত: নামের এই সংক্ষেপিত অংশেই পরিচিত। মদীনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতপূর্ব প্রফেসর; বাংলাদেশের ঢাকা আর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাস্ট্রের হার্ভার্ড ও এমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়ার মাল্টিমিডিয়া, উত্তরাঞ্চলীয় ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্‌স, জাতীয় ও মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিবিধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, "ফেলো", প্রভাষক, ডীন বা প্রধান। অস্ট্রেলীয় সুপ্রীম কোর্টের জ্যৈষ্ঠ আইনজীবি/ 'সিনিয়র সলিসিটর'।

২ আশৈশব ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, আল্লাহ তা'আলার রহমতে আমি দুনিয়াবী জ্ঞান বিজ্ঞানেও উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগে পেয়ে, অন্যান্যের ভেতর, বিশ্বের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় বলে পরিচিত, যুক্তরাস্ট্রের এমআইটি (ম্যাসাচুসেটস ইন্সিটিটিউট অব টেকনোলজি) থেকে পি.এইচ.ডি., একই পর্যায়ে ছাড়াও যুক্তরাস্ট্রেরই হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সাইন্স সেন্টার, আর তারপর, অস্ট্রেলিয়ার সুইনবার্ন ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে পড়াশোনা করি।

এই ব্যক্তিগত আঙ্গিকে লেখার একটি কারণ হল এই যে, তাঁর ছাত্র হিসেবে আমি তাঁর থেকে সেইসব অসাধারণ যা পেয়েছি যা সাধারণতঃ একজন সাধারণ উস্তায থেকে পাওয়া যায় না, তা ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁর অসাধারণ বিশেষত্বের প্রতিটির উল্লেখকেই শিক্ষার্থী হিসেবে আমার নিজের অভিজ্ঞতায় তাঁর উল্লিখিত বিশেষত্বের প্রেক্ষিতের ব্যাপক বর্ণনা দরকার বা সহায়ক মনে হয়েছে। এই অতি বিস্তৃত রূপেই ব্যক্তিগত আঙ্গিকে লিখতে গিয়ে দ্বিধা বোধ করেছি। মনে হয়েছে তাঁর চেয়ে বেশি নিজের কথাই যেন বেশি বলে ফেলছি। নিজের স্বভাবসুলভ অত্মপ্রচার বিমুখতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে কঠোরভাবে রক্ষার আজীবনের অভ্যাসের পরিপন্থী বলে তা বেশ মানসিক কষ্টেরও কারণ হয়েছে। কিন্তু উস্তায মহতরমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলীকে যথা সম্ভব ফুটিয়ে তোলার আরাধ্যের স্বার্থে অবশেষে ঐসবকে উপেক্ষা করে এই অতি ব্যক্তিগত বর্ণনার আঙ্গিকেই লিখতে সিদ্ধান্ত নিই।

আর এই আঙ্গিকটি বেছে নেয়ার আরেকটি কারণ হলো, এই আশা যে এই লেখাটি ধর্মজ্ঞানের অন্যতম শাখা 'আসমা'উর-রিজাল', যা মুহাদ্দিস ছাহেবানের পরিচয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তাঁদের থেকে পাওয়া বলে বর্ণিত হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার পরিমাপের কাজে লাগে - তাতেও কাজে লাগতে পারে। সেখানে, শিক্ষক আর ছাত্রের শিক্ষাদান ও গ্রহণ সংশ্লিষ্ট সময়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যের যত বেশি পাওয়া যায়, ততই উপকারী গণ্য করা হয়। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ অন্যান্য জ্ঞান শাখার বিশেষজ্ঞ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব বড় মাপের মুহাদ্দিসও ছিলেন তাঁর সম্পর্কিত আসমা'উর-রিজালের জন্যও যত বেশি প্রয়োজনীয় প্রকারের তথ্য সম্ভার, তার জোগাড় অত্যন্ত জরুরী, হাদীস শাস্ত্রের ভবিষ্যত পঠন পাঠন আর তার রেওয়ায়েতের চলমান ইতিহাসের প্রয়োজনে।

দুনিয়াবী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তৎস্বার্থে রচিত লেখার জন্য প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত বিবিধ বর্ণনা পদ্ধতির প্রধান একটি হলো 'Subjective-Qualitative, Personal Observation Report', তথা- "ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণভিত্তিক গুণগত মূল্যায়ন প্রতিবেদন"। এখানে সেটাই উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

উপরোক্ত কারণসমূহে বিশেষভাবে সাজানো এই প্রবন্ধে সাধারণতঃ হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের একেকটি বিশেষত্ব যা এই অধম ছাত্র লক্ষ্য করেছি, তা নিয়ে এক একটি প্রবন্ধাংশ (সেকশন) হবে। প্রবন্ধ-পরিচিতিমুখ শুরুর দিকের পর থেকে। সাধারণতঃ প্রবন্ধাংশের শিরোনামেই হযরতের ঐ অংশে তুলে ধরা বিশেষত্বটি উল্লেখ করে ঐ অংশের অধিকাংশ জুড়েই, প্রবন্ধের লেখক ও তাঁর ছাত্র হিসবে আমার নিজের পূর্বতন শিক্ষাগত পটভূমিতে তাঁর ঐ উল্লিখিত বিশেষত্ব ফুটে ওঠার যে প্রেক্ষিত তৈরি হয়, তার বর্ণনার পরেই প্রবন্ধাংশের শেষে ঐ প্রেক্ষিতের আলোকে তাঁর এতদ প্রবন্ধাংশে উল্লিখিত

বিশেষত্বটির আবার উল্লেখ হবে সংক্ষেপে। এবার তার প্রেক্ষিতায়নের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার পর। এভাবে, বর্তমান প্রবন্ধটি এক অর্থে আরেকটি বৃহত্তর কর্ম্মের সূচনার মত। ভবিষ্যতে এই অধম বা অন্য কোন সৌভাগ্যবানের হাতে, এর প্রবন্ধাংশগুলোতে উল্লিখিত হযরতের বিশেষত্ত্বগুলোকে আরো বিস্তৃতভাবে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে উপস্থাপিত হবে।

অসাধারণ বিশেষত্ব

আজকের এই ফিৎনার যুগে তথাকথিত 'শায়খ', 'আল্লামা', 'মৌলানা' আর 'পীর-সাহেব'-এর এমনই সর্ব্বব্যাপী প্রাদুর্ভাব ভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে যে, এদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে জনসাধারণ দিশেহারা ভেড়ার পালের মত এলোপাথাড়ি ছোটাছুটি করে বা নিষ্ক্রিয় বসে থেকে গন্তব্যচ্যুত হচ্ছেন। সেখানে সাধারণতঃ মুহাদ্দিস ছাহেব বলে পরিচিত, প্রকৃত 'আল্লামা শায়খ আল-কাজী মুহাম্মদ হবিবুর রহমান আল-রা'রায়ী আল-মুহাদ্দিস আল-ক্বারী আল-মুফাসসির ছিলেন ইলমের সেইসব দুর্লভ পরশ পাথরদের একজন, যাঁদের অতি সংক্ষিপ্ত সংস্পর্শ মাত্রই প্রকৃত ইলম সঞ্চারিত হয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষক বা শিক্ষার প্রয়োগের উপায়ে পরিণত পর্যন্ত হতে পারে, আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্পর্শে এভাবেই সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু আনহুম মূহূর্ত্ত মাত্র এমন সব আশ্চর্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন যাঁদের দিয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ে কোটি কোটি বছরের ইতিহাসের গতিমুখ বদলে গিয়ে দুনিয়া জাহান চিরকালের জন্য বদলে যায়। যাঁদের সম্পর্কে তাঁদের ইসলামের মূর্ত্তরূপ, 'আলমু'ল ঈমান' যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরশ মাত্র ঐভাবে রূপান্তরের 'কিমিয়া' বা রসায়ন-রহস্য বর্ণনা করে কাজী নজরুল ইসলাম বলেন, 'পরশে তাহার সোনা হল যারা'; আর রূপান্তরিত হবার পর তাঁদের জগৎ বদলে দেয়া আশ্চর্য ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করে ইকবাল বলেন, 'ইয়ে গ্বাজী, ইয়ে তেরে পুর-আস্রার বন্দে'। সেই আদি ও আসল পরশ পাথর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'ওয়ারিস' হিসেবে প্রজন্ম-পরম্পরায় প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা ও নিযুক্তির আসানীদে নিশ্চিতায়িত, তথা প্রকৃত 'আলিম'-রাও, এইরূপ আশ্চর্য মানুষে পরিণত হয়ে, তাঁদের ভেতরও দুর্লভ কেউ কেউ ঐরূপ পরশ-পাথরতুল্য হয়ে ওঠেন সেই আদি ও আসল পরশ পাথরের গুনাগুণের কিঞ্চিত রশ্মিচ্ছটার প্রকাশ হয়ে। আমার মুর্শিদ মহতরম, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-এর ধারার অন্যতম জ্ঞান ও তদসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব বাহক পরম্পরার অন্যতম, হযরত শাহ মুহম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীক্বী রাহিমাহুল্লাহ এর মত, ঐ একই শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-এর ধারার হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবও। অনেকেই তাঁদের চিনে নিতে পারলে'ও ছিলেন, সেরকমই একজন। ধূলিতুল্যও নই যে এই আমি অধম, এমন

একজনও যে তাঁদের দয়াময় নেকনজরের সৌভাগ্য লাভ করি, তার শোকর আদায় করে শেষ করা যাবে না, আলহামদুলিল্লাহ।

প্রথম দর্শনের পটভূমি

আল্লাহ তা'আলার খাস মেহেরবানীতে ইলমের তলবে আশৈশব কয়েক দশকের সফরে মরক্কোর ফেজ থেকে নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার অম্পেল পর্যন্ত, মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিয়েছি, আর তারও বাইরে পুরো দুনিয়ারই পূর্ব থেক পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণে ৩৬টি দেশে গিয়েছি- মদীনা শরীফ, মক্কা শরীফ, মিশরের আল-আজহার, উপমহাদেশের দেওবন্দী সহ বিভিন্ন ধারা, মালয়েশিয়া, আলজেরিয়া, সূদান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইয়েমেন, কুয়েত, জর্দান, চীন, ফিজিসহ বিবিধ জ্ঞানকেন্দ্রে অনেক উলামা মশায়েখের কাছে ইলম হাসিলের সা'আদত লাভ করলেও, মুহাদ্দিস ছাহেবের মত উস্তায খুব একটা দেখিনি। তাঁর কাছ থেকে ইলম হাসিল, তাঁর সোহবত ও তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত সস্নেহ উৎসাহ লাভের নেয়ামতের দ্বারে প্রথমেই কীভাবে পেলাম?

মুহাদ্দিস ছাহেবের সাথে পূর্বের কোন পরিচয় ছিল না, তাঁর মাদ্‌রাসায় পড়িনি। তাঁকে কীভাবে পেলাম? তা' অনেকটা অলৌকিকভাবেই বলা যায়।

আল্লাহ তা'আলার খাস রহমতে আমার জন্ম হয়, ১ রবিউল আউয়াল ১৩৫১ হিজরী, রবিবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে। এ এমনিতে আমার ধর্ম শিক্ষা কোন এক বরকতময় ঘটনার মাধ্যমে, আক্ষরিক অর্থেই- এ আমার জন্মের পরপরই, অত্যন্ত সম্মানিত শিক্ষকের কোলে- 'দোলনা থেকে'-ই শুরু হয়ে বাবার উদ্যোগে ও তত্বাবধানে অগ্রসর হতে থাকলেও, আমার সচেতনে খোদ নিজের উদ্যোগে ইলমের সন্ধানের সফর শুরু হয় ১৯৮৮ সনে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ সহ প্রথম তিন যুগের শিক্ষার্থীদের মতই কোন একটি হাদীস শরীফ পেলে, বা তার কথা শুনলে তা স্রেফ বই থেকে পড়ে নিয়ে, বা কারো মুখে শুনে নিয়েই চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করি না। বরং হাদীস শরীফটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমি যার কাছ থেকে তা নেব, তাঁর পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য সত্যায়ন ও বর্ণনার অনুমতি মূলক ধারাবাহিক সনদধারা নিশ্চিত করে নেয়া, এবং তার জন্য নিজে সশরীরে বর্ণনাকারীর কছে গিয়ে তা, আর তার সনদের ধারাবাহিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ে শুনে নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়ে থাকি।

সেই সুবাদেই একবার একটি বিশেষ হাদীস শরীফ বিষয়ে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশায় খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একজন ইয়মেনী মুহাদ্দিস, হযরত মোহাম্মদ 'আলী বা'রোক্বা আলহাদ্রামী (ম:)-কে গিয়ে বহু দূর ইন্দোনেশিয়ার যবদ্বীপের পূর্বাঞ্চলের আরব মহল্লা আম্পেল পৌঁছাই।একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এভাবে কোনখানে কোন হাদীসটা পাওয়র জন্য মুহাদ্দিসকে দূর দূরান্তের কোথায় পাওয়া যাবে, সেটা কীভাবে জানতে পারেন?

আল্লাহ তা'আলারই মর্জি, আমার মুখ দিয়ে বের হলো, মৌমাছি যেমন মৌর ঘ্রাণে খোঁজ পেয়ে গিয়ে মৌ'র উৎসরূপ ফুলে পৌঁছে যায়, আল্লাহ তা'আলা আমাকেও সেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জ্ঞানের উৎস আলেমদের কাছে পৌঁছে দেন বা এরকমই কিছু।

হাদীস শরীফসহ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলমের মধুর দরিয়ার স্রোতের ভান্ডার হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের কাছেও আমি মদীনা শরীফের খরীদা গোলাম এই অধম আমাকে আল্লাহ তা'আলা এইভাবে পৌঁছে দেন। সেই প্রথম দর্শনের কাহিনীটি দিয়েই তাঁকে নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধটি শুরু করি।

সারা জীবনের তৃষ্ণা ও চেষ্টার পর ১৯৮৮ সনে প্রথম বার হুজুর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতে মদীনা শরীফে মাত্র আধা দিনের হাজিরার সা'আদতের পর, আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষককতার কালে, আমেরিকা সফররত জেদ্দার এক হীরা ব্যবসায়ীর নিকট নিজেকে বিক্রি করে দিয়ে, ১৯৯০ সনে আমেরিকা থেকে হিজরতের নিয়তে জেদ্দা এবং তারপর তাঁর দয়ায় মুক্ত করা ক্রীতদাস হিসাবে মদীনা শরীফ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট পৌঁছাই। অনেকটা এক কাপড়েই, সঙ্গে টাকা পয়সাও তেমন কিছু ছিল না বলেই অনেকটা মনে পড়ে। কিন্তু সেখানে পৌঁছাবার পর শুনলাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকি বলেছেন, কেউ যেন দুনিয়ার তালাশে মদীনা শরীফ না আসে বা এই রকম কিছু। তা শুনবার পর মদীনা শরীফে আয় উপার্জনের জন্য কোন কাজ খুঁজতে আর সাহস হয় না। এই ভয়ে যে তা 'দুনিয়া তালাশে'র ভেতর না পড়ে যায়।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশের এক সরদার, মদীনা শরীফের অন্যতম অতি সম্মানিত আলেম, হযরত শায়খ ইফ্ফত ইবনু 'আব্বাস (রঃ) প্রথম দিন থেকেই মসজিদে নববীর পাশেই তাঁর একটি জায়গায় আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি আমাকে নিজের সন্তানের মতই দেখতেন, স্নেহও করতেন, আবার সম্মানও করতেন। মাঝে মাঝে 'মওলানা'-ও বলতেন, যদিও আমি তখনও বহু বছর নিয়ম মত মাদ্‌রাসা পড়া কোন 'মওলানা' ছিলাম না -একবার রাজার ওখান থেকে আসা একজন বড় শায়খের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, 'তাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি'। এসবই ছিল হুজুরে আকরমের পক্ষ থেকে আদরের প্রকাশ। আমি নগণ্য এতে খুব লজ্জা পেতাম। তিনি আমাকে এভাবে সম্মানিত অতিথি ও আপন পরিবারের হিসাবে গন্য করলেও, আমি তাঁর ওখানে কর্মরত মজদুরদের সঙ্গেই সোয়াই পছন্দ করি, তারাই আজ পর্যন্ত আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। সকালে তাঁদেরই সঙ্গে সেকালে এক রিয়ালে কেনা যেত যাই বড় একটি রুটি, তা ভাগ করে খেয়ে বাকিটা জুব্বার জেবে রেখে দিয়ে সারা দিন কখনো ক্ষুধা বোধ হলে, তা থেকে একটা খেয়ে নিয়ে

জমজমের পানি খেয়ে নিতাম। হয়ত মাঝে মধ্যে অন্য কাউকেও একটু আধটু দিতাম, একটি রুটি কখনো কখনো অনেক দিনই খেতে থাকতাম। এভাবেই চলতাম। কাজ খুঁজতাম না।

একবার একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি সরকারি চাকুরী করেন?' একটু চুপ থেকে বললাম, 'আমি সরকারের চাকুরী করি'। সরকারে দু-আলমের গোলাম হিসাবেই জীবন চলছিল খুবই ভাল।

একবার শায়খ জয়তূনী নামে এক ধনাঢ্য মদীনাবাসী আমাকে ডেকে এনে তার বিস্তৃত অফিসে ঘর ভর্তি লোকের সামনে আমাকে দেখিয়ে বললেন 'এ মহব্বতের মুহাজির, আমরাও আনসার', আর তারপর আমাকে তাঁর বাড়িগুলোর একটি জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলে আমি বিনিময়েই যেন অনেকটা তাঁর কোন কাজ করে দেয়ার সুযোগ দিতে বললে তিনি তাঁর অফিসে আমাকে একট কাজ দিয়ে দেন। এছাড়া আর কোন বাহ্যিক আয় উপার্জনমূলক কাজ করিনি। কোনরকম জরুরী দরকার হলে মাঝে মধ্যে কিছুদিনের জন্য অন্য কোন দেশে কোন কাজ নিয়ে চলে যেতাম কিছু দিনের জন্য। তখন ভাল আয় হয়ে যেত, তা থেকে আবার বেশ কিছু দিন চলত।

ফুলতলীর ফুল

এভাবেই এক পর্যায়ে কিছুদিন মালয়েশিয়ার মালাক্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের বিশেষজ্ঞ প্রফেসর হিসেবে কাজে নিযুক্ত হই। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় মসজিদে মাঝে মধ্যে নামায পড়লেও বেশি সময় কাটাতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পাশে একটু দূরে একটি গ্রামের ছোট একটি মসজিদে। তা ছিল তুলনামূলক নিরিবিলি, আর সেখানকার ইমাম মুসল্লীরা ছিলেন নানা আধুনিক বিদ'য়াত মুক্ত, ঐতিহ্যবাহী ইবাদত বন্দেগীতে অভ্যস্ত থাকায় সেখানেই বেশি স্বস্তি বোধ করতাম। সেখানেই একবার বোধ হয় মুরাক্বাবার হালতে তন্দ্রাতে বা ঘুমে বাংলাদেশের হযরত মৌলানা 'আব্দুল লতীফ ফুলতলী (র:)-কে দেখি। তার তা'বীরটা বুঝতে পারি না। এর পরেই বোধ হয় আমার মুরশিদ হযরত মুহম্মদ 'আব্দুর রশীদ সিদ্দীক্বী (র:)-এর তরফ হতে মনে হলো মৌলানা ফুলতলী ছাহেবের কাছে যাওয়ার নির্দেশ মনে হয়। হযরত 'আব্দুর রশীদ (র:)-এর ইন্তেকালের তখন ১২ বছরের উপর হয়েছে, মৌলানা ফুলতলী ছাহেব এই সময়ের ২/৩ মাসের ভেতরই ইন্তেকাল করেন।

এর পরই কীভাবে মনে নেই, আমি ফুলতলী ছাহেবের কাছে গিয়ে হাজির হই। ২০০৭ ইং -এর এক সময়, প্রায় নিশ্চিতই আগষ্ট বা তার সামান্য একটু পরে। আমি নানা ঘটনা চক্রে ফুলতলীর মৌলানা হযরত 'আব্দুল লতীফ ছাহেবের সন্ধানে গিয়ে ফুলতলীতে তাঁর দৌলতখানায় হাজির হই। তাঁর সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় ছিল না। ২/১ বছর পূর্বে

কোন এক ঘটনায় তাঁর কাছে অল্প কিছুক্ষণের জন্য গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। তারই সূত্রে তন্দ্রা বা স্বপনে দেখা ঘটনা দেখে এবার দ্বিতীয় বার যাওয়া হয়।

ফুলতলীতে হযরত ফুলতলী (র:)-এর বসবার ঘরে তিনি আমাকে দর্শন দিলে, আমি তাঁকে নিয়ে দেখা আমার স্বপ্নটি বললে, তিনি কিছুই বললেন না, কিন্তু নিজে আসনে বসা অবসস্থায় তাঁর কদমযুগলের পাশে মেঝেতে বসা আমার মাথার ওপর তাঁর হাতটি রেখে সম্ভবত: দোয়া করতে থাকলেন -দীর্ঘক্ষণ। মনে হলো আধা ঘণ্টা বা ওরকম।

এরপর হয় সেদিনই বা পরের দিন বা এরকমই কোন এক সময়, মৌলানা ফুলতলী (র:)-এর পেছন পেছন সিলেট শহরের সুবহানীঘাট এলাকায় তাঁর ইয়াকুবিয়া মাদ্‌রাসায় গিয়ে হাজির হলে মৌলানা ফুলতলী (র:) ছাহেবের শিক্ষাদান বৈঠক শেষে তিনি চলে গেলে আমিও সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে, সেখানে কারো কারো মুখে মুহাদ্দিস ছাহেব বলে কারো উল্লেখ শুনে, আমি যে মৌ-এর ঘ্রাণ অবচেতনেই আকৃষ্ট হয়ে অবশেষে সেই মৌ-এর উৎস হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ -এর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য লাভ করি। তাঁর কাছে পৌঁছাবার উপায় হয়।

লোকের মুখে মুহাদ্দিস ছাহেব শুনে দিলে খেয়াল আসে, যাঁর নামটাই হয়ে গেছে মুহাদ্দিস ছাহেব, তিনি সম্ভবত" হাদীস শরীফের এমনই বিশেষজ্ঞ হবেন যিনি হাদীস শরীফের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হবেন। এ থেকে তাঁর কাছ থেকে একটি মাত্র হলেও, হাদীস শরীফ শুনে তা রেওয়াতের এজাযত লাভের আগ্রহ দিলে পয়দা হয়।

সিলেটে আমার অগ্রজপ্রতীম, সম্পর্কের মামাতো ভাই, ফেঞ্চুগন্‌জ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহতরম আবুল কালাম খান আজাদ (কবি 'কালাম আজাদ'। আমার আজাদ 'ভাই ছা'ব) -এর বাসায়ই মেহমান ছিলাম। তিনি হযরত ফুলতলী (র:)- কনিষ্ঠতম বেগমের ভাই হিসেবে তাঁর সম্বন্ধিও বটে। তাঁর এই সম্পর্কের ভেতর দিয়েই হযরত ফুলতলী (র:)-এর সঙ্গে আমারও ঐ একই সম্পর্ক, এক কাঠি সরে, হয়। যার কথাটিও আমার মালাক্কাতে দেখা পূর্বোক্ত ঐ স্বপ্ন বা দিব্যদৃষ্টিতে প্রাসঙ্গিক হিসেবে উক্ত ছিল, যার সূত্রে আমি হযরতের কাছে এসেছিলাম।

সুবহানীঘাট থেকে আজাদ ভাই ছাবের বাসায় ফিরে এলে, যাঁকে লোকে মুহাদ্দিস ছাহেব বলে উল্লেখ করে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহের কথা বললে, তিনি জানান যে মুহাদ্দিস ছাহেব তাঁর মুর্শিদ, আর তিনিও আমাকে উৎসাহিত করেন।

প্রথম দর্শন

আমি যতদূর মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গেই রওনা দেই। দিনে বেশ দের হয়ে গিয়েছিল। দের-বিকাল বোধ হয়। অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল, আমার কাছে কোন ছাতাও ছিল না। ইতিমধ্যেই কয়েক দিনের সফরে ও ঘুমের অভাবে ক্লান্ত ছিলাম - একই কাপড়ে সফরে

ছিলাম, যতদূর মনে পড়ে। বৃষ্টিতে কাপড়টি ভিজে ছিল। সাধারণতঃ ঠান্ডাতে - আর ভিজে গেলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু আগ্রহের আতিশয্যে এসব কিছুই আটকে রাখতে পারল না।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের খোঁজে সুবহানীঘাট গিয়ে শুনলাম, তিনি এই মাত্র বা একটু আগেই। রারাই তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্য বেরিয়ে গেছেন। তৎক্ষনাৎ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই গিয়ে একটি বাস ধরে, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ৬৩/৬৪ কি. মি. দূর ৩-৪ ঘণ্টার তুলনামূলক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে জকিগন্জের রারাই গ্রাম বা শহরতলিতে তাঁর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে শুনলাম, তিনি একটু আগেই আবার সুবহানীঘাটের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গিয়েছেন। সেই বৃষ্টির ভেতরই আবার ফিরে চলি সুবহানীঘাটের জন্য। আল্লাহ তা'আলার মর্জিতে সেখানে পৌঁছে শুনলাম, তিনি জকিগন্জ ফিরে গিয়েছেন। বৃষ্টিতেই আবার ফিরে চললাম, রারাই যাওয়ার জন্য।

আল্লাহ তা'আলাকে বল্লাম, 'আমি এটা সফা-মারওয়া করছি'। মনে সেই ভাবটাই ছিল। আল্লাহর নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের জন্য এই ছোটাছুটি ত' আল্লাহর জন্যই।

সিলহটের সুবহানীঘাটের ইয়াকুবিয়া মাদ্‌রাসা আর জকীগন্জের রা'রাইতে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের দৌলতখানার মাঝে এভাবে চার চক্কর পুরা হলে, হযরত কে তাঁর বাসভবনে পেলাম। হযরত আমাকে তাঁর বেঠকে গ্রহণ করেন, রাত বেশ হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় সাড়ে নয়টা বা তারও বেশি। রা'রাইর মত গ্রামাঞ্চলে সেটা অনেক বেশি রাতই ছিল। হযরতের বয়সও বেশি। তদুপরি সম্ভবত: অসুস্থও ছিলেন। তার পরও তিনি অতি দানশীলতা থেক অনেক সময় আমার সঙ্গে কথা বলেন, খাবার মেহমানদারী করেন, রাতে থাকবার সুব্যবস্থা করে দেন তাঁরই বাড়িতে, কিন্তু তারও ওপর যে অকল্পনীয় নেয়ামত দান করেন, তার শুকুর সারা জীবন শুকরিয়া বলে আদায় সম্ভব নয়। হযরত কে বল্লাম, আমি রাসূলুল্লাহ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস পেয়েছি, نَضَّرَ اللهُ امرأً سَمِعَ مقالَتي فوَعاها فأدَّاها كَا سَمِعَها আর তাঁর কাছে এসেছি এই আশা নিয়ে যে তিনি আমাকে এই হাদীসটি শিখিয়ে দিয়ে আল্লাহর নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ধারাবাহিক ইসনাদের মাধ্যমে মুস্তনদ রাবীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কথা হিসেবে সংরক্ষণ করে তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়ার অনুমতি দেবেন।

প্রথমে বাড়ির ভেতর খানার ব্যবস্থা করে সেখানে নিয়ে পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন, নিজেও খেলেন। তার পরে আবার বৈঠক ঘরে নিয়ে এসে কথা বললেন। নানা কথা বললেন। এখন মনে হয়, আমার পরীক্ষা নিচ্ছিলেন।

কথাচ্ছলে তাঁকে হযরত ফুলতলী (র:)-কে নিয়ে দেখা স্বপ্ন আর তা নিয়ে মুরাক্বাবা-তে

সম্ভবত: দেখা আমার মুর্শিদ হযরত মৌলানা মুহম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী (র:) -এর নির্দেশ বলে যা মনে পড়ে। আর তা শোনার পর হযরত ফুলতলী (র:)-এর আমার মাথার ওপর হাত রেখে দীর্ঘ দোয়ার কথাটিও বলি।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন, তারপর হঠাৎ বল্লেন, 'আপনার ত কাজ হয়ে গেছে'[৩]!

তার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাহেবজাদাকে কিছু নিয়ে আসতে বলেন। পরে জেনেছি, উনি হযরতের গর্ব করার মত সুযোগ্য সন্তান, লন্ডন প্রবাসী আলেম মহতরম, মৌলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল। তখন আমি হযরতকেই ঠিক চিনি না। তাঁর নাম পর্যন্ত ঐদিনের পূর্বে আমি শুনিনি, তাঁর মর্যাদা, সন্তান ও মুতা'আল্লিকদের চেনারই কথা নয়। শুধু সেইদিন বিকেলে মহতরম অধ্যক্ষ আবুল কালাম খান আজাদ সাহেবের কাছে শুনেছিলাম যে মুহাদ্দিস ছাহেব তাঁর মুরশিদ আর তিনি হযরত ফুলতলী সাহেবের খলীফা। ফুলতলী ছাহেবকেও খুব অল্পই চিনতাম।

মৌলানা হেলাল সাহেব বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন। সম্ভবতঃ বাড়ির ভেতর গেলেন। একটু পরে ফিরে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন আতরের একটি বড় বোতল, যতদূর মনে পড়ে একটি 'তাকিয়া' (কুশন), আর - পরে বুঝলাম, কয়েক পাতার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আর আরবীতে হযরতের দস্তখত সম্বলিত একটি সীল মোহরও নিয়ে এলেন। তা হযরতের দস্তমোবারকে দিয়ে, মহতরম মৌলানা হেলাল সাহেব - এবং হযরতের আরও দুজন পুত্র -খুব আদবের সঙ্গে, যতদূর মনে পড়ে দস্তবস্তা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হযরত সস্নেহে আমাকে, যতদূর মনে পড়ে, আমার বুকসহ, আতরের বোতলটি থেকে অনেক আতর মাখিয়ে দেন, তারপর আমাকে হাদীসে আওয়্যালিয়্যা পড়িয়ে দেন, তার পর যত দূর মনে পড়ে, যে হাদীস শরীফটি শিখে তা রেওয়ায়েতের অনুমতি চাইতে হযরতের কাছে এসেছিলাম, তিরমিজী শরীফের উপরোক্ত হাদীস শরীফটি পড়িয়ে দেন।

তারপর উপরোক্ত পুস্তিকাটিতে এক জায়গায় আমার নামটি লিখে, শেষের দিকে এক জায়গায় উনার নিজের দস্তখত আর সীলমোহর সন্নিবেশিত করে তা আমাকে দান করেন। খুলে দেখলাম, আমাকে সিহাহ সিত্তাসহ হাদীস শরীফের কিতাব থেকে হাদীস শরীফ রেওয়ায়েতের সঙ্গে সঙ্গে তফসীর, ফিকহ সহ ইসলামের জ্ঞানের আরও বিভিন্ন শাখায় এজাযত ও নিয়োগ দান করেছেন।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে প্রায় হতবাক হয়ে গেলাম। আমি তো মাত্র একটি হাদীস শরীফ ইসনাদের মাধ্যমে শিখে তা রেওয়ায়েতের অনুমতি পাওয়ার আশায় এসেছিলাম,

---

৩ স্থানীয় ভাষায় "আফনার ত কাম অই গেছে"।

এখন এত কিছু প্রদত্ত হলাম। এক কাতরা চাইতে এসে মহাসমুদ্র পেয়ে গেলাম, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যূদ (দানশীলতা) থেকে প্রবাহিত হযরত রাহিমাহুল্লাহ-এর যূদ-এর দরিয়া থেকে।

বললাম, 'আমি ত এইসব হাদীস সব পড়িনি'।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব বললেন, 'মুহাদ্দিস হওয়ার জন্য সব হাদীস জানা জরুরী নয়। কোন হাদীসটি কোথায় পাওয়া যাবে তার ধারণা, কোনটা কোন পর্যায়ের, এসব জানাটাই জরুরী', বা এরকম কিছু।

পুত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা ভাবছ, উনাকে পড়াইনি। উনাকে সনদ কীভাবে দিয়ে দিলাম?' তারপর নিজেই তার উত্তর দিয়ে দিলেন, 'মনে আছে। অমুক আমাকে সনদ দিয়েছিলেন?'

বললেন, 'এটা সেরকমই। একজনের ভেতর সে যোগ্যতা পাওয়া গেলে তা দেওয়া যায়', বা এরকম কিছু।

তাঁর ফিরাসৎ

নিজেকে কোন দিনই খুব একটা কিছু মনে করিনি। চিন্তা করি, হযরত আমাকে কিসের ভিত্তিতে সনদ দেয়ার যোগ্য মনে করে সনদ দান করলেন। বহু বছর পর, এখন মনে পড়ল, হয়ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে সাধারণ গত-মোতাবেক 'মাদ্‌রাসা' পড়ুয়া হিসেবে না হলেও -আশৈশব দয়াময় মা বাবার তত্ত্বাবধানে সুচিত কয়েক দশকে কুরআন শরিফ, পবিত্র সুন্নাহ, ফিকহ, আখলাক, তারীখসহ বিবিধ বিষয়ে যা শিখবার সৌভাগ্য পেয়েছি, তা খেয়াল করে হয়ত অধমকে দয়া করেই যোগ্যের খাতায় শুমার করে নেন।

মুহাদ্দিস ছাহেবের দ্বারে পৌঁছার পূর্বে আশৈশব যৌবনে ২৬ বছর বয়স পর্যন্ত বাবার তত্ত্বাবধানে বাংলা, আসাম আর বেলুচিস্তানে। তার পর, স্বীয় উদ্যোগে মদীনা শরীফ মক্কা শরীফসহ মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের বহু দেশ ছাড়া তার বাইরেও বিস্তৃততর বিশ্বের পূর্ব থেকে পশ্চিম, আর উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত ৩৪/৩৫টি দেশে, আর তার চেয়ে আরও বেশি দেশের মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ-মুফতি, উস্তায ও শায়খগণের কাছ থেকে আরবী-ফারসী-উর্দুসহ ইসলাম ধর্মীয় অধিকাংশ কিতাবাদির ভাষাসহ কয়েকটি ভাষা, নহু-সর্ফ, তজবীদ-কেরাত-তফসীর, হাদীস-সীরাত-সুন্নাহ, উসূল ফিকহ-ফিকহ- ইজতিহাদ ও তুলনামূলক মাযহাব, আকীদা, দর্শন-যুক্তি তথা মন্তিক, তারীখ, তিব্ব, আখলাক্ব ও চরিত্রগঠন মূলক তাসাউফ-তাজকিয়া, ব্যবসায় ও শাসন-প্রশাসনের হুকুম-আহকা ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও, ব্যবহারিক শিক্ষা পর্যায়ে তীরন্দাজী, খালী হাতে আত্মরক্ষামূলক লড়াই, সাঁতারের

কিঞ্চিত শিখি ও কিঞ্চিত তেজারত ও ৪ মাস ছাগল চরানো রাখালকর্ম করি আম্বিয়া 'অলাইহিমুসসালামের সুন্নত হিসেবে। আর এসবের ভেতর দিয়ে কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ফিকহে আসানীদ-ভিত্তিক সনদও প্রদত্ত হই[৪]; বিভিন্ন দেশে উস্তায, ইমাম, খতীব ছাড়াও আমন্ত্রন ক্রমে নিয়োগপ্রাপ্ত ধর্মশিক্ষার শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাতার হিসেবে খেদমত আন্‌জাম দিই এসব ভূমিকাসহ বিভিন্ন ভূমিকায় অষ্ট্রেলিয়ায় কুল্লিয়্যাহ ইসলামিয়া অষ্ট্রালীয়্যাতে কিছুদিন শায়খুল হাদীস, বাংলাদেশে গাজীপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীয়াহ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান ও সহযোগী প্রফেসর, আর কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীয়াহ অনুষদের প্রতিষ্ঠাতা 'আমীদুশ-শরীয়াহ, তথা ডীন ও প্রফেসর; আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যায়ে শরীয়াহ বিষয়ের প্রতিষ্ঠাতা; এমআইটি নামক সর্বোচ্চ বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ প্রফেসরকে ইসলাম শিক্ষাদানে নিয়োগপ্রাপ্ত 'কনসাল্ট্যানট' (মুস্তাশার)।

নিজে কখনোই পূর্বের ঐ পড়াশোনার কথা কিছু মনে করিনি, তাঁকেও বলিনি। সত্য বলতে কি, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সময় পূর্বের ঐ সব ধর্মশিক্ষার প্রাপ্তি আর স্বীকৃতির কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। তাই এসব ধর্মশিক্ষা, শিক্ষকতার অতীত কর্মকাণ্ড নিজেরও খেয়াল ছিল না, হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবকে বলাও হয়নি। তাঁর স্বাভাবিকভাবে

---

৪ বাবা, মা , চাচা, মা'র মামা ছাড়াও বেলুচিস্তানে তাঁর মুরশিদ ও উস্তাদ সিন্ধুর হযরত হাশিম জান মুজাদ্দিদী (র:) সহ, আরো কিছু শিক্ষকের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর আর বিবিধ বিষয় শিক্ষার পর স্বীয় উদ্যোগে ঐ সব বিষয় ছাড়া আরও বিষয়ে শিক্ষালাভের পর কিছু সনদও লাভ করেছিলাম। তার সব বিবরণ এখানে না দিলেও, কিঞ্চিত ধারণা দিলে ভাল হবে। বিশেষ করে মুহাদ্দিস ছাহেবে বিবেচনাকে হালকা ভাবে না নিয়ে তার পেছনে তাঁর সম্ভাব্য রূহানী অন্তর্দৃষ্টি (ফেরাসৎ)কে অনদাজ করে তার যথাযোগ্য কদর করবার জন্য- তিনি ছিলেন আরব আমীরাতের শরীয়হ বিচারালয়ের কাজী, কোন কিছুই হাল্কাভাবে করবার লোক ছিলেন না।

মুহাদ্দিস ছাহেবের দুয়ারে হাজির হওয়ার পূর্বে, আমি বাবা মা ও আত্মীয়স্বজনের ভেতর অন্যান্য আলেমদের বাইরে, মুরশিদ ও উস্তাদ সিন্ধুর হযরত হাশিম জান মুজাদ্দিদী (র:) -এর কাছে ৬ বছর ব্যাপকতর তফসীর ছাড়াও পড়ার বহু পরে মালয়েশিয়ার কেদাহ সুলতানাতের ম'হাদ তাহফীজুল কুরআন লরং আলিফ মাদ্রাসার খলীলুর রহমান রহীমী এবং হিন্দুস্তানের দেওবন্দের শাখারূপ পাকিস্তানের ফয়সলাবাদের জামেয়া দারুল কুর'অনের মুফতি জামীলুর রহমানের কাছ থেকে কুরআন শরীফ আর আমর বিল মা'রূফ ও দাওয়াহর একটি লিখিত ("সরীহান") আসানীদ-ভিত্তিক সনদ লাভ করেছিলাম। এ ছাড়া, বাবারই তত্ত্বাবধানে মিশকাত, আর সিহাহ সিত্তার কিতাবাদি কিছু, আর মুফতী কিফায়াতুল্লাহর তালীমুল ইসলাম ও আশরফ আলী থানবী সাহেবের বেহেশতী জেওর পড়ে থাকলেও, এবং চীনের হযরত আব্দুল মালিক ইউসুফ (র:)-এর কাছে শফেয়ী ফিকহর কিছু, এবং স্বীয় উদ্যোগে হাম্বলী ফিকহর কিতাব আল-মুগনী সহ বিভিন্ন সময়ে কোরান শরীফ, হাদীস শরীফ, ফিকহ, সীরাহ, আর তারীখ পড়েছিলাম। নহু সরফ ছোটবেলায়ই বাবার কাছেই পড়েছিলাম। মরক্কোর ফেজ নগরীর জামেয়া কায়রাউইন (কায়রাউইন বিশ্ববিদ্যালয়)-এর হযরত সৈয়দি ফুদায়ল (র:)-এর কাছে শিখতে যাওয়ার পরে ফেরার সময় আমাকে ঐতিহ্যগত পদ্ধতির আসানীদ-ভিত্তিক কার্যত: (কিনায়ান) সনদ রূপ হাদীস ও ফিকহের কিতাবাদি (ইমাম মালিকের মুয়াত্তা ও মুদাওয়্যানা, ইবন রুশ্‌দের চার মাজহাবের কিতাব বিদায়াতুল মুজতাহিদ, আর মালিকী ফিকহের কিতান আবু জায়দ কায়রাউইনীর রিসালা) দিয়ে দেয়া হয়েছিল।

জানার কথাও নয়। কিন্তু এখন মনে হয়, তিনি সম্ভবত: তাঁর ফিরাসৎ দিয়া তার কিছুহয়ত দেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন, মুমিন 'আবশ্যই আল্লাহর নূর দিয়ে দেখেন', একজনের ভেতরটা পর্যন্ত। ঐ প্রথমে দেখার ঘটনার পর আরো কিছু অসাধারণ ঘটনা থেকে আমার হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের ফেরাসৎ ও সাহেবে- কাশফ হওয়া সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত পর্যায়ের দৃঢ় ধারণা জন্মেছে। এ প্রসঙ্গে সবগুলো না হলেও আরো দু'য়েকটি ঘটনা পরে, জায়গামত বলব।

ধর্মজ্ঞানের কষ্টি পাথর

ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আমি আশৈশবই পাশচাত্য - এবং বিশেষ করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করে, বিশ্বের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, এমআইটি থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি, 'পিএইচডি' অর্জন করেছিলাম। বাবা নিজে সম্ভবত: বৃহত্তর বাংলা ও আসামের প্রথম মুসলিম বিজ্ঞানে স্নাতক অর্জনকারী ছিলেন। সম্ভবত: সমগ্র এশিয়া যদি না'ও হয়। উপমহাদেশের সম্ভবত: প্রথম বেতার প্রকৌশলী ছিলেন। তাঁর নামের পরে 'বি.এস.সি.', আর আগে বা পরে 'রেডিও ইঞ্জিনিয়ার' কথাগুলো এমনভাবে লেখা হত, নামের আগে 'কবি' কথাটির মতই, যাতে এসব তাঁর নামের অংশই যেন হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রভাবে ধর্মের মত একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীও আশৈশবই অর্জন করেছিলাম, যদিও ধর্মের বিস্তৃততর ও সর্ব্বব্যপী উচ্চতর প্রজ্ঞা সীমিততর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর প্রাধান্য রেখে থাকে।

সাধারণের তুলনায় এই অসাধারণ পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই হয়ত একবার খেয়ালে এলো, এত অল্প সময়ে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের মত এত বড় একজন মুহাদ্দিস, ফকীহ আর শায়খ। এবং আমাকে তাঁর সনদ এনায়েতের পর খুব দ্রুত পরম্পরায় মদীনা শরীফসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত ও ধর্মশিক্ষা কেন্দ্রের এতজন বড়বড় মুহাদ্দিস ছাহেবদের একেকজনের কাছ থেকে অল্প সময়েই সনদ প্রাপ্তি হতে পারে কীভাবে। এর গুরু দায়িত্ব পালনের তৌফীক্বই বা পাব কীভাবে? বিজ্ঞানীসুলভ সংশয় এইরূপ চিন্তা মনে আনে বৈ কি!

এইরূপ চিন্তা দূর করতে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব বড় সহজভাবে বলে দেয়া কথা ইমাম গাজ্জালী (র:)-এর দর্শনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধর্মীয় চেতনাকে মুক্ত করার মতই আমাকে মুক্ত করতে সহায়ক হয়। প্রথম কথাটি - অল্প সময়ের ভেতরই কীভাবে সনদ পেয়ে গেলাম, তা আমি মুখ ফুটে প্রশ্ন করার আগেই নিজেই বলে দেন, প্রথম দেখাতেই আমাকে হাদীসই শুধু নয়, ধর্ম শিক্ষার অন্যান্য শাখায়ও সনদ দেয়ার পরপরই বলে দেন। পূর্বে তার উল্লেখ করেছি:

"হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব বললেন, 'মুহাদ্দিস হওয়ার জন্য সব হাদীস জানা জরুরী নয়। কোন হাদীসটি কোথায় পাওয়া যাবে তার ধারণা, কোনটা কোন পর্যায়ের, এসব

জানাটাই জরুরী', বা এরকম কিছু।'[৫]

এই 'কোন হাদীসটি কোথায় পাওয়া যাবে তার ধারণা, কোনটা কোন পর্যায়ের' -এই টুকুই বা এত অল্প সময়ের ভেতর কীভাবে অর্জিত হয়, যার ভিত্তিতে সনদ দিয়ে দেয়া হয়? বিশেষ করে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ -আর ওপরে উল্লিখিত অতি উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস সাহেবান দ্বারা? তাঁদের পক্ষে হাদীস শরীফের বিষয়ে হাল্কাভাবে কোন কিছুই বলা বা করাটা -মুহাদ্দিসের সনদ দিয়ে দেয়া তো অনেক বড় কথা -হতেই পারে না।

এটা হতে পারে বিভিন্ন পর্যায়ে বা পর্যায়ক্রমে। সনদ-দানকারী হযরতের কাছে আসার পূর্বেই নতুন সনদ যাকে দেয়া হবে, শিক্ষার্থী অন্যান্য শিক্ষক থেকে এই জ্ঞান ইতি পূর্বেই অর্জন করেছে -সে সম্পর্কে সে নিজে সচেতনও যদি না হয়ে থাকে নিজস্ব তাওয়াজ্জু বা বে-হূশীর কারণে; এবং যেই নতুন শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থী এসেছে, তিনি তাঁর নিজস্ব মখসূস পদ্ধিতে তা পরীক্ষা নিয়ে নতুন শিক্ষার্থীর সনদের জন্য দরকার পর্যায়ের জ্ঞান তার আছে বলে নিশ্চিত হতে পারেন।

এই দ্বিপর্যায়গত শিক্ষাগত যোগ্যতা নিশ্চিতায়ন-ভিত্তিতে সনদ প্রদান ত' আজকাল, আধুনিক যুগেও, সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ডুবে থাকা পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান বিষয়গুলোতেও সনদাদি দানের ক্ষেত্রে (RPL - Recognition of Prior Learning) পূর্বতন শিক্ষার স্বীকৃতি' বলে প্রচলিত আছে, হার্ভার্ড-এমআইটি অক্সফোর্ড-ক্যাম্ব্রিজ সবখানেই বিনা দ্বিধায় প্রচলিত আছে, যতক্ষন সনদ প্রদানকারীর যোগ্যতা ও শিক্ষার্থীর পূর্বতন শিক্ষার পরীক্ষার পদ্ধতিটি হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত ও প্রচলিত বিবিধ বিকল্প পরীক্ষা পদ্ধতির অন্তত: যে কোন একটি। তাতে সময় সময় এক বছর, এক বৈঠক বা তার চেয়ে কম বা বেশি যাই লাগুক না কেন।

একটি সনদ প্রাপ্তির জন্য যেই ন্যূনতম যতটুকু জ্ঞান জরুরী ততটুকুও একজন শিক্ষার্থীর আছে কি না, তার অল্প সময়ই শুধু শিক্ষকের সোহবতের ভেতরই নিশ্চিতায়নের উপরোক্ত উপায় ছাড়া আরেকটি বিকল্প উপায় হয়ে থাকে - নতুন সনদ প্রদানকারী শিক্ষক নিজের ফেরাসৎ দ্বারা নতুন শিক্ষার্থীর ঐ রকম ঐ পর্যায় পর্যন্ত জ্ঞানের উপস্থিতি দেখতে পারেন হয়ত যদি তিনি ফেরাসৎওয়ালা হয়ে থাকেন।

উপরোক্ত পর্যায় ছাড়াও, আরও উপায়ে একজন শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে অন্যদের শিক্ষাদানের অনুমতি ও দায়িত্ব প্রদানমূলক সনদ দান করতে পারেন। কখনো কখনো, আল্লাহ তা'আলার খাস রহমতে, একজন ধর্ম শিক্ষক, তাঁর শিক্ষাদানে আল্লাহ-প্রদত্ত খাস বরকতে, নিজ থেকেই তাঁর প্রদেয় সনদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানটুকু নতুন

---

৫ উপরে দ্রষ্টব্য।

শিক্ষার্থীর হৃদয়ে প্রদান করেন, শিক্ষার্থীর গভীর আগ্রহের কারণে -অসাধারণ দ্রুততায়। আর তার ভিত্তিতেই তখনই নতুন শিক্ষার্থীটিকে অন্যদের শিক্ষাদানের সনদ দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রা:)-কে এভাবে জ্ঞান দান করে, প্রদেয় সনদের জন্য তাঁদের তৈরি করে নিয়ে তাঁদের সনদ প্রদান করেন, কখনো কখনো অতিদ্রুততার সঙ্গে। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত মাত্র ২ বছর ৩ মাসের মত পেয়ে থকলেও, সমভবত: সবচেয়ে বেশি হাদীস রেওয়য়েত করেন ও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ থেকে হাদীস শরীফ সংরক্ষনের বিশেষ দোয়া তথা সনদ লাভ করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের অনুসরণে উলামাও কখনো কখনো এরকম করে থাকতে পারেন।

উদাহরণ স্বরূপ, অমাকে পূর্বে কখনোই দেখেননি যেই হযরত প্রফেসর সৈয়্যদ আলী আশরাফ (র:), তিনি ধর্ম শিক্ষাদানে আমাকে অসামান্য পর্যায়ের দায়িত্বে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮-এর ভেতর কোন এক সময় হযরত প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফ (র:) সাহেবের সোহবত লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁকে আমি চিনতাম না, তিনিও আমাকে চিনতেন না। কিন্তু আন্তর্জাতিক সফরে ঢাকায় থামলে টেলিভিশনের জন্য ধর্মীয় শিক্ষামূলক কয়েকটি বক্তৃতা রেকর্ড করিয়ে দিতে অনুরুদ্ধ হলে, ঘটনাচক্রে রামপুরাস্থ টিভি কেন্দ্রে তাঁর একটি রেকর্ডিং শেষ হলে আমার রেকর্ডিং শুরু হলে তিনি স্টুডিওতেই থেকে গিয়ে আমাকে লক্ষ্য করতে থাকেন। আমার রেকর্ডিং শেষ হলে আমার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথোপকথনে কিছু প্রশ্ন করে, এক পর্যায়ে বলে উঠলেন, অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। এখানে থেকে গিয়ে আমাকে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করুন। প্রথম দেখাতেই আমার রেকর্ডিং শুনে ও দেখে, এবং সংক্ষিপ্ত কথোপকথনে কিছু প্রশ্নের ভেতর দিয়ে, মনে হয় তিনি আমাকে পরীক্ষা করেছিলেন। তার পরেই আমিও আমার সফর ও পরিকল্পনাদি বাদ দিয়ে তাঁর এক কথায়ই থেকে গেলে, তিনি আমাকে তাঁর ঐ নিখাদরত ধর্মশিক্ষাদান চেতনার নতুন জামে'য়া দারুল ইহাসানে মিশরের আল-আজহারের উস্তাযগণ দ্বারা পরিচালিত 'আলিয়া' পর্যায়ের শিক্ষাদানে প্রফেসর তথা উস্তাযসহ একাধিক বিভাগের প্রফেসর বা উস্তায ও প্রধান হিসেবে নিয়োগ দানই যে শুধু করেন তাই নয়, সমগ্র জাতির মাদ্‌রাসা শিক্ষাসহ, দেশে ব্যাপকতর ধর্মশিক্ষা দানের ক্ষেত্রে অসামান্য দায়িত্ব দান করেন। খুব সম্ভব তাঁরই উদ্যোগে সে সময় মাদ্‌রাসা শিক্ষা পাঠ্যক্রম সংস্কারের জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট যে জাতীয় কমিটি গঠিত হয়, তাতে লালবাগ মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস 'আজীজুল হক[৬],

৬ এর একটু আগে, ১৯৯৩ বা ১৯৯৪ সনে), আমি দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদীস সাহেবের (র:)-এর উস্তাদ, হযরত আশরফ আলী থানবী (র:), তাঁর খলীফা হাফজ জ্বী হুজুরের (র:) ও তাঁর খলীফা টঙ্গীর চেরাগ আলী বাজার জামে' মসজিদের খতীব ও ইমাম, ও নিকটবর্তী দত্তপাড়া মাদ্‌রাসার উস্তাদ হযরত=

হাটহাজারী ও ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস ও উস্তায, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব উবায়দুল হক ও সঙ্গে আমি অধমকেও সদস্য পদ দান করে ঐ কাজে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঐ প্রথম দেখার সংক্ষিপ্ত পরীক্ষায়, উনি কিসের পরীক্ষা নিয়েছিলেন জানি না। তবে ধর্মশিক্ষার ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে যে এভাবে পরীক্ষা নিয়ে পূর্বতন শিক্ষার ভিত্তিতে নতুন সনদ বা স্বীকৃতি -লিখিত, মৌখিক, বা কার্যত: - দেয়া হয়, এটা ছিল তারই আরেকটি উদাহরণ।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব (র:)-এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের রাতে কয়েক ঘণ্টার ভেতরই তৎকর্তৃক আমি অধমকে ধর্মশিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে ঠিক সে সময় না বুঝলেও, পরে বুঝতে পারি। তাঁর ছিল অসাধারণ ফেরাসৎ -আর আমি নিজেও সে সময় তা খেয়াল না করলেও, এবং তা তাঁকে কখনোই না বলে থাকলেও, তিনি হয় তাঁর ফেরাসৎ দিয়ে, নয় সে রাতে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার অজ্ঞাতেই তিনি আমার পরীক্ষা নিয়ে, বা এ দুয়েরই সমন্বয়ে আমার তাঁর সঙ্গে দেখার পূর্বে কয়েক দশকের ধর্ম শিক্ষার ধারণা করে পরেই ধর্ম শিক্ষাদানে খেদমতের জন্য তাঁর তরফ থেকেও সনদ প্রদান করেন। আর, তারও পর, তাঁর বরকত-মণ্ডিত শিক্ষাদান ব্রতে, তিনি (এবং তাঁরই মত আরো কোন কোন বুজুর্গ) আমি অধমকে নিজের থেকে জ্ঞানের ফয়জ দান করেও আমাকে সনদ দান করেন খেদমতের সুযোগ করে দেয়ার নিমিত্তে।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের কাছ থেকে এইভাবেই পরীক্ষিত ও নিশ্চায়নের পরই তাঁর কাছ থেকে তাঁর মুবারক আসানীদের ধারাবাহিকতায় তাঁরও অনুমতি ও নিযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে তাঁর মহানুভবতায় লাভ করি। অল্প সময়ের সোহবতের পর প্রাপ্ত অন্যান্য সনদের ক্ষেত্রেও তাই হয়। হযরত মুহাদ্দিস (র:) এবং তাঁর মত ঐভাবে বিচার করে সনদ বা দায়িত্ব দানকারী অন্য ক'জন বুজুর্গ-গণও ছিলেন ধর্ম শিক্ষা ও তা প্রদানের জন্য লোক বাছাইয়ের পরীক্ষার অসাধারণ কষ্টি পাথর।

হাদীস শাস্ত্রের পরশ পাথর

আমার মুর্শিদ ও সর্ব্বোচ্চ উস্তায, হযরত মৌলানা শাহ মুহম্মদ আব্দুর রশীদ হামেদী সিদ্দীকী তাঁর আলিয়া মাদ্‌রাসার মুহতামিম হলেও, বসতেন মাদ্‌রাসার 'দারুল-হাদীসে'র কার্যালয়ে। তাঁকে যখন অনেকটা অলৌকিকভাবেই পেয়ে তাঁর শিষ্যত্বের সা'আদৎ লাভ করি, তখন তাঁর বয়স সম্ভবত: ৯৮ বৎসর। তাঁর পার্থিব সাক্ষাৎ সোহবতের সুযোগ বেশি পাইনি।

=মোহাম্মদ ইউনুসের - এই তিন জনের তরফ থেকে, সবশেষ জনের মারফত ফিকহ - ও বিশেষ করে, তার অতি মৌলিক কিতাব, আশরফ আলী থানবী সাহেবের (রঃ) বেহেশ্‌তী জেওর পড়ানোর - আসানীদভিত্তিক সনদও প্রদত্ত হয়েছিলাম।

কিন্তু আমার প্রতি তাঁর অসাধারণ স্নেহ ও দয়ায়, এই দৃশ্যতঃ অল্পকালীন সোহবতেরই সীমিত সংখ্যক হাজিরাতেই তিনি ধর্মজ্ঞানের বিবিধ শাখারই জ্ঞনেরই বীজ বপন করে দেন। পরশ পাথরের মতই যেন তাঁর সেই স্পর্শ হয়েছিল। তাঁরই নির্দেশে ১৯৯৪ ইং-তে তাঁর ইন্তেকালের পরেও। বিভিন্ন দিকে প্রেরিত হয়ে সেই পরশ-স্পর্শের দ্বারা সিঞ্চিত হই। তারই ধারাবাহিকতায় পূর্বে বর্ণিত অবারো অলৌকিকভাবেই হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের দুয়ারে পৌছে আমি যেন সেই পরশ পাথরের স্পর্শের বরকতের এক ঢলের দরিয়ায় গিয়ে পড়ি। মুহাদ্দিস ছাহেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষতেই তদ্বারা আমি অধমও মুহাদ্দিস হিসেবে সনদে মস্তনদ হওয়ার পর, একের পর মুহাদ্দিস হিসেবে আরো অনেকগুলো সনদে যুক্ত ও এজাযত ক্রমে নিযুক্ত হই। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নতে মুকাদ্দসের/হাদীস শরীফের খাদেম হিসেবে।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের নিকট থেকে ঐ ভাবে হাদীস শরীফ ছাড়াও কুরআন শরীফ, তফসীর, ফিকহ ও আখলাকের সনদ প্রাপ্তির পূর্বের ঐ ধর্মীয় শিক্ষাগত পড়াশোনা, আর কিছু সনদাদি প্রাপ্তি সে সময় আমার মনে না থাকলেও, ছিল। কিন্তু এসবের কোন পর্যায়েই এর আগে মুহাদ্দিস ছাহেব (র:)- এর মত এত পরিষ্কার করে কেউই এত ব্যাপক বিষয়-বিস্তারে বিস্তারিত লিখিত সনদ দেননি।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের সঙ্গে ঐ এক দেখার সোহবতটা আমার যেন হয়ে দাঁড়াল আসানীদ-ভিত্তিক সনদাদি প্রাপ্তির এক ঢলের বাঁধ উন্মুক্তির মত। বিশেষ করে হাদীস আর ফিকহ শিক্ষাদান ও ব্যবহারিক পর্যায়ে প্রয়োগের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে। রারাইতে আমীরাতের উম্মুল কু'আইনের কাজী আর সিলেটের ইছামতি মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ও শায়খুল হাসীস হযরত মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেবের বৈঠকে তাঁর দস্ত মুবারকে উক্ত কুরআন শরীফ, ফিকহ আর আখলাক্ব সহ হাদীসের ঐ বিস্তৃত সনদ প্রাপ্তির দিন দু'য়েক বা তার আশে পাশের ভেতর। অমার মদীনা শরীফে ফেরার সফরেই, পথে - ঢাকার আজীমপুরে, চট্টগ্রামের হাটহাজারী আর ঢাকার আলীয়া মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস খতীব ছাহেবের নিকট বুখারী শরীফের তাঁর উস্তায দেওবন্দের হযরত হুসেন আহমদ মাদানী (র:)-এর ব্যক্তিগত নুসখা থেকে কিছুটা পাঠ করে তাঁর দস্ত মোবারক থেকে হাদীস শরীফে আরেকটি সনদ প্রাপ্ত হই।

যতদূর মনে পড়ে। ঐ একই সপ্তাহে মদীনা শরীফে আমি প্রফেসর হিসেবে যে কাজে নিযুক্ত হই, তাতে যোগ দিতে গিয়েদেখি, দরজা দিয়ে ঢোকার আগেই দরজার মাথার ওপরে ঐ হাদীস শরীফটিই লেখা, যা আসানীদ-ভিত্তিকরূপে শিখে তার রেওয়ায়েতের আসানীদ-ভিত্তিক এজাযত লাভের আশায় হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের কাছে গিয়েছিলাম:

نضَّر اللهُ امرأً سمِعَ مقالَتي فوَعاها فأدَّاها كما سمِعَها

কাজে যোগ দেয়া সংক্রান্ত দলীলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, হযরত সৈয়দ তৈসীর ইউসুফ

হামদান হযরত আমাকে 'উস্তাযুল-কামিল' বলে উল্লেখ করেন, আর যোগদানের অল্প পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে, মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর শায়খুল হাদীস আর মদীনায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীস শরীফের উস্তায, হযরত 'উমর ফালাতা (দঃ বঃ)- এর সঙ্গে দেখা হলে, তাঁর সঙ্গে হাদীস শরীফ নিয়ে কোন একটি কথোপকথনের কোন এক পর্যায়ে উনি হঠাৎ আমাকে হাদীস শরীফের রেওয়ায়েতর এজাযত ও সনদ দিতে চাইলেন। আমি তার আগে তাঁর কাছে যথারীতি হাদীস শরীফ শিক্ষা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তিনি আমাকে মসজিদে নববী শরীফে তাঁর হাদীস শরীফের দারসে যোগদানের জন্য বললে আমি কিছুদিন সেই মুবারক জায়গায় তাঁর পায়ের পাশে বসে তাঁর কাছ থেকে তাঁর আরো কিছু শিক্ষার্থীর সঙ্গে হাদীস শরীফ শিক্ষা করি। তার পর একদিন, তিনিও আমাকে হাদীস শরীফে একটি সনদ লিখে দেন।

"সকরুজ্জা' শব্দটি ধারণ করে এমন একটি বিশেষ হাদীস খুঁজেতে খুঁজতে ইন্দোনেশিয়ায় আরবপল্লী বলে পরিচিত একটি এলাকায় মাদ্‌রাসা খয়রিয়াহ নামক মাদ্‌রাসার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হিসেবে নিয়োজিত যে ইয়েমেনী নবী বংশীয় মুহাদ্দিস, হযরত সৈয়্যদ মুহম্মদ আলী বা'রোকবা আল-হাদ্রামী (দাঃ বঃ)-এর কাছে পৌঁছে তাঁর কাছে ৬ বৎসর আসা যাওয়ার ভেতর দিয়ে হাদীস শরীফ ও ফিকহ। প্রধানতঃ শাফেয়ী -শিক্ষা লাভ করি, তিনিও এই রকম সময়েই, আমাকে হাদীস শরীফে লিখিত সনদ দান করেন। আর একই রকম সময়ে, জেদ্দা তথ মক্কা শরীফের নবী বংশীয় বয়োজৈষ্ঠ্য শায়খ, সৈয়দ আব্দুর রহমান আস-সাক্কাফ আমাকে এক বাক্যে 'হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সব কথা', তথা কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, সীরাত, আখলাক ও তাসাউফসহ, তাঁর থেকে রেওয়ায়েত-কৃত, আর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সব কথা সম্পর্কিত সব কথাই রেওয়ায়েত ও শিক্ষাদানের অনুমোদনক্রমিক নিযুক্তির এজাযত বা সনদ দান করেছিলেন।কিন্তু এ দু'টি সনদের প্রথমটি ব্যাপক হলেও ছিল মৌখিক, আর দ্বিতীয়টি লিখিত ও বিস্তারিত হলেও ছিল হাদীস শরীফ ও ফিকহে সীমিত।

তার একটু পরেই হজ্জের সময় আরফাহ-এর দিন ঘটনাচক্রে কী জানি খুঁজতে গিয়ে একটি তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছে সেখানে চারি দিকে এত গহমা-গহমীর ভেতরেও একান্ত একলাই ইবাদতে মশগু একজন বয়োজৈষ্ঠ বুজুর্গকে দেখতে পাই। উনি মুহাদ্দিস বলে মনে হয় শুনতে পেয়ে তাঁর কাছে একটি হলেও হাদীস শরীফ শেখার আশায় তাঁর দুয়ারে অপেক্ষা করি। উনি কথা বললে, মনের ইচ্ছাটি বোধ হয় বলি। কথার এক পর্যায়ে উনি পর দিন আমাকে মীনায় তাঁর তাঁবুতে আসতে বলেন।

পরের দিন জখমী পা নিয়ে হাটতে খুব কষ্ট হলেও বহু খুঁজে খুঁজে দূরে একসময় উনার তাবুতে গিয়ে হাজির হই। আমাকে যা শেখানোর তা ত গতকাল আর এই দিনও

শেখালেন, আর তারপর তার এক ছাত্র। সম্ভবতঃ তার কাতিবকে ডেকে কাগজপত্র আনতে বললেন, তারপর অনেকগুলি পৃষ্ঠার একটি আসানীদ-ভিত্তিক সনদ আমার নাম লিখে, নিজের তরফ থেকে আমাকে ঐ সনদ দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। সনদ প্রদানকারী এই মুহাদ্দিস ছাহেবের নাম দেখলাম, সাহারনপুর জামে'আ মাজাহারুল উলূমের শায়খুল হাদীস, হযরত মৌলানা ইউনুস জৌনপুরী (রঃ)। যিনি শায়খুল হাদীস মৌলানা জাকারিয়া কান্দাহলবী (রঃ)-এর সেই খলীফা যাঁর সম্পর্কে তিনি তাঁর ইন্তেকালের পরেই শুধু খোলা যাবে বলে অসিয়ৎ করে বন্ধ রাখা একটি খামের ভেতরে লিখে রাখা একটি দলীলে লিখে রেখে গিয়েছিলেন যে, তাঁর এই শাগরেদ তাঁর থেকে অগ্রসর হবেন। পরে জেনেছি, ইমাম বুখারীর (রঃ)-এর, মতই তিনি এই যুগে স্বীয় যুগের 'আমীরুল মু'মিনীন ফি'ল হাদীস' বলে পরিচিত ছিলেন।[৭]

৭ হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব (রঃ) এবং তাঁর মুরশিদ হযরত আব্দুল লতিফ ফুলতলী (রঃ) এবং তাঁর মুরশিদ হযরত মৌলানা ইসহাক্ব বদরপুরী (রঃ) এবং তাঁর মুরশিদ হযরত হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (রঃ) সকলেই, তাঁর ওয়লিদ মুহতরম, হযরত কেরামত আলী জৌনপুরী (রঃ)-এর জৌনপুরী সিলসিলার বুজুর্গ ছিলেন। আমার মুরশিদ (রঃ)-এর সিলসিলা হযরত কেরামত অলী জৌনপুরী (রঃ)-এর সতীর্থ, হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী সিপাহসালার (রঃ) থেকে প্রবাহিত হলেও, আমার মুর্শিদে (রঃ)-র রূহানী নির্দেশনার পথ ধরে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের নিকট পৌঁছাবার পর এক দিকে তারপর দূর দূরান্তের বিভিন্ন জৌনপুরী হযরতের সান্নিধ্য ও তাঁদের নিকট থেকে সনদ প্রাপ্তি ঘটে, অন্যদিকে তাদের কাছে পৌছাবার পূর্বেই জৌনপুরী সিলসিলার সঙ্গেও একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতের কিছুটা ইঙ্গিত বা প্রস্তুতি হিসেবে। শেষবার বাবার সঙ্গে বদরপুরে জৌনপুরী সিলসিলার মৌলানা ইসহাক সাহেব (রঃ)-এর মসজিদে গেলে তাঁর শুভদৃষ্টি আমার ওপর এনায়েত হয়েছিল, আর তার কয়েক দশক পরে, ধাকায়, হযরত কেরামত অলী জৌনপুরীর (রঃ)-এর নাতি ওতাঁর সিলসিলার বয়োজৈষ্ঠ বুজুর্গ, হযরত রশীদ আহমদ জৌনপুরী (রঃ) -এর সানিধ্যে কিছুদিন শিক্ষা ও সোহবতের ফয়জ লাভের সৌভাগ্যও হয়েছিল। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ ইং-এর ভেতর কোন এক সময় মুফাসসির ও মুহাদ্দিস, শায়খ হযরত রশীদ আহমদ জৌনপুরী (রঃ) আর হযরত রশীদ আহমদ জৌনপুরী (রঃ)-এর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয় বেশ কিছুকাল। তিনি কেরামত আলী জৌনপুরী (রঃ)-এর নাতি ছিলেন, আর আমার ঐ সোহবত লাভের সময়টা এটা তাঁর ১১৪ বৎসর বয়সে ইন্তেকালের কিছু পূর্বের ঘটনা -তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর কর্মক্ষেত্রে গেলে আমি তাঁর কোম্পানী ডিরেক্টরের বিশাল টেবিলের একপাশে খুবই চুপ চাপ বসে থাকলেও - তাঁকে ঘিরে বসে থাকা অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক সময় আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, "এ খুব গভীর জলের মাছ" (বা ঐ রকম কিছু)। আমি আজও ঠিক জানি না, এটা বলতে তিনি ঠিক কি বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু সেসময় থেকে আমি তার বিশেষ স্নেহের পাত্ররূপ তাঁর কাছ থেকে আরবী ভাষার উচ্চতর কিছু, তাজকিয়া, আর হিকমতের অমূল্য কিছু জ্ঞান শিক্ষা লাভ করি, এবং তার শিক্ষা দেয়া কিছু আমলের মাধ্যমে, তার বিশেষ দোয়ার বরকতে আমার মদীনা শরীফ হিযরতের পথের কিছু শক্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হলে মদীনা শরীফ ফিরে যেতে রওনা হলে তিনি আমাকে বন্দরে যাওয়ার গাড়ীতে তুলে দিয়ে জানিয়ে বিদায় করেন - এটাই যতদূর মনে পড়ে, তাঁর সঙ্গে ইহজগতের শেষ দেখা। এর পর, চক বাজারে হযরত হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (রঃ)-এর রূহানী নির্দেশনায় বদরপুর গিয়ে পৌঁছালে, মৌলানা ইসহাক বদরপুরী সাহেবের (রঃ)-এর নিকট থেকে জৌনপুরী সিলসিলার খেলাফৎও লাভ করি, আর মুরশিদ মুহতরমে বরকতে যাঁর তরফ থেকে ইতি পূর্বেই সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ)-এর শিষ্য ও তাঁরই অপর শিষ্য, হযরত কেরামত আলী জৌনপুরী (রঃ)-এর সতীর্থ বালাকোটের সিপাহসালার হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)-এর সিলসিলাধীন হামেদী সিলসিলায় মুজাদ্দিদিয়া, ক্বাদেরিয়া, চিশতিয়া, ক্বরনিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুহাম্মদিয়া তরীক্বার খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলাম।

আজকে ফিরে দেখে বুঝতে পারি, মুর্শিদে আজীজ, মহতরম হযরত মৌলানা মুহম্মদ 'আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী (র:) সাহেব হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা তামিলে প্রাপ্ত হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের কাছে হাদীস শরীফ শিখে রেওয়ায়েতের অনুমতি ভিক্ষার পর এত অল্প সময়ে এত বিভিন্ন ধারার বড় বড় মুহাদ্দিস ছাহেবগণের নিকট থেকে এভাবে সনদ প্রাপ্তি ভিত্তিতে আমি অধমেরও তাঁদেরই পেছন পেছন মুহাদ্দিস হিসেবে নিযুক্তি, হযরত মুরশিদ আর হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাধ্যমে প্রাপ্ত সেই অসাধারণ বরকতেরই ফল যা হুজূরে আক্বদসের খাস স্নেহ থেকে উৎসারিত - তাঁদের স্পর্শটাই পরশ পাথের স্পর্শের মত; মুহাদ্দিস ছাহেব (র:) ছিলেন সেরকম এক পরশ পাথর যার সংস্পর্শে এসে আমার মত না-চীজকেও মুহাদ্দিস ছাহেবানদের মহান সমাজের অন্তরভুক্ত করে নেয়া হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক যেন এই দায়িত্বের নেয়ামতের গুরুভার যথাযথ যথাসাধ্য বহনের তৌফীক্ব দান করেন।

আমীরাতের কাজী

যদিও তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, তাঁর মুহাদ্দিস পরিচয় জানতে পেরে -অচিরেই তাঁর কাজীর পরিচয়ে তাতে কাজী হিসেবে আর তাঁর ফিকহ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞতায় আরো বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস পূর্বেই জেনেছিলাম - مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ - অর্থাৎ, 'যাঁকে আল্লাহ মঙ্গল দিতে চান, তাঁকে ধর্মে 'ফিকহ' দান করেন'। এ জন্যই ফিকহ, ও তার প্রায়োগিক উচ্চতর পর্যায় ইফতা আর কাজীর সুমহান দায়িত্বের কাজের ইলমে আগ্রহ ছিল। 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নহি 'আনি'ল-মুনকারের' চূড়ান্ত সামাজিক-ব্যবহারিক পর্যায়, যথা 'এমারত' বা 'আমীরাতে'র কাজেরও নিয়ম-কানুন তথা 'আহকাম আল-সুলতানিয়া'-এর ইলমেরও আগ্রহ ছিল অল্প বয়স থেকেই। বিশেষ করে ৭ বছর বয়সের আশপাশ থেকেই, ১৯৫৮ সনে চোখে পড়ার মত পদক্ষেপ নেয়া আইয়্যুব খানের সামরিক অভ্যুত্থানের সময় থেকেই। ঐ বয়সেই বাসায় বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভাষা সংগ্রামসহ বিবিধ পর্যায়েই বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, ও আন্তর্জাতিক উপনিবেশবাদ- সাম্রাজ্যবাদ আর আঞ্চলিক সম্প্রসারণবাদের সচেতন বিরোধিতাকারী মা-বাবার কথাবার্তা, আর কিন্ডার গার্টেন পর্যায়েও, নিজের অসাধারণ শিক্ষালয়টিতে কাশ্মীর যুদ্ধে সব হারিয়ে মুহাজির হিসেবে বেলুচিস্তান আসা তরুন জুলুম-সচেতন শিক্ষক ফজলে হক মীর (র:)-এর মত শিক্ষক, আর সহপাঠী আরেক কাশ্মীরের মজলূম পরিবারের সন্তান, আব্দুল জলীলের নিজ বাসায় বড়দের কাছে শোনা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ন্যায় অন্যায়ের বয়ান শুনে -এ বয়সেই জুলুমের প্রতিরোধে, আর বিল-মা'রূফের ব্যবহারিক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ সচেতন হই, ঐ অল্প বয়সেই। এরই ফলে 'কিন্ডারগারটেন ২' শ্রেণিতেই আমাদের বয়োজৈষ্ঠ ক্লাস ক্যাপ্টেনের

আমাদের শিক্ষকের অনুপস্থিতে অন্য সব ছাত্রদের আচরণ নিয়ে শিক্ষককে দেয়া, ক্যাপ্টেনের নিজের বন্ধুদের পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট নালিশ নামা দিয়ে বাকী ছাত্রদের কাউকে কাউকে অন্যায়ভাবে বেতের বাড়ি খাওয়ানোতে অতীষ্ঠ ও ভীত সন্ত্রস্ত সব ছাত্রদের এই জুলুম থেকে উদ্ধারের জন্য, তাদের পক্ষে কথা বলা বা ব্যবস্থা নেয়ার জন্য, ঐ ৬ বা ৭ বছর বয়সেই, ক্লাসের বাচ্চাদের নিয়ে Wee Children's League প্রতিষ্ঠা করে সমস্যার বিহিত করে, জীবনের প্রথম বাস্তবিক রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিই। যদিও এর পর সারা জীবনই দলীয় রাজনীতি থেকে সচেতনভাবেই অতি সন্তর্পণে বেঁচে থাকি। কিন্তু সমাজে ইনসাফ নিশ্চিত করা'র জন্য অন্তর্দৃষ্টি বাড়ানোর জন্য ব্যাপকতর রাজনীতি বিজ্ঞান ও আইনের মাধ্যমে ঐ ব্যাপকতর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহারিক পদ্ধতিতে ইনসাফ কায়েমের চেষ্টায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্য আইন। উভয়েই ডক্টরেট অর্জনমূলক পড়া শোনা করি।

কিন্তু ফিক্বহ, ইফতা আর কাজীর বিচারের পদ্ধিত ছাড়া, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও আইন বিষয়ের পারদর্শিতা দিয়ে প্রকৃত ইনসাফ ও তার নিশ্চিতায়ক, আল্লাহ তা'আলার ধর্মের প্রায়োগিক রূপ, হযরত রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -র শরীয়তে মুক্বাদ্দসাও প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, তার উৎসারক বিশ্বব্যাপী তাঁর মহব্বতের সেই প্লানবও সম্ভব হবে না যার বিশ্বপ্রেমী প্রভাবেই একমাত্র জগতে সকলের জন্য প্রকৃত নিরাপত্তা ও শান্তির নিশ্চয়তা বিধান হতে পারে। আকৈশোরই ফিকহে আগ্রহ থাকলেও, কৈশোরেই অনেকটা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (রঃ) এবং কাজী নজরুল ইসলাম - এর মতই মার্ক্সীয় দর্শনে নিপীড়িতের স্বার্থে সংগ্রামের কথায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। সেই অনুপ্রেরণা পথ ধরে নবতারুন্যে অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় তুলনামূলক মার্কসবাদে উচ্চতর শিক্ষালাভ ও গবেষণাকালেই, পরিষ্কারভাবে এই সত্যটি অনুধাবন করতে পারি যে, ফিকহ, ইফতা আর কাজীর বিচারের মাধ্যমে শরীয়ত নাফিজ-পূর্ব্বক ধর্মে শেখানো সর্বজীবের প্রতি আন্তরিক বিশ্বপ্রেম ছাড়া সকলের জন্য ইনসাফ কায়েম সম্ভব নয়।

মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট-ব্যবস্থায় বস্তুগত পর্যায়ে কিছু অন্যায় বা না-ইনসাফী দূর করা গেলেও, তার মূল্য গিয়ে দাঁড়ায় অত্যন্ত বেশি। মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে নিয়ে, মানুষকে যন্ত্রের মত ব্যবহারপূর্বক তার মানসিক স্বাস্থ্য ধ্বংস, তার ধর্মপালন নির্দয়ভাবে নিষ্পিষ্ট করে তার চরম আত্মিক ক্ষতি সাধনের পরেও, সমাজের স্বার্থের নামে ব্যক্তির মৌলিকতম ব্যক্তিসত্ত্বাকে পর্যন্ত দলিত করে, 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবে'র নামে কোটি কোটি মানুষকে হত্যা বা চরম নিপীড়ন লক্ষ্য করি। তার বিকল্প হিসেবে উপস্থাপিত পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শ্রেণি নিপীড়নে তা আগে থেকেই বীতশ্রদ্ধ ছিলাম। সাধারণভাবে পাশ্চাত্য, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদারনৈতিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও। এমতাবস্থায় পুঁজিবাদের একটুখানি ন্যায়ানুগ করে আনা

রূপ, বিলাতের কীনসের 'সমাজকল্যাণ' ব্যবস্থা - আর সমাজবাদের একটু খানি 'মানবিক' করে আনা রূপ, হিন্দুস্তানের গান্ধীর 'সিন্ডক্যালিস্ট' সমাজবাদও ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগের সাময়িক রাজনৈতিক সমস্যার সাময়িক সমাধানই শুধু প্রমাণিত হয়।

নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষা ও পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণেই কিছুটা, স্বধর্ম ও ঐতিহ্যের কাজীর বিচারকেই মনে হয় এমন একটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাভাবিক ব্যবস্থা যা হাজার বছরেরও বেশি কাল ধরে সমাজে ন্যায় বিচারসহ সার্বিক মঙ্গল ধরে রেখেছিল, যা ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসনের মাধ্যমেই শুধু অস্বাভাবিকভাবে তুলে দেয়া হয়েছিল তুলনামূলক সাম্প্রতিককালে। এই কাজীর বিচারের পুণরুজ্জীবনকেই এবার মানব সমাজ থেকে অন্যায় অবিচার, নিপীড়ন-উৎপীড়ন উৎপাটিত করবার একমাত্র যথার্থ উপায় মনে হয়, ব্যবহারিক বিচারেও। ধর্মীয় কারণ ছাড়াও।

জানতে পারলাম হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব, আমীরাতের উম্মুল কুআইনের অত্যন্ত সম্মানিত ও যোগ্য সহকারী কাজী ছিলেন আনন্দমণ্ডিত বিস্ময়েই যেন বিহ্বল হলাম। এই যুগে একজন জ্বলজ্যান্ত আসল কাজীই স্বচক্ষে দেখতে পাব। এ যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। অন্যদের কাছে তিনি সাদরে 'মুহাদ্দিস ছাহেব' হিসেবে সারা দুনিয়ায় সম্যক পরিচিত হলেও। সেই পরিচয় শুনেই আমিও তাঁর কাছে আকৃষ্ট হয়ে রেওয়য়েতের এজাযতসহ একটি মাত্র হাদীস শরীফ পাওয়ার আশায় এসেছিলাম। কিন্তু, তাঁর ঐ কাজী পরিচয় শুনার পর, আমার হৃদয়ে তাঁর প্রধান পরিচয়টি হয়ে দাঁড়ালো, আমীরাতের কাজী। আমীরাত দিয়েই ত সমাজে ন্যায়নিষ্ঠ শাসন আসবে, আর সেই আমীরাতের আমিরের চূড়ান্ত ন্যায়ানুগ পর্যায় হবে কাজী সিদ্ধান্তভিত্তিক। কাজী হিসেবে মুহাদ্দিস ছাহেব আমার জন্য হয়ে দাঁড়ালেন, আমার স্বপ্নের কাজীর বিচারের ভিত্তিরূপ 'কাজী'র মনসবের মূর্ত্তরূপ।

১৯৮৮ সনে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে যখন 'আইন ও শরীয়ত' একটি শংকর বিষয় উদ্ভাবনমূলক তার পাঠ্যক্রম তৈরি করে, ঐ বিষয়ের বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে, তার সহকারী অধ্যাপক ও প্রধান হিসেব আক্ষরিক অর্থেই বস্তুত: শূণ্য থাকে তা অতি স্নেহে গড়ে তুলি -তার পেছনে আমার স্বপ্নটাই ছিল, তেমন কিছু আইনবিদ গড়ে তুলব যারা একই সঙ্গে হবে শরীয়তের প্রখর জ্ঞান ও সচেতনতা-সম্পন্নরূপে দেশে কাজীর বিচার ফিরিয়ে আনার জন্য প্রস্তুত। তার ২১ বছর পর একজন প্রকৃতই জ্বলজ্যান্ত কাজী হিসেবে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবকে পেয়ে গিয়ে, মনে তাঁকেই এই আধুনিক যুগের প্রকৃত শরয়ী কাজীর অনুসরণীয় নমুনা হিসেবে দেখতে শুরু করি।

১৯৮৮ ইং সনে বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আইন ও শরীয়ৎ' বিষয়। দেশে ত বটেই, সারা বিশ্বেই সম্ভবত:, প্রথম - এ যুগে প্রতিটি দেশেই সরকারী ক্ষমতা দিয়েই

অপরিহার্য করে প্রচলিত 'আধুনিক' আইনের পরাকাঠামোর ভেতরই শরীয়ৎ ভিত্তিক ন্যায়বিচারমূলক তথা কাজীর কাজের জন্য লোক প্রস্তুত করার শিক্ষার পাঠ্যক্রম তৈরি ও পড়ানোর জন্য বিষয়টি ও তার বিভাগ শুরু করেছিলাম, আল্লাহ তা'আলার রহমতে। কিছুদিন পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম ও বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় বলে পরিচিত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও বিষয়টি সূচনা করি। সেরকম সময়ই, ব্রুনাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল বাংলাদেশে এলে ঐ বিষয় ও পাঠ্যক্রমটি স্বদেশে চালু করেন বলে শুনেছি। বাংলাদেশে আমার কাছে সে বিষয়টি পড়াদের একজন পরে মালয়েশিয়ায় শরীয়তের কাজী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিল -শুনেছি। ব্রুনাইতে ত শুনেছি পরে সারা দেশের ওপরই আধুনিক আইনের কাঠামোর ভেতর দিয়েই শরীয়তের কাজীর বিচার-ভিত্তিক ন্যায়নিষ্ঠ ধর্মাশ্রয়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু ঐ পাঠ্যক্রমের তাত্ত্বিক কাজী বানানো শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য এই যুগে যথাযথভাবেই কাজীর দায়িত্ব পালনকারী কোন জ্বলজ্যান্ত কাজীর অনুসরণীয় নমুনা বা উপমা দিতে পারিনি। নিজেও পাইনি। দেশের তথাকথিত 'কাজী'-দের ত দেখলাম। অন্তত: নিকাহর অনুষ্ঠানে যাঁদের দেখী, তাঁদের তো অতি নিম্নমানের কেরাণীর নবিশের বেশি কিছু মনে হয়নি। আমার নিজের নিকাহর সময় অল্প সময়ের একটি অনুষ্ঠানে সামাজিক 'উরফ'-এর নিয়মে দামাঁন্দ হিসেবে মুখে রুমাল ধরে বসে থাকা অবস্থায়ও তিনবার রুমাল সরিয়ে মুখ খুলে কথা বলতে হয়েছিল নিকাহকে শরীয়তের নিয়ম ভঙ্গের কারণে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য।

মুহাদ্দিস ছাহেব (র:)-কে কাজীর কাজে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্যও অনুসরণীয় উপমা পেয়ে গেলাম। ঠিক করলাম, যতটুকুই সুযোগ পেতে পারি, ততটুকু হলেও, এই যুগের পরিস্থিতিতে সে কাজের তত্ত্বগত জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশনা মূলক শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করব। অন্তত: কোন একটি না একটি পর্যায়। ফিকহ, ইফতা বা কাজীর কাজের চূড়ান্ত পর্যায়, তথা আদেশ বা নির্দেশের মাধ্যমে তার প্রয়োগের জন্য নির্দেশনা দান এর ক্ষেত্রে।

ফিকহ বিশেষজ্ঞের পর্যায়ক্রম

এইখানে প্রেক্ষিত পরিষ্কার করার জন্য এই পর্যায়গুলোর একটু পরিচয় বলা সমীচিন। অনেকেই ফিকহেরই এই তিন পর্যায়ের পার্থক্য ও সম্পর্ক বোঝেন না, বা তার দিকে খেয়াল না রেখে এদের আলাদা আলাদা বিষয় মনে করে থাকেন। এতে ধর্ম প্রতিষ্ঠাতে এই পর্যায়গুলোর ভূমিকা বুঝতে না পেরে এই জ্ঞানের যথার্থ ব্যবহার করতে পারেন না। ধর্মের জ্ঞানের ভিত্তিরূপ 'নস্স', কুরআন শরীফ আর সুন্নতের সংবাদ তথা, 'হাদীস' শরীফ থেকে জীবনব্যাপী পালনের জন্য আল্লাহ তা'আলার হুকুম আহকামের বুঝ, 'ফিক্হ' (আক্ষরিক অর্থেই 'বুঝ) অপরিহার্য, আর কুরআন আর সুন্নতে বর্ণিত মৌলিক

নিয়মাদির (উসূল) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্লেষণ কাঠামোর বিজ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত 'বুঝ'টিই শুধু এই 'ফিক্হ' যা ছাড়া কুরআন শরীফ আর সুন্নতে মুকাদ্দাসা বুঝে আল্লাহ তা'আলার হুকুম যথার্থ পালন সম্ভব নয়। এই জন্যই যথার্থ ধর্ম পালনের জন্য হয় নিজেই কুরআন শরীফ আর সুন্নতের সংবাদরূপ 'হাদীস' শরীফের এমন বিশেষজ্ঞ - তথা মুফাস্সির ও মুহাদ্দিস। যিনি উভয়ের গভীরতর 'বুঝ', তথা 'ফিক্হ'-এরও বিশেষজ্ঞ তথা 'ফক্বীহ' হওয়া আবশ্যক, নয় ঐ রকম কোন ফক্বীহর শেখানো মত তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে তিনি যাঁর উত্তরাধিকারী, সেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ অপরিহার্য। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব (র)- এই রকমের অতি উচ্চ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মুফাসসির ও মুহাদ্দিসই শুধু ছিলেন না, অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আবারও, আন্তর্জাতিক পর্যায়েরও, 'ফক্বীহ'ও ছিলেন।

'ফিকহ' ও 'ফক্বীহ'র-ও পর্যায় আছে। ফিক্হের মাধ্যমে প্রাপ্ত হুকুম-আহকামের অতি সাধারণ পর্যায়ের ইলম শেখা ও বলে দেয়ার পর্যায়ের ফিকহের আলিম। যাঁদেরকে সাধারণতঃ শুধু 'আলিম', বা উপমহাদেশে প্রায়ই 'মৌলানা' বলে। তাঁদের পর্যায়ের ফিক্বহ ও ফকীহ, তুলনামূলক সহজ-প্রাপ্য। সাধারণ্যের জন্যই এই পর্যায়ের 'ফিকহ' ও 'ফকীহ' সাহেবান-ই ফিকহের জ্ঞানের সম্মানিত সিংহদ্বার। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ওপর, আর তাঁদের কাছে দৈনন্দিন জীবনের পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ ধর্মজ্ঞান শিখতে আসাদের ওপর রহমত করুন।

ধর্মের বুঝের 'ফিকহ'র এর পরবর্তী উচ্চতর পর্যায় হলো পূর্ববর্ত্তী পর্যায়ে যে সব হুকুম আহকাম শেখা ও বলে দেয়া হয়, তার ভিত্তিরূপ উৎস ও তার বিশ্লেষণ পদ্ধতির নিয়মাবলী (উসূল')-এর বুঝ, তথা 'ফিকহে'র 'ইলম'। সংক্ষেপে এই পর্যায়ের 'ফিক্বহে'র ইলম-কেই 'ফিকহ' আর ফিকহের এই পর্যায়ের আলিমকেই 'ফক্বীহ' বলে।

এই সব অর্থে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব (র:) সাধারণ আলিম বা 'মৌলানা'। এবং তদুর্দ্ধ পর্যায়ের আলিম, 'ফক্বীহ'। দু'টোই ছিলেন। কিন্তু তিনি তারও ওপরের অন্য দু'টি পর্যায়েরও ফিকহের আলিম। মুফতি ও কাজী - ও ছিলেন। সাধারণ 'আলিম' -র ঊর্ধ্বতর পর্যায়ের 'ফক্বীহ'-এর ব্যবহৃত ধর্ম-জ্ঞানের মূল উৎস, 'নস্স' - কুরআন ও সুন্নতের সংবাদ, তথা হাদীসে। এবং তার বিশ্লেষণমূলক 'উসূল' ও তদ্সমুদয়ের ব্যবহারজাত প্রাপ্ত হুকুম-আহকামের কোনটি কোন বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রযুক্ত হওয়া দরকার, তার বিশেষ বোঝার ভিত্তিতে এ নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্ন বিশেষ প্রশ্নের শরীয়ৎ-সম্মত উত্তরের বিশেষ বিশেষজ্ঞতা হলো 'ইফতা'। আর তার ভেতর দিয়ে প্রদত্ত ঐরূপ উত্তর হলো 'ফতোয়া', তার দানকারী উত্তরদানকারী, প্রায়োগিক ফিকহের বিশেষজ্ঞ হলেন মুফতি ব্যক্তি বিশেষের পর্যায়েরও পর, সমাজিক পর্যায়ে ব্যবহারিক রূপে প্রয়োগের সিদ্ধান্তদানের বিশেষজ্ঞতা ও ক্ষমতাধর ফক্বীহ-ই হলেন প্রকৃত

শরীয়ৎ-সম্মত কাজী। এমন কাজীর বিচারেই সমাজে শরীয়তের 'আদল' বা ন্যায়বিচার, ও তার প্রেক্ষিতরূপ, 'ইহসান' তথা সর্বব্যাপী প্রেমময় দয়ায় সকলের জন্য শান্তি, প্রগতি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

কাজী পর্যায়ের 'ফকীহ'-এর সিদ্ধান্তের সামাজিক প্রয়োগের ভিত্তি হলো সামাজিক শক্তি। সে রাজনৈতকভাবে অর্জিত ও ব্যবহৃত 'এমারতে'র শক্তিই হোক, আর না হয় সামাজিকভাবে যাদের ভেতর বা ওপর ঐ সিদ্ধান্ত প্রয়োগ হবে, তাদের সমাজ হিসেবে তা মেনে নেয়ার মনোভাব ও স্বীকৃতি 'রেজ্বা' বা উভয়ের সমন্বয়ের। এজন্যই, মুফতির ফতোয়ার কার্যকর হওয়ার ন্যূনতম শর্ত তা ফতোয়াকামী একক ব্যক্তির তা মান্য করন হলেও, কাজীর সিদ্ধান্তের কার্যকর হওয়ার ন্যূনতমটিও অন্ততঃ যাদের সমাজের ওপর তার প্রয়োগ, তাদের সমাজের অন্ততঃ তা মেনে নেয়া, বা ঐ সমাজ যে শাসক বা ব্যবস্থাপক (আমীরের) ব্যবস্থাপনাকে মেনে নিয়েছে, তদ্বারা কাজী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তি বা স্বীকৃতি। বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদের মুখে বর্তমান যুগে ওপর থেকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় শিক্ষা, পরীক্ষা, নিশ্চিতায়নের আসানীদ বা ধর্মতঃ নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দু'প্রকারের কোন ধরনের শক্তি সমর্থিতও হয়ে কাজীর দায়িত্ব পালনকারী খুব একজন পাওয়া যায় না।

সেখনে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব (র:) সেরকমই একজন কাজীও ছিলেন বেশ কিছুকাল। আরবের উম্মুল কুওয়াইনের এমারতের নিযুক্ত কাজী হিসেবে। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব ফিক্বহ বিশেষজ্ঞতার উপরোক্ত সবগুলি পর্যায়েরই এমন একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন যা এই যুগে সারা বিশ্বেই বিরল। এই ভাবে, বর্তমান যুগে তিনি ছিলেন প্রকৃত কাজীর এক দুর্লভ, বিরল নমুনা -যাঁর অনুকরণে, অনুসরণে তাঁর নির্দেশনায় শিক্ষানবীসীর মাধ্যমে এইরূপ কাজীর কাজের ব্যবহারিক পর্যায়ের শিক্ষা লাভের জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে পড়ি। দুনিয়ায় আবারও যেই 'কাজীর বিচারে'র ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আগ্রহে পূর্বে বর্ণিত নানা পাঠ্যক্রম তৈরি ও পড়ানোর সূচনা করেছিলাম।

অসাধারণ প্রশিক্ষক

আমার বুঝে ওঠার আগেই যেন হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের (র:) অধীন ফিকহের সব পর্যায়ে আমার শিক্ষানবীসী শুরু হয়ে যায়!

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব যে কি পর্যায়ের প্রশিক্ষক ছিলেন, তা বোঝার জন্য প্রশিক্ষণ মনস্তত্ত্ব ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জরুরী কিছু বিষয়ের কিঞ্চিত ধারণা দরকার, যা এখন বলব। আমি নিজে অষ্ট্রেলিয়ায় আইনচর্চার প্রশিক্ষণ গ্রহণ, আর মালয়েশিয়ার মাল্টিমিধিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের অধীন বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দানের পরিচালনা, উভয়ের সময় প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত এ বিষয়গুলো গভীরভাবে বুঝতে পারি।

প্রথমতঃ, উচ্চ পর্যায়ের একজন প্রশিক্ষক তাঁর প্রশিক্ষণাধীন শিক্ষার্থীকে পদে পদে কি করতে হবে বলে দেন না। বরং প্রশিক্ষণাধীনকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, তার পূর্ব্বলব্ধ শিক্ষার আলোকে সেই শিক্ষাকে ব্যবহারিক পর্যায়ে প্রয়োগ করে হাতে কলমে অভিজ্ঞতায় কাজটি প্রযুক্তিগতভাবেই শিখতে থাকতে দিয়ে থাকেন। কিন্তু একই সঙ্গে তার কাজকর্মের ওপর নজর রাখেন, আর মাঝে মধ্যে দরকারমত, তার অগ্রগতির 'ক্রিটিক্যাল' পর্যায়ে অতিসংক্ষেপে, আপাতদৃষ্টে স্রেফ কথাচ্ছলে, এমন দু'একটি অতি পরিমিত কথা বলেন, যা দিয়ে প্রশিক্ষণাধীনের পূর্বতন তাত্ত্বিক শিক্ষার প্রয়োগে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে দেন।

আধুনিক মনস্তত্ত্বের জনক বলে পরিচিত সিগমন্ড ফ্রয়েডের প্রতিষ্ঠিত 'মনোবিশ্লেষণ' -নামক পদ্ধতিতে যে কোন নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির অবচেতন মনের গভীরে স্থায়ীতরভাবে কোন একটি নির্দেশ প্রোথিত করে দেয়ার জন্য মনস্তাত্ত্বিক যুক্তিটাকে বলা চলে কিছুই না বলে দীর্ঘ সময়, সাধারণতঃ কয়েক বছর, প্রতি দিন দৈনিক ১ ঘণ্টা -তার অলক্ষ্যেই তার কথা শুনে গিয়ে তাকে লক্ষ্য করতে থাকার ভেতর মাঝে সাঝে, 'ক্রিটিক্যাল' পর্যায়ে এমন দু'য়েকটি অতি পরিমিত কথা বলে দেয়া, যাতে তার চিন্তার ধারার গতিমুখটি অভিপর্তে দিকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আত্মশুদ্ধিমূলক ধর্মসাধনায় আমার নিজের দীর্ঘকালীন প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক পরম্পরায় ঊর্ধ্বতন, তরীকার সিলসিলার ইমাম ও মুজাদ্দিদ, হযরত শাহ আব্দুল বারী আল-হাসানী ওয়াল-হুসায়নী (র:) একবার বলেছিলেন, 'পীরি-মুরীদি আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ হলো, এক জোড়া পা কে ভুল দিকে যেতে দেখলে, তার রোখটি একটু বদলে দেয়া, তখন সে নিজেই হেঁটে হেঁটে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে'।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিও ছিল এরূপ। সারাক্ষণ সঙ্গে রেখে, প্রতি পদক্ষেপে নিজে কিছু বলে না দিয়ে, বরং প্রশিক্ষণাধীনকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার পূর্বলব্ধ শিক্ষাকে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে দিয়ে তার 'ক্রিটিক্যাল' কোন পর্যায় এলে তখন অগ্রগতির দিকনির্দেশনামূলক দু'একটি কথা বলে দিয়ে প্রশিক্ষণের যে কোন সম্ভাব্য নিষ্ফলতা নিবারণ ও সাফল্য নিশ্চিত করা।

ফিকহের আমার পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানের ব্যবহারিক পর্যায়ে প্রয়োগের প্রশিক্ষণে তাঁর দয়াময় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও তাই হয়।

ফিকহের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ইফতা

আমার তাত্ত্বিক পর্যায়ের ফিকহে ত' ইতিপূর্বেই শৈশবে হিন্দুস্তানের মুফতি কেফায়েতুল্লাহ (র:)-এর তা'লীমুল ইসলাম দিয়ে শুরু করে নানা পর্যায়ে ফিকহে শিক্ষার মাধ্যমে এক পর্যায়ে সনদ প্রদত্ত হয়েই ছিলাম। কার্যত:, ১৯৮৭ -তে মরোক্কোর ফেজের জামে'য়া কায়রাউইন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দি ফুদূল (র:)-এর কছে শিখতে গিয়ে ফেরার সময়

ইজতিহাদের ও চার মাযহাবের তুলনামূলক ফিকহের, এমন এক আসানীদ ধারা সূত্রে যা স্পেনের আন্দালুসের উমাইয়া খেলাফতের এমারতের কাজী ইয়াদ ও তাঁর উস্তায মরক্কোর সেউতার কাজী ইবন রুশদ হয়ে ঊর্ধ্বগামী; আর ২০০৭ ইং -তে লিখিতভাবে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব (র:)-এর কাছ থেকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তাঁর অবিচ্ছিন্ন আসানীদ ধারার মাধ্যমেও।

এর পর পরই যেন ফিকহের ব্যবহারিক পর্যায়, তথা 'ইফতা'র প্রশিক্ষণ শুরু হয় - নিজের অজান্তেই যেন। নিজের জীবন, এবং মাঝে মাঝে অন্য চেনা জানাদেরও, ধর্মপালনের ক্ষেত্রে কোন জটিল, বিশেষতঃ একাধিক মাযহাবকে জড়িয়ে, প্রশ্ন দেখা গেলে, দুনিয়ার যেখানেই থাকি না কেন, হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব (র:)। এবং মাঝে মাঝে দরকার মত অন্য বিশেষজ্ঞদের - সে বিষয়েই শুধু নয়, না বুঝলে নস্‌স ও ফিকহের উসূলে তার ভিত্তিটিও জিজ্ঞেস করবার অভ্যাস বাড়িয়ে দিই। মুহাদ্দিস ছাহেবও তাঁর উচ্চপর্যায়ের প্রশিক্ষক-সুলভ অলক্ষ্যনীয় পদ্ধতিতে এসবের উত্তর দিয়ে আমাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফিকহের ব্যবহারিক প্রয়োগের হুকুম আহকামে পৌঁছাবার প্রশিক্ষিত করেন।

এর একটি উদাহরণ দিচ্ছি

২০০৭-এ মদীনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসেবে নিযুক্তির পর অন্যান্য বিষয় সহ, আহকামুল মালিয়যাহ শেখাতে গেলে, আধুনিক কালে উদ্ভূত নানা সমস্যা নিয়ে হুকুম আহকাম খুঁজে বের করা দরকার হলে ফিকহের ব্যবহারিক প্রয়োগের হুকুম আহকামে পৌঁছাবার বিষয়ের প্রয়োজনের বিষয়ে বেশি সচেতন হই। চিরকালেই আরো শিখবার অদম্য আগ্রহ ছিল। সে আগ্রহেই নিজে ইতিমধ্যই বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ের প্রফেসর হিসেবে কার্যরত হলেও, পাশেই আমার কার্যালয়ের পাশের প্রধান রাস্তার অন্য পাশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য আরবী ভাষা ও ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের এক বৎসরব্যাপী কার্যদিবসের দৈনিক কয়েক ঘণ্টার সান্ধ্যকালীন পাঠ্যক্রম শুরু হলে আমি এই নতুন কার্যক্রমেও শিখতে আগ্রহী হই। আমার নিজের শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদানের অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গেও। কিন্তু আমি নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম পর্যায়ের প্রফেসর। 'উস্তাযু'ল কামিল'। হিসেবে কার্যরত থাকার কারণে আবার একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র হতে দেয়ায় আপত্তি ছিল মনে হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হিসেবে কর্মরত আমার অন্যতম উস্তায, শায়খ সৈয়্যদ তৈসীরকে বললে তিনি বিশেষ ব্যবস্থায় আমাকে পাঠ্যক্রমটিতে ভর্তির জন্য লিখে দিলে, অবশেষে সেখানেও আরো শিক্ষালাভ শুরু করি।

কিন্তু সেখানে একটি ফিকহী সমস্যা দেখা দেয়। সেখানে একজন তরুণ পাকিস্তানী বা ভারতীয় শিক্ষক ছিলেন, যিনি 'গ্বয়র মুক্বল্লিদ' তথা ফিকহের মাযহাবগুলোর কোনটিরই অনুসরণ না করা, তথাকথিত 'আহলে-হাদীস' ফেরক্বার ছিলেন মনে হয়, আর কেউ

সেটা করছে তা ধারণা করলে তার প্রতি বিরূপ হতেন মনে হ'ত। সউদীরা সাধারণতঃ হাম্বলী, আর কেউ কেউ এবং বিশেষ করে মদীনা শরীফের পুরনো ও আদি বাসিন্দা, তথা 'আহলে মদীনার কেউ কেউ। মালিকী হিসেবে প্রাচীন 'আহলুল-হাদীস' ধারার 'আহলে সুন্নত ওয়'ল জামা'তে'র অনুসারী, 'আহলে হাদীস' 'গ্বয়র মুক্বল্লিদ' ন'ন। যাঁরা আরবী 'আহলুল হাদীস' নামের 'আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাত'-এর দুই প্রাচীন শুদ্ধ ধারার একটি। আর একই রকম শুনতে, কিন্তু একেবারেই ভিন্ন, ফারসী 'আহলে হাদীস' নামে হিন্দুস্তানে বৃটিশ আমলের নতুন চালু করা ফেরকার সূক্ষ্ম তফাৎ সম্পর্কে জানেন না, তাঁরা এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হন বলে সেরকম সময় বাদশাহ ফাহদ মরহূম বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়ে জানিয়েছিলেন, তাঁরা হাম্বলী। অতি অল্প সংখ্যক 'আহলে হাদীস' 'গ্বয়র মুক্বল্লিদ' যারা, তারা সব বহিরাগত - ভারতবর্ষীয়, আলবানী ইত্যাদি।

মাগরিব আর 'ইশা-র নামাজ উস্তাযদের সঙ্গেই জামাতে হ'ত। সেখানে মাঝে মাঝে এই 'গ্বয়র মুক্বল্লিদ' ও নামাজ পড়াতেন। নামাজে আমার হাত কুরআন আর সুন্নাহ থেকে নেয়া, তদুভয়ের বিশ্লেষণের 'হানাফী মাযহাব' বলে সাধারণতঃ পরিচিত পদ্ধতি মতে কুরআন সুন্নাহ থেকে পাওয়া বুঝ অনুযায়ী উত্তম বলে মনে করা রূপ, তথা নাভির ঠিক নীচে বাঁধা দেখে বিরক্ত হতেন। এক সময় ভয় হতে শুরু করল, এই বিরক্তি থেকে তিনি কোন না কোন ছুতোয় আমাকে তাঁর পড়ানো বিষয়ে 'ফেল'-ই না করিয়ে দেন! পূর্বে অন্তত: দু'বার, একবার অষ্ট্রেলিয়ায়, একবার যুক্তরাষ্ট্রে। বিশ্ববিদ্যালয়ে, যদিও ঠিক এই 'হাত বাঁধা' নিয়ে না হলেও, এরকম অন্যায়ের মুখো-মুখি হতে হয়েছিল।

সেটা ছিল বর্ণবাদ আর সাম্প্রদায়িক হিংসার শিকার হওয়ার ঘটনা। কিন্তু এখানে ছিল ব্যক্তিগত ধর্মাচারের একটি সূক্ষ্ম সংবেদনশীল বিষয়, কি করব একটু চিন্তায়ই পড়লাম।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবকে (র:) এ নিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নামাজের ক্বিয়ামে বুকেই হাত বাঁধতে পারি।

আমি এটা ত' জানতাম যে মাযহাব-অস্বীকারকারী ভারতবর্ষীয় 'গ্বয়র মুক্বল্লিদ'-দের প্রায় সকলেই যেভাবে বুকে হাত বাঁধে, তা বাহ্যিকভাবে মাযহাব-অনুসারী সঊদী হাম্বলীদের মতই। আর এটাও জানতাম যে হাম্বলী মাযহাব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের অন্য তিনটি মাযহাবের মতই মাযহাব হিসেবে শুদ্ধ ও অনুসরণ-যোগ্য। আমি ইতোপূর্বেই চার মাযহাবেরই ফিকহে সনদ অর্জন করেছিলাম - মরক্কো, নাইজেরিয়া, হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ইয়েমেন ও মদীনা শরীফের ফিকহবিদদের কাছ থেকে শিখে। কিন্ত আমি এটাও জানতাম যে কোন সময় যে কোন একটি মাযহাবেরই মাধ্যমে কুরআন আর সুন্নাহর অনুসরণ বাঞ্ছনীয় - আর একই সঙ্গে একাধিক মাযহাবের মাধ্যমে কুরআন বিভিন্ন হুকুম, যখন যে মাযহাবের যেটা পছন্দ সেটা পালন, তথা 'তলফীক্ব', নিষিদ্ধ। আমিই তা' জানলে মুহাদ্দিস ছাহেব (র:)-ও ত' তা

জেনেই থাকবেন। তার পরও তিনি আমাকে ঐরূপ নির্দেশণা দিলে তা নিয়ে গভীরতর অনুসন্ধান - 'ইস্তিন্বাৎ' - করলাম।

বুঝলাম, এক্ষেত্রে আমার এটা করণীয়। বুকে হাত বাঁধব গ্বয়র মুক্বল্লিদ হিসেবে নয়, আহলে সুন্নত ওয়'ল জামা'তের অন্যতম অনুসরণীয় হাম্বলী মাযহাবের স্থানীয়দের উলামা ও তাঁদের অনুসরণে জনসাধারণের সাধারণতঃ অনুসৃত ধারাটির এমন একটি ধারা মনে করে নিজস্ব মাযহাবে ক্ষতির আশংকামণ্ডিত পরিস্থিতিগত কারণে আপাততঃ অন্তস্থ করে নিয়ে। আর এই বুঝে পৌঁছাতে ব্যবহারিক প্রয়োগে প্রযোজ্য ইফতার বেশ কয়েকটি নিয়ম বুঝতে পারলাম সরাসরি বাস্তবিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে। এভাবেই হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের নির্দেশনায় মোটামুটি স্বাধীনভাবেই ইফতামূলক সিদ্ধান্ত রচনার প্রশিক্ষণে অগ্রসর হতে থাকি।

ফিকহেরও পরশ-পাথর -'ইফতা'

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের (রঃ) পরশ পাথর-তুল্য স্পর্শের পর কিছুকালের ভেতরই, নানা সূত্রে ইফতার সনদাদি প্রাপ্তির ভেতর, ছ'বছর যাবৎ যাতায়াতের মধ্যমে যেই হযরত সৈয়্যদ মোহাম্মদ 'আলী বা'রোক্বার আল-হাজরমী আল-ইয়েমেনীর কাছ থেকে হাদীস আর ফিকহ শিখছিলাম, তাঁর কাছ থেকে ইফতা'র এমন একটি সনদ প্রদত্ত হই, যা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম মালিকের ছাত্র ইমাম মুহম্মদ ও তদূর্ধ্বে ইমাম আবু হানীফা হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যায়। এটা কার্যত ছিল অনেকটা পূর্বে মরক্কো থেকে ফেরার সময় কাজী ইবনে রুশদের ধারায় প্রাপ্ত চার মাযহাবের তুলনামূলক ফিকহের পূর্বে উল্লিখিত সনদের মত।

২০১২ -এর ডিসেম্বরে মৌলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল সাহেবের বদান্যতায় সিলেটে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক জ্ঞান সম্মেলনে আবারো হযরতের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হলে সদ্যলব্ধ চার মাযহাবের ইফতার সনদের কাগজটি নতুন কাপড় পরা শিশুর মত তাঁকে দেখালাম। তিনি দেখে খুব খুশী হয়ে অনুমোদনসূচক, উৎসাহদানমূলক কিছু কথা বল্লেন।

আমি ত' ইফতার ঐ সনদের কথা ভুলে যাই। কিন্তু হযরতের আমার মুফতির ভূমিকায় অনুমোদনসূচক উৎসাহমূলক ঐ কথা বলার পরই যতদূর মনে পড়ে অষ্ট্রেলিয়া গেলে কীভাবে জানি ঐ সনদের কথা উঠে লোকজনের ভেতর ছড়িয়ে পড়লে অনেকে আমাকে 'মুফতি ছাহেব' বলতে শুরু করে। লোকে জিজ্ঞেস করলে বাধ্য হয়ে যা জানি তা বলি, না জানলে মুহাদ্দিস ছাহেব (রঃ) সহ যেখান থেকে পারি জেনে জানাতে চেষ্টা করি। আমি তো মুফতি তো 'দূরে থাক, ইমামতিও করতে চাইনি। পূর্বে একবার ঐ শহরে এসে ঐ সমাজে তারাবীহর নামাজ শুরু করিয়েছিলাম, তাঁদের অনুরোধে পড়িয়েও ছিলাম। এবার, মেহমান হিসেবে প্রথম এসে যাঁর বাসায় উঠেছিলাম, তাঁকে পরিষ্কারভাবেই

বলেছিলাম, আমি লুকিয়ে থাকতে চাই। কাউকে আমার আসবার কথাটিও বলবেন না। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই তিনি ফোন করে করে অনেককেই এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আর কীভাবে আমার মুফতির সনদের কথা কীভাবে জানি তিনি জেনে গিয়ে সেটাও সকলকে বলতে লাগেন। কিছু দিন পর সেই শহর ছেড়ে হাজার মাইল দূরে মহাদেশের অন্য প্রান্তে অন্য আরেক শহরে গেলেও আমার শত লুকানোর পরও কীভাবে সেখানও তা প্রকাশ হয়ে পড়লে, অনেকেই আমাকে মুফতি' বলতে শুরু করে, আর নির্মিতব্য একটি নতুন মসজিদে বিবাদমান দই দল ধরে আমাকে ইমাম বানিয়ে দিলে। মসজিদের নতুন এমারত তৈরি হওয়ার পর নতুন মসজিদের ইমারতে প্রথম জুম'আ পড়িয়ে হযরত রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খান্দানের এক সম্মানিত জনের হাতে মসজিদের দায়িত্ব অর্পণ করে দেয়া পর্যন্ত প্রায় ৯ মাস পর্যন্ত ইমামতি করতে বাধ্য হই। তারপরও অনেকেই মুফতি বলতে থাকে, আর আমিও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে বাধ্য হয়েই উত্তর দেয়ার চেষ্টা করি। ঐ শহর ছেড়ে গেলেও, ঐরকম হয়। একসময় অন্যান্য দেশ থেকেও কখনো কখনো লোকে প্রশ্ন করে উত্তর চাইতে শুরু করে।

কাজীর কাজের প্রশিক্ষণ

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব (রঃ)-এর এই যুগের প্রকৃত কাজীর দুর্লভ অনুসরণীয় নমুনারূপ মরতবা বুঝতে পারার পর তাঁর কাছ থেকে এই কাজের প্রশিক্ষণের আগ্রহের পর, আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাস রহমতে তারও দ্বার উন্মুক্ত করেন। এ যেন আমার মুরশিদ (রঃ) আর তাঁরই ইশারায় হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব (রঃ)-এর বরকতেই।

সে মতে, ২৮ শাওয়াল ১৪৩৯ হিঃ মোতাবেক ১২ জুলাই ২০১৮ ইং তারিখে -এ লিখিতভাবে, হিন্দুস্তানে দেওবন্দের তত্ত্বাবধানে চালু করা শরীয়তের এমারত আর তদাধীন কাজীর কাজের ব্যবস্থাপনাসহ এতদসংক্রান্ত শিক্ষার কর্তৃপক্ষরূপ দায়িত্বশীল - হযরত শায়খ ড. ফজলুর রহমান - কর্তৃক এমারত ও কাজীর কাজের জন্য ধর্মত: লিখিত সনদ মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হই। তা' প্রদত্ত হ'ই জুলহিয্যা ১৪২৯ হিঃ থেকে তাঁর সঙ্গে শিক্ষামূলক প্রায় ১০ বৎসরের ইলমী সম্পর্কের পর বিশেষ পরীক্ষার পর - একটি দু'ধারী আসানীদ ধারায়। তা একদিক দিয়ে বালাকোটের শহীদ আমীরুল মো'মেনীন সৈয়্যদ আহমদ বেরলভী (রঃ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কর্তৃক ইয়মেনে আমীর বা কাজী হিসেবে নিযুক্ত এবং পরে খেলাফতে রাশেদার প্রথম তিন প্রধান খলীফা কর্তৃকই পুরো খেলাফতের কাজী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির পর নিজেই খেলাফতে রাশেদার শেষ প্রধান খলীফা হিসেবে আমীরুল মো'মেনীনে দায়িত্ব পালনকারী, হযরত 'আলী (রা:)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত। আর তা' অন্য দিকে, প্রথম উসমানী খলীফা, প্রথম সেলিমের মাধ্যমে 'আব্বাসী খেলাফতের উত্তরাধিকারী হিসেবে আবির্ভুত উসমানী খেলাফতের উৎস উসমানী

সুলতানাতের প্রথম সুলতান, উসমান খানের নিয়োগপ্রাপ্ত শায়খুল ইসলাম, তথা সর্বোচ্চ ফকীহ মুফতি কামালুদ্দীন কাশানী (র:)-এর মাধ্যমে তাঁর উস্তায হযরত সদরুদ্দীন কুনাবী (র:) হয়ে তাঁর উস্তায, স্পেনে চলতে থাকা পূর্বে খেলাফতে রাশেদার শেষ খলীফা হযরত হাসানের স্বীকৃতি দানে মাধ্যমে খেলাফতে রাশেদার উত্তরাধিকারী হিসেবে আবির্ভুত উমাইয়া খেলাফতের প্রাচ্য আব্বাসী খেলাফৎ দ্বারা উৎখাত হওয়ার পরেও, স্পেনে চলতে থাকা শায়খুল আকবর, ইবন 'আরবী (র:)-এর মাধ্যমেও হযরত আলী হয়ে রাসূলুল্লাহ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছায়।

এই সনদ পাওয়ার পর হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের (র:) সাক্ষাতের সুযোগ হয়, তিনি বিভিন্ন কাজে লন্ডন তশরীফ নিয়ে গেলে, আমিও সুদূর অষ্ট্রেলিয়া থেকে সেখানে গিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে হাজির হই। তাঁর শিক্ষার মজলিসে বসলে তখন আমার নিজের কিছু মনে থাকত না। ধর্ম শিক্ষার মজলিসে সাধারণত; এইরুপই হয়ে থাকে। সেখানেও তাই হল। এমারত ও কাজীর সম্প্রতি লব্ধ সনদের কথাটিও সাধারণতঃ মনে থাকল না। এক পর্যায়ে মনে পড়লে, ভয়ে ভয়ে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবকে তার কথা বললাম, আর তারপর আরও বেশি তরদ্দুদের সঙ্গে, বললাম, আমি কি এখন কাজীর কাজটিও করব?

২০ বছরেরও পূর্বে আমাকে ইতিমধ্যেই পি.এইচ.ডি. করে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত বিষয়ে পোস্ট ডক্টরাল করার ও সেখানে ঐ বিষয়ের বিষয় প্রধান আর বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের বিভাগ প্রধান, ডীনের দায়িত্ব পালন ছাড়াও আইনে অধ্যাপনার উচ্চতর পদাদি ধারণের পরও মুর্শিদ (র:) এর তরফ থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়ে 'ওকালতী' তথা, আইনের ব্যবহারিক প্রায়োগিকরূপে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য বলার পর। এক পর্যায়ে গিয়ে কাজী হওয়ার জন্যও কথাচ্ছলে বলা হয়েছিল। তখন বুঝিনি এসব শরীয়তের কাজীর দায়িত্বের বিশেষজ্ঞতা অর্জনের দিকেই ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছিল হয়ত।

১৯৮৬ ইং-এর আশপাশে সিডনীর শহর- কেন্দ্রের 'সারে হিল' মসজিদের ব্যবস্থাপনাদলের সহ-সভাপতি রূপে নিয়োজিত হলে প্রথমবার রমজান আর ঈদের দিন ঠিক করা নিয়ে মুসলমানদের মতভেদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হলে এ বিষয়ে ফিকহের নির্দেশনা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে সে সময় এই বিষয়ে শরীয়তের হুকুম-সম্বলিত একটি চটি বই লিখলেও আরো প্রায় ২৫ বছর পর বুঝতে পারি চটি বইটিতে এতদসংক্রান্ত হুকুমের বর্ণনাটি অসম্পূর্ণ ছিল। সে বর্ণনাতে মাস সূচনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য শরীয়তের কাজীরও একটি অপরিহার্য ভূমিকার কথাটি লেখা হয়েছিল না, সেটি সে সময়ে আমি নিজেও তখন বুঝতে পারিনি। আজকের যুগে, বিশেষ করে একটি অমুসলিম-প্রধান দেশ। অষ্ট্রেলিয়াতে এই শরীয়তের কাজীর ভূমিকাটি বা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ প্রশ্নও চিন্তিত ছিলাম। এমতাবস্থায় হিন্দুস্তানে সফরে গেলে

সেখানে এটা জেনে কিছুটা আশ্চর্যান্বিতও হ'ই, আনন্দিতও হই। যে হিন্দুস্তানে দেওবন্দ মাদ্‌রাসার উদ্যোগে ও তত্বাবধানে মুসলমানদের জন্য সর্ব-ভারতীয় এমন একটি বেসরকারী শরীয়তের আমীরত তথা তা'মীরে শরীয়ৎ ও কাজীর বিচারের ব্যবস্থা চালু আছে, যদ্বারা মুসলমানেরা নিজেদের ভেতরকার অনেক মতবিরোধ ও বিষয়াদি, অমুসলিম পরিচালিত সরকারী ব্যবস্থায় না গিয়ে, নিজেদের ভেতরই, শরীয়তের হুকুম, মত সমাধা করে নেন। অষ্ট্রেলিয়াসহ, অন্যান্য দেশেও, কোন রাজনৈতিক দ্বন্দে না গিয়ে, শান্তিপূর্ণভাবে, অন্তত: সম্ভাব্য কোন কোন বিষয়ে এভাবে বেসরকারী পর্যায়ে আর শান্তিপূর্ণ রূপে, মুসলমানদের ভেতর কাজীর বিচার ও ভূমিকা প্রচলিত করবার সম্ভাবনা নিয়ে আমি আগ্রহ প্রকাশ করলে, আমাকে তৎপূর্বের এতদসংশ্লিষ্ট ফিকহের পড়াশোনার ভিত্তিতে আমাকে উপরোক্ত এমারত আর কাজীর সনদ দেয়া হয়েছিল। এবার অস্ট্রেলিয়া থেকে ২০১৮ ইং-এর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে লন্ডনে গিয়ে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব (র:)-এর সান্নিধ্যে হাজির হলে একদিন এক পর্যায়ে। পূর্বে উল্লিখিত মতে। তাঁকে জিজ্ঞস করে বসি, আমি কি কাজীর দায়িত্ব পালনেও অগ্রসর হব?

তিনি প্রথম বলে উঠলেন, 'না, না!'

আমি বুঝলাম, সম্ভবত: তাঁর এই নিষেধ সেই একি কারণে হয়ে থাকবে, যে কারণে আমার আত্মশুদ্ধি সাধনার তরীকার প্রশিক্ষক পরম্পরার ঊর্ধ্বতন ও ইমাম, হযরত শাহ সৈয়দ 'আব্দুল বারী (র:) তাঁর শিষ্য পরম্পরা ধারায় সাধারণতঃ কেউ যেন মুফতী (তথা, বিচারক) না হয় - পরকালে শেষ বিচারের দিন এরকম বিচারক ব হুকুম দানকারীদের যে কঠিন বিচার হতে পারে, তার কথা মনে করেই। একি কারণ আমি নিজেও এরকম কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাই না। আদিষ্ট হয়ে সীমিত পরিসরে মুফতীর দায়িত্ব পালন করতে শুরু করি, ভয় ভয়ে। আল্লাহ তা' আলা আমার ভুল-ত্রুটি মাফ করুন, আমীন!

এখন কাজীর ভূমিকা নিয়ে আবার এটাও মনে হল। অষ্ট্রেলিয়াতে মুসলমানদের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অন্তত: চাঁদ দেখার শরীয়ৎ-সম্মত সাক্ষ্য আর এইরকম কোন কোন বিষয়ে কাজির কাজের দরকার। তার কী হবে? আমার মনে এটা আসবারপ্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব (র:) বলে উঠলেন, 'القاضي يسير برضاء الناس', 'কাজী অগ্রসর হবে জনগণের সন্তুষ্ট, তথা ঐ ভূমিকায় তাকে জনগণের চাওয়ার ভিত্তিতে'। এর পর। অষ্ট্রেলিয়া ফরে গেলে, অনেকটা হঠাৎ করে মুসলমানদের একটি সমাজের সরকার নিবন্ধিত একটি সমিতি থেকে আমাকে লিখিত ভাবে তাদের মুফতী ও কাজীর ভূমিকা গ্রহণ করতে অনুরোধপূর্ব্বক নিয়োগ দেয়া হয়। ভয়ে ভয়ে আমি সে দায়িত্ব গ্রহণ করে তা পালন করতে শুরু করলে, মুসলমানদের অন্যান্য সম্প্রদায়েরো কেউ কেউ আমাকে ঐ ভূমিকায় দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করে কাজ করিয়ে নেয়। অনানুষ্ঠানিক ও

অবৈতনিকভাবেই তা অল্পস্বলপ করি স্রেফ ধর্মীয় দায়িত্বরূপে, অনুরুদ্ধ হলে বা তার আশা করা হলেই সাধারণতঃ একই রূপ, অনানুষ্ঠানিক ও অবৈতনিকভাবেই, স্রেফ ধর্মীয় দায়িত্বমত, অনুরুদ্ধ হলে বা তার আশা করা হলে, সমাজে ধর্মীয় কোন কোন কাজের দরকার মত এমারত ও করি, তার শিক্ষা বা প্রশিক্ষণও দিই। উল্লিখিত সনদ আর হযরত মুহাদ্দিস সাহেবের কথার ভিত্তিতেই।

'আরিফ' - 'মা'রিফা' ও 'কাশফ'

ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী দখলদারিত্বের মাধ্যমে উৎখাৎ-করা সুলতানী বাঙলার 'কাজীর বিচারে'র ইনসাফ ভিত্তিক সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যেই ধরনের কাজীর দরকার - তাঁর পশ্চাত্য বিচার ব্বস্থার প্রতীকরূপ চোখ বাঁধা নারীর মত স্রেফ কঠোরভাবে সবার জন্য সমানভাবে আইনের লিখিত আইনকানুন প্রয়োগের হুকুমদানকারী বিচারক হলে চলবে না। বৃটিশদের তৈরী করা আজকের বিয়ে পড়ানো কাজী ত নয়ই!

'কাজীর বিচারে'-র ইনসাফভিত্তিক সমাজের জন্য দরকার -এমন সব কাজী, যাঁরা ইনসাফ কায়মে শরীয়তের নিয়মে হুকুম জারীতে কঠোরভাবে দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কঠোর দৃঢ়তাকে মুড়িয়ে রাখা দুটি সুকুমার বৃত্তগতির অধিকারীও হবেন। এক দিকে তিনি হবেন সর্বজীবে দয়ায় আপ্লুত এক সার্বজনীন প্রেমময় হৃদয়ের অধিকারী। আর অন্যদিকে হবেন, দৃশ্যমানকে ভেদ করে তার পেছনের প্রকৃত পরিচয় পর্যন্ত দেখতে পারার ক্ষমতাধারী ও তাতে অভ্যস্ত। এই তিনটি গুনই আসে আত্মশুদ্ধি সাধনার যে শাস্ত্র তাসাউফ। তার তিনটি পরস্পরযুক্ত দিক থেকে। (১) মা'রিফাহ, আর (২) আদব

হযরত মুহাদ্দিস সাহেবের (র:) দু'টিই ছিল অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ে।

আরিফ ইলম (জ্ঞান) এরও ঊর্ধ্বে গিয়ে মা'রিফাহ (পরিচয়) দিয়ে পরিজ্ঞাত কাউকে বা কিছুকে তার বাহ্যিক রূপ (জাহির) ভেদ করে তার একান্ত প্রকৃত সত্য (হকীকত) জানতে পেরে, সেই প্রকৃত সত্যের ভিত্তিতেই তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন বা দান করেন, ও তদানুযায়ী কর্ম করেন। এটা যেমন আল্লাহ তা'আলার প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে। তেমনই আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও মখ্বলূকের ক্ষেত্রেও। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বাহ্যিক রূপ ভেদ করে তার ভেতরের আসলটা দেখতে পারলেই একজন প্রকৃত কাজী যন্ত্রের মত শুধু আইনের বাহ্যিক লেখা (Letter of the Law) দিয়ে, বাদী আর আসামীর দাবী ও উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের প্রকাশ্য রূপের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত না দিয়ে, বরং আইনের আসল উদ্দেশ্য (Spirit of the Law) অনুসরণ করে, বাদী আর আসামীর দাবী ও উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের আসল বাস্তবতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়ে ইনসাফ নিশ্চিত করতে পারেন। আর এ জন্যই, প্রকৃত কাজীর কাজের জন্য এইরূপ মা'রিফা অপরিহার্য বলেই, এই মা'রিফা ছাড়া কেউ সেই প্রকৃত কাজী হতে পারেন না, যাঁকে দিয়ে 'কাজীর বিচারে'র ইনসাফ কায়েম সম্ভব।

মা'রিফার ভিত্তিই হল আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের অবস্থানকে, তথা নিজেকে চেনার ভেতর দিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে চেনা, আর এই চেনার ভেতর দিয়েই সব ঘটনা সহ আল্লাহ তা'আলার মখলুককে চেনার সামর্থ যেই কাজী, তিনিই প্রকৃত কাজী হিসেবে দুনিয়ায় কাজীর বিচারের মাধ্যমে ইনসাফ কায়েমের জরী'য়া হতে পারেন। এইরূপ আত্মপরিচয়লাভের নিয়ামত যিনি প্রাপ্ত হন, তিনি একেবারেই অস্তিত্বহীনের মত হয়ে যান, তাঁর তওয়জ্বু'তে। আমার মুর্শিদ মহতরম বহুত ঊর্ধ্বের মর্যাদার 'আলিম। কুরআন হদীস সহ ধর্মজ্ঞানের সব শাখায়ই। এবং 'আরি ফ হওয়া সত্বেও, চিঠি লিখলে নীচে নিজের নাম সই করলে তার ওপর লিখতেন, 'খাকছার', তথা 'ধূলি মাত্র'। আচার আচরণে, হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবও ছিলেন তেমনই। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি এত বড় পর্যায়ের মুহাদ্দিস, ফকীহ, কাজী, শায়খ হওয়া সত্ত্বেও। ইন্তেকালের দিনে চলৎশক্তিহীন অবস্থায়ও প্রকাশনায় ব্যস্ততাসহ - আমার তাঁকে জানার সোয়া যুগ যা দেখেছি, তার সারাক্ষণই প্রায় একটানা সফরসহ শিক্ষাদানমূলক বহু কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, এমন কখনোই হয়নি যে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি, আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সময় দেননি। অথচ, কত রাম শ্যাম যদু মধুকেই ত' দেখেছি কোন জরুরী কাজে একটু কথা বলতে চাইলেই 'অত্যন্ত ব্যস্ততা'র ভানের ভড়ং করে আত্মম্ভরিতার প্রকাশ করে।

দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জনের চেষ্টায় আমার অন্যতম 'মেন্টর', মার্কিন 'নাগরিক অধিকার আন্দোলনের' মহানায়ক মার্টিন লুথার কিং-এর আত্মীয় এবং সংগ্রামের সহযোদ্ধা, প্রফেসর প্রেস্টন কিং। কে'ও দেখেছি ঐরকম। শত ব্যস্ততার ভেতরও কখনো যোগাযোগ করলেই সাক্ষাৎ উত্তর দেননি, এমন হয়নি। মুরশিদ মহতরম ত ঐরকমই ছিলেনই - তার চেয়েও অধিক।

মুরশিদ মহতরম (র:) আর হযরত মুহাদ্দিস সাহেবের (র:)-এই খাকসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসওয়ার নহর থেকেই; প্রফেসর কিং-এর মত দের ক্ষেত্রেও এমনটা তাঁরই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসওয়া'র ছায়া থেকেই।

হযরত মুহাদ্দিস (র:)-এর উপরোক্ত 'আযেজী' ও 'ইনকিসারী' তাঁর নিজের মা'রিফাহ-জাত আত্মপরিচয় থেকেই ছিল। আর এই মা'রিফাহ দিয়ে নিজেকেই শুধু নয়, আল্লাহ তা'আলা আর তাঁর মখ্বলূককে চিনতেন বলেই মনে হয়েছে আমার।

অন্যদেরকে চেনার যেই অসাধারণ ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে সব পেয়ারা বান্দাকে দান করেন, তার অসাধারণ উপায় হিসেবে আল্লাহ তা'আলা মানুষের ভেতরটা দেখে ফেলা যায় যা দিয়ে, সেই 'ফেরাসৎ', আর পরিস্থিতির প্রকৃত বাস্তবতা, তথা 'হকিকত'-টি দেখে ফেলা যায় যা দিয়ে, সেই 'কাশফ'-ও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়েছিলেন বলেই, তাঁর সঙ্গের বিভিন্ন অসাধারণ ঘটনা নিজে দেখে আমার এ প্রবল ধারনা হয়েছে।

নিজের অভিজ্ঞতায় দেখা তাঁর আশ্চর্য 'ফেরাসৎ' সম্পর্কে ইতোপূর্বে, ওপরে কিঞ্চিৎ

লিখেছি। ২০০৭ সনে তাঁর সঙ্গের প্রথম সাক্ষাতের পূর্বের কয়েক দশকের আমার ধর্মশিক্ষার কিছুর বিন্দুমাত্র তাঁকে না বললেও। এমনকি তাঁর সান্নিধ্য আমার নিজেরও তার কথা মনে থাকলেও। তিনি খুব অল্প সময়েই মনে হলো, তাঁর অসাধারণ অন্তদৃষ্টিমূলক ফেরাসৎ দিয়ে তা দেখে, আমার অলক্ষ্যই তার বিশেষজ্ঞসুলভ বিশেষ পদ্ধতিতে তার পরীক্ষাও নিয়ে, আমাকে তাৎক্ষনিকভাবে হাদীসের সঙ্গে সঙ্গে তাফসীর, ফিকহ ও আখলাকের সীল মোহর দিয়ে লিখিত সনদ প্রদান তাঁর 'ফেরাসতে'র একটি আশ্চর্য করার মতই নমুনা ছিল।

প্রায় অর্ধযুগ পর, ২০১২ বা তার একটু পরে অন্য এক ঘটনায় হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের (রঃ) কাশফ প্রত্যক্ষ করি বলেই মনে করি। নিজের একটি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে একটি অসুবিধায় পড়লে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবকে তা বলে তাঁর দোয়াপ্রার্থী হ'লে তিনি দোয়া করবার পর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোয়াটি কবুল হয়েই মনে হলো, অসুবিধাটি দূর হয়ে যায়। তাঁকে 'মুস্তযাবুদ- দাওয়াৎ'। আল্লাহ তা'আলা যাঁর দোয়া কবুল করেন। বলে মনে হয়েছে।

কিছুদিন পর, ঐ একই বিষয়ে। আমার নিজেরই এমন একটি ভুল, যা তাঁর কোন দুনিয়াবীভাবেই তাঁর জানার কথা নয়, তার পর। আবারও ঐ একই অসুবিধা দেখা দেয়। তার কাছে আবারও দোয়া চাইলে, তিনি বললেন, এবার আর তা ঠিক হবে না, বা ঐরকম কিছু। আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাফ করুন। আমার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেই বিষয় আর ঠিক করতে পারিনি! এটা তাঁর কাশফ-লব্ধ জ্ঞানেরই একটি উদাহরণ মনে হয়েছে।

তাঁর সঙ্গের আরো এরকম ঘটনায় তাঁর কাশফের অধিকারী হওয়ার প্রবল ধারণা হয়। দুনিয়াবী হিসেবে তো এসবের শতভাগ নিশ্চিতায়নের কোন উপায় না থাকায়, 'প্রবল ধারণা' ('জ্বন্ন আল-গ্বালিব)-ই এখানে সর্বোচ্চসম্ভব পর্যায়ের নিশ্চিতরূপে সাধারণতঃ গণ্য। সে-রকমই একটি ঘটনাতে তরীকার জিকরের সংখ্যার কোন একটি বিষয়ে তিনি তা শুদ্ধ হওয়ার নিশ্চিতায়ন করেন। যা নিয়ে আমি তাঁকে কিছুই বলিনি, অথচ তা নিয়ে কিছু চিন্তা করছিলাম।

'মা'আরিফ' ভূমিকার পরশ-পাথর

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব (রঃ) অতি উঁচু পর্য়ায়ের মা'রিফাহ দিয়ে শুধু 'আরিফই নয় - মা'আরিফ ও ছিলেন। অন্যের আরিফ হওয়ার সাধনায় সাহায্য করে আরিফ বানিয়ে দেয়ার, এমনকি 'আরেফ' হওয়ার পথের 'পথিক', তথা 'সালিক'-দেরও মা'আরিফ হওয়ার পথে তুলে দেয়া বা অগ্রসর করে দেয়ার মাহের ও ছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এর একটি উদাহরণ নিম্নে।

২০১২ সনে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও

হাজির হলে তাঁর কষ্টি ও পরশ-পাথর সুলভ, ফেরাসৎ-ময় ও প্রশিক্ষণমণ্ডিত আচরণের আরেকটি অসাধারণ ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করি। আমি তখনও আরিফম মা'আরিফ বা ইরফান শব্দগুলোই সমভাবে জানতাম না, বা বুঝতাম না। যদিও, অনেক পরে জেনেছি, সাধারণতঃ 'বাইয়'ত' করাতেন না আমার যেই মুর্শিদ মহতরম (র:), তিনি ১৯৮৮ সনে বাহ্যিকভাবে একেবারেই 'অপরিচিত'[৮] আমাকে ডেকে নিয়ে আমাকে বাই'য়াত যখন করিয়ে দেন, তখন আসলে তিনি আমাকে এই 'আরিফ হওয়ার, আল্লাহ তা'আলাকে চেনার সাধনার পথে পথচলার পথিক হিসেবেই প্রকৃত যাত্রা শুরু করিয়ে দিয়েছিলেন।

এর পর, অন্যান্য ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে সচেতনভাবে এই আত্মশুদ্ধি শিক্ষার এই যাত্রা বিভিন্ন পর্যায় দিয়ে, হযরত মুর্শিদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পথনির্দেশনার আওতার ভেতরই হযরত শায়খ নূর, এবং হযরত শায়খ 'আব্দুস সালাম (দা:ব:)-সহ এ বিষয়ের আরো অন্যান্য শিক্ষক তথা শায়খদের অধীন অগ্রসর হয়ে এক পর্যায়ে ১৯৯১ এর আশে পাশে মুর্শিদ মহতরমের অন্যতম খলীফা বলে জ্ঞাত শায়খ মহীউদ্দীন (র:) কর্তৃক, মুর্শিদ মহতরম পক্ষ থেকেই অনুমেয়, আত্মশুদ্ধি শিক্ষাদানের ইসনাদ গত 'এজাযত' ও দায়িত্বসহ মালয়েশিয়া প্রেরিত হই[৯] -অচিরেই দুর্গমতর এলাকায় মুরশিদ মহতরমের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিকট এই এজাযতের কথা বলে খেলাফত দানের কথা বললে তিনি তা অনুমোদন করেন। তার পরে এক যুগের ভেতর হযরত মুর্শিদ (র:) ইন্তেকাল করেন ১৯৯৪ ইং -এ, এবং ২০০২-এ বা এর একটু পরে আমার এই বিষয়ের আরো প্রশিক্ষণের অগ্রগতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন মুরশিদ মহতরমের খলীফা হযরত 'আবদুস-সালাম (দা: ব:)। তাঁর আর আমার প্রতি একই সময় আলাদা আলাদাভাবে মুর্শিদ মুহতরম (র:)-এর নির্দেশে। আত্মপরিচয় তথা পরিচয় (মা;রিফা)-ভিত্তিক আত্মশুদ্ধিএই উচ্চতর প্রশিক্ষণের পর্যায়ে হযরত মুরশিদ মহতরমের শিখিয়ে যাওয়া সব আনুষ্ঠানিক পর্যায়গুলোর চূড়ান্ত হযরত আব্দুস সালামের প্রকাশ্য তত্ত্বাবধানে অতিদ্রুত সমাপ্তির পর, কমবেশী ২০০৬ সনে মুর্শিদ মহতরম হযরত মৌলানা মুহম্মদ আব্দুর-রশীদ সিদ্দীকী (র:) -এর পক্ষ থেকে তাঁর খলীফা হযরত আব্দুস-সালাম (দা:ব:) সাহেবের হাতে মুর্শিদ মহতরম হযরত মৌলানা মুহম্মদ আব্দুর-রশীদ সিদ্দীকী (র:) -এর খেলাফৎ, এবং তার পরের বছর হযরত আব্দুস সালাম (দা: ব:)-এর হাতে তাঁর নিজের খেলাফৎ প্রাপ্ত হই। তা', হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র:)-এর সিলসিলায় পর্যায়ক্রমে মুজাদ্দেদিয়া, কাদিরিয়্যা, চিশ্‌তিয়্যা, শাজিলিয়্যা,

৮ 'আরিফগণ বাহ্যিককে ভেদ করে প্রকৃত পরিচয় জানার মাহের হয়ে থাকেন।

৯ আত্মশুদ্ধি পন্থার (ত্বরীকা)-র যেই ১০ 'লতীফা' পর্যন্তের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল সে পর্যায় পর্যন্ত আমাকে, তারই শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব তথা এযাজত দেয়া হয় প্রথম। পরে তা' বিস্তৃততর, পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদানের খেলাফৎ দেয়া হয়। নিম্নবর্ণিত পর্যায়ক্রমে।

করণীয়্যা, নকশবন্দিয়্যা ও মুহম্মদিয়া তরীকাসমূহে। এর সঙ্গে পরে ঐ সিলসিলায়ই সোহরাবর্দ্দিয়্যা তরীকারও খেলাফৎ সংযুক্ত হয়, এবং তার আগে মুর্শিদ মহতরম হযরত মৌলানা আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী (র:) -এবং তাঁর ছাহেবজাদা ও খলীফা, 'ইমাম সাহেব' হযরত মাহমূদুল হাসান (র:)-এর নিকট থেকে মুহাম্মদিয়া, এবং মুরশিদ মহতরমের ও বর্ত্তমান বিশ্বে রিফায়ী তরীকার ইমাম, হযরত সৈয়্যদ ইউসুফ হাশিম রিফা'য়ী (র:)-এরও খলীফা হযরত নূর (দা: ব:), হযরত আব্দুস-সালাম (দা: ব:) ও শায়খ মহীউদ্দীন (র:)। এর পক্ষ ছাড়াও মসজিদে নববী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ মুওয়জ্জহ শরীফে, রাসূলুল্লাহ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর দিকে মুখ করে বসা অবস্থায়, হযরত রিফায়ী (র:)[১০] -এর খলীফা হযরত বিশর রিফায়ী (র:)-এর নিকট থেকে রিফা'য়ী তরীকার এজাযত বা খেলাফত প্রদত্ত হই।

এই সময়ের আশেপাশে প্রধানতঃ মদীনা শরীফে এবং ইয়েমেন, হিন্দুস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সূদান, আলেরিয়া, মরক্কো, এবং মালীসহ অন্যান্য জায়গা থেকে অন্যান্য সিলসিলায় ঐসব তরীকা এবং তিজানিয়্যা, সমানিয়্যা, বা'আলাবিয়্যা, শতিরয়্যা, 'আইদ্রুসিয়্যা, ও 'আলাবিয়্যা সহ অন্যান্য আরো কিছু তরীকায়ও আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ এজাযত বা খেলাফত প্রদত্ত হই।

এসবই তো ছিল আত্মশুদ্ধির সাধণার মাধ্যমে আত্মপরিচয়ের ভেতর দিয়ে আল্লাহ তা'আলার পরিচয়। মা'রিফা লাভের মাধ্যমে উনার একজন 'আরিফ, তথা 'আরিফ বিল্লাহ' হয়ে তাঁর দাসত্বে পরিপূর্ণ নিমজ্জিত হওয়ার চেষ্টার প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকগণের দেয়া দাক্ষিণ্য ভিক্ষালাভের পথচলা। কিন্তু এই প্রায় ২০ বছরের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পুরোটারই কোন পর্যায়ে নিজের 'আরিফ' হওয়ার চিন্তা তো দূরে থাক। 'আরিফ', 'মা'রিফা' বা 'আরিফ বিল্লা' শব্দগুলোর দিকেও খেয়াল যায়নি, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তা কখনো খুব একটা বুঝিওনি।

এমতাবস্থায়, ২০১২ সনে পূর্বে উল্লিখিত সিলেটে যে সেমিনারে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের (র:)-এর আরেকবার সান্নিধ্যলাভের নসীব কথা বলেছি, সেখানে স্টেজের ওপর উপবিষ্ট হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব (র:) আমাকে ডেকে আমাকেও স্টেজে তাঁর পাশে বসতে বললে

---

১০ আমি কুয়েত ও জর্দানের হযরত শায়খ ইউসুফ হাশিম রিফায়ীর (র:)-এর এযাজত প্রাপ্ত বা খলীফা হযরত শায়খ নূর (দা: ব:) কর্তৃক হযরত রিফায়ীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর কাছে কিঞ্চিত শিক্ষালাভ করেছিলাম। একইভাবে, শায়খ নূর (দা: ব:)-এর সস্নেহ দয়ায় তৎকর্তৃক আফগানিস্তানের হযরত শায়খ সিবগ্বতুল্লাহ মুজাদদিদী (র:)-এর সঙ্গেও পরিচিত হয়ে তাঁর কাছ থেকেও অত্যন্ত অল্প হলেও, তাঁর বিশাল উপকারের লাভ করি। শায়খ নূরই নিজে আমাকে প্রথম মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীকায় শিক্ষাদানের পর তাঁর মুর্শিদ হযরত মৌলানা মুহম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী (র:)-এর কাছে নিয়ে গেলে তিনি আমাকে সস্নেহে মুর্শিদ হিসেবে আমাকে তাঁর অভিভাবকত্বে নিয়েছিলেন যেই পথ ধরে আমার জন্য জ্ঞানলভের এর পরবর্ত্তী সব দুয়ার উন্মুক্ত হয় - আমি শায়খ নূরের প্রতি এ জন্য চির কৃতজ্ঞ।

আমি লজ্জিত হলেও হুকুম তা'মীলে স্টেজে তাঁর বাম পাশে এসে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়লে এক সময় তিনি আমাকে উঠে কিছু বলতে বলেন। তা'মীলে, উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করি। যদিও তাঁর মত হস্তির সামনে কিছু বলতেও দ্বিধা হচ্ছিল। কি বলছিলাম, কিছুই মনে নাই। কিছু পরিকল্পনা করে সাজিয়ে গুছিয়েও কিছু বলছিলাম না। আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে দিলে যা আসছিল, তাই স্বতস্ফূর্তভাবে বলে যাচ্ছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর, নামাজের জন্য সংক্ষিপ্ত বিরতি হলে, নামাজ পড়ে স্টেজের ওপর ফেরার সময় শুনতে পেলাম, হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব (র:) আমার সম্পর্কে বলছেন, 'উনি আরিফ বিল্লাহ'।

শুনে আমি খুবই লজ্জিত হলাম। আরবী জানি বলে এর অর্থ তো বুঝতে পারি। হযরতের (র:)-এর মুবারক জবানে এই কথাটিকে স্নেহ থেকে দোয়াই মনে করলাম - আমীন বলি। আমি শুনতে পেরেছি তা বুঝতে না দিয়ে, জায়গামত গিয়ে তাঁর হুকুম তা'মীলে যে কথা শুরু করেছিলাম, তা বলে পূর্ণ করি।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে মা'রিফার কিছু 'আতা করে তাঁর আরিফ হওয়ার সা'আদৎ নসীব করলে, এক পর্যায়ে তাকে মা'আরিফ - অন্যদেরও আল্লাহ তা'আলাকে চেনাবার জরী'য়া করে দেন। আমার মুর্শিদ মহতরম (র:) এইরূপ মা'আরিফ হিসেবেই আমাকে এই পথে তুলে নিয়েছিলেন। আমার ওপর আমার শায়খগণের তরফ থেকে ইতোপূর্বে বর্ণিত নানা এজাযত আর খেলাফৎ-মাধ্যমে অন্যদের আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে 'আরিফ' হওয়ার পথের পর্যায়গুলোর পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ। তখন না বুঝলেও। আসলে আমার নিজেরই এই 'মা'আরিফে'র ভূমিকায় দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষণেরই অংশ ছিল, তাঁদের দয়ায়। এক্ষনে হযরত মুহাদ্দিস সাহেবের (র:) আমি অধমকে 'আরিফ বিল্লাহ'র মত কিছু একটা বলাটা যেন আবারো তাঁর পরশ-পাথর সুলভ বরকতে মা'আরিফের ভূমিকায় আমার প্রশিক্ষণের যেন গতি বেগবান হয়ে ওঠে। আমার নিজেরই খেয়ালে না এসেই আমার আত্মপরিচয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পরিচয়মূলক আত্মশুদ্ধি শিক্ষাদানের কার্যক্রমের পরিধি বিশ্বের বিস্তারব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়ে ২০১২ সনের ঐ সেমিনারের পর।

আখলাক ও 'আদবে'র প্রশিক্ষক

আখলাক সংশোধন পদ্ধতি যে তাসাউউফ বা 'তজকিয়া' বিজ্ঞান, তার ভিত্তি, মেরুদণ্ড আর উদ্দেশ্য। সবই হ'ল 'আদব'। আর এই 'আদবে'র বিশ্বদৃষ্টি হল ধর্মীয় সমাজব্যবস্থার মৌলিক বিষয়বস্তু, 'আদল, তথা 'কাজীর বিচারে'র ইনসাফ আর তার ব্যবস্থাগত কাঠামো, তথা প্রকৃত 'আমীরাতে'র-ও ভিত্তি।

আদব হল পর্যায়ক্রমিক মর্যাদার সংবেদনশীল বোধ ও তার সুকুমার ব্যহারিক প্রকাশ। প্রকৃত বোদ্ধার এই বোধে মর্যাদার পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ প্রকৃতপক্ষে সব মর্যাদার আসল মালিক, আল্লাহ তা'আলা। তাঁর নীচে, তাঁর প্রকাশের মাধ্যম (مظهر) রূপ সমগ্র সৃষ্টির

সর্বোচ্চ। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অধঃস্তন সব নবী ও ফেরেশতা কূল; তারপর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত ও অনুমোদিত উলু'ল-আমর: একদিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গর্ভ (رحم) সূত্রে সম্পর্কিতজনেরা, সর্বোচ্চ যাঁদের, পিতা-মাতা -আর অন্যদিকে নববী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞান ও ভূমিকার উত্তরাধিকার (وراثة) সূত্রে সম্পর্কিতজনেরা, তথা আসানীদের মাধ্যমে নিযুক্ত হককানী উলামা। এর নীচে আবারো মর্যাদার পর্যায়ক্রমে সৃষ্টিকূলের বাকী সকলেই। ইনসান আর জিন থেকে নিচের দিকে গাছপালা, পাথর, ধূলিকণা পর্যন্ত।

'আদব' হল, এঁদের সকলের প্রতিই যার যার মর্যাদাক্রমানুযায়ী সংবেদনশীলতাপূর্ণ বোধ ও ব্যবহারে তার প্রকাশ। আশৈশব এই 'আদব' শিখে এসেছিলাম। তা সত্বেও সবসময়ই কোথাও কোন বেআদবী হয়ে যায় কি না, সেই ভয়ে থেকেছি। একবার মদীনা শরীফে আমার অন্যতম ইয়েমনী বংশোদ্ভুত নবী বংশীয় উস্তায, হযরত সৈয়্যদ আইদ্রুস আল-কাফ (দা: ব:)। যাঁর কাছে কিছু শাফে'য়ী ফিকহ আর তিব্ব ছাড়াও তাসাউফ আর আখলাকও শিখছিলাম। তাঁকে বল্লাম, আমি 'কিল্'তুল আদব' (আরবী প্রকাশ ভঙ্গীতে, 'বে-আদব); তিনি বলে উঠলেন, 'না, বরং আপনি 'কিম্মতুল -আদব' (আদবের সর্ব্বোচ্চ শিখর)। এ ছিল তাঁর স্নেহ থেকে বলা উৎসাহব্যঞ্জক একটি কথা। কিন্তু, আল্লাহ তা'আলার রহমতে আশৈশবই ওপরে বর্ণিত বিষয় খেয়াল রেখে আদব বজায় রাখতে সচেষ্টই থেকেছি সারাজীবন। এ বিষয়ে টনটনে সংবেদনশীলতার সঙ্গে। তারপরও, হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের (র:) আদবের আরও উচ্চতর সূক্ষ্মতর বোধ থেকে আদবের আরও শিক্ষালাভ করি, একটি ঘটনায়।

১৯৯৪ সনে মুরশিদ মহতরম ১০৪ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করার পর, প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিকভাবে মুরশিদহীন হয়ে পড়ি। তাঁর খলীফা যেই হযরত নূর (দা: ব:)-এর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দ্বারা মুর্শিদ মহতরমের তরীকায় প্রবেশের পথ খুলেছিল, তাঁর সঙ্গেও ভৌগোলিক দূরত্বসহ নানা কারণে তেমন যোগাযোগ রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনেও নানা আজমাইশরূপ কঠিন বিপদ আপদের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। ২০০৬-এর আশে পাশে হযরত 'আব্দুস-সালাম (দা: ব:)-এর তত্ত্বধানে এসে আবার বাহ্যিক অভিভাবকত্বের ছায়াতলে আশ্রয়ের সৌভাগ্য হলেও আমি সহস্র মাইল দূরত্বে, আর হযরত আব্দুস-সালাম দুর্গমতম এলাকায় হওয়ায় তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখাও হচ্ছিল প্রায়ই অসম্ভব।

এর একটু পরেই হযরত মুহাদ্দিস (র:)-এর সঙ্গে ঘটনাচক্রে একটি হাদীস শেখার আগ্রহে এসে আত্মিকভাবে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠলে, একবার মনে হলো, তিনি যদি হাদীসশাস্ত্রের মতে আমার তাসাউফের মুরুব্বীরও ভূমিকা গ্রহণ করলে আমার সার্বিক

অগ্রগতির জন্য হয়ত সহজ হত। তিনি বয়সেও অভিভাবক পর্যায়ের ছিলেন। আমার ১৯৯৬ সনে ইন্তেকাল করা মরহুম আব্বার চেয়ে বছর তিনেক মাত্র বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন, মা বাবা দু'জনের পরিচিতও ছিলেন। এসব নানা চিন্তায়ই হয়ত কথাটি মনে এসেছিল।

এক সময় কথাটি তাঁকে বললাম। কুরআন, হাদীস, ফিকহ, আখলাক। সব বিষয়েই আমাকে সনদ দিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মুরুব্বীর ভূমিকা গ্রহণ করে অকাতরে উৎসাহ দান করলেও তাসাউফের ক্ষেত্রে আমার এই মূহূর্ত্তের চিন্তাটিতেও তিনি রাজী হওয়ার মত কিছুই বললেন না; বরং অস্বীকৃত হলেন।

এই অস্বীকৃতিকরণটি আমি আজও ঠিক না জানলেও দু'টি সম্ভাব্য কারণের যে কোন একটি বা উভয়ই তা হতে পারে বলে মনে হয়। দু'টোই হতে পারে আদবের অত্যন্ত সূক্ষ্ম বোধ সংক্রান্ত। এক, আমি ইতোমধ্যেই তাসাউফ শাস্ত্রে খেলাফত প্রদত্ত 'অভিভাবক' হিসেবে ঐ শাস্ত্রে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণদানের মুরুব্বী, হযরত মৌলানা আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী (র:)-এর মত একজন অতি সম্মানিত জৈষ্ঠ্য শায়খের তরফ থেকে নিযুক্ত। সেখানে আমার ওপর এ বিষয়ে মুরুব্বী অভিভাবক হওয়াটা হয়ত আদবের সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতার পরিপন্থী হত।

একইভাবে, আমি তখন আর এখনও। হযরত মৌলানা আব্দুর-রশীদ সিদ্দীকী (র:) সাহেবের নিযুক্ত, তাঁর খলীফা, হযরত 'আব্দুস-সালাম (দা: ব:)-এর তত্ত্বাবধানাধীন, ও খলীফা। এমতাবস্থায় হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের (র:) অভিভাবকত্বে যাওয়া বেআদবী হতে পারত।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের (অস্বীকৃতিতে আমি আমার মূহুর্তমাত্রের বেখেয়ালী থেকে জেগে উঠে সুক্ষ্ম সংবেদনশীলতার বিচারে বেআদবী বলে গণ্য হতে পারত হয়ত, এমন ক্ষীণ সম্ভাবনা থেকে বেঁচে যাই। আর এ জন্য হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের প্রতি শোকরগুজারী বোধ করি। আলহামদুলিল্লাহ।

মহব্বতের হাবীব

আদবের ভিত্তিই হ'ল এক অতি মার্যিত মহব্বত।

সব আদর্শ প্রকৃত উস্তাযের মতই মুহাদ্দিস ছাহেবের হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষার্থীর মনে এক অনাবিল, শিশুসুলভ মহব্বতের উদ্রেক করে আক্ষরিক অর্থেই হাবীব হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ারিসরূপ হাবীব (র:) হয়ে যান।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব নামে তো হাবীব ছিলেন-ই, কার্যতঃও ছিলেন হাবীব বিভিন্ন সুসম্পর্কিত পর্যায়ের মহব্বতের। রহমানের মহব্বতে হবিবুর রহমান, রহমানের সর্বোচ্চ ও আদি ও আসল হাবিব। আদি ও আসল হবিবুর রহমান, তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হকীকী ওয়ারিস মুস্তনদ তথা হক্কানী আলিমরূপে তাঁরই

তজল্লীতে ভাস্বর এমন এক হাবিব যিনি ইনশাআল্লাহ রহমান আল্লাহ তা'আলারও হাবিব, তাঁর হাবিব হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও হাবিব, আল্লাহ তা'আলার বান্দা, তথা তাঁর সব মখলূকেরও হাবিব, তাঁর মখলুজ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ - 'খয়রুল খ্বল্ক' হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতেরও হাবিব; তাঁদের ভেতর শ্রেষ্ঠ, আলেমে-মু'আল্লিম ও তালেবে-ইলমদের হাবিব। এভাবেই তাঁরও দুয়ারে ইলমের তালেব এই আমারও দিলে তাঁর নিজের জন্যও সবিশেষ মহব্বতের একটি নহর বইয়ে দেন তাঁর নিজের উস্তায সুলভ মহব্বত, স্নেহ দিয়ে। তা অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করে তাঁর প্রশিক্ষণ দিয়ে এমনভাবে শিখেছিও যে, আলেম, মু'আল্লিম, শিক্ষক, ফকীহ, মুফতী, কাজী, এমন কি সমাজের ধর্মমত ব্যবস্থাপনা, তথ 'আমীরতে'র কজ, সবখানেই দরকার এক অনাবিল মহব্বতের রহমত দিয়েই সাধারণতঃ পরিচালিত হওয়া।

তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক দুনিয়াতে প্রায় দেড় যুগ। ১৭/১৮ বছরের - তার প্রায় এক যুগ, ১২ বছর অতিক্রান্ত হলে এক দিন দিলে, তা নিয়ে একটি কসীদার নুজূল হয় আমার কল্বে, ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারিতে। যদিও আমি আধুনিক কবিতা, সনেট ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ধরনেরই কবিতা লিখি ও সম্পাদনাও করেছি[১১] -মনের গভীরে আসা কবিতা অনেক সময় আসে পুঁথি বা বাউল কাব্যের আঙ্গিকে[১২] এইখানে'ও তাই:

হজ্বরত মহ্বদ্দিস ছা'ব

হজ্বরত হবীবুর রহমান
লভিয়া তাঁহার সান্নিধ্য'
ধন্য মনপ্রান
খোদার বড়ই দান!

---

১১ এমনকি, ঘটনাচক্রে তারুণ্যে জাতীয় স্বার্থে অনেকটা বাধ্য হয়েই একটি 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' ও লিখে ফেলি দেশ-মুক্তির কিছুদিন পর কোলকাতাতে এক দক্ষিণ এশীয় আন্তর্জাতিক যুবসম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী একটি ক্ষুদ্র দলের অংশ হিসেবে কোন এক পরিস্থিতিতে পড়ে! সে আরেক কাহিনী অন্য কোন সময় বলা যাবে।

১২ আমার বাবা এবং দাদার মতই আমিও স্বভাব কবি - তাঁরাও অন্য স্বভাব কবিদের মত ঐ লোকসাহিত্য সুলভ আঙ্গিকে কাব্য রচনা করেন। বাবা যদিও আধুনিক সাহিত্যও সৃষ্ট করেন, ভাষাসৈনিক হিসেবে ১৯৫২-এর দিকের তাঁর লেখাগুলো, এবং তার পরের লেখাগুলোতেও তাই পাওয়া গেলেও, তাঁর সম্ভবতঃ সর্বশেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ, "পথ সন্ধানে" (১৯৮৬)- সহ তাঁর কোন কোন সাহিত্যকর্ম ঐ পুঁথি আঙ্গিকে লেখা। স্বভাব কবিরা সম্ভবতঃ অবচেতনায়ই লোকজ হয়ে থাকেন, নিজেরা লোকসাধারণেরই অবিচ্ছেদ্যঅংশ হিসেবে, মনের গভীরতা থেকে উৎসারিত কথাগুলো লোকভাষায় লোকসাহিত্যের আঙ্গিকেই বলে যান অবচেতনেই।

আরবের কাজী
আমাদের ধন
মহ্বদ্দিস ছা'বে যবে
করিনু বরন

হিজরত হল স্হির
মদীনার ধামে
বরি সেথা সরতাজে
সালামে সালামে।।

মুর্শিদের ইশারাতে
পশি তাঁর দ্বারে
ভূষিত হনু মুই
হ্বদীস ভান্ডারে

কুরআন, রূহানী
বিবিধ জ্ঞান
মহাসমুদ্র সম তাঁর
করি কিঞ্চিত পান ।।

কী সুভাগ দানিলেন
হজ্বরত মুর্শিদ
মওলানা সিদ্দীকী
আব্দুর রশীদ

রহমত বর্ষুক তাঁর
পরে চিরকাল ।।
হবীব হযরত ও হোন
সদা খুশহাল।।

বিদায়

সব প্রকৃত মহব্বতেরই দুনিয়ার গণ্ডি ছেড়ে ঊর্ধ্ব জগতে উত্তীর্ণ হয়ে চিরকালীন হওয়ার একটি দিক থাকে। ইহজাগতিক পর্যায় থেকে বিদায়ের চাবি দিয়ে তা বরজখের দুয়ার খুলে সেই চিরন্তন ঊর্ধ্ব লোকে উত্তীর্ণ হয়। হাবিব মুহাদ্দিস সাহেবের ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। ঐ কবিতার তিন বছর পর, তাঁর ইন্তেকালের খবর শুনে তাঁকে নিয়ে তাৎক্ষনিক দিলে আরেকটি কবিতার নুজূলের উপলক্ষ করে দিয়ে - এবারেরটিও স্বভাব কবিগতভাবেই, তবে আরবীতে:

الوداع

الوداع يا محسني العظيم
الى اللقاء بدار القرار
يا من نضر الله وجهه
و جعله لنا كالشعار
بالحديث و منصب القضاء
كنت قاري عكست القرآن
بلغت الرضاء ،
يآ شيخ حبيب الرحمن !
كيف تنكر الحب اذا
شهدت عليه الدمع الحزن
!الوداع، شيخنا الحبيب
الى اللقاء

উপসংহার

প্রকৃত 'আল্লামা আজকাল লোকে ছোট বড় আলিম, এমন কি গ্বয়র-আলিমকেও শায়খ, মৌলানা, এমন কি 'আল্লামা'-ও বলে ফেলে এই পরিচয়মূলক পদবীরই শুধু নয়, এইসব পরিচয়ে যাঁদের আসলেই পরিচিত হবার কথা। সেসব জ্ঞান তাপসদেরও অতি মাত্রায় অবমূল্যায়ন করে।

প্রকৃত 'আলিম, মওলানা, শায়খ, ফকীহ, মুফতী, কাজী বলতে কি বোঝায়, তা' পূর্বেই একটু খুলে বলেছি। ওপরে প্রকৃত 'আল্লামা হলেন যিনি একাধারে এইসব পদবী দিয়ে পরিচিত হবার মত আসলেই বিশেষজ্ঞ হিসেবে ধর্মজ্ঞানের অনেকগুলো শাখার প্রত্যেকটিতেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় অবিচ্ছেদ্য ধারায় নেমে আসা ইসনাদ-ক্রম, তথা আসানীদ মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের প্রকৃতই নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞরূপে সত্যায়িত। এরকম প্রকৃত 'আল্লামা আজকাল ত আজকাল, চিরকাল বিরল। সেখানে, হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব শায়খ, ফকীহ, কাজী, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, কারী ইত্যাদি হিসেবে ছিলেন একজন বিরল প্রকৃত 'আল্লামা। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে দেখা তাঁর ওপরের বর্ণনা থেকে বুঝতে পারার কথা। অন্যরা তো তাঁকে আরো বেশী দেখেছেন বা জেনেছেন। তাঁদেরও বর্ণনা থেকে এই কথার আরও সমর্থ পাওয়া যেতে পারে।

শেষ কথা

হয়েও হয় না শেষ যাঁর কথা, সেই মুহাদ্দিস ছাহেব (র:) সম্পর্কে আমার আপাতত: শেষ কথাটি হ'ল:

দু' ফোটা জলও
পারিনি দিতে
হাদিয়া করে:

নিয়েছি অঢেল
অকাতরে:

দিয়ো গো খোদা
ভেস্তে সুযোগ
সেবিতে তাঁর
চরণ যোগ

লভিতে আরো
স্নেহের ঢলও:
স্বরা ধরনীতে:
প্রাণ মন ভরে।
মহব্বতে
হযরতের (দ:, র:) তরে।।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ
একজন জ্ঞানসাধকের কথা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

মুসলিম জাতি শ্রেষ্ঠতম জাতি। মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত হওয়ায় মহান আল্লাহ আমাদেরকে শ্রেষ্ঠতম হবার সম্মান দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

كنتم خير أمة أخرجت للناس

'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যারা মানবজাতির জন্য উৎসারিত। (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

এই সর্বোত্তম উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মানুষ হলেন মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমের উত্তরাধিকার আলিমে রাব্বানিগণ। মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

نصر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه

'আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং সেটা সংরক্ষণ করে অন্যের কাছেও তা পৌঁছে দিয়েছে।' (তিরমিযি, আবু দাউদ)

তিনি আরও বলেছেন,

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ

'প্রত্যেক আগত জামা'আতের মধ্যে নেক, তাকওয়াসম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য মানুষ (কিতাব ও সুন্নাহর) এ জ্ঞান গ্রহণ করবেন। আর তারা এ জ্ঞানের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনকারীদের রদবদল, বাতিলপন্থীদের মিথ্যা অপবাদ এবং জাহিল অজ্ঞদের ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে বিদূরিত করবেন।' (বায়হাকি)

আমার দেখা এমন একজন আলিমে রাব্বানি, হাদীসে নববীর খাদিম এবং মুহাদ্দিসুল আসর ছিলেন হযরত মাওলানা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। এক জীবনে তিনি এতসব কীর্তি রেখে গিয়েছেন, যা সত্যিই বিস্ময়কর। মহান আল্লাহ তায়ালার প্রত্যক্ষ মদদ এবং রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্নেহাশীস না থাকলে এ পরিমাণ খিদমতের আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়।

হযরত মাওলানা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ একাধারে একজন মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুফাসসির, সমাজসেবক, বিদেশের কোর্টের বিচারক, কামিল পীর, লেখক, সম্পাদক

এবং সর্বোপরি একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। তাঁর সাথে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছে। প্রতিবার একজন বিনয়াবনত উজ্জ্বল মুখশ্রীর এক অসাধারণ আলিমের সামনে আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছি। যাদের কথা এখন বইয়ে পাওয়া যায়, সেই পূর্বযুগের দুনিয়াবিমুখ আলিমদের এক মুজাসসাম নমুনা ছিলেন তিনি।

তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইলমপিপাসু মানুষের জন্য আদর্শস্থানীয় ছিলেন। শিক্ষাজীবনের সবগুলো স্তরে তিনি ঈর্ষণীয় সাফল্যের সাক্ষর রেখেছেন। ১৯৫৯ সালে কামিল পাস করা পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি জাতীয় মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। এরপর কর্মজীবন শুরু করার পর সেখানেও অসাধারণ কৃতিত্ব ও সাফল্য দেখিয়েছেন।

তাঁর কর্মজীবনের সূচনা ১৯৫৯ সালে। সে বছর তিনি ইছামতি দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। এরপর তিনি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সিলেটের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদ্‌রাসা, ইছামতি দারুল উলুম মাদ্‌রাসা এবং সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদীসের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। শেষোক্ত মাদ্‌রাসায় তিনি দীর্ঘ সময় অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেছেন। এছাড়া তিনি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে উম্মুল কুওয়াইন কোর্টে বিচারক হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। বাংলাদেশী আলিম সমাজের জন্যও এটি একটি গর্বের বিষয়।

তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে একজন দাঈ ইলাল্লাহর কর্মক্ষেত্রের পরিসর কতটা সুবিস্তৃত হতে পারে, তা কিছুটা ধারনা করা যায়। শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিরিয়া, মরক্কো, ভারত, মিশর প্রভৃতি রাষ্ট্রে তিনি দাওয়াতি সফর করেছেন। দেশের আনাচে-কানাচে আহলুস সুন্নাতের সঠিক আকীদা প্রচারে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। পাশাপাশি আত্মিক পরিশুদ্ধিতা অর্জনের জন্য ছাহেব কিবলাহ আল্লামা ফুলতলি রাহিমাহুল্লাহর কাছে মুরিদ হয়ে তরিকতের সুলুক সমাপ্ত করেছেন। সবশেষে আধ্যাত্মিক পথপরিক্রমায় কামালিয়ত অর্জন করে খিলাফত লাভ করেছেন।

সমাজসেবামূলক কাজের সাথেও তিনি সমানভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি নিজ খরচে জমি কিনে থানাবাজার হাবিবিয়া হিফজুল কুরআন মাদ্‌রাসা এবং ইয়াতিম খানা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা এখনও চলমান। এছাড়া তিনি বিভিন্ন মাদ্‌রাসার একাডেমিক ভবন, নামায কক্ষ ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন। তাঁর নিজ হাতে নির্মিত ও সংস্কারকৃত মসজিদের সংখ্যাও একাধিক। তাঁর সর্বশেষ প্রতিষ্ঠিত আল হাবীব জামে মসজিদে তিনি আমৃত্যু হাদীসের দারস দিয়ে গেছেন। তাঁর কবরও সেই মসজিদের পাশেই অবস্থিত। এখানে তিনি নিজের ব্যক্তিগত গ্রন্থের সংগ্রহ দিয়ে আল হাবীব গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন।

তিনি তাঁর জ্ঞানচর্চার অনন্য নিদর্শনস্বরূপ আরবি, বাংলা ও উর্দু ভাষায় ১৮টি গ্রন্থ লিখে

গিয়েছেন। এগুলোর সবই প্রকাশিত। এছাড়া তিনি নিজ সম্পাদনায় সিলেট শহর থেকে মাসিক শাহজালাল পত্রিকা বের করতেন। অল্প সময়েই গবেষণামূলক বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখির কারণে পত্রিকাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কর্মবহুল জীবনে নানান দিক থেকে ইসলামের সেবার আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আমৃত্যু তাঁর এই প্রচেষ্টা সর্বক্ষেত্রে জারি ছিল। কিন্তু তাঁর সাধনার মূল বিষয় ছিল ইলমে হাদীস চর্চা ও ইলমে হাদীসের খিদমত। সিলেট অঞ্চলে ইলমে হাদীসের খিদমতকারী অনেক বুযুর্গ ছিলেন, এখনও আছেন। কিন্তু তাঁর হাদীসের খিদমত এমন কিংবদন্তীতুল্য পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, 'সিলেটের মুহাদ্দিস ছাব' বললে সবাই বুঝতো মুহাদ্দিস হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহর কথা বলা হচ্ছে। একজন বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর বিশ্বখ্যাত হাদীসের শিক্ষকগণের দুআ, ইজাযত ও অবদান মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তিনি যাদের কাছে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন অথবা হাদীসের সনদ-ইজাযত লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

১। শামসুল উলামা আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলি র.
২। মুফতি আমিমুল ইহমান রাহিমাহুল্লাহর উসতায আল্লামা মুহাম্মদ হোসেন সিলেটি র.
৩। মুফতি সায়্যিদ আমিমুল ইহসান র.
৪। সুলতানুল উলামা আল্লামা হাবিব সালিম আশ শাতেরি র.
৫। ড. সায়্যিদ মুহাম্মদ ইবন আলাভি আল মালিকি র.
৬। ড. আসআদ মুহাম্মদ সাঈদ সাগিরজি র.
৭। ড. তাহিরুল কাদিরি প্রমুখ।

তাঁদের কাছ থেকে শেখা ইলম তিনি অর্ধশত বছরেরও বেশি সময় ধরে অকাতরে বিলিয়ে গিয়েছেন। তাঁর প্রথমিক শিক্ষকতা জীবনের ছাত্রদের মধ্যে এখন তেমন কেউ আর বেঁচে নেই। তাঁদের মধ্যে মাওলানা শুয়াইবুর রহমান বালাউটি, মাওলানা ইরশাদ হোসাইন গোয়াহরি, মাওলানা মাশুক আহমদ প্রমুখ অন্যতম। দেশ-বিদেশের বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিসগণও তাঁর থেকে ইলম অর্জন করেছেন, তাঁর থেকে সনদ ও ইজাযত গ্রহণ করেছেন। যারা তাঁর থেকে হাদীসের সনদ ও ইজাযত গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন:

১। কুয়েতের সাবেক মন্ত্রী শায়খ সায়্যিদ ইউসুফ হাশিম রিফাঈ র.
২। আল ফিকহুল হানাফি ওয়া আদিল্লাতুহু গ্রন্থের লেখক সিরিয়ার শায়খ ড. আসআদ মুহাম্মদ সাঈদ সাগিরজি র.
৩। মদীনা শরীফের শায়খ হাবিব আসিম ইবন আদি।
৪। বাহরাইনের ড. নাজি বিন রাশিদ প্রমুখ।

আল্লামা হবিবুর রহমান র. এর হাদীস দারস দানের সাথে এক ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িয়ে আছে। এ ঘটনা সিলেট অঞ্চলে মশহুর। ১৯৬৩ সালের কথা। তিনি তখন ফুলবাড়ি মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনারত। মুহাদ্দিস সাহেবের পীর ও মুর্শিদ আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন- কাকে সৎপুর মাদ্‌রাসায় হাদীস শরিফ পড়ানোর দায়িত্ব দিবেন। তখন এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ এনেছেন। তিনি ঘরের মধ্যে একজন মানুষের দিকে হাত মুবারক দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'ওনাকে হাদীস পড়ানোর জন্য পাঠিয়ে দিন।' দেখা গেলো, তিনি মুহাদ্দিস হবিবুর রহমান র. এর দিকে ইশারা করলেন।

মুহাদ্দিস হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহর হাদীস পাঠদানের নিজস্ব কিছু নিয়ম ছিল। তিনি কখনও মুতালাআ ছাড়া পাঠদানে বসতেন না। কখনও কখনও গভীর রাত পর্যন্ত মুতালাআ করতেন। হাদীসগ্রন্থে হাত রেখে পড়া বা কাগজ রাখাতে তিনি অপছন্দ করতেন। দারস দানের সময় তিনি খুব মেপে কথা বলতেন। জটিল পরিভাষা বা দুর্বোধ্য মাসআলাও অত্যন্ত সহজভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতেন। ছাত্রদের দারসে অযু অবস্থায় থাকতে হতো। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুনলে দরুদ শরিফ পড়া ছিল বাধ্যতামূলক। সবসময় তিনি নিচে বসে দারস দিতেন। ছাত্ররাও তাঁর সাথে নিচে বসতো। বৃদ্ধাবস্থায় যখন নিচে বসা কষ্টকর হয়ে উঠলো, তখন তিনি চেয়ারে বসে দারস দেয়া শুরু করেছিলেন। অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, যখন তিনি একদম মৃত্যুশয্যায়, তখনও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ইলম পিপাসু ব্যক্তিদের কখনও হুইল চেয়ারে বসে এবং কখনও বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাদীসের দারস দিয়েছেন। তাঁর সর্বশেষ হাদীস সংকলন আল মুনতাখাস সুনানি ওয়াল আসার তাঁর ইন্তেকালের দিন প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর ১৮টি গ্রন্থের মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো সরাসরি ইলমে হাদীস সম্পর্কিত:

১. দোয়ায়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফযিলত

২. যাখিরাতুল আহাদিসিল আরবাঈন ফি ফাদাইলি সায়্যিদিল মুরসালিন

৩. কানযুল আহাদিসিল আরবাঈন ফি মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যিল আমিন

৪. তুহফাতুল লাবিব বি আসানিদিল হাবিব

৫. আত তুহফাতুল লাতিফাহ বি আহাদিসিল মুসালসালাতিল মুনিফাহ

৬. দারসে হাদীস-১

৭. মুনতাখাবুস সুনানি ওয়াল আসার

এগুলো ছাড়াও তাঁর বিভিন্ন সময়ের হাদীসের দারস দানের ভিডিও সংরক্ষিত রয়েছে।

সেগুলোর লিখিত রূপ দেয়ারও কাজ চলছে।

শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহর হাদীস শিক্ষাদান কেবলমাত্র শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর হাদীস শিক্ষাদানের ক্ষেত্র কায়রোর আযহারের মসজিদ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো মাহফিলের ময়দান, লন্ডন শহরের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ- সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। তাঁর শিক্ষার্থীদের শ্রেণি-পেশাতেও ছিল বৈচিত্র্য। তরুণ তালিবে ইলম থেকে অশীতীপর বৃদ্ধ মুহাদ্দিসও ছিল তাঁর শিক্ষার্থী। যখন যেভাবে প্রয়োজন, সেভাবেই তিনি ইলমে নববীর সৌরভ ছড়িয়ে গিয়েছেন।

দুনিয়ার জীবন আমাদের কারুরই স্থায়ী নয়। এই সত্য আমাদের সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রহিমাহুল্লাহও ২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি চলে গেলেও তাঁর জ্ঞানসাধনার অনন্য নজির এখনও আমাদের সামনে বিদ্যমান। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ইলমে হাদীস চর্চারত অবস্থায় তাঁর পার্থিব জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষেত্রে একটি হাদীস প্রাসঙ্গিক। মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ يُحْيِي بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ

'এমন ব্যক্তি যার মৃত্যু এসে পৌঁছেছে এমন অবস্থায়ও ইসলামকে জীবন্ত করার উদ্দেশে জ্ঞানার্জনে মশগুল রয়েছে, জান্নাতে তার সাথে নবীদের মাত্র একধাপ পার্থক্য থাকবে।' (সুনানে দারিমী)

মহান আল্লাহ তাঁর কবরকে আলোকিত করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমিন।

লেখক: ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; সাবেক চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

تقريظ وتعريف موجز عن العلامة المحدث القدوة محمد حبيب الرحمن البنجالي

كتبه

فضيلة الشيخ د. يسري رشدي السيد جبر الحسني القاهري الأزهري الشافعي الشاذلي شارح الكتب الستة بالأزهر الشريف ومساجد القاهرة بالأسانيد المتصلة.

الحمد لله الذي حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلماء المجتهدين الذين قضوا أعمارهم في تحصيل العلم من القرآن والسنة وهما المنبع الأصيل الذي يدور عليهما علوم النبوة والوحي على قلب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ومنحهم الله الهمة والاستمرار من عمرهم على أداء رسالتهم حفظا لهذا الدين القويم تعلما وتعليما لينقلوه للأجيال التي تليهم فيقوموا بدور الأنبياء إرشادا وتعليما وأسوة. ومن بحر هؤلاء العلامة المحدث محمد حبيب الرحمن البنجالي المولود ٢٥٣١هـ - ٤٣٩١م في قرية راري، ذكي غنج في بنجلاديش من محافظة سلهت وتخرج من جامع العلوم غاس باري بتفوق تحت رعاية إدارة المجلس التعليمي للمدارس الإسلامية بباكستان الشرقية (بنجلاديش). وعلى عادة العلماء أخذ العلم بالدراسة والتلقي على العلماء ليصح له الإسناد عن العلماء، ومن هؤلاء:

١ - شمس العلماء العلامة محمد عبد اللطيف شودهري الفولتلي (٢١٩١م) - ٨٠٠٢م)

٢ - محدث الحجاز السيد محمد بن علوي المالكي المكي (٠٤٩١م - ٤٠٠٢م) ١٩

٣- المفتي السيد عميم الإحسان المجددي البركتي (١١٩١م - ٤٧٩١م)

٤ - سلطان العلماء السيد سالم بن عبد الله الشاطري الشافعي اليمني (٩٥٣١م - ٩٣٤١هـ) وغيرهم من كبار علماء عصره.

وقد عمل مفتشا للتعليم بوزارة التربيه والتعليم ببنجلاديش وأستاذا بالدراسات العليا والمعهد العالي وقدوة للائمة والوعاظ وسافر إلى الإمارات وعين قاضيا في المحكمة الشرعية ثم عاد إلى بنجلاديش

١٨٩١م واستمر في أداء رسالته داعيا إلى الله في بلاده وخارجها وشارك في العديد من المؤتمرات

في انجلترا وأمريكا والهند والسعودية وسوريا والمغرب ومصر.

وقد أكرمني الله وقابلته في مقام سيدنا الحسين بالقاهرة يوم سبت مع أحد أبنائه وتلامذته ولفيف طلاب العلم أثناء آخر زيارة له في مصر المحروسة. وتبادلنا الأسانيد والإجازات وسررت بلقائه غاية السرور وأكرمني الله أن أذهب إلى بلده هذا العام ٣٢٠٢م لإحياء ذكراه وقد ترك مؤلفات وجمع الأسانيده منها كتاب منتخب السنن والآثار وأسأل الله أن يجعل ما خلفه من علوم وتلاميذ في صحيفة حياته وأن ينفع به وبذريته من بعده وأن يعوضنا عن علمائنا خيرا ليظل هذا الدين حيا باتباعه وعلمائه وطلابه حتى يرث الله الأرض ومن عليها ويجعلنا على قدمهم مناسبين بهم مقتضيهم

آثارهم.

إيقاظ الوسنان بذكر
شيخ الحديث محمد حبيب الرحمن

بقلم
خادم الحديث الشريف
فضيلة الشيخ الدكتور: ناجي بن راشد بن حسن العربي
أستاذ الحديث المشارك بجامعة البحرين
مملكة البحرين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله،وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد؛فهذه كلمات موجزة ، وسطور معدودة في التعريف بشيخنا العلامة المحقق الفقيه شيخ الحديث مولانا الشيخ محمد حبيب الرحمن بن مولانا الشيخ ممتاز علي السهلتي البنغلاديشي - رحمه الله تعالى -.

أول لقاء بشيخنا العلامة شيخ الحديث:

أول لقاء لي بمولانا شيخ الحديث شيخنا العلامة محمد حبيب الرحمن كان في بريطانيا،في مدينة لندن على وجه الخصوص،إذ كنا في محفل بهيج،واحتفال ديني كبير؛بسبب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف،وكانت لي كلمة في تلك الفعالية الدينية المباركة؛وبينما أن جالس على كرسي منصة المتحدثين؛أنتظر انتهاء الترتيبات التي تسبق بداية الاحتفال إذا بي أرى شيخاً يقدم من بعيد متوجهاً إلى جهة المنصة،وإذا بي أرى الجميع تتوجه عيونهم إليه،وتتسارع ذواتهم للترحيب به،والسلام عليه،

والاحتفاء به.

عندها تأملت في هذا القادم الكريم المكرَّم،والشريف المشرَّف،فإذا بي أرى شيخاً وقوراً،منوراً بأنوار الهداية الربانية،ترتسم على وجهه صورة مشرقة من صور ((تعرف في وجوههم نضرة النعيم)) [المطففين: ٤٢]، رأيت شيخاً جليلاً كريماً يمشي مشية الخاشعين،((وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا)) [الفرقان: ٣٦]،يسلم على الناس في تواضع تام جم،يبادلهم الترحيب بوجه طلق،وثغر مبتسم،فوقفت له قبل أن يصل إلى المنصة تقديراً واحتراماً،ولسان حالي يقول لفضيلته:

قيامي والعزيز إليك الحق وترك الحق ما لا يستقيم

ولما وصل قريباً من المنصة تشرفت بالسلام على جنابه،فعرَّفني الإخوة من طلبته وأحبابه على فضيلته،وعرفت معرفة عامة مختصرة شيئاً بسيطاً من مكانة ومقام هذا العالم الجليل.

تشرفت بالجلوس قرب فضيلة مولانا العلامة على المنصة وأنا أغبط نفسي بنيل هذا التشريف، فإنه رحمه الله فاجأني وأبهرني وشدّني بسمته الذي يذكرك بالعلماء الربانيين،وبالنور الذي يشرق في وجهه،والتواضع الشديد الكبير الذي يجعلك تدخل في حالة من الاستغراب وأنت ترى هذا الخلق العظيم،الذي غاب عن الكثيرين من أبناء هذا العصر.

انتهزت تلك اللحظات في التعرف على فضيلته،والتماس بركته،وطلب دعواته،فقد رأيت في شخص شيخنا العلامة صفات تشد طالب العلم وتأسره؛رأيت: عالماً عاملاً بعلمه،تدرك من أول وهلة أن هذا العالم من طراز فريد من العلماء العاملين الصالحين.

فشواهد عمله بعمله ظاهرة عليه من كل جانب،في مشيته،في هيأته،في كلامه،في جلسته،في تلك اللحظات أدركت أنني أمام عالم عامل رباني؛رأيت: عالماً ورعاً،زاهداً،خاشعاً،عارفاً،ذاكراً،يذكرك بأكابر الصالحين،وترىٰ فيه خشية المخبتين،وإنابة العابدين المخلصين.

أعجبت كثيراً في هذا اللقاء الذي استمر لدقائق معدودة قبل ابتداء الفعاليّة،لكنها كانت دقائق مباركة وكأنها ساعات طويلة،وأثمرت أيضا ثمرات مباركات يانعات.

كان من عظيم فضل الله تعالى عليّ فيها أن فضيلة مولانا شيخ الحديث العلامّة الشيخ محمد حبيب الرحمن؛هو أيضاً قد أحسن الظنّ بي،ووقع لي عند فضيلته القبول،وأنزلني من منازل قلبه الطاهر منزلاً رفيعاً لم أكن أحسب أني أبلغه،حيث بادرني بعطفه الأبوي،ولطفه المحمّدي.

وهو ما أثمر صلة ومحبّة وتواصلاً،فقد أكرمني بالإجازة العامة والخاصة،وأسمعني الحديث المسلسل بالأولية،كما أجازني على عدد من المسلسلات بشروطها،التي من جملتها مسلسل الضيافة على الأسودين: التمر والماء،ومسلسل المحبّة،والمشابكة وغيرها،وكان ذلك في زيارة خاصة لفضيلته بناءً على دعوة كريمة إلى منزله.

وقد تكرّم عليَّ بكتابة الإجازة لي في ثبته (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب) أكثر من مرّة في نسختين على مدى السنوات التي مّرت من عمر معرفته رحمات الله تعالى عليه.

كان شيخنا العلاّمة المحدّث شيخ الحديث محمد حبيب الرحمن يسير على خطى عموم علماء شبه القارّة الهنديّة،علمهم أكثر من كلامهم،وعلمهم ليس علم الثرثرة،وبعثرت الكلام في كل واد ومحفل،نعم كان شيخنا العلاّمة قليل الكلام كثير الذكر،فإذا ما سأله السائل،أو باحثه الباحث،أو تناقش معه العالم رأيت حينها أن هذا الساكت ساكت سكوت المتمكّن،وأن سؤال السائل فتح صندوقاً مغلقاً به من جواهر العلم نفائس،ومن كنوز المعرفة ركائز،عندها تدرك أن سكوت مولانا الشيخ سكوت الحكيم،كما أن كلامه كلام الخبير العليم. وكأنني بلسان حال مولانا شيخ الحديث يقول: هكذا رأينا شيوخنا وهكذا تعلّمنا منهم: أن في السكوت السلامة والراحة إلا إذا تعيّن الكلام،وتأكد البيان فهناك يقول لسان الحال: خلق الله للحروب رجالاً،وخلق للبيان لساناً.

في منزل الشيخ:

زرت مولانا شيخنا الشيخ محمد حبيب الرحمن في منزله ببريطانيا،وهناك

رأيت صورة حقيقة لما كان قد ترسخ عندي من قناعة من أن هذا العالمَ عالم يُتْبِعَ القولَ العمل.

لمّا دخلت منزل شيخنا لم أر فيه ما يتصل بمظاهر الحضارة أو المدنيّة الغربيّة مع أنه بيت في مدينة الضباب،لأن نور الهداية،وسراج السنن النبويّة اللذان كانا يسكنان قلب وعقل شيخنا شيخ الحديث أزالا ذاك الضباب،وأنارا أركان وجوانب ذاك البيت،فرأيت بيتاً تسكنه السكينة،وتجمّله السنن النبويّة المصطفويّة،بيت تشهد أركانه وجوانبه وزواياه أن صاحبه عالم عامل حريص على دينه،غيور على عقيدته،محافظ على نفسه وأهله وذريّته من ذَوَبَان الهويّة الإسلاميّة،ومن الانسلاخ عن القيّم السويّة المشرقيّة. بل وفوق كل ذلك رأيت في بيت شيخنا شيخ الحديث صورة واضحة للزهد الصادق،والبساطة،مع رقي في الذوق،وسمو في الهمّة،وسعة صدر،ورحابة نفس،وتبسّط وتلطّف للضيف.

ثم إن شيخنا لا يكتفي بكل ذلك،حتى يضيف فوق كل هذه المكارم والمحاسن،أن يغمرك يا من زرته في بيته بالكرم،فقد رأيت الشيخ كريماً جواراً شهماً،قد جمع الله تعالى له من الخصال الشريفة،والصفات الكريمة ما يجعلني أترحّم عليه من صميم قلبي،خصوصاً وأنه رحمه الله تعالى كان يحبني كثيراً ويحسن الظن بي فوق وأكثر مما أنا عليه،جزاه الله تعالى خير الجزاء. في هذا البيت المنوّر المبارك وبحضور بعض أبناء الشيخ وبعض طلبته قضيت مع فضيلته وقتاً مباركاً قرأت على فضيلته بعض ما يسَّرَه الله تعالى وأجازني مّرة ثانية،وأسمعني ما تيسر من المسلسلات،وسألته عن بعض مسائل في العلم؛فكان ذلك اليوم يوماً مشهوداً مع تلك المجموعة المباركة من أهل الشيخ ومحبّيه؛وأخص منهم الأخ الكريم الذي هو بمثابة ظل الشيخ الذي لا يفارقه وهو: الابن الأكبر للشيخ ، أخونا الكريم: فضيلة الشيخ محمد عبد الأول هلال بن الشيخ محمد حبيب الرحمن.

وخلاصة القول واختصاره: لقد كان شيخنا شيخ الحديث الشيخ محمد حبيب الرحمن عالماً،علّامة،قاضياً،فقيهاً،محدّثاً على طريقة محدّثي شبه القارة الهنديّة،مفتياً،ورعاً،زاهداً،عابداً،ذاكراً، صالحاً،منوّراً،محبّباً،مقبولاً عند الجميع.

وكل هذا الذي ذكرته؛ذكرته لأني رأيت آثاره،وأنا لم أدرك من فضل وفضائل الشيخ

إلا ما سمحت به الظروف من لقاءات متباعدة في سنين معدودة؛فماذا عسى أن يقول عن فضيلته أبناؤه وطلبته الملازمون له ، العارفون بجميع أحواله.

وإن من نعم الله تعالى عليَّ أن أكرمني بأن أتصل بأكابر علماء ومسندي جمهورية بنغلاديش من طريق هذا العالم البنغلاديشي،وهو فضل كبير،وإن من عاداتي التي أحرص عليها وأسعى ما استطعت للوصول إليها أن أتصل بعلماء ومسندي الدول من طريق علمائها كما هنا ، وكما في غيرها مما لذكره موضوع آخر.

رحم الله تعالى شيخنا شيخ الحديث،وجزاه الله تعالى عن الحديث وخدمته خير الجزاء،وبارك في ذريته وطلبته،والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

শায়খুল হাদীস মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক

অনেক আগে থেকেই উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক মারকায ফুলতলী দরবার এর সাথে আমাদের সম্পর্ক, যোগাযোগ ও ভালোবাসা। সব সময়-ই এ দরবার সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করেছি, বোঝার চেষ্টা করেছি। এদেশের মানুষের অন্তরে দ্বীনের আগ্রহ ও দ্বীনের বুঝ তৈরিতে এ দরবারের অবদান অনস্বীকার্য এবং সর্বজনস্বীকৃত। এ দরবারের-ই একজন মহান প্রথিতযশা খাদেম ছিলেন শায়খুল হাদীস মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ।

ফুলতলী দরবার একটি রুচিশীল, মননশীল ও সৃজনশীল জাতি গঠনে সব সময়-ই বদ্ধপরিকর। তারা তাদের দরবার থেকে অনেক সমৃদ্ধ বই-পুস্তক প্রকাশ করেছেন। সময়ে সময়ে তারা সেসব বই-পুস্তক আমাদের উপহারও দিয়েছেন। অধিকাংশ বইয়ের-ই লেখক ছিলেন শায়খুল হাদীস মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। শায়খুল হাদীসের ভরাট, গম্ভীর, দূরদর্শী, নির্দেশনাধর্মী ও সমাধানমূলক লেখা পাঠ করেই তাঁর প্রতি আমাদের আগ্রহ জেগেছিল; তাকে কাছে থেকে দেখার ইচ্ছা হয়েছিল।

ইলমে নববী ও ইলমে হাদীসের একজন নিরলস সাধক ও আকাশ-উদার শিক্ষক ছিলেন শায়খুল হাদীস মাওলানা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। ইলমে দীনের খেদমতে তিনি নিজের পুরো জীবনকে আল্লাহর রাহে নিবেদন করেন।

শায়খুল হাদীস মাওলানা মো. হবিবুর রহমান ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার রারাই গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রচণ্ড ধী শক্তির অধিকারী ছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরেই মেধার স্বাক্ষর রাখেন। আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করেন।

শায়খুল হাদীসের কর্মজীবন ছিল উৎসাহজাগানিয়া। হযরত শাহ জালাল রাহিমাহুল্লাহ এর পদধূলি ধন্য পুণ্যভূমি সিলেটের বিভিন্ন স্বনামধন্য আলিয়া মাদ্‌রাসায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং অসংখ্য শিক্ষার্থীকে ইলমে হাদীসের দীক্ষা প্রদান করেন।

প্রশাসন ও দারস প্রদানের ভীষণ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও শায়খুল হাদীস মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ গবেষণা ও প্রকাশনার ব্যাপারে প্রচণ্ড মনোযোগী ছিলেন। ১৯৯১-'৯৩ পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় সিলেট শহর থেকে মাসিক শাহজালাল নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। আমি মনে করি, উস্তাযের এ প্রচেষ্টা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিক্ষার্থী ও উত্তরসূরিরা প্রিন্ট মিডিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরটিতে মনোযোগী হবে।

শায়খুল হাদীস হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন মননশীল লেখক। তিনি যুগ ও সময়কে সামনে রেখে সবচে প্রয়োজনীয় লেখাগুলো জাতিকে উপহার দিয়েছেন। হাদীস, সীরাত, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা, আরবী ও উর্দূভাষায় তার ১৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, শায়খুল হাদীসের এই নিরলস সাধনা থেকে যেন আমরাও উৎসাহিত হই, নিরন্তর গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনায় আমরা যেন জাতির জন্য কিছু পথনির্দেশনা লিখে যেতে পারি।

শায়খুল হাদীস হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ একজন দেশপ্রেমিক মানুষ ছিলেন। দ্বীনি খেদমতের পাশাপাশি তিনি দেশের দুঃখী ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেন। সময় ও প্রতিবেশ প্রেক্ষাপটে তিনি বেশ কয়েকবার এদেশের জাতীয় রাজনীতিতেও অংশ নিয়েছিলেন। মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থী বা মাদ্‌রাসা সংশ্লিষ্টদের এখান থেকেও প্রেরণা নেয়ার সুযোগ আছে নিঃসন্দেহে।

উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম দীন মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ এর একান্ত স্নেহভাজন শাগরেদ হওয়ায় শায়খুল হাদীস মো. হবিবুর রাহিমাহুল্লাহ এর প্রতি দারুননাজাতের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরও প্রচণ্ড আবেগ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। শায়খুল হাদীসের ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁর থেকে বরকতপূর্ণ দারস ও সনদ গ্রহণ করেছিলেন।

দেশের অন্যতম আধ্যাত্মিক মারকায ফুলতলী দরবারের একাধিক প্রোগ্রামে হুজুরের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রথম সাক্ষাতেই হুজুরকে একজন নিখাদ আশেকে রাসূল হিসেবে আবিষ্কার করেছি। তাঁর পবিত্র মুখশ্রীর নূরানী বিভা আমাকে প্রতিটি মুহূর্তই তাঁর প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল করেছে। যখন-ই সুযোগ হয়েছে, তিনি আমাদের সাথে হাসি-খুশি কথা বলেছেন। দারুননাজাতের খেদমতে যুক্ত থাকায় তিনি আমাকে অনেক উৎসাহ ও সাহস প্রদান করেছেন। তাঁর অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ও দরদমাখা স্নেহ প্রায় সময়েই মনে পড়ে।

ফুলতলী দরবারের ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে তাঁর অংশগ্রহণ ও গ্রহণযোগ্যতা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করে। সাধারণত ফুলতলী দরবারের স্টেজে মূল আলোচক ও হাতে-গোনা দু একজন মানুষ অবস্থান করেন। শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহকে প্রায় সময়ই স্টেজে দেখা যেতো। এছাড়া তিনি যখন আলোচনা করতেন, উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী তখন গভীর মনোযোগে সেগুলো শ্রবণ করতো। তাঁর কথা ও আলোচনা ছিল রূহানিয়াতপূর্ণ। তাঁর কথায় শ্রোতারা পরিবর্তন হতো, পরিবর্তনের ইচ্ছা পোষণ করতো।

ফুলতলীর ছাহেব বাড়িতে দালাইলুল খাইরাতের সনদ প্রদান মাহফিলে শায়খুল

হাদীসের সাথে আমার শেষ সাক্ষাত। সে একান্ত সাক্ষাতে আরও উপস্থিত ছিলেন যুগের ফররুখ কবি রূহুল আমীন খান। তারা দুজন-ই তখন আমায় দীনের খেদমতের ব্যাপারে যুগোপযোগী পরামর্শ দিয়েছিলেন। ছোট ছোট বাক্যে শায়খুল হাদীস যে কথাগুলো বলেছিলেন, এখনও সেগুলো আমাদের ভীষণ ভাবায়। আমার শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন নির্মাণে শায়খুল হাদীসের সেই ক্ষণিকের সংসর্গ আমাকে নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণীত করে।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ইলমে হাদীসের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র মহান রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে আখেরাতের অনন্ত পথে পাড়ি জমিয়েছেন। পরদিন লাখো মানুষের কান্নাবিজড়িত উপস্থিতিতে এই মহান অলীর জানাযার নামায সম্পন্ন হয়। অজস্র-সহস্র মানুষের এই বিমল ভালোবাসা প্রমাণ করে, সত্যিই তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং আল্লাহর দীনের সাচ্চা খাদেম ছিলেন।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিখাদ আশিক এই প্রচারবিমুখ নিভৃতচারী মহান অলীর মহাপ্রস্থান নিঃসন্দেহে এদেশের দীনী মহলের জন্য বিরাট ক্ষতি। দয়াময় আল্লাহর প্রতি আমাদের পরম বিশ্বাস, তিনি আপন অনুগ্রহে এই ক্ষতি পুষিয়ে দেবেন।

হৃদয়ের গহীন থেকে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন। তাঁর রেখে যাওয়া কাজগুলো যোগ্য উত্তরসূরির মাধ্যমে সম্পন্ন করুন। আর আমাদেরকেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপন ক্ষমা ও দয়ায় সিক্ত করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

লেখক: অধ্যক্ষ, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

স্মৃতিতে সমুজ্জল
শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

আল্লামা হাফিয মুহাম্মাদ আবদুল জলিল

الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين الصطفى ، اما بعد ..

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন, উস্তাযুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিসীন, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে কত যে অমলিন স্মৃতি মনের মাঝে উদয় হচ্ছে এর কিয়দাংশও লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এ মনীষীর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময়। তখন আমি আলিম জামাতের ছাত্র, আর তিনি ছিলেন সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস। কিছু পরে আমি বিয়ানীবাজার মাথিউরা গ্রামে উনার শ্বশুর বাড়ির মহল্লার মসজিদে খতম তারাবীহ পড়ানোর জন্য নিয়োজিত হই। তখন সেখানে বেশ কিছু দিন তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ হয়। সেসময় তিনি প্রাণঢালা স্নেহ মমতার সাগরে আমাকে টেনে নেন। আজীবন সেই বন্ধন অটুট ছিল। আমি বড়লেখার সুজাউল মাদ্‌রাসা ও সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া করেছি। তাই সরাসরি ক্লাসে উনার কাছে পড়ার সুযোগ হয়নি। তবে বিভিন্ন সময় সুযোগ মত সারফ, নাহু, বালাগাত, মানতিকসহ অন্যান্য বিষয়ের কিতাবাদির বহু জটিল বিষয় উনার কাছ থেকে জেনে নিতাম। তিনি ইলমী যেকোন প্রশ্নের এত সুনিপুণ ও প্রামান্য উত্তর দিতেন যার নজীর আমাদের কালে খুব একটা নেই। আজীবন তিনি আমার ইলমী পথ প্রদর্শক ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আকাঈদ ও সীরাতের বিভিন্ন নাদির কিতাবের তালিকা নিজ হাতে লিখে দিতেন। সময় সুযোগ মত এসব কিতাব সংগ্রহ করে মুতালাআ করতে বলতেন। সত্যি বলতে কী, ইসলামি উলুমের সর্ব বিষয়ে এমন পারদর্শী ও বুৎপত্তি সম্পন্ন আলিম বর্তমান যুগে এক কথায় বিরল।

এ মহান ব্যক্তি একদিকে ছিলেন শামসুল উলামা, শায়খুল মাশাইখ, ফখরুল আরিফীন, মুজাদ্দিদে দাওরান হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রথম সারির খলীফাগণের অন্যতম, অপরদিকে ইলমে কিরাত ও ইলমে হাদীসেও ছিলেন তাঁর শীর্ষস্থানীয় সাগরিদ। জীবনের সিংহভাগ সময় তিনি হাদীসে নববীর দারস ও তাদরীসে ব্যয় করেছেন। প্রায় একযুগ তিনি সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, পরবর্তীতে এক বছর সেখানে অধ্যক্ষ পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেখানে তিনি মূলতঃ সহীহ বুখারী শরীফ এবং সুনানে তিরমিযী শরীফ অধ্যাপনা করেছেন। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় তিনি পূর্ব সিলেটের অন্যতম

শীর্ষ প্রতিষ্ঠান ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ এবং শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ দুই মাদ্‌রাসায় তাঁর হাতে গড়া ছাত্রদের বেশিরভাগ একেকজন প্রাজ্ঞ আলিম হিসেবে বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মজীবন পার করেছেন। এমনকি ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন মসজিদ মাদ্‌রাসায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থেকেছেন। ১৯৭৭ সাল থেকে প্রায় পাঁচ বছর তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের উম্মুল কুওয়াইন শহরের একটি মসজিদে খতীব এবং সেখানকার আদালতে বিচারিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সে সময়ও তিনি চিঠি দিয়ে আমার খোঁজ খবর রাখতেন। এমনকি তাঁর প্রিয় দুই ছাত্র মাওলানা আবদুল হামিদ লাল ও মাওলানা মুখলিসুর রহমান এর মাধ্যমে কোন কোন সময় নগদ অর্থ হাদিয়া পাঠাতেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকতা ছাড়াও দেশে বিদেশে তিনি সময় সুযোগ মত হাদীস শরীফের দারস তাদরীসে ব্যস্থ সময় কাটাতেন। উমরার সফরে উলামায়ে কিরামের অনুরোধে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে বুখারী শরীফের দারস দিয়েছেন। মিশর সফরকালে ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযার প্রাঙ্গন এবং আল আযহার ইউনিভার্সিটি মসজিদে বসে দারস দিয়েছেন। বিভিন্ন সময় বৃটেন সফরকালে এদেশের বিভিন্ন শহরে হাদীসের দারস দিয়েছেন। বিশেষ করে একবার দীর্ঘ কয়েকমাস তিনি প্রতি সপ্তাহে একদিন লন্ডনের দারুল হাদীস লতিফিয়ায় হাদীসের বিখ্যাত কিতাব শামাঈলে তিরমিযী শরীফ সম্পূর্ণ দারস প্রদান করেন। এমনকি জীবনের শেষদিকে বেশ কয়েক বছর তিনি বাড়ির পাশে নিজের প্রতিষ্ঠিত মসজিদে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার নিয়মিত দারসে হাদীস পেশ করতেন। তাঁর দারসে সব মাকতাবে ফিকর এর উলামা শামিল হতেন।

আরবী, উর্দু ও ফারসী ভাষার তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল প্রশ্নাতীত। ইলমে হাদীসের পাশাপাশি ইলমে তাফসীর ও ইলমে ফিকহে তাঁর অগাধ দখল ছিল ঈর্ষনীয়।

একজন নিবেদিত প্রাণ দাঈ ইলাল্লাহ হিসেবে মানুষের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে তিনি দেশ বিদেশে বিভিন্ন মাহফিলে অংশ নিতেন। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় বিষয় ভিত্তিক বয়ান পেশ করতেন। তাঁর বয়ান যেমন ছিল সাধারণ মানুষের উপযোগী ঠিক তেমনি উলামায়ে কিরামের জন্যও হতো শিক্ষনীয়। তিনি মাহফিলে ইখতিলাফি বিষয়াদি সাধারণতঃ বয়ান করতেন না। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে কোন ইখতিলাফি মাসআলা চলে এলে পরিপূর্ণ দলীল সহকারে এমন মার্জিত ভাষায় তা উপস্থাপন করতেন যাতে আলিম ও সাধারণ মানুষ বিষয়টি সহজে বুঝতে পারে। ইখতিলাফি মাসআলা বয়ানের ক্ষেত্রে কারো মত খণ্ডনের প্রয়োজন হলে তিনি এমন মাধুর্যপূর্ণ ভাষা ও যৌক্তিকভাবে করতেন যাতে বিরুদ্ধবাদীরা মনক্ষুন্ন না হয়ে চিন্তার খোরাক পেতেন। বয়ানের ক্ষেত্রে তিনি মানব জীবনের প্রাত্যহিক

দিক ভিত্তিক বিষয় নির্ধারণ করতেন। যখন যে বিষয়ে বয়ান করতেন এ বিষয়ে বর্ণিত কুরআনুল কারীমের আয়াতসমুহ পেশ করতেন। খুবই সংক্ষিপ্তভাবে মুফাসসিরগণের কিতাবাদী থেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করতেন। তারপর উক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট হাদীস পেশ করে মুহাদ্দিসীনে কিরামের ব্যাখ্যা সহজ সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করতেন। এতে সাধারণ মানুষ যেমন বিষয়টি খুব সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো তেমনি উলামায়ে কিরামের জন্য প্রতিটি বয়ান একেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস হয়ে উঠতো।

একজন মানুষের জীবনে সবকিছুর ঊর্ধ্বে হলো আখলাকে হাসানার স্থান। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সত্যিকার অর্থেই ছিলেন আখলাকে হাসানার বাস্তব উদাহরণ। তাঁর চলাফেরা, উঠাবসা, কথাবার্তা, মানুষের সাথে ব্যবহার সব কিছুতেই ছিল সুন্নাতে নববীর স্ফুরণ।

হাদীস শরীফের ভাষ্য মতে একজন মানুষ ইন্তেকাল করলে তাঁর ব্যক্তিগত আমলের সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তবে তাঁর রেখে যাওয়া অন্যের জন্য উপকারী ইলম, সাদাকায়ে জারিয়া এবং এমন নেক সন্তান যারা তাঁর জন্য দুআ করবে এ তিনটির সাওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আমল নামায় যুক্ত হতে থাকবে। আমরা হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর পূর্ণ জীবনের সব দিক সামনে রেখে বলতে পারি, আলহামদুলিল্লাহ! তিনি হাদীসে বর্ণিত এ তিনটি বিষয়ই রেখে গেছেন।

সেই ১৯৫৯ সাল থেকে শুরু করে তিনি ইলমে কিরাত, ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর, ইলমে ফিকহ ও ইলমে তাসাউফ শিক্ষাদান এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রচনা করে যে ইলমি ধারা চালু করেছেন; এমনকি জীবনের শেষ পর্যায়ে মারাত্মক অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত উলামায়ে কিরামকে মুসালসাল হাদীসের দারস দিয়ে সনদ ও ইজাযাত প্রদান করে যে ইলমি খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন কিয়ামত পর্যন্ত প্রজন্মের পর প্রজন্ম হাজারো লক্ষ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে।

তিনি দেশ বিদেশে বহু মসজিদ, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়া এতিমখানা প্রতিষ্ঠা ও সমাজের অসহায় গরীব মিসকিনদের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ চালু রেখে গেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান ও বহুমূখি কার্যক্রম তাঁর জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে অব্যাহত থাকবে।

আমার জানামতে তাঁর সহধর্মিনীও ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মহিয়সী মহিলা ছিলেন। তাঁর বুখারী শরীফের উস্তায ছিলেন তৎকালীন সময়ে বিয়ানীবাজার এলাকার খ্যাতিমান বুযুর্গ আলিম হযরত মাওলানা আবদুল মজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব এর ইন্তেকালের মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে তাঁর মহিয়সী পত্নী ইন্তেকাল করেন। তাঁরা তাদের প্রত্যেক সন্তানকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে বিভিন্ন পর্যায়ে

দ্বীনি খিদমতে নিয়োজিত করে গেছেন। তাঁর তিন জামাতা প্রত্যেকেই আলিম এবং সমাজে সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত। আশা করা যায় পারিবারিক পরিমণ্ডলেও এই ইলমি ধারা এবং তাঁর জন্য দুআ অব্যাহত থাকবে।

পরিশেষে বলা যায়, হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালে বাংলাদেশের ইলমি অঙ্গনে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে আমার মতো হাজারো মানুষ ইলমি অভিভাবক শূন্যতায় পতিত হয়েছি। আল্লাহপাক উনাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান করে রাখুন। তাঁর রূহানী দুআ আমাদের জন্য জারি রাখুন। আমীন।

লেখক: চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড-দারুল হাদীস লতিফিয়া লতিফিয়া, লন্ডন; সাবেক প্রেসিডেন্ট, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে।

স্মৃতিতে ভাস্বর আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী

১৯৫৮ ঈসায়ি সালের কথা। আমি তখন আলিম ১ম বর্ষের (বর্তমান নবম শ্রেণির) ছাত্র। গাছবাড়ি জামিউল উলুম মাদ্‌রাসায় কামিল ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত আমার একমাত্র মামা হাফিজ মাওলানা জিল্লুর রহমান রহ. (প্রাক্তন শায়খুল হাদীস-সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্‌রাসা) এর সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজনে গাছবাড়ি মাদ্‌রাসায় গমন করি। মামা তাঁর ক্লাসমেট কয়েকজন সমবেত ছাত্রদের সাথে আমাকে তাঁর ভাগনা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। এঁরা প্রত্যেকেই কর্মজীবনে একেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দেদিপ্যমান ছিলেন। তাঁরা হলেন সর্বজনাব আল্লামা মো. হবিবুর রাহমান রহ. (শায়খুল হাদীস ও অধ্যক্ষ সৎপুর এবং ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসা), আল্লামা আব্দুল জাব্বার রহ. (মুহাদ্দিস ইছামতি ও সৎপুর কামিল মাদ্‌রাসা), মাওলানা জামিল আনসারী রহ. (মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১ম ছাত্র), মাওলানা আব্দুল হাকিম রহ. (মুহাদ্দিস- দরগাহ মাদ্‌রাসা, সিলেট) সহ আরো কয়েকজন।

সেদিনের পরিচয়ের সুবাধে তাঁরা সবাই আমাকে সব সময় ভাগনা বলে সম্বোধন করলেও ব্যতিক্রম ছিলেন আল্লামা হবিবুর রহমান রহ.। তিনি আমাকে মামা বলে ডাকতেন, রোগাক্রান্ত হয়ে ইবনে সিনায় ভর্তি হলে আমি তাঁর হাল পুরছি করতে গেলে তিনি আমাকে মামা বলেই সম্বোধন করেছেন। আমার মামার ক্লাসমেট ও বন্ধু একজন মুরব্বি যখন তাঁর মায়াবী কণ্ঠে আমাকে মামা বলে সম্বোধন করতেন তখন আমি বিমোহিত হতাম, শ্রদ্ধায় তাঁর প্রতি বিগলিত হয়ে যেতাম।

১৯৬৭ ঈসায়ি সালে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে আমি কামিল পাশ করেছি। তিনি তখন সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে মুহাদ্দিস ছাহেব হিসেবে তখন থেকেই তাঁকে একবাক্যে সবাই চিনতো।

কর্মক্ষেত্র, বিচরণস্থল এবং রাজনৈতিক পাটফর্ম ভিন্ন থাকায় দেখা সাক্ষাৎ খুব একটা বেশি হতো না। তবে মাঝে মধ্যে কোথাও দেখা হলে সেই মধুময় মুচকি হাসি দিয়ে মামা কেমন আছেন, আপনার মা, মামা কেমন আছেন? ইত্যাদি খবরাদি নিতেন।

১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি সিলেট রেজিস্ট্রি মাঠে মীলাদুন্নবী মাহফিলে তিনি সাহাবায়ে কিরামের আলাচনা করতে গিয়ে أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ এই আয়াত তিলাওয়াত করে বয়ান পেশ করছিলেন। আমি এদিকে কোথাও যাচ্ছিলাম, তাঁর কণ্ঠ শুনে বিমোহিত হয়ে থমকে দাঁড়ালাম। মন্ত্রমুগ্ধের মত ধীরে ধীরে স্টেজের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলেচনা শুনছিলাম, এদিকে ইতিমধ্যে কীভাবে যেনো তাঁর দৃষ্টি আমার দিকে

পড়লো এবং তাঁর আহ্বানে আমাকে স্টেজে নিয়ে বসানো হলো। আমি তাঁর শারাফতিতে বরাবরের মত মুগ্ধ হলাম।

১৯৮৬ ও ৯১ ঈসায়িতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট ৫ আসন অর্থাৎ কানাইঘাট-জকিগনজ থেকে আমি যখন নির্বাচন করি তখন তিনি কৌশলগত কারণে প্রকাশ্যে আমাকে সমর্থন না দিলেও আমার শুভাকাংখী ছিলেন।

১৯৯৬ ঈসায়ি সনে তিনি নিজে এবং আমি ভিন্ন দু'টি ইসলামী দল থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হিসেবে আমার নাম ঘোষিত হবার পরও পরাজিত দেখানো হয়। কিন্তু ভোটের ময়দানে কখনো কেউ কারো সমালোচনা বা বিষোদগার করা থেকে বিরত ছিলাম। এটিও তাঁর শারাফতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বৈ-কি। ২০০১ সালের নির্বাচনে আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি আমায় অভিনন্দিত করেছেন। যতবারই নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছি দলবল নিয়ে দুআ নিতে তাঁর বাড়িতে হাজির হয়েছি। সব সময়ই তিনি স্বভাবসুলভ হাসিমুখে শুভ কামনা করে উত্তম মেহমানদারী করেছেন।

তিনি ছিলেন গাছবাড়ি জামিউলুম মাদ্‌রাসার ইতিহাসে অন্যতম সেরা মেধবী, মেহনতি ও শরীফ ছাত্র। অধিক মুতালাআ তথা কুতুববিনির জন্য সুপ্রসিদ্ধ। শিক্ষকতা জীবনেও তিনি ছিলেন ইলমে হাদীসের সেরা উস্তায। বৃহত্তর সিলটে হাদীস বিশারদ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল সর্ব মহলে। তাঁর হাজার হাজার ছাত্র অথবা ছাত্রের ছাত্র আজ ইলমে ওয়াহীর খিদমাতে নিয়োজিত আছেন। তিনি কারো নগ্ন সমালোচনা থেকে দূরে থাকতেন বরং যতই মতপার্থক্য থাকুক তাদের প্রতি তাঁর ভাষা ছিল অমায়িক, মার্জিত এবং সংশোধনমূলক।

২০০৬ সালে তিনি বৃটেন সফরে যাচ্ছেন। আমি সিলেট শহরের মা-মনি ক্লিনিকে পিত্ততলির পাথর অপারেশন করিয়েছি। তাঁর জামাতা মাওলানা আবদুস সালাম মাদানীর কাছে আমার অসুস্থতার খবর শুনে গাড়ি ঘুরিয়ে এসে আমাকে দেখে দুআ করে গেছেন। এই ছিল তাঁর শারাফতির নমুনা।

তাঁর অসুস্থতার খবর শুনে আমি দেখতে গিয়েছি, ঐ দিন রাতেই আমি নিজে আচমকা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ি। এর ৭/৮ মাস পরে আমি শয্যাশায়ী অবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ইলমে হাদীস তথা ইলমুল ওয়াহীর এ মহান খাদিমকে আল্লাহ তা'লা ক্ষমা করে দিন। জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন। তাঁর লিখিত ১৯টি কিতাব, অসংখ্য ছাত্র এবং দেশ বিদেশে পরিচালিত বহুমুখি খিদমাতও কবুল করুন। সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে এসব কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখুন।

অনুলিখন : আবু হুমায়রা।

লেখক: বর্ষীয়ান আলিম ও রাজনীতিবিদ। সাবেক সংসদ সদস্য, সিলেট ৫ (জকিগনজ-কানাইঘাট)।

প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ মুহাদ্দিস ছাবের জন্য অশেষ শ্রদ্ধা

ইউসুফ শরীফ

প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য দু'চার কথা লিখতে চাই। তাঁর মত মনীষী পুরুষ সম্পর্কে আমি যে নিছক ব্যক্তিগত কিছু অনুভূতিই মাত্র প্রকাশ করতে পারি– এব্যাপারে আমি সচেতন। 'মুহাদ্দিস ছাব' নামে সুবিখ্যাত তাঁর মত ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে অতিকথন যেমন সমীচীন নয়, তেমনি পুরোপুরি প্রকাশ না ঘটলেও অতৃপ্তি থেকে যায়! শেষোক্তটি মোটেই আমার কাজ নয়– তারপরও উনার সম্পর্কে আমার দুয়েকটি অনুভূতির কথা বলতে চাই।

বত্রিশ বছর আগে মাসিক 'পরওয়ানা'-র পরিকল্পনা ও প্রকাশনা শুরুর সময় মুহম্মদ মুজিবুর রহমান সাহেবের কাছে 'মুহাদ্দিস ছাব' নামটি প্রথম শুনেছিলাম। কোন্ প্রসঙ্গে নামটি উচ্চারিত হয়েছিল এখন মনে পড়ছে না– তবে মুহাদ্দিস ছাব পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি এটা মনে ছিল। দ্বিতীয়বার– সেটাও তিরিশ বছর আগে তালামীযের প্রথম ওয়ার্কশপের সময় ফুলতলীতে যাই। এরপর ফুলতলীতে অনেকবার গিয়েছি– শামসুল উলামা আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ র.-এর জন্য ফুলতলী আমার কাছে ভাল লাগার তৃপ্তিময় এক স্থান। ফুলতলীর বড় ছাহেব আল্লামা মোহাম্মদ ইমাদউদ্দিন চৌধুরী আমার অতীব শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। আধ্যাত্মিকতা ছাড়াও বড় ছাহেবের মানবীয় কর্মকাণ্ড এবং সাহিত্য-মনস্কতা আমার আকর্ষণের অন্যতম বিষয়।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাবের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ– কাছাকাছি যাওয়া খুবই কম হলেও তাঁর সম্পর্কে ফুলতলীর ছোটছাব মাওলানা মোহাম্মদ হুছামউদ্দিন চৌধুরী এমপি এবং সিদ্দিকুর রহমানের কাছেও কিছু জেনেছি। মনে পড়ছে– বড়ছাহেব সম্পর্কে এই কথাটি অনেকবার শুনেছি– ফুলতলী ছাব যখন বাড়িতে থাকেন, তখন বড়ছাব বাড়িতে আছেন, এটা বোঝাও যায় না। ফুলতলী ছাবের সামনে মুহাদ্দিস ছাব যেন একজন শিশুর মতন– এরকম কথাও কারও কারও কাছে শুনেছি। আধ্যাত্মিক সম্পর্কের এ-ও এক নজির– সঙ্গত কারণে এমনটা মনে করা হয়। আমার মনে হয়– আধ্যাত্মিক তো বটেই এটা মানবীয় আদবেরও একটি বড় নজির। ফুলতলী ছাব র. মসলকে এই মানবীয় আদবের নজির কমবেশি সবার জানা।

তালামীযের প্রথম ওয়ার্কশপ [১৯৯৪] উপলক্ষ্যে ফুলতলীর সফর ছিল আমার জন্য খুবই স্মরণীয়। ফুলতলী ছাব বাড়িতে মুজিবুর ভাই দূর থেকে শান্ত-স্নিগ্ধ-সৌম্য একজন মানুষকে দেখিয়ে বললেন, ভাই– ওই যে মুহাদ্দিস ছাব যাইতাছেন–

তাঁকে দেখে মনে হল শান্ত-সৌম্য-স্নিগ্ধ এমন একজন যিনি মানবীয় শিক্ষাবিদ যতটা–

ততটাই ধীর-স্থির ব্যক্তিত্ববান মানুষ। শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব মুহাদ্দিস হিসেবে অনন্য বলেই 'মুহাদ্দিস ছাব' নামেই সকল মহলে পরিচিত। সবাই জানেন– তিনি ছিলেন ছাত্র হিসেবে মেধাবী– ইলমে কিরাত, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকহ, ইলমে তাসাউফ– সকল ক্ষেত্রে উস্তায-শায়খগণের প্রিয়ভাজন ছাত্রও ছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন যুগ-বরেণ্য উলমায়ে কিরাম– তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইয়ামেনের একজন, সিরিয়ার দু'জন, পাকিস্তানের একজন এবং সউদী আরবের একজন।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাব বিজ্ঞ অধ্যাপক– শিক্ষাবিদ হিসেবে শুধু ছাত্র বা শিক্ষিত মহলে নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও ধর্মীয় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে গেছেন। বলা যেতে পারে– তিনি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে জ্ঞান- অন্বেষণকারীর জন্যও শিক্ষক।

তিনি চার বছর আরব আমিরাতে ছিলেন চাকরিসূত্রে এবং প্রায় পুরো সময়টাই আমিরাতের বিচার বিভাগে ১৯৮২ সালে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত ছিলেন ওই দেশের উম্মুলকুয়াইন কোর্টের বিচারক। এই তথ্যটিও মনে রাখতে হবে– মুহাদ্দিস সাব সউদী আরব, ভারত, মরক্কো, সিরিয়া, যুক্তরাজ্য. যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন। চাকরি-যোগাযোগ ও সফরকালে ফিকহ-হাদীস-কিরাত-তাসাউফ– সার্বিক ইসলামী শিক্ষা-চর্চা সংশ্লিষ্ট আর্ন্তজাতিক ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময়ের ব্যাপক সুযোগ লাভ করেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের ইসলামী চিন্তাবিদদের অনেকের সাথে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাবের ব্যক্তিগত এই যোগাযোগ-চর্চা-মতবিনিময় প্রসঙ্গ আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন। এই সুযোগ-যোগাযোগ তাঁর সার্বিক চিন্তা-চেতনাকে স্বভাবতই অধিকতর আলোকিত করেছে– আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দিয়েছে– যা তিনি লেখায়-বয়ানে প্রয়োগ করেছেন– রেখে গেছেন।

এই মানুষটি ইসলামী শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি নিজের ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং সেইসঙ্গে দেশের কৃষি-কৃষক– অর্থাৎ সাধারণ মানুষের উন্নয়ন-অগ্রগতিমূলক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়েও গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং এসব ব্যাপারে তাঁর ছিল নিজস্ব মতামত। ভাষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক তাঁর একটি মন্তব্য জানতে পেরেছিলাম ২০০২ সালে ৬ সেপ্টেম্বর। জকিগন্জ লেখক সম্মেলনে গিয়েছিলাম কবি আল মাহমুদ, কবি আবিদ আজাদ, গল্পকার ব্রিগেডিয়ার [অব.] আবু বকর সিদ্দিকীকে নিয়ে। সম্মেলনের দুপুরের বিরতিকালে আমরা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেবের বাড়িতে যাই মধ্যাহ্ন ভোজ গ্রহণের জন্য কবি কালাম আজাদসহ উনার জ্যেষ্ঠ পুত্র তরুণ কবি আবদুল আউয়াল হেলালের সাথে।

মুহাদ্দিস ছাব আলাপচারিতায় আমাদের ভাষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে খুবই

প্রয়োজনীয় কিছু কথা বলেছিলেন। বাঙালী মুসলমানের ভাষা-সংস্কৃতির রক্ষা ও সমৃদ্ধি প্রসঙ্গে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বিশেষ করে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সজাগ ও সোচ্চার থাকতে সবাইকে অনুরোধ করেন। ভাষা-সংস্কৃতির নিজস্বতা রক্ষা করতে না পারলে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

ভাষা আন্দোলনকালে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সদ্য তরুণ মাত্র। সেই সময়টাতে তিনি যে আন্দোলিত হয়েছিলেন, এটা সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম। অনুমিত হয়, ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর এই আন্তরিক ভালবাসা আগে আরও অনেকে জেনেছেন-বুঝেছেন। বাংলা ভাষার সংরক্ষণ এবং বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন নিয়ে এই আবেগ-অনুভূতি শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমানের আরেকটি দিক– সন্দেহ নেই গুরুত্বপূর্ণ দিক।

মুহাদ্দিস ছাবের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি জরুরি বিষয় সেদিন উঠে আসে। ১৯৯১ সালে সিলেট– ৫ আসনে সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হাফিজ আহমদ মজুমদার নেতা-কর্মীসহ তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আলোচনাকালে এক পর্যায়ে হাফিজ আহমদ মজুমদার দেশের উন্নয়ন নিয়ে উনাকে মতামত জানাতে অনুরোধ করেন। তিনি তখন বলেছিলেন, দেখুন বাংলাদেশ হলো একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের সব উন্নয়নের মূলে রয়েছে কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়ন। যতদিন পর্যন্ত কৃষি ও কৃষকের স্থায়ী এবং টেকসই উন্নয়ন হবে না, ততদিন অন্য যত সেক্টরে যত উন্নয়ন হোক না কেন দীর্ঘ মেয়াদে দেশের জন্য খুব বেশি উপকার আশা করা যাবে না। আমাদের রাজনীতিবিদগণের এদিকে মনযোগী হওয়া উচিত। ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, কৃষিপ্রধান এই দেশটির জন্য তেত্রিশ বছর আগে উচ্চারিত মুহাদ্দিস সাবের এই তাগিদ এখনকার জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান প্রথমত ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা-সংরক্ষণ এবং দ্বিতীয়ত কৃষি-উন্নয়ন ও কৃষকের তথা জনগণের সমৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন জকিগন্জ লেখক সম্মেলনে ঢাকা থেকে আগত কবি-সাহিত্যিকদের সাথে মত বিনিময়কালে। প্রকৃতপক্ষে জকিগন্জ লেখক সম্মেলনের চর্চিত মূল বিষয়টির প্রতিই তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। মাতৃভাষার ব্যবহার-সমৃদ্ধি এবং এই ভাষার সাহিত্যে কৃষি ও কৃষক অর্থাৎ মাটি ও মানুষকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করার প্রতি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। জকিগন্জ লেখক সম্মেলনে এই বিষয়গুলো আলোচিত হোক– উদ্যোগ গ্রহণে কবি-সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করা হোক– জাতীয় স্বার্থে প্রাজ্ঞ মনীষী পুরুষের এই ইঙ্গিতটির বাস্তবায়ন অনেকাংশে হয়েছে– হচ্ছে– হবে এমনটাই আমরা আশা করতে চাই।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেবের একটি অনন্য উদ্ধৃতি উল্লেখ করে

এই প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ– মহান মানুষটির জন্য অশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি।

তিনি বলতেন, কোন ফল-ফসল কিংবা ফুল চাষে যে বীজ রোপণ করা হয় তা থেকে চারা অংকুরিত হয়ে এক সময় পূর্ণ গাছ হয়। সে গাছ যতই বড় হোক না কেন যতদিন পর্যন্ত রোপণকৃত বীজ মাটির সাথে সম্পূর্ণরূপে মিশে না যায়– বিলীন না হয়ে যায় ততদিন পর্যন্ত গাছে ফল-ফসল কিংবা ফুল ধরে না। সুতরাং একজন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মঅহমিকা, আমিত্ব সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য মানুষের উপকার সাধন করতে পারবে না।

অনন্য– মানবীয় এই অনুভূতি আমাদের আলোকিত করুক!

কবি আল মাহমুদ সিলেট বিমানবন্দরে লাউঞ্জে বসে বলেছিলেন, আপনার জোর তাগিদে জকিগনজ লেখক সম্মেলনে এসে বিরল অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছি। ফুলতলীর পীর ছাহেব [র.] এর কথা ছোটবেলায় মা'র কাছে শুনেছি। উনার কাছে যাওয়া– দোয়া নেয়ার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। বড় ছাহেবজাদা মাওলানা ইমাদউদ্দিন সাহেবের সাথে বাংলা থেকে আরবী-ফার্সি-উর্দু কাব্য-সাহিত্য নিয়ে দীর্ঘক্ষণের অসাধারণ আলোচনায় তৃপ্তি পেয়েছি। ফুলতলী ছাহেব [র.] এর প্রধান খলিফা [ঘনিষ্ঠ] মুহাদ্দিস সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা সংস্কৃতির নিজস্বতা রক্ষার তাগিদ চমৎকৃত করেছে। সাহিত্য সভা-সম্মেলনে কত জায়গায় গিয়েছি, এরকম সাহিত্য-অন্তপ্রাণ অমায়িক সাহিত্যকর্মী খুবই কম দেখেছি।

মুহাদ্দিস ছাহেব ৮৫ বছর বয়সেও দিনমানের যে রুটিন যে মেনে চলতেন তা দেখলে অবাক হতে হয়।

তাঁর পুত্রের লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি-

'আজও দেখলাম ফজরের পর তিলাওয়াত, ওযীফা শেষ করে একটি খেজুর খেয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়েন। ঠিক নয়টায় ঘুম থেকে উঠে নাস্তা সেরেই কিতাব নিয়ে বসেন। এগারোটায় দু'জন সাক্ষাৎপ্রার্থী এলে কিতাব হাত থেকে রাখেন। বারোটার দিকে পূর্ব লন্ডনের ইস্টহাম এলাকায় পূর্ব নির্ধারিত একটি সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম শেষ করে সেখানেই একটি ঘরে দুপুরের খাবার পর তিনটার দিকে ঘরে ফিরে আসেন। কাপড় পরিবর্তন করেই কিতাব নিয়ে বসেন। ঘণ্টাখানেক পড়ে কিতাব পাশে নিয়েই ঘুমিয়ে যান। মাত্র আধঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠে আবারো কিতাব নিয়ে বসেন।'

এই উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা যায় প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ শেষ বয়সে এসেও গ্রন্থ পাঠে কতখানি আগ্রহী ছিলেন।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

আমাদের মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর

মুফতি মাওলানা ইলিয়াছ হোসাইন

উস্তাযুল উলামা, কুদওয়াতুল ফুজালা, ফখরুল মুহাদ্দিসীন, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ যাকে আমরা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর বলেই চিনতাম জানতাম। যিনি বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশারদ আলিম ছিলেন। এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমার মতো এক সামান্য মানুষ স্মৃতিচারণমূলক কিছু লিখতে পারব এমন মনে করা কঠিন ব্যাপার। শুধুমাত্র হুজুরের বড় ছাহেবজাদার হুকুম রক্ষার্থে মহান আল্লাহ যতটুকু তৌফিক দেন চেষ্টা করবো। কারণ হুজুরের আলোচনা থেকে একটি কথাও যদি ফুটিয়ে তুলতে পারি তাহলে যারা দেখবেন তারা উপকৃত হবেন বলে বিশ্বাস। আর যদি না লিখি তা হলে হুজুরের ইলমী, আমলী, আখলাকী জিন্দেগীর হয়ত এমন কিছু আমার মাধ্যমে কিতমান হয়ে যাবে যা আরও অনেকে লিখবেন এবং আলোচনা করবেন। কিন্তু আমার দেখা বিষয়গুলো আমার মধ্যেই থেকে যাবে। আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করছি যেন তিনি আমাকে লেখার তাওফিক দান করেন। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহিল আজিম।

ইলম নামক আলোর মাধ্যমে জাহাল নামের অন্ধকার দূর হয়। অন্ধকার প্রকোষ্টে একটি মোমবাতি বা প্রদীপের আলো জ্বালানো হলে অন্ধকার দূরীভুত হয়ে যায়। এক একজন আলিমের ইন্তেকাল যেন একটি আলমের মাওত (ইন্তেকাল)। আল্লাহ পাক ইলমকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাবেন না বরং উলামায়ে কেরামদের ইন্তেকালের মাধ্যমে ইলিম দুনিয়া থেকে চলে যাবে। সাধারণ মানুষের দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়াকে আমরা মাউত বলি। উলামায়ে কেরামের মাউতকে ইন্তেকাল বা ওফাত বলে থাকি। ইন্তেকাল শব্দের অর্থ হলো Transfer, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে চলে যাওয়া। ওফাত হলো পূর্ণ, অর্থাৎ জীবনের দায়িত্বভার পূর্ণ করে আর এই দুনিয়াতে থাকার প্রয়োজনীয়তা নেই বিধায় মাওলার সান্নিধ্যে চলে যাওয়া, যেখানে চলে যাওয়া অবধারিত। প্রত্যেককেই যেতে হবে। কেউ যেতে হলে নফছে আম্মারা হিসাবে কেউ লাওয়ামা হিসেবে আর সৌভাগ্যবান আল্লাহর ওলী বা আল্লাহার দুস্তরা থাকেন নফছে মুতমাইন্নাহ হিসাবে, যারা সন্তুষ্ট চিত্ত্বে যাবেন এবং মহান আল্লাহও তাদেরকে বলবেন, তোমরা আমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ইর্শাদ করেছেন "সাবধান নিশ্চয় আল্লাহর ওলীরা যাদের কোন ভীতি ও দুশ্চিন্তা নেই। যারা ঈমান এনেছে এবং খোদা ভীরু অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশ নিষেধ সম্পর্কে সদা সতর্ক। তাঁদের জন্য রয়েছে ইহ জগতে সুসংবাদ এবং আখেরাতে। "মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরীক্ষা করে দিয়েছেন"। আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র

উলামারাই ভয় করেন। আল কুরআন।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেভাবে প্রাক ইসলামী যুগে নবী রাসূলদের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে হেদায়াত দানের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরবর্তী সময়ে উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী হলো আমার উম্মতের উলামায়ে কেরাম বনী ইসরাঈলের নবীদের মতে উলামায়ে কেরাম নবীদের উত্তরাধিকারী।

আমরা হুজুরকে সম্বোধনে হুজুরই বলে থাকি। আমরা অন্যান্য হুজুর থেকে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর হিসেবেই বিশেষায়িত করেছিলাম। শুধু সৎপুর কামিল মাদ্‌রাসার প্রত্যেক ছাত্রের কাছেই মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আমরা তখনও ছোট এবং দাখিল আউয়াল বা দাখিল ছানী জামাতের ছাত্র। এই সময় সৎপুর মাদ্‌রাসার দরজায়ে কামিল খোলা হয়। খোলার সময়ে হযরত ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ, হযরত শায়দা সাহেব রা. সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন দরছ দিতেন। আরও যাঁরা ছিলেন কামিল জামাতের দায়িত্ব কেউ নিতে আগ্রহী ছিলেন না। বানিয়ে মাদ্‌রাসা হযরত বড় হুজুর রহ. খুবই পরিশানির মধ্যে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ও হযরত গোটারগ্রামী মুহাদ্দিস ছাহবে রহ. কে সৎপুর মাদ্‌রাসায় প্রেরণ করেছিলেন হযরত ছাহেব কিবলাহ রহ.। তখন থেকেই সৎপুর কামিল মাদ্‌রাসা সিলেট জেলা বর্তমান বিভাগে মধ্যে অন্যতম একটি বিশিষ্ট মাদ্‌রাসা হিসেবে পরিগণিত হয়।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর যখন হাদীস শরীফের দরস দিতেন তখন আমরা ছোট ছোট যারা ক্লাস না থাকা অবস্থায় বাইরে থাকতাম ক্লাসের বাইরে থেকে হুজুরের তাকরীর শুনার জন্য ভিড় করতাম। মাদ্‌রাসার একাডেমিক ভবনের দক্ষিণ দিকে ছোট একটি কামরায় হুজুর থাকতেন। মাদ্‌রাসার অফিস উত্তর দিকে থাকায় কামরা থেকে বের হয়ে হুজুর যখন অফিসে যেতেন প্রায় প্রত্যেকটি ক্লাস রোমের ছাত্রদের অবস্থা চিহ্নিত করে ফেলতেন। ছাত্ররা এই সময়ে সতর্ক হয়ে যেত। হুজুরের প্রতি ছাত্রদের সম্মান ও ভালবাসা ছিল অনুকরণীয়। হুজুরের কামরাটি ছিল ছোট। ছাত্ররা প্রায়ই খেদমতে হাজির থাকতেন। হুজুরের প্রত্যেকটি কথা শুনার জন্য সবাই ছিলেন আগ্রহী। ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক কেমন হওয়া প্রয়োজন তা হুজুরের খেদমতে যে ছাত্র একদিন উপস্থিত হতে পেরেছে সে অনুমান করতে পেরেছে। হুজুরের কামরায় যারা রীতিমতো যেতেন তারা (কুতুব বিনি) বই পড়ায় অভ্যস্থ হয়েছেন। এই কামরায় ছোট বড় সকলের উপযোগী ছোট বড় কিতাব/বই রাখা ছিল। হুজুরের উৎসাহ প্রদানে ছাত্ররা বই পড়ে এর উপরে লেখার অভ্যস্থ হতে মাদ্‌রাসার বিশাল লাইব্রেরি থেকে কিতাব সংগ্রহ করে পড়ার প্রতি আগ্রহী হতেন ছাত্ররা।

আমরা শুনেছি হুজুর প্রধান মুহাদ্দিস হয়ে আগমন করায় কন্ডিশন ছিল চাহিদা মোতাবেক কিতাব সংগ্রহ করতে হবে। যেখানে আসাতাযায়ে কেরামদের কিতাবের প্রতি আকর্ষণ ছিল তেমনিভাবে উৎসাহী ছাত্ররাও কিতাবের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। হুজুরের উৎসাহ প্রদানে দারুল কিরাতের প্রতি মাদ্‌রাসার প্রায় ছাত্র আগ্রহী হয়ে পড়েন। যা শামসুল উলামা শায়খুল কুররা ওয়াল মুহাদ্দিসীন হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ নিজবাড়িতে স্থাপন করেন। দারুল কিরাত কি? কুরআন শরীফ তো পড়তেই পারি। একবছর এভাবে চলে গেল। পরের বৎসর থেকে ফুলতলীতে কুরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়ার মানসে চলে গেলাম। রামাদ্বান শরীফের এই ক্লাসে হুজুর ও থাকতেন। যাই হোক মহান আল্লাহ হুজুরকে জাযায়ে খয়ের দান করুন।

হুজুর শুধু একজন খ্যাতিমান আলেমকুল শিরোমনিই ছিলেন না, তিনি একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নেজামে ইসলাম পার্টি থেকে পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ হওয়ার পরেও ইলেকশনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ দিন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর সভাপতির পদ অলংকৃত করে রেখেছিলেন।

হযরত ছাহেব কিবলাহর সাথে যে আদবের, লেহাযের সম্পর্ক ছিল তা দেখে যে কোন লোক অভিভুত হয়ে অনেক কিছু শিখতে পারত। হযরত ছাহেব কিবলাহও আমরা দেখতাম এবং আন্দায করতাম হুজুরের প্রতি মুহাব্বাত ও ভালবাসা অন্যরকম। যখন প্রথম দিকে হযরত ছাহেব কিবলাহ বিলাতে আগমন করেন তখন হুজুর আরব আমিরাতে ছিলেন। সেখান থেকে হযরত ছাহেব কিবলাহর হুকুমে বিলাত আগমন করেন। হুজুর বলেছেন হিথ্রো বিমান বন্দরে আমি যখন উপস্থিত হই তখন দেখি হযরত ছাহেব কিবলাহও উপস্থিত এবং ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করছেন। হুজুর এটা বললেন, আমি লজ্জিত হলাম। হযরত ছাহেব কিবলাহ খুশি হয়ে বললেন, আমি তোমাকে (অমুকের ছেলে অমুককে) বরণ করছি না। আমি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শরীফের একজন খাদিমকে বৃটেনের জমিনে বরণ করছি।

হযরত ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহর পরবর্তী বিলাত সফরে প্রায়ই সফর সঙ্গী হিসাবে তাঁর একান্ত খলীফাকে সাথে নিয়ে আসতেন। ছাহেব কিবলাহর বিলাত আগমনের মিশন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা, আল ইসলাহ সংগঠন, ছাত্র সংগঠন স্থাপন করা ইত্যাদি কাজের সাথে হুজুর ছায়ায় মত সাথে থাকতেন। হযরত ছাহেব কিবলাহর হুকুমে আমি অধম বিলাতে মাদ্‌রাসায় চাকুরী নিয়ে আসার সময় হুজুর আমাকে কন্ডিশন দিয়েছিলেন লেখাপড়া করতে হবে। আমি চেষ্টা করেছি। কিন্তু মাদ্‌রাসায় কাজের ব্যস্ততায় পূর্ণরূপে হুকুম পালন করতে পারিনি। লন্ডনের মাদ্‌রাসা বলতে মক্তব আদলে ছিল। হযরত ছাহেব কিবলাহর মনের বাসনা, দোয়া এবং হুজুরের অনুপ্রেরণায় ফুলটাইম মাদ্‌রাসা

আরম্ভ করে এবং কামিল হাদীস পর্যন্ত মাদ্‌রাসা উন্নীত হয়। এ পর্যায়ে মাদ্‌রাসাকে নিয়ে আসতে দেখতাম মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর হযরত ছাহেব কিবলাহর খেদমতে মাদরাসটি পূর্ণতায় রূপ নিতে প্রায়ই দোয়া চাইতেন, আমাকে কীভাবে কি করতে হবে প্রায়ই পরামর্শ দিতেন।

হুজুর লন্ডনের এই মাদ্‌রাসায় (দারুল হাদীস লতিফিয়ায়) হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে দারস দিতেন, যেমন বোখারী শরীফ। বিভিন্ন জায়গা থেকে হাদীস পিপাসু আলিম উলামা, হুফ্‌ফায, কুররা ও আম জনতা উপস্থিত হতেন। হুজুরের এই দারস ও তদরীছের সিলসিলা ওয়েসাল ইলাল্লাহ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এছাড়া আরও বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় মসজিদে এবং ঘরের মধ্যে হাদীস পিপাসু আল্লাহর বান্দাদের বিশেষ অনুরোধে দারস জারী ছিল। ইন্তেকালে পূর্ব মুহূর্তেও যখন তিনি অচলাবস্থায় ছিলেন তখনও দেশের বিভিন্ন কামিল মাদ্‌রাসার ছাত্র শিক্ষক দলে দলে হুজুরের কাছে সনদ হাসিল করার জন্য উপস্থিত হতেন। বিভিন্ন দেশের বড় বড় স্কলার সনদ লাভের জন্য দারসে শরীক হয়েছেন।

সবচেয়ে বড় কথা হলো ইলম অনুযায়ী আমল ছিল হুজুরের জীবনের সৌন্দর্য্য। কীভাবে আমল করতে হয় হুজুর বাস্তবে দেখিয়ে দিতেন। হুজুরের দিকে তাকালেই আপাদ মস্তক একজন অনুসরণীয়, অনুকরণীয় আলিমে আমল দেখা যেত। যখন আমরা সৎপুর মাদ্‌রাসায় পড়াতাম তখন হুজুর নামাযের পর ছাত্রদেরকে মসজিদের আঙ্গিনায় বসিয়ে অজু করার, নামায পড়ার নিয়ম-কানুন বাস্তবতার সাথে শিক্ষা দিতেন। এবং কিছু সময় রেগুলার নসীহত করতেন। প্রথম দিকে হুজুর দারস ও তদরীসের ব্যাঘাত হতে পারে তাই দাওয়াতী প্রোগ্রামে বেশ বের হতে চাইতেন না। পরবর্তীতে প্রতিদিনই যেতে হতো। খুব কমই হুজুরের সফর সঙ্গী হতে পেরেছি। দেশে হোক বা বিলেতে হোক শিক্ষনীয় বিষয় নিয়ে আলাপ করতেন। জীবনের পরিবর্তনের জন্য এভাবে আল্লাহর ওলীদের সংস্রব যে কত উপকারী সফর সঙ্গী না হলে বুঝতে পারতাম না। বাস্তবিক কবি বলেছেন 'এক যামানা সুহবতে বা আউলিয়া বেহওর আয ছদ ছালো তোআত বেরিয়া।'

যার মর্ম হলো- কিছু সময় আল্লাহর ওলীদের সাথে সময় কাটানো একশত বৎসর লোক দেখানে ছাড়া এবাদত থেকে উত্তম। যদিও কোন কিছু বেশ একটা বুঝতামনা তবুও মনে হতো রূহ তাজা হওয়ার পন্থা হলো সাদিকীনদের সঙ্গী হয়ে যাওয়া। যারা ভাগ্যবান তারা লম্বা সময় সঙ্গী হতে পেরেছেন, উপকৃত হয়েছেন। আল্লাহ যেন ছাবিত কদম রাখেন। এই কামনা করি।

মানুষ এই নশ্বর ধরা ত্যাগ করার পর উপকারী যে তিনটি বিষয় সম্পর্কে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার দেখা মত হুজুর পরিপূর্ণ রূপে তা রেখে গেছেন। অর্থাৎ, সাদকায়ে জারিয়া যা বিভিন্ন স্থানে মাদ্‌রাসা বিশেষ করে

গ্রামের বাড়িতে মসজিদ, মাদ্‌রাসা, এতিমখানা, লাইব্রেরি ইত্যাদি।

উপকারী ইলিম যা দ্বারা উপকার হয় এর বিস্তারিত বর্ণনা মুশকিল। পড়ার জিন্দেগীর পর থেকে ইন্তেকাল এর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দারস ও তদরীসের কাজ জারী ছিল। অনেক কিতাব লিখে ইলমের চর্চা জারী করেছেন, যা অনাদিকাল পর্যন্ত থাকবে, ইনশাআল্লাহ। হুজুরের আলাপচারিতায় ইলমি চর্চা ছিল। আমার দেখামতে এমন অনেক লেখককে দেখেছি যারা হুজুরের খেদমতে বসেছেন এবং কিছু সময় আলাপ শুনেছেন তারা হুজুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছেন। পরবর্তীতে প্রতিদিন হুজুরের খেদমতে হাজির হতেন। তৃতীয় যে বিষয়টি হুজুরের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তা হলো নেক আওলাদ রেখে যাওয়া, যারা দোয়া করবেন। বাস্তবিকই হুজুর তাঁর আওলাদদেরে আলিম এবং যোগ্যতার উত্তরসূরী হিসেবে রেখে গেছেন। যারা বংশ পরম্পরায় দোয়া করবেন। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য অগণিত উপযুক্ত রূহানী আওলাদ, মুরীদান এবং ইলমে কেরাতের ছাত্র রেখে গেছেন। যাদের প্রত্যেকটি নেক আমলের সওয়াব উত্তরোত্তর হুজুর পাবেন। আমরা মহান আল্লাহর শাহী দরবারে এই প্রার্থনাই করি যেভাবে হুজুর আমাদিগকে আপন সন্তানের চেয়েও অধিক মুহব্বত করতেন তার জন্য হুজুরকে জাযায়ে খায়েরদান করো। হুজুরের শেষ ঠিকানা জান্নাতুল ফেরদৌসের সর্বোচ্চ মাকাম দান করো। আমাদিগকে হুজুরের জন্য নেক ইয়াদগার হিসাবে কবুল কর। হুজুরের আদর্শের উপর চলবার এবং এই আদর্শকে সম্প্রাসরিত করার তৌফিক দান করো। আমিন।

লেখক: সাবেক প্রিন্সিপাল, দারুল হাদীস লতিফিয়া, লন্ডন।

মুসলিম বিশ্বের উজ্জলতম নক্ষত্র

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

(১৯৩৪-২০২২)

অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

বিংশ শতাব্দীতে উদিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম উজ্জলতম নক্ষত্র, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন ওয়াল মুফাস্সিরীন শায়খুল হাদীস ওয়াততাফসীর আল্লামা মো. হবিবুর রহমান জকিগঞ্জী (রারাই), সিলেটি র. আল্লাহ প্রদত্ত মেধা ও স্বীয় মুর্শিদে কামিল শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ র. এর তা'য়লিম-তারবিয়ত ও দু'আর বরকতে জীবনে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি ইখলাস, ইলিম, সমাজ কল্যাণ, অর্থনীতি, আইন-বিচার, প্রশাসনসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুমুখী শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করেছেন। তাঁর সম্পূর্ণ জীবন জ্ঞান পিপাসুদের জন্য আদর্শ। তিনি মানুষের অন্তরে অমর হয়ে আছেন ও থাকবেন।

মানুষের জীবনের মূল ভীত হলো ঈমান ও ইখলাস, প্রত্যেক মানুষের জন্ম হয় ঈমানের উপর, তারপর যার ইখলাস যতটুকু শক্তিশালী হয় তার ঈমানও ততটুকু শক্তিশালী হয়। ইখলাস ছাড়া কারো ঈমান মজবুদ থাকে না, খালিক-মালিক আল্লাহ তা'লাকে পরিচয় করা যায় না, নবী-রাসূল মানা যায় না, রিসালাতে বিশ্বাস করা যায় না, স্থায়ী জীবন আখেরাতকে বিশ্বাস করা যায় না, অবশেষে জন্মগত ঈমান হারিয়ে কাফিরে পরিণত হতে হয়। এই ইখলাসকে যিনি যতটুকু ইসলাহ করতে পারেন, অন্তরের অন্তস্থলে সহীহ ইখলাসকে যতটুকু স্থান দিতে পারেন, তিনি ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে ততটুকু সফল হন, ততটুকু কামিল ইনসান হন, কামিল মু'মিন হন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ তাঁর অন্তরে সহীহ ইখলাস লালনে সফল হয়েছিলেন বলেই তিনি জীবনের সকল পর্যায়ে আদর্শ মানুষ হয়ে মানুষের অন্তরে অমর হয়ে আছেন। তিনি ছাত্র জীবনে শিক্ষার্থীদের আদর্শ ছিলেন। তাঁর একজন সম্মানিত উস্তাযের (ইন্তরমাটির হুজুর) সাথে আমি কোন এক সময় কিছুক্ষণ অতিবাহিত করার সুযোগ পেয়েছিলাম, এ সুযোগে তাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আখলাক ও মেধার একসাথে যুহুর তাঁর মধ্যে যেভাবে ঘটেছিল এরূপে অন্য কোন ত্বালিবুল ইলিমের মধ্যে দেখি নাই। উস্তাযগণ অন্যান্য ত্বালিবুল ইলিমকে উপদেশ প্রদানে তাঁর মিছাল উপস্থাপন করতেন। তিনি আরো বলেন, ছাত্র জীবনে মুহাদ্দিস ছাহেব সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ছিলেন, সকল উস্তায তাঁকে আদর করতেন, মহব্বত করতেন। তিনি গাছবাড়ি জামি'উল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার কৃতিছাত্র ছিলেন। তাঁর কৃতিত্বে মাদ্‌রাসার সুনাম বর্ধিত হয়েছে। তিনি গাছবাড়ি জামি'উল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে

তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম পাবলিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে বোর্ডের মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান অধিকার করে সরকারী মেধাবৃত্তি লাভ করেন, ইতিপূর্বে গাছবাড়ি মাদ্‌রাসা থেকে বোর্ডের আওতাধীন পরীক্ষায় কোন শিক্ষার্থী মেধা তালিকায় স্থান লাভ করতে পারেননি, মেধাবৃত্তিও লাভ করতে পারেননি। গাছবাড়ি মাদ্‌রাসার এই খ্যাতি তাঁর খ্যাতি থেকেই শুরু হয়। তিনি একই মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ফাজিল পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বোর্ডের মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করে মেধাবৃত্তি লাভ করেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে একই মাদ্‌রাসা থেকে কামিল পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অতি সুনামের সাথে হাদীস বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে "মুহাদ্দিস" উপাধি লাভ করেন।

শিক্ষাকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়। প্রায় ষাট বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি একই সাথে দ্বীনের বহুমুখী খিদমত আনজাম দিয়েছেন। তাঁর খিদমতসমূহের মধ্য থেকে নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খিদমতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

ক. উলূমে নবওয়ী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমত:

তিনি তাঁর সুদীর্ঘ প্রায় ষাট বছরের কর্মজীবনে ইলমে হাদীসের অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ইলমে হাদীসের প্রতি তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অপরসীম। মুর্শিদে কামিলের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাঁর এত ঘনিষ্ঠতা ছিল যে, তাঁর হাদীসের দরস প্রদানের সময় বারকাতে নবওয়ী বিরাজমান থাকত। ইলমে হাদীসের অধ্যাপনায় দরবারে রিসালতে তাঁর মক্‌বুলিয়ত এতটুকু ছিল যে, সাধারণ মানুষ 'মুহাদ্দিস ছাহেব' বলতে তাঁকেই বুঝতেন। ইলমে তাফসীরেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসীম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকতার সময় বুখারী শরীফসহ হাদীস শরীফ ও তাফসীরের কিতাবাদির দরস ছাড়াও তিনি বিভিন্ন জায়গায় দরসে হাদীস ও দরসে তাফসীরের মাহফিল করতেন। তাঁর দরসে পবিত্র কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের উপস্থাপন ভঙ্গি এতই আশ্চর্যজনক ছিল যে, তাঁর দরস থেকে উলামায়ে কেরাম যে ভাবে উপকৃত হতেন সাধারণ মানুষও অনুরূপ উপকৃত হতেন, তাই তাঁর তাফসীর ও হাদীসের দরসের মাহফিলে উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মানুষ সমানভাবে উপস্থিত থাকতেন। ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে তিনি ইলমে হাদীস ও ইলমে তাফসীরের দরস প্রদান করেছেন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর উলূমে নবওয়ীর দরস জারী ছিল। দেশ-বিদেশ থেকে উলামায়েকেরাম এসে তাঁর কাছে ইলমে হাদীস পড়ে সনদ গ্রহণ করতেন। ইন্তেকালের পূর্বে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে বাহিরে দরসের সফরে যেতে না পারলেও বাড়ির পাশে আল হাবীব জামে মসজিদে ইলমে হাদীসের নিয়মিত দরস দিতেন। তিনি অসংখ্য মুহাদ্দিসীনে কেরামের শায়খ, বিশেষভাবে এই

যুগে হাদীসে মুসালসালাতের খিদমত তিনি জারী রেখেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য উলামায়েকেরাম হাদীসে মুসালসালাতের সনদ গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তিনি ইলমে ফিকহ, উসূল, ফরাইদ্ব, আকাইদ, তারীখ, সিরত, আদব সহ ইসলামী উলুমের দরস দিয়েছেন। তাঁর ছাত্রগণ দেশে-বিদেশে ইলমে হাদীসের খিদমতসহ দ্বীনি খিদমাত আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন।

খ. ইলমে কিরাতের খিদমতঃ

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ হবিবুর রহমান র. রঈসুল কুররাহ শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ র. এর নিকট থেকে ইলমে কিরাতের সনদ হাসিল করে সহীহ কিরাত শিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রতি রামাদ্বানুল মুবারকে শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ র. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "দারুল কিরাত মাজীদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট" ফুলতলী, জকিগঞ্জ, সিলেট এর অধিভূক্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে ইলমে কিরাত শিক্ষা দিতেন। প্রধান কেন্দ্র ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা কেন্দ্র, হযরত শাহজালাল দারুস্‌সুন্নাহ্ ইয়া'কুবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা সোবহানীঘাট কেন্দ্র, সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা কেন্দ্রসহ অনেক কেন্দ্রে তিনি ইলমে কিরাতের শিক্ষকতা করেছেন। অনেক কেন্দ্রে প্রধান কারী ও নাযিমের দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি একজন মুশ্‌তাক কারী ছিলেন। ইলমে কিরাতে তাঁর ব্যাপক খ্যাতি ছিল। তিনি খাদিমে কুরআন ছিলেন।

গ. ইলমে ত্বরীকতের খিদমতঃ

তিনি ছিলেন ইমামে ত্বরীকত, মুর্শিদে কামিল, আশ্‌-শায়খুল জামি'য় বাইনাশ্‌শরীয়ত ওয়াত্‌ত্বারীকত ওয়াল হকীকত ওয়াল মুহাব্বাত রঈসুল কুররাহ শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ র. এর অন্যতম মজায। শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ র. তাঁকে কাদীরিয়াহ, চিশতীয়াহ, নকশ্‌বন্দিয়া, মুজাদ্দাদিয়াহ ও মুহাম্মদীয়াহ ত্বরীকার ইজাযত প্রদান পূর্বক ইলমে ত্বরীকতের খিদমাত করার নির্দেশ করেছিলেন। মুর্শিদের নির্দেশ মুতাবিক তিনি দেশে-বিদেশে ইলমে ত্বরীকতের তা'য়লিম-তরবিয়ত দিয়েছেন, এ খিদমতেও তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি তাঁর منتخب السنن والاثار গ্রন্থে গাউছুল আযম ইমাম সায়্যিদ আব্দুল কাদির জীলানী র. এর উদ্ধৃতি দিয়ে التصوف শব্দের নিম্নরূপ বিশ্লেষণ করেছেন: তিনি লিখেছেন التصوف শব্দে চারটি বর্ণ রয়েছে- التاء و الواو- الصاد- التاء التوبة দ্বারা الفاء; التوبة শব্দ বুঝানো হয়েছে, দু'প্রকার, صفاء শব্দ বুঝানো হয়েছে, توبة الباطن, الصاد و توبة الظاهر দু'প্রকার الفاء ও الولاية ترتب على التصفية দ্বারা صفاء السر, الواو ও صفاء القلب দ্বারা الفناء فى الله বুঝানো হয়েছে। মূলত تصوف শব্দটি صوف থেকে নির্গত, ইহার অর্থ পশম, লোম। এক যুগে আল্লাহ্ ওয়ালা ব্যক্তিবর্গ পশম বা লোম দ্বারা নির্মিত লেবাস পরিধান

করা পছন্দ করতেন, এই জন্য অধ্যাত্মিক আচার-আচরণের ব্যক্তিবর্গকে صوفى বলা হতো, এটা থেকে صوفية শব্দের আভিধানিক অর্থ হয়েছে সুফীবাদের আচার-আচরণ গ্রহণ করা বা সুফী হওয়া। ইমাম জীলানী র. এর উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহওয়ালা হতে হলে এই চারটি অর্থে নিজেকে গঠন করতে হবে। শায়খুল হাদীস র. এর লিখিত গ্রন্থে এ বিষয়টি স্থান পাওয়ায় বুঝা যায় যে, ইলমে ত্বরীকতে তাঁর গভীরতা কত বেশি ছিল। বাস্তবিকই তিনি فنا فى الله ও فنا فى الرسول- فنا فى الشيخ এর স্তরে পৌঁছে ছিলেন।

ঘ. তাবলীগে দ্বীনঃ

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ হবিবুর রহমান র. তাবলীগে দ্বীনের দায়িত্ব পালনে ছাত্র জীবন থেকে সচেতন ছিলেন। মানুষের দ্বারে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে তিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। তিনি অনেক মাদ্‌রাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেমনঃ লালার গাও হাবিবিয়া হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা, ভূরকী হাবিবিয়া হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা, রায়সন্তুষ হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা, থানাবাজার হাবিবিয়া হিফজুল কুরআন মাদ্‌রাসা, ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা মসজিদ, থানাবাজার মসজিদ। তাছাড়াও তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তিনি অনেক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, অনেক প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা পরিষদে থাকার সুবাদে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাবলীগে দ্বীনের লক্ষ্যে তিনি দেশে-বিদেশে অনেক সফর করেছেন। সিলেট বিভাগসহ দেশের ভিতরে অনেক মাহফিল করেছেন, দেশের বাহিরেও তিনি দাওয়াতী সফর করেছেন, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ আমেরিকার বহুদেশে সফর করেছেন, অনেক সাহাবায়ে কেরাম ও আওলিয়ায়ে কেরামের যিয়ারত করেছেন, যেমন সিরিয়া সফরে হযরত বিলাল রা., শুহাদায়ে কারবালা, সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী, সুলতান আব্দুল হামিদ ও ইমাম মিয্‌যী রা. এর কবর যিয়ারত করেছেন। মরক্কো সফরে ইমাম জাযূলী র. ইমাম শাযূলী র. কাযী আয়ায র. সহ অনেকের যিয়ারত করেছেন। মিশর সফরে ইমাম শাফঈ' র. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী হানাফী র. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী র. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. সহ অনেক ইমামগণের যিয়ারত করেছেন, ইলমে হাদীসের দরস দিয়েছেন, উলামায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ করে মতবিনিময় করেছেন। ইস্কান্দারিয়া সফরে ইমাম বূসীরী র. ও তাঁর মুর্শিদের যিয়ারত করেছেন। বিভিন্ন দেশে বুখারী শরীফ, শামাঈলে তিরমিজী শরীফ, রিয়াদুস্ সালিহীন, ইমাম বুখারী র. এর আল আদাবুল মুফরাদসহ অন্যান্য কিতাবের দরস দিয়েছেন। ভারত সফরে তদ্বীয় মুর্শিদের মুর্শিদ ইমুমত্ত্বরীকত শাহ আবু ইউসুফ মুহাম্মদ ইয়া'কুব বদরপুরী র. সহ অনেক আওলিয়ায়ে কেরামের যিয়ারত করেছেন, বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা করেছেন। মোদ্দাকথা তাবলীগে

দ্বীনে তিনি পৃথিবীর বহুদেশে সফর করেছেন, তথায় ঈমান-আকাইদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন, ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে অনেক মাহফিল করেছেন।

ঙ. খিদমতে খালকঃ

আল্লাহ তা'লা মানুষ জাতিকে আশরাফুল মাখলূকাত করে সৃষ্টি করেছেন, তাই মানুষের দায়িত্ব হলো সকল মাখলূকাতের সেবা করা। শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ হবিবুর রহমান র. আশরাফুল মাখলূকাত হাওয়ার শুকরিয়া আদায়ে মানুষসহ সকল মাখলূকাতের সেবায় সদা-সর্বদা নিমগ্ন ছিলেন। সমাজে শান্তি ও দেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনে তিনি ছাত্রজীবন থেকে সচেষ্ট ছিলেন। পাকিস্তান আমলে বাম পন্থীদের প্ররোচনায় আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষা দুর্বল করার লক্ষ্যে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কুটকৌশল করা হয়েছিল। এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ র. সহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের হক্কানী উলামায়ে কেরাম এক সাথে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, এ আন্দোলনে তিনি ছাত্রনেতা হিসেবে রাজপথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আন্দোলনের মুখে সরকার আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট স্থগিত করেছিল। ড. ফজলুর রহমানের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ। মানুষের সেবায় তিনি রাজনীতি করতেন। ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ও ইসলামী হুকূমত কাইমের চেষ্টায় তিনি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে জকিগঞ্জ, কানাইঘাট ও বিয়ানীবাজার আসন হতে পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে 'বই' প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদে পক্ষ হতে জকিগঞ্জ-কানাইঘাট আসনে 'ঘড়ি' প্রতীক নিয়ে বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তিনি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন। তিনি ন্যায়-বিচারে অভ্যস্ত ছিলেন। আরব-আমীরাতে তিনি দীর্ঘ দিন বিচার বিভাগে কাজ করেছেন। তিনি কোন বিচার অনুষ্ঠানে গেলে বিচার্য বিষয়টিকে অতি সহজ করে সমাধান করে দিতেন যাতে কোন পক্ষের মনে কষ্ট না হয়। অন্যের কষ্টে তিনি নিজেই কষ্ট পেতেন, অন্যের কষ্ট, দুঃখ-দুর্দশা মুছনে মেতে উঠতেন, কারো আর্থিক কষ্ট হলে নিজের অর্থ ব্যয়ে বা অন্যের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেও দুস্থজনের কষ্ট দূর করতেন। কোন প্রাণীকে কষ্টে দেখলে উদ্ধার করার চেষ্টা করতেন। সামাজিক সংস্কারের জন্য শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ র. আনজুমানে আল ইসলাহ নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি এই সংগঠনের দীর্ঘদিন সভাপতি ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের বোর্ড কমিটির সম্মানিত সদস্য ছিলেন। এই সুবাদে তিনি বোর্ডের অধিভূক্ত মাদ্‌রাসাসমূহে লেখা-পড়ার মান উন্নয়নে চেষ্টা করেছেন, নতুন

মাদ্‌রাসাসমূহ বোর্ডের অধিভূক্ত করারও চেষ্টা করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন। তাছাড়াও তিনি জনসেবামূলক অনেক সংস্থা-সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক, উপদেষ্টা, নীতি নির্ধারক, পরামর্শদানকারী ও উৎসাহ প্রদানকারী ছিলেন। তিনি "মাসিক শাহজালাল" নামক ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক একটি নিয়মিত মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তিনি নিজেই এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। তিনি দেশের আলিম-উলামা ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সেবার্থে স্বীয় উদ্দ্যোগে নিজ বাড়ির নিকটে "আল-হাবীব জামে মসজিদ ক্যাম্পাসের উত্তর পাশে مكتبة الحبيب নামে এক বিশাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ ধরণের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার আমাদের উপমহাদেশে বিরল। এই গ্রন্থাগারে প্রবেশ করলে তাঁর জ্ঞান সাগরের গভীরতা কিছুটা অনুমান করা যায়। তাঁর সেবামূলক কাজের তালিকা লিখে শেষ করার নয়, কারণ আমাদের সামনে দৃশ্যমান সেবামূলক কাজের চেয়ে আমাদের দৃষ্টির অদৃশ্যে তাঁর অনেক বেশি কাজ রয়েছে।

চ. গ্রন্থাদি রচনা:

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ হবিবুর রহমান র. একজন দক্ষ লেখক ও বহু গ্রন্থপণেতা ছিলেন, তাঁর লিখিত ও সংকলিত গ্রন্থাদির সংখ্যা শতশত না হলেও ঈমান-আকাইদ টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁর জ্ঞান-গর্ভ ক্ষুরধার লেখনী খুবই সহায়ক। তাঁর লিখিত যে কোন গ্রন্থ পাঠ করলে নুতন নতুন দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। তাঁর সংকলিত منتخب السنن والاثار গ্রন্থের শিরোনামগুলো দেখলে সম্মানিত পাঠকমহল তাঁর যশ, জ্ঞানের গভীরতা, সু-কৌশলী উপস্থাপন ভঙ্গি ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাবেন। তিনি এই হাদীস গ্রন্থখানা তিনটি পর্ব (كتاب) পঁচিশটি অধ্যায় (باب) ও ঊন পঞ্চাশটি অনুচ্ছেদে (فصل) সুবিন্যস্ত করেছেন। চমৎকার বিষয় হলো যে, এ সব শিরোনামের আওতায় কতিপয় মাজহাবী মাসাইলের সুষ্ঠু সমাধান ছাড়াও পূর্ণ গ্রন্থে ভ্রান্ত আকাইদের খণ্ডন করে সহীহ আকাইদের দলিলাদি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, পাঠকমহল অতি সহজে সহীহ মাসলাক বুঝে নিতে সক্ষম হবে, এতে কারো প্রতি কোন প্রকার আক্রমণাত্মক আলোচনাও নাই। রেওয়াইয়াতের মাধ্যমে বাতিলপন্থীদের এরকম খণ্ডন ও সহীহ মাসলাকের ছুবূত খুবই বিরল। তাঁর লিখিত ও সংকলিত গ্রন্থরাজী পড়লে মনে হয় তিনি ছিলেন এই যুগের ইমাম ত্বাহাওয়ী, মুসলিম বিশ্বের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, উলামায়ে কেরামের প্রত্যাবর্তনস্থল। তথ্য-উপাত্তসহ জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁর লিখিত ও সংকলিত কিতাবাদি পড়া একান্ত প্রয়োজন। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর সকল খিদমাত কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন!

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জকিগন্‌জ ফাযিল সিনিয়র মাদ্‌রাসা, সিলেট।

হাদীসশাস্ত্রের মহান সাধক
মুহাদ্দিস মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

ড. সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ আল মারুফ

হামদ, সালাত ও সালামের পর,

মুহাদ্দিস মো. হবিবুর রহমান-এর জন্ম বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে। হাদীসশাস্ত্রে দীর্ঘ দিন খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার কারণে "মুহাদ্দিস" লকবটি সহযোগেই লোকেরা তাঁর নাম উচ্চারণ করে। আমাদের দেশে মাদ্‌রাসার শিক্ষকগণের নামের শেষে তার এলাকার নাম, জন্মস্থানের নাম জুড়ে দেওয়া হয়। ছাত্ররা বলে- রসূলপুরের হুজুর, বালিয়াকান্দির হুজুর, বাহুবলের হুজুর ইত্যাদি। কিন্তু সৎপুর কামিল মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস-এর পরিচয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের মাধ্যমে হওয়াটা তাঁর একটি কারামাত। মহান আল্লাহ তাঁকে এভাবেই দুনিয়াতে সম্মাননা (কারামাত) জানিয়েছেন। এটি কেবল তাঁর পরিবার বা ফুলতলী মাসলাকের সম্মান নয় বরং বাংলাদেশরই সম্মান। কারন দিল্লীর মুহাদ্দেস পরিবারের বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে নামের পরে বলি- শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী, শাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী। তিনি গোটা বাংলাদেশের অহঙ্কার। কারণ, তাঁর নিকট সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্ররা হাদীসের দরস নিয়ে তা গ্রমাগঞ্জের মসজিদ, মাদ্‌রাসা, ওয়াজ মাহফিল ও গ্রন্থাদি রচনার মাধ্যমে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন।

সিলেটের বহু লোক ইংল্যান্ড থাকেন- প্রধানত, তাদেরকে ধর্মীয় নির্দেশনা দিতে তথায় তিনি বহুবার গেছেন এবং সকল দেশের মুসলিমগণই তাঁর দ্বারা আলোকিত হয়েছেন। এ দিক থেকে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও খেদমত রয়েছে বটে।

মুহাদ্দিস ছাহেব কেবল যে ক্লাসে হাদীসের লেকচার দিয়েই শেষ-এমন ছিলেন না। তিনি নিজে সিলেটের স্বনামধন্য পীর আল্লামা আব্দুল লতীফ চৌধুরী ফুলতলী ও অন্যান্য পীর মুর্শিদের সাহচর্যে থেকে আত্মশুদ্ধি ও রূহানী জগতের উচ্চ গগণে বিচরণ করেছেন। সুন্নাতের পাবান্দ ছিলেন, সুন্নী আকীদার সুরক্ষক ছিলেন। এ ধরনের শিক্ষাবিদগণ আসলে ২৪ ঘণ্টার ফুলটাইম, ফুল লাইফ জাতির শিক্ষক ছিলেন। সকাল-সন্ধ্যা ছাত্ররা পিছু ছাড়তো না, রাত্রে মাহফিলে গিয়ে কিছু না বললে ভক্তরা বেজার। কারও কোন মাসাআলা জানার প্রয়োজন হলে সর্বোচ্চ মুফতি হিসেবে তাঁর দ্বারস্থ হতো। এ ধরনের আলেমনগণের প্রাইভেট লাইফ বলে কিছু থাকে না। তাঁরা নিজ সন্তান ও বিবি-সংসারের জন্যও বেশি সময় দিতে পারেন না। কিন্তু যারা পারেন- এটা তাদের কারামাত। তাঁর সন্তানগণ শিক্ষিত ও ভাল মানুষ হিসেবে সমাজে সমাদৃত। তিনি সদা সহাস্য চেহারায়

আগন্তকদের সাথে আলাপচারিতা করতেন।

যতটুকু তাঁকে দেখেছি, যতদূর জেনেছি- আমি কেবলই ভাবতাম- এখনও ভাবি, এই সকল উচ্চগুণাবলী সম্পন্ন বিশুদ্ধ আকীদার পণ্ডিত ব্যক্তিরা চলে গেলে এই শূন্যস্থান কি আর পূরণ হবার? আমি ১৯৮১ সালে কামিল পাস করে '৮২-এর ব্যাচকে ক্লাসে বুখারী শরীফ পড়িয়েছি ছয় মাস। তাই আমি বুঝি মুহাদ্দিস হতে হলে কত বেশি জানা লাগে। আমি সব সময় মনে করেছি যে, এত কম ইলম নিয়ে কিভাবে উস্তাযি করব? এখন মনে হচ্ছে, দিনে দিনে ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধি এতই হ্রাস পেয়েছে যে, আমরাই ভাল ছিলাম। তেমনি মুহদ্দিস মো. হবিবুর রহমান বছরের পর বছর, হাজারের পর হাজার ছাত্রকে হাদীস পড়িয়েছেন; তাঁর মত লোক চলে যাবার পর তাঁর মত বা কাছাকাছি কোন মুহাদ্দিস কি পাওয়া যাচ্ছে? গেলেও অতি অল্প সংখ্যক থাকবেন- যাদের পর তাদের মত শিক্ষক আর পাওয়া যাবে না। মুহাদ্দিস মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ তাঁর যামানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন এবং সার্বিক বিচারে তিনি বরং সেরাই ছিলেন।

তাঁর সাথে দু'বার দেখা হয়েছিল। একবার সম্ভবত সুনামগঞ্জের এক মাহফিলে। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন রাতের প্রাইম টাইম ৯টায় ড. মারুফ কিছু বক্তব্য রাখবেন। আমি উঠলাম, অল্প সময় বক্তৃতা দিলাম। (বহুদিন ধরে এটি ইউটিউবে আছে) তিনি খুশি হলেন। পরবর্তীতে অনেকে বললেন- ড. মারুফ এত ভাল বক্তব্য রাখবেন আমরা ভাবিনি। পাশের লোক বলে উঠে, "আরে এ তো ছিল মুহাদ্দিস সাব-এর কেরামত"। হ্যাঁ, আমিও মনে করি, বক্তৃতার সময় আমার মাথায় এ বিষয়টি কাজ করেছে যে, এই বিখ্যাত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিস যদি ফুলতলীর পীর ছাহেবকে মেনে চলেন তবে ফুলতলীর পীর ছাহেব না জানি কত বড়।

লন্ডন শহরে গিয়েছি একাধিকবার কিন্তু লন্ডন মিউজিয়ামে যাইনি। আমার এ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করেছেন মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল। আল্লামা মো. হবিবুর রহমান যীদা মাজদুহু-এর যোগ্য সন্তান। তিনি আমাকে সময় দিয়েছেন এবং তার লিখিত বই দিয়েছেন। আমি তার ব্যক্তিত্ব ও লেখনী দেখে মুগ্ধ হলাম। যদি তিনি দেশে থাকতেন তাহলে পিতার মতই এ দেশে আলো ছড়াতেন। ফল দিয়ে গাছ চেনা যায়। তাই একটু বললাম। বড় বড় শহরের নাম এমন অনেকের জানা, যারা সে শহরের কখনও যাননি। বড় বড় আলেমগণের জ্ঞান-গরিমা ও অবদানের কথাও এমন অনেকের কাছে ছড়িয়ে পড়ে, যারা তাঁর কাছে পড়েননি। যেমন আমি। মুহাদ্দিস সাবকে দেখার আগে তাঁর সম্পর্কে অনেক শুনেছি। সিলেটীরা বলতেন- মুহাদ্দিস হবিবুর রহমান ছাব বাক্কা হদিছ পড়ান। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী মাওলানা আব্দুস সালাম বিয়ে করে, ছুটি শেষে মদীনা শরীফে ফিরলে জানতে পারি যে, তিনি মুহাদ্দিস সাহেবের জামাতা হয়েছেন। যদিও আমার বন্ধুটি পরবর্তীতে জামাতে ইসলামীর খপ্পরে পড়ে যান।

বন্ধু আব্দুস সালাম যা ভাল মনে করতেন তা বলে ফেলতেন। হয়তো তার এ সাহস

ও ইসলামপ্রীতিকে সুযোগ সন্ধানীরা কাজে লাগিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এ বন্ধুর মাদীনা-স্মৃতিকেই কেবল ধরে রেখেছি। এখানেও মুহাদ্দিস হবিবুর রহমান ভুল করেননি। কারণ তিনি অঢেল ধন-দৌলতের দিকে না ঝুকে একজন ভাল আলেমকে দামান্দ বানিয়েছেন।

আমি মনে করি হাদীসশাস্ত্রের এই মহান সাধকের লিখিত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হওয়া দরকার এবং তাঁর জীবনকে ছাত্রদের জন্য তুলে ধরা দরকার। তাঁর ছাত্র জীবন, শিক্ষকতার জীবন, আত্মশুদ্ধির পথ-পরিক্রমা, মূল্যবান নসিহত ইত্যাদি জাতির সামনে তুলে ধরা হলে আমরা সবাই উপকৃত হব।

আমার এ ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত লেখার মত খণ্ড খণ্ড চিত্র প্রচার করলে, একদিন প্রায় পূর্ণ অবয়ব ভেসে উঠবে। সেদিনটির অপেক্ষায় থাকলাম। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমানকে তাঁর হাবীবের পাশে স্থান দিন! আমীন !

লেখক: প্রফেসর, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ওআইসি আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমিতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। অনুবাদের জন্য শেখ হামাদ আন্তর্জাতিক পুরস্কার বিজয়ী (২০২২)। সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ একজন কিংবদন্তি আলেমে দ্বীন ও ইসলামের নিরলস খাদেম

ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল- মারুফ আল- মাদানী

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়

ক্ষণজন্মা আলেমে দ্বীন, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার রারাই গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন বিখ্যাত আলেমে দ্বীন মরহুম মাওলানা মমতায আলী ও মাতা ছিলেন মহিয়সী নারী আমিনা খাতুন। সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। দেশে-বিদেশে এলমে দ্বীন প্রচারে ও প্রসারে অসামান্য অবদান রেখেছেন তিনি। খ্যাতি লাভ করেছেন ও লকবে ভূষিত হয়েছেন 'মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর' হিসেবে।

শিক্ষা জীবন

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও শান্ত প্রকৃতির পরহেজগার মানুষ ছিলেন। পড়াশোনার প্রতি ছিলেন ভীষণ মনোযোগী। এলাকার প্রাইমারি স্কুলে তিনি কিছুদিন লেখাপড়া করেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর বড় ভাই মরহুম মাওলানা নজিবুর রহমানের সাথে ভারতের বদরপুর সিনিয়র মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে কিছুদিন লেখাপড়া করার পর তিনি ফিরে আসেন কানাইঘাট থানাধীন সড়কের বাজার আহমদিয়া মাদ্‌রাসায়। সড়কের বাজার মাদ্‌রাসায় ছাত্র থাকাকালীন সময়ে শিক্ষকদের অনুপ্রেরণায় পার্শ্ববর্তী প্রাইমারি স্কুল থেকে জেলাভিত্তিক প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মেধাতালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এখান থেকেই তিনি মেধার স্বাক্ষর রাখেন এবং মেধাবী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি সিলেটের অন্যতম প্রাচীন ইসলামী বিদ্যাপীঠ গাছবাড়ি জামিউল উলুম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং অত্যন্ত মনোযোগের সাথে যথারীতি লেখাপড়া শুরু করেন।

১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ডের অধীন আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করেন। ১৯৫৭ সালে একই মাদ্‌রাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৯ সালে এ বিদ্যাপীঠ থেকে হাদীস বিভাগে কামিল পরীক্ষায় বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বাদশ স্থান লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, গাছবাড়ি মাদ্‌রাসার ইতিহাসে তৎকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান

লাভকারী তিনিই প্রথম ছাত্র। মেধার বিকাশ ঘটিয়ে পূর্ব বাংলার এই কৃতি সন্তান অনন্য ও অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

কর্মজীবন

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর মাদ্‌রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি কামিল পাশ করার পর সিলেটের বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ ইছামতি দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় সহকারী মাওলানা পদে ১৯৫৯ সালে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালের ১১ই এপ্রিল সিলেটের প্রাচীনতম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফুলবাড়ি আজিজিয়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। কয়েক মাস পরে তার পীর ও মুর্শিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর নির্দেশে ১৯৬৩ সালের ২৩ শে নভেম্বর তৎকালীন সময়ের হাদীস চর্চার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। এই মাদ্‌রাসায় হাদীসের অধ্যাপনা করার কারণেই শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর লকবে ভূষিত হন। ১৯৭৪ সালের ১৪ ই জানুয়ারি পর্যন্ত সেখানে সুনামের সাথে হাদীস অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ১৫ই জানুয়ারি ইছামতি দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। ইতিমধ্যে সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি হয় এবং মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যা নিরসনকল্পে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের অনুরোধে ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে উক্ত মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় খুব কম সময়ের মধ্যে মাদ্‌রাসার পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং স্থিতিশীলতা পুনরায় ফিরে আসে। ১৯৭৭ সালের ২ এপ্রিল পর্যন্ত সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৭ সালে সৎপুর দারুল হাদীস থেকে চলে আসার অল্প কিছুদিন পর তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে গমন করেন। অতঃপর আরব আমিরাতে প্রথমে উম্মুল কুওয়াইন শহরে একটি মসজিদে ইমাম ও খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি স্থানীয় ও দেশীয় ওলামায়ে কেরামদের অনুরোধে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সে দেশের বিচার বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৮২ সালে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি উম্মুল কুওয়াইন কোর্টে বিচারক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া সরকারি ছুটির দিনে আরব আমিরাতে মরুচারী বেদুঈনদের অবৈতনিক শিক্ষাদান করতেন। বয়স্ক বেদুইনদের কুরআনুল কারীম সহি শুদ্ধ তেলাওয়াত শেখাতেন এবং জরুরী মাসলা মাসায়েলের বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন।

অতঃপর আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরে ১৯৮২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর পুনরায় তিনি ইছামতি দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় পুনরায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর

অবসর গ্রহণ করেন। তার একান্ত প্রচেষ্টায় ইছামতি মাদ্‌রাসাটি পূর্ব সিলেটের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী বিদ্যাপীঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণির সরকারি মঞ্জুরি ও স্বীকৃতি লাভ করে।

দীর্ঘদিন এলমে হাদীসের খেদমত ও আল কুরআনের প্রশিক্ষণ এ মানুষটিকে মহিমান্বিত করেছে। আজও তার ছাত্রেরা ও ভক্ত অনুরক্তরা এবং সন্তানেরা হৃদয়ে লালন করে তাকে গভীরভাবে স্মরণ করছে।

রাজনৈতিক জীবন

শিক্ষকতা ও দাওয়াতি কাজের পাশাপাশি একসময় তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নেজামে ইসলামের মনোনয়নে তিনি তখনকার সিলেট ৭ আসনে (জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার ও কানাইঘাট) এম এন এ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল-ইসলাহ এর সভাপতি দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ১৯৯৬ সালে আঞ্জুমানে আল ইসলাহ এর মনোনীত ও সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে তিনি জাতীয় নির্বাচনে সিলেট পাচ আসনে (জকিগঞ্জ-কানাইঘাট) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

বিদেশ সফর

যুক্তরাজ্য

প্রথমত: ১৯৮১ সালে তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ) এর এজাযাতে তিনি আরব আমিরাত থেকে যুক্তরাজ্য সফর করেন। এ সফরে যুক্তরাজ্যের নানা জায়গায় তিনি তাঁর মুর্শিদের সাথে আয়োজিত মাহফিলে আবেগময় বয়ান পেশ করতেন। মাত্র ১৫ দিন সফর শেষে পুনরায় তাঁর পূর্বের কর্মস্থল আরব আমিরাতে প্রত্যাবর্তন করেন।

এভাবে তিনি সুযোগমত প্রতিবছর যুক্তরাজ্যে সফরে যেতেন। তিনি গ্রেট ব্রিটেনের উল্লেখযোগ্য প্রতিটি শহরে জলসা করতেন এবং ইসলামের অমীয় বাণী প্রচার করতেন। ২০০৯ সালে তিনি একাধারে প্রায় নয় মাস যুক্তরাজ্যে অবস্থান করেন। এ সফরে তিনি লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত দারুল হাদীস লতিফিয়ায় শামায়েলে তিরমিজি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থের দারস প্রদান করেন। বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে এ দারসে অসংখ্য আলিম-ওলামা ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে এসতেফাদা হাসিল করতেন। দারস সম্পন্ন শেষে প্রায় দুই শতাধিক আলিমকে শামায়েলে তিরমিজির সনদ প্রদান করেন যা অবিস্মরণীয় ও অকল্পনীয়। এছাড়া ব্রিটেন সফরকালে নানা জায়গায় সুযোগ মতো রিয়াদুস সালেহীন ও আদাবুল মুফরাদ নামক হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ হৃদয় বিদারক এবং চিত্তাকর্ষক

দারস প্রদান করতেন। যা আজও ব্রিটেনবাসী আলিম-ওলামারা এবং সাধারণ মানুষ হৃদয় ভরে স্মরণ করছেন। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের এ খেদমত সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুলিয়াতের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি।

যুক্তরাষ্ট্র

১৯৯৫ সালে আমেরিকায় অবস্থানরত তার ছাত্র ও ভক্তদের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রে সফর করেন। সে সুযোগে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে উক্ত সময় মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামের অমীয় বাণী প্রচার করেন।

সিরিয়া

২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর সিরিয়া সফর করেন। সে সময়ে দামেস্কের প্রখ্যাত হানাফী চিন্তাবিদগণের সাথে ইসলামের নানা বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও মতবিনিময় হয়। সে সফরে দামেস্কের বিখ্যাত আলিম 'আল ফিকহুল হানাফী ওয়া আদিল্লাতুহু' কিতাব প্রণেতা শায়খ ড, আসয়াদ মুহাম্মদ সাঈদ সাগিরজির কাছ থেকে ইলমে হাদীসের দারস গ্রহণ করে সনদ গ্রহণ করেন। এ সময় তার শায়খ নিজ বাড়িতে নৈশ ভোজের আয়োজন করেন। এছাড়া তিনি শায়খ ড, আজজাজ আল খাতিব, শায়খ হিশাম বুরহানি, শায়খ আব্দুর রহমান হামমামি সহ অসংখ্য ওলামায়ে কেরামের সাথে এলমি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

মরক্কো

২০১০ সালের এপ্রিল মাসে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর মরক্কো সফরে গমন করেন। এ সময় তিনি মদিনাতুল আউলিয়া নামে মারাকাশ শহরে দালাইলুল খয়রাত প্রণেতা ইমাম জাজুলী (রহ,), ইমাম কাজি আয়াজ (রহ) ও ইমাম সহাইলি (রহ,) প্রমুখের মাজার জিয়ারত করেন।

ভারত

ভারতের আসাম প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি বিভিন্ন সময়ে সুযোগ মত ব্যাপক সফর করেন। এ অঞ্চলে অসংখ্য ইসলামী জলসায় যোগদান ছাড়াও এ অঞ্চলের ওলামায়ে কেরামের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে ইলমে হাদীসের দারস প্রদান করেন। এ অঞ্চলের ওলামায়ে কেরাম আজও তা স্মরণ করছেন এবং মন খুলে তার জন্য দোয়া করছেন।

মিশর

২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি মিশর সফর করেন। সফরকালে কায়রো শহরে বিখ্যাত সাহাবী উকবা ইবনে আমের (রা:), ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) এর

মাজার জিয়ারত করেন। উক্ত সফরে ইতিহাসখ্যাত জামিয়াতুল আযহার মসজিদে হাদীসের দারস প্রদান করেন। এছাড়া উক্ত সফরে ভক্ত ও পরিচিত জনের মাঝে ইসলামের অমীয় বাণী প্রচার করেন।

সম্পাদনায় শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সম্পাদনায় সিলেট শহর থেকে মাসিক শাহজালাল নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অতি অল্প সময়ে সিলেট অঞ্চলে এ পত্রিকার ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীতে নানা কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের প্রকাশিত গ্রন্থ

হুজুর তাঁর জীবদ্দশায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে চির অমর হয়ে আছেন।

তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো:

আল কাওলুল মকবুল ফী মিলাদির রাসূল, দোয়ায়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফজিলত, মাসয়ালায়ে উশর: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, দুরুদ শরীফের ফজিলত ও অজিফা, যিয়ারাতে মদিনা মোনাওয়ারা, আসহাবে বদর, হজ ও জিয়ারত, দালাইলুল খয়রাত, আল হিযবুল আজম, দরছে হাদীস ইত্যাদি।

মাদ্‌রাসা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ২০০০ সালে থানাবাজার লতিফিয়া ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসার পাশে জমি ক্রয় করে একটি হিফযুল কুরআন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ মাদ্‌রাসার নাম থানাবাজার হাবিবিয়া হিফযুল কুরআন মাদ্‌রাসা। ২০১১ সালে তিনি হিফযুল কুরআন মাদ্‌রাসার সাথে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

মসজিদ প্রতিষ্ঠা

ইছামতি দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসার পশ্চিম দিকে একটি ছোট মসজিদ ছিল দীর্ঘ কাল ধরে। মাদ্‌রাসা চলাকালীন সময়ে ছাত্র শিক্ষকগণের উপস্থিতিতে স্থান সংকুলন না হওয়ার প্রেক্ষিতে নিজ উদ্যোগে ব্রিটেন ও আমেরিকায় অবস্থানরত ভক্তদের থেকে অনুদান কালেকশন করে মাদ্‌রাসা পূর্ব দিকে একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০০ সালে এলাকাবাসী এবং মাদ্‌রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের চাহিদার প্রেক্ষিতে তিনি থানাবাজার লতিফিয়া ফুরকানিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা সংলগ্ন পুরাতন ছোট মসজিদের স্থলে সুপরিসর বৃহৎ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৬ সালে নিজ বাড়িতে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে আল হাবিব জামে মসজিদ। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের জীবদ্দশায় এ মসজিদে প্রতি মঙ্গলবার বাদ মাগরিব

হাদীস শরীফের দারস পেশ করতেন। এতে তাঁর ভক্তরা এবং আশেপাশের ওলামায়ে কেরাম শরীক থাকতেন এবং অত্যন্ত ভাব গম্ভীর্য হালাতে হাদীসের দারস অনুষ্ঠিত হতো।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সাথে ফুলতলী ছাহেব কেবলার বাড়িতে তিনবার আমার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং আলাপ হয়েছে। যেমনি নুরানী চেহারার মালিক তেমনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বড় মাপের আলেমে দ্বীন, আল্লাহর পেয়ারা বান্দা। অত্যন্ত বিনয়ী ও নিরহংকার মানুষ। তার দোয়া নেয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। আল্লাহর ওলীদের শানে আল্লাহ এরশাদ করেন,

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة لا تبديل لكلمةالله ذلك هو الفوز العظيم

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর অলিদের কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা নেই। তারা যারা ঈমান এনেছেন এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছেন, তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে ইহকালে এবং পরকালে। আল্লাহর কালিমার কোন পরিবর্তন হবে না। ইহাই মহা সাফল্য।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর আল্লাহর অলি ছিলেন। একদিকে হাদীসের ব্যাখ্যাকার অন্যদিকে ছিলেন আধ্যাত্মিক মহান সাধক। পৃথিবীতে যতদিন ছিলেন ততদিন হাদীসের খেদমত করে গেছেন দ্বীনের আলো জ্বালিয়ে গেছেন। তাঁর হাদীসের আলোচনায় ও ইসলামের অমীয় বাণী প্রচারে এলাকাবাসী ধন্য হয়েছেন। দেশ-বিদেশে সফর করে দ্বীনকে সমুন্নত রেখেছেন। রেখে গেছেন তিনি অসংখ্য ভক্ত- অনুরক্ত। এ খেদমত টুকুই ইনশাআল্লাহ কেয়ামতের দিন তাঁর নাজাতের উসিলা হবে। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

হে রব্বুল আলামিন! তুমি মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের আলা মাকাম নসিব করো। তাঁর চারপুত্র ও তিন কন্যাদেরকে সাবরে জামিল এখতিয়ার করার তৌফিক এনায়েত ফরমাও। আমিন ইয়া রব্বুল আলামিন।

লেখক: অধ্যক্ষ, মহাখালী দারুল উলুম হোসাইনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

ইলমে হাদীসের মহান জ্যোতিষ্ক

অধ্যক্ষ মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ নুমান

উস্তাযুল উলামা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন ইলমে হাদীসের অন্যতম এক জ্যোতিষ্ক। যার আভায় স্নাত বাংলাদেশ, আরব আমিরাতসহ এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার অগণিত জ্ঞান পিপাসুরা। সদা বিনয়ী-হাসোজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় চেহারার এ মহান মনীষীর সিরত সুরতে ছিল অসম্ভব ব্যক্তিত্বের ছাপ। যাকে এক নযর দেখলে শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরে উঠত। তিনি জনসমক্ষে তাশরীফ নিলে মানুষ তাঁর সোহবতের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ত। এমন এক গুণীজন সর্ম্পকে আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের লেখা 'সাঁতরে সাগর পাড়ি দেয়ার' সমতুল্য। তারপরও হুজুরের স্নেহধন্য ছাত্র হিসাবে ও হুজুরের বড় ছাহেবজাদা মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল ছাহেবের অনুরোধে ক্ষুদ্র এ প্রয়াস।

ইলমে হাদীসের ক্ষণজন্মা এ মহাপুরুষ বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেষা জকিগন্জ উপজেলার রারাই গ্রামে ১৯৩৪ ঈসায়ী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাজীবনের প্রতিটি ধাপে মেধা তালিকার শীর্ষে অবস্থান করে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেন। ১৯৫৯ইং সালে মহান শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রথমে ইছামতি দারুল উলুম সিনিয়র কামিল মাদ্‌রাসায় অতঃপর ১৯৬৩ইং সালে ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ৭ মাস যেতে না যেতেই ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর নির্দেশে সৎপুর কামিল মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসাবে যোগদান করেন। এখান থেকেই শুরু হলো তাঁর হাদীসের খেদমত।

সৎপুর কামিল মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসাবে হুজুরের যোগদান ছিল অত্যন্ত বরকতময় ও ঐতিহাসিক একটি ঘটনা। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই "আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর স্মারকগ্রন্থ ৬৪নং পৃষ্ঠায়" লিখেছেন- "১৯৬৩ইং সালের ১১ই এপ্রিল আমি ফুলবাড়ি মাদ্‌রাসায় যোগদান করি। সেখানে হাদীস জামাত চালু ছিলনা বলে ফাযিল পর্যন্ত পড়াতাম। ৭ মাস পর ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ আমাকে বললেন, 'তুমি সৎপুর মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসাবে পড়াতে যাও।" কিন্তু জায়গাটি অনেক দূর ও আমার নিকট অপরিচিত হওয়ায় আমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম। হঠাৎ একদিন ছাহেব কিবলাহ আমার লজিং বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন এবং ধমক দিয়ে আমাকে বললেন, 'তোমার যা কিছু লাগে আমি দিব, তুমি গোটারগ্রামী মুহাদ্দিস ছাহেবকে নিয়ে সৎপুর মাদ্‌রাসায় পড়াতে যাও। এর এক সপ্তাহ পর আমি সৎপুর মাদ্‌রাসায় হাজির হলাম এবং হাদীসের খেদমত শুরু করলাম। কিন্তু বিলম্বের কারণে মনে মনে অনুতাপে ভুগছিলাম। কিছুদিন পর গ্রীষ্মকালীন ছুটি হলে বাড়িতে আসলাম এবং খাদিমানি

ছাহেবকে নিয়ে ছাহেব কিবলাহকে দেখতে গেলাম। গরমের দিন দুপুরের খাবার খেয়ে হযরত ছাহেব কিবলাহ বাহিরের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাঁর খেদমত করতে লাগলাম। তখন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাকে জোর করে সৎপুর মাদ্‌রাসায় পাঠালাম। আসলে আমি এক পেরেশানির মধ্যে পড়েছিলাম। কারণ সৎপুর মাদ্‌রাসায় কামিল ক্লাস আমিই শুরু করিয়েছি। সৎপুর মাদ্‌রাসার মুহতামিম (প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ) ছাহেব ভাবুক মানুষ। তিনি কাউকে খোঁজ করবেন না। আমাকেই মুহাদ্দিস সংগ্রহ করে দিতে হবে (কিন্তু আমি কাউকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না)। এমতাবস্থায় একদিন কাতর মনে বসে ছিলাম, হঠাৎ দেখি আল্লাহ তায়ালা চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন, দেখলাম হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ রেখেছেন। আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! 'স্বপ্ন দেখে বড় সাধ করে সৎপুর মাদ্‌রাসায় হাদীসের ক্লাস খুলেছি। পড়ানোর জন্য মুহাদ্দিস পাচ্ছিনা। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙুল মোবারক দিয়ে ইশারা করলেন, বেআদবীর ভয়ে আমি সম্পূর্ণ না ঘুরে চোখ ফিরিয়ে দেখি আমার পিছনে তুমি বসা। তাই অনেকটা জোর করেই তোমাকে সৎপুর পাঠিয়েছি। তৎক্ষণাত আমি কদম শরীফ ধরে আরজ করলাম, আমি বুঝতে পারিনি, যেতে বিলম্ব করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন।" (সংক্ষেপিত) এভাবে সূচিত হলো সৎপুর মাদ্‌রাসায় হাদীসের চর্চা।

সর্বজন বিদিত যে, সৎপুর দারুল হাদীস একটি মকবুল মাদ্‌রাসা। মদিনাওয়ালার অনুমতিক্রমেই শুরু হয় এর যাত্রা। প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা গোলাম হোসাইন (রহঃ) নিজে ছিলেন এক আশিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অপরদিকে তাঁর মুর্শিদদ্বয় যথাক্রমে পীর হামিদ উল্লাহ ছাহেব কাইমগঞ্জী ছাহেব (রহঃ) ও শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহঃ) দ্বয়ের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় মাদ্‌রাসাটি কামিল স্তর পর্যন্ত পৌঁছা ও হাদীসের শিক্ষা চালু হওয়া ছিল অবধারিত। আর এ মহান কাজটি সুসম্পন্ন হয় যামানার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ'র মাধ্যমে। তিনি একাধারে ১৯৭৪ইং সাল পর্যন্ত মুহাদ্দিস হিসাবে সৎপুর মাদ্‌রাসায় এ মহান দায়িত্ব পালন করেন। এ মাহেন্দ্রক্ষণে আরো যারা সৎপুর মাদ্‌রাসায় হাদীসের আলো বিতরণ করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন- আল্লামা রফিক আহমদ ছাহেব (রহঃ), আল্লামা ইজ্জত উল্লাহ ছাহেব (রহঃ), আল্লামা ফাযিল আব্দুল্লাহ ছাহেব (রহঃ) ও আল্লামা আব্দুল জব্বার গোটারগ্রামী হুজুর (রহঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। এ সময়টি ছিল মাদ্‌রাসার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। তখন মাদ্‌রাসার সর্বত্র প্রবাহিত ছিল নবী প্রেমের এক অনন্য আবহ। এই অবস্থাকে কালজয়ী করে রাখতে আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর নিজেই একটি কাব্য রচনা করেছিলেন, যার প্রথম চরণ দু'টি হলো-

ইয়ে গোলামী বাগ হো ওর হামিদী গোলজার হো
এ লতিফি ফয়েজকা এক খুশনমা দরবার হো

(অর্থ্যাৎ, আল্লামা গোলাম হুসাইন সৎপুরীর এ বাগানই পীর হামিদ উল্লাহ ছাহেবের গুলজার, এটাই লতিফি ফয়েজসিক্ত এক নন্দিত দরবার)

সৎপুর কামিল মাদ্‌রাসা হলো আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বহুস্মৃতির ঐতিহাসিক স্মারক। মাদ্‌রাসার ইতিহাস তাঁকে বাদ দিয়ে রচনা করা অসম্ভব। মাদ্‌রাসার সমৃদ্ধ কুতুবখানাটি আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। কুতুবখানার প্রতিটি বইয়ে তাঁর হাতের পরশ লেগে আছে। তিনি মুহাদ্দিস হিসাবে মাদ্‌রাসায় যোগদানের সময় মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ আমার ওয়ালিদ ছাহেবের ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, যখন যে কিতাব চাইবেন, তিনি যেন সে কিতাব সংগ্রহ করে দেন। এ সুবাদে কামিল জামাতের সিহাহ ছিত্তার মূল্যবান শরাহগুলো এবং অন্যান্য বিষয়ের দূর্লভ কিতাবাদির একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা গড়ে উঠে। কিতাব পড়ার প্রতি হুজুরের আগ্রহ ছিল অসীম। সময়-সুযোগ পেলেই তিনি কিতাব পড়ায় মগ্ন থাকতেন। আজকাল উলামায়ে কেরাম কিতাব পড়া থেকে দূরে থাকায় সমাজে মুহাক্কিক আলিমের অভাব দেখা দিয়েছে। আমি বহুবার দেখেছি হুজুর অসুস্থ অবস্থায়ও শুয়ে শুয়ে কিতাব পড়ছেন। হুজুরের এ আদর্শটি যদি আমরা লালন করতে পারি তাহলে সমাজ থেকে বহু ফিৎনা সহজে নির্মূল হয়ে যাবে।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের ইলমি মিহারাত ছিল আকাশছোঁয়া। সকল ঘরানার আলিমগণের নিকট তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল হিমালয়সম উচ্চতায়। কোনো মাসয়ালা বা বিষয়ে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বক্তব্যে কেউ দ্বিমত পোষণ করতেন না। সম-সমায়িক কালে তাঁর মতো সুযোগ্য আলিম এতদঞ্চলে কেউ ছিলনা। বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম প্রফেসর আব্দুল মান্নান ছাহেব (রহঃ) একদিন আলাপচারিতায় বলেছিলেন, তিনি প্রথমবার মাদ্‌রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার পর বোর্ড কমিটি পূর্নগঠন করতে গিয়ে সিলেটের একজন আলিমকে সদস্য করার চিন্তা করলেন। আর সে পদের জন্য তিনি আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকেই যোগ্য বলে বোর্ড সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ইলমে হাদীসের এক কিংবদন্তি ছিলেন। তাঁর দারসে যারাই বসেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আলোকিত মানুষ হিসাবে কবুল করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আল্লামা ইরশাদ হোসাইন গোয়াহরী (রহঃ), আল্লামা আব্দুল হাই ছাতকী হুজুর (মা.জি.আ), আল্লামা রইছ উদ্দিন হামজাপুরী (রহঃ) ও আল্লামা মুফতি আব্দুল খালিক ছাহেব (রহঃ)সহ অসংখ্য গুণীজন। হুজুরের ছাত্ররা বাংলাদেশসহ ইউরোপ-আমেরিকার বড় বড় প্রতিষ্ঠানে হুজুরের ইলমি ফয়েয লাভ ও তাঁর মুবারক সনদে যুক্ত হতে হুজুরকে দিয়ে হাদীস জামাতে সবক প্রদান করতেন। হুজুরের সবক অনুষ্ঠানে বসার সৌভাগ্য আমার অনেকবার হয়েছে। হুজুরের গোছালো ও সাবলীল বক্তব্য আমাদেরকে মুগ্ধ করত। মনে হতো হুজুরের প্রতিটি কথায় মুক্তা

ঝরছে। হুজুরের সবক অনুষ্ঠানে প্রথমেই "মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত" হাদীস বর্ণনা করতেন। হুজুর ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বেও অসুস্থ অবস্থায় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষককে "মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত" হাদীসের সনদ প্রদান করেছেন। আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বহমুখি খেদমাত ও তাঁর মহান গুণাবলী স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এক কথায় বলতে গেলে হুজুর ছিলেন সকল গুণের আকর। কবির ভাষায় বলতে হয়-

গুলিস্থাঁ মে জা-কর হর এক-গুলকো দেখা
না তেরিছি রঙ্গত না তেরিছি বু মিলা

(বাগানে গিয়ে সকল ফুলকে পরখ করলাম, না তোমার মতো রং না তোমার মতো সুবাস পেলাম)

এ মহান মনীষীর কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। প্রথমত আমি হুজুরের ছাত্র। আমার উপর তাঁর অনেক এহসান রয়েছে। হুজুর যখন সৎপুর মাদ্‌রাসায় আগমন করেন, আমি তখন শিশু বয়সের ছিলাম। বুঝার মতো বয়স যখন হয়, তখন থেকে সবার মুখে মুখে তিনজন মনীষীর নাম শুনতাম। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ, শায়দা ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ ও মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ। তখন থেকে এই নামগুলো হৃদয়ে মিশে আছে। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর সপরিবারে আমাদের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। হুজুরের বড় ছাহেবজাদী ও দুই ছাহেবজাদা মাওলানা হেলাল ও বেলাল তখন ছোট ছিলেন। হুজুর আমাদেরকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি আমার ওয়ালিদ ছাহেব (রহঃ)'র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। দ্বিতীয়ত আমার আব্বাজানের ইন্তেকালের পর মাদ্‌রাসায় বহুমুখী সংকট দেখা দিলে, সকলের অনুরোধে ১৯৭৬ইং সালে হুজুর সৎপুর কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। তখন নানা কারণে আমি অন্য প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছিলাম। হুজুর একদিন আমাকে বললেন, নুমান! আমি তোমার বাবার প্রতিষ্ঠানে জকিগন্‌জ থেকে এসে পড়াই, আর তুমি অন্য প্রতিষ্ঠানে পড়, এটা দেখতে বড় বেমানান লাগে। সেদিন এ কথাটি আমাকে এতো প্রভাবিত করেছিল যে, সপ্তাহ যেতে না যেতেই আমি দাখিল নবম শ্রেণিতে এসে ভর্তি হলাম। তৃতীয়ত ১৯৯৫ইং সালে সৎপুর মাদ্‌রাসায় আরেকটি সংকট দেখা দিল। আমি তখন মাদ্‌রাসায় প্রভাষক হিসাবে কর্মরত। এ সংকটটি নিরসন করতে শিক্ষক, ছাত্র ও এলাকাবাসী সবাই গলদঘর্ম হয়ে পড়লেন। এহেন পরিস্থিতিতে হুজুরের ঘনিষ্ঠ দু'জন ব্যক্তি উপশহরস্থ হুজুরের জামাতা এমাদ উদ্দিন ছাহেবের বাসায় মাদ্‌রাসার ঘনিষ্ঠজনদেরকে নিয়ে হুজুরের শরণাপন্ন হলেন। হুজুর আমাদেরকে অল্প কথায় কিছু নসিহত করলেন। তাতেই সংকটটি অলৌকিকভাবে কেটে গেল। এরকম হুজুরের উপকারভোগির সংখ্যা গণনা করে শেষ করার নয়।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ছিলেন ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর শীর্ষস্থানীয় খলিফাগণের অন্যতম। ইলমে হাদীসের মতো তরিকতের জগতেও তিনি ছিলেন অন্যতম এক দিকপাল। অসংখ্য মানুষ হুজুরের মাধ্যমে আলোকিত জীবনের অধিকারী হয়েছেন। দেশ ও বিদেশে দাওয়াতি কাজে মুহাদ্দিস ছাহেব ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর অনুসঙ্গী ছিলেন। তিনি ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর হাতেগড়া সংগঠন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ'র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হিসাবে দীর্ঘদিন দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দেন। হুজুরের কর্মবহুল জীবন ছিল মুসলিম উম্মাহের জন্য এক মডেল। হুজুর আজ আমাদের মধ্যে না থাকলেও চিরকাল বেঁচে থাকবেন তাঁর কর্মে। কথায় আছে "কীর্তিমানের মৃত্যু নেই" তাঁরা পরপারে গেলেও থাকেন অমর! তাঁদের আলোকিত জীবন জাতিকে করে আলোকময়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ রাহবারকে যেন জান্নাতের আলা মাকাম দান করেন। আমীন!

লেখক: অধ্যক্ষ, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট।

ফখরুল মুহাদ্দিসীন, উস্তাযুল উলামা
শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুন নূর

যুগে যুগে অগণিত নবী রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে রাব্বুল আ'লামীন এ জগতবাসীকে তাঁর পরিচয় এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মহান দায়িত্ব পালন করিয়েছেন। এতে বনী আদম নিজ পরিচয় এবং তাঁর ফাইন্যাল ডেস্টিনেশন জান্নাত সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। সর্বশেষ ও সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে যেহেতু নবী রাসূল প্রেরণের দ্বার চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়, তাই ওয়ারিশুল আম্বিয়া হিসেবে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম কিয়ামত পর্যন্ত এ গুরু দায়িত্ব পালন করবেন। এরই ধারাবাহিকতায় যুগের চাহিদা পূরণে অনেক মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ উলামায়ে কিরাম নায়েবে নবী হিসেবে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে যুগে যুগে বিভিন্ন তাগুতী শক্তি ও বাতিল মতবাদ থেকে হেফাজত করে সীরাতুল মুস্তাকীমের পথ নির্দেশনা দিয়েছেন, দিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও দেবেন। রাহমান রাহীমের অশেষ মেহেরবাণীতে খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমে ওহীর যে ক'জন বিদগ্ধ পণ্ডিতের জন্ম হয়েছিল তাঁদের অন্যতম হলেন শায়খুল হাদীস আল্লাম মো. হবিবুর রাহিমাহুল্লাহ। পূর্ব সিলেটের জকিগন্জ উপজেলার রারাই গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হলেন বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন মাওলানা মুমতায আলী রাহিমাহুল্লাহ, মহীয়সী মাতা হলেন আমিনা খাতুন।

বাল্যকাল থেকেই প্রখর মেধা ও চারিত্রিক মাধুর্যের কারণে আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব ছাত্র, শিক্ষক এবং এলাকাবাসীর প্রিয় পাত্রে পরিণত হন। বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান লাভ ও বৃত্তি প্রাপ্তি এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় আকর্ষণীয় ফলাফল তাঁকে জ্ঞানার্জনের পথে আরো বেশি আগ্রহী করে তুলে। পাশাপাশি আসাতিযায়ে কিরামের নেক নজর ও স্নেহ ভালোবাসায় তিনি কিতাব অধ্যয়নে ছাত্রজীবনেই অনন্য নজির স্থাপন করেন। গাছবাড়ি জামিউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি ছাড়াও কোন উস্তাযের কাছে কোন দুর্লভ কিতাব আছে তা তিনি চেয়ে নিয়ে আদ্যোপান্ত পড়তেন এবং উস্তাযগণের ইন্টারভিউ এর মুখোমুখি হতেন। অর্থাৎ, কিতাবটি পড়ে তিনি কি শিখেছেন এবং এব্যাপারে তাঁর কোন প্রশ্ন আছে কি না ইত্যাদি। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের ভাষায়- সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক আল্লামা ফজলে হক (ফাযিল ছাহেব) রাহিমাহুল্লাহ সাপ্তাহিক ছুটিতে বাড়িতে আসার সময় আমার জন্য আলিয়া মাদ্‌রাসার লাইব্রেরি থেকে নতুন কোন কিতাব নিয়ে আসতেন, আর আগের সপ্তাহে দেয়া কিতাব ফেরত নিতেন। প্রতি সপ্তাহে কিতাব

ফেরত দেয়ার সময় এ কিতাব সম্পর্কে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখতাম। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মধ্যে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসার লাইব্রেরি একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি হিসেবে বিখ্যাত ছিল।

ইতিপূর্বে এ মহান মনীষীর জীবনী থেকে আমরা অবগত হয়েছি যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইশারায় মুহাদ্দিস হিসেবে তিনি হাদীসে নববীর খিদমাত শুরু করেছেন। তিনি যেসব প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেছেন সব জায়গায়ই তাঁর অধ্যাপনা, আমল আখলাক, ব্যবহার ও চারিত্রিক মাধুর্যের স্মৃতি আজ অবদি বিদ্যমান। আরব আমিরাতের বিচার বিভাগ থেকে বিদায় নিয়ে যখন দেশে ফেরে পুনরায় ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার দায়িত্বভার গ্রহণ করে অধ্যাপনা শুরু করেন সে সময়ের একজন নগণ্য ছাত্র হিসেবে হুজুরকে যেরকম দেখেছি সেই স্মৃতিচারণই হলো এই নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

মুহাদ্দিস হিসেবে ইলমে হাদীসের অধ্যাপনায় তাঁর তুলনা তিনি নিজে। সমসাময়িক অনেক মুহাদ্দিসের ক্লাসে বসার সুযোগ আমার হয়েছে, কিন্তু আমাদের মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরে দারস সব সময়ই ছিল ব্যতিক্রম। সিহাহ সিত্তার যেকোন কিতাব দারস দেয়ার সময় পঠিত হাদীসটি অন্য কোন কোন কিতাবে আছে, উক্ত হাদীস কে কোন বিষয়ে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এ বিষয়ে উত্থাপিত যেকোন প্রশ্ন এবং এর জবাব, মাযহাবী ইখতিলাফ, বিশেষ করে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের গবেষণা প্রসূত সিদ্ধান্ত ; ফিকহি ও আকাঈদি মাসআলার ক্ষেত্রে রাজেহ (অগ্রগণ্য) মত এবং আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার সমাধানে উক্ত হাদীসের দিক নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় স্থান পেতো। এ যেনো জ্ঞানের জগতে নতুন গবেষণার দ্বার উন্মোচন করে দেয়া। ছাত্রদেরকে তিনি সব সময় বেশি বেশি বিভিন্ন বিষয়ের কিতাব অধ্যয়নের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। হুজুর যখন যে কিতাব পড়ার কথা বলতেন সে কিতাবের বিষয়বস্তু এবং লেখক সম্পর্কে আকর্ষনীয় ভাষার সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট ধারণা দিতেন, ফলে আদিষ্ট ব্যক্তি নিজে থেকেই কিতাবটি পড়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতো।

হুজুর পোষাক পরিচ্ছদে যেমন সৌখিন ও পরিপাটি ছিলেন ঠিক তাঁর আচরণও ছিল মনমুগ্ধকর। তাছাড়া খুবই উন্নত মানের আতর ব্যবহারের সুন্নতী অভ্যাস ছিল নিয়মিত।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি ছাত্র ও শিক্ষকগণের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও আর্থিক সমস্যাবলী একান্তভাবে শ্রবণ করে যথাযথ সমাধান করে দিতেন, যাতে লেখাপড়ার উপর এর কোন প্রভাব না পড়ে। আনজুমানে মাদারিসে আরাবিয়ার চেয়ারম্যান হওয়ার সুবাদে হুজুর কোন কোন মাদ্‌রাসায় শিক্ষক নেই সেখানে উপযুক্ত শিক্ষক দেয়ার ব্যবস্থা করা, কোথাও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবার কোথাও মাদ্‌রাসার শিক্ষক, কমিটি বা এলাকাবাসীর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দিলে সব পক্ষকে নিয়ে একান্তে বসে এর সম্মানজনক সমাধান করে দেয়া, এসব যেনো তাঁর রুটিন

ওয়ার্ক ছিল।

কালিগনজ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সালিশ বৈঠকের ক্ষেত্রে বিবাদমান উভয় পক্ষের আমানত হুজুরের নিকট রাখা হতো। হুজুর এলাকার মাতব্বর ব্যক্তিগণকে ডেকে এনে সমস্যার ইনসাফ ভিত্তিক সমাধানে উদ্বোদ্ধ করতেন। এ ক্ষেত্রে হুজুর কোন সমাধান দিলে বিবাদমান পক্ষসমুহ আন্তরিকভাবে তা মেনে নিতেন। এমনকি জকিগন্জ কোর্ট থেকে কোন কোন সময় তালাক অথবা ফরাইজি সম্পত্তি বিষয়ক কোন কোন মামলা হুজুরের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হতো। তিনি শরীয়া ভিত্তিক সমাধান দিতেন। এতে উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে কোর্টে আপোষনামা দাখিল করে মামলা নিস্পত্তি করে নিতেন। উলামায়ে কিরাম অথবা মুফতি সাহেবগণ জটিল কোন মাসআলায় আটকা পড়লে হুজুরের সাথে আলোচনা করে এর সমাধান বের করতেন। এ ক্ষেত্রে ভিন্ন মাসলাকের উলামাগণও হুজুরের দেয়া সমাধান শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিতেন। উলামায়ে কিরামের উত্তাপিত জটিল কোন বিষয়ের সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি নিজের মতামত ব্যক্ত না করে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির রেফারেন্স উপস্থাপন করতেন, ক্ষেত্র বিশেষে কিতাবের নাম এমনকি অধ্যায় বলে দিয়ে সমাধান খুঁজে বের করার নির্দেশনা দিতেন।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর মাদ্‌রাসার ক্লাস টাইমে কোথাও কোন মাহফিলে সাধারণতঃ যেতেন না। ক্লাস টাইম পরে যেতেন, আবার পরদিন ক্লাস টাইমের আগেই মাদ্‌রাসায় হাজির হতেন। হুজুরের অভ্যাস ছিল কিতাব মুতালাআ না করে ক্লাস নিতেন না। তাই প্রয়োজনীয় কিতাব সাথে রাখতেন। সফরের সময় গাড়িতে বসেই মুতালাআ করতেন। মাহফিল শেষে রাতে বিশ্রামের পূর্বেও কিতাব পড়তেন। ওয়াজ মাহফিলে হুজুরের বয়ান থেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে মাদ্‌রাসার ছাত্র শিক্ষক, আলিম উলামা বেশি উপকৃত হতেন। তাই দেখা যেতো মাহফিলে বসে কেউ কেউ জরুরী কথা বা কিতাবের রেফারেন্স নোট করে নিচ্ছেন। হুজুরের এক দেড় ঘন্টার বয়ানে কারো কারো সারা বছরের ওয়াজের খোরাক হয়ে যেতো।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের একটি বিশেষ গুণ হলো তিনি সব সময় তাঁর আসাতিযায়ে কিরামের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কথায় কথায় কোন উস্তাযের প্রসঙ্গ এলে খুবই আদব ও সম্মানের সাথে তাঁদের আলেচনা করতেন। বিশেষ করে তাঁর পীর ও মুরশিদ শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, আদাব ও ইহতেরাম কতটুকু ছিল তা কেবল অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার বিষয়, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ছাহেব কিবলার অনুমতি ও নির্দেশনা ছাড়া তিনি ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা মাদ্‌রাসা বিষয়ক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। কোন বিষয়ে ছাহেব কিবলাহ কোন নির্দেশনা দিলে সেটি সর্ববস্থায় অগ্রাধিকার দিতেন।

সম্ভবত ২০০০ সালের কথা। হুজুরের সাথে প্রথমবারের মত হজ্জে যাওয়ার সৌভাগ্য

হয়েছিলো। হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এলো। হুজুর পূর্ব থেকেই কাফেলার সবাইকে মদীনা শরীফের আদাব ও করণীয় সম্পর্কে গুরুত্বের সাথে তা'লিম দিলেন। প্রিয় নবীর প্রিয় ভূমি মদীনা তাইয়্যিবায় পৌঁছে আসবাবপত্র হোটেলে রেখে হুজুরের সাথে মসজিদে নববীতে ইশার জামাতে শরীক হলাম। জীবনে প্রথমবার এসেছি তাই একা না গিয়ে হুজুরের সাথে রওজায়ে আতহারে সালাত সালাম পেশ করার প্রত্যাশায় অপেক্ষায় রইলাম। মনে প্রবল আগ্রহ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাবীবে খোদার দরবারে হাজিরা দেবো। সম্ভবতঃ হুজুর আমাদের মনের অবস্থা উপলব্ধি করলেন। শেষ পর্যন্ত ইশার নামায শেষ করে হুজুর হোটেলে চলে গেলেন। হুজুরের সাথে আমরাও চলে গেলাম। মনের আবেগে বারবার হুজুরের রুমে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু মুখ খুলে বলতে পারছি না। হুজুরের রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি কখন জানি হুজুর যিয়ারতের জন্য বের হন। হুজুর বের হলেন না, বরং আমাদের জানিয়ে দিলেন, সফর জনিত কারনে বেশ ক্লান্ত হয়েছো, কিছু সময় ঘুমিয়ে বিশ্রাম নাও। তাহাজ্জুদের সময় হুজুরের খাদিম এসে বললেন, হুজুর ডাকছেন। তাড়াতাড়ি রুম থেকে বের হয়ে গেলাম। বললেন, ফজরের নামায শেষে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে সালাম জানাতে যাবো। ঠিক সময়ে হুজুর আতর ব্যবহার করলেন, সাথীদেরও দিলেন। তারপর রুম থেকে বের হলেন। পথে যেতে যেতে কিছু সাদাকা করলেন। আমাদেরকে সাথে নিয়ে চূড়ান্ত বিনয় ও আবেগঘন পরিবেশে রাহমাতুল্লিল আ'লামীনের দরবারে সালাত সালাম পেশ করে মুনাজাত করলেন। পরবর্তীতে অনুসন্ধান করে জানলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি পাওয়ার পর মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রওজা আতহারে হাজিরা দিয়েছেন। বিষয়টি জানার পর রাতে না যাওয়ার কারনে মনের মাঝে যে পেরেশানী ছিল নিমিষে দূর হয়ে গেলো। এটিও পরিস্কার হয়ে গেলো একজন সত্যিকার আল্লাহ ওয়ালা আশিকে রাসূলের রওজা শরীফে হাজিরা দেয়া আমাদের মত সাধারণ উম্মতের হাজিরার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহপাক হুজুরের উসিলায় আমাদেরকে সত্যিকার হুব্বে রাসূল নসীব করুন।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে যে পথ মত ও আদর্শের উপর রেখে গেছেন আমরা যেনো জীবনভর এর উপর অটুট থাকতে পারি। হুজুরের রেখে যাওয়া বহুমূখি খিদমাতের সাথে জড়িত থেকে কিয়ামতের দিন যেনো হুজুরের সাথে আল্লাহর হাবীবের লিওয়ায়ে হামদ এর নীচে স্থান পাই।

লেখক: প্রিন্সিপাল, শাহজালাল লতিফিয়া মাদ্‌রাসা, নিউজার্সি, আমেরিকা; সাবেক অধ্যক্ষ, ফেঞ্চুগনজ মুহাম্মাদিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, সিলেট।

رأيت جمالا في كماله

أبو سهيل محمد فخر الهدى

،باسمه سبحانه وسعدانه، والصلاة والسلام على ذي المجد والمكانة

،أما بعد

كان يزورنا ونحن صغار، وكان يلطف بنا ونحن كبار، وكان يعرف بالسيد المحدث عند الجميع خلال الديار.

إنه شيخنا شيخُ الحديث العلامة محمد حبيب الرحمن، رضي عنه وعنا ربنا رب الأكوان، زارنا ذات مرة ونصحني بطلب العلم وحفظ القرآن ، فالتحقت بمدرسة للتحفيظ فرزقنيه الرب المنان، والحمد كله لله الملك الديان، كما أشكر السيد المحدث يعم عليه وعلى ذويه وعلينا الإحسان.

و بعد أن قضيت سنوات في الدرس والتدريس توجهت إلى خارج البلاد، فشهدت تفوقه في العلم والحلم في قلوب العباد.

ومضت الأيام والشهور والسنوات، والتقيت به بحسن الحظ في منبع الوحي والبركات، في مكة المكرمة في أشهر معلومات، فبايعته في سفر الحج ونحن في رحمة رب البريات

ما زلت متعلقا به رغم قلة اللقاءات، والسيد المحدث في أواخر أيامه مهتما بالخدمات والمسؤوليات ، وفي يوم من الأيام سمعت عن مرضه الأخير فقصدت أن أزوره فلم أوفَّق رغم جدية المحاولات ، فأرسلت شقيقي أن يبلِّغ عني السلام والتحيات، وكلَّمته لبضع دقائق على الهاتف مباشرة وكانت هي آخر المكالمات.

وكانت حياته كلها لنا دروسا في توجيهاته، وكان فريدا في معاملاته حتى في بسماته، كما كان متفوقا في جميع تعليماته وإرشاداته، فرأيت والله جمالا في كماله.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفيض عليه وعلينا بكرمه العميم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واسكنه فسيح الجنان برحمتك يارحيم ويارحمان. اللهم آمين.

দ্বীনের মহান মুবাল্লিগ
আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ ছরওয়ারে জাহান

ইসলাম ধর্ম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মুবাল্লিগে কেরাম ইসলামের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই দ্বীনের তাবলীগ আরম্ভ হয়েছে। তাওহীদ ও রিসালতের অমিয় বাণী বিশ্বময় প্রচার করতে সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণে প্রতিটি যুগে যুগে আওলিয়ায়ে কেরাম, মুহাদ্দীসীন ও উলামায়ে কেরাম দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখে আসছেন। তাবলীগ প্রধানত দুই প্রকার। প্রথমতঃ বিধর্মীদের নিকট দ্বীনের তথা কালিমার দাওয়াত পৌঁছানো। দ্বিতীয়টিঃ সাধারণ মুসলমানের মধ্যে ইসলামী কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ বিষয়টি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে পরিচালিত হয়ে আসছে। যেমন মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও সৈয়দ আহমদ বেরলভীর তাজদিদী আন্দোলন সহ ত্যাগী উলামায়ে কেরাম এর খেদমত।

আলোচ্য নিবন্ধে তেমনি একজন মহাপুরুষের বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করবো। তিনি হলেন সিলেট জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল জকিগন্জ উপজেলার রারাই গ্রামে জন্মগ্রহণকারী যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস প্রথিতযষা আলেম, সূফী, সাধক আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। জীবনভর যিনি তাবলীগে দ্বীন তথা সর্বস্তরের মানুষের ইসলাহে পরিশ্রম করে গেছেন। উপমহাদেশেরে শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ রইছুল কুররা পীরে কামিল আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর তিনি একজন প্রথম সারির খলিফা ছিলেন। মুর্শিদের নির্দেশে এবং দিক নির্দেশনায়ই আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ বৃহত্তর সিলেটসহ ইউরোপ আমেরিকা, ভারত ও মধ্য প্রাচ্যে তাবলীগে দ্বীনের মেহনত করে গেছেন। তিনি একাধারে একজন শীর্ষ স্থানীয় কারী ও আশেকে রাসূল ছিলেন।

একজন মুবাল্লিগের যে কয়টি গুণ থাকা অতি প্রয়োজন। তার সবকটি গুণ আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

ইলম ও হেকমত

সকল নবীগণ ছিলেন ইলম ও হেকমতে পরিপূর্ণ। 'হিকমত শব্দের অর্থ হলো যাবতীয় বিষয় বস্তুকে যথার্থ জ্ঞান দ্বারা জানা।' আমাদের নবী ইলমে ওহীর মাধ্যমে যে হেকমত অর্জন করেছেন তা ছাহাবায়ে কিরামকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং পর্যায়ক্রমে তা আজ অবদি যাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছে তারাই একজন পরিপূর্ণ ইলম ও হিকমতের ধারক

হয়েছেন। এর মধ্যে মুহাদ্দিস সাহেব রাহিমাহুল্লাহ অন্যতম। তাঁর ইলম ও হিকমত সম্পর্কে ছাত্র, শিষ্য ও মুরিদিন এমনকি ভিন্ন মতাবলম্বীরা আস্থাবান ছিল। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও একজন মুবাল্লিগ ও দাঈর প্রধান ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেবের মধ্যে ছিল। প্রজ্ঞাবান আলিম ছাড়া কখনই দ্বীনের দাওয়াত ও ইসলাহের কাজ করা যায় না। কারণ জ্ঞানের স্বল্পতা বা অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, দাওয়াত, তাবলীগ ও ইসলাহের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

উত্তম চরিত্র

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরিত হয়েছি"। আল্লাহ বলেন, "আপনি অবশ্যই সুমহান চরিত্রের অধিকারী"। আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণ অনুসারী। তিনি তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা অন্যকে আকর্ষণ করেছেন এবং সকলের হৃদয়ে ঈমানের দীপ্ত শিখা প্রজ্বলিত করতে পেরেছিলেন তিনি অবশ্য উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে পেরেছিলেন।

তাঁর কথাবার্তা, লেন-দেন, উঠা-বসা, চালচলন, শিক্ষাদান, ওয়াজ- নসিহত ও ইনসাফপূর্ণ সদাচরণ ছিল উত্তম আচরণের বহিঃপ্রকাশ। শালীনতা বিবর্জিত আচরণ তাঁর কাছ থেকে কখনই প্রকাশ পায়নি, এমনকি অন্যজন বিরক্ত হয় বা ক্ষোভ সৃষ্টি হয় এমন কাজ তিনি কখনই করেননি।

ধৈর্য ও স্থিরচিত্ততা

ধৈর্য ও স্থিরচিত্ততা ছাড়া যেমন কোন কাজেই সফলতা অর্জন করা যায় না তেমনি ধৈর্য না থাকলে অনেক পাপ কাজ থেকেও বিরত থাকা যায় না। আমরা যারা হুজুরকে একান্ত কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে তারা বলতে পারেন আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেবের ধৈর্য ও স্থির চিত্তটা কেমন ছিল। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সব অন্যায় সহ্য করে নেয়া হবে এবং যে যা বলুক মুখ বুজে মেনে নেয়া হবে। মূলতঃ সকল ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা অবলম্বন করা হুজুরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

আগে নিজে করা পরে অন্যকে বলা

আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদেরকে ভুলে যাও"। কোন কাজ নিজে না করে অন্যকে নির্দেশ দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। হুজুর আগে সালাম দিতেন, আগে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতেন, আগে উশর দিতেন পরে উশরের ওয়াজ করতেন।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেবের তাবলীগের আলোচনার পরিসর অনেক বড়। হুজুরের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাহ হয়েছে। তন্মধ্যে উলামায়ে কেরামের সংখ্যা

বেশি। কিতাবের দারসের মাধ্যমে হুজুর তাবলীগে দ্বীনের কাজ করতেন। অধ্যয়নরত ছাত্ররা হুজুরের দারসে বসে পরিবর্তন হয়ে যেত। বছরজুড়ে হুজুর হাজার হাজার মাহফিলে বয়ান পেশ করতেন। শ্রোতামণ্ডলী অত্যন্ত মনযোগ সহকারে হুজুরের কুরআনের আয়াত ও হাদীসের বর্ণনাগুলো শুনতো এবং আমল করত। এ ছাড়া বিশেষ করে বিভিন্ন জায়গায় বোখারী শরীফের তাফসীর করতেন। অনেক দূর এলাকা থেকে আশিকে রাসূল হুজুরের মুখে হাদীসের অমিয় বাণী শোনার জন্য আগমন করত। একবার সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ কেন্দ্রীয় মসজিদে বৈরী আবহাওয়া ও ঝড় তুফানের মধ্যে নির্ধারিত তারিখে হুজুর আগমন করলেন, দূরের অনেকেই মনে করলেন হুজুর হয়তো আজ আর আসবেন না। প্রায় আট কিলোমিটার দূরে একজন আশিকে রাসূল জনাব সৈয়দ নুরুল আরেফিন (চোখে দেখতেন না) তিনিও মনে করলেন হুজুর হয়তো আজ আসবেন না। তন্দ্রাস্থলে উনার সামনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির হয়ে বললেন "হে নুরুল আরেফিন আপনি ঘরে বসে আছেন অথচ হবিবুর রহমান চলে এসেছেন।" হুজুরের আলোচনায় হাজার হাজার মানুষের জীবনের পরিবর্তন এসেছে। ইংল্যান্ডের শতাধিক জায়গায় হুজুর বয়ান করতেন, জিকিরের মাহফিল পরিচালনা করতেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত সিলেট শহরস্থ টিভি গেইট জামে মসজিদে দারসে বুখারীসহ খানেকা পরিচালনা করতেন। আজ থেকে ৩০/ ৪০ বছর আগে হুজুর বৃহত্তর সিলেটের দূর্গম এলাকায় কুরআন-হাদীসের মুহাব্বাতে এমনকি পায়ে হেঁটে মাহফিলগুলোতে অংশ নিতেন। ইসলাহি আলোচনা করতেন, আলেম উলামা, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের জন্য হুজুর ছোট বড় অনেক গ্রন্থ রচনা করে তাবলীগে দ্বীনের মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর তাবলিগে দ্বীনের সকল খেদমত যেন মহান আল্লাহর শাহী দরবারে কবুল হয় এই দোয়া করি।

লেখক: অধ্যক্ষ, চান্দাইর পাড়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, সিলেট।

ইলমে হাদীসের কিংবদন্তি সুপুরুষ এক মহান ব্যক্তিত্ব

অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আব্দুল আলীম

ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে হাদীস শরীফ। হাদীসের হুজ্জিয়ত (প্রামাণ্যতা) সম্পর্কে উম্মতের উলামাগণ একমত। হাদীস শরীফ ছাড়া কুরআন শরীফের অনেকাংশের মর্ম বুঝা অসম্ভব। হাদীস সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা যেখানে করা হয় তাকে ইলমুল হাদীস বলা হয়। ইলমে হাদীস এমন একটি বরকতি ও পূণ্যময় ধারা, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ থেকে সংরক্ষণ ও পরবর্তীতে তা ধারাবাহিকভাবে সংকলন হয়ে আসছে। যারা হাদীস চর্চা করেন তাদেরকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যেমন: হাদীস অধ্যয়ন শুরু করলে তালিবুল হাদীস, সদনসহ হাদীস বর্ণনা করলে মুসনিদ, 'মুহাদ্দিস' যিনি হাদীস বিষয়ে পারদর্শী, ছহি-জইফ হাদীসের পার্থক্য এবং হাদীসের কঠিন শব্দসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত। হাফিজে হাদীস, যার মুহাদ্দিস হওয়ার পাশাপাশি এক লক্ষ হাদীসের সনদ ও মতন মুখস্থ। হুজ্জত, যার তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ। হাকিম, যিনি সমস্ত বর্ণিত হাদীস সনদ ও মতনসহ অবগত। চূড়ান্ত পর্যায়ে আমিরুল মোমেনিন ফিল হাদীস, যিনি তার যুগে শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ হিসেবে পরিগণিত হন। যেমন- আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ আল মাদানী, যিনি আবুজ জানাদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইমাম শু'বা ইবন হাজ্জাজ, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ, তাঁরা এ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

ইলমে হাদীসের ধারক ও বাহক মহৎপ্রাণ সাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিলেন এবং ইলমে হাদীসের খেদমত করে গেছেন।

মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ তাঁর তারিখে ইসলাম গ্রন্থে একটি পরিসংখ্যান দিয়েছেন তা হল- বদর যুদ্ধে তিনশত তের জন সাহাবি, হুদায়বিয়ায় চৌদ্দশত জন সাহাবি, ফতহে মক্কার মধ্যে দশ হাজার সাহাবি, হুনাইনের যুদ্ধে বারো হাজার, তাবুকের যুদ্ধে চল্লিশ হাজার, বিদায় হজে নবীজির সাথে সত্তর হাজার এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেছালের সময় সাহাবিগণের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার জন।

এতসব সাহাবায়ে কেরাম এর মধ্যে হাদীস বর্ণনাকারি সাহাবার সংখ্যা সাড়ে সাত হাজার।

মুফতি আযম আল্লামা রফি উসমানি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাবে হাদীস গ্রন্থে হাদীস বর্ণনাকারি সাহাবির সংখ্যা এগারো হাজার উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তীতে তাবেঈনে এজাম, তবে তাবেঈনগণ ও আইম্মায়ে আহাদীসে নববীগণ ইলমে হাদীসের খেদমতে আত্মনিয়োগ করে উম্মতের জন্য এ বরকতি ইলমকে হিফাজত করে গেছেন।

কত মহিয়ান ব্যক্তিবর্গ তাঁদের উত্তরসূরি হিসেবে ইলমে হাদীসের ফয়েজ ও বরকত হাসিলের উদ্দেশ্য তাঁদের জীবন কুরবানি করে গেছেন, তন্মধ্যে ইলমে হাদীসের কিংবদন্তি সুপুরুষ হচ্ছেন আমাদের উস্তায মুহতারাম শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ (মুহাদ্দিস ছাহেব) অন্যতম। উক্ত নিবন্ধে মুহাদ্দিস ছাহেব নামে খ্যাত এ মহান মনীষীর ইলমে হাদীসের খেদমতের যৎসামান্য আলোকপাত করা হল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইলমে হাদীস একটি পূণ্যময়, বরকতি ও মাউরুসি ইলম। তাই মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর গতানুগতিক পন্থায় ইলমে হাদীস পড়ানো শুরু করেননি বরং তাঁর পীর ও মুরশিদ শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ'র নির্দেশ ও অনুপ্রেরণায় শুরু করেছিলেন। এ বিষয়ে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বর্ণনা হুবহু নিম্নে উল্লেখ করা হল-

'আমি ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর নির্দেশে হাদীসের খেদমত শুরু করেছিলাম। এ বিষয়ে তিনি যে ইশারা পেয়েছেন তা হাদীসের খেদমতে সম্পৃক্ত হওয়ার অনেক পরে আমি জানতে পারি। সৎপুর যাওয়ার পর গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হলে আমি বাড়িতে আসি। আমি ও খাদিমানী ছাহেব হযরত ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর সাক্ষাতে ছাহেব বাড়িতে যাই। আমার এবং খাদিমানী ছাহেবের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। রাস্তায় যেতে যেতে তাঁর সাথে আমার তর্ক হয়। তিনি আমাকে 'মুহাদ্দিস ছাহেব' বলে ডাকলে আমি তাঁকে বললাম আর একবার যদি আপনি এরকম করেন তাহলে আমি জবাব দেবো না। আমাকে কেউ এ নামে ডাকে না, আপনি আরেকটি উপাধি বের করবেন না!

যাই হোক, আমরা ছাহেব কিবলাহ'র খেদমতে হাজির হলাম, কদমবুসি করলাম। তিনি তাঁর খাদিম আলতাফ মিয়াকে ডাক দিলেন 'আলতাফ! ঘরে জানিয়ে দাও রারাইর মুহাদ্দিস ছাহেব এসেছেন, চা পানি ব্যবস্থা করার জন্য।' তখন খাদিমানী ছাহেব আমাকে হালকা খোঁচা দিয়ে বললেন, দেখেছেন 'মুহাদ্দিস ছাহেব' ডাক কিন্তু কবুল হয়ে গেছে। নাস্তার পরে ছাহেব কিবলাহ টঙ্গীঘরে তাশরিফ আনলেন। তখন আমি, খাদিমানী ছাহেব ও আরো কয়েকজন ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, শোনো, আমি সৎপুর দারুল হাদীস খুললাম, তোমাকে সেখানে খেদমতের সুযোগ দেওয়ার কারণ আছে। আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইশারা পেয়েছিলাম, ইশারা কি সেটাও পরে আমাকে বলেছিলেন। ছাহেব কিবলাহ বলেছেন, দারুল হাদীস খোলার পর মুহতামিম ছাহেব আমাকে অনুরোধ করলেন একজন মুহাদ্দিস যেন আমি নির্ধারণ করে দেই। কিন্তু আমি কাকে দেই, একজনই তো আছেন। আমি একটু পেরেশানিতে পড়ে

গেলাম কাকে দেওয়া যায় এখানে? এই পেরেশানির মধ্যে একদিন বাড়িতে থাকাবস্থায় কোন একসময় তন্দ্রাভাব চলে আসলো, দেখলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ এনেছেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ইশারায় আমি দারসে হাদীস চালু করেছি, এখন সেখানে হাদীস পড়ানোর জন্য কাকে খেদমতে দেবো সেটা নিয়ে পেরেশানিতে আছি, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুল মুবারক দিয়ে তোমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, উনাকে দিয়ে দাও, ভালো হবে। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি তুমি আমার পাশে বসা। এজন্যই তোমাকে আমি সেখানে হাদীসের খেদমতে পাঠিয়েছি।'

হাদীস শরীফের ফয়েজ ও বরকত মদিনা ওয়ালার পক্ষ থেকেই আসে। তাই মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর মাধ্যমে সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হতে পূর্ণ ইশারা পেয়ে হাদীসের দারস শুরু করেছিলেন। আরো কত হাদীস পড়ানেওয়ালা আছেন কিন্তু মুহাদ্দিস ছাহেব বলতেই একমাত্র আমাদের হুজুরকেই বুঝানো হত।

بے عشق نبی جسنے دیا درس بخاری * اتا ہے بخار اسکو بخاری نہین اتی

"নবীজির এশক ও মহব্বত ছাড়া যে বুখারি দারস দিবে তার মধ্যে শুধু উত্তাপ আসবে, কিন্তু বুখারির ফয়েজ ও বরকত আসবে না'

যাদের কাছে তিনি হাদীস অধ্যয়ন করে ইজাজাত ও সনদ লাভ করেছেন তারা হলেন-

১. **শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ, (১৯১৩-২০০৮)।**

গাছবাড়ি জামিউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ'র কাছে সরাসরি হাদীস শরীফ অধ্যয়ন সুযোগ পাননি। পরে অবশ্য আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ'র কাছে সহীহ বুখারি শরীফের প্রথম দিক থেকে কিছু হাদীস অধ্যয়ন করে সনদ ও ইজাজত গ্রহণ করেছেন।

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ যেহেতু তাঁর পীর ও মুরশিদ তাই তিনি সনদ গ্রন্থে হাদীসের সনদ অংশে ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ'র নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন। তাই এখানে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর তাঁর মুরশিদের প্রতি আকিদতমন্ধির বহিঃপ্রকাশ পেয়েছে।

গাছবাড়ি জামিউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় যাঁদের কাছে হাদীস অধ্যয়ন করে ইজাযাত ও সনদ লাভ করেছেন তারা হলেন-

২. **শায়খুল হাদীস আল্লামা ছইদ আলী রাহিমাহুল্লাহ, চারাবই (১৯০৭-১৯৬৪)।**

৩. **শায়খুল হাদীস আল্লামা শফিকুল হক বুলবুল রাহিমাহুল্লাহ, (১৯২৭-২০০১)।**

৪. **শায়খুল হাদীস আল্লামা ইদ্রিছ আহমদ শিবনগরী রাহিমাহুল্লাহ, (১৯২৪-২০০৭)।**

৫. **শায়খুল হাদীস মুফতি আল্লামা আব্দুল গণি রাহিমাহুল্লাহ (১৯২০-১৯৮৭)।**

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পর দেশ-বিদেশের বিজ্ঞ মুহাক্কিক-মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে ইলমে হাদীস অধ্যয়ন করে হাদীস শরীফের সনদ গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-

১. **মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান ছাহেব** রাহিমাহুল্লাহ'র উস্তায সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ বাহরুল উলুম আল্লামা মুহাম্মদ হোসেন সিলেটী, (১৮৯০-১৯৭৩)।

২. ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসার সাবেক হেড মাওলানা শায়খুল হাদীস সায়্যিদ মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান আল মুজাদ্দিদি আল বারাকাতি রাহিমাহুল্লাহ, (১৯১১-১৯৭৪), সনদ গ্রহণের সময় তাঁর মুরশিদ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

বাহরুল উলুম মুহাম্মদ হোসাইন সিলেটি রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ'র উস্তায।

উস্তায ও শারগিদের কি গভীর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা ছিল এ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর বর্ণনা করেন-

বাহরুল উলুম সিলেটি ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ প্রায় গর্ব করে বলতেন আমার প্রিয় শারগিদ সায়্যিদ আমীমুল ইহসান তাঁর حواشي السعدي علي مقدمة الدهلويه গ্রন্থে কয়েক স্থানে আমার নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে এক স্থান হল قال السخاوى ان للطبري كتابا مسمى بتهذيب الاثار এখানে নতুন ও পুরাতন সকল কপিতে ইমাম তাবারি এর স্থলে ইমাম তাবরানির নাম লেখা হয়েছে। বস্তুত ইমাম শামসুদ্দিন সাখাভি فتح المغيث গ্রন্থে তাবারি'ই উল্লেখ করেছেন। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে মুকদ্দমায় শায়খের একটি হাতের লিখা কপি রয়েছে। সেখানে ইমাম তাবারি লিখা হয়েছে ইমাম তাবরানি নয়। মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান ছাহেব লিখেন قد نبهنا عليه وقت الدرس شيخنا المحدث المحقق مولانا محمد حسين السلهتي

আমাদেরকে হাদীস শরীফ দারস দেওয়ার সময় আমাদের উস্তায বাহরুল উলুম

মুহাম্মদ হোসাইন সিলেটি রাহিমাহুল্লাহ বিষয়টি অবগত করেছেন।

এ দিকে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর যখন সিলেট থেকে ঢাকায় যেতেন, যাওয়ার সময় বাহরুল উলুম সিলেটি ছাহেব এর কোন সংবাদ নিয়ে গেলে মুফতি সাহেবের খেদমতে হাজির হওয়া মুহূর্তে প্রথমেই মুফতি ছাহেব বলতেন শাহ ছাহেব কা কিয়্যা খবর হ্যায়। শাহ ছাহেব দ্বারা তিনি ফুলতলী ছাহেব কিবলাকে বুঝাতেন। এরপরই জিজ্ঞেস করতেন, মেরে উস্তায ছাহেব ক্যা কিয়্যা খবর হ্যায়। যখন মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর বলতেন, মেরে পাছ বাহরুল উলুম ছাহেব নে এক খবর ভেযা হ্যায়। আমার এ কথা শুনার সাথে সাথেই মুফতি ছাহেব দাঁড়িয়ে যেতেন। আমাকে আর কোন কথা বলতে দিতেন না। যতক্ষণ না আমি তাঁর জায়গায় না বসি, আমি বসতে পীড়াপীড়ি করলে তিনি বলতেন الرسول كالمرسل। সংবাদ বাহক সংবাদ দাতার অনুরূপ। আগর মেরে উস্তায ছাহেব তশরিফ লে আতে উস্ক ময় মেরে জায়গা পর বয়ঠা দেতে। তখন الادب فوق الامر। হুকুম পালন সর্বোচ্চ আদাব এর দিকে খেয়াল করে মুফতি ছাহেবের নির্দেশে আমি তাঁর জায়গায় বসতাম। এবং মুফতি ছাহেব ছাত্রের মত দাঁড়িয়ে তাঁর উস্তাযের সংবাদ শুনতেন। সংবাদ বলা শেষ হলে আমি উঠে যেতাম আর তিনি তাঁর জায়গায় বসতেন। উস্তাযের প্রতি ছাত্রের আদবের এ বিরল দৃষ্টান্ত দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে যেতাম।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর বলেন, এ ঘটনা এক দিনের নয় কয়েকবার এমন ঘটনা ঘটেছে।

৩. শায়খুল হাদীস আল্লামা শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ, সিলেটি (১৯০৮-১৯৮১)।

৪. সুলতানুল উলামা সায়্যিদ আল হাবিব সালিম বিন আব্দুল্লাহ শাতিরী আল ইয়ামানী রাহিমাহুল্লাহ (১৩৫৯হিজরী-১৪৩৯)।

নবীজির যুগ থেকে হারামাইন শরিফাইন ইলমের প্রাণ কেন্দ্র হিসেবে বরিত হয়ে আসছে। ইতিহাসে সর্বশেষ ওফাতবরণকরী সাহাবি হযরত আবু তোফায়েল আমির বিন ওয়াসিলা আল লাইছি রাদিআল্লাহু আনহু মক্কা মোকাররমায় ১১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। বিশিষ্ট তাবেঈনগণ হারামাইন শরিফাইনে ইলমে হাদীসের দারস দিতেন। বিশিষ্ট তাবেঈ আতা বিন আবি রিবাহ মক্কা নগরীতে বসবাস করতেন। ইমাম আবু নুমান বিন সাবিত আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ পবিত্র হজ উপলক্ষে ইমাম আতা বিন আবি রিবাহ রাহিমাহুল্লাহ'র কাছ থেকে ইলমে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ ধারাবাহিকতায় মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফে বড় বড় শায়খদের জন্ম হতে থাকে। নিকট অতীতকালে মুহাদ্দিসুল হিজাজ, শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মদ আলাভী আল মালিকী আল মক্কী অন্যতম শীর্ষ আলিম ছিলেন। আমাদের উস্তায মুহতারাম শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান

রাহিমাহুল্লাহ (মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর) পবিত্র হজের সফরে মক্কা-মোকাররমা মসজিদুল হারাম এর সাবেক শিক্ষক শতাধিক গ্রন্থপ্রণেতা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম ড. শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ আলাভী মালিকী মক্কী রাহিমাহুল্লাহ, (১৯৪০-২০০৪) এর খেদমতে হাজির হন। এবং তাঁর কাছ থেকে ইলমে হাদীসসহ অন্যান্য ইলমের সনদ গ্রহণ করেন।

লন্ডন সফরকালে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর আরো দুইজন বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন এর সাক্ষাত লাভ করে তাদের কাছ থেকে সনদ গ্রহণ করেন। তারা হলেন- মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যশনাল এর প্রতিষ্ঠাতা বহুগ্রন্থ প্রণেতা পাকিস্তানের ডক্টর আল্লামা মুহাম্মদ তাহিরুল কাদরী হাফিযাহুল্লাহ, শায়খ ড. আসআদ মুহাম্মদ সাঈদ হানাফী আস-সাগিরজী দামেশকী আল হানাফী রাহিমাহুল্লাহ, (মৃত্যু- ১৪৩৪ হিজরী)।

উপরোক্ত বর্ণিত উস্তাযগণের বিবরণ তিনি তাঁর সনদগ্রন্থ তুহফাতুল লাবীব বি আসানীদীল হাবীব-এ উল্লেখ করেছেন।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর আগেরকার যুগের মুহাদ্দিসগণের অনুসরণে তুহফাতুল লাবীব বি আসানীদীল হাবীব গ্রন্থে ইলমে কিরাত, ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীরের বিভিন্ন কিতাবাদী ও ওযায়ীফা ইত্যাদির সনদ উল্লেখ করেছেন।

তাঁর সনদগ্রন্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি তাঁর উস্তাযগণের মাধ্যমে বর্তমান যুগে আলি সনদ (কম সূত্রে নবীজির সাথে সংযুক্ততা) অর্জন করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

তিনি ১৯৬৩ সালের ২৩শে নভেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের ১৪ই জানুয়ারি পর্যন্ত সৎপুর কামিল মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস, আবার ১৯৭৬ সালে সৎপুর কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ও প্রধান মুহাদ্দিস নিযুক্ত হন। সে সময় তাঁর কাছে অনেক আলিম উলামা হাদীস অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে আরব আমিরাতে অবস্থানের পর আবারো ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিসের পদ অলংকৃত করেন। সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের আগমনে পুরো সিলেটে আলোড়ন তৈরি হয় এবং হাদীস পিপাসুগণ সেখানে ভিড় জমান।

সৎপুর দারুল হাদীস আলিয়া মাদ্‌রাসা এবং ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় বিভিন্ন সময় বিপুল সংখ্যক ছাত্র তাঁর কাছে বুখারি শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাব অধ্যয়ন করেছেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের বাইরে তাঁর দারসে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বের কতিপয় খ্যাতিমান আলিমগণ সনদ গ্রহণ করেছেন। ২০০৮ সালে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের হাদীস শরীফের সনদ বিতরণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৫০৪ জন হাদীস অধ্যয়নকারীকে সনদপত্র প্রদান করেন।

সরাসরি প্রতিষ্ঠানে তাঁর কাছে অধ্যয়ন করেছেন যারা তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন:

১. মাওলানা শিহাব উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী
২. মাওলানা মুফতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী
৩. মাওলানা শুয়াইবুর রাহমান বালাউটি, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জালালপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা, সিলেট।
৪. মাওলানা মাশুক আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইছামতি দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা, সিলেট।
৫. মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম সিদ্দিকী, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্‌রাসা, মৌলভীবাজার।
৬. মাওলানা ইরশাদ হোসাইন রাহিমাহল্লাহ, সাবেক অধ্যক্ষ বুরাইয়া কামিল মাদ্‌রাসা, সুনামগঞ্জ।
৭. হাফিয মাওলানা নূরুল হক বিলপারী রাহিমাহুল্লাহ।
৮. মুফতি মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, শায়েস্তাগঞ্জ।
৯. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুন নূর, সাবেক অধ্যক্ষ, ফেঞ্চুগঞ্জ মুহাম্মাদিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, সিলেট।
১০. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীম, অধ্যক্ষ হবিবপুর কেশবপুর ফাযিল মাদ্‌রাসা, সুনামগঞ্জ।

যারা কোন প্রতিষ্ঠানে সরাসরি তাঁর কাছে অধ্যয়ন করেননি, তবে বিশেষ দারসে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ইলমে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেছেন:

১. শায়খ সায়্যিদ ইউসুফ হাশিম রেফাঈ রাহিমাহুল্লাহ, কুয়েত। বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও কুয়েত সরকারের সাবেক মন্ত্রী।
২. শায়খ ড. আসআদ মুহাম্মাদ সাঈদ সাগিরজী রাহিমাহুল্লাহ, সিরিয়া। আল ফিকহুল হানাফী ওয়া আদিল্লাতুহ সহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিতাব প্রণেতা।
৩. শায়খ সায়্যিদ হাবীব আসিম বিন আদী হাফিযাহুল্লাহ, মদিনা শরীফ।
৪. শায়খ ড. নাযি বিন রশিদ হাফিযাহুল্লাহ, বাহরাইন, বহুগ্রন্থ প্রণেতা।
৫. মাওলানা হুছামুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী, বহুগ্রন্থ প্রণেতা।
৬. মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী শাহান ফুলতলী, সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৭. মাওলানা ড. সাইফুল ইসলাম আল আজহারী, চাঁদপুর, বহুগ্রন্থ প্রণেতা।
৯. মাওলানা মনিরুল ইসলাম, মাগুরা, বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর হাদীসের দারসের ক্ষেত্রে অনেক আদব রক্ষা করে চলতেন, এবং ছাত্রদেরকে আদব রক্ষার তাগিদ দিতেন। অজু ছাড়া কোন ছাত্রকে দারসে বসতে বারণ

করতেন। কিতাবের উপর হাত রেখে বা আঙ্গুল রেখে মতন পড়তে নিষেধ করতেন এবং কিতাবের ভিতরে কোন কাগজের টুকরা রাখতে নিষেধ করতেন। একথাও বলতেন 'কিতাবকো সনদুক আওর বন্দুক না বানাও'। হাদীস পড়ানোর সময় দুরুদ শরীফ পড়ার প্রতি বিশেষ তাগিদ প্রদান করতেন। আমরা দেখেছি সারারাত জেগে কিতাব মুতাআ'লা করে পরদিন দারসে বসতেন। তাঁর দারস চলাকালীন কোন ছাত্র এদিক ওদিক তাকালে বা অন্যমনষ্ক হলে তিনি প্রচন্ড রাগ করতেন।

তিনি ক্লাসরুমে ফ্লোরে বসে দারস দিতেন, ছাত্ররাও ফ্লোরেই বসতেন। সে সময় তাঁর চেহারা খুব গাম্ভীর্যপূর্ণ ও উজ্জ্বল এবং চক্ষুযুগল রক্তিম ও ছোট হয়ে যেত, যেন মুক্তা ঝরছে। দারস দেয়ার সময় তাঁর চোখের দিকে থাকালে ভীতির সঞ্চার হত। একদিনকার ঘটনা সুস্পষ্ট মনে আছে, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, এবং আমাদেরকে ধমকের সুরে বলেছিলেন, যদি তোমরা নবীজির নসব শরীফ অন্তত সাত ধাপ পর্যন্ত মুখস্থ না কর তবে তোমাদেরকে আর হাদীসের দারস প্রদান করব না।

চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও তিনি হাদীসের দারস প্রদান থেকে অবসর নেননি। বরং বিভিন্ন স্থানে হাদীসে মুসালসালাত ও অন্যান্য হাদীস শরীফের কিতাবাদী দারস দিয়ে থাকতেন। ইছামতিতে থাকাকালীন সময় ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ, রাখালগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ, কুলাউড়া রেলওয়ে জামে মসজিদ, বড়লেখা চান্দগ্রাম জামে মসজিদ, বিয়ানীবাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এবং অবসর গ্রহণের পর মাথিউরা বাজার দারুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা, জকিগন্‌জের বাবুর বাজার জামে মসজিদ ও থানাবাজার জামে মসজিদে কোথাও দারসে বুখারি শরীফ আর কোথাও তাফসীরুল কুরআন মাহফিল করেছেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত নিজ বাড়ির পাশে প্রতিষ্ঠিত আল-হাবীব জামে মসজিদে প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার বাদ মাগরীব দারসে হাদীস প্রদান করতেন। সেসময় বহুদূর থেকে তাঁর শিষ্য ও ভক্তগণ হাদীস শিক্ষার জন্য দারসে শরিক হতেন। শয্যাশায়ী থাকা অবস্থায় হাদীস প্রেমিগণ দেশের বিভিন্ন প্রান্থ থেকে তাঁর খেদমতে হাজির হতেন এবং তিনি অসুস্থ হওয়া সত্বেও পবিত্র হাদীস শরীফের দারস চালিয়ে গেছেন।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের ইলমি গভীরতা সম্পর্কে আমি অধম সামান্য স্মৃতিচারণ করে নিবন্ধের ইতি টানবো।

হাদীসে মুরসাল হল কোন তাবেঈ তাঁর সাহাবি উস্তাযের নাম উল্লেখ না করে সরাসরি قال رسول الله صلي الله عليه وسلم বলতেন এরূপ হাদীসকে হাদীসে মুরসাল বলা হয়।
হাদীসে মুরসালের হুকুম হল জুমহুর উলামার মতে, মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য, শুধুমাত্র শাফেয়ীগণের মতে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী

রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মুকদ্দমাতুশ শায়খে মুরসাল হাদীসের হুকুম লিখেছেন - জুমহুর উলামার মতে মুরসাল হাদীসের হুকুম توقف মুলতবি। কারণ এক তাবেঈ অন্য তাবেঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। আর তাবেঈগণের মধ্যে ছিকাহ বা গায়রে ছিকাহ উভয় হতে পারেন। কাজেই অকাট্যভাবে কোন হুকুম দেওয়া যায় না।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর উল্লেখ করেন শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ এর যুগের অনেক পূর্বে ভারতবর্ষে ইরান থেকে আগত মুহাদ্দিসগণের সঙ্গে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ'র উসুলে হাদীসের উপর লিখিত গ্রন্থ নুখবাতুল ফিকর কিতাব এসেছিল। সম্ভবত তিনি হাদীসে মুরসালের হুকুম নুখবাতুল ফিকরের অনুসরণে বর্ণনা করেছেন।

মুকদ্দমাতুশ শায়খে যেখানে قال الشيخ বলা হয়েছে, সেখানে আমাদের অনেক উলামা 'শায়খ' দ্বারা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীকে বুঝে থাকেন। মুহাদ্দিসে দেহলভী ছাহেব নিজে নিজেকে শায়খ বলার কথা নয়। বস্তুত এখানে قال الشيخ দ্বারা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানিকে বুঝিয়েছেন।

মুকদ্দমাতুশ শায়খ হচ্ছে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ'র লিখিত মিশকাত শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ লুমআতুত তানকিহের ভূমিকা বুঝানো হয়েছে। যে ভূমিকায় তিনি ইলমে হাদীসের কিছু পরিভাষাগত আলোচনা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর বলেন شيخ احمد بن محمد ابوالعباس تقى الدين الشمني المتوفى ২৭৮ হ ইমাম শুমুন্নি এর উচ্চারণে কেউ কেউ শুমনি, আর কেউ শামনি, আবার কেউ শিমনি বলে থাকেন। বস্তুত তাহকিক মুতাবিক তাঁর নামের উচ্চারণ শুমুন্নি হবে।

مجمع بحار النوار لي غراعب التنزيل ولطأف الخبار কিতাবের লেখক ভারতের বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ মুহাম্মদ তাহির ফাত্তানি রাহিমাহুল্লাহ এর নামের সাথে সম্পৃক্ত فتنى শব্দের উচ্চারণে অনেক আলিম ভুলের স্বীকার হন। কেউ বলেন, ফাতনি আবার কেউ বলেন ফেতনি। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর আমাদেরকে বলেন এখানে ফাতনি বা ফেতনি কিছু হবে না বরং সঠিক হল ফাত্তানি। কারণ মুহাম্মাদ তাহির ছাহেবের বাড়ি ছিল ভারতের গুজরাটের পাকপট্টম এলাকায়, তাই এই পাকপট্টমের দিকে নিসবত করে তাঁকে ফাত্তানি বলা হয়।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর একদিন ইমাম আ'মাশ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন-

الاعمش كان محدثا كبيرا كان اسمه سليمان بن مهران الاعمش كعمى ومعنى الاعمش الذى يريه من بعيد كعمى لان عينه صغير

জালিম শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর অভ্যাস ছিল আলিম উলামাদের সাথে প্রায়ই হাসি ঠাট্টা করত। হাসি-ঠাট্টার বাহানায় সে এক পর্যায় এই আলিমকে কাতল করে

ফেলত। ইমাম আ'মাশ এর সাথে তার একটি ঘটনা ঘটে- একদা কোন জলাশয় অতিক্রমকালে হাজ্জাজ ইমাম আ'মাশ রাহিমাহুল্লাহ এর কাঁধে সাওয়ার হয়ে যানবাহনে আরোহনের দোয়া পড়তে থাকে-سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون

ইমাম আ'মাশ রাহিমাহুল্লাহ একটু গভীর পানিতে গিয়ে হাজ্জাজকে কাধ থেকে ফেলে দেন এবং বলতে থাকেন তুমি এখন দোয়া পড়-رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين

একদা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর বুখারি শরীফ ও মুসলিম শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন, এ প্রসঙ্গে বলেন- দুনিয়ার সকল আলিম একমত যে, আল্লাহর কিতাব কুরআন শরীফের পরেই আকাশের নীচে শ্রেষ্ঠ কিতাব হচ্ছে সহিহ বুখারি শরীফ, তবে নিশাপুরের মুহদ্দিসগণের নিকট বুখারি শরীফ পৌঁছার পূর্বে মুসলিম শরীফ তাঁদের হাতে পৌঁছে ছিল তাই তাঁরা বলেছেন দুনিয়ার মধ্যে কুরআন শরীফে পরেই শ্রেষ্ঠ কিতাব হচ্ছে মুসলিম শরীফ।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর এ প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ কবিতা বলেন-

تنازع قوم فى البخارى ومسلم - يقال اى زين يقدم

لقد فاق البخارى صحة -كا فاق فى حسن الصناعة ملسم

অর্থাৎ বুখারি শরীফ ও মুসলিম শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে একদল মানুষের মধ্যে বিতর্ক হয়। বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে বুখারি শরীফ শ্রেষ্ঠতম কিতাব। যেভাবে সুন্দর বিন্যাসের দিক দিয়ে মুসলিম শরীফ শ্রেষ্ঠ কিতাব।

হাদীসে মু'আনাআ'ন নিয়ে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে এরূপ বিতর্ক দেখা যায়। হাদীসে মু'আনআ'ন হচ্ছে যে হাদীসটির সকল রাবি শুধু عن عن দিয়ে বর্ণনা করেছেন। حدثنا বা اخبرنا বলেননি।

কেউ বলেছেন হাদীসটি মাওসুল আবার কেউ বলেছেন হাদীসটি মুনকাতে। এখানে কেউ শর্তারূপ করেছেন শায়েখ ও শাগরিদের মধ্যে সাক্ষাত প্রয়োজন। আবার কেউ শায়েখ ও শাগরিদ এক যুগের হওয়া শর্তারোপ করেছেন। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করে নিম্নোক্ত কবিতাটি বলেন-

تنازع قوم فى الحديث المعنعن - فقد قيل موصول وقد قيل مرسل

فجمهور اهل قد شرطوا اللقاء - وذا عن على والبخارى ينتقل

ويكفيه امكان اللقاء عند مسلم - وقلبى الي قول البخارى اميل

لان اللقاء فيه الشفا و سكينة - وساوان قلب شيق يتململ

অর্থাৎ হাদীসে মু'আনআ'নের ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে কেউ বলেছেন হাদীসটি মাওসুল অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সম্পৃক্ত, আবার কেউ বলেছেন হাদীসটি মাকতু অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সম্পৃক্ত নয়। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মতে শায়েখ ও শাগরিদের মধ্যে সাক্ষাতের শর্তারোপ করেছেন। যেমনটা আলী ইবনুল মাদিনী ও ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর বলেন, পৃথিবীর মধ্য সহিহ বুখারি শরীফের দু'টি ভাষ্য সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। একটি হল ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ'র ফতহুল বারি অপরটি হল ইমাম বদরুদ্দীন আইনি হানাফি রাহিমাহুল্লাহ'র উমদাতুল কারি।

এই দুই ইমাম আত্মীয়তার সম্পর্কে দু'জন ভায়রা ভাই ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেক খুনসুটি চলতো। একবারের ঘটনা হল, একটি মসজিদে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি ছাহেব হাদীস শরীফের দারস দিতেন। পরক্ষণে তিনি সেখান থেকে চলে যান। ঘটনাক্রমে ইমাম আইনি ছাহেব ঐ মসজিদে দারস শুরু করেন। আইনি ছাহেব ইবনে হাজার ছাহেবকে পত্র লিখেন, মসজিদ ভালো ও খুব সুন্দর তবে একটি পাথরের কারণে মসজিদটির শোভা কমে গিয়েছিল। এখন পাথরটি সরানোর কারণে মসজিদের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

জবাবে ইবনে হাজার আসকালানি ছাহেব লিখেন, মসজিদটি সবসময় সুন্দর-ই ছিল এবং আছে। তবে চক্ষু ভালো না হওয়ার কারণে মসজিদের সৌন্দর্য ভেসে উঠেনি।

মজার ব্যাপার হল আইনি ছাহেব পাথর দ্বারা ইবনে হাজার আসকালানিকে বুঝিয়েছেন। কারণ আরবিতে হাজর এর অর্থ পাথর আর আসকালানি ছাহেব চক্ষু দ্বারা বদরুদ্দীন আইনি ছাহেবকে বুঝিয়েছেন। কারণ আরবিতে আঈন এর অর্থ চক্ষু।

একজন প্রকৃত হাদীস বিশারদের যে সকল গুণাগুণ কিতাবাদীতে উল্লেখ রয়েছে আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের মধ্যে সবগুলোই বিদ্যমান ছিল। বিশেষ করে হাদীসের পরিচিতি এবং রিজাল শাস্ত্রের অবস্থা সম্পর্কে যে কতটুকু অবগত ছিলেন তাঁর বক্তব্য ও দারস প্রদান থেকে পরিস্কার বুঝা যেত। আমরা তাঁর এ মহা সিন্ধু থেকে বিন্দু মাত্র অর্জন করতে পারিনি।

পরিশেষে বলা যায়, দেশ ও জাতির গর্ব এবং ইলমে হাদীসের এ নির্ভরযোগ্য কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে আমরা আজ এক অপূরণীয় বিয়োগ বেদনায় জর্জরিত।

হাদীসে নববীর এ মহান খাদিমকে যেন আল্লাহপাক কবুল করেন এবং আমাদের পক্ষ হতে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে জাযায়ে খায়ের দান করেন। আমিন!

তথ্যসুত্রঃ

১. তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব সনদগ্রন্থ
শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

২. মাসিক পরওয়ানা (মার্চ-২০২২)

৩. তারিখে ইলমে হাদীস
আল্লামা মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ

৪. উসূলুল হাদীস
শায়খ আজ্জাজ আল খাত্তিব রাহিমাহুল্লাহ

৫. আহবাব (সনদ বিতরণ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক ২০০৮)
অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুন নূর (সম্পাদক)

লেখকঃ অধ্যক্ষ, মাথিউরা সিনিয়র ফাযিল মাদ্‌রাসা, সিলেট।

اللُّؤْلُؤُ وَالـمَرْجَانُ مِنْ حَيَاةِ عَلَّامَةِ الزَّمَانِ مُحَمَّد حَبِيْبِ الرَّحْمن عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّضْوَانُ

كَتَبه:
أحْقَرُ الوَرَى فِيْ الـمَسَاعِيْ وَالعُلى
أبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّد عَيْنُ الهُدى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

كَلَامُ الكِبَارِ دُرُوْسٌ وَسُكُوْتُ الصِّغَارِ أَدَبٌ، فَاخْتَرْتُ أنْ لَّا أَكْتُبَ وَفَضَّلْتُ لِمَنْ أَسَنُّ مِنِّي أَتَأَدَّب، ولكنْ ذِكْرَيَاتُ الوَفَاةِ، في الحوْلِيَّةِ الثَّانِيَةِ، لَا تَتْرُكُنِي سَاعَةً، بَلْ أَجْبَرَتْنِيْ أنْ أَقَدِّمَ التَّحِيَّةَ، لِحَبِيْبِ أَهْلِ السُّنَّةِ، مَحْبُوْبِ أحْبَابِنَا السَّادَةِ، حَبِيْبِ القَوْمِ وَالْمِلَّةِ، خَطِيْبِ الأُمَّةِ، شَيْخِ الحَدِيْثِ العَلَّامَةِ....

إنَّه بَدْرٌ في العِلْمِ، بَحْرٌ في الحِلْمِ، كَرِيْمٌ في الخُلُقِ، عَظِيْمٌ في الأَفُقِ، جَدِيْرٌ في إحْسَانَاتِه، خَلِيْصٌ في خِدْمَاته، رَفِيْعٌ في تَعْلِيْمَاتِه، جَمِيْلٌ في تَوْجِيْهَاتِه، خَبِيْرٌ في تَطَلُّعَاتِه، لَطِيْفٌ في إرَادَاتِه، كَلَامُه فِقْهٌ، وَسُكُوْتُه تَوْجِيْهٌ، حَيَاتُه سُنَّةٌ، وَمَوْتُه رِفْعَةٌ، فَوْتُه مَدِيْحٌ، وَذِكْرُه رَفِيْعٌ ....

إنَّه ثِقَةٌ فِيْ العَرَبِ وَالعَجَمِ، قُدْوَةٌ في الجَمِيْلِ وَالشِّيَمِ، قَاسِمُ العُلُوْمِ النَّبَوِيَّةِ وَالْقِيَمِ، أَسْتَاذُ أَسَاتِذَتِنَا، وَشَيْخُ مَشَايِخِنَا، زَهْرَةُ الرَّوْضَةِ اللَّطِيْفِيَّةِ وَبَهْجَةُ الأَسْرَارِ الْمَجِيْدِيَّةِ، عَلَّامَةُ الزَّمَانِ، آيَةٌ مِّنْ آيَاتِ اللهِ الْمَلِكِ الْمَنَّانِ، حَبِيْبُ حَبِيْبِ خَالِقِ الأَكْوَانِ، إنَّه مِمَّنْ لَه عَلَيَّ وَعَلَيْنَا جَمِيْلٌ وإحسانٌ، إنَّه الأستاذُ الْمُرَبِّي الرَّيَّانُ، إنَّه القُطْبُ العَلَّامَةُ مُحَمَّد حَبِيْبُ الرَّحْمن، عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّضْوَانُ. فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَبِه عَلَيْنَا وَعَلى ذَوِيْهِ وَمُحِبِّيهِ وَمُرِيْدِيْه الفَتَّاحُ العَزِيْزُ الدَّيَّانُ.

إنَّه كغَيْرِه مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ، الرُوَّادِ فِي الزُّهْدِ الرَّبَّانِيِّيْنَ، عَرَفْنَا عَنْهُ القَلِيْلَ وَبَقِيَ لَنَا

الكَثِيْرُ، عَاصَرْنَاه وَجَالَسنَا كَأَنَّه بَسِيْطٌ يَسِيْرٌ، ولم نَعْلَمْ أنَّ تَفَوُّقَه فِيْ الْـمَيَادِيْنِ كبيرٌ.

كُنْتُ مَعَـه فِيْ طَـوَافِ الـزِّيَارَةِ، وَفِي بِدَايَـةِ الشَّـوْطِ الأَوَّلِ يَمِـيْنَ الكَعْبَـةِ، فَقَبَّـلَ رَجُـلًا فِيْ رِجْـلِه وَأَنَا وَرَاءَه، وَلَمْ أَتَمَكَّـنْ مِـنْ أَنْ أَسْـأَلَه عَنْـه حَـتَّى فَـارَقَ الحَيَـاةَ، قَصَـدْتُ مِـرَارًا فَنَسِـيْتُ عِنْـدَ اللِّقَـاءِ، وَفِيْ اللقَـاءِ الأَخِـيْرِ أَوْ قَبْـلَ الأَخِـيْرِ عَزَمْـتُ فَأَخَـذَ كِتَـابِيْ الاحْتِفَـالَ فَاسْتَغْرَقَ فِيْهِ، فَبَقِيَ السُّؤَالُ وَخَفِيَ الجَوَابُ.

الأُسْـتَاذُ الَّـذِيْ قَـضَى جُـلَّ حَيَاتِـه فِيْ دَرْسِ الحَدِيْـثِ وَتَدْرِيْسِـه، حـتَّى أَصْبَحَ التَّدْرِيْسُ مِـنْ يَوْمِيَّاتِـه، فـلَا يَكُـوْنُ طَالِبًا أَنْ يَأْتِيَـه طَالِـبٌ، بَـل يَعْتَـذِرُ فِيْ غَالِـبِ الأَحْيَـانِ لِعُـذْرِ الشَّـيْخُوْخَةِ حِـيْنَ يَقْتَرِحُـه مُقْتَـرِحٌ، كُنْـتُ مَـعَ مَجْمُوْعَـةٍ مِـنَ الطَّلَبَـةِ فِي الْـمَدِيْنَةِ الْمُنَـوَّرَةِ، وَالْتَقَيْنَـا بِشَـيْخِنَا فِي الْـمَسْجِدِ النَّبَـوِيِّ شَمَـالَ الحُجْـرَةِ النَّبَوِيَّـةِ الشَّرِيْفَـةِ، فَـأَلَحَّ عَلَيْـهِ الجَمِيْـعُ أَنْ يُدَرِّسَـنَا حَدِيْثًـا مِـنْ مَرْوِيَّاتِـه، فَفِي الأَخِـيْرِ رَضِيَ بِنَـا وَبَـدَأَ بِحَدِيْـثٍ مِـنْ صَحِيْـحِ البُخَـارِيِّ، عِنْـدَ بَابِ سَـيِّدِنَا بِـلَالٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ الـرَّبُّ الْمُتَعَـالُ، فَرَأَيْنَـا كَأَنَّ وَجْهَـه نُـوْرٌ، وَدَرْسَـه نُـوْرٌ، وَتَوَاضُعَـه فِيْ قِمَّـةِ الجَمَـالِ، فَجَـاءَ شَخْـصٌ فَمَنَعَـه بِقِـلَّةٍ مِـنَ الأَدَبِ مِـنَ الكَمَـالِ، وَالعَجِيْـبُ مِنـه أنـه لم يَمْتَنِـع كَعَـادَةِ الشُّـيُوْخِ فِيْ مِثْـلِ هـذِه الظُّـرُوْفِ بَـلْ خَـرَجَ بِنَـا وَمَنَعَنَـا مِـنَ الجِـدَالِ، وَجَلَـسَ بِنَـا بُعَيْـدَ بَابِ البَقِيْـعِ فِي السَّـاحَةِ الشَّرْقِيَّـةِ، وَبَـدَأَ الحَدِيْـثَ بِتَوَاضُـعٍ لَا يُوْصَـفُ كَأَنَّـه فِيْ الحَـضْرَةِ النَّبَوِيَّـةِ، وَجَـاءَ الْـمَنْعُ مَـرَّةً ثَانِيَـةً، فَقَـامَ بِنَـا إلى السَّـاحَةِ الجُنُوْبِيَّـةِ وَالمـكَانُ مُكْتَـظٌّ بِالسَّـادَةِ وَالسَّـيِّدَاتِ، وَجَلَـسَ بِنَـا بُعَيْـدَ بَابٍ لِمَوَاقِـفِ السَّـيَّارَاتِ، وَبَـدَأَ الحَدِيْـثَ وَهُـوَ فِيْ قِمَّـةِ التَّوَاضُـعِ وَالخُضُـوْعِ، وجَـاءَ المانِـعُ بَعْـدَ قَلِيْـلٍ وَهَـدَّدَه بِالـمَقْمُوْعِ، فَقَـامَ فِيْ أَدَبٍ وَخُشُـوْعٍ، وَقَـالَ لَمَ نَتَمَكَّـنْ يَا رَسُـوْلَ الله والأعـيُنُ إلى القُبَّـةِ الخَـضْرَاءِ تُرْفِـرِفُ بِالدُّمُوْعِ.

رَأى شَـقِيْقِي الأَكْـبَرُ، وَتِلْمِيْـذُه الأَزْهَـرُ، شَـيْخُ الحَدِيْـثِ العَلَّامَـةُ مُحَمَّـد شَمْسُ الهُـدى، رَحِمَـه رَبُّنَـا وَرَبُّ الخَلَائِـقِ وَالـمُصْطَفى، رُؤيَتَـيْنِ مَنَامِيَّتَـيْنِ عَـنْ هـذَا الـمِسْكِيْنَ، فاسْـتَفْسَرَ مِنْـهُ وَكَانَ فِي الألـفِ والتِّسْـعِمائَةِ والثَّـانِيْ والتِّسْـعِيْنَ، فَتَنَبَّـأَ شَـيْخُنَا بِأَنَّ الذِّهْـنَ يَنْتَـشِرُ بَعْـدَ الـزَّوَاجِ وَالعَـيْنُ يَخْتَلِـفُ بَـلْ يَسْـتَمِرُّ فِيْ طَلَـبِ العِـلْمِ وَخِدْمَـةِ الـدِّيْنِ، وَصَـدَقَ شَيْخُنَا،

وَقَامَ بِالتَّشْجِيْعِ وَالدُّعَاءِ فِيْ حِيْنٍ وَآخَرَ أَسْتَاذُنَا، وَاسْتَمَرَّتِ الـمَسِيْرَةُ، بِعِلْمٍ وَإِرْشَادٍ وَبَصِيْرَةٍ، وَإِنْ كَانَ الـمُسْتَوَى ضَئِيْلًا، وَالْـمُقَدَّمُ بِالْـمُنَاسَبَةِ قَلِيْلًا، وَسَتَسْتَمِرُّ بِإِذْنِ اللهِ بِكَشْفِ حَقَائِقِ الْمُبْتَدِعِيْنَ، مَا دَامَتِ الأَنْفَاسُ فِيْ التُّرَابِ وَ مَا شَاءَ رَبُّنَا رَبُّ العَالَمِيْنَ.

ولما بدأتُ الرَّدَّ على جَهَالَاتِ الـمُبْتَدِعِيْنَ، كان شيخُنا أَفْرَحَ النَّاسِ به مِنَ الـمُتَفَائِلِيْنَ، وَأَجْوَدَهُمْ بِالخَيْرِ مِنَ الدَّاعِيْنَ، وَكانَ يَسْتَحْضِرُنِي فِي التَّحَدُّثِ مَعَ الخَوَاصِّ الـمُحِبِّيْنَ، فَكَانَ هذَا مِمَّا يُشَجِّعُنِي أَنْ أَكُوْنَ فِي وَظِيْفَتِيْ مِنَ الـمُخْلِصِيْنَ.

وَلَمَّا أَصْدَرَ الـمَجَلَّةَ الشَّهْرِيَّةَ "شَاه جَلَال"، وَكَانَ رَئِيْسُ تَحْرِيْرِهَا فَأَدَّى حَقَّهَا بِنَفْسِه عَلى وَجْهِ الكَمَالِ، وَكَانَتْ تَصْدُرُ مَقَالَاتِيْ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ مِّنَ الشُّهُوْرِ، فَكَانَ يَسْتَبْشِرُ بِهَا وَيُظْهِرُهَا مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ قَبْلَ الصُّدُوْرِ، كَتَبْتُ مَرَّةً عَنِ الحِجَابِ وَعنْ وَجْهِ الـمَرْأَةِ، فَقَالَ قَبْلَ الطِّبَاعَةِ أَثْبَتَ العَيْنُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وكنتُ أَتَّصِلُ به في حِيْنٍ وَآخَرَ، لِـمَا أَشْكَلَ عَلَيَّ في آيَةٍ أَوْ حَدِيْثٍ أَوْ أَثَرٍ، فَكانَ دَائِمًا يُعَامِلُنِي بِلُطْفٍ وَاسِع الصَّدْر، وكثيرا ما يُرْشِدُني إلى كتابٍ أو إلى خَبَرٍ، فَرُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ مِنْ بَابٍ، فَبِلُطْفِه يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ الأَبْوَابَ.

وفي التَّوْجِيْهِ وَالإِرْشَادِ، للعِبَادِ وَالبِلَادِ، كانَ لِشَيْخِنَا نَهْجٌ نَادِرٌ، حِيْنَ يُخْطِئُ عَالِمٌ أَوْ طَالِبٌ، وَهُوَ فِيْ الـمَجْلِسِ بَيْنَهُمْ حَاضِرٌ أَوْ جَالِسٌ، فَكَانَ لا يَفْضَحُه بَلْ يَسْلُكُ طَرِيْقًا هُوَ فِي ذَاتِه شَيِّقٌ لَبِيْبٌ، أَذْكُرُ مِنْ لُطْفِه مِثَالَيْنِ، وَرَفَعَ اللهُ ذِكْرَه وَرِفْعَتَه فِيْنَا وَفِي الدَّارَيْنِ:

ذَكَرْتُ مَرَّةً الحَدِيْثَ الـمَشْهُوْرَ "كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الـمَاءِ وَالطِّيْنِ"، فَنَبَّهَنِيْ قَائِلًا وَكَأَنَّه فِي إِرْشَادِه مَعْذُوْرٌ: أَيُّ الحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ، "بَيْنَ الـمَاءِ وَالطِّيْنِ"، أَوْ "بَيْنَ الرُّوْحِ وَالجَسَدِ"، فَعَامِلْتُ فِيْمَا بَعْدُ بِأَنَّ "بَيْنَ الرُّوْحِ وَالجَسَدِ" هُوَ الصَّحِيْحُ الفَصِيْحُ. وَجَزَى اللهُ عَنَّا شَيْخَنَا أَحْسَنَ الجَزَاءِ فَهُوَ مَنْ يَرْفَعُ وَيُطِيْحُ.

وَمَرَّةً أُخْرَى نَطَقْتُ بِتَرَدُّدِيْ: قَالَ فِي الأَحْكَامِ السُّلطَانِيَّةِ الإِمَامُ الماوْرِدِي، فَنَبَّهَنِي وَهُوَ

مُتَأَكِّدٌ: أَيُّهُمَا ضَبْطٌ، المَاوْرِدِي أَوِ المَاوَرْدِي، فَتَيَقَّنْتُ بِأَنَّ مَنْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ هُوَ أُسْتَاذِي وَشَيْخِي.

وَفِيْ سَنَةِ ٢٩٩١ للمِيْلَادِ، وَفِيْ شَهْرِهَا السَّابِع، وَفِيْ يَوْمِهَا السَّابِعِ بَعْدَ العَاشِرِ، جَاءَ الْمِسْكِيْنَ الأَجَلُ، فَرُتِّبَ لِيْ زَوَاجٌ هُوَ الأَوَّلُ، تَمَنَّيْنَاهُ فِيْ كَثْرَةِ مُهِمَّاتِه وَمَا بَقِيَ لَنَا إِلَّا الأَمَلُ، فَأَخْبَرَنَا قَبْلَه بِيَوْمٍ بِأَنَّه يُرَافِقُ العَرِيْسَ مِنَ الطَّرِيْقِ، حَتَّى يُعَدَّ أَنَّه مِنْ نَفْسِ الفَرِيْقِ، وَرَافَقَنَا شَيْخُنَا، وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا أُسْتَاذُنَا، فَبِلُطْفِه طَلَعَ الْعُرْسُ يُفِيْقُ، وَبِحِكْمَتِه ذَاكَ الْيَوْمَ زَالَ مَا كَانَ يُعِيْقُ. فِللّٰهِ دَرُّكَ يَا مَنْ لُطْفُه عَتِيْقٌ، وَيَا مَنْ حُسْنُه بَرِيْقٌ.

ذَاتَ يَوْمٍ كَانَتْ لِي سَبْعَةُ مجَالِسَ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مُحَاضَرَاتٍ دِيْنِيَّةٍ، الوَاحِدَةِ تِلْوَ الأُخْرى، فِيْ عَنَاوِيْنَ مُخْتَلِفَةٍ وَفِيْ أَمَاكِنَ مُتَبَاعِدَةٍ، وَفِي كُلِّ مَجْلِسٍ خِطَابٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَاوَحُ مَا بَيْنَ سَاعَةٍ إِلى سَاعَتَيْنِ، بِدَايَتُهَا كَانَتْ بِصَلَاةِ الجُمُعَةِ فِيْ بِيَانِيْ بَازَار وَنِهَايَتُهَا كَانَتْ بِصَلَاةِ الفَجْرِ فِيْ نَبِيْ غَنْج، وَلِسَبَبٍ مَّا كُنْتُ أَتَوَاصَلُ مَعَ الشَّيْخِ بَيْنَ الحِيْنِ وَالْآخَرِ، وَعِنْدَمَا عَلِمَ عَنِ المَجَالِسِ السَّبْعَةِ قَالَ: أَجِنِّيٌّ هذَا؟

وَالكَلَامُ يَطُوْلُ، وَالذِّكْرَيَاتُ تَطُوْلُ، وَنُوْرُ لُطْفِه فِي العَوَالِم يَجُوْلُ، فَلْيَعْتَبِرْ مَنْ بِأَنْوَارِ مَعْرِفَةِ مَشَايِخِه يَتَجَوَّلُ أَوْ يَقُوْلُ.

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

ড. সৈয়দ শাহ এমরান

ইসলামী জ্ঞান ও সমকালীন অভিজ্ঞতায় বর্ষীয়ান অনন্য ব্যক্তিত্ব শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ (১৯৩৪-২০২২) তাঁর সময়ের জীবন্ত বিশ্বকোষ ছিলেন। মুরশিদে বরহক শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য বড় ছাহেবজাদা আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী (মা.জি.আ.) তাঁর সম্পর্কে যথার্থ বলেছেন যে, "কোন কঠিন বিষয় মুহাদ্দিস ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হেসে হেসে অতি সহজে এর জবাব দিতেন, এমন মানুষ আর পাওয়া যাবে না"। হুজুরের ইসালে সাওয়াব উপলক্ষে একটি স্মারক প্রকাশের লক্ষে হুজুরের বড় সাহেবজাদা মাওলানা মো. আব্দুল আউয়াল হেলাল সাহেবের অনুরোধে যদিও আমি নগণ্য একটি ছোট প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা করছি; বাস্তবে তাঁর মত মনীষীর মূল্যায়নধর্মী কোন লেখা হিসেবেই এ প্রবন্ধকে মনে করা ঠিক হবে না। কারণ তিনি এর চেয়ে অনেক বড় এবং আমলে সালেহর অধিকারী এক মহান বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব, তবে তাঁর সম্পর্কে এটি একটি ধারণা মাত্র। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের সামান্য অংশ মাত্র আমি অবগত ও অবলোকন করতে পেরেছি, আর এর আলোকে এ প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে।

মুহাদ্দিস ছাহেব ছিলেন বিংশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ভারত উপমহাদেশের মহান অলি শামসুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.) (১৯১৩-২০০৮খ্রি.) এর অন্যতম একজন নেতৃস্থানীয় ছাত্র ও খলিফা। এছাড়া তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী হলেন মুহাদ্দিসুল হিজায সায়্যেদ মুহাম্মদ বিন আলাওয়ী আল মালিকী মক্কী (রহ.), মুফতি সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী (রহ.), বাহরুল উলুম আল্লামা মুহাম্মদ হোসাইন সিলেটি (রহ.), আল্লামা আবদুল হক (রহ.), আল্লামা ফযলে হক্ক (রহ.), আল্লামা মুহাম্মদ সাঈদ (রহ.), আল্লামা ইদরীস আহমদ শিবনগরী (রহ.) ও আল্লামা শফিকুল হক বুলবুল (রহ.)। তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রতিভাবান ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

তিনি হাদীস বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য সমকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসে কেরামগণের শরনাপন্ন হন এবং এ বিষয়ে অভূত জ্ঞান অর্জন করেন। এ ছাড়াও তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্; সমকালীন বিষয় ও আরবী ভাষা এবং সাহিত্যে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল।

তিনি অত্যন্ত প্রখর ও দ্বী-মান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছাত্র জীবনেই তিনি মেধার পরিচয় বহন করেন গাছবাড়ি মাদ্‌রাসার ইতিহাসে বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী প্রথম ছাত্র হিসেবে। কারণ গাছবাড়ি মাদ্‌রাসাটি তাঁর সময়ে বর্তমান সিলেট জেলার কানাইঘাট

উপজেলায় একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার ছাত্রগণ মুহাদ্দিস ছাহেবের আগে কখনো জাতীয়ভাবে সম্মান অর্জন করতে পারেনি, তিনি সর্বপ্রথম ১৯৫৫, ১৯৫৭ ও ১৯৫৯ সালে হাদীস বিভাগে বোর্ডে দ্বাদশ, তৃতীয় ও দ্বাদশ স্থান অর্জন করেন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ১৯৫৯ সাথে কর্মজীবন শুরু করেন ইছামতি দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসার সহকারী মাওলানা পদে যোগদানের মাধ্যমে। পরবর্তীতে তিনি ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। এরপর আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহ.) এর নির্দেশনা পেয়ে সৎপুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় ১৯৬৩ সালে প্রধান মুহাদ্দিস এবং তারপর ১৯৭৪ সালে ইছামতি মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে উম্মুল কুওয়াইন শহরে খতীবের চাকরি নিয়ে প্রবাস জীবন শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সেখানে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন। উম্মুল কুওয়াইন কোর্টে বিচারক হিসেবে প্রায় চার বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মর্যাদা আরব অঞ্চলে বৃদ্ধি করেন। কিন্তু দেশের মায়ায় বেশিদিন তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত না থেকে ১৯৮২ সালে দেশে ফিরে পুনরায় ইছামতি আলিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর যথারীতি অবসর গ্রহণ করেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর অধ্যাপনা, ইমামতি, খতিব ও বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি একজন দাঈ ইলাল্লাহ হিসেবে কাজ করেন। তাঁর সুচিন্তিত অভিমতের কারণে ধর্মদ্রোহী, ধর্মীয় অপব্যাখ্যাকারী যেমন সন্ত্রস্ত থাকতো তেমনি বিভিন্ন স্তরের আলেম, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সহযোগিতা লাভে ধন্য হতেন। তিনি আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহ.) এর প্রতিটি রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা আন্দোলনে একজন আন্তরিক সহযোগী হিসেবে পীর ও মুরশিদের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেছেন। আনজুমানে আল ইসলাহ এবং আনজুমানে তালমীয়ে ইসলামিয়ার প্রতিটি কর্মসূচিতে ছিল তাঁর অত্যন্ত দক্ষ ও সরব উপস্থিতি।

তাঁর জীবনাচরণ, কথা বার্তা, বক্তব্য-বিবৃত্তি, আলোচনা ও ওয়াজ নসীহতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার প্রতি সমর্পিত আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। হুব্বে রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাভের প্রত্যাশায় তিনি সবসময় নিবেদিত ছিলেন। তিনি দালাইলুল খাইরাত সংকলনপূর্বক ভূমিকায় উল্লেখ করেন "মানুষের ইহ ও পরকালীন জীবনে সফলতা লাভ হয় মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে। আর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র মাধ্যম হলো রাসূলে আকরাম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে দুরূদ ও

সালাম প্রেরণ করা"।

শাইখ বা পীরের প্রতি তাঁর সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন ছিল প্রশ্নাতিত। সূফি তাত্বিকতায় ফানা-ফি শায়খ বলতে যা বুঝায় তিনি ছিলেন তার একজন মূর্ত প্রতীক। তাঁর তাহকীককৃত "আল হিযবুল আজম" গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর পীর ছাহেব কিবলাহ (রহ.) এর বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেন যে "বাবা আমার! আমার অধিক ব্যস্ততা ও বেখায়ালির কারণে আমাদের সিলসিলার দুটি ওযীফা বিলুপ্ত হবার পথে। তুমি চকবাজার গিয়ে এমদাদিয়া কুতুবখানা থেকে আলহিসনুল হাসীন এবং আল হিযবুল আযম কিতাব দু'টি নিয়ে এসো। আমি গিয়ে কিতাব দু'খানা নিয়ে এলাম। দেওয়ান আব্দুল বাছির সাহেব ও আমাকে কাছে বসিয়ে কিতাব দু'খানা পড়ালেন এবং ইজাযত দিলেন। এরপর পূর্বে খরিদ করিয়ে রাখা সাদা পাগড়ি আমি অধমের মাথায় পরিয়ে দিলেন। আজ জীবন সাহাহ্নে এসে মুরশিদ কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রেখে যাওয়া এ আমানত বর্তমান এবং অনাগতকালে এ সিলসিলার অনুসারীগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার মানসে 'আল হিযবুল আযম' কিতাবখানা প্রকাশে অনুপ্রাণিত হই। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত এ কিতাবখানার বিভিন্ন সংখ্যা তুলনামূলক পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলো।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজিদে অসংখ্যা আয়াতে কারিমায় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদার বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রাপ্তিকে অপরিহার্যভাবে গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিদ্ধান্তকে সর্বোচ্চ আসনে স্থান দেয়ার মাধ্যমেই একজন মানুষ প্রকৃত মুমিন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে বলে সুস্পষ্টভাষায় ইসলাম জানিয়ে দিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং পূর্বযুগের সকল মুহাক্কিক ইমামগণ, আলিমগণ এবং বুযুর্গগণ এ সত্যকে অন্তরে ধারণ করে ইসলামের পক্ষে কাজ করেছেন। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর তাঁর সময়ের একজন মুহাক্কিক শাইখ হিসেবে এ সত্যের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটাননি এবং আহলে হককে পুরোপুরি অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করেছেন।

হাদীস শরীফের খেদমত

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের হাদীস শরীফের খেদমতের সূচনাপর্ব ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। তিনি সৎপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা এবং ইছামতি আলিয়া মাদ্‌রাসায় সূদীর্ঘ ৩৫ বছর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাদীস শরীফের খেদমত করেন। পরবর্তীতে আমৃত্যু তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর হাদীসের খেদমত করেছেন বিভিন্ন

ভাবে, কখনো সরাসরি কোন দারসের মাধ্যমে আবার কখনো ভারচুয়াল পদ্ধতিতে দেশ বিদেশের অংশগ্রহণকারীগণের সরাসরি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তিনি বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ এবং শামাইলে তিরমিযী দারস প্রদান করছেন। তিনি লন্ডনস্থ দারুল হাদীস লতিফিয়া মাদ্‌রাসায় শামাইলে তিরমিযী শরীফের দারস প্রদান করতেন; যেখানে বহু মানুষ অংশগ্রহণ ঘটতো। ইমাম বুখারীর লিখিত প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাব আদাবুল মুফরাদ, এবং অন্যতম হাদীস গ্রন্থ রিয়াদুস সালিহীন যুক্তরাজ্যে থাকাকালীন সময়ে দারস প্রদান করতেন। তাঁর দারস পেয়ে অনেক খ্যাতনামা মুহাদ্দিস তৈরি হন, তারা অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনা করেন, যা সকল মহলে সুপঠিত ও সমাদৃত হয়েছে। হাদীস বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো (১) যাখীরাতুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী ফাদায়িলি সায়্যিদিল মুরসালিন (২) কানযু আহাদীসিল আরবাঈন ফী মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যিল আমীন। (৩) মুনতাখাবুস সুনান ওয়াল আছার। হাদীস শরীফে তাঁর খেদমত সমকালীন বিশ্বে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে।

ইলামুল ফিকহ বিষয়ে খেদমতঃ

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম প্রতিপালনের ব্যবহারিক বিধানসমূহ ফিকহ শাস্ত্রে আলোচিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন মাযহাবের মাসয়ালার বিষয়ে ইখতিলাফ থাকায় বহু-সংস্কৃতির অঞ্চলে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও বৈরিতা তৈরি হয়। বিশ্বায়নের (Globalization) কারণে এখন প্রতিটি অঞ্চলই এমনকি এককভাষা সমৃদ্ধ অঞ্চলও ইসলামের বিধান প্রতিপালনে মাযহাবগত বহু মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর বিতর্কিত বিষয়সমূহের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমাধান প্রদান করে সকলের নিকট মর্যাদার আসনে সমাসীন হন। অন্যদিকে সমকালীন ও আধুনিক বিষয়সমূহের বিষয়ে যুক্তি প্রমাণসহ শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখা করে তিনি সমূহ সমস্যার সমাধান করেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁর প্রাঞ্জল উপস্থাপন ও যৌক্তিক পর্যালোচনার মাপকাঠি হিসেবে ফিকহে হানাফীকে তিনি সবসময় প্রাধিকার দিয়ে হানাফী মাযহাবের একজন পণ্ডিত হিসেবে আবির্ভূত হন। সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বনামধন্য শাইখগণ তাঁর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত জানার জন্য উদগ্রীব থাকতেন।

মিলাদুন্নবী ও সিরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ে খেদমত

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর মহান সুন্নাতকে সর্বাবস্থায় জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার নাম ঈমান। রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদাপূর্ণ জীবনাচার সাহাবায়ে কিরাম (রা.) হতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সঠিকভাবে অবগত হয়ে নিজেদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসার স্থান করে নিবে এটিই একজন মু'মিনের

কামনা। কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষী অথবা ইসলামের বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিরা বক্তৃতা বিবৃতি এবং বিভিন্ন লেখনির মাধ্যমে রাসূল চরিত্রে কালিমা লেপন করার হীন প্রয়াস যুগেযুগে অব্যাহত ছিল এবং আছে। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর তার সময়ে এসব অপচেষ্টার মূলোৎপাটনের জন্য সর্বদা চেষ্টা করেছেন। তিনি "সীরাতে হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল কাউলুল মাকবুল ফী মীলাদির রাসূল নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তাসাউফের খেদমত

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর বিশ্বাস করতেন তাসাউফ মানুষের আত্মাকে বিশুদ্ধ, কলঙ্কমুক্ত, নির্মল ও স্বচ্ছ করে খোদাপ্রাপ্তির পথকে সহজ করে তুলে। সুষ্ঠু সৌজন্যতাবোধ, পরিমার্জিত জীবনবোধ ও অন্তর পরিশুদ্ধির মাধ্যমে একজন মানুষ উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও প্রকৃত মানব সত্তা হিসাবে আবিষ্কৃত হবার জন্য তাসাউফের দীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। তিনি শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.) এর নিকট বায়াত গ্রহণের মাধ্যমে তাসাউফ চর্চা শুরু করে উন্নত স্তরে আসীন হন। 'দোয়ায়ে মাসনুনা' ও তেত্রিশ আয়াতের ফজীলত, 'দালাইলুল খারযাত' ও 'আল হিযবুল আযম' নামক তাসাউফের কিতাবসমূহ রচনা ও সংকলন করে এ ধারাকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আরো সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন বিষয়টিকে গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলে ধরেছেন।

দাওয়াতি সফর

তিনি জানতেন দ্বীনি দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দেয়া প্রতিটি মুমিনের উপর ফরয। হক্কানী আলেম-ওলামা দ্বীনি দাওয়াত ফরয হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। ওলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেকে বলেছেন, দ্বীনি দাওয়াত ফরযে কেফায়া। পবিত্র কুরআন মাজীদে দ্বীনি দাওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা রয়েছে। বলা হয়েছে:

'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহব্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করবে উত্তম পন্থায় (অনুবাদ:ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সূরা নাহল ১৬:১২৫)।

হিকমত শব্দের টীকায় বলা হয়েছে "যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলে (আল কুরআনুল কারীম; ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৭, পৃ-৩২)

দ্বীনের প্রচারকগণের প্রয়োজনীয় গুণাবলী হলো

১। হিকমত অর্জন : দ্বীনের দাওয়াত দানকারীদের হিকমত অর্জন করতে হবে, যার দ্বারা মানুষের জ্ঞান ও অন্তর প্রভাবিত হয় এবং মানুষ দ্রুত যা গ্রহণ করে সে ধরণের মেকানিজমকে হিকমত বলে।

২। মাওয়াইজ-ই-হাসান : দাওয়াত দানকারীকে দাওয়াতের বিষয়বস্তু আকর্ষনীয় করে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে শ্রোতার অন্তর প্রশান্তি বা আধ্যাত্মিকতায় ভরে যায়।

৩। কাওল-ই লায়্যিন : দ্বীন প্রচারককে রূঢ় বা কঠোরচিত্ত হলে চলবে না। তাকে দয়া, সৌহার্দ্য, নম্রতা দেখাতে হবে।

৪। তালীফ-ই কালব : দাঈর অন্যের হৃদয়কে জয় ও অন্যের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষমতা থাকতে হবে।

৫। নির্মল চরিত্র: দাঈকে নির্মল চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তার মধ্যে সকল প্রকার চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলীর প্রতিফলন থাকতে হবে।

দ্বীনি দাওয়াতের কাজ নায়েবে রাসূল হিসেবে আলেম ওলামার উপর বর্তায়। তাঁরই ধারাবাহিকতায় সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন, অলী-আউলিয়া, পীর-মাশায়েখ ও আলেমগণ দ্বীনি দাওয়াতের কাজ এগিয়ে নিয়ে এসেছেন ইসলামের সূচনাপর্ব থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত। যুগে যুগে যারা মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, তাঁদের অসাধারণ মানবপ্রেম, অনুপম চারিত্রিক মাধুর্য, অতুলনীয় মানবিক মূল্যবোধ, দৃষ্টান্তমূলক সৎকর্ম, ফযিলতপূর্ণ আমল ও পরিশুদ্ধ মননশীলতা দ্বারা বিশাল জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর ফলে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষ মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। ওরাসাতুল আম্বিয়াদের উত্তরসূরি হিসেবে মুহাদ্দিস ছাহেব তাঁর জীবদ্দশায় যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এ লক্ষে বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে, আবার মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপ, ইউরোপ থেকে আফ্রিকা, আমেরিকা দেশ মহাদেশ সফর করে মানুষকে ইসলামের সুমহান শিক্ষা প্রদান করেছেন।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বিশেষত্ব হলো তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, তবে তাঁর আত্মসম্মান ও আত্মসচেতনতা যথেষ্ট ছিল। তিনি ছোট বড় সকলকে ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন, শ্রদ্ধা করতেন।

একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। অসুস্থতার খবর পেয়ে একজন সৈয়দজাদা হুজুরকে দেখতে গ্রামের বাড়ি জকিগন্জের রারাই গেলেন। তাঁর সফরের বিষয়টি কাউকে জানাননি। বাড়িতে যেয়ে খবর জানতে পেলেন হুজুর আরাম করছেন। তিনি পরিচয় না দিয়ে গেস্ট রুমের পার্শ্বে অপেক্ষা করলেন। হুজুরের আসরের নামাজ আদায় করার জন্য নিজ কামরায় প্রস্তুতি নিচ্ছেন মর্মে জানতে পেরে আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে, খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যেই দেখা হবে। আসরের নামাজ শেষ করলে তার নাতি সাফওয়ান আল হাবীব এসে মেহমানকে ডেকে নিল। সাক্ষাতেই তিনি অত্যন্ত আফসোস করে বলতে ছিলেন "একজন সৈয়দজাদাকে এভাবে কষ্ট দিলাম; আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কি জবাব দিব।" মেহমান আসার সাথে সাথে কেন হুজুরকে জানায়নি এজন্য নাতি সাফওয়ান ও সাহেবজাদা আবদুল বাকী খালেদকে রীতিমত ভৎর্সনা করলেন এবং বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। মেহমানদারী শেষে বিদায় নিলে হুজুর অসুস্থ অবস্থায় গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। একা হাঁটতে পারছিলেন না, নাতির সহযোগিতা নিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে মসজিদের নিকট পর্যন্ত অত্যন্ত কষ্ট করে চলে আসলেন।

এ আচরণ ছিল মূলত হুব্বু ফিল্লাহ বা আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসার প্রমাণ। ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহ.) কে সৈয়দজাদাদেরকে অত্যন্ত সম্মান করতে দেখেছি। একজন মানুষ হিসেবে যে সকল মানবীয় গুণাবলীর সমাবেশ ঘটা সম্ভব ছিল মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের মধ্যে সবটুকু ছিল বলে আমি প্রত্যক্ষ করেছি। জীবনের শেষ দিকে অসুস্থতার জন্য অনেকটা কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। শারীরিক দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সাধ্যনুযায়ী বাড়িতে বসে দ্বীনের খেদমত করেছেন। এ সময় একটি কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজ বাড়ির আঙ্গিনায়। মাঝে মধ্যে অনলাইনে তালিম ও তরযিয়্যাত দান করতেন। এসব অনলাইন তালিমে দেশ বিদেশের অনেক বিজ্ঞজনেরাও অংশগ্রহণ করে উপকৃত হয়েছেন। হুজুর ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ তারিখে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) আল্লাহ তা'আলা হুজুরকে উত্তম প্রতিদান করুন। আমিন!

লেখক: উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ও ধর্মীয় জ্ঞানে তাঁর উচ্চ সনদঃ একটি পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মদ নুরুন্নবী আল আযহারী

সার সংক্ষেপ

অত্র প্রবন্ধে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন মাশায়েখদের থেকে নানা শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জনের সনদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মাধ্যমে পাঠক জ্ঞানতাপস শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর জীবনী, জ্ঞানার্জনে তাঁর অসামান্য ধৈর্য্য ও ত্যাগ, সনদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে শায়খের দেশ-বিদেশে জ্ঞানার্জন ও বুৎপত্তির স্বীকৃতি স্বরূপ মাশায়েখদের থেকে যে সনদ অর্জন করেছেন তা সম্পর্কে ধারণা পাবে। এই প্রবন্ধটি তিনটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কৃতিত্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সনদের পরিচিতি ও গুরুত্ব এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন শাস্ত্রে শায়খের সনদ অর্জন প্রসঙ্গে- যার বিস্তারিত নিম্নরূপ।

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: জীবনচরিত অধ্যয়নের উপকারিতা, শায়খুল হাদীসের জীবনী ও কৃতিত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ: জীবনচরিত অধ্যয়নের উপকারিতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: শায়খুল হাদীসের জীবনী ও কৃতিত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়: সনদের পরিচিতি ও গুরুত্ব এবং সনদ মুসলিম উম্মাহর অনন্য বৈশিষ্ট্য

প্রথম পরিচ্ছেদ: সনদের পরিচিতি ও গুরুত্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সনদ মুসলিম উম্মাহর অনন্য বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় অধ্যায়: ইলমে হাদীস ও অন্যান্য শাস্ত্রে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সনদ

প্রথম পরিচ্ছেদ: ইলমে হাদীসে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সনদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অন্যান্য শাস্ত্রে আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সনদ

উপসংহার

ভূমিকা ইসলামে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথম ঐশী বাণী 'ইকরা' থেকে মুসলিমগণ অনুপ্রাণিত হয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। যুগে যুগে জ্ঞানপিপাসুরা জ্ঞান অর্জনের পথে নিবেদিত হয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটেছেন। জ্ঞানার্জনের এই ধারার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা হয়েছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে অনন্য মুসলিম সভ্যতা। কালের আবর্তনে শিক্ষানীতিতে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটলেও এখনও আদি শিক্ষা ব্যবস্থা অনন্য, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী বিভিন্ন শাস্ত্রের শিক্ষকদের নিকট অসামান্য বুৎপত্তি অর্জন করে শিক্ষক থেকে ইজাযাহ বা স্বীকৃতিপত্র লাভ করতেন। যদিও আধুনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রসারতার দরুন প্রাচীন শিক্ষানীতি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে তবুও এই ঐতিহ্য টিকে আছে এবং থাকবে। বিশ্বের অসংখ্য জ্ঞানপিপাসুরা প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি প্রবীণ শায়খদের সহবতে গিয়ে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সনদ অর্জন করেন। সময়ের পরিক্রমায় জ্ঞানার্জনের সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ধৈর্য ও প্রত্যয়ে নেমেছে হতাশজনক ভাটা! এই ক্রান্তি-লগ্নেও বাংলাদেশের ধর্মীয় অঙ্গনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি দেশ বিদেশের স্বনামধন্য স্কলারদের নিকট হতে প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিতে বিভিন্ন শাস্ত্রে গভীর বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। এই মহান ব্যক্তিত্বের জ্ঞানার্জনের সনদ নিয়ে আমাদের এই প্রবন্ধ। আমার বিশ্বাস এই ক্ষনজন্মা শিক্ষাবিদ সম্পর্কে জানতে প্রবন্ধটি সাধারণ পাঠকের উপকারে আসবে আর এতে জ্ঞান অন্বেষণকারীদেরকে জন্য রয়েছে পাথেয় ও অনুপ্রেরণা।

প্রথম অধ্যায়: জীবনচরিত অধ্যয়নের উপকারিতা, শায়খুল হাদীসের জীবনী ও কৃতিত্ব

এই অধ্যায়টি দুটো পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে, প্রথম পরিচ্ছেদে মনিষীদের জীবনচরিত অধ্যয়নের উপকারিতা এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শায়খুল হাদীসের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: জীবনচরিত অধ্যয়নের উপকারিতা

ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই সাহাবা, তাবেয়ী ও তাদের অনুসারীগণ, খুলাফা, শাসক এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের মনীষীদের জীবনচরিত, তাদের অবয়ব, অর্জন, অবদান, স্বভাব, প্রভাব, কৃতিত্ব ও মুখনিঃসৃত বাণী বিশদভাবে আলোচনা, সমালোচনা, পর্যালোচনা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়টি খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে রচিত হয়েছে বিষয়ভিত্তিক জীবনচরিতের অসংখ্য গ্রন্থ যদিও প্রথম দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু

হয়েছিল কিন্তু সাথে সাথে মুফাসসির, ক্বারি, মুফতি, সুফী, ভাষাবিদ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, ইতিহাসবেত্তা, শাসক, বিচারক, কবি, সাহিত্যিক, গায়কসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় যারা অবদান রেখেছেন তাদের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ হয়েছে। এসব জীবনচরিতের সমসাময়িক, শাস্ত্রীয়, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকসহ নানাবিধ গুরুত্বের পাশাপাশি এতে রয়েছে শিক্ষা, আদব, শিষ্টাচার, আদর্শ, সভ্যতা, আত্মকথন, উপলব্ধি, জীবনাদর্শ, অনুপ্রেরণাসহ নানা দিক। বড় বড় ইমামদের জীবনাদর্শ ও শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোচনার তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন- 'ওলামায়ে কিরামের শিষ্টাচার ও তাদের জীবনাদর্শ আলোচনা আমার নিকট ফিকহী [মাসলা-মাসায়িল] আলোচনা থেকেও উত্তম, কারণ এসব বুর্জুগদের শিষ্টাচার'[১]। ইমাম সুফিয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন- 'সালেহীনদের আলোচনায় আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়[২] অনুরূপ ইমাম সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকেও বর্ণিত হয়েছে[৩] ইমাম বিশর ইবনুল হারেস আল-হাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন- তুমি [শিক্ষা গ্রহণের জন্য] এটাই যথেষ্ট যে, নিশ্চয়ই কিছু কিছু মৃতদের আলোচনার দ্বারা অন্তর পুনরুজ্জীবিত হয় পক্ষান্তরে জীবিত কিছু মানুষকে দেখলে অন্তর রুক্ষ হয়ে যায়[৪]। ইমাম মারওয়াযী (রহ.) ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ এর ছেলে আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, 'আবদুল্লাহ (রা.) বলেন আমি আমার পিতার নিকট হযরত আবদুল্লাহ আল-ফাদল, ফাতহ আল মাওসেলী এবং তাদের বালা-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ ও অবিচলতার কথা আলোচনা করতেই তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন এবং বলেন- আল্লাহ তাদেরকে রহম করুক। বুজুর্গদের আলোচনায় আল্লাহর রহমত নাযিল হয়'[৫]।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ শায়খুল হাদীসের জীবনী ও কৃতিত্ব

জন্মঃ শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার রারাই গ্রামে ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা মুমতায আলী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন প্রথিতযশা আলিম। তাঁর মাতার নাম মরহুমা আমিনা

১ কাযি আইয়াজ, আবুল ফাদল আল কাদ্বি আইয়্যাদ ইবন মুসা আল-ইহাসাবী, তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরিবুল মাসালিক, (মরক্কোঃ মাতবায়াতু ফুদালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭০), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩।

২ আহমদ ইবন হাম্বল, আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল ইবন হেলাল আশ-শায়বানী, আয-যুহুদ, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ২৬৪।

৩ কাযি আইয়াজ, তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরিবুল মাসালিক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩।

৪ সুলামী, আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন মুসা ইবন খালেদ ইবন সালেম, তাবাকাতুস সুফিয়া, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮), পৃষ্ঠা ৫০।

৫ মারওয়াযী, আবু বকর আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্জাজের সূত্রে বর্নিত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রচিত, আল-ওয়ারা, (রিয়াদঃ দারুস সামঈ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭) পৃষ্ঠা ৮৬।

খাতুন। তিনি সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে তৃতীয়। তিনি সর্বসাধারণের কাছে 'মুহাদ্দিস ছাব' নামে খ্যাত।

শিক্ষা জীবন: তাঁর পড়ালেখার হাতেখড়ি হয় স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। কিছুদিন পর তাঁর বড় ভাই মরহুম মাওলানা নজিবুর রাহমান (রাহ) এর সাথে বর্তমান ভারতের বদরপুর সিনিয়র মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখান কিছুদিন পড়ালেখা করে কানাইঘাট উপজেলাধীন সড়কের বাজার আহমদিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং এখানে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সম্পন্ন করেন। তাঁর শিক্ষকদের অনুপ্রেরণায় তিনি পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে জেলাভিত্তিক প্রাথমিক বৃত্তি পরিক্ষায় অংশগ্রহণ করে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ করেন। এরপর সিলেটের অন্যতম প্রাচীন বিদ্যাপিঠ গাছবাড়ী জামিউল উলুম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৫৫ সালে আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। একই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৫৭ সালে ফাযিল পরিক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৫৯ সালে হাদীস বিভাগে কামিল পরিক্ষায় বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য যে, গাছবাড়ী মাদ্‌রাসার ইতিহাসে তিনিই বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী প্রথম ছাত্র। প্রাতিষ্ঠানিক লিখাপড়ার পাশাপাশি তিনি ইসলামি বিভিন্ন শাস্ত্রে অসামান্য বুৎপত্তি অর্জন করেন যা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

কর্মজীবন: তিনি ১৯৫৯ সালের ৩ আগস্ট ইছামতি দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় সহকারী মাওলানা পদে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৩ সালের ১০ এপ্রিল সিলেটের প্রাচীনতম ইসলামি বিদ্যাপীঠ ফুলবাড়ী আজিরিয়া মাদ্‌রাসায় যোগ দেন। তাঁর আধ্যাত্মিক মুরশিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর নির্দেশে একই বছরের ২৩ নভেম্বর সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সেখানে সুনামের সহিত অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৪ সালে ইছামতি দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ নিয়ে নানা জটিলতা দেখা দেয়। সমস্যা নিরসনে জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনুরোধে ১৯৭৬ সাথের ১১ অক্টোবর সেখানে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। সেখানে দক্ষ নেতৃত্বের ফলে অল্প দিনেই মাদ্‌রাসায় স্থিতিশীলতা ফিরে এলে ১৯৭৭ সালের ২ এপ্রিল তিনি সেখান থেকে চলে আসেন।

১৯৭৭ সালে সৎপুর মাদ্‌রাসা থেকে চলে আসার কিছুদিন পর তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে গমন করেন। সেখানে প্রথমে উম্মুল কুওয়াইন নামক শহরের একটি জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব নিযুক্ত হন। সেখানে প্রতিযোগিতামূলক এক পরীক্ষায়

অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বিচার বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৮২ সাল পর্যন্ত উম্মুল কুওয়াইন কোর্টে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পাশাপাশি উল্লিখিত মসজিদে খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। ছুটির দিনে তিনি মরুচারী বেদুঈনদের অবৈতনিক শিক্ষাদান করতেন। বিশেষ করে বয়স্ক বেদুঈনদের পবিত্র কুরআন সহীহ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত শিখাতেন।

১৯৮২ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আবারও তাঁর পুরাতন কর্মস্থল ইছামতি মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে অত্যন্ত সুনাম-সুখ্যাতি ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইছামতি আলিয়া মাদ্‌রাসা পূর্ব সিলেটের শ্রেষ্ঠতম ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। তিনি আমৃত্যু ইছামতি মাদ্‌রাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং গভর্ণিংবডির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিভিন্ন দেশে দাওয়াতি সফর

মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ দাওয়াতি মিশন নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেছেন। এসব সফরের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার পথহারা মানুষকে দ্বীনের দীক্ষা দিয়েছেন। ১৯৮১ সালে স্বীয় পীর ও মুরশিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহমতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশে তিনি আরব আমিরাত থেকে প্রথমবারের মতো যুক্তরাজ্য সফর করেন। এরপর থেকে তিনি প্রায় প্রতি বছরই যুক্তরাজ্য সফর করেন। এসব সফরে তিনি গ্রেট ব্রিটেনের উল্লেখযোগ্য প্রতিটি শহরে বিভিন্ন মাহফিলের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্রিটেনে বসবাসরত তাঁর ছাত্রগণের অনুরোধে ২০০৯ সালে তিনি একাধারে প্রায় নয় মাস সে দেশে অবস্থান করেন। সে সময় প্রতি শনিবার লন্ডনস্থ দারুল হাদীস লতিফিয়ায় শামায়েলে তিরমিজি নামক বিখ্যাত হাদীসের কিতাব সম্পূর্ণ দারস পেশ করেন। নিয়মিত সে দারসে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর থেকে প্রচুর সংখ্যক উলামা এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করতেন। দারস পূর্ণ হলে দুই শতাধিক আলিমকে শামায়েলে তিরমিজির সনদ প্রদান করেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর ব্রিটেন সফরকালে বিভিন্ন শহরে রিয়াদুস সালিহীন এবং আদাবুল মুফরাদ নামক হাদীসের কিতাবের দারস প্রদান করেন তিনি। এছাড়া ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র, ২০০৮ সালে সিরিয়া, ২০১০ সালে মরক্কো, ২০১৮ সালে মিশর সফর করেন।

সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম

মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আজীবন চেষ্টা করেছেন। তিনি ২০০০ সালে থানাবাজার হাবিবিয়া হিফযুল কুরআন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১১ সালে তিনি হিফজুল কুরআন মাদ্‌রাসার সাথে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০০ সালে তিনি থানাবাজার লতিফিয়া ফুরকানিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা সংলগ্ন পুরাতন ছোট

মসজিদের স্থলে সুপরিসর বৃহৎ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২০১৬ সালে নিজ বাড়ি সংলগ্ন স্থানে নতুন একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এ মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে আল হাবীব জামে মসজিদ। জীবনের শেষ লগ্নে প্রতি মঙ্গলবার বাদ মাগরিব থেকে এই মসজিদে তিনি হাদীস শরীফের দারস প্রদান করতেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইলমে হাদীসের শিক্ষার্থীসহ কয়েকশত উলামা এতে অংশগ্রহণ করতেন।

প্রকাশিত রচনাবলী

প্রাতিষ্ঠানিক ও দাওয়াতি ব্যস্ততার মাঝেও মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন যা ধর্মীয় গবেষনায় নতুনমাত্রা যোগ করেছে। এ পর্যন্ত তাঁর লেখা ১৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে-

১. **আল কাউলুল মাকবুল ফী মিলাদির রাসূল:** মাহফিলে মিলাদের ইতিহাস বিষয়ে উর্দু ভাষায় লেখা এ কিতাব ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৮-এ কিতাবখানা বাংলা অনুবাদ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

২. **দোয়ায়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফজিলত:** দৈনন্দিন জীবনে পঠিতব্য হাদীস শরীফে বর্ণিত দোয়ার সংকলন। ২০১০ সালে বাংলা ভাষায় লেখা এ কিতাবের ১৪তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ২০১২ সালে লন্ডন থেকে এ কিতাবের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

৩. **মাসআলায়ে উশর: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ:** ২০০৬ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়।

৪. **দুরূদ শরীফের ফযীলত ও ওযীফা:** এ বইখানা ১৯৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০০০ সালে।

৫. **যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা (ফযীলত ও নিয়ম):** ১৯৯৯ সালে এ বই প্রকাশিত হয়।

৬. **আসহাবে বদর:** ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন সাহাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্বলিত এ গ্রন্থ ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০১৫ সালে।

৭. **ওযীফা:** কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে বর্ণিত দোয়া সম্বলিত পকেট সাইজের এ বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে ৫ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

৮. **হজ্জ ও যিয়ারত (সংক্ষিপ্ত আহকাম ও নিয়ম):** প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯ সালে।

৯. **হাদিয়াতুল লাবীব ফী নাবযাতিম মিন সীরাতিন নাবিয়্যিল হাবীব:** আরবী ভাষায় রচিত সংক্ষিপ্ত সীরাতের কিতাব। ২০১১ সালে ব্রিটেন সফরকালে তিনি এ কিতাব

রচনা করেন। ২০১২ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছে। সীরাতে হাবীবে খোদা নামে এ কিতাবের বাংলা অনুবাদ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০১২ সালের আগস্ট মাসে। মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর বড় ছেলে মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল হেলাল (ম. জি. আ.) কর্তৃক অনূদিত সীরাতে হাবীবে খোদা বর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়েছে।

১০. **যাখীরাতুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী ফাদায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীনঃ** বঙ্গানুবাদসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ফজিলত বিষয়ক চল্লিশ হাদীস। ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

১১. **কানযুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যিল আমীনঃ** বঙ্গানুবাদসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজনের মানাকিব বিষয়ক চল্লিশ হাদীস। প্রথম প্রকাশ ২০১১ সাল। ২০১০ সালে ব্রিটেন সফরকালে চল্লিশ হাদীসের এ দুই কিতাব তিনি প্রণয়ন করেন।

১২. **তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীবঃ** আরবি ভাষায় রচিত এ কিতাব ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। ২০০৮ সালে পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এ কিতাবে তাঁর সনদ বিবৃত হয়েছে। পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

১৩. **আত তুহফাতুল লাতীফাহ ফী আহাদীসিল মুসালসালাতিল মুনীফাহঃ** আরবি ভাষায় রচিত এ কিতাব ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এ কিতাবে তাঁর শায়খগণ প্রদত্ত মুসালসাল হাদীসসমূহের সনদ গ্রন্থিত হয়েছে।

১৪. **দালাইলুল খাইরাতঃ** ইমাম জাযুলি রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত দুরূদ শরীফের এ কিতাবখানা তাহকিক এবং ওজিফা আকারে পড়ার বিন্যাস করেছেন মুহাদ্দিস ছাহেব যা ২০১০ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

১৫. **আল হিযবুল আযমঃ** ইমাম মোল্লা আলী কারী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত এ কিতাব তাহকীক করেছেন তিনি যা ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

১৬. **দারসে হাদীস-১ঃ** ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছে দারসে হাদীস সিরিজের প্রথম গ্রন্থ। এতে হাদীসে নিয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নসব তথা বংশমর্যাদা বিষয়ক একটি হাদীসের উপর প্রদত্ত দারস গ্রন্থিত হয়েছে।

১৭. **সালাতুত তারাবীহ:** এ গ্রন্থে ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়েছে।

১৮. **মুনতাখাবুস সুনান ওয়াল আছার:** তাঁর প্রণীত সংক্ষিপ্ত হাদীসের কিতাব ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর অপ্রকাশিত অনেক রচনাবলী ও গবেষণাকর্ম রয়েছে।

ইন্তেকাল: শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটের দিকে তিনি নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। ৪ ছেলে ৩ মেয়েসহ তাঁর অসংখ্য ভক্ত, অনুসারী, মুরিদান, শিক্ষার্থী ও শুভাকাংখী। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে হাজার হাজার মানুষ এক নজর তাঁকে দেখার জন্য সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গিয়ে উপস্থিত হন জকিগন্জে তাঁর বাড়িতে ভিড় জমায়। ৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় জকিগন্জের থানাবাজার সংলগ্ন মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার মানুষ তাঁর জানাজায় উপস্থিত হয়েছিলেন। জানাজায় ইমামতি করেন আল্লামা হবিবুর রহমানের বড় ছেলে মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল। জানাজায় দেশের শীর্ষ আলেম, রাজনীতিক, সরকারি কর্মকর্তাসহ দেশের বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নেন। জানাজা শেষে তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত রারাই গ্রামস্থ আল-হাবীব জামে মসজিদের উত্তর পাশে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়[৬]।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সনদের পরিচিতি ও গুরুত্ব এবং সনদ মুসলিম উম্মাহর অনন্য বৈশিষ্ট্য

এই অধ্যায়টি দুটো পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে, প্রথম পরিচ্ছেদে সনদের পরিচিতি ও গুরুত্ব এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সনদ মুসলিম উম্মাহর অনন্য বৈশিষ্ট্যতার দিকগুলো আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: সনদের পরিচিতি ও গুরুত্ব

সনদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, নির্ভর করা, সম্পৃক্ত বা সংযুক্ত করা। আর মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় সনদ ঐসব লোকদের ধারাক্রমকে বলা হয় যাদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সনদ ও ইসনাদ দু'টি শব্দই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন- "হাদীসের মূলভাষ্য পর্যন্ত পৌঁছার ধারাবাহিকতা বর্ণনা করাকে ইসনাদ (অর্থাৎ সনদ) বলে[৭]"। এককথায়, হাদীসের মূলভাষ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে যে সকল বর্ণনাকারী থাকেন তাদের

---

৬ বিস্তারিত জানতে পড়ুন মুহাদ্দিস ছাহেব (রহঃ) এর বড় ছেলে মোঃ আব্দুল আউয়াল (ম জি আ) কর্তৃক রচিত সময়ের সাক্ষী (সিলেটঃ আল হাবীব ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯), পৃষ্ঠা ১৫৬-১৬৭।

৭ ইবন হাজার, শিহাবুদ্দীন আবুল ফাদল আহমদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ, নুযহাতুন নাজর, (দামেস্কঃ মাতবায়াতুস সাবাহ, ৩য় সংস্করণ, ২০০০), পৃষ্ঠা ১০৬।

ধারাবাহিকতাকেই সনদ বা ইসনাদ বলা হয়। আর শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ বর্ণনাকারীদের পরিচিতি, অবস্থা, যোগ্যতা, সততা, দ্বীনদারিতা, আমানতদারিতা, এক কথায়, তাদের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করে হাদীস সম্ভারকে সমৃদ্ধশালী করেন। ফলে উলুমুল হাদীসে 'ইলমুর রিজাল', 'ইলমুল জারাহ ওয়াত তা'দীল' ও 'ইলমুত তাওয়ারিখ ওয়াল ওয়াফিয়াত' এর ন্যায় নতুন নতুন শাখা প্রশাখার উন্মেষ ঘটে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বা সুন্নাহ ইসলামী শরীআতের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস এবং প্রথম উৎস কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা। সুতরাং হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশুদ্ধতা, নির্ভরযোগ্যতা ও সত্য-মিথ্যা যাচাই করা আবশ্যক। আর সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সনদই মূল ভিত্তি। হাদীসের অকাট্যতা তখনই প্রমাণিত হবে যখন এর সনদ সহীহ হবে। যদি সনদ সহীহ না হয় তাহলে হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ধরনের সনদ মূলত হাদীস গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার সময়কাল পর্যন্তই ধর্তব্য। গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে পরবর্তী সনদ পর্যালোচনার প্রয়োজন বা অবকাশ নেই।

যদিও হাদীসের সনদের প্রতি গুরুত্ব, হাদীস শাস্ত্রকে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, যাচাই বাছাই, পর্যালোচনা পূর্বক হাদীসের মান নির্ণয়কে কেন্দ্র করে ঘটেছিল কিন্তু এই প্রক্রিয়া শুধু হাদীস শাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং ইলমে কিরাত, ইলমে তাফসীর, ইলমে ফিকহ, ইলমে তাসাওউফসহ দ্বীনি জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় সনদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষত ইলমে হাদীস যেহেতু ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস এবং পবিত্র কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা সেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসকে সংরক্ষণ করতে সনদের উপর নির্ভরশীল।

সকল মুহাদ্দিসীনে কিরাম অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে সনদ যাচাই বাছাই সাপেক্ষে হাদীস সংকলন করেছেন এবং বর্ণনার সাথে সাথে এর স্বরূপও বলে দিয়েছেন। তাঁদের সকলেই সনদ তথা বর্ণনাকারীদের নাম পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করেই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং কেউ কেউ বর্ণনাক্রমকে দ্বীন বা দ্বীনের অংশ বলে অবহিত করেছেন।

শাস্ত্রীয় পণ্ডিতগণ সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইবন শিরিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় সনদের ইলম দ্বীনের অংশ, অতএব পরখ করে দেখ কার থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছো[৮]"। বিশিষ্ট ফকিহ ও মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) বলেন, 'সনদ দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। যদি সনদ না থাকত, যার যা ইচ্ছা তা-ই বলত'[৯]। তিনি আরো বলেন, 'সনদ ব্যতীত দীনি ইলম

৮ বায়হাকী, আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন, আল-মাদখাল ইলা ইলমিস সুনান, (বৈরুতঃ দারুল মিনহাজ, প্রথম সংস্করণ, ২০২৭), ১/২৩৩।

৯ নিসাপুরী, আবু আবদুল্লাহ আল-হাকেম মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ, মারিফাতু উলুমুল হাদীস, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭), পৃষ্ঠা ৬।

অন্বেষণকারী সিঁড়ি ব্যতীত ছাদে আরোহণকারী ব্যক্তির ন্যায়'[১০] হযরত ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল কাত্তান রাহিমাহুল্লাহ সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, 'তোমরা হাদীসের ভাষ্যের দিকে নয় বরং সনদের দিকে দৃষ্টিপাত করো। যদি সনদ সহীহ হয় তাহলে তা গ্রহণ করো। সনদ সহীহ না হলে কেবল হাদীসের ভাষ্য গ্রহণ করে তোমরা প্রতারিত হয়ো না'[১১]। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, 'যারা সনদবিহীন হাদীস অনুসন্ধান করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো রাতের আঁধারে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহকারীর মতো, যে অজ্ঞাতসারে এমন জ্বালানি কাঠের বোঝা বহন করে, যাতে রয়েছে অজগর সাপ।[১২] প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম সুফিয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সনদ হলো মুমিনের অস্ত্র। যদি অস্ত্র সাথে না থাকে তাহলে কী দিয়ে যুদ্ধ করবে?[১৩]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সনদ মুসলিম উম্মাহর অনন্য বৈশিষ্ট্য

যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী ও রাসূল তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবিবের প্রতি অবতীর্ণ পবিত্র কুরআন এবং তাঁর শরীয়তকে কোন ধরণের পরিবর্তন পরিবর্ধন থেকে সংরক্ষণ করেছেন। হাদীস ও ইসলামের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় জ্ঞানগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম সনদ সহকারে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। সনদের বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ ইসলামের প্রায় প্রতিটি শাস্ত্রকে বিকৃতি থেকে অক্ষুন্ন রেখেছে যা ইমামগণ উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করেছেন যা অন্য কোন ধর্মে, জাতিতে নেই। ইমাম আবূ হাতিম আর রাযী রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-কে সৃষ্টির সময় থেকে পরবর্তী কোনো উম্মতের মধ্যে রাসূলগণের হাদীস বা বাণী সংরক্ষণ করার কোনো প্রচলন ছিল না, কেবল উম্মতে মুহাম্মদী ছাড়া'।[১৪]

ইমাম ইবনে হাযম লিখেছেন যে, ইয়াহুদীদের মধ্যে নবী মুসা (আ.) পর্যন্ত মিলিত কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে অনেক মুরসাল ও মু'দাল বর্ণনা (যার মধ্যখানে সনদের বিচ্ছিন্নতা রয়েছে) পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মুরসাল বা মু'দাল বর্ণনা যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে তাদের সনদ

---

১০ মানাভী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাউফ ইবন তাজুল আরেফীন ইবন আলী ইবন যাইনুল আবেদীন, ফাইজুল কাদীর, (মিশরঃ মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৬ হিঃ), ১/৪৩৩।

১১ খতীব আল-বাগদাদী, আবু বকর আহমদ ইবন আলী ইবন সাবেত ইবন আহমদ ইবনুল মাহাদী, আল জা'মে লি আখলাকির রা'বী ওয়াস সা'মে (রিয়াদঃ মাক্তাবাতুল মা'আরিফ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩, ২/১০২।)

১২ খতীব আল-বাগদাদী, নাছিহাতু আহলিল হাদীস, (জর্ডানঃ মাক্তাবাতুল মানার, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হিঃ), পৃষ্ঠা ৩২।

১৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪২।

১৪ খতীব আল-বাগদাদী, শারফু আসহাবিল হাদীস, (আনকারাঃ দারু ইহইয়ায়িস সুন্নাতিন নাববীয়া, তাঃ বিঃ), পৃষ্ঠা ৪২।

সেরূপ নিকটবর্তী হয় না। বরং তাদের আর মুসা (আ.) এর মধ্যে ত্রিশ পুরুষের ব্যবধান থেকে যায়। তারা সর্বোচ্চ শামঊন বা তার সমকালীন লোক পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আর নাসারাদের মধ্যে কেবল তালাক হারাম হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনা ছাড়া আর কোনো বর্ণনা সনদ পরম্পরায় নেই'[১৫]। আল্লামা মানাভী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা এ উম্মতকে 'সনদ' এর মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং একে মানুষের মধ্যে তাদের বিশেষত্বের কারণ বানিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তাদের কঠোর পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে একজন বর্ণনাকারী ত্রিশ বা তার অধিক সনদে পর্যন্ত হাদীস লিখেছেন'[১৬]। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সনদ বা ইসনাদ উম্মতে মুহাম্মদীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম একটি।

তৃতীয় অধ্যায়: ইলমে হাদীস ও অন্যান্য শাস্ত্রে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সনদ

এই অধ্যায়টি দুটো পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে, প্রথম পরিচ্ছেদে ইলমে হাদীসে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সনদ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্যান্য শাস্ত্রে আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সনদ অর্জন প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: ইলমে হাদীসে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সনদ

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ বাংলাদেশের ধর্মীয় জ্ঞানের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি হাদীস শাস্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা ছাড়াও প্রাচীন পদ্ধতিতে বিভিন্ন মাশায়েখদের থেকে হাদীস শাস্ত্রে অসামান্য বুৎপত্তি অর্জন করেন যদিও গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার পর পরবর্তী স্তরে বর্ণনাকারীদের সনদ তেমন আবশ্যকীয় বিষয় নয় তবুও মুহাদ্দিসীনে কিরামগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের সাথে নিজেদের যুক্ত রাখার বরকত, সম্মান ও মহৎ উদ্দেশ্যে সনদ প্রদান ও গ্রহণ করে থাকেন। শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ হাদীসের বিশুদ্ধ ছয়টি গ্রন্থ ছাড়াও শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবের সনদ অর্জন করেন যা তাঁর রচিত 'তুহফাতুল লাবীব বি আসানিদিল হাবীব' ও 'আত তুহফাতুল লাতীফাহ ফী আহাদীসিল মুসালসালাতিল মুনীফাহ' কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি যেসব উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত স্কলারদের থেকে সনদ অর্জন করেছেন, তন্মধ্যে-

---

১৫ ইবন হাযম, আবু মুহাম্মদ আহমদ ইবন আলী ইবন আহমদ ইবন সাইদ, আল-ফিছাল ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়ান নিহাল, (কায়রোঃ মাক্তাবাতুল খানেযী, তাঃ বিঃ), ২/৬৮।

১৬ মানাভী, ফাইজুল কাদীর, ১/৪৩৩।

১। প্রখ্যাত সূফী ও ইমাম শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ [১৯১৩ -২০০৮ ইং] মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এই মহান ব্যক্তি থেকে সহীহ বুখারীর শুরু থেকে পড়েছেন এবং সনদ অর্জন করেছেন। আর ইমাম ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেন তাঁর শায়খ মাওলানা খলিলুল্লাহ রামপুরী রাহিমাহুল্লাহ মৃ ১৯৪৬ থেকে, তিনি হযরত আল্লামা মনোওর আলী রামপুরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি হযরত সায়্যিদ মুহাম্মদ শাহ রামপুরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি স্বীয় পিতা হযরত সায়্যিদ হাসান শাহ রামপুরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে, আর তিনি হযরত শায়খ আলম আলী নাকিনাভী রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী (রহ) থেকে, আর তিনি হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা ইমাম শাহ আহমদ ওলীউল্লাহ দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ এর নিকট থেকে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহসহ দ্বীনের সকল জ্ঞান অর্জন করেন। আর তিনি শায়খ আলহাজ্ব মুহাম্মদ আফদাল থেকে, তিনি শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ থেকে, তিনি তাঁর পিতা শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ থেকে, তিনি ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমদ ফারুক সিরহিন্দী থেকে, তিনি শায়খ মুহাম্মদ ইয়াকুব কাশ্মীরী থেকে, তিনি হাফেজ ইবন হাজার হাইছামী মাক্কী থেকে, তিনি শাইখুল ইসলাম যাকারীয়া আল-আনসারী থেকে, তিনি শায়খুল ইসলাম হাফেজ আবুল ফাদল শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার আসকালানী থেকে, তিনি শায়খ ইবরাহীম ইবন আহমদ তুনুখী থেকে, তিনি শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আবি তালেব আল-হাজ্জার থেকে, তিনি সিরাজুল হুসাইন ইবন মুবারক আয-যাবেদী থেকে, তিনি শায়খ আব্দুল আওয়াল ইবন ঈসা ইবন শুয়াইব আস-সিজযী আল-হারাভী থেকে, তিনি শায়খ আবুল হাসান ইবন আব্দুর রহমান ইবন মুজাফফার আদ-দাউউদী থেকে, তিনি আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন আবু আহমদ সারাখসী থেকে, তিনি শায়খ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন মতর আল-ফিরাবরী, তিনি ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইব্রাহীম ইবনুল মুগিরাহ আল-জু'ফী আল-বুখারী (রাহিমাহুমুল্লাহ) থেকে।

শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর শায়খ আলহাজ্ব মুহাম্মদ আফদাল ছাড়াও শায়খ আবু তাহের মাদানী, তিনি তাঁর পিতা শায়খ ইবরাহীম আল-কুর্দী থেকে, তিনি শায়খ আহমদ আল-কাসশাসী থেকে, তিনি শায়খ আহমদ ইবন আব্দুল কুদ্দুস শিনাভী থেকে, তিনি শায়খ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আহমদ রামলী, তিনি শাইখুল ইসলাম যাইনুদ্দীন যাকারিয়া আল-আনসারী থেকে আর তিনি উপরোল্লিখিত সনদে ইমাম বুখারি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ শায়খ মাওলানা খলিলুল্লাহ রামপুরী রাহিমাহুল্লাহ ছাড়াও শায়খ মাওলানা ওয়াজিহ উদ্দিন রামপুরী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি শায়খ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মেরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান থেকে, তিনি কাসেম নানুতুভী থেকে, তিনি শায়খ শাহ আব্দুল গনী মুজাদ্দেদী, দেহলভী, মাদানী থেকে, তিনি তাঁর পিতা আরিফ বিল্লাহ শায়খ আবু সাঈদ মুজাদ্দেদী থেকে, তিনি শায়খ মুহাম্মদ ইসহাক থেকে, তিনি শায়খ শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী থেকে, তিনি ইমাম অয়ালীউল্ল্যাহ দেহলভী থেকে আর তিনি উপরোক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন।

২। শায়খ মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ [১৯০৭-১৯৬৪ইং] যিনি গাছবাড়িয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন। তাঁর থেকে শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ বুখারী ও মুসলিমের প্রথামাংশ এবং সুনানে আবু দাউদের প্রথামাংশ পড়েছেন, শুনেছেন এবং সনদ লাভ করেছেন। তিনি তাঁর শায়খ শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী থেকে উপরোক্ত সনদে ইমাম বুখারি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

৩। শায়খ মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল হক রাহিমাহুল্লাহ [১৯২৭-২০০১ ইং] যিনিও গাছবাড়িয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন। তাঁর থেকে শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ বুখারী ও মুসলিমের দ্বিতীয়াংশ, সুনানে তিরমিযীর সনদ অর্জন করেন। তিনি বাহারুল উলুম শায়খ মুহাম্মদ হুসাইন সিলেটী থেকে, তিনি শায়খ নাজের হাসান থেকে, তিনি শায়খ আহমদ আলী সাহারানপুরী থেকে, তিনি শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী থেকে, তিনি শায়খ শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী থেকে, তিনি ইমাম ওয়ালীউল্ল্যাহ দেহলভী থেকে, তিনি উপরোক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন।

শায়খ মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল হক রাহিমাহুল্লাহ শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেন, আর তিনি শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান, তিনি শায়খ কাসেম নানুতুভী থেকে, তিনি শায়খ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী দেহলভী থেকে, তিনি শায়খ মুহাম্মদ ইসহাক থেকে, তিনি শায়খ শাহ মুহাম্মদ আব্দুল আযীয দেহলভী থেকে, তিনি ইমাম শাহ ওয়ালীউল্ল্যাহ দেহলভী থেকে আর তিনি উপরোক্ত বর্ণিত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন।

৪। মাওলানা মুফতি আব্দুল গণী রাহিমাহুল্লাহ [১৯২০-১৯৮৭ ইং] তাঁর নিকট মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ সুনানে ইবনে মাজাহ ও সুনানে নাসাঈ-র সনদ লাভ করেন।

৫। বাহারুল উলুম আল্লামা মুহাম্মদ হুসাইন সিলেটী রাহিমাহুল্লাহ [১৮৯০-১৯৭২ ইং] তাঁর থেকেও মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ হাদীসের সনদ লাভ করেন।

৬। মাওলানা ইদ্রিস আহমদ শ্রিনগরী রাহিমাহুল্লাহ [১৯২৪-২০০৭ ইং] মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর নিকট সুনানে আবু দাউদের দ্বিতীয়াংশ এবং মিশকাতুল মাসাবিহ পড়েছেন ও সনদ লাভ করেছেন। মাওলানা ইদ্রিস আহমদ শ্রিনগরী রাহিমাহুল্লাহ বাহারুল উলুম শায়খ মুহাম্মদ হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি শায়খ নাজের হাসান থেকে, আর তিনি শায়খ আহমদ আলী সাহারানপুরী থেকে, আর তিনি উপরোক্ত বর্ণিত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন।

৭। সিলেট আলিয়া মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ রাহিমাহুল্লাহ [১৯০৮-১৯৮১ ইং] তাঁর নিকট মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ বুখারী শরীফের ইজাযত ও সনদ হাসিল করেন। তিনি মাওলানা মোস্তাক আহমদ কানপুরী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, আর তিনি তাঁর পিতা মাওলানা আহমদ হাসান থেকে, তিনি কুতুব শাহ ফজলুর রহমান থেকে, তিনি শায়খ মুহাম্মদ ইসহাক থেকে, তিনি শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী থেকে, তিনি ইমাম শাহ ওয়ালী উল্ল্যাহ দেহলভী থেকে এভাবে তিনি তিনি উপরোক্ত বর্ণিত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন।

৮। ইমাম মুফতী সায়্যিদ আমিমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বারকতী রাহিমাহুল্লাহ [১৯১১-১৯৭৪ ইং] যিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান ছিলেন ও মূল্যবান বহু গ্রন্থের প্রণেতা। ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় তাঁর কক্ষে বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে বিশেষ করে আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ এর উপস্থিতে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ বুখারী শরীফের কিছু হাদীস ইমাম মুফতী সায়্যিদ আমিমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বারকতী রাহিমাহুল্লাহ এর নিকট পড়েছিলেন এবং ইজাযত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। মুফতী সায়্যিদ আমিমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বারকতী রাহিমাহুল্লাহ ১৪ জন মাশায়েখ থেকে হাদীসের সনদ অর্জন করেছিলেন।

৯। হেরেমে মক্কার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ঝান্ডাবাহী, বহু গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম সাইয়্যিদ মুহাম্মদ ইবন আলাভী আল-মালেকী আল-মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ [১৯৪০-২০০৪ ইং] মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ হজ্জের সময় পবিত্র মক্কায় অবস্থান কালে তাঁর থেকে কিছু মুসালসাল হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং তিনি মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহসহ উপস্থিত অন্যান্যদেরকে সিহাহ সিত্তাহ ও তাঁর বর্ণিত হাদীস, তাফসির, ফিকহ, শামায়িলসহ তাঁর রচিত সমস্ত কিতাবের ইজাযত প্রদান করেছেন। তিনি মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ কে তাঁর রচিত কিছু বই ও তোহফা বিশেষ করে তাঁর পাগড়ী হাদিয়া দিয়েছেন। তিনি কয়েকজন মাশায়েখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বিশেষ করে তিনি তাঁর পিতা হিজাযের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সাইয়্যিদ আলাভী ইবন আব্বাস আল-মালেকী আল মাক্কী, শায়খ হাসান মাসশাত, শায়খ মুহাম্মদ তিজানী, হাবীব সালেম ইবন আহমদ ইবন হুসাইন,

শায়খ ইব্রাহীম খুতানীসহ আরো অনেক।

উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর হাদীসের সব সনদের মধ্যে ইমাম সাইয়্যিদ মুহাম্মদ ইবন আলাভী আল-মালেকী আল-মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ এর সনদটি খুবই উচ্চ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লামের খুবই নিকতবর্তী হিসেবে বিবেচিত। কারণ মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম বুখারীর মাঝে মাত্র বারোজন আর তিনি ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লামের মাঝে মাত্র ষোলজন বর্ণনাকারী।[১৭]

১০। শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী। মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কিছু হাদীসের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন এবং সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য কিতাব থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ কে সিহাহ সিত্তার সনদসহ হাদীস, তাফসির, ফিকহ, শামায়িল, সাহিত্যসহ তাঁর সব কিতাবের ইজাযত দিয়েছেন যার সংখ্যা প্রায় ছয় শতাধিক। তিনি বিভিন্ন দেশের বহু মাশায়েখ থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন যা তিনি 'আল-জাওয়াহিরুল বাহেরাহ ফিল আসানিদিত তাহেরাহ' কিতাবে সংকলন করেছেন।

১১। শিরিয়ার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুফতী ড. আসয়াদ সাগিরজি ইবন মুহাম্মদ সাঈদ হানাফী রাহিমাহুল্লাহ। মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ২০০৫ সালে লন্ডনে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং তাঁর থেকে ইজাযত গ্রহণ করেন। আবার ড. আসয়াদ সাগিরজিও মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ দামেশক সফর কালে ২০০৮ সালে তাঁর থেকে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন।

১২। সুলতানুল ওলামা শায়খ হাবীব সালেম ইবন আবদুল্লাহ ইবন ওমর শাতেরী শাফেয়ী ইয়ামানী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ ২০১৮)। মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর থেকে হাদীস, তাফসির, ফিকহের সনদ লাভ করেন। তাঁর ইজাযতনামা ও সনদসমূহ তাঁর প্রিয় ছাত্র শায়খ ফারেস মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ তাঁর 'নাফহাতুল মিসকিল আতেরী বিছাবত ওয়া আসানিদ শায়খুনাল হাবীব আল্লামা সালাম ইবন আবদুল্লাহ ইবন ওমর আস-শাতেরী' শিরনামে একটি সতন্ত্র কিতাবে সংকলন করেছেন।

উপরোল্লিখিত সনদ ছাড়াও মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর ইমাম তিরমিযী সংকলিত 'শামায়িলুল মুহাম্মদিয়া', ইমাম দারেমির 'সুনানে দারেমী', হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরীর 'মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন', ইমাম নববীর 'রিয়াদুস সালেহীন', ইমাম

---

১৭ রহমান, মুহাম্মদ হবিবুর, তুহফাতুল লাবীব বি আসানিদিল হাবীব, (সিলেটঃ মুয়াসসাতুল হাবীব, ৪র্থ সংস্করণ, ২০২১), পৃষ্ঠা ৩৩।

জালালুদ্দীন সুয়ুতীর 'জামেউস সাগীর' এবং তাঁর রচিত সমস্ত গ্রন্থের সনদ রয়েছে।[১৮]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ অন্যান্য শাস্ত্রে আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সনদ

ইলমে কিরাতের সনদঃ মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ইলমে কিরাতের সনদ অর্জন করেছেন রাঈসুল কোররা, প্রখ্যাত মুফাসসির, শাইখুল হাদীস শামসুল ওলামা আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ থেকে। তিনি পবিত্র কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ১৩৮৬ হিজরীতে পবিত্র রামাদান মাসে তাজভীদসহ ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ এর নিকট পাঠ করে সনদ অর্জন করেন। আর ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ তিনজন বিখ্যাত শায়খ থেকে ইলমে কিরাতের সনদ অর্জন করেছেন। আর তাঁরা হলেন- মাওলানা শাহ ইয়াকুব বদরপুরী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ ১৯৫৮,) মক্কা শরীফের বিশিষ্ট কারী শায়খ আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মাহমুদ আল-হিজাযী (১৩০৩-১৩৮১হি:) ও মাওলানা আব্দুর রউফ করমপুরী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ-১৯৬৯)।

তাফসীরের সনদঃ মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাফসীরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহের সনদ অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম ইবনে জারির আত-তাবারীর 'জামেউল বায়ান ফি তাফসীরুল কুরআন', ইমাম কুরতুবীর 'আল-জামে লি আহকামিল কুরআন', ইমাম ইবনে কাসিরের 'তাফসীরুল কুরানিল আযীম', ইমাম জালালুদ্দীন মাহল্লী ও ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতীর 'তাফসীরে জালালাইন' কিতাবের সনদ অর্জন করেন।[১৯]

ইলমে ফিকহঃ মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর ইলমে ফিকহে সর্বজন স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ চার মাজহাবের ইমাম, ইমামে আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদ্রিস শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত সনদ রয়েছে।[২০]

ইলমে তাসাউফঃ মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাসাউফের দীক্ষা গ্রহণ করেন পবিত্র রামাদান মাসে ১৩৭৭ হিজরীতে, বাংলার বিখ্যাত সুফী সাধক প্রখ্যাত মুফাসসির, শাইখুল হাদীস শামসুল ওলামা আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ থেকে এবং ১৩৮৫ হিজরীতে তাসাউফের ইজাযত অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি কাদেরীয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরিকার সনদ অর্জন করেন।[২১] মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ইমাম গাজ্জালীর অনবদ্য কালজয়ী রচনা "ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন" সহ সব কিতাবের সনদ লাভ করেন।

---

১৮ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৯।

১৯ বিস্তারিত দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫১-৫৫।

২০ বিস্তারিত দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪-৪২।

২১ বিস্তারিত জানতে, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০-৬৫।

উপসংহারঃ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা অনস্বীকার্য যে, মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ হাদীস ও অনন্য শাস্ত্রে এক কিংবদন্তি। তিনি আমৃত্যু ইলমে হাদীসের খিদমাত করেছেন। তাঁর এই বর্ণাঢ্য জীবন কেটেছে জ্ঞানার্জন ও বিতরণে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তিনি হাদীস ও অন্যান্য শাস্ত্রের সনদ অন্বেষণ করেছেন এতেই তাঁর নিষ্ঠা, প্রচেষ্টা ও ইলমের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রতীয়মান। এই ক্ষনজন্মা জ্ঞানতাপস রেখে গিয়েছেন অসংখ্য রচনাবলী যা আমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত দিশারী হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্রঃ

- আহমদ ইবন হাম্বল, আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল ইবন হেলাল আশ-শায়বানী, আয-যুহুদ, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯)
- আউয়াল, মো. আব্দুল, সময়ের সাক্ষী, (সিলেটঃ আল হাবীব ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯)
- ইবন হাজার, শিহাবুদ্দীন আবুল ফাদল আহমদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ, নুযহাতুন নাজর, (দামেস্কঃ মাতবায়াতুস সাবাহ, ৩য় সংস্করণ, ২০০০)
- ইবন হাযম, আবু মুহাম্মদ আহমদ ইবন আলী ইবন আহমদ ইবন সাইদ, আল-ফিছাল ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়ান নিহাল, (কায়রোঃ মাক্তাবাতুল খানেযী, তাঃ বিঃ)
- কাযি আইয়াজ, আবুল ফাদল আল কাদ্বি আইয়্যাদ ইবন মুসা আল-ইহাসাবী, তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরিবুল মাসালিক, (মরক্কোঃ মাতবায়াতু ফুদালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭০)
- খতিব আল-বাগদাদী, আবু বকর আহমদ ইবন আলী ইবন সাবেত ইবন আহমদ ইবনুল মাহাদী, আল জা'মে লি আখলাকির রা'বী ওয়াস সা'মে, (রিয়াদঃ মাক্তাবাতুল মা'আরিফ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩)
- খতিব আল-বাগদাদী, নাছিহাতু আহলিল হাদীস, (জর্ডানঃ মাক্তাবাতুল মানার, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হিঃ)
- খতিব আল-বাগদাদী, শারফু আসহাবিল হাদীস, (আনকারাঃ দারু ইহইয়ায়িস সুন্নাতিন নাববীয়া, তাঃ বিঃ)
- বায়হাকী, আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন, আল-মাদখাল ইলা ইলমিস সুনান, (বৈরুতঃ দারুল মিনহাজ, প্রথম সংস্করণ, ২০২৭)
- নিসাপুরী, আবু আবদুল্লাহ আল-হাকেম মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ, মারিফাতু উলুমুল হাদীস, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭)
- মানাভী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাউফ ইবন তাজুল আরেফীন ইবন আলী ইবন যাইনুল আবেদীন, ফাইজুল কাদীর, (মিশরঃ মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৬ হিঃ)
- মারওয়াযী, আবু বকর আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্জাজের সূত্রে বর্নিত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রচিত, আল-ওয়ারা, (রিয়াদঃ দারুস সামঈ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭) পৃষ্ঠা ৮৬।

- রহমান, মুহাম্মদ হবিবুর, তুহফাতুল লাবীব বি আসানিদিল হাবীব, (সিলেট: মুয়াসসাতুল হাবীব, ৪র্থ সংস্করণ, ২০২১)
- সুলামী, আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন মুসা ইবন খালেদ ইবন সালেম, তাবাকাতুস সুফিয়া, (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সাউদান ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম।

আমার স্মৃতিতে হাদীস জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

মাওলানা মুহাম্মদ হবীবুর রাহমান

بسم الرحن الرحيم الله

نحمده ونصلى على رسوله الكريم - أما بعد: قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم - إنما يخشى الله من عباده العلماء - (سورة المؤمن:٤١)

আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট শামছুল উলামা, রাইছুল কুররা, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন ওয়াল মুফাসসিরীন, ওয়াল ফুকাহা, আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অন্যতম বিশিষ্ট শাগরীদে রাশীদ শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ হাদীস জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ, মুহাক্কিক আলীমে দ্বীন, উচ্চস্তরের আশীকে রাসূল, ফুলতলী সিলসিলার একনিষ্ঠ খাদিম, সিলেট তথা বাংলাদেশের কৃতি সন্তান, হরদিল আযীয বা সকল পথ ও মতের লোকের নিকট প্রিয়জন ও শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি ছিলেন শান্ত, সৌম্য, ক্ষমাশীল, নির্লোভ, মেহমান নেওয়ায, উচ্চস্তরের পরহেযগার, সর্বদা জামাতের সাথে নামাজ আদায়কারী, তাহাজ্জুদ গোজার, সদালাপী, বিনয়ী, নম্র-ভদ্র, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, মিষ্টভাষী, বাগ্মী বক্তা, গরীব, এতীম ও অসহায়দের সাহায্যকারী এবং আত্মীয়-স্বজন, ভক্তবৃন্দ, ছাত্র-শিক্ষক ও প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব।

ইলমে হাদীসের খাদিম হিসেবে স্বীয় ব্যক্তি জীবনে অক্ষরে অক্ষরে নবী কারীম এর আদর্শ, চারিত্রিক গুণাবলী ধারণ এবং লালন -পালন করে চলার চেষ্টা করে গেছেন। প্রতিটি সুন্নাহকে ব্যক্তি জীবনে যথাযথভাবে আমল বা বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁর চলাফেরা, কাজকর্ম, লেবাস পোশাক, কথাবার্তা, আহার নিদ্রা, সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় সুন্নতে রাসূলের অনুসরণ করে গেছেন। তিনি ছিলেন নমুনায়ে সাহাবা বা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আখলাকের প্রতিচ্ছবি। মুহতারাম হুজুর বাংলাদেশ আনজুমানে মাদারিসে আরাবিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় উহার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে মাদারিসে আরাবিয়া

সঠিক ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ও সুন্নী আকীদাকে রক্ষার নিমিত্তে আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট শামছুল উলামা আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশে মুহতারাম অধ্যক্ষ আল্লামা ইসহাক আহমদ চৌধুরী বিশ্বনাথী রাহমাতুল্লাহি

আলাইহি, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আল্লামা গোলাম হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রাহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আল্লামা আব্দুল জাব্বার গোটার গ্রামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আল্লামা আবুল ফদল এরশাদ হুসাইন গোয়াহরী হুজুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আল্লামা আব্দুস সালাম তেলিকোনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ আরো অনেক ইসলামী চিন্তাবীদদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৬৪ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে মাদারিছে আরাবিয়া। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে উক্ত সংস্থার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন বিশ্বনাথ ফাযিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা ইসহাক আহমদ শায়দা চৌধুরী রহঃ, বিগত ০৭/০২/১৯৮২ ইংরেজি সাল পর্যন্ত দক্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন আল্লামা খলীলুর রাহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। বিগত ০৭/০২/১৯৮২ সাল তারিখের বোর্ড কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ আঞ্জুমানে মাদারিছে আরাবিয়ার চেয়ারম্যান পদে আল্লামা মো. হবিবুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহকে মনোনীত করা হয় এবং জেনারেল সেক্রেটারীর পদে কিছুদিন মাওলানা মাশুক আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দায়িত্ব পালন করার পর আমাকে উক্ত সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারী মনোনীত করা হয়। উক্ত সংস্থার কর্মসূচীর প্রথম প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৬৬ সাল হতে ৫ম শ্রেণি ও দাখিল ৮ম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষা চালুকরণের মাধ্যমে। তৎকালে বৃহত্তর সিলেট তথা বাংলাদেশে এ ধরণের বড় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা যায়। এ বৃত্তি পরিক্ষা চালুর অনেক পর সম্ভবত ১৯৮৫ সাল থেকে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণি ও দাখিল ৮ম শ্রেণিতে বাকী বিল্লাহ বৃত্তি পরীক্ষা চালু করে। তখন আঞ্জুমানে মাদারিছে আরাবিয়া তদস্থলে শিক্ষার্থীদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে এবং উৎসাহিত করতে ইবতেদায়ী ৪র্থ শ্রেণি ও দাখিল ৭ম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষা চালু করে। এরপর স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা ও বৃহত্তর সিলেটের হিফযুল কোর'আন মাদ্‌রাসাসমূহকে নির্দিষ্ট নিয়মে বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত বৃত্তির বড় অংকের টাকা আমাদের পীর ও মুর্শিদ শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ আনজুমানে মাদারিছে আরাবিয়ার বোর্ড কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত বৃত্তি পরিক্ষাকে 'লতিফিয়া বৃত্তি পরীক্ষা' নামে নামকরণ করা হয়। অদ্যাবধি ঐ সকল সুন্নী পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিভাবকত্ব ও প্রেরণার উৎস হিসেবে সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে মাদারিছে আরাবিয়া। আমাদের পীর ও মুর্শিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর দোয়া ও সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল।

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তায আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন খাঁটি আশিকে রাসূল এবং সুন্নাতে রাসূল এর একনিষ্ট অনুসারী। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল

সুন্নাতের আলোয় উদ্ভাসিত। আমার বক্ষমান নিবন্ধে তাঁর কিঞ্চিত আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

এক. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত একখানা হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ خَدَمتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ وَلَا لِمَ صَنعت؟ ولا ألا صنعت؟ رواه البخاري -

অর্থাৎ, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি দশ বৎসর নবী করীম এর খেদমতে ছিলাম। কোনদিন তিনি 'উফ' শব্দটি বলেননি এবং 'কেন এমন করেছ? অথবা করনি?' বলেননি। (বুখারীঃ ৫৬৯১/৬০৩৮, মিশকাত শরীফ, বাবু আখলাকিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওয়া শামাইলিহি)

এমনিভাবে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে মাদারিছে আরাবিয়ার জেনারেল সেক্রেটারী পদে দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর উক্ত কমিটির সভার রেজুলিউশন, পরীক্ষা পাশের সনদপত্র ও পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র ইত্যাদিতে তাঁর স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য তাঁর খেদমতে হাজির হতাম, কোনদিন কেন এমন করেছ? কেন এমনি কর নাই? কথাটি আমাকে বলেননি। বরং কোন ভুল হলে মায়ার ভাষায় বলে দিতেন কাজটি এমনিভাবে করলে ভাল হত।

দুই. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরো একখানা হাদীস

من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنَا فَلَيسَ منَّا -

অর্থাৎ, যে ছোটকে স্নেহ করে না এবং বড়কে সম্মান করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তিরমিযিঃ ১৯১৯/ ১৯২১, আবু দাউদঃ ৪৯৪৩, মুসনাদে আহমাদঃ ২২৭৫৫, আদাবুল মুফরাদঃ ৩৫৪/৩৫৫)

আমার হুজুর কিবলাহ এর তবিয়ত এমন ছিল যে, তিনি ছোটদেরকে স্নেহ করতেন এবং শিশুদের বা ছোটদের বেলায় শিশু হয়ে যেতেন। প্রমাণ স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করতে যাচ্ছি। পরম শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর প্রতি ইংরেজি মাসের শেষ শুক্রবার আমাদের রাখালগঞ্জ বাজার মসজিদে বাদ জুম'আ বুখারী শরীফের দারস দিতেন। এ মাহফিলে প্রায় হাজার খানেক উলামা হযরত ও অন্যান্য শিক্ষার্থী এবং অনেক লোকজন শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। একদা আমার বাসায় খাবার খেতে বসে ফরমালেন, আমার বুকে কাশির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত প্রকট, তাই নারিকেলের মোরব্বা খাব না। আহারের পর তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমার তিন বৎসরের ছেলে মুহাম্মাদ মতিউর রাহমান মারজান নারিকেলের পাত্র হাতে নিয়ে উক্ত মিষ্টি খাবার চামচ দ্বারা তাঁর মুখ মুবারকে দিতে লাগল এবং তিনি তা খেতে লাগলেন। তখন আমি ধমক দিয়ে বললাম, কী

সর্বনাশ! হুজুর মারাত্মক অসুস্থ আর তুমি তাঁকে নারিকেলের তৈরি মোরব্বা খাওয়াচ্ছ! বলে তার হাত থেকে পাত্রটি কেড়ে নিলাম। সাথে সাথে হুজুর বললেন, সে ছোট মানুষ তো। আমি তাঁকে খুশী করার জন্য খেয়েছি যদিও উহা আমার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ ঘটনাটি ছোটদেরকে স্নেহ মমতা করার জলন্ত প্রমাণ।

তিন. তাঁর উস্তাযের প্রতি ভাব ভক্তি এবং তাঁর প্রতি উস্তায মহোদয়গণের উচ্চ ধারণার প্রমাণ স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। বিগত ১৯৭৪ ইংরেজিতে গাছবাড়ী কামিল মাদ্‌রাসার পরম শ্রদ্ধেয় প্রথম মুহাদ্দিস মরহুম ও মগফুর আল্লামা শফিকুল হক ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একখানা পত্র আমার হাতে দিয়ে আমাকে ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসায় জনাব মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের কাছে প্রেরণ করলেন। সাথে সাথে তিনি একথাটি বললেন যে, আমি অসুস্থ হয়ে গেছি। আমার বুখারী শরীফ পড়ানোর জন্য যোগ্য লোক পাচ্ছি না। আমি কয়েকজন মুহাদ্দিস ছাহেবের নাম বললাম। তদুত্তরে তিনি ফরমাইলেন, উনারা তিফিল মুহাদ্দিস। পক্ষান্তরে মুহতারাম হবিবুর রাহমান ছাহেব হলেন কামিল মুহাদ্দিস। আমি কয়েকবার তাঁকে গাছবাড়ি কামিল মাদ্‌রাসায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি আসতে পারেননি। এখন দেখা যাক, তিনি কী বলেন। আমি ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে ছালাম ও কদমবুসি করার পর বললাম, আমি গাছবাড়ি কামিল মাদ্‌রাসার মুহতারাম মুহাদ্দিস ছাহেবের একখানা পত্র নিয়ে আপনার খেদমতে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বসা থেকে দাঁড়িয়ে পত্রখানা হাতে নিয়ে বললেন, এ পত্রের মর্ম কথা আমার জানা আছে। আমি উত্তর না লিখে সরাসরি সময় সুযোগে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হব ইনশা আল্লাহ।

চার. হাদীসের উপর যথাযথ আমল ও উস্তায ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন, বিশেষ করে স্বীয় উস্তায ও মুর্শিদ, যুবদাতুল আরিফীন, কুদওয়াতুস সালিকীন, শামছুল উলামা, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন ওয়াল মুফাসসিরীন ওয়াল ফুকাহা রইছুল কুররা, আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট আল্লামা ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশ যথাযথ সম্মানের সাথে পালন করতেন। তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। বিগত ১৯৬৫ ইংরেজী সনে সৎপুর কামিল মাদ্‌রাসায় কামিল জামাতে হাদীস পড়ানোর জন্য আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফরমাইলেন যে, আপনাকে আমরা আউয়াল মুহাদ্দিস পদে মনোনীত করার মনস্থ করেছি। মুহতারাম মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর অনুনয় বিনয় সহকারে ধীর গতিতে আরজ করলেন যে, আমি সবে মাত্র কামিল পাশ করেছি। আমি কি বুখারী শরীফ পড়াতে পারব? তদুত্তরে হযরত ছাহেব কিবলাহ ফরমাইলেন, আমি মদীনা শরীফ হতে সৎপুর মাদ্‌রাসার কামিল জামাতের মঞ্জুরি নিয়ে এসেছি, সাথে সাথে মুহাদ্দিস ও দেয়ার জন্য চেয়েছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশারায়

আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং আপনি বুখারী শরীফ পড়াতে পারবেন। ভক্তি সহকারে স্বীয় উস্তায ও মুর্শিদের নির্দেশ মেনে সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায় প্রথম মুহাদ্দিস পদে যোগদান করলেন।

আমাদের মুহতারাম উস্তায মরহুম ও মগফুর আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত বিধি বিধান মোতাবেক মালিক ও মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে ইন্তেকাল করেছেন। কালামে পাকে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

كل نفس ذائقة الموت - (سورة آل عمران)

অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ الخ - (سورة الجمعة)

অর্থাৎ, হে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি বলে দিন, (হে মানব জাতি!) তোমরা মৃত্যু থেকে পালাতে চাচ্ছ? নিশ্চয়ই মৃত্যু তোমাদের সাক্ষাত করবেই। এর মানে হল, তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

আরবীতে একটি প্রবাদ আছে,

مَوْتُ الْعَالِمِ كَمَوْتِ الْعَالَمِ

অর্থাৎ, একজন বিশেষজ্ঞ আলেমের মৃত্যু এক জাতি বা জগতের মৃত্যুতুল্য। কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে,

علماء امتى كانبياء بني إسرائيل - (سلسلة الأحاديث الصحيحة)

অর্থাৎ আমার উম্মতের আলেমগণের মর্যাদা বনী ইসরাইলের নবীগণের সদৃশ। অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

مدَادُ الْعَلَمَاء أَفْضَل من دماء الشهداء - الأسرار المرفوعة لملا على القارى)

কেননা আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - (سورة المؤمن : ٤١)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগনই তাঁকে অত্যধিক ভয় করে থাকেন।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর অত্যন্ত খোদাভীরু দ্বীনের খাদিম ছিলেন। কিন্তু আমাদের পাগলপারা মনকে একটি হাদীসের বাণী শান্তনা দেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন,

نَضَرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا حَفِظَهُ حَتَّى يبلغهُ غَيره - (رواه الترمذي وأبو داود)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির মুখকে চির উজ্জ্বল বা চাকচিক্যময় করুন যে আমার পক্ষ থেকে হাদীস শুনে তা সংরক্ষণ করল বা কণ্ঠস্থ করল এবং তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিল। এ হাদীসের মর্মকথা আমার মুহতারাম উস্তায তাঁর জীবনে পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করে গেছেন। তাঁর কাছ থেকে হাজার হাজার মুহাদ্দিস, আলিম উলামা হাদীস অধ্যয়ন করেছেন। সুতরাং আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর চেহারা সমুজ্জ্বল করবেন। তাঁর ইন্তেকালের পর অনেকে স্বপ্নে দেখেছেন তাঁর মুখমন্ডল সু-উজ্জল এবং সু-উচ্চ বালাখানায় অনেক খাদিম সহ অবস্থানরত আছেন। তবে আক্ষেপের কথা হল, আমরা একজন ক্ষণজন্মা প্রথিতযশা প্রখ্যাত হাদীস বিশারদকে হারিয়েছি। তিনি ইলমের সাগর ধারণ করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো একখানা হাদীসে এরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মানুষ থেকে ইলম উঠিয়ে বা কেড়ে নিবেন না, বরং তিনি ইলম উঠিয়ে নেবেন আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে। (বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালিহীন)

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে হারিয়ে আমরা একজন যোগ্যতম হাদীসে নববীর খাদিম, সঠিক পথের দিশারী, প্রাজ্ঞ মনীষী, উলামাগণের অভিভাবক, ফয়েজে লতিফির গুপ্ত ভান্ডারকে হারিয়েছি। আমাদের স্মৃতির দর্পণে কত কথা, কত ইতিহাস ভেসে উঠে, যা লিখনী দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর ইন্তেকালে দেশ ও জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা বর্ণনাতীত। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমান,

مَوْتُ أَلف عابد أَهْوَنُ مِنْ مَوتِ عَالِم بصير بحلالِ اللّٰهِ وَحَرَامِهِ

অর্থাৎ হালাল ও হারামের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিধারী সচেতন আলেমের মৃত্যু থেকে হাজার আবেদের মৃত্যু অতি নগন্য বা তুচ্ছ। (জামিউল বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি) প্রকৃত ও দক্ষ আলিমের শূন্যতা পূর্ণ হয় না। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের খেদমতে হাদীসের তা'আরুদ, তাফসীরে কালামে পাকের অনেক জঠিল বিষয়ের সমাধান, ফিকহ ও আকাইদ সংক্রান্ত কঠিন মাস'আলার সিদ্ধান্ত অনেক মুহাদ্দিস ও উলামায়ে কেরাম তাঁর নিকট থেকে পেতেন, তাই তাঁর মাহফিলসমূহে উলামায়ে কেরামের অধিক উপস্থিতি

হত। তাঁর মত বাহরুল উলুম ব্যক্তি হাতেগোনা, খুবই অল্প সংখ্যক। তাঁর মত প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ আলিমের মৃত্যু সমাজ ও বিশ্ববাসীর ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়ার কারণ বটে। হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল,

مَا عَلَامَةُ هَلاكَ النَّاسِ؟ قَالَ: إِذَا هَلَكَ عُلَمَاءُهُمْ (مسند الدارمي)

অর্থাৎ, মানব জাতি ধ্বংস হবার আলামত কী? তদুত্তরে তিনি বললেন, আলেমগেণর মৃত্যুই হচ্ছে তাদের ধ্বংস বা পতনের আলামত। হকপন্থী উলামা হযরত পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে সঠিক পথের পরিচালনাকারী সমাজে পাওয়া যাবে না, ফলে অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা সমাজের নেতৃত্ব দেবে এবং শরীয়তের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নিজে পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ মর্মে একখানা হাদীস বর্ণিত আছে। নবীজীর হাদীসে আরো বর্ণিত আছে,

النّاسِ أنفعهم للناس(صحيح ابن حبان)

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে মানুষের অধিক উপকার করে। মুহতারাম মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের কাছ থেকে দেশ ও জাতি ইলমি ও আমলি দিক দিয়ে উপকৃত হয়েছে।

দোয়া করি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে, তিনি যেন তাঁর খুলুসিয়ত ও লিল্লাহিয়তের সাথে ইলমে হাদীসের খেদমতকে নাজাতের উসীলা হিসেবে কবুল করেন। তাঁকে যেন জান্নাতের আ'লা দরজা তথা জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন। পরকালে তাঁর প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলার সঙ্গী করে উম্মতের কান্ডারী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লিওয়াইয়ে হামদের নীচে স্থান দান করেন, আমীন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, রাখালগঞ্জ ডি কিউ ফাযিল মাদ্‌রাসা, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ
আমার পাওয়া-আমার মূল্যায়ন

অধ্যাপক মাওলানা মোখলেসুর রহমান

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২। আমাদের জন্য এবং আমরা যাঁহার রূহানী ফায়েজ ও আলোর পিপাসী তাদের জন্য এক বেদনা বিধূর শোকাবহ দিন। এদিন আমাদের প্রিয় উস্তায এবং প্রিয় রাহবর, উপমহাদেশের হাদীস বিশারদ উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন, উস্তাযুল ওলামা ইনসানে কামিল, রাসূলের প্রেমে আত্মহারা আরিফ বিল্লাহ, আত্মমর্যাদায় বিনয়ী, বিনম্র ব্যক্তিত্ব, বহু গ্রন্থ প্রণেতা হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস মো. হবিবুর রহমান সাহেব রফীকে আলা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন ইলমে দ্বীন ও হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি বড়ই সৌভাগ্যবান যে তাঁর অসংখ্য ছাত্র মুহাদ্দিস, ওলামা ও দীনের দায়ী হিসেবে খেদমত করছেন। তিনি সম্মোহনকারী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হাদীসের দারস প্রদান করেছেন। তাঁর দারসে সকল ছাত্ররা সম্মোহণের সাথে বয়ান শ্রবণ করতেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন ইনসানে কামিল এবং তিনি ছিলেন রাসূলের একজন খাঁটি প্রতিনিধি। তাঁর দারসে হাদীসের সাথে রাসূলের মহব্বত ছিল একাকার। তরিকতের ছিলছিলায় তিনি আরিফ বিল্লাহ আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলার অন্যতম খলিফা। শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ নিজেই লিখেছেন "আল্লামা ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর মতো মহান ওলীর সান্নিধ্য পাওয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ তরীকতের ইজাজত হাসিল ও এসবই আমার এবং আরো অনেকের জীবনের পরম প্রাপ্তি।" ব্যক্তিজীবনে ইলমে হাদীস ও তরীকতের পথ পরিক্রমায় আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব আমাদের সকলের মুর্শিদ ফুলতলী ছাহেব কিবলার স্নেহধন্য ও অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। ছাহেব কিবলাহ সব সময় মুহাদ্দিস ছাহেবকে গুরুত্বসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিকটে ডেকে নসিহত প্রদান করতেন।

আমরা জানি যে প্রকৃত আলেমগণ হচ্ছেন নবীদের ওয়ারিশ তথা রাসূলগণের প্রতিনিধি, শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব ছিলেন একজন প্রকৃত খাটি নায়েবে রাসূল। আর নবী ও রাসূলদের আগমন পরিক্রমায় হযরত ইব্রাহিব আলাইহি সাল্লাম তাঁর বংশধর দের জন্য একটি দোয়া করেছিলেন তা পবিত্র কুরআনে আছে:

"হে পরওয়ার দিগার। তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলোয়াত করবেন এবং তাদের কিতার ও হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয়ই তুমি মহাপরক্রমশালী হেকমতওয়ালা"।

উক্ত আয়াতে হযরত ইব্রাহিম আঃ এর দোয়ার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, মূলত: নবী রাসূলের প্রধান কাজ হলো আল্লাহ তায়ালা নিকট থেকে অবতীর্ণ কিতাবের তেলাওয়াত, আল

কিতাব ও আল হিকমাহ তথা কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা এবং সকল প্রকার জ্ঞানের শিক্ষা দান করবেন, তাযকিয়ায়ে নফস তথা আত্মার পরিশুদ্ধির শিক্ষা দান করবেন। (আল ইমরান আয়াত নং ১৬৪)

যেহেতু আল ওলামাউ ওরাসাতুল আম্বিয়া আলেমগণ হচ্ছেন নবী রাসূলগণের ওয়ারিশ কোন ধন সম্পদের ওয়ারিশ নন। দীনের প্রচার ও প্রসারে ইলমের ওয়ারিশ। আর ওলামারা হচ্ছেন নায়েবে রাসূল তাই সত্যিকার নায়েবে রাসূলের প্রধান কাজ হলো উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত নবী রাসূলের চারটি কাজ। শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব (রহ:) এর জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি নায়েবে রাসূল হিসাবে উপরোক্ত চারটি দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত অত্যন্ত সফল ভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন কুরআন শরীফের তেলাওয়াতকারী ও শিক্ষাদানকারী, তিনি ছিলেন ইলমে হাদীস, ইলমে শরিয়ত এবং ইসলামী জ্ঞানের শিক্ষা দানকারী। তিনি ছিলেন তাযকিয়ায়ে নফসের শিক্ষাদানকারী একজন কামিল বুজুর্গ। তিনি হলেন আমাদের মুর্শিদ ফুলতলী ছাহেব কিবলার (রহ:) অন্যতম স্নেহভাজন খলিফা।

তিনি সারাটি জীবন আল কিতাব ও আল হিকমত তথা কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীসের) তালিম প্রদান করেছেন। তিনি তাফসীরুল কুরআনের দারস দিয়ে এবং ওয়াজ মাহফিলে কুরআনের তফসীর বয়ান করে আল কিতাবের খেদমত করেছেন, তেমনি দারসে হাদীসের তালিম ও মাহফিলে হাদীসের বয়ান প্রদান করে হিকমাহ তথা সুন্নাহ ও হাদীসের খেদমতের রেখেছেন অবিস্বরণীয় অবদান। তিনি মুহাদ্দিস হিসাবে শ্রেণী কক্ষে সিহাহ সিত্তা গ্রন্থ সমূহের দারস দিয়ে বহু মুহাদ্দিস তৈরি করেছেন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান অতি নিরবে তাযকিয়া তথা ব্যক্তিশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধির খেদমত করেছেন। তাঁর বয়ানে ও চলনে, বলনে ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগাধ মহব্বত। তিনি তাঁর বয়ানে সবসময় সহীহ ঈমান ও আকীদা, সহীহ ইবাদত বন্দেগী তথা যাহিরী আমল এবং সহীহভাবে আত্মশুদ্ধিকরণ অতি সুন্দরভাবে প্রচার করতেন। ইলমে তাসাউফের দৃষ্টিকোন থেকে তাঁর মুর্শিদ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলার প্রতি ছিল ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। এমনকি তাঁর রয়েছে অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সকল ছাহেবজাদাদের প্রতি। তিনি ওয়াজ নসিহতে সকলের নিকট আবেদন করে বলতেন ছাহেবজাদারা হলেন আমাদের মুকতাদা। আমরা আমাদের ছাহেব কিবলাকে যদি ভালোবাসি তবে ছাহেবজাদাদেরকে আমাদের ভালোবাসতে হবে, আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে।

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতা'লা কালামে পাকে বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে, সে তাদের সাথে থাকবে; যাদের উপর আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ নবী রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককার ব্যক্তিগণের সাথে থাকবে। আর তারাই সর্বোত্তম বন্ধু।" মানুষ তার দুনিয়ার জীবন যে ভাবে যে মনোভাবে যার সাথে মিলেমিশে বসবাস করে তেমনিভাবে সে ব্যক্তি আলমে বরযখ ও আলমে আখেরাতেও মিলিত হয়ে বসবাস করবে। এ আয়াতের আলোকে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের জীবন, আচার আচরণ, কর্ম-জীবন পর্যালোচনা

করলে আমরা বলতে পারি তিনি মর্যাদার উচ্চ আসনে অবস্থান করেছেন। রূহ ও আত্মার স্তর ও প্রকারভেদে নিঃসন্দেহে মুহাদ্দিস ছাহেব (রাহঃ) মুমিনের রূহ। মুমিনরা আল্লাহর নূর দিয়ে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে অবলোকন করতে পারেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম ফরমাইছেন "আল ওলামাউ ওসরাসাতুল আম্বিয়া" আলেমগণ দীনের ইলম ও প্রচারের জন্য নবী রাসূলের ওয়ারিশ। কোন সম্পদের ওয়ারিশ নন। যেহেতু নবী-রাসূলগণের কোন ধন সম্পদ অবশিষ্ট থাকে না। অন্যদিকে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম, ছাহেবুল হাদীস শরীফ, দু'জাহানের সরদার। তিনি হাদীস সংকলক, হাদীস দারস প্রদানকারীদের জন্য দোয়া করেছেন।

অন্য আরেকটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম মুহাদ্দিসগণকে তাঁর খলিফা হিসাবে রহমতের দোয়া করেছেন।

বর্তমান যুগের জন্য শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব ইলমুল কিরাত, ইলমুল হাদীস, ইলমুল ফেকাহ, ইলমুল তাফসির ও ইলমুল তাসাউফের অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেম।

আমাদের সকলের নিকট মুহাদ্দিস ছাহেব হিসাবে খ্যাত এবং আমাদের সকলের নিকট শ্রদ্ধাভাজন তিনি হলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান। তিনি অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল সময় সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস, ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ও হাদীসের খেদমত প্রদান করেন। দারসে হাদীসের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নিকট কুরআনের তফসির ও হাদীসের শিক্ষা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন মাহফিলে বয়ান পেশ করেছেন। এছাড়া দাওয়াতী সফরে বিভিন্ন সময় তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সিরিয়া, মরক্কো, ভারত, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেছেন। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের উম্মুল কুওয়াইন শহরে মসজিদের খতীব ও ইমামের দায়িত্ব এবং তিনি উম্মুল কুওয়াইন কোর্টে বিচারকের (কাজী) দায়িত্ব পালন করেছেন।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান এ যুগের শ্রদ্ধাভাজন শায়খুল হাদীস ও মনীষি ইসলামি চিন্তাবিদ, হাদীস বিশারদ, দারসে হাদীস ও সাধারণ মাহফিলে বয়ান প্রদানের পাশাপাশি দীনের খেদমতে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে আল কাউলুল মাকবুল ফী মিলাদির রাসূল, দোয়ায়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফযিলত, মাসআলায়ে উশর; প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, দুরূদ শরীফের ফযিলত ওযীফা, যিয়ারতে মদিনা মুনাওয়ারা (ফযিলত ও নিয়ম), আসহাবে বদর, ওযীফা, হজ্জ ও যিয়ারত (সংক্ষিপ্ত আহকাম ও নিয়ম), হাদিয়াতুল লাবীব ফী নাবযাতিম মিন সিরাতিন নাবিয়্যিল হাবীব, যাখীরাতুল আহাদীসিল আর বাঈন ফী ফাদায়িলি সায়্যিদুল মুরসালিন, কানযুল আহাদিসিল আরবাঈন ফী মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যিল আমিন, তুহফাতুল লাবিব বী আসানীদিল হাবীব, আততুলফাতুল লাতীফাহ ফি আহাদীসীল মুসালসালাতিল মুনীফাহ, দালাইলুল খাইরাত (তাহকীক ও বিন্যাস), আল হিযবুল আযম (তাহকীক), মুনতাখাবুস সুনান ওয়াল আসার। এছাড়া তিনি মাসিক শাহ জালাল নামে একটি মাসিক ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছিলেন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব নিজের বাড়ির নিকটে মসজিদ কমপ্লেক্স

হাবিবিয়া হিফজুল কুরআন একাডেমী ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে একটি আলাদা ভবন দুতলা ভবন নির্মাণ করে নিজস্ব লাইব্রেরির কিতাব এবং আরোও গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ক্রয় ও সংগ্রহ করে গবেষণা উপযোগী হাবিবিয়া লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমার দেখা ও আমার পাওয়া আমার প্রিয় উস্তায মুহাদ্দিস ছাহেব খ্যাত শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান। প্রথম দেখায় আমরা সম্মোহনে পড়ে যাই। ১৯৭৪ সালে আমি ইছামতি সিনিয়র মাদ্‌রাসায় আলিম ২য় বর্ষে অধ্যয়ন করি। তখন আমরা জানলাম যে সৎপুর কামিল মাদাসা থেকে তিনজন মুহাদ্দিস আমাদের মাদ্‌রাসায় যোগদান করবেন। আমরা আনন্দে আত্মহারা যে আমরা তিনজন যোগ্য উস্তাযের সান্নিধ্য পাবো, তাদের দারস পাবো। তাঁদের দোয়া ও আদেশ উপদেশ পাবো। ১৯৭৪ সালে ইছামতি দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় আমাদের প্রিয় উস্তায শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। আরোও যোগদান করেন মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল জব্বার গুটারগ্রাসী ও মুহাদ্দিস আল্লামা মোতাহির আলী (বাল্লা)। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের নেতৃত্বে মাদ্‌রাসায় প্রবাহিত প্রাণের জোয়ার। ফুলতলী ছাহেব কিবলার আদশে ও নির্দেশে ১৯৭৫ সালে অত্র মাদ্‌রাসায় দারসে হাদীস (কামিল ক্লাস) শুরু হলো। ১৯৭৭ সালে ৩য় ব্যাচে আমি মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের দারসে হাদীস বোখারী শরীফের সাগরেদ। দারসে হাদীসে হুজুরের জ্ঞানীয় তাকরির ছিল অতূলনী। বদউল ওহী (নুজুলে ওহীর) ক্লাসের তকরির এখনও কানে বাজে। মনে হয় যেন এই মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিবরাইল আলাইহিস সালাম ওহী নিয়ে এসছেন। বোখারী শরীফের প্রথম হাদীস ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়ত তকরির আহা ফি সম্মোহনীয় ছিল। দুর্ভাগ্য আমরা হুজুরকে বেশিদিন পাইনি। তিনি ছাহেব কিবলার নির্দেশে বিশেষ প্রয়োজনে সংযুক্ত আরব আমিরাত চলে গেলেন।

১৯৮২ সালে আবারো তিনি ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। বিভিন্ন সময়ে হুজুরের দোয়া নিতে তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণ করেছি। সব সময় পেয়েছি হুজুরের স্নেহ ও দোয়া। সময়ের প্রবাহে আমিও হয়ে যাই প্রবাসী। দীর্ঘ প্রতিক্ষায় ২০১৩ সালে সুদূর লন্ডনে মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলালের মাধ্যমে হুজুরের সাথে আমার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। হুজুরের নিকট একান্ত দোয়া প্রার্থী হই। হুজুর একান্তভাবে আমাকে সাদরে গ্রহণ করেন।

হুজুরের নিকট রূহানী সম্পর্কের জন্য আবেদন জানাই এবং বিশেষ দোয়ারও দরখাস্ত জানাই। এই বৎসরই হজ্জ পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। হুজুরের বিশেষ দোয়া ও বিভিন্ন সবক গ্রহণ করে এবং বিশেষ আমল ও নির্দেশ মোতাবেক হজ্জ পালন করেছিলাম। হজ্জ পালন ছিল আমর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এর পরে দেশে হুজুরের খেদমতে হাজির হয়ে দোয়া ও পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সবক গ্রহণ করি। পর্যায়ক্রমে হুজুর আমাকে দালাইলুল খায়রাত, আল হিজবুল আযম ও হিযবুল বাহার এর এজাজত ও সবক প্রদান করেন। সময়ের সাথে পর্যায়ক্রমে বিশেষ সবক ও প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্য হুজুর নিজের ইচ্ছায় আমাকে বড় ছাহেব কিবলার নিকট যাওয়ার ইজাজত দেন। বড় ছাহেব কিবলার সাথে বিশেষ আমলে অংশ গ্রহণের পূর্বে মাগরিবের নামাজের পর হুজুরের দোয়া নেওয়ার জন্য হুজুরের বাড়িতে হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হই।

ড্রয়িং রুমে অগণিত আলেমগণের সামনে আমাকে সম্মোধন করে হুজুর বলেন, "আমি তোমাকে দোয়া করে এ পথে এনেছি", হুজুর উপস্থিত সকল আলেমদের নিয়ে আমার জন্য দোয়া করলেন। আমার হুজুর ছিলেন আমার আলো, আমার রাহবার, আমার দোয়ার আঁধার। হুজুরের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল আলো ও আলোকিত পথে। হুজুর শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফোনে আলাপ হলে হুজুর বলতেন আমার জন্য দোয়া করিও। হুজুরের ছোহবত পাওয়ার আশায় আমেরিকা থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে বাংলাদেশে যাই। হুজুরের ইন্তেকালের পূর্বের দিন ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ হুজুরের বাড়িতে হুজুরকে দেখতে যাই। হুজুর অন্তিম শয়ানে দেখে বুক ভেঙ্গে চোখের পানি ঝরলো। কোন জবান পেলাম না, শুধুই দেখলাম হাত ও কপাল ছুঁয়ে দেখলাম। যোহরের নামাজের পর জিয়ারতে সকলকে নিয়ে মহান রাব্বে কারিমের নিকট ফরিয়াদ জানালাম; আয় রাব্বে কারিম আমার হুজুরের জবান খুলে দাও, হুজুরকে জানিয়ো দাও মোখলেস সুদূর আমেরিকা থেকে দেখতে এসেছে, হে আল্লাহ আমার হুজুরের জানের প্রতি আসান করো, হে আল্লাহ আমার হুজুরের খাতেমা বিল খায়র করো।

বিকেলে ফেরত আসার সময় হুজুরকে দেখতে আবার যাই। তখন আমি দেখি হুজুরের নূরানী চেহারা ফুটেছে। এ সময়ে আমি হুজুরের বুকে ও হাতে একটু মৃদুভাবে ধরি এবং হাত দিয়ে বলতে থাকি হুজুর আমি মোখলেস আমেরিকা থেকে এসেছি। আল্লাহ সুবহানুহু তায়ালার কি রহমত ও দয়া। হুজুরের জবান খুলে যায়, আমার প্রিয় হুজুর বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুল্লিাহ। এরপর বলেন ফি আমানিল্লাহ, ফি আমানিল্লাহ, ফি আমানিল্লাহ, হাত উঠায়ে দোয়া করেন। আমার হুজুরকে প্রাণ ভরে দেখি এই মুহূর্তে হুজুরের হাতে কিছু হাদিয়া দেই- তিনি গ্রহন করেন। এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া, হে আল্লাহ আমি তোমার শোকর আদায় করে বলছি আলহামদুলিল্লাহ।

পরেরদিন ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ আমার হুজুর তাঁর রাফীকে আ'লার ডাকে সাড়া দিয়ে ওপারে চলে গেলেন। আমার সৌভাগ্য হলো যে, আমি জানাজা ও দাফনে শরীক হতে পেরেছি। হে আল্লাহ আমার আলো, আমার রাহবর, আমার প্রিয় উস্তাযকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন, আমিন।

লেখক: বহুগ্রন্থ প্রণেতা, কবি।

একজন নায়িবে নবী আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা শেহাব উদ্দিন গোটারগ্রামী

সেই বাল্যকাল থেকে আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ঘিরে কত শত স্মৃতি মনের গভীরে জমা হয়ে আছে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ আত্মীয়তার সম্পর্কে আমাদের দাদা (আমাদের ওয়ালিদ ছাহেবের সম্পর্কে মামা)। আমাদের ওয়ালিদ ছাহেব (শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল জব্বার গোটারগ্রামী রাহিমাহুল্লাহ) এবং হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ'র মধ্যে ছোট কাল থেকেই গভীর সম্পর্ক ছিল, যদিও আমাদের বাবা মুহাদ্দিস ছাহেব থেকে বয়সে কিছু ছোট ছিলেন। গোটারগ্রামী মুহাদ্দিস ছাহেব নামে খ্যাত আমাদের ওয়ালিদ মুহতারাম এবং হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব কামিল পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীতে উভয়ে একই সাথে দীর্ঘদিন সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসা এবং ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় হাদীসে নববীর খিদমাত আনজাম দিয়েছেন। উভয়ের অগণিত ছাত্র সময়ের পরিক্রমায় বরেণ্য আলিম হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছেন।

আত্মীয়তার সম্পর্কের সুবাদে ছোটকাল থেকেই হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের একান্ত সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। আমরা বিভিন্ন উপলক্ষে উনার বাড়িতে যেতাম, তাই কেবল আমি নই আমাদের সকল ভাই বোন তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তিনি আমাদের খুবই স্নেহ করতেন। তাই যেকোন সময় তাঁর খিদমতে যেতে ভয় কিংবা সংকোচ করতাম না। তিনি সব সময় আমাদের মামা আল্লামা মাশুক আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির (পরবর্তীতে যিনি ইছামতি মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহন করেন) মাধ্যমে আমাদের পরিবারের সব প্রয়োজনের খোঁজ খবর রাখতেন।

আমার পরম সৌভাগ্য যে, ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় উনার কাছে সহীহ বুখারী ও জামিউত তিরমিযী পড়ার সুযোগ পেয়েছি। আমার দৃষ্টিতে সবদিক থেকেই তিনি ছিলেন একজন পথিকৃত (Role models)। যারাই তাঁর সান্নিধ্য পেতেন, বিশেষ করে তাঁর ছাত্রগণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণের চেষ্টা করতেন। মূলতঃ এটি প্রকৃত ওয়ারাসাতুল আম্বিয়াগণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আমরা অনেকেই শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি, কিন্তু অনুসরণীয় শিক্ষক হওয়া এতটা সহজ নয়। একজন সত্যিকার ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হচ্ছেন প্রকৃত অনুসরণীয় শিক্ষক।

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে

দেখে অনুসরণ করতেন। এ পর্যায়ে আমি দু'টি হাদীস উল্লেখ করতে চাই।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أطعم وأسقى

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেহরী না খেয়ে ধারাবাহিক রোযা (সাওমে ওয়েসাল) রাখতে নিষেধ করলেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো সেহরী ব্যতীত ধারাবাহিক রোযা রাখেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- আমি তোমাদের মত নই। আমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) পানাহার করানো হয়। (সহীহ বুখারী)।

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

.

অর্থাৎ, তাবিঈ হাম্মাম ইবন হারিছ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) জারীর ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্রাব করে ওজু করার সময় মুজার উপর মাসেহ করলেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এরূপ করলেন? উত্তরে তিনি বলেন, কিসে আমাকে এমন কাজ থেকে বিরত রাখবে যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতে দেখেছি। (সুনান ইবনু মাজাহ)।

উল্লিখিত দু'টি হাদীস পেশ করে আমার উদ্দেশ্য একথা প্রমান করা যে, সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইইহি ওয়াসাল্লাম এর বিভিন্ন কাজ দেখে দেখে অনুসরণ করতেন। অনুরূপ পরবর্তীরা একজন সত্যিকার ওয়ারিসে নবীর বিভিন্ন কাজ দেখে অনুসরণ করে আসছেন। এমনই সর্বক্ষেত্রে অনুসরণীয় সত্যিকার একজন ওয়ারিসে নবী ছিলেন হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ।

ছোটবেলা থেকেই আমি ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার ছাত্র। জোহরের নামাযের সময় হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ মাদ্‌রাসার মসজিদে জোহরের ফরয পূর্ববর্তী চার রাকাত এবং পরের দু'রাকাত সুন্নাত নামায যখন আদায় করতেন খুব মনযোগ সহকারে তাকিয়ে থাকতাম। নামাযে তাঁর দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা, বসা আমাকে খুবই আকর্ষণ করতো। পরবর্তীতে জেনেছি, নামাযে তাঁর এই কাইফিয়াত হুবহু সুন্নাতে নববীর অনুসরণ।

মানুষের সাথে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর আচার ব্যবহার কত যে শালীন, মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় ছিল তা সর্বজন বিধিত। তাঁর কোন কথা ও আচরণে কেউ কখনো বিরক্ত হয়েছে, কষ্ট পেয়েছে এমন নজীর আমাদের জানা নেই। ছাত্রদের সাথে তিনি

এমন মধুর আচরণ করতেন যাতে পলকে সবাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়তো। সাধারণতঃ কামিল জামাতের ছাত্রদের তিনি মাওলানা বলে সম্বোধন করতেন। আমাদের চোখে দেখা, বহু উশৃঙ্খল ছাত্রকে তাদের পিতা মাতা চরম হতাশা আর বিরক্তি নিয়ে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর খেদমতে সমর্পণ করে দিতেন। তাঁর সহবতে অল্প সময়ে লেখাপড়ায় অমনযোগী উশৃঙ্খল সেই ছাত্রও সোনার মানুষে পরিণত হয়েছেন। গরীব ছাত্রদের কিতাবাদী, কাপড়চোপড় ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজন তিনি কোন না কোনভাবে পূরণ করে দিতেন।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এমন একজন আলোকিত মানুষ ছিলেন। তিনি যখন যেখানে গিয়েছেন সেখানকার অন্ধকার দূরিভূত হয়েছে। তিনি যখন সৎপুর মাদ্‌রাসায় যান তখন সেই মাদ্‌রাসা সিলেট জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেছিল। তিনি ইছামতি মাদ্‌রাসায় আসার পর অল্প সময়ে এ মাদ্‌রাসাও একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ দুই বিখ্যাত মাদ্‌রাসায় তাঁর সহবতে থেকে অসংখ্য ছাত্র সময়ের শ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে গড়ে উঠেছেন। তাঁরা বাংলাদেশ ছাড়াও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইলমে দ্বীনের আলো ছড়াতে নিয়োজিত হয়েছেন।

তিনি উস্তাযগণের প্রতি সব সময়ই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিশেষ করে স্বীয় উস্তায ও মুরশিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলার প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অনাগত কালের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। তাঁর উস্তাযগণের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁদের সাথে কতিপয় ফুরুঈ (শাখাগত) মাসআলায় ইখতিলাফ ছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ তো নয়ই বরং পরোক্ষভাবেও কোনদিন তাঁদের ব্যাপারে কোন কটু মন্তব্য করেছেন এমন নজীর নেই। এটিই আখলাকে হাসানা, এটিই উলামায়ে কিরামের শান।

তাঁর ইলম, তাকওয়া ও চারিত্রিক মাধুর্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ বর্ণনা দেয়া আমার জন্য সাঁতার কেটে মহাসাগর পাড়ি দেয়ার মতো অসাধ্য। সংক্ষিপ্ত কথা হলো, ইলম এবং যাবতীয় মানবিক গুণাবলীতে তাঁর উদাহরণ তিনি নিজে। তাঁর মত বিদগ্ধ একজন নায়িবে নবীকে হারিয়ে আমরা ইলমের জগতে ইয়াতীম হয়েছি।

আল্লাহপাকের দরবারে কায়মনোবাক্যে দুআ করি তিনি যেনো হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মাকাম দাম দান করেন। তাঁর রূহানী দুআ ও তাওয়াজ্জুহ আমাদের জন্য জারি রাখেন।

লেখক: মুহাদ্দিস, দারুল হাদীস লতিফিয়া লন্ডন। প্রেসিডেন্ট, লতিফিয়া উলামা সোসাইটি ইউকে।

ইলমে হাদীসের এক উজ্জল নক্ষত্রের বিদায়

মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদী

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم

আমরা সাধারণত দেখতে পাই যেসকল আলেম রাজধানী অথবা কোন জেলা শহরে বসবাস করেন তাদেরকে সবাই চিনে। দেশব্যাপী তাদের একটা পরিচিতি থাকে। এর বিপরীতে যেসকল আলেম কোন অজপাড়া গায়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন তারা যত বড় আলেমই হোন না কেন তাদেরকে দেশের সবাই চিনতে পারে না। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের খুব একটা পরিচিতি থাকে না। আর থাকলেও খুব সীমিত পরিসরে এবং দেশের ছোট একটি অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সিলেট জেলার জকিগন্জ উপজেলার তিনজন মুহাদ্দিস ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁরা জেলা শহর বা রাজধানীতে অবস্থান না করে থাকলেও বৃহত্তর অঞ্চলের গণমানুষ বিশেষত: ওলামা মাশায়েখ মহলে তাঁদের ব্যাপক পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তাদের একজনের পরিচিতি কেবল তাঁর এলাকায়ই নয় বরং ভারত আসামেও তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল। আর অপর একজন তো তাঁর শেষ আমলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

আমাদের ছোটকালে জকিগঞ্জের তিন ব্যক্তিত্ব সর্বসাধারণের কাছে মুহাদ্দিস হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যদিও তথায় অনেক আলেম ছিলেন। তথাপি মুহাদ্দিস হিসাবে এই তিন জনের ব্যাপক পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল। সবার মুখে মুখেই মুহাদ্দিস সাব নামে তাদের পরিচিতি ছিল। একজন আমার উসতায ও মুরশিদ হযরাতুল আল্লাম শায়েখ মুকাদ্দাস আলি দামাত বারাকাতুহু। অপরজন ঘেছুয়া নিবাসী হযরাতুল আল্লাম মাওলানা মুতাসিম বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তৃতীয়জন হলেন রারাই গ্রামের হযরাতুল আল্লাম মাওলানা হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। রারাইর মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন সিলেটের সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসার শাইখুল হাদীস ছিলেন, একারণেই সৎপুরের মুহাদ্দিস সাব হিসেবে তখন সবার কাছে তাঁর পরিচিতি ছিল।

আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিচয়ের সূচনা হয় যখন আমার বড় ভাই হযরত মাওলানা আজিজুর রহমান দামাত বারাকাতুহু এর সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়। তিনি আমার ভাইয়ের ভায়রা। তখন থেকেই তাঁর সাথে আমার ওঠাবসা ও দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয়। আমি দুয়েকবার তাঁর বাড়িতেও গিয়েছি, আর তিনিও আমাদের বাড়িতে এসেছেন। তাছাড়া আমার ভাই তাঁর ছাত্র এবং পরবর্তীতে ইছামতি দারুল

উলুম কামিল মাদ্‌রাসার প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন আর মরহুম হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একই প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাই যখনই ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ইছামতি মাদ্‌রাসায় যাওয়া হতো প্রায় সময়ই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হতো। তাঁর হাস্যজ্জ্বল চেহারা এবং অত্যন্ত আদরযত্ন আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি অতি উত্তম আখলাকের অধিকারী ছিলেন। মানুষের সাথে সর্বদা হাসিমুখে কথা বলতেন। তাঁর কথার মধ্যে অতুলনীয় এক মাধুর্যতা ছিল। তিনি সবার কাছেই সমাদৃত ছিলেন। সবার সাথে মিশে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করতেন। তাঁর মধ্যে অনেকগুলো গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি একাধারে একজন হাদীসের প্রাজ্ঞ শিক্ষক, প্রভাববিস্তারকারী ওয়ায়েজ, ব্যক্তিত্বশালী আলেম, লেখক, সাহিত্যিক ও মুর্শেদে কামেল ছিলেন। শিক্ষকতা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পাশাপাশি অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করে গেছেন। তাঁর সাহিত্যিকতার নিদর্শনস্বরূপ তিনি "মাসিক শাহজালাল" নামে একটি মানসম্মত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, যে কোন কারণেই হোক তা বেশি দিন চালু থাকেনি।

তাঁর অসংখ্য গুণের মধ্যে দু'টি গুণ আমাকে বেশ আকৃষ্ট করেছে। একটি হচ্ছে তাঁর ইলমি গভীরতা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে হকের পক্ষে সব সময় অটল থাকা। এ প্রসঙ্গে আমার দু'টি ঘটনা মনে পড়ে।

ক. একবার কী কারণে যেন ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সিলসিলার শত্রু ও তাঁর সিলসিলাবিরোধী লোক আকবর আলী রেজভীকে নিজের মাদ্‌রাসায় দাওয়াত করে আনেন এবং তাঁরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে এই আকবর আলী রেজভী ছাহেব প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, যাতে তিনি ছাহেব কিবলার সিলসিলার বুজুর্গানে দ্বীনকে গালমন্দ করলেন ও কুফরি ফতোয়া প্রদান করেন। জকিগন্‌জ সিনিয়র মাদ্‌রাসার সমাবেশেও তাকে প্রধান অতিথি হিসেবে নেওয়া হয়। আমি তখন সিলেটেই ছিলাম। রেজভি সাহেবের বক্তব্যের প্রতিবাদে সিলেটের আলেমগণ মাইজকান্দি মাদ্‌রাসায় বিশাল এক সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং বড় বড় উলামা মাশায়েখকে সেখানে দাওয়াত করেন। আকবর আলী রেজভী ছাহেব যেসব অবাস্তব কথাবার্তা বলেছিলেন সমাবেশে সেগুলোর জবাব প্রদান করা হয়।

তখন মাওলানা হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সংযুক্ত আরব আমিরাতে থাকতেন। কারণ সত্তরের নির্বাচনে তিনি নেযামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে জাতীয় পরিষদ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। অতঃপর ৭১ এর যুদ্ধের পর সারাদেশের মাদ্‌রাসা ও আলেম উলামার প্রতি যে অবস্থা বিরাজ করছিল তা তো সবারই জানা। সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশে নিরাপত্তা ছিল না, বিধায় তিনি

আরব আমিরাতে চলে গিয়েছিলেন। সেখানের আদালতে শরইয়্যায় তিনি কাজ করতেন।

আমাদের উলামায়ে কেরাম যখন মাইজকান্দি মাদ্‌রাসায় সম্মেলন করেন তখন মরহুম হবিবুর রহমান ছাহেব বাড়িতে এসেছিলেন। সংবাদ পেয়ে সম্মেলনের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি তাঁর বাড়িতে গেলাম। যাওয়ার সময় কুমিল্লার আবেদ শাহ নামক জনৈক মাওলানার একটি পুস্তিকা সাথে নিয়ে যাই, যাতে তিনি দাবি করেছেন যে সৈয়দ আহমদ রায় বেরেলভি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নাকি সীমান্ত প্রদেশের সুন্নি মুসলমানের হাতে নিহত হয়েছেন। কারণ তিনি নবুওয়তের দাবি করেছিলেন আর খুতবায় নিজের নামের সাথে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাগিয়েছিলেন। একারণে সীমান্ত প্রদেশের সুন্নি মুসলমানের হাতে তিনি নিহত হন। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, সৈয়দ আহমদ রায় বেরেলভি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ব্রিটিশের চর শিখদের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি লিখেছেন সুন্নি মুসলমানের হাতে নিহত হয়েছেন। তার কথামতো শিখরা হচ্ছে সুন্নি মুসলমান।

যাহোক আমি বইটি মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখানোর পর বুঝলতে পারলাম যে, বিষয়টা আগে থেকেই তাঁর জানা আছে। তাই যদিও তিনি সামাবেশে যেতে রাজি হননি কিন্তু আমাকে বললেন যে, ইনশাআল্লাহ আমি কাজ করব এবং কাজ করে আপনাকে রিপোর্ট দেবো। একসপ্তাহ পরে আমার সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে জানালেন যে, হযরত ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুলাউড়ায় ইসালে সওয়াবের যে মাহফিল করতেন, সেই মাহফিলে কুমিল্লার আবিদ শাহকে তিনি আনতে চেয়েছিলেন। তখন আমি আবেদ শাহ লিখিত বই থেকে তার আসল রূপ তুলে ধরি। এছাড়া আমার সমপর্যায়ের যারা তাদের কাছে এই ফিরকার বিভিন্ন বিষয় পরিস্কার জানাই। এতে ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মতের পরিবর্তন হয়। অতঃপর তাকে বাদ দিয়েই ইসালে সওয়াবের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আরো জানালেন, ডিসির কোর্টে বসে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, আকবর আলি রেজভি আর সিলেটে ঢুকতে পারবে না। আলহামদুলিল্লাহ! এরপর আর কোনো সময়ই ঐ লোক সিলেটে আসতে পারে নাই।

খ. দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর প্রণীত একটি খুতবা প্রকাশিত হয়, যার নাম হচ্ছে খুতবায়ে ইয়াকুবিয়া। এ বিষয়ে আমি অবগত ছিলাম না। আমার আম্মাজানের ইন্তেকালের দু'দিন পর ছিল শুক্রবার। তাঁর ইন্তেকাল উপলক্ষে যখন বাড়িতে আসলাম এবং জুমুআর নামাজ আদায়ের

উদ্দেশ্যে মসজিদে গেলাম তখন ইমাম ছাহেব আমাকে নামাজ পড়ানোর অনুরোধ করলেন। আমি খুৎবা দিতে দাঁড়ালে তিনি এই খুতবাটি আমার হাতে এগিয়ে দিলেন। সেদিন ঐ খুৎবা পড়তে গিয়ে হঠাৎ একটি অসঙ্গতিপূর্ণ কথা সামনে আসল। আমি তখন বেশ বিব্রতবোধ করলাম। কিন্তু কী করব খুৎবাটি পড়া শুরু করে দিয়েছি আর হঠাৎ খুতবার মধ্যে একথা এসে গেছে নতুবা আগে জানলে তো মুখস্ত খুতবাই দিতাম। পরবর্তীতে আমি ইছামতি মাদ্‌রাসায় গিয়ে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লিহি আলাইহি এর কাছে বললাম, এই খুতবাটি কি আপনি দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ দেখেছি। এতে ছাপাজনিত বহু অসঙ্গতি আছে। আমি বলে দিয়েছি, এটি যদি পুনরায় ছাপানো হয় তাহলে যেনো ভালোভাবে শুধরানো হয়।

উপরোক্ত দু'টি ঘটনা থেকে আমাদের সামনে যে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হলো সেগুলো হচ্ছে-

ক. মরহুম হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রচলিত মুহাদ্দিসদের মতো সাধারণ কোন মুহাদ্দিস ছিলেন না, বরং তিনি ইলমে হাদীসে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কোন হাদীস সহীহ আর কোন হাদীস জাল তা বোঝার মতো যোগ্যতা তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ছিল।

খ. তিনি সর্বদা হক্ব ও ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন।

গ. হক কথা যদি স্বীয় কোন মুরব্বির বিরুদ্ধেও যায় তবুও তিনি তা বলতে দ্বিধা করতেন না। বরং কোন তোয়াক্কা না করেই সত্যটা প্রকাশ করতেন এবং হকের উপর অটল থাকতেন।

ঘ. মাসলাক প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ভিত্তিহীন কথা বা কাজকে মোটেই সমর্থন করতেন না। তাই যদিও তিনি সর্বদা নিজের মাসলাকের উপর অটল ছিলেন কিন্তু কোন ভিত্তিহীন কথা বা কাজকে কখনো বরদাশত করেননি।

তাঁর সাথে বিভিন্ন মাহফিলেও আমার যোগদান করার সুযোগ হয়েছে এবং তাঁর বক্তব্য শোনারও সুযোগ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! তাঁর বক্তব্য ছিল খুবই হৃদয়গ্রাহী। তিনি সর্বদা কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতেই আলোচনা করতেন। দ্বীনি দাওয়াতের লক্ষে তিনি স্বদেশ ছাড়াও ইংল্যান্ডসহ বহু দেশ সফর করেছেন। তাছাড়া একাধিকবার হজ্জও আদায় করেছেন।

ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে আমি সিলেটে এসেছিলাম। তখন জকিগঞ্জে আমার একটি প্রোগ্রাম ছিল। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি মারাত্মক অসুস্থ। তিনি ও তাঁর স্ত্রী উভয়েই তখন শয্যাশায়ী। তখন তাঁকে দেখার জন্য তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, আমার তো কোমর থেকে নিয়ে উপর পর্যন্ত ভালো কিন্তু কোমর থেকে নিচের অংশ নাড়াচাড়া করতে পারি না। তখনও তাঁর কথাবার্তা বেশ

পরিষ্কার ছিল। এই ছিল তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথাবার্তা। এরপর কিশোরগঞ্জ থেকেই তাঁর ইন্তেকালের খবর পাই।

মানুষ মরণশীল। সবাইকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটিই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের ফয়সালা। তাই তিনিও আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমরা দুআ করি আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তাঁকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন, তাঁর সন্তানাদিকে তাঁর জন্য নেক ইয়াদগার হিসেবে কবুল করুন, আমিন।

লেখক: শায়খুল হাদীস, আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া কিশোরগঞ্জ। বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

দূর আকাশের তারা

মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম

মুহাদ্দিস সাব হুজুর কিংবা ইছামতির শেখ সাব হিসেবে সমধিক পরিচিত এক পণ্ডিত আলেম ছিলেন হযরত মাওলানা শায়খ মো. হবিবুর রহমান শায়খে ইছামতী রহ.। তিনি আমার কাছে এক দূর আকাশের তারা ছিলেন। আমি তাঁর শাগরেদ হতে পারিনি। তবে তাঁর রচনাবলী গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি। তাঁর গল্প শুনেছি আমার প্রিয় উস্তায শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর হাফিজ মাওলানা জিল্লুর রহমান রহ. এর নিকট। তিনি ছিলেন তাঁর সহপাঠি। আর তাঁর সাথে এক সফরে কিছু প্রশ্নের ইলমী ও ভারসাম্যপূর্ণ জবাব শুনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। এরপর ইউটিউবে তাঁর বক্তব্য পেলেই শুনতে থাকি। এরপর দু'বার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয় সিলেট শহরের মাওলানা ইমাদ উদ্দিন সাহেবের উপশহরস্থ বাসায়।

তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ আরো বাড়তে থাকে এবং আমার আকাঙ্ক্ষা জাগে তাঁর সান্নিধ্যে সময় কাটাতে। একজন আল্লাহ্ ওয়ালা বুযুর্গ, একজন নিরহংকার মানুষ, একজন পণ্ডিত আলেম, একজন প্রকৃত আলেমের গুণাবলি সম্পন্ন দিশারী আলেমে দীন হিসেবে তাঁকে আমার মন সাক্ষী দেয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, বিনম্রতা যার ভূষণ। তাঁর উপস্থাপনা ছিলো খুব চমৎকার। কথা বলতেন আদল ইনসাফের সাথে। তাঁর আলোচনা ছিলো অত্যন্ত ভারসাম্য পূর্ণ। তিনি কখনো কাউকে আঘাত কিংবা উস্কানী দিয়ে কথা বলতেন না। আলীয়া, কওমী সকল মসলকের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিলো ব্যাপক। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো।

উনার সাথে একটি সফরে খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছিলো খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে। ইলমে গায়েব সর্ম্পকে তিনি বলেছিলেন, মতলকে ইলমে গায়েব কেবল আল্লাহ তায়ালা জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ততটুক জানেন যেটুকু আল্লাহ তাকে জানিয়েছেন। কদমবুসি সম্পর্কে বলেছিলেন, এব্যাপারেতো মুফতি শফি রহ. এর ফতোয়াই যথেষ্ট। আজানের পর হাত তোলে দুআ এবং জানাযার নামাযের পর দুআ সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর সম্মিলিত হাত তুলে দুআর যে দলীল সেখানেও সে একই দলীল। তাকে জিজ্ঞাস করেছিলাম মাসলাকগত দূরত্বের ব্যাপারে। তিনি বলেছিলেন, দূরত্বটা খুব অনাকাঙ্খিত। আসলে দূরত্ব থাকারতো কোন কথা ছিলো না, কিন্তু কিছু লোকের হিংসা, বিদ্বেষ এবং বাড়াবাড়ি এক্ষেত্রে দায়ী। তাদের কারণে মূলত: এ দূরত্ব। অন্যথায় এখানে দূরত্বের কোন প্রশ্নই আসে না। মূলে গেলে সবাই এক। ফুলতলী এবং বাইয়মপুরী রহ. এ দু'জনের পীরতো একজনই। তিনি হচ্ছেন

বদরপুরী রহ.। যিনি ছিলেন শায়খ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর খুব ঘনিষ্ঠ একজন। আবার বদরপুরী রহ. এর পীর হলেন জৈনপুরী সাহেব যিনি সৈয়দ আহমদ শহীদ রহ. এর খলিফা। তিনি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। তাই মাসলাকগত দূরত্ব থাকার কোন কারণ ছিলো না, মূলে গেলে সবাই এক। তিনি চাইতেন দু মাসলাকের মধ্যে দূরত্ব কমে আসুক, সবাই ইসলামের মৌলিক বিষয় নিয়ে কাজ করুক। আমাদের মুরব্বীদের মধ্যেও এতোটা দূরত্ব ছিলো না। পরবর্তীতে কিছু লোকের হিংসা ও বাড়াবাড়ি দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। তিনি মনে প্রাণে চাইতেন এ দূরত্ব কমে আসুক।

সর্বশেষ উনার সাথে সাক্ষাত হয়েছিলো উনার অসুস্থতার সময়, তাঁর জামাতা মাওলানা ইমাদ উদ্দিন সাহেবের উপশহরস্থ বাসায়। অসুস্থাবস্থায়ও তাঁর বিনয়, নম্রতা খুবই মুগ্ধ করেছে। তখন দলে দলে লোকজন আসছিলেন। ঢাকা থেকেও অনেক আলেম উলামা এসেছেন হাদীসের সনদ নিতে। তাঁর আচরণ, বেশভূষা ও চালচলনে মনে হতো তিনি সলফে সালেহীনদের একজন। তিনি কেবল বড় একজন আলেম নয় শুধু, হাজার হাজার আলেমের উস্তাযও তিনি। কিন্তু তাঁর বিনয় নম্রতার মাধ্যমে তিনি বুঝাতেন তিনি খুব নগন্য। নিজেকে খুব ছোট করে দেখতেন তিনি।

তাঁর বয়ান তাঁর দারস-তাদরীস, তাঁর আলোচনা, তাঁর প্রশ্নোত্তর, তাঁর সম্মোহনী শক্তি, তাঁর আচার ব্যবহার, তাঁর বিনয় আকৃষ্ট করে। কথাবার্তা, ব্যবহার এতই আকর্ষণীয় যা মানুষকে খুব কাছে টানতো। তিনি আঞ্চলিক ভাষায় খুব মাধুর্য্যতার সাথে কথা বলতেন। প্রতিপক্ষের কোন প্রশ্ন বা এশকালের জবাবেও ছিলেন শালীন। তাঁর আলোচনায় ছিলো ইলমের ঘ্রাণ। অনেক অজানা কিতাবের নাম জানা যেত তাঁর আলেচনা থেকে। তিনি ই'তিতিদালের সাথে কথা বলতেন। তীক্ষ্ণ দলীল পেশ করতেন। মাঠে ময়দানে তাঁর ওয়াজে মনে হতো যে তিনি দরগাহে দারস দিচ্ছেন। অনেক অজানা কিতাবের মুসান্নিফকে খুব শানদার ভাবে উপস্থাপন করতেন।

মুহাদ্দিস ছাহেবের রচিত কিতাবাদির মধ্যে সর্ব প্রথম যে রচনাটি আমি পড়ি সেটি হচ্ছে 'আল কাওলুল মাকবূল ফী মীলাদির রাসূলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' এরপর তাঁর সাহেবজাদা মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল আরো ক'টি কিতাব আমাকে হাদিয়া দেন, সেগুলো পড়ি। তাঁর ইলমী আলোচনা খুব মজাদার ছিল। রেফারেন্স দিয়ে দিয়ে তিনি যখন আলোচনা করতেন তখন তা শুনতেই মন চাইতো। আলোচনা মনকে ছুঁয়ে যেত। কোনো ফুযুল কথা বলতেন না। আলোচনা থেকে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা বুঝা যেত। তিনি ছিলেন ফুলতলী মসলকের এক অলংকার।

আমি প্রায়ই তাঁর জামাতা মাওলানা ইমাদ উদ্দীন যিনি আমাদের শাহজালাল উপশহর প্রাতঃভ্রমণ ক্লাবের সম্মানিত সদস্য ইমাদ ভাইকে বলতাম শায়খ সাহেব হুজুর আপনার বাসায় আসলে আমাকে বলবেন আমি তাঁর সান্নিধ্যে বসবো। এটা আমার মনের চাহিদা

ছিলো। কিন্তু আমার অখণ্ড ব্যস্ততা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সময় করে যেতে পারিনি। আজ তিনি না ফেরার দেশে। তিনি আমার কাছে দূর আকাশে তারাই রয়ে গেলেন। তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। আল্লাহ তাঁর দারাজাত বুলন্দ করুন। তিনি এ জগতে আর ফিরবেন না তবে তাঁর কর্ম তাঁকে অমর করে রাখবে। তাঁর ইলমী খেদমত ছাত্রদের পরম্পরায় কিয়ামত অবধি অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

লেখক: উপ-পরিচালক, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী সিলেট বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চল; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

স্মরণের আবরণে আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

অধ্যাপক এম এ সোবহান

মাওলানা হবিবুর রহমান সাহেব ছিলেন একজন মহীরূহ তুল্য মহামানব। তিনি ছিলেন আমার নিকট প্রতিবেশী, পারিবারিক শুভাকাংখী এবং ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আপনজন। আমার বাল্য ও কৈশোরের বেড়ে ওঠার মধুময় দিনগুলোতে ওনার উত্থান দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রকৃতির চন্দ্র-সূর্য অন্ধকারে আলো ছড়ায়। তবে রাতের নিশ্চিদ্র অন্ধকার ঘনিয়ে এলে আকাশের সুন্দর নীলিমায় কিছু জ্বল-জ্বলে তারা মনের আঁধারে উদ্ভাসিত আলো ছড়িয়ে দেয়। আমার মনে হতো, আল্লামা মো. হবিবুর রহমান তেমনি এক দীপ্তিমান নক্ষত্র। ইংরেজী ভাষাতে তাকে বলা যেতে পারে, "Morning shows the Day" আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, চারপাশের গভীর অন্ধকারে আপন মহিমায় তিনি একসময় আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে দেবেন।

আমার প্রয়াত বাবা আলহাজ্ব মুহিব আলী নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। অতঃপর এক কাপ চা পান করে ওজু করার জন্য শান বাঁধানো পুকুর ঘাটে যেতেন খড়ম পায়ে খট খট করে। এই রুটিনটিতে আমরাও অভ্যস্থ হয়ে পড়ি। প্রথম দিকে ফযরের নামাযের জন্য বাবার হাকডাক ছিল, যা পরবর্তীতে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কেবল খড়মের ডাকই ছিল যথেষ্ট। "আস্সালাতু খাইরুম মিনান্নাউম" মুয়াজ্জিনের সুমধুর আহ্বান আর খড়মের খট-খটানি একসময় একাকার হয়ে পড়ে। নামাজ শেষে আমরা ৩ ভাই যে যার বিছানাতে বসে তেলাওয়াতে মশগুল হতাম। সূরের ব্যঞ্জনা ছিল প্রায় সমানে সমান। প্রতিবেশীরা মশগুল হয়ে শোনত আর মন্তব্য করত, ঐ বাড়িটা যেনো এক মিনি লতিফিয়া ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা। প্রসঙ্গটা বর্তমানে নিবন্ধে অবতারণার প্রধান কারণ হলো, আমাদের পারিবারিক ও চারপাশের ধর্মীয় ঐতিহ্যের পেছনে মুহাদ্দিস সাহেবের অবদান ও অনুপ্রেরণা ছিল অপরিসীম এবং অতুলনীয়।

আমার জন্মস্থান হাজারীচক এবং রারাই গ্রামটা পাঁচ মিনিটের দূরত্ব, বড় রাস্তাটার এপার-ওপার। গ্রামের দুরন্ত বালক আমি, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাতে খালি পায়েই হাটাচলা করতাম। আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিক হয়ে একটি রাস্তা থানাবাজার দিয়ে মুহাদ্দিস সাহেবের বাড়ি অবধি প্রসারিত। শরতের সূর্যোদয়ে শিশির ভেজা ঘাস মাড়িয়ে ঘুরে বেড়ানোর মজাটাই ছিল আলাদা। দক্ষিণ দিকে যতই এগোতাম, মাওলানা সাহেবের তেলাওয়াতের সম্মোহনী সূর আমার সমগ্র অস্তিত্বকে জানান দিয়ে যেত। আহা, ছেলেবেলার সবুজ ঘাসের চাদর মোড়ানো সেই মেঠোপথ এখন কংক্রিটের আস্তরণে তলিয়ে গেছে। ঘাসফুলগুলো সেখানে আর পরম আনন্দে ডানা মেলে না। তেমনি করে

পাড়ার জীর্ণ কুটির ভেদ করে তেলাওয়াতের সুললিত সূর ভোরের বাতাসকে মুখরিত করে না। কালেভদ্রে বাড়ি এলে কোন এক অজানা আকর্ষণে দখিনের বাতায়ন খুলে দিয়ে কান পেতে রই, হয়ত মুহাদ্দিস সাহেবের সুললিত সূর ইথারে ভেসে আসবে বলে। জানি, তা আর কখনো হবার নয়। জীবনের সাজানো সবুজ বৃক্ষরাজি হতে একেকটি পাতা অকাতরে ঝরে পড়ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি; মাথার উপরের সুশীতল ছায়াগুলো কোনো এক অদৃশ্য শক্তির ইশারাতে অনন্তের অতলে হারিয়ে যাচ্ছে।

আমার প্রয়াত বাবা ষাটের দশকের শুরুতে সেনাপতি ব্রিজের পশ্চিম প্রান্তে অত্যন্ত আধুনিক মানের একটা গ্রোসারী সপ শুরু করেন। বাবা একজন চৌকস ব্যবসায়ী এবং আধুনিক রুচিসম্মত মানুষ ছিলেন। দোকানটার প্রায় অর্ধেক জুড়ে শীতল পাটি মোড়ানো একখানা প্রশস্থ চৌকি ছিল। সেখানে ছিল পাওয়ার ফুল জার্মান Murphy Radio, দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকা, জলপানের কলস এবং একটি নবাবী হুকো। এলাকর বাঘা বাঘা মুরুব্বিরা এসে ওখানে আড্ডা জমাতেন। ঐ রুই-কাতলাদের ভিড়ে লক্ষ্য করতাম, পাকিস্তান বেতারের খবরের সময় হলে রারাই গ্রামের মাওলানা মুমতায আলী সাহেব এসে উপস্থিত হতেন। উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম জানাতেন। মাওলানা মুমতায আলী সাহেব ছিলেন একজন বেটে-খাটো মানুষ, পাকা জামরুলের মত সুদর্শন চেহারার পুরুষ। তাঁর মিতভাষী চরিত্র এবং নূরানী চেহারাটা আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁকে দেখামাত্রই দূর থেকে উচ্চস্বরে সালাম জানাতাম। তিনিও পরম মমতা আর ভালোবাসায় কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। সেই দোয়ার বদৌলতে হয়ত বাকী জীবনটা মহান রাব্বুল-আল- আমিনের অসীম রহমত হতে বঞ্চিত হবো না। জাপানী সাহিত্যে একটা বিখ্যাত প্রবাদ আছে, "Kodomo Wa Oizano Senaka O Minagara Okiku Narimasu" বাংলা ভাষাতে যার অর্থ দাঁড়ায় "সন্তানেরা জন্মদাতার পৃষ্ঠদেশ দেখে দেখে লালিত হয়।" বাল্যের দূরন্ত দিনগুলোতে মাওলানা মুমতায আলী সাহেবকে দেখেছি বিধায় তাঁর সুযোগ্য সন্তান মাওলানা মো. হবিবুর রহমান সাহেবকে পরবর্তীতে চিনতে এবং জানতে অসুবিধা হয়নি।

আমাদের কৈশোর জীবনে মধুমাসে গ্রীষ্মের অবকাশটা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য। প্রতিটি বাড়িতে ফলের কোনো কমতি ছিল না। এগাছ হতে ওগাছে বাদুর ঝুলা হয়ে পাকা আমের মধুর রসে রসাদ করে পাড়াময় ঘুরে বেড়াতাম। বাড়ি ফিরে মায়ের বকুনিটা ছিল ফলের চাইতেও সুমধুর। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার জন্য আরেকটা প্রধান আকর্ষণ ছিল দোকানে বসে বেতারের খবর শোনা, পত্রিকার পরতে পরতে চোখ বুলানো। ঐ দীর্ঘ ছুটিতে মাওলানা হবিবুর রহমান সাহেব এবং তাঁর ছোট ভাই মাওলানা খলিলুর রহমান সাহেব দু'জনেই বাড়ি ফিরতেন। মুহাদ্দিস সাহেবের নির্দেশে আমার

একটা প্রাত্যহিক ডিউটি নির্ধারিত ছিল, প্রতিদিন সকাল সকাল পৌনে এগারোটা হতে দুপুর একটা অবধি দোকানে হাজিরা দেয়া। তার প্রধান কারণ ছিল, আমি খুবই নিখুঁত ও দ্রুততার সাথে সর্টওয়েভের স্টেশনগুলো খুঁজে পেতাম। প্রতিদিন এগারোটা হতে কায়রো বেতারে তেলওয়াত, বিশ্ব সংবাদ এবং হাদীসের উপর তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা হতো। সেখানে আল- আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জগৎখ্যাত পণ্ডিতেরা অংশ নিতেন। মুহাদ্দিস সাহেব ঠিক দশটা পঞ্চাশ মিনিটে এসে উপস্থিত হতেন। তাঁর উপস্থিতিতে জমায়েত যেন একটা মাহফিলে রূপ নিত। কায়রো বেতারের পর্যালোচনা আমাদের মত আমজনতার উপলব্ধির সীমানায় ছিল না। আমরা ছিলাম কেবলি নীরব শ্রোতা। অনুষ্ঠান শেষ হলে মাওলানা সাহেব অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় বিষয়গুলো আলোচনা করে বাড়ির দিকে রওয়না হতেন। সেই মধুমাখানো দিনগুলো, ছায়াসুশীতল গুরুজন আজ কেবলি স্মৃতি।

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে সত্তুরের নির্বাচন এলো। সকল দল যোগ্য প্রার্থীর সন্ধান করছে। সেই অস্থির সময়ে মাওলানা হবিবুর রহমান সাহেব ছিলেন সততা ও উচ্চ শিক্ষায় খ্যাতির শিখরে। পরিশেষে মাওলানা ফুলতলী সাহেবের বিজ্ঞ সিদ্ধান্তে পাকিস্তান নেজামে ইসলাম হতে কেতাব প্রতীকে লড়ার ঘোষণা দিলেন। পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন গুলোর একচ্ছত্র সমর্থনে আমরা এক শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছুতে সক্ষম হলাম। আমাদের পেছনে কোন আর্থিক শক্তি ছিল না। আমার বাবা ও দু'একজন ব্যবসায়ী মিলে কিছু পোস্টার ছেপে দিলেন। আমাদের পাড়ার মাস্টার মনোহর আলী সাহেব নিজ হাতে কিছু বাঁশের কলম তৈরি করেন। অতঃপর কাগজ-কালি কিনে এনে যুবক-কিশোরদের সমবেত করে পোষ্টার লিখার কাজে লাগিয়ে দেন। কুপির আলোতে রাত জেগে কলম চালানোর আনন্দ এখনো মনে পড়ে। নির্বাচনে মুহাদ্দিস সাহেব সম্মানজনক ব্যবধানে হারলেও আমাদের পক্ষে মেনে নেয়াটা খুবই কষ্টকর ছিল সেদিন। সেদিনের বিষাদঘন সমাবেশে মাওলানা সাহেব অবিচল কণ্ঠে বলেছিলেন, "আপনাদের অফুরন্ত ভালোবাসা আজ আমার পরাজয়ের গ্লানিকে ম্লান করে দিয়েছে। আমার গায়ের চামড়া দিয়ে আপনাদের পায়ের জুতো বানিয়ে দিলেও সকলের ভালোবাসার ঋণ শোধ হবার নয়।" প্রকৃত অর্থে সত্তরের নির্বাচনেই মাওলানা হবিবুর রহমান সাহেবকে লাইম লাইটে নিয়ে আসে। তাঁর সুখ্যাতি চন্দন কাঠের সুগন্ধির ন্যায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি পরিণত হন সততা ও বিশ্বস্থতার এক পরম নির্ভরযোগ্য ভরসাস্থলে।

বাঙালী মুসলমান আলেমরা নিতান্তই প্রচারবিমুখ জাতি। মুহাদ্দিস সাহেবও প্রচারবিমুখ মানুষ, নিজেকে গুটিয়ে রাখতেই পছন্দ করতেন। তাঁর উচ্চশিক্ষা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সাবলীল ভাষায় কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা এবং সহজবোধ্য প্রকাশ ভঙ্গী মুহাদ্দিস সাহেবকে খ্যাতির শিখর দেশে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রকৃত অর্থে হবিবুর রহমান সাহেব

ছিলেন বিশ্ব মানের একজন আলেম। বাংলা-ইংরেজী-আরবী-উর্দু-ফার্সী এ সকল ভাষাতে তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। আমি যতবারই উনার সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়েছি, অসাধারণ একটা সমাধান নিয়ে এসেছি। আবার অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মতো বয়োকনিষ্ঠদের কাছ থেকেও তিনি অনেক কিছু জেনে নিতেন। উঁচু বৃক্ষ বাঁকা হয়েই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সুশীতল ছায়া বিতরণ করে।

মাওলানা হবিবুর রহমান সাহেবের স্নেহ সান্নিধ্যে থেকে ইসলামের আধুনিক গবেষণা কাজে শরীক হতে চেয়েছিলাম। দূর্ভাগ্যবশতঃ আমার ব্যক্তিগত কিছু সীমাবদ্ধতার জন্য তা আর হয়ে উঠেনি। শত আফসোস করেও ব্যর্থতার সেই গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। উচ্চ শিক্ষার্থে জাপান চলে যাবার ফলে মাওলানা সাহেবের সাথে প্রায় চার দশকের একটা ফারাক তৈরী হয়ে পড়ে। উনার জীবাদ্দশাতে সেই শূন্যতা আর পূরণ করতে পারিনি। মাঝে মধ্যে সাক্ষাৎ হলে মনে হত, আমরা দু'জন যেন এক মহাসমুদ্রের এপারে-ওপারে দাঁড়িয়ে আছি। চরম দূর্ভাগ্য এই যে, মুহাদ্দিস সাহেবের সুবিশাল জানাযায় শরীক হতে পারলাম না। হায়রে দূরন্ত নির্মম প্রবাস। সুদূর বিদেশে বসে বাবা-মায়ের মৃত্যু সংবাদ তিলে তিলে আমাকে দগ্ধ করেছে। ইন্টারনেটের সৌজন্যে মাওলানা সাহেবের মৃত্যুর পর লক্ষাধিক মানুষের জমায়েত, করুণ আর্তনাদ প্রত্যক্ষ করেছি। শেষকৃত্যেই একজন সফল মানুষ অজস্র জনতার অপার ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বিদায় নেন।

মুহাদ্দিস সাহেবকে নিয়ে আমার স্মৃতি হাতড়িয়ে লিখার তাগিদ অনুভব করছিলাম। রাব্বুল আল-আমিন কোনো বান্দারই আশা অপূর্ণ রাখেন না। হঠাৎ করে সুদূর লন্ডন থেকে স্নেহ আর ভালোবাসায় সিক্ত ডাক এলো। আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ব্যক্তিত্ব এবং মাওলানা সাহেবের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ সন্তান মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল আমাকে স্মরণ করলেন। ঐ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার আবদার ফিরিয়ে দেয়ার শক্তি আমার নেই। তাই মাকড়শার জালের মত আবৃত শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিগুলো রোমান্থন করে কিছু ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর বিবরণ দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি মাত্র।

ভালোবাসার ঋণ সহজে পূরণ হবার নয়। বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ি গেলে মুহাদ্দিস সাহেবের মাজারটা যিয়ারত করতে যাই। কবরটার সামনে দাঁড়ালে মনে হয়,

"হায় ওরে মানবহৃদয়,
বার বার
করো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।

জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে.....

নশ্বর এ পৃথিবী কাউকে ধরে রাখতে পারে না, তাকে ছেড়ে দিতে হয় অনন্তের কোলে। ঈমান রক্ষার লড়াই, সত্যের সাথে মিথ্যার দ্বন্ধ চলবে অনন্তকাল। মুহাদ্দিস সাহেবের গৌরবমাখা বর্ণাঢ্য জীবন আগামী প্রজন্মকে সত্যের নিশান হাতে এগিয়ে চলার অসীম সাহস ও প্রেরণা যোগাবে।

লেখক: গ্রন্থ প্রণেতা, শিল্পপতি, জকিগন্জ সরকারী কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক।

স্মৃতির আয়নায় রারাইর মুহাদ্দিস সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

মাওলানা সালেহ আহমদ সালিক

মানুষ পৃথিবীতে আসে। কিছু দিন পর চলে যায় না ফেরার পথে। সংক্ষিপ্ত এই জীবন পরিক্রমায় সুকীর্তি দ্বারা কেউ স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকে যুগ থেকে যুগান্তরে। কাউকে মানুষ স্মরণ করে কুকীর্তির কারণে। কারো দ্বারা সমাজ ও জাতি উপকৃত হয়, আর কেউ সমাজ ও জাতি হতে উপকার লাভ করে। রারাইর মুহাদ্দিস সাহেব নামে খ্যাত হযরত মাওলানা হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই মনীষাদের অন্যতম যারা নিজেদের বহুবিদ সুকীর্তির কারণে সমাজে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। যাদের থেকে সমাজ ও জাতি উপকৃত হয়েছে। রারাইর মুহাদ্দিস সাহেবের সঙ্গে আমি অধমের গভীর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁর সাহচর্যে যাওয়ার খুব একটা সুযোগ হয়নি আমার। তাই এই মনীষী সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী কোন কিছু লেখার অবকাশ আমার নেই। তথাপি স্মৃতির আয়নায় ভেসে উঠা কয়েকটি খণ্ড স্মৃতি দিয়ে লেখাটি সাজানোর চেষ্টা করব।

তিনি গাছবাড়ি জামিউল উলুম মদরাসায় লেখাপড়া করেছেন। সেখানে তাঁর হাদীসের উস্তায ছিলেন আল্লামা শফিকুল হক বুলবুল সাহেব, শেওলার মুফতি আব্দুল গণী সাহেব ও চুরাবইর মাওলানা সঈদ সাহেব। জানা যায়, তাঁর সম্পর্কে তদীয় উস্তায বুলবুল শফীক সাহেব বলেন, আমি হবিবুর রহমানের মত মেধাবী ছাত্র জীবনে অনেক কম পেয়েছি।

একবার বুলবুল শফিক সাহেব জকিগঞ্জের ইনামতি মাদ্‌রাসার জলসায় অতিথি হয়ে আসেন। উনার সাথে সাক্ষাতের জন্য জনাব মাওলানা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইনামতির জলসার উপস্থিত হন। উস্তাযের সঙ্গে সক্ষাৎ করেন, দুআ নেন। উনি চলে যাওয়ার পর উক্ত মাদ্‌রাসার জনৈক উস্তায মাইকে ঘোষণা করেন, গাছবাড়ির শায়খুল হাদীস সাহেব মাওলানা মো. হবিবুর রহমান সাহেবেরও উস্তায। একথা শুনে বুলবুল সাহেব বলে ওঠেন, আরে আমি উস্তায অইলে কিতা অইল, বাঁশ থাকি তো ছিঙ্গল বড় অইত ফারে, বেটা বউত বড় আলিম। (আমি উস্তায হলে কী হলো, বাঁশ হতে তার কঞ্চি বড় হতে পারে। তিনি অনেক বড় মাপের আলিম)।

এ ঘটনা থেকে দুটি বিষয় ফুটে ওঠে। এক : উস্তাযের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। উস্তাযের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বিনা দাওয়াতে একটি ভিন্ন মাসলাকের প্রতিষ্ঠানে চলে আসা তো চাট্টিখানি কথা নয়। নিজের ব্যক্তিত্ব, আপনজনদের সমালোচনার শঙ্কা আর মাসলাকী সংকীর্ণতা কোন কিছুই গুরুভক্তিকে পরাজিত করতে পারল না। দুই : উস্তাযের জবান থেকে স্বীকৃতি পাওয়া গেল যে, তিনি কত উঁচু মাপের আলিম ছিলেন।

বিনয় ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম ভূষণ

খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা বন্ধে করণীয় নির্ধারণ করতে একবার জকিগঞ্জ মাদ্‌রাসায় সর্বস্তরের আলিম-উলমাদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে বৈঠকে আমার আব্বা হযরত মাওলানা মাহমুদ হোসাইন হাতিডহরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপস্থিত ছিলেন। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে মুহাদ্দিস সাহেব বললেন, হাতিডহরি হুজুরের গেছ থকি আমি অনেক কিছু হিকছি। রোটিন খরাও তান গেছ থাকি হিকছি। (হাতিডহরি হুজুরের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। রুটিন করাটাও শিখেছি তাঁর কাছ থেকে)। এখান থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তিনি অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ ছিলেন। ইখলাস ও বিনয় না থাকলে লোকসমক্ষে অকপটে এমন কথা বলতে পারতেন না।

উদারতার এক দীপ্তিমান দৃষ্টান্ত

খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা সম্পর্কে সমাজকে অবগত ও সচেতন করার জন্য একটি বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কয়েকটি প্রবন্ধ রচনার দায়িত্ব দেয়া হয় কওমী মাসলাকের উলমায়ে কিরামকে। আর তিনটি প্রবন্ধ রাখা হয় ফুলতলী মাসলাকের উলমায়ে কিরামের জন্য। এ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস সাহেব জানতে চেয়ে বলেন, লেখকের অভাবের কারণে এগুলো আমাদের জন্য রেখেছেন, না মরুওয়াত রক্ষার জন্য? বলা হল, প্রবন্ধকার আমাদের মাঝে আছেন। আপনাদের সম্মানার্থে এগুলো রাখা হয়েছে। তিনি বললেন, তা হলে বাকি তিনটি প্রবন্ধও আপনারাই লেখুন। কি অনুকরণীয় উদারতা।

আসলেই ব্যক্তির বড় হওয়ার জন্য তার মনের বিশালতার ভূমিকা অনেক বড়। আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার খেদমতগুলোকে কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন।

লেখক: বহুগ্রন্থ প্রণেতা; মুহাদ্দিস, জামিয়া মাদানিয়া আঙুরা মুহাম্মদপুর, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিনয়ের এক অনন্য নাম মুহাদ্দিস সাহেব কিবলাহ

অধ্যক্ষ মোঃ মাজেদ আহমেদ চঞ্চল

তাঁর নাম

জ্বী, সবার মত তাঁরও একটি পোশাকী নাম আছে, তা হচ্ছে, মো. হবিবুর রহমান। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে তিনি তাঁর চেনাজানা পরিমণ্ডলে মুহাদ্দিস সাহেব অভিধায় অভিহিত হচ্ছেন বহুকাল থেকে। জকিগঞ্জে আরও অনেক মুহাদ্দিস সাহেব আছেন। কিন্তু ফুলতলী ঘরাণায় তিনি এবং কাওমী ঘরাণায় হযরত মাওলানা মুকাদ্দাস আলী সাহেবকে শুধুমাত্র এই অভিধায় অভিহিত করা হয়।

এক্ষেত্রে পরিচিতিতে দ্বিধা দ্বন্দ্ব হলে তাঁকে 'রারাইর মুহাদ্দিস সাহেব' এবং উনাকে 'বারগাত্তার মুহাদ্দিস সাহেব' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

কালীগঞ্জ ও মুহাদ্দিস সাহেব কিবলাহ

কালীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় তিনি প্রথম এসেছিলেন ১৯৫৯ সালে। তখন তিনি যৌবনদৃপ্ত এক আলেম। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য ও সাংগঠনিক দক্ষতায় তিনি এই মাদ্‌রাসায় দীর্ঘদিন খেদমত করে প্রিন্সিপাল হিসেবে অবসর নেন ১৯৯৯ সালে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কোনো দিন এলাকার কারো সাথে মন কষাকষি করেননি, কোনো ঝগড়াঝাটি করেননি, কোনো ঝামেলা করেন নি বরং এলাকার ছোটখাটো অনেক ঝামেলা মিটাতে নীরবে নিবৃত্তে কাজ করেছেন প্রায়শই।

মুহাদ্দিস সাহেবের কোয়ার্টার ও আমার বাবা-মার স্মৃতি

ইছামতি মাদ্‌রাসার আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভালো হওয়ার পর তাঁকে কোয়ার্টার দেয়া হয়েছিল। সেই সাদামাটা কোয়ার্টারে তিনি যেদিন থাকতেন, সেদিন অফিস টাইমের পূর্বাপর সময়ে তাঁর কক্ষে এক আনন্দমুখর পরিবেশ থাকতো। এলাকার মুরব্বীরা তো বটেই, আমরা ইয়াংরাও তাঁর কক্ষে যেতাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতো তাঁর জীবনের স্মৃতিচারণ, বিদেশের অভিজ্ঞতা ও সামাজিক বিষয়াদির আলোচনা। প্রসঙ্গ পেলেই তিনি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আল্লাহ পাক ও রাসুলে পাকের নির্দেশনার উল্লেখ করতেন। বলতেন, আমার আল্লাপাকে কইন.....! (আমার আল্লাহপাক বলেন)। আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইন.....! (আমার রাসূল বলেছেন)।

এই কোয়ার্টারে উঠার আগে কালীগঞ্জে আসার পরপরই তিনি আমাদের বাড়িতে

থাকতেন। এজন্য আমাদের বাড়ির সবার প্রতি তাঁর আলাদা এক ধরণের টান ছিল।

আমার বাবা-চাচারা ইছামতি হাইস্কুল, ইছামতি মাদ্‌রাসা ও কালীগঞ্জ বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। আমার বাবার সাথে তাঁর খুব সখ্যতা ছিল। আমাদের সাথে দেখা হলেই বাবার অল্প বয়সে মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলতেন, আমার বাবা-মায়ের আদর-আপ্যায়ন-ভালোবাসার কথা বলতেন এবং কান্নাকাতর কণ্ঠে দোয়া করতেন।

সর্বশেষ যেদিন মৃত্যুশয্যায় তাঁকে দেখতে যাই, সেদিনও আমার বাবা-মায়ের স্মৃতিচারণ করে আমাকে আপ্লুত করেছেন।

তিনি দলাদলি-গালাগালি পছন্দ করতেন না

চলনে-বলনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক। বিনয় ছিল তাঁর ভূষণ! আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে একবার এলাকার এক ভাইয়ের সাথে ইছামতি মাদ্‌রাসার ছাত্রদের এক সমস্যার কারণে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীগণ আমাদের ইছামতি হাইস্কুলে খবর দিলে আমি ও আমার সহপাঠী ভাই বন্ধু নুমান উদ্দিন (হাতিডহর), মনুর উদ্দিন চৌধুরী (খলাদাপনিয়া), মাশুক উদ্দিন চৌধুরী (খলাদাপনিয়া), শাহনেওয়াজ চৌধুরী (খলাদাপনিয়া) সহ নাইন-টেনের অনেকেই তখন মাদ্‌রাসায় যাই। আমরা তখন মাদ্‌রাসার ছাত্র ভাইদের ব্যথায় সমব্যাথী ও চরম উত্তেজিত।

আমরা মাদ্‌রাসায় তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, আফনারা আইছোইন দেখিয়া খুব খুশ অইছি। ইলান মহব্বত এখে অন্যে থাখতো। কিন্তু যে পুয়ার লগে গন্ডগোল, তাইনও তো অউ আতরাফোর এক ভালা মানসোর পুয়া। আমরা ময় মুরব্বী লইয়া এখবার ভইয়া দেখি। যুদিন আমরা সমাধান করতে না পারি, তে আমি নিজে খবর দিয়া আফনারে আনাইমু (আপনারা এসেছেন দেখে খুবই খুশি হয়েছি। একেঅন্যে এরকম মুহাব্বাত থাকা দরকার। কিন্তু যে ছেলের সাথে সমস্যা হয়েছে সেও তো এই এলাকার এক ভদ্র ঘরের সন্তান। আমরা মুরব্বিগণকে নিয়ে একবার বসে দেখি।যদি আমরা সমাধান করতে না পারি তবে আমিই আপনাদের খবর করে আনাবো।) এরপর তখনকার সবচেয়ে সম্মানী ও লোভনীয় নাবিস্কো ক্রীম বিস্কুট খাইয়ে আমাদের বিদায় দেন। বিষয়টিরও সম্মানজনক সুরাহা হয়ে যায়।

সম্বোধনে সম্মান জানানো

তাঁর একটা বিশেষ গুণ ছিল যে, যতই ছোট কেউ হোক না কেন, নাম ধরে ডাকতেন না। আর তুই তোকারি তো দুরের কথা, কাউকে তুমি করেও বলতেন না। প্রায় সবাইকে আপনি বলতেন এবং সম্মান দিয়ে কথা বলতেন। এমনকি মাদ্‌রাসার মুরব্বী পিয়নকে তো বটেই, কমবয়েসী সাপোর্ট স্টাফদেরকেও নামের পরে মিয়া লাগিয়ে কথা বলতেন। আমি আর আহাদ ভাই (হাজারী চকের) প্রায়ই একসাথে যেতাম। দেখেই

বলতেন, মাজেদ মিয়া নি, আহাদ মিয়া নি, কিলা আইলাতে আইজ, বউক্কা (আরে মাজেদ মিয়া, আহাদ মিয়া যে, আসেন- বসেন)। আমার মনে হয় তিনি এক্ষেত্রে হাদীসের আলোকে ফুলতলী সাহেব কিবলার অনন্য নির্দেশনা বড় হখলোরে তাজিম করা আর ছোটো হখলোরে মায়া করার (বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ) নীতি অবলম্বন করতেন।

আমি যখন তাঁর সহকর্মী

আমি জানি, এই শিরোনাম দেখে অনেকেই অবাক হবেন। কিন্তু না, অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি সত্যি একজন গর্বিত শিক্ষক, যে এই উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশারদ আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেবের এম.পি.ও ভুক্ত সহকর্মী হিসেবে কাজ করার গৌরব অর্জন করেছিলাম। আমার কাজ ছিল, মূলতঃ উচ্চ শ্রেণিতে ইকোনমিকস পড়ানো। তবে ক্লাসের পাশাপাশি হুজুরের নির্দেশ অনুযায়ী একাউন্টস মেন্টেইনে আমি তদানীন্তন অফিস সহকারী মরহুম মাশুক আহমদের কাজ তদারকি করতাম বেশি।

বিশেষ করে এক্সটার্নাল অডিটর আসলে, তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়ে অডিটরদের সাথে আমাকে ও মাশুক আহমদকে পরিচয় করিয়ে বলতেন, আমি দৌড়ো থাকি, অউ দুই আহমদ সাবরে আফনারার লগে দিলাম। এইন ইতা লাইনো বড় জাননেওয়ালা মানুষ। তাইন হখোল তা বুঝাইবা, আর মাশুক আহমদ ছাবে কাগজ পত্র দেখাইবা (আমি ব্যস্ত থাকি, এই দুই আহমদ সাবকে আপনাদের সাথে দিলাম। ইনি এ বিষয়ে পারদর্শী, তিনি সব আপনাদের বুঝিয়ে দেবেন, আর মাশুক আহমদ সাহেব কাগজপত্র দেখাবেন)। অডিটররা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর প্রতিটি কথা শুনতেন এবং বিধি মোতাবেক অডিট করে যেতেন।

তাঁর ওয়াজ নসীহত

আমাদের সময়ে এখনকার মত ইউটিউবওয়ালা কমার্শিয়াল ওয়াইজ ছিলেন না। ফুলতলী সাহেব কিবলা, মুহাদ্দিস সাহেব কিবলাসহ এলাকার কওমী ঘরাণার নামী দামী ওয়াইজরা ই ছিলেন এলাকাবাসীর একমাত্র ভরসাস্থল। তখন ওয়াজের সময় বোন ও ফুফুরা বাপের বাড়িতে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। আমাদের কালীগঞ্জের ওয়াজের মধ্যে মুহাদ্দিস সাহেব কিবলার ওয়াজ শোনার জন্য আলাদা এক ব্যতিব্যস্ততা আমাদের পরিবারেও দেখতাম। তাঁর ওয়াজ নসীহতে বর্তমানকালের মত নর্তন-কুর্দন, গালাগালি, ফালাফালি (লাফালাফি অর্থে) ছিল না, ছিল না কল্পিত গাল-গপ্প, বরং ছিল ধীর স্থির লয়ের এক স্বর্গীয় আমেজ, প্রাণ ছোঁয়া আওয়াজ আর বড় বড় কেতাবের রেফারেন্স। রেফারেন্সের অনুপম ব্যবহার ই তাঁকে উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্রের এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে বলে আমি মনে করি। এজন্য তিনি প্রচুর পড়াশোনা করতেন। সিলেটি ভাষায় ওয়াজ নসীহতে তিনি অভ্যস্ত থাকলেও, আরবি-উর্দুর অপূর্ব মিশেলে খাঁটি

বাংলায়ও তিনি অত্যন্ত মনমুগ্ধকর ভাবে বয়ান করতেন।

মানুষের দোষ গোপন রাখার উপদেশ

আমরা ইয়াংরা একবার ইছামতি মাদ্‌রাসা সংলগ্ন ইছামতি শাহী ঈদগাহ পাকা করার উদ্যোগ নিয়ে চাঁদা কালেকশন করেছিলাম। আমাদের সাথে একজন গণ্যমান্য মুরব্বীও ছিলেন। আমরা একদিন প্রসঙ্গক্রমে মুহাদ্দিস সাহেবকে জানালাম যে, উনি নামায পড়েন না। তিনি বললেন, দুইষ দুইষ ইতা মাতোইন না জানি। পরোর দুইশ ঘুরিয়া রাখা ভালা। তান কপাল খারাফ, ই বয়েসোও নমায পড়িরা না, আমি তানরে বুঝাইমু (না না, এরকম বলবেন না; অন্যের দোষ গোপন রাখা ভালো। উনার দুর্ভাগ্য যে, এই বয়সে এসেও নামায পড়েন না। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলবো)।

তাঁর বেশভূষা

তাঁর বেশভূষায় এক আটপৌরে ভাব বিদ্যমান ছিল। শেষ বয়েসেও তিনি জোব্বা-চাপকান না পরে তাঁর চিরচেনা সাদা নর্মাল পায়জামা ও পাঞ্জাবির উপর একটা হাফ ওয়াসকোট পরতেন। এটিতেই তাঁকে মানাতো সবচেয়ে স্মার্ট ও মানানসই। খুব শীতে শেরওয়ানী টাইপের লম্বা কোট পরতেন, এতে তাঁর সুন্দর চেহারা সমুজ্জ্বল দেখাতো। সাধারণত মাথায় নর্মাল টুপি (ত্বকি) পরতেন, তবে জুময়ার নামায, ঈদের নামায, বিয়ে-শাদি ও ওয়াজ-নসিহতে গেলে সবুজ পাগড়ি পরতেন, এই গেটআপে তাঁকে এক আলাদা ইমেজে দেখা যেত, যা এখনো চোখে ভাসে।

নিজ মুর্শিদের প্রতি তাঁর অনুরাগ

মুহাদ্দিস সাহেব কিবলাহ ছিলেন পীরে কামেল হযরত মাওলানা ফুলতলী সাহেব কিবলার একান্ত প্রিয় ও শীর্ষস্থানীয় মুরিদ ও খলিফা। তিনি সব সময় তাঁর মুর্শিদের স্মরণ করতেন এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ফুলতলী সাহেব কিবলার বক্তব্য ও আমল নিয়ে কথা বলতেন। ফুলতলী সাহেব কিবলার ইন্তেকাল পূর্বাপর সব সময় তিনি তাঁর দোয়ায় সাহেব কিবলার জন্য রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করতেন।

তিনি ছিলেন আলোচক, অহেতুক সমালোচক নয়

আমাদের কালীগঞ্জ এলাকার সকল মানুষের সাথে তাঁর সখ্যতা ছিল। তিনি সকল ভালো মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখতেন এবং সবার প্রতি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন। আমি বেশ কয়েকবার ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার কমিটিতে ছিলাম। তাঁর প্রতি সদস্যদের চরম আস্থার কারণে অনেকেই মিটিংয়ে কম আসতেন। আগে ভাগে বলে দিতেন, আপনি যেখানে আছেন, সেখানে আমরা মনে করি, আমরাও আছি। মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসাই এমন আস্থার সৃষ্টি করেছিল বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমার প্রতি তাঁর আলাদা দুর্বলতা

আমার প্রতি তাঁর আলাদা দুর্বলতা ছিল। আমি এটা জানতাম এবং বুঝতাম। এর তিনটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ হচ্ছে, আমার বাবা-মা ও পরিবার-পরিজনদের প্রতি তাঁর অপার ভালোবাসা। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আমার প্রতি তাঁর একান্ত স্নেহ মমতা।আর তৃতীয় কারণ হচ্ছে, তাঁর ছেলেদের প্রতি, বিশেষ করে তাঁর বড় ছেলে বিশিষ্ট লেখক, কবি ও ইসলামি স্কলার আব্দুল আউয়াল হেলাল ভাইয়ের সাথে আমার অনাবিল ভালোবাসা।

জ্বী, বয়েসের বেশ কিছুটা ফারাক থাকলেও, বহু বহু বছর থেকে হেলাল ভাইয়ের প্রতি আমার অনন্য ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব। আমরা তাই এখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনালাপে ব্যয় করতে পারি। সেই ফোনালাপে থাকে দেশ ও দশের কথা, ধর্মীয় আলোচনা, সামাজিক চিন্তাধারা ও লেখালেখি। আর হেলাল ভাই দেশে এলে কোনো না কোনো ফর্মে আমাদের ছোট-বড় একটা না একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, সেখানে অন্তত দু'জন আমরা কমন থাকি-একজন সিলেটের প্রধান কবি অগ্রজ কালাম আজাদ আর আরেকজন আমি। আমাদের এই ভালোবাসার মূল বন্ধন একজনকে ঘিরে। তিনি হচ্ছেন আমাদের পিতৃতূল্য আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস সাহেব কিবলাহ।

শেষ কথা

আজকের এই লেখা শেষ করতে গিয়ে রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের গর্ব ও গৌরবের ধন মুহাদ্দিস সাহেব কিবলাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। আমিন। সুম্মা আমিন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, লুৎফুর রহমান হাইস্কুল এন্ড কলেজ, জকিগনজ। স্টুডেন্ট এফেয়ার্স এডভাইজর, আরটিএম আল কবির টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, সিলেট।

উপমহাদেশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র
আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ

মুফতি মাওলানা মোঃ আব্দুর রহমান নেজামী

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের, যিনি আমাদেরকে মানবকূলে জন্ম দিয়ে তাঁর প্রিয় বান্দাহগণের সান্নিধ্য লাভের তাওফিক দানে ধন্য করেছেন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ওলীয়ে কামিল, শামসুল উলামা, মুজাদ্দিদে যামান রঈসুল কুররা ওয়াল মুফাসসিরীন আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর প্রথম সারির খলিফা হাদীস জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ। ইলমে হাদীসের খেদমতে অসামান্য অবদানের কারণে জৌনপুরী সিলসিলার ফুলতলী মসলকে মুহাদ্দিস ছাহেব বললেই আপামর সকলেই উনাকে বুঝে নিতো। তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গেলে এ অধমের লেখা শেষ হবার নয়। ছাত্রজীবন থেকেই যার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ আমাকে এনে দিয়েছে এক অন্য জগৎ। ১৯৮১ সালে ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদরাসায় ফাযিল জামাতে ভর্তি হই। হুজুর তখন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। ১৯৮২ সালে আমাদের ফাযিল ফাইনাল পরীক্ষার আগেই তিনি দেশে ফিরে আবারো ইছামতি মাদরাসায় যোগ দেন। কামিল জামাতে আমরা ছাত্র ছিলাম ৩২ জন। হুজুরের কাছে আমরা সহীহ বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড, সহীহ মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ড ও সুনানে তিরমিযী শরীফ পড়েছি। আজো চোখে ভাসে ক্লাসে তাঁর নূরানী চেহারা, কানে বাজে পঠিত প্রত্যেক হাদীসের উপর তাঁর জ্ঞানগর্ভ দারস। মাদরাসার পার্শ্ববর্তী গ্রামে আমার লজিং থাকার সুবাদে ক্লাসের সময়ের পরেও নিয়মিত হুজুরের সোহবতে বেশিরভাগ সময় অবস্থানের চেষ্টা করতাম। যারাই ক্লাস কিংবা মাহফিলে বয়ান শুনতেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অপলক নেত্রে চেয়ে থাকতেন তাঁর মায়াবী চেহারার দিকে, আর হাদীসে নববীর সুধা পানে ধন্য হতেন। প্রতিটি বিষয়ে অকাট্য যুক্তি ও কুরআন হাদীসের দলীল উপস্থাপন করতেন তিনি। ইলমে দ্বীনের সকল শাখায় তাঁর ছিলো প্রখর জ্ঞান ও গভীর পাণ্ডিত্য।

ফিকহী কোনো মাসায়েল জিজ্ঞেস করলে হুজুর আমাকে বলতেন, অমুক কিতাব বের করো, ঐ বাব বের করো তা খুঁজো পেয়ে যাবে এবং সাথে আরো অনেক কিছু জানা হবে। এমনি করে কিতাব অধ্যয়নের প্রতি উৎসাহ ও জোর তাগিদ দিতেন। আমি কোন একদিন বললাম, হুজুর আমিতো কিতাব বুঝি না, কীভাবে বুঝবো? তিনি বললেন, ক্বালা ক্বালা কি পড়তে পারো, এর অর্থ বুঝতে পারো? আমি বললাম, জি হুজুর। তিনি

বললেন, তাহলেই কিতাব বুঝতে পারবে। তুমি লেগে থাকো আল্লাহ সাহায্য করবেন। হুজুরের সেই উৎসাহ উদ্দীপনা ও দোয়ার বদৌলতেই আজ কিছু কিছু কিতাব পড়তে ও বুঝতে পারি আলহামদুলিল্লাহ।

ব্যক্তিগত জীবনে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর অত্যন্ত বিনয়ী ও মার্জিত ব্যবহারের অধিকারী, চূড়ান্ত পরহেজগারিতা এবং সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিপূর্ণ পাবন্দ ছিলেন। সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্ম সুন্নাতগুলোও তাঁর আমলে সদা বিরাজমান থাকতো। বিশেষত আমরা ছাত্র হয়ে ক্লাসে হুজুরের আগে কখনো সালাম প্রদান করতে পারিনি। এমনকি আমরা সহপাঠীরা এ নিয়ে পূর্ব পরিকল্পনা করেও হুজুরের আগে সালাম দিতে সক্ষম হইনি কখনো।

একবার সালাম দেয়া বিষয়ে একটি ভ্রান্তির অবসান ঘটলো। একদিন হুজুরের খিদমতে গিয়ে দেখতে পাই তিনি খাবার খাচ্ছেন, এমতাবস্থায় আদত অনুযায়ী তিনি সালাম দিলেন। কিন্তু আমি সালাম বা তার জবাব কিছুই দিইনি। তখনই হুজুর বললেন, কি নিজামী ইলম অর্জন করে ফেলেছো? সালাম বা এর জবাব দিলে না যে? আমি বললাম, হুজুর! আমরাতো জানি খাবার খাওয়া অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরূহ। হুজুর বললেন, এজন্যই তো আমি সালাম দিলাম। তোমাদের ভুল শুধরানো উচিত। খাবার খাওয়া অবস্থায় সালাম বা সালামের জবাব দেয়া উভয়ই জায়েয, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব একজন খ্যাতনামা, সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম ছিলেন। আমৃত্যু দেশ বিদেশে তিনি ইলমে ওহী তথা ইলমে নববীর খিদমত করে গেছেন। সাথে সাথে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দুর্লভ কিতাবাদীর বিশাল ভাণ্ডার সংগ্রহ করেছেন। যা আজ বাড়ির পাশেই প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও স্বীয় মাকবারার সন্নিকটে মাকতাবা আল হাবীব তথা আল হাবীব গ্রন্থাগার এর রূপ লাভ করেছে। সেখানে দূর দূরান্ত থেকে জ্ঞান পিপাসু পাঠক, লেখক ও গবেষকদের ভীড় লেগেই আছে। আল্লাহ যেন উনার সকল খিদমতকে কবুল ও জারী রাখেন।

তাযকিয়ায়ে নফসের ক্ষেত্রে আমলে সালেহকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে স্বীয় মুর্শিদ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নেক নজরে করমে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গে পৌঁছে ছিলেন তিনি।

বিশ্বের বহু দেশে গমন করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ ও রাসূল প্রেমের ফল্গুধারা। আমি বৃটেনে আসার পর থেকে মুহাদ্দিস ছাহেবের লন্ডনের প্রায় সকল সফরে আমি কাছে থাকতাম, সময় দিতাম। হুজুরকে যখনই অবসর সময়ে দেখতাম তখনই দেখা যেতো কিতাব মুতালাআ করছেন। আলেম উলামা ও ছাত্রদের কিতাব অধ্যয়নে উৎসাহিত করতেন। হাজার হাজার আলেম, শাগরিদ, মুহিব্বীন তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে জীবনকে ধন্য করেছেন।

কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝেও তিনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন বহু মূল্যবান লেখনী। এক সময় মাসিক শাহজালাল সম্পাদনা করে দেশব্যাপী সাড়া জাগিয়েছিলেন।

তিনি আমাদের ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন পরপারে। তাঁর মত একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে হারিয়ে দেশ ও জাতি তথা মুসলিম উম্মাহ শোকে মুহ্যমান। একজন সত্যিকারের আলিমে দ্বীনের মৃত্যু একটি জাহানের বিদায়। আরবীতে প্রবাদ আছে -'মাউতুল আলিমে মাউতুল আলম'। তাঁর ইন্তেকাল তেমনি একটি জাহানের মৃত্যু সমতুল্য। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া অসংখ্য ছাত্র উপমহাদেশসহ বিশ্বের বহুদেশে কুরআন হাদীসের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

আল্লাহ যেন ইলমে দ্বীনের এ মহান বুজুর্গকে জান্নাতুল ফেরদৌসের সুউচ্চ মাকাম দান করেন এবং আমাদেরকে তাঁর রূহানী ফায়েযে ধন্য করেন। আমীন

লেখক : সাধারণ সম্পাদক, বিয়ানীবাজার উলামা পরিষদ ইউকে। চেয়ারম্যান, বিয়ানীবাজার দাররুল হাদীস লতিফিয়া মাদরাসা। প্রতিষ্ঠাতা, দক্ষিণ মাথিউরা জালালিয়া মহিলা আলিম মাদরাসা, বিয়ানীবাজার।

তাঁকে মেরে ফেলা কিংবা জীবিত রাখা প্রসঙ্গে

মুসা আল হাফিজ

তিনি অত্যন্ত তন্ময় একাগ্রতায় ওয়াজ করছিলেন। আস্তে আস্তে বলেন। খুব দরকারী আলোচনা করেন। মহব্বত, ইলম, আকলের সমাহার ঘটে। তাঁর বয়ানের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠি নাম শুনতে শুনতে। আব্বা প্রায়ই বলতেন জকিগন্জের মাওলানা হবিবুর রহমান সাহেব জবরদস্ত আলিম। সময়টি মাহে রবিউল আউয়াল। মাহফিলটি ছিলো সিলেট শহরে। তাঁর আগে একজন বক্তার বক্তব্য। কান ঝালাপালা করে দিচ্ছিলো। লোকটি ওয়াজ করছে না গালাগালি করছে, বুঝাই যাচ্ছিলো না। তার বয়ান থেকে লোকেরা ঘৃণা ও হিংসা নিয়ে বের হবে মুসলিমদের আরেক অংশের প্রতি। যাদেরকে কথায় কথায় তিনি বলছেন ওয়াহাবির বাচ্ছাইন। প্রকৃতপক্ষে ওয়াহাবি ফেরকার প্রতি অনীহা আছে আমারও। কিন্তু এই ভদ্রলোক ঢালাওভাবে দেওবন্দিদের ওহাবী বলছেন, সায়্যিদ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাইল শহীদ, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, কাসিম নানুতুবী রহ. প্রমুখ বুজুর্গকে ওহাবী বলে গালাগাল করছেন, যাদেরকে দেওবন্দের উলামা নিজেদের আকাবির বলে তাজিম করেন। তিনি অজ্ঞতা থেকেই এমনটি করছেন। কারণ সায়্যিদ আহমদ শহীদ থেকেই এসেছে মুহাম্মাদিয়া সিলসিলা। এই সিলসিলার বুজুর্গ হচ্ছেন ইসমাইল শহীদ রহ.। ফুলতলির পীর সাহেব সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এর সিলসিলার উত্তরপুরুষদের বিখ্যাত রূহানী ফরজন্দ। আর গাঙ্গুহি-নানুতুবীরা ওহাবীদের থেকে অনেক আলাদা। ওহাবীরা বরং তাদেরকে গুমরাহ বলে আখ্যায়িত করে। তাদের কিতাবাদিতে বাতেল ফের্কার তালিকায় রয়েছে আদ দিওবন্দিয়্যুন।

নাহ, এই ওয়াজ আর শুনবো না। মনে মনে চলে আসবার নিয়ত করলাম। কিন্তু এরই মধ্যে মঞ্চে শ্লোগান। একজন এসেছেন। কে এসেছেন? মুহাদ্দিস সাব হুজুর, মাওলানা মো. হবিবুর রহমান। তাঁর বয়ান না শুনে তো যাওয়া যায় না। আধা ঘণ্টা পরে তিনি বয়ান শুরু করলেন। মনোযোগ সহকারে শুনবার, বুঝবার এবং ধারণ করবার মতো কথা বললেন একে একে। তিনি বোধ করি পূর্ববর্তী বক্তার নাম না নিয়ে কিছু কথা বললেন। তাঁর কথার সারকথা হলো সত্যবাদী হওয়া জরুরী। বাড়াবাড়ি না করা উচিত কোনো বিষয়ে।

ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেন, عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ يَضُرُّكَ، فَإِنَّهُ يَنْفَعُكَ. وَاجْتَنِبِ الْكِذْبِ فِي مَوْضَعٍ تَرَى أَنَّهُ يَنْفَعُكَ، فَإِنَّهُ يَضُرُّكَ -'তুমি সত্যবাদী হও, কেননা সত্য তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে মনে করলেও মূলতঃ তা তোমার উপকারই করবে। আর তুমি মিথ্যা

থেকে বেঁচে থাকো, কেননা মিথ্যা তোমাকে উপকৃত করবে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে তা তোমার ক্ষতিই করবে'

কিছুক্ষণ প্রাথমিক আলোচনা সেরে তিনি প্রবেশ করলেন নবীজীর এশক ও মহব্বতের আলোচনায়। যেখানে আমার হৃদয়ের পরম প্রশান্তি।

ফার্সি শের পড়লেন অনেকগুলো। শেখ সাদীর বিশ্ববিখ্যাত সেই শের;

بلغ العلى بكاله - كشف الدجى بجماله

حسنت جميع خساله - صلوا عليه و آله

'মানবতার শীর্ষে তুমি হলে উপনীত,
রূপের ছটায় দূর করিলে আঁধার ছিল যত।

সকল গুণের সমাবেশে চরিত্র মহান,
তুমি ও তোমার বংশ পরে হাজারো সালাম।'

শেখ সাদীর কবিতাকে আশ্রয় করে তিনি বললেন, রাসূলে খোদার চরিত্র-বৈশিষ্টের বিবরণী, শান ও শওকতের আলোচনা। পড়লেন শের- :

كريم السجايا جميل الشيم - نبى البرايا، شفيع الامم

امام رسل پيشواى سبيل - امين خدا مهيط جبرائيل

شفيع الورى خواجه بعث و نشر - امام الهدى صدر ديوان حشر

كليمى كه چرخ فلک طور اوست - همه نورها پرتر نور اوست

'মহান স্বভাব চরিত্র মধুর
উম্মতের কাণ্ডারী নবী বিভুর,
রাসূলগণের নেতা, পথের দিশারী
খোদার বিশ্বস্ত জিবরাইলের মনযিল।
সৃষ্টলোকের সুপারিশকারী, পুনরুত্থান দিবসের সরদার
হেদায়াতের ইমাম, বিচার দিনের নেতা।
নভোমণ্ডল যার তুর পাহাড় আল্লাহর সাথে করতে আলাপ,
সকল আলো তাঁরই নূরের বিকিরিত আলোর ছটা।'

আল্লাহর নবীর অস্তিত্ব সম্পর্কে শেখ সাদী বলেন :

تو اصل وجود آمدى از نخست - دگر هرچه موجود شد فرع تست

'আপনি সৃষ্টির মূল উৎস। অন্যসব সৃষ্টি আপনার শাখা প্রশাখা।'

তাঁর জন্ম প্রসঙ্গে বলেন :

چو صیتش در افواہ دنیا فتاد - تزلزل در ایوان کسری فتاد

'আগমন পরে যে কণ্ঠ ধ্বনিত হলো এ ধরায়

তাতেই কম্পিত কেসরার সিংহাসন।'

দূর থেকে আমি তাঁকে মহব্বত করতাম, শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর নামটি মনে গেঁথে যায় বিশেষভাবে। ১৯৯৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় সিলেট শহর থেকে প্রকাশিত মাসিক শাহজালাল নামের একটা কাগজ আমার হাতে আসে। কাগজটির কয়েকটি সংখ্যা ছিলো আমার কাছে। ছাত্র মানুষ। হিফজে পড়ি। সেই কাগজে তাঁর লেখা পড়েছিলাম মনোযোগ সহকারে। কী ছিলো বিষয়, কেমন ছিলো লেখা, তা এখন মনে নেই। তবে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ হিকমাহ নোট করেছিলাম বোধ করি। যেমন-

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন إِنَّ لِلْحَسَنَةِ نُورًا فِي الْقَلْبِ، وَزَيْنًا فِي الْوَجْهِ، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ النَّاسِ- وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ ظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، وشَيْنًا فِي الْوَجْهِ، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، ونَقْصًا فِي الرِّزْقِ، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ 'নিশ্চয় নেক আমলের প্রভাব হ'ল- অন্তরের আলো, চেহারার উজ্জ্বলতা, শারীরিক শক্তিমত্তা, রিযিকের প্রশস্তি এবং আমলকারীর প্রতি মানুষের আন্তরিক ভালবাসা। আর গুনাহের কুপ্রভাব হ'ল- হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া, চেহারার মলিনতা, শরীরের দুর্বলতা, রিযিকের ঘাটতি এবং সৃষ্টিকুলের অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক'

(খ) ইমাম আওযা'ঈ (রহঃ) বলেন إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ عَبْدَهُ بَرَكَةَ الْعِلْمِ، أَلْقَى عَلَى لِسَانِهِ الْمَغَالِيْطَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ أَقَلَّ النَّاسِ عِلْمًا، 'যখন আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত করতে চান, তখন তিনি তার যবানে ভুলের প্রবণতা বাড়িয়ে দেন। আর আমি দেখেছি, এই ধরনের বঞ্চিতদের জ্ঞান হয় সবচেয়ে কম।

(গ) ইবনুল জাওযী (৫০৮-৫৯৭ হি.) বলেন المِسْكِينُ كُلُّ المِسْكِيْنِ مَنْ ضَاعَ عُمْرَهُ فِي عِلْمٍ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ، فَفَاتَتْهُ لَذَّاتُ الدُّنْيَا وَخَيْرَاتُ الآخِرَةِ، فَقَدِمَ مُفْلِسًا عَلَى قُوَّةِ الحُجَّةِ عَلَيْهِ 'সব মিসকীনের বড় মিসকীন সেই, যে তার সারাটা জীবন ব্যয় করল জ্ঞানের অন্বেষণে। অথচ সে অনুযায়ী আমল করল না। ফলে সে দুনিয়াবী সুখ থেকে বঞ্চিত হ'ল এবং আখেরাতের কল্যাণ সমূহ থেকেও বঞ্চিত হ'ল। অতঃপর নিজের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সাক্ষ্যের বোঝা নিয়ে সে নিঃস্ব অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হ'ল'।

(ঘ) আবুল লায়েছ সামারকান্দী (রহঃ) বলেন مَثَلُ مَنْ يَعْمَلُ الطَّاعَاتِ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ وَمَلأَ كِيسَهُ حَصَاةً، فَيَقُولُ النَّاسُ مَا أَمْلأَ كِيسَ هَذَا الرَّجُلِ وَلَا مَنْفَعَةَ لَهُ سِوَى مَقَالَةِ النَّاسِ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ شَيْئًا لَا

يُعْطَى بِهِ شَيْءٌ، كَذَلِكَ الَّذِي عَمِلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ سِوَى مَقَالَةِ النَّاسِ وَلَا ثَوَابَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، 'যে ব্যক্তি লোক দেখানো বা প্রশংসা পাওয়ার জন্য ইবাদত-বন্দেগী করে, তার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে পাথরকণায় ভরা থলি নিয়ে বাজারে গেল। লোকজন তাকে দেখে বলল এই লোকের থলিটা কত পরিপূর্ণ! অথচ মানুষের প্রশংসা ছাড়া এই থলিটা তার কোন উপকার বয়ে আনে না। যদি সে এটা দিয়ে কিছু কিনতে চায়, বিনিময়ে তাকে কিছুই দেওয়া হবে না। অনুরূপ লোক দেখানো ও খ্যাতির আকাঙ্খী ব্যক্তির আমল কোনই কাজে আসে না। সাময়িক মানুষের প্রশংসা পায় মাত্র। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোন নেকী বরাদ্দ থাকে না'।

অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বিদগ্ধ এই আলেমের নাম বার বার শুনেছি আরো পরে। আমার গ্রামের বাড়ির পাশেই সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসা। ১৯৬৩ সালের ২৩ নভেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সেখানে তিনি প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে অত্যন্ত সুনামের সাথে হাদীসের পাঠদান করেন। তারপর চলে যান জকিগন্‌জের ইছামতি মাদ্‌রাসায়। তিনি চলে গেলেও আশপাশের এলাকায় তার গুণগান, তাঁর চর্চা, তার স্মৃতিতর্পণ জারি ছিলো। আমরা তাই তাঁর নামটি শুনতাম বারবার। শ্রদ্ধা ও মান্যতার একটা আবহ তৈরী হয় এর মধ্য দিয়ে। তাঁর সাথে সাক্ষাত হবার আগেই তিনি হয়ে উঠেন আমার শ্রদ্ধেয় ও মান্যবর।

পরে তাঁকে যত নিবিড়ভাবে দেখেছি, জেনেছি, মনে হয়েছে তিনি সর্বমগ্ন এক ইলমী অস্তিত্ব। আপন কালে ইলমে দ্বীনের গভীর ও ব্যাপক হিস্যা তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু ইলম লাভ করলেই আলেম হওয়া যায় না। আলেম বলে পরিচিত হলেই সত্যিকার আলেম হওয়া যায় না। একদল আলিম হলেন মিসকিন। যাদের সম্পর্কে ইবনুল জাওযী (৫০৮-৫৯৭ হি.) বলেন, أَفَاتَتْهُ الْمِسْكِينُ كُلُّ الْمِسْكِينِ مَنْ ضَاعَ عُمْرَهُ فِي عِلْمٍ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ، 'সব মিসকীনের বড় মিসকীন সেই, যে তার সারাটা জীবন ব্যয় করল জ্ঞানের অন্বেষণে। অথচ সে অনুযায়ী আমল করল না। ফলে সে দুনিয়াবী সুখ থেকে বঞ্চিত হ'ল এবং আখেরাতের কল্যাণ সমূহ থেকেও বঞ্চিত হ'ল। অতঃপর নিজের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সাক্ষ্যের বোঝা নিয়ে সে নিঃস্ব অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হ'ল' (ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের ১৫৯ পৃ.)।

ইলিম তাঁকে করেছে পরহেজগার, ডুবিয়েছে ইবাদতের মগ্নতায়। ইলিম বিতরণের সদকায় তিনি ছিলেন বৃষ্টিধারার মতো। ফলে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের অনেকগুলো চ্যানেল তিনি খুলে দিতে সক্ষম হন আপন জীবনে। হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ، وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ، وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ- 'তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞানার্জন করা পরহেযগারিতা, তা অন্বেষণ করা ইবাদত এবং এর

পঠন-পাঠন তাসবীহ। আর জ্ঞান-গবেষণায় নিয়োজিত হওয়া জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যারা জানে না তাদেরকে ইলম শিক্ষা দান করা সদকা এবং জ্ঞান আহরণে আগ্রহীদের কাছে তা বিতরণ করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। (ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ৩/২৪৬।)

হযরত মুয়াজ বিন জাবালের রা. বর্ণিত বৈশিষ্ট্য এমন গুণ, যা ইলিমের নতিজা। কারো সত্তায় যদি ইলিম জীবন্ত হয়ে উঠে, তাহলে তার ফসল হিসেবে যেসকল বৈশিষ্ট্য মাথা তুলবে, সেগুলোর সার সংক্ষেপ এখানে বিধৃত। আখেরি জামানা মহান মানুষদের মহান গুণের স্পর্শ থেকে একেবারে বঞ্চিত নয়। ফলে কালে কালে বিভিন্ন আল্লাহওয়ালার হৃদয় ও জীবনে সালাফের মহান গুণের বিচ্ছুরণ ঘটে। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের ইলিম ও আখলাকে তার নজির লক্ষ্য করা যেতো। তিনি শ্রেষ্ঠতম কামাই করেছিলেন জীবনে। এবং এর ফলাফলও ছিলো অসাধারণ। যে মর্যাদাবান সম্পদের বাহক তিনি ছিলেন, তা তাঁকে মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করেছে।

ইমাম ইবনু আবিদদুনইয়া (রহঃ) বলেছিলেন -اعْلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ أَشْرَفُ مَا رَغَّبَ فِيهِ الرَّاغِبُ، وَأَفْضَلُ مَا طَلَبَ وَجَدَّ فِيهِ الطَّالِبُ، وَأَنْفَعُ مَا كَسَبَهُ وَاقْتَنَاهُ الْكَاسِبُ؛ لِأَنَّ شَرَفَهُ يُثْمِرُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَفَضْلَهُ يُنْمِي عَلَى طَالِبِهِ, ‘জেনে রাখ! আগ্রহী ব্যক্তি যা কিছু কামনা করে, তন্মধ্যে ইলমই অধিকতর মর্যাদাবান। অনুসন্ধানী ব্যক্তি যা কিছু তালাশ করে এবং তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, জ্ঞানই তার মাঝে শ্রেষ্ঠতম। উপার্জনকারী যা কিছু কামাই করে ও সঞ্চয় করে, তার মাঝে জ্ঞানই সর্বাধিক উপকারী উপার্জন। কেননা জ্ঞানের মর্যাদা তার বাহককে সফলকাম করে এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব তার অনুসন্ধানকারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়’।

তাঁর শিষ্টাচার ছিলো অসাধারণ। এতে ইলমের রূপ, রঙ ও জৌলুস প্রকাশ পেতো। উলামার অন্যতম কাজ হলো শিষ্টাচারকে বিস্তৃত করা, এর শিক্ষাদান এবং জীবনে তার প্রতিষ্ঠা। মুহাদ্দিস ছাব রহ. এর সান্নিধ্যে শিষ্টাচারের যে নজির লক্ষ্য করা যেতো, তা সালাফের মহান ধারাবাহিকতাকে স্মরণ করিয়ে দিতো। আলেমগণ যার হামিল হবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। অনুরাগী ও শিষ্যদের তারা এর দ্বারা আলোকিত করেন।

ইমাম যুহরী (৫০-১২৪ হি.) বলেন,كُنَّا نَأْتِي الْعَالِمَ فَمَا نَتَعَلَّمُ مِنْ أَدَبِهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ عِلْمِهِ ‘আমরা (ইলিমের তালাশে) আলেমদের নিকটে গমন করতাম। অতঃপর তাদের শিষ্টাচার থেকে যা শিক্ষা নিতাম, তাদের নিকট জ্ঞান অর্জনের চাইতে সেটি আমাদের নিকট অধিক প্রিয় ছিল’ (যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৮/১৫৬)।

তাঁর ইলিম উপসংহারহীন ছিলো না। ইলিমের উপসংহার হৃদয়কে দেয় বিশেষ সিফাত। কর্মকে দেয় বিশেষ রং। আখলাককে দেয় বিশেষ বৈশিষ্ট। সেই রং, সেই গুণ আর সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরবর্তীদের জন্য তাঁর সেই আমানত, যা তিনি লাভ করেছিলেন তার

পূর্বতীদের থেকে। সেই আমানতই আলিমে দ্বীনের আসল মিরাস, যা থেকে বঞ্চিত হওয়াটাই হলো প্রকৃতপক্ষে তাঁকে হারানো। আর একে ধারণ করাই হলো তাকে জীবিত রাখা।

লেখক : কবি, গবেষক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ভদ্রতা যার ভূষণ ছিল

মুফতি মাওলানা আবুল হাসান

দ্বীনি ব্যক্তিত্বের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক পৃথিবীতে খুব কমই আসে, যারা নিজ গুণে পৃথিবী আলোকিত করেন। সমাজকে উপহার দেন নক্ষত্র তুল্য অমূল্য সম্পদ। রারাইর হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এমনি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহান মানুষ ছিলেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন এমন উচ্চ জ্ঞান, গরিমা দিয়ে যা দিয়ে তিনি কলুষিত সমাজকে আলোকিত করেছেন। তাঁর ইলমি গভীরতা আর আখলাকি মাধুর্যতায় অগনিত মানুষ সন্ধান পেয়েছে সঠিক পথের। শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সঙ্গে আমার পরিচয়টা যদিও বড় আকারের ছিল না। তদুপরি তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যতা, সুন্নতে নববীর অনুসরণ আমাকে বিমোহিত করে। তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমার বেশ মনে পড়ে সে দিনের দৃশ্যটি, যে দিন তিনি জামিয়া ইসলামিয়া দারুসসুন্নাহ মোহাম্মদিয়া লামারগ্রাম মাদ্‌রাসার বার্ষিক মাহফিলে অতিথি হয়ে এসেছিলেন। সম্ভবত ১৯৯৪ বা ১৯৯৫ সালের বার্ষিক মাহফিলের দিন ছিল। জামিয়ার মহা-পরিচালক আধ্যাত্মিক জগতের রাহবর শাহ-সুফি আল্লামা আব্দুল জব্বার পীর সাহেব রায়পুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বড় উদার মনের মানুষ ছিলেন।

তিনি জামিয়ার বার্ষিক মাহফিলে শীর্ষ স্থানীয় বিদগ্ধ উলামায়ে কেরামদেরকে দাওয়াত করতেন। শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহও সে বছর জামিয়ার মাহফিলে অতিথি হয়ে আগমন করেছিলেন। হযরতুল আল্লাম মাওলানা আব্দুল জব্বার পীর সাহেব রায়পুরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আদতে শরিফা ছিল, মাহফিলে আগত বিশিষ্টি উলামা হযরাতকে তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর পাশে বসিয়ে মেহমানদারী করা। শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ সেদিন যখন হযরত রায়পুরী রাহমাতুলালাহি আলাইহির সাথে মুলাকাত করেন তখন মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহকে রায়পুরী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সম আসনে বসানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু মুহাদ্দিস ছাহেব বসেন নি। মরহুম হযরত পীর সাহেব রায়পুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বার বার অনুরোধ করার পরও মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ নিচে ফ্লোরে বসে যান। তিনি হযরত রায়পুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সম কুরছিতে বসেননি। আমি তাঁর এই তাওয়াজু ও ইনকেছারি দেখে আবেগ আপ্লুত হয়ে যাই। এতো বড় মাপের মুহাদ্দিস ছাহেব হয়েও তাঁর মধ্যে এতো ইনকেছারি। সুবহানাল্লাহ। সে দিনের এ দৃশ্যটি দেখার

পর থেকে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অনেক বেড়ে যায়। এতো বড় মাপের মানুষ হয়েও ইনকেছারির যে দৃষ্টান্ত রাখলেন তা সত্যিই বিরল।

আসলে যিনি যত বড় হন, তার মন ততো বড় হয়। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন বৃহত্তর সিলেটের এক রত্ন। যার ইলিম, আমল, ইখলাস, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা, উদারতা ও জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করা আমার মতো নালায়েকের পক্ষে সম্ভব নয়। সে দিন ঐ একান্ত বৈঠকে আলাপ চারিতায় তিনি যে আলোচনা করেছিলেন তার বাস্তবতা আজ মাত্র ২৮ বছর পরে জাতি বাস্তবে রন্দ্রে রন্দ্রে উপলব্ধি করতে হচ্ছে। তিনি আলাপ চারিতায় বলেছিলেন, আজ আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আলিম "জুযি" মাসআলা মাসাইল নিয়ে বির্তকে জড়াচ্ছে। যেগুলো না ওয়াজিব না সুন্নাত, আর পরস্পর দুরত্ব সৃষ্টি করছে। আমাদের এ গুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি আরো বলেছিলেন, আমার অত্যন্ত ভয় লাগছে, আমি যেমন দেখেতে পাচ্ছি, তথাকথিত "আহলে হাদীস" নামে যে ফিতনা আমাদের সামনে মহামারি আকারে আসতেছে, তা থেকে উম্মতকে হেফাজতে রাখার জন্য এখন থেকে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। নতুবা আল্লাহর পাকড়াও থেকে আমরা কেউই রেহাই পাবো না। বিভিন্ন সময় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সাথে আমার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। দোয়া নিয়েছি। কিন্তু তাঁর মধ্যে কখনও অহংকারের লেস মাত্র খুঁজে পাইনি। মছনুন হাসীস দিয়ে কথা বলতেন। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর জীবনের বাকে বাকে আমাদের জন্য শিক্ষনীয় অনেক কিছু রেখে গেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর জীবন ব্যাপী খিদমত সমূহ কবুল করে চিরস্থায়ী জান্নাতের বাসিন্দা বানিয়ে নিন। আমিন।

লেখক: ইমাম ও খতিব, জকিগন্জ বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ; সহকারী শায়খুল হাদীস জামেয়া ইসলামিয়া দারুস সুন্নাহ মোহাম্মদীয়া লামার গ্রাম মাদ্‌রাসা, জকিগন্জ, সিলেট।

আমার দেখা আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা মোঃ আব্দুল জব্বার

আমি মূলত মাদ্‌রাসার ছাত্র নয়। স্কুলে লেখা পড়ার মধ্য দিয়েই আমার শিক্ষা জীবনের শুরু। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে আমি জকিগন্‌জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করি। কিন্তু এসএসসি পাশ করার পর আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর সুনাম যশ খ্যাতি, গ্রহণযোগ্যতা, তাঁর আদর্শ চাল-চলন, ব্যবহার, মানুষের প্রতি ভালবাসা দেখে মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ জন্মে। আমি মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের তত্বাবধানে ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হই। একজন মোহাক্কিক এবং ত্যাগী উস্তাযের যেসকল গুণ থাকা দরকার তার সবগুলোই আমি আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর মধ্যে দেখেছি। ছাত্রদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাস, প্রয়োজনে শাসন করা, ছাত্রদের সার্বিক অবস্থার প্রতি কড়া নজরদারী, অভিভাকদের সাথে আন্তরিক যোগাযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি। এ সবগুলো বিষয়ই হুজুরের মাঝে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

ইলমের খনি আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ খুবই প্রখর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ইলমে কুরআন, ইলমে হাদীস, ফিকহ, আদব ও ইলমে তাসাউফের অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যেকোন বিষয়ে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা যে কেউ সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতো। যে কোন কঠিন বিষয়ে তাঁর নিকট সমাধান চাইলে তিনি অত্যন্ত সহজ সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করে বুঝিয়ে দিতেন।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ইলমে হাদীসের নিরলস খাদিম হিসেবে পূর্ণ অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় মহান ব্যক্তি ছিলেন। পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে হুজুর সুন্নতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী ছিলেন।

ইলমে তাসাউফের ক্ষেত্রে হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রথম সারির একজন খলিফা ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে ছাহেব কিবলাহর নিকট থেকে খেলাফত লাভ করেন। তিনি দুরূদ শরীফের কিতাব দালাইলুল খাইরাত দৈনন্দিন পড়ার বিন্যাস ও হিযবুল আযম তাহকীককৃত সংস্করণ প্রকাশ করে পাঠকের নিকট পৌঁছে দেন। তাঁর রচিত আল কাউলুল মাকবুল ফী মীলাদির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিতাব খানা সর্ব মহলে সমাদৃত। এছাড়া তিনি দৈনন্দিন জীবনে পঠিতব্য দোয়ার সংকলন দোয়ায়ে মাছনুনাহ ও তেত্রিশ আয়াতের ফজিলত, অজিফা সহ বিভিন্ন কিতাবাদী রচনা করেন। তিনি আনজুমানে মাদরিসে আরাবিয়া, আনজুমানে আল

ইসলাহ, আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া সহ বিভিন্ন সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন।

১৯৮১ বা ৮২ খ্রীস্টাব্দের রামাদান মাসে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসার তৎকালীন প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা মোঃ আব্দুল মন্নান সাহেবের অনুমতি ও সহযোগিতায় অনেক ত্যাগ ও পরিশ্রমের ফলে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসা শাখা খোলা হয়। এই শাখা খোলা এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও দায়িত্ব পরিচালনার ভার আমি অধমের উপর ন্যস্ত করা হয়। দারুল কিরাতের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে যাতে তালামীযে ইসলামিয়া তার কোন সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারে সেজন্য তালাবায়ে আরাবিয়া ও ইসলামি ছাত্র শিবিরের বহুসংখ্যক নেতাকর্মী দারুল কিরাতে ভর্তি হতে থাকে। তৃতীয় রামাদানে কেন্দ্রের প্রধান কারী হযরত মাওলানা জালাল সিদ্দিকী সাহেব বিষয়টি আঁচ করতে পেরে আমাকে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন। তাঁর সাথে পরামর্শ করে আমি ফুলতলী ছাহেব বাড়িতে চলে যাই। ছাহেব বাড়িতে গিয়ে ছাহেব কিবলাহর নিকট বিষয়টি খুলে বললে ছাহেব কিবলাহ একখানা চিঠি লিখে তা মুহাদ্দিস ছাহেবকে দিতে বলেন। আমি চিঠি খানা নিয়ে সোজা ইছমতি কামিল মাদ্‌রাসায় চলে যাই। মুহাদ্দিস ছাহেবকে চিঠি খানা দিলে পরদিন যাবেন বলে হুজুর আমাকে বিদায় দেন। পরদিন যথা সময়ে হুজুর সেখানে উপস্থিত হলেন। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে সেখানে দারুল কিরাতের দায়িত্বে দেখতে পেয়ে ছাত্র শিবির, তালাবায়ে আরাবিয়া, তালামীযে ইসলামিয়া সহ সকল সংগঠনের, সকল মতের নেতা কর্মীরা মাসব্যাপী নিরবে নত হয়ে কেরাত প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। হুজুরের প্রজ্ঞা, মেধা, দক্ষতা, আদব আখলাক ও নির্মল ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিল। কেউ কেউ আবার বলাবলি করছিল, মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ফুলতলী ছাহেবের সঙ্গ ত্যাগ করলে দেশ বিখ্যাত আলিমের মর্যাদা পেতেন। অনেককে আবার বলতে শুনেছি হুজুরের চালচলনে মহানবীর রেখে যাওয়া আদর্শের নমুনা পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা হুজুরকে জান্নাতুল ফেরদৌসের আলা মাকাম দান করুন। আমিন।

লেখক: সিনিয়র শিক্ষক, জকিগন্‌জ ফাজিল সিনিয়র মাদ্‌রাসা, সিলেট।

ক্ষণজন্মা কিংবদন্তি
মুহাদ্দিস মাওলানা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা আ, জ, ম, অহিদুল আলম

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

মানবতার মুক্তির দিশারী পবিত্র কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এরশাদ ফরমায়েছেন: হে আমার প্রিয়তম হাবীব! আপনি জানায়ে দিন যে, যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান! অর্থাৎ তারা সমান নহে। কারন ইলম হলো নূরে এলাহী। কুসংস্কারের অন্ধকার, লা দ্বীনিয়াতের অন্ধকার, শিরক ও বিদয়াতের অন্ধকার থেকে নূরে এলাহীতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে আলোকিত, পুলকিত প্রস্ফুটিত প্রজ্জলিত ও প্রদীপ্ত করে। জাহিলিয়াতের জুলমত থেকে জীবনকে কলুস মুক্ত করে হিরা মনিমুক্তা তুল্য রত্ন বানায়। এজন্য আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু ইলমের ফজিলত ও هاى এর মর্যাদা বর্ননা করে বলেন-

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

আল্লাহ তালা মুমিন বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং যাদেরকে ইলমে দ্বীনের অধিকারী করা হয় তাদেরকে তিনি বহু মর্যাদায় ধন্য করেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে, যাকে ইলমে দীন দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত ও পর্যাপ্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে।

দোজাহানের কামলিওয়ালা নবী ওলামায়ে কেরামকে নবীগণের ওয়ারিশ ও উত্তারাধীকারী খেতাব দিয়ে বলেন: العلماء ورثة الانبياء সুতরাং আলেম দুই ভাগে বিভক্ত (এক) আলেমে হক্কানী বা রব্বানী (দুই) আলেমে ছু বা দুনিয়াদার আলেম। দুনিয়াদার বা বদ আলেম কখনো নবীর ওয়ারিশ হতে পারে না। কেবলমাত্র তারাই হক্কানী আলেম যারা কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক আমল করতঃ শরীয়ত মারেফত তথা ইলমে জাহের ও বাতেন অর্জন করে উভয়ের সমন্বয়ে জেন্দেগী গঠন করেছেন এবং অলী আউলিয়া গাউছ কুতুব আবদালদের সোহবত ও সান্নিধ্য হাসিল করে খাটি ও পোক্ত হয়েছেন। তাদেরই মধ্যে আসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব, ক্ষণজন্মা পুরুষ, হাদীস শাস্ত্রের অবিসংবাদিত সুপ্রসিদ্ধ মহৎ ও বিজ্ঞজন, লাখো আলেম হাফেজ মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আদীব তৈরীর পারফেকট কারিগর, শ্রুতি মধুর কণ্ঠের ওয়াজ নছীহত দানকারী মুবাল্লিগ, বৃহত্তর সিলেট জেলার গৌরব ও গর্ব, আলেম সমাজের উজ্জল জ্যোতিস্ক ও উস্তাজুল আছাতিযা,

সুশ্রী চেহারার অধিকারী ইলমে শরিয়তের নক্ষত্র, ইলমে মারেফতের প্রদীপ্ত প্রদীপ, ছাহেব কেবলা জনাব মরহুম মাওলানা আবদুল লতিফ চৌধুরি ফুলতলী (রহ:) এর বিশিষ্ট খলিফা, বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ এর সাবেক সভাপতি, বিচিত্র জীবন ইতিহাসের অধিকারী, অসংখ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র, কোর্টের বিচারক, দেশ বিদেশে যার রয়েছে অগনিত গুণগ্রাহী, দেশ বরেণ্য শায়খুল হাদীস মাওলানা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ (মুহাদ্দিস হুজুর)। যিনি ছিলেন সরকারে দো আলম হাবীবে কিবরিয়া রহমাতুল্লিল আলামীনের আদর্শে অনুপম অনুকরণ, অনুস্মরণের অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

পবিত্র কুরআনের ভাষায় অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসুলের জীবনের মধ্যে রয়েছে উত্তম-উৎকৃষ্ট আদর্শ। অত্র আয়াতে কারীমার মেসদাক ছিলেন মুহাদ্দিম হুজুর মাওলানা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ।

কবির ভাষায়ঃ

مپندار سعدی که راه صفا تواں رفت جزبر پائے مصطفی۔

অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি ও সংযম হাসিল করতে হলে নবী মোস্তফার পায়রুবী-আনুগত্য ব্যতীত কখনোই সম্ভব নয়। সেই হেতু মোহাক্কেক ও মুদাক্কেক ব্যক্তিগণ রহমতওয়ালা নবীর এশকে মোহব্বতে গরক হয়ে তাঁরই আদর্শের হুবহু নমুনায় জীবন গঠনকরণে, শায়খুল হাদীস মাওলানা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ তদ্রুপ সুন্নতে নববীর পূর্ণ অনুসারী এক মহৎ কিংবদন্তি। তারই কর্মময় বিশাল জীবনের যতকিঞ্চিত তারই রূহানী তাওয়াজ্জহ ফয়েজ বরকতে ধন্য হওয়ার মানসে আমি নগন্যের এক্ষুদ্র প্রয়াস।

জন্ম তথ্য

১৯৩৪ খ্রি. মোতাবেক ১৩৫২ হিঃ সনে সিলেট জেলার জকিগন্জ উপজেলার রারাই গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরীবারে শুভ শধ্যিক্ষনে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মুহতারমের নাম জনাব মরহুম মাওলানা মোঃ মোমতাজ আলী, মাতা মুহতারিমা মরহুমা আমিনা খাতুন। তারা সাত ভাই এবং এক বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তম ছিলেন। মুহাদ্দিম হুজুরের আব্বাজান ছিলেন এলাকার প্রখ্যাত প্রবর স্বনামধন্য একজন এলেমে দ্বীন।

শিক্ষা জীবন

রারাই গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে কিছুকাল লেখা পড়া করে শৈশব কালেই তিনি তার বড় ভাই জনাব মরহুম মাওলানা নজিবুর রহমানের (রহ:) সাথে বর্তমান ভারতের বদরপুর

সিনিয়র মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে কিছুদিন লেখাপড়া করে দেশে ফিরে আসেন। এসে কানাইঘাট উপজেলা ধান সড়কের বাজার আহম্মদিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এখানে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত লেখা পড়া করেন। সড়কের বাজার মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন কালীন সময় শিক্ষকগনের উৎসাহে পার্শ্ববর্তী প্রাইমারি স্কুল থেকে জেলা ভিত্তিক প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে সিলেটের অন্যতম প্রাচীন ইসলামি বিদ্যাপিঠ গাছবাড়ী জামেউল উলুম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা এডেকুশন বোর্ডের অধিন আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৯ সালে হাদীস বিভাগে কামিল পরীক্ষায় বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য যে, গাছবাড়ি মাদ্‌রাসায় ইতিহাসে বোর্ডের মেধা তালিকায় স্পন লাভকারী সর্ব প্রথম ছাত্র একমাত্র তিনিই।

কর্মজীবন

১৯৫৯ সালের ৩ আগস্ট সিলেট জকিগন্‌জ উপজেলার ইছামতি দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় সহকারি মাওলানা পদে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালের ১০ এপ্রিল সিলেটের প্রাচীনতম ইসলামিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফুলবাড়ি আজিজিয়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। স্বীয় পীর ও মুর্শিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কেবলা (রহ:) এর নির্দেশে ১৯৬৩ সালের ২৩ নভেম্বর সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিম হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সেখানে সুনামের সাথে অধ্যাপনা করেন। ১৫ জানুয়ারি ইছামতি দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ইতোমধ্যে সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ নিয়ে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয় সমস্যা নিরসনকল্পে জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের অনুরোধে ১৯৭৬ সালের ১১ অক্টোবর সেখানে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদেন। তার এ ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে অল্পদিনের মধ্যে মাদ্‌রাসার স্থিতিশীলতা ফিরে এলে ১৯৭৭ সালের ২ এপ্রিল সেখান থেকে চলে আসেন।

আরব আমিরাতে অবস্থান

আরব আমিরাত ৭ স্টেটের সমন্বয়ে গঠিত (দুবাই, সারজা, আজমান, রাসেল খাইমা, উম্মুলকুইন, ফুজাইরা, আবুধাবী) মুহাদ্দিস হুজুর (রহ:) ইলমে হাদীসের পাশা পাশি আহলে আরবদেরকেও বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতের শিক্ষা প্রদান করেন। ১৯৭৭ খ্রিঃ সন থেকে ১৯৮১ খ্রিঃ সন পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থান করেন। প্রথমত উম্মুল কুইন সহরের জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব নিযুক্ত হন। তথায় প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বিচার বিভাগে যোগদান করত কোর্টের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ খ্রি. সালের ১৪ সেপ্টেম্বর অবার তিনি ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। অত্যন্ত সুনাম ও

দক্ষতার সাথে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন কার্যক্রম চালিয়ে ১৯৯৯ খ্রি. সালের ৩১ ডিসেম্বর নিয়মতান্ত্রিকভাবে অবসর গ্রহণ করেন। তার একান্ত প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিলোতিলে ইছামতি ফাজিল মাদ্‌রাসা পূর্ব সিলেটর শ্রেষ্ঠতম ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠে। তার একক প্রচেষ্টায় মাদ্‌রাসার অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়। আলিম, ফাজিল ও কামিল ক্লাসের সরকারী মঞ্জুরী এবং স্বীকৃতি আদায়ে তার অবদান অনস্বীকার্য। মাদ্‌রাসার বিল্ডিং এবং সুবিশাল মসজিদ তার নীরব সাধনার স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইছামতি মাদ্‌রাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং গভর্নিং বডির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অর্ধ শতাব্দির অধিক কাল ধরে ইলমে হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত এ মনীষী অধ্যাপনার পাশাপাশি সাধারন মানুষের কাছে কুরআন হাদীসের শিক্ষা পৌছে দেয়ার লক্ষে দেশ বিদেশে নিয়যিত তাফসীরুল কুরআন, দারসে হাদীস প্রদান ও মাহফিলসমূহে বয়ান পেশ করতেন। তার বয়ানে সব সময়ই ইলমি ও আমলী বিষয় প্রাধান্য পেত। কবির ভাষায়-

علم دين فقه است وتفسير وحديث

ہر كه خواهى غيرازيں گر در خبيث

অর্থাৎ, ইলমে দ্বীন হচ্ছে ফেকাহ, তাফসীর ও হাদীসের সমিষ্টিত। এ ভিন্ন অন্য সব খবিছী ও ভ্রান্ত। তাই যারা হককানী আলেম তাদের ব্যক্তিগত আমলে সহীহ হাদীস, ফেকাহ, ইজমা কেয়াসের বাস্তবতায় থাকায় তাহার বয়ান তাকবীরের মধ্যেও হাদীস কুরআনের মূল্যবান মনি মুক্তার অলঙ্কারে ভরপুর থাকতো। তাদের সোহবত ও সান্নিধ্য লাভের জন্য মহান আল্লাহর বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

অর্থাৎ, হে ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ছাদেকীন ছালেহীনদের সংগী হও। জনাব মাওলানা মো. হবিবুর রহমান (মুহাদ্দিস হুজুর) ইলম, আদব ও আমলের সুন্দর সাজে সজ্জিত ছিলেন। কবির ভাষায়-

فان العلم نور من الهي ونور الله لا يعطى بعاصي.

অর্থ্যাৎ, কারন ইলম আল্লাহ তালার অবতীর্ণ নূর এই নূর পাপী হতে সদা দূরে থাকে।

বিভিন্ন দেশে দাওয়াতি সফর

১৯৮১ সালে স্বীয় পীর ও মুরশিদ হফরত ফুলতাসী ছাহেব কিবলাহ (রহ:) এর নির্দেশ তিনি আরব আমিরাত থেকে প্রথম বারের মত যুক্তরাজ্য সফর করেন। মাত্র ১৫ দিন সফরে তিনি ছাহেব কেবলার সাথে ইউ, কে, এর বিভিন্ন শহরে আয়োজিত মাহফিল

প্রোগ্রামে মূল্যমান বয়ান পেশ করেন। স্বল্প দিনের সফর শেষে ছাহেব কেবলা সাথে হজ্জ পালন শেষে আপন কর্মস্থলে আরব আমিরাতে ফিরেযান। এর পর থেকে তিনি প্রায় প্রতি বছর যুক্তরাজ্য সফর করেন। এসব সফরে তিনি গ্রেট ব্রিটেনের উল্লেখযোগ্য প্রতিটি শহরে বিভিন্ন মাহফিলের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের মহান দায়িত্ব পালন করেন।

ব্রিটেনে বসবাসরত তাঁর ছাত্রগণের অনুরোধে ২০০৯ সালে তিনি একাধারে প্রায় নয় মাস সে দেশে আবান করেন। সে সময় প্রতি শনিবার লন্ডনস্থ দারুল হাদীস লতিফিয়ায় শামাঈলে তিরমিযী বিখ্যাত হাদীসের কিতাব সম্পূর্ণ দারস প্রদান করেন। নিয়মিত সে দারসে গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর থেকে প্রচুর সংখক ওলামা এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করতেন। দারস পূর্ণ হলে দুই শতাধিক আলিমকে শামাঈলে তিরমিযীর সনদ প্রদান করেন। যুক্তরাজ্যে সফরকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শহরে রিয়াদুস্ সালিহীন এবং আদাবুল মুফরাদ নামক বিখ্যাত হাদীসের কিতাবেরও দারস প্রদান করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র

১৯৯৫ সালে আমেরিকায় অবস্থানরত তাঁর ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের আমন্ত্রণে তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। সে সময় বিভিন্ন শহরে মাহফিলসমূহে যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভন্ন শহরে তাঁর প্রেরণা ও নির্দেশনায় বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামি সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সিরিয়া

২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি সিরিয়া সফর করেন। সে সময় দামেস্কের বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদগণের সাথে ব্যাপকভাবে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। সে সফরে দামেস্কের প্রখ্যাত হানাফী আলিম, আল ফিকহুল হানাফী ওয়া আদিলাতুহুসহ বহু মূল্যবান কিতাব প্রণেতা শায়খ ড. আসআদ মুহাম্মাদ সাঈদ সাগিরজি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কাছ থেকে ইলমে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন। সনদ গ্রহণ উপলক্ষে শায়খ সাগিরজি দামেস্কের উল্লেখযোগ্য উলামার উপস্থিতিতে ২৯ অক্টোবর ২০০৮ নৈশভোজের আয়োজন করেন। এ ছাড়া বহু গ্রন্থ প্রণেতা শায়খ ড.আজ্জাজ আল খাতিব রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ হিশাম বুরহানি রাহিমাহুল্লাহ. শায়খ আবদুর রাহমান হাম্মামি প্রমুখ তাঁর সাথে একান্তভাবে ইলমি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে শায়খ হাম্মামি পুরো সফরে নিজে ড্রাইভ করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনে নিয়ে যান।

মরক্কো

২০১০ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মরক্কো সফর করেন। এ সময় মদিনাতুল আউলিয়া নামে খ্যাত মারাকাশ শহরে দালাইলুল খাইরাত প্রণেতা ইমাম জাযুলী রাহমাতুল্লাহি

আলাইহি, ইমাম কাযী আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম সুহাইলি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখের যিয়ারত করেন।

ভারত

ভারতের আসাম প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি বিভিন্ন সময়ে ব্যাপক সফর করেন। সেসব সফরে মাহফিলে যোগদান ছাড়াও উলামায়ে কেরামের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্পনে বুখারী শরিফের দারস প্রদান করেন। মিশর : ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি মিশর সফর করেন। সেই সফরে কায়রো শহরে সাহাবি উকবা ইবন আমির রাদিয়ালাহু আনহুর মাজার প্রাঙ্গণ, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ'র মাজার প্রাঙ্গণ এবং ইতিহাসখ্যাত আল-আজহার মসজিদে হাদীস শরীফের দারস প্রদান করেন।

রাজনৈতিক জীবন

শিক্ষকতা ও দাওয়াতি কার্যক্রমের পাশাপাশি একসময় তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীতে তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির সিলেটের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নেজামে ইসলামের মনোনয়নে তিনি তখনকার সিলেট ৭ আসনে (জকিগন্জ, বিয়ানীবাজার ও কানাইঘাট) এমএনএ (Member of National Assemble) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সম্মানজনক ভোট পান। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল-ইসলাহ'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে আঞ্জুমানে আল-ইসলাহ মনোনীত ও সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে তিনি জাতীয় নির্বাচনে সিলেট পাঁচ আসনে (জকিগন্জ-কানাইঘাট) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

পত্রিকা প্রকাশ

১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর সম্পাদনায় সিলেট শহর থেকে মাসিক শাহজালাল নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বল্প সময়ে সিলেট অঞ্চলে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করলেও ১৯৯৩ সালে নানা কারণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

প্রকাশিত গ্রন্থ

এ পর্যন্ত তাঁর লেখা ১৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

১. আল কাউলুল মাকবুল ফী মিলাদির রাসূল

২. দোয়ায়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফজিলত

৩. মাসআলায়ে উশর : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

৪. দুরূদ শরীফের ফযীলত ও ওযীফা

৫. যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা (ফযীলত ও নিয়ম)

৬. আসহাবে বদর

৭. ওযীফা

৮. হজ্জ ও যিয়ারত (সংক্ষিপ্ত আহকাম ও নিয়ম)

৯. হাদিয়াতুল লাবীব ফী নাবযাতিম মিন সীরাতিন নাবিয়্যিল হাবীব

১০. যাখীরাতুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী ফাদায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন

১১. কানযুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যিল আমীন

১২. তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব

১৩. আত তুহফাতুল লাতীফাহ ফী আহাদীসিল মুসালসালাতিল মুনীফাহ

১৪. দালাইলুল খাইরাত

১৫. আল হিযবুল আযম

১৬. দারসে হাদীস-১

১৭. সালাতুত তারাবীহ

১৮. মুনতাখাবুস সুনান ওয়াল আছার

ইন্তেকাল

২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যা ৬:১৮ মিনিটে সিলেট জেলার জকিগন্জের নিজ বাড়িতে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরদিন ৮ ফ্রেব্রুয়ারি রোজ মঙ্গলবার বাদ যোহর বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে নামাযে জানাযা শেষে বাড়ির পাশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আল হাবীব জামে মসজিদের উত্তর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাদ্দিস হুজুর আজ নেই; তাঁর অনেক কৃতী ও স্মৃতি এখনও বিদ্যমান। এগুলো সংকলন করা, সংরক্ষণ করা, সম্প্রসারণ করা তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারীদের কর্তব্য। আল্লাহ তাদের তাওফীক দান করুন এবং মুহাদ্দিস হুজুরকে দান করুন জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা।

তথ্যসূত্র

১. জালালাবাদের কথা দেওয়ান নুরুল আনওয়ার হোসেন চৌধুরী প্রকাশক : বাংলা একাডেমি

২. হাদীস চর্চায় বাংলাদেশী মুহাদ্দিসগণের অবদান ড. মাওলানা মোরশেদ আলম সালেহী প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

৩. চলমান জালালাবাদ : ইসলামী রেনেসাঁর অনন্য যারা শায়খ তাজুল ইসলাম আউয়ালমহলী

৪. প্রসঙ্গ জকিগন্জ ইতিহাস ও ঐতিহ্য মো: হান্নান মিয়া (সম্পাদক) প্রকাশক: উপজেলা পরিষদ, জকিগন্জ

৫. জকিগন্জ মনীষা সম্পাদক: মো. আবদুল আউয়াল হেলাল, অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল হাকীম প্রকাশক: জকিগন্জ লেখক পরিষদ

৬. আহবাব (সনদ বিতরণ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক ২০০৮) সম্পাদক : অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুন নূর

৭. ইসলামী আন্দোলনে জালালাবাদ প্রফেসর ফজলুর রহমান

লেখক: মুফাসসির ও সহকারী অধ্যাপক, তাফসীর বিভাগ, ছারছীনা দারুসসুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসা, পিরোজপুর।

স্মৃতির আয়নায় হাদীস জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, উস্তাযুল আসাতিযা, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা আবু নছর মোঃ কুতুবুজ্জামান তাফাদার

الحمد لله الذى شرف اشرف الخلق بالتعارف والتقرب به بالإيمان والعلم والعمل والاخلاق والصلاة والسلام على خير خلقه الذي افاض العالم بفيض ربه بما اوحى اليه منه وبينه تبيينا وبلغه تبليغا وعلى اله وصحبه ومن تبعهم وسلك نهجهم من بعدهم الى يوم- الدين

অশেষ প্রশংসা ও শুকুর মহান আল্লাহ তা'লার দরবারে, যিনি আমাদেরকে দ্বীনে ইসলামের অনুসারী বানিয়ে এর সত্য ও সুন্দর বাস্তবতার পথে পরিচালিত করেছেন। প্রিয় নবী সায়্যিদুল মুরসালিন হাবীবুল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত অনুসারী ও উত্তরসূরি উলামায়ে রাব্বানীর সংস্পর্শ লাভের তাওফিক দিয়ে ধন্য করেছেন। তাদের ওসীলায় সিরাতুল মুস্তাক্বিমের উপর পরিচালিত হবার পথ সহজতর করে দিয়েছেন এবং যুগের মধ্যে আপতিত নানাবিধ ফিতনা, বিভ্রান্তি, বিপর্যয় ও গোমরাহীর সকল প্রতিকুল অবস্থাকে উপেক্ষা করে ঈমান- আক্বীদাহ নিরাপদ রেখে দ্বীনের বিশুদ্ধ আলোকোজ্জ্বল পথ অনুস্মরণ অনুকরণের তাওফিক দানে ধন্য করেছেন। তৎসঙ্গে শ্রদ্ধার সাথে সকল ইহসান ও অবদানের বিষয় স্মরণ করি সত্য পথের দিশারী আইম্মা, শুয়ূখ ও আসাতিযগণের, যাদের প্রদর্শিত পথ হেদায়েত ও নাজাতের ওসীলাহ। মহান আল্লাহ তা'লা তাদের সকলকে যেন দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বোত্তম প্রতিদান দানে ধন্য করেন।

হযরত মুহাদ্দিস সাহেব রারাই রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে লিখে তাঁর ব্যক্তিত্ব বা শাখসিয়াতের যথার্থ উপস্থাপন আদৌ সম্ভব নয়।

মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর জীবন ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শের অনুপম অনুকরণে সাজানো। তিনি পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, প্রাতিষ্ঠানিক জীবন সকল স্তর অতিবাহিত করেছেন প্রশংসনীয় আদর্শের উপর। তাঁর বাহ্যিক অবস্থা যেমন ছিল সুন্নাতে নবুবীর অনুসরণ-অনুকরণে সাজানো, তেমনি অভ্যন্তরীণ আদব- আখলাকও ছিল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শের প্রতিফলন।

বাক্যালাপে তাঁর উদাহরণ তিনি নিজেই। কথা-বার্তার মধ্যে হাস্যরস সহ পাণ্ডিত্যের কোন কমতি ছিল না। তিনি কথা বলতেন খুব মেপে মেপে। কখনো তাঁর বাক্যালাপে

বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি সর্বদা পরনিন্দা ও অনর্থক বাক্যালাপ পরিহার করে চলতেন। তিনি এমন কোন কথা বলতেন না যা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যে কোন বিষয়ে তার তাহকীক ছিল চূড়ান্ত। তার দেয়া সিদ্ধান্ত মেনে নিতে কারো কোন দ্বিধাবোধ করতে হত না। যে কোন বিষয়ে সঠিক বিচার-বিশেষণের সর্বোচ্চ শিখরে ছিল তাঁর অবস্থান। মতবিরোধপূর্ণ সকল মাসআলা নিয়ে তাঁর তাহকীক ছিল সর্বজনবিদিত।

ছাত্রদেরকে পাঠদানে তিনি ছিলেন অতি সতর্ক ও যত্নশীল। সহজবোধ্য সাবলীল উপস্থাপনায় জটিল ও কঠিন বিষয়কে ছাত্রদের হৃদয়গ্রাহী করতেন। তাঁর শৈল্পিক উপস্থাপনার ধারাবাহিকতা সুদীর্ঘ বক্তব্যকেও স্মরণে রাখা সহজ করে দিত। ধর্মীয় যে কোন বিষয়ের পাঠদানে তিনি ছিলেন পূর্ণ পারঙ্গম। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ছিল সর্বমহলে প্রশংসনীয়।

কোন কিতাবের লিখক সম্পর্কে আলোচনা করলে- তাঁর জন্মস্থান, শিক্ষাজীবনসহ প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য এমনভাবে বলে দিতেন যেন ভৌগলিক ম্যাপ সামনে রেখে তা বলে দিচ্ছেন। এমনকি উক্ত লেখকের লিখিত গ্রন্থাবলীর তালিকা উপস্থাপনে কমতি করতেন না।

উর্দু ভাষায় যখন হাদীসের দারস প্রদান করতেন তখন তাঁর ভাষা শুনলে তিনি বাংলা ভাষাভাষী লোক বলে মনে হতো না। উর্দু ভাষায় তাঁর উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিকতাপূর্ণ বয়ান শুনলে যে কেউ তাঁকে উঁচু মাপের উর্দু ভাষার সাহিত্যিক বলে গণ্য করত। তাঁর তাক্বরীর বস্তুনিষ্ঠ, প্রসঙ্গিক ও আকর্ষনীয় হওয়ায় ছাত্ররা তা শুনতে কখনো অমনোযোগি হতো না।

ছাত্রদের সাথে ছিল তাঁর চমৎকার আন্তরিকতাপূর্ণ সুসম্পর্ক।

সময়ে সময়ে তাদের সার্বিক খোঁজ-খবর নিতেন। স্নেহ করে প্রায়শ তাদেরকে কাপড় চোপড়, কিতাবাদিসহ অনেক জিনিস উপহার দিতেন। তাঁর ছাত্রদের অনেকে এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণও তাঁকে সর্বোচ্চ অভিভাবক হিসেবে মনে করতেন। যে কোন প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তারা তাঁরই দ্বারস্থ হতেন। তাঁর দেয়া সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে আমলে নিতেন। তাঁর সম্পর্কে তাদের এ বিশ্বাস ও আস্থা ছিল- আল্লাহর প্রিয়ভাজন এ মনীষীর সুপরামর্শ ও সিদ্ধান্ত তাদের জন্য যথোচিত ও কল্যাণকর হবে।

আধ্যাত্মিকার ক্ষেত্রে তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী ও বুজুর্গ হযরত ফুলতলী সাহেব ক্বিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর সুযোগ্য সিনিয়র খলিফা ছিলেন। নিজের জীবনের ছোট বড় সকল বিষয়াদি, এমনকি নিজের কর্মস্থল নির্ধারণ তারই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারণ করেছেন। প্রয়োজনীয় যে কোন বিষয়ে প্রিয় মুর্শিদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করতেন। এত বড় মাপের আলেম হওয়া সত্বেও মুর্শিদের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অপরিসীম। এর দ্বারা তিনি তরীকত ত ও বেলায়েতের সুউচ্চ মাক্বামে পৌছে ছিলেন।

তিনি নিজের প্রকাশ ও প্রচার অপছন্দ করতেন। তাই তাঁর কারামত ও কামালাত অনেকটা গোপন থেকেছে। তিনি কাশফের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয় তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়ে যেত। আর কখনো অনিচ্ছায় তা জবান দিয়ে বেরিয়ে আসতো। এ সম্পর্কীয় বহু ঘটনা অনেকেরই জানা।

একদা হুজুর ইছামতি মাদ্‌রাসায় ক্লাসে বসা অবস্থায় হঠাৎ ফুলতলীর হযরত বড় সাহেব আল্লামা ইমাদ উদ্দিন সাহেব (মা. জি. আ.) এর কথা স্মরণ করে বলছিলেন- আফসোস! বহুদিন হলো উনার সাথে দেখা হল না। সময়ের অভাবে দেখা করার সুযোগ হচ্ছে না। আপনাদের কারো সাথে ইদানিংকালে কোথাও দেখা হয়েছে কি? উনার জন্য মন খুব টানছে। এ কথাগুলো বলার ৫/৭ মিনিট পরই হযরত বড় ছাহেব মাদ্‌রাসার গেইট দিয়ে প্রবেশ করে সরাসরি মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের সাথে দেখা করলেন। (সুবহানাল্লাহ)

হুজুরের একজন স্নেহাস্পদ শাগরিদ মাওলানা মুহাম্মদ আলী খান বলেছেন- আমার বাবা যে বছর রামাদ্বানে ইন্তেকাল করলেন, সে বছর রামাদ্বানের পূর্বে শেষ ক্লাসে হুজুর ক্লাস শেষে সকল ছাত্রদের নিকট থেকে জানতে চাইলেন কে কোথায় রামাদ্বানে দারুল ক্বিরাতের খেদমতে থাকবে। ছাত্ররা একে একে প্রত্যেকের নিজ নিজ শাখা কেন্দ্রের নাম বলে যাচ্ছিল। যখন আমার বলার পালা আসল, তখন হুজুর নিজেই বলে দিলেন - তুমিতো এবার কোথাও খেদমতে যাবে না, তোমার আব্বার খেদমতে বাড়ি থাকতে হবে, কেননা তিনি তো অসুস্থ। অথচ তখনো আব্বা সুস্থ আছেন। মাঝে মধ্যে অসুস্থ হলেও সেরে উঠতেন। আর আমি সে বছরে কুলাউড়ার হিঙ্গাজিয়া মাদ্‌রাসায় দারুল ক্বিরাতের নিয়োগ নিয়েছি। তবে সে দিন হুজুরের কথার উপর আর কোন কথা বলা হয়নি। রামাদ্বান এলে দারুল ক্বিরাতের খেদমতে গেলাম। সে বছর ৩ রামাদ্বান আব্বা হঠাৎ অসুস্থ হলেন এবং একদিনের মধ্যেই ইন্তেকাল করলেন। বাবার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে রওয়ানা করে বাড়ি পৌঁছার আগেই বাবা ইন্তেকাল করলেন। অবশেষে দারুল ক্বিরাতের খেদমতে আর যাওয়া হলো না। রামাদ্বানের বাকি অংশ বাড়িতে থেকে বাবার কবর জিয়ারত ও নেক ইয়াদগারী অব্যাহত রাখলাম। তখন হুজুরের শেষ ক্লাসের সে কথাগুলো বার বার মনে করছিলাম। ভাবছিলাম হুজুর হয়তো কাশফের মাধ্যমে তা অবহিত ছিলেন।

ছাত্র জীবন থেকে নিয়ে শেষ জীবন পর্যন্ত কিতাব অধ্যয়নের একটা মগ্নতা হুজুরের পুরো জীবনময় ব্যাপৃত ছিল। যে কোন বিষয়ের জ্ঞান সমৃদ্ধ কিতাব হাতে পেলে তা না পড়ে কখনো রেখে দিতেন না। প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে হুজুর সিরাত বিষয়ক একখানা নতুন কিতাব পূর্ণাঙ্গ পাঠ করতেন। হাদীস, ফিক্বাহ, তাফসীর, আদবসহ ধর্মীয় সকল বিষয়ের মুত্বালায়া ও পাণ্ডিত্যে হুজুর ছিলেন উচ্চাসনে। প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কিতাব নিজ সংগ্রহে রাখাকে তিনি আবশ্যক মনে করতেন। দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য

কিতাব সংগ্রহে ও সংরক্ষনে তিনি খুব সচেতন ও যত্নশীল ছিলেন। তিনি নিজের সংগ্রহে নিজ বাড়িতে যে বিশাল পাঠাগার রেখে গেছেন- তা এরই উজ্জল প্রমাণ বহন করে। তাছাড়া সৎপুর কামিল মাদ্‌রাসা ও ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসা কুতুবখানায় দুর্লভ কিতাবাদির যে সংগৃহীত ভাণ্ডার রয়েছে তার পুরোটাই বলতে গেলে তাঁর সক্রিয় উদ্দ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফসল।

হুজুরের জ্ঞানের পরিধি শুধু কিতাব অধ্যয়নে সীমাবদ্ধ ছিল না। আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে লাদুন্নীর জ্ঞানে তিনি আলোকিত ছিলেন। জীবনকালে বাহ্যিকভাবে যেমন ছাত্রদেরকে সর্বদা নসিহত ও সুপরামর্শ দিতেন, তদ্রুপ ইন্তেকালের পূর্বে ও পরে অনেক শাগরিদ বাতিনীভাবে হুজুরের সুপরামর্শ ও নির্দেশনা লাভে প্রায়শ উপকৃত হচ্ছেন।

দেশ-বিদেশ ভ্রমণের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে হুজুরের জ্ঞানের পরিধি আরো প্রসারিত হয়েছিল। তিনি প্রচলিত সকল মাজহাব ও মাসলাক সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান রাখতেন। জগতের বহু বড় মাপের সম-সাময়িক জ্ঞানী-গুণীজনের সাথে ছিল তার হৃদ্যতা ও সুনিবিড় সুসম্পর্ক। নিজ দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশের বড় বড় আলেমগণ তাঁর জ্ঞান থেকে উপকৃত হয়েছেন। অনেকে তাঁর কাছ থেকে ইলমে হাদীসের ইজাযাত ও সনদ গ্রহণে নিজেদেরকে ধন্য করেছেন।

হুজুরের আরবী, উর্দু, ফার্সি ও বাংলা সহ বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতার জুড়ি ছিল না। তাঁর লিখনী শক্তি ছিল অতি উঁচু মাপের। হুজুরের লিখিত একখানা ফতোয়ার উর্দু লেখা কপি দারুল উলূম করাচিতে আল্লামা ত্বকী উসমানী সাহেবের জনৈক ছাত্র মারফত তিনি দৃষ্টিগোচর হলে তিনি তা মনোযোগ সহকারে পাঠ করে বললেন, বাংলাদেশে এমন উঁচু মাপের আলেম আছেন নাকি? তখন উক্ত ছাত্র বললেন, তিনি আমাদের সিলেটের একজন শীর্ষ পর্যায়ের খ্যাতনামা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেব। জটিল ও কঠিন যে কোন বিষয়ের সমাধানে যৌক্তিক ও মৌলিক উৎস নির্ণয়ে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একবার জকিগনজের কোন এক এলাকায় সড়কের পার্শ্ববর্তী সরকারি খাস জমির দখলদারিত্ব নিয়ে ভীষণ মারামারিতে একজন মারা যান। এ বিষয়ের শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইছামতি মাদ্‌রাসার তৎকালীন শিক্ষকগণের কয়েকজন মাদ্‌রাসায় আলোচনা করছিলেন। হুজুর অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় প্রথমদিকে তাদের আলোচনায় ভ্রুক্ষেপ করলেন না। অবশেষে যখন তারা হুজুরের নিকট প্রশ্ন করে জবাব জানতে চাইলেন, তিনি বললেন - আপনাদের মাসআলার সমাধান কুদুরী কিতাবে আছে। একটু তালাশ করে দেখুন। এটা তেমন জটিল কোন মাসআলা নয়। হুজুরের জবাব শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন। সকলের একই প্রশ্ন - কুদুরী কিতাবে মাসআলাটা কোথায় আছে? হুজুর তাদের বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পেরে বললেন, আপনারা احياء الموات অধ্যায় দেখুন! সেখানে এ বিষয়ের আলোচনা রয়েছে।

শাফায়াত বিষয়ে সাধারণ শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রীধারী এক ইঞ্জিনিয়ার প্রবীণ ব্যক্তি বিভ্রান্তির শিকার হলে তাকে যেন কেউ বুঝাতে পারছিল না। আলেমগণ হাদীসের বর্ণনা শুনালে তিনি তা মানতে রাজী ছিলেন না। তার বক্তব্য ছিল, আমি ৩০ পারা কুরআন শরীফের অনুবাদ পড়ে দেখলাম তাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফায়াত করবেন কথাটি কোথাও নেই। আমি পবিত্র কুরআন শরীফ ছাড়া অন্য কিছু মানব না। অথচ উক্ত ইঞ্জিনিয়ার নিয়মিত নামাজী ছিলেন। তার এক ভাতিজা কামিল পাশ মাওলানা যিনি হুজুরের শাগরিদ ছিলেন, চাচাকে বুঝাতে কৌশলে মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরকে তার বাড়িতে দাওয়াত করলেন এবং চাচার বিভ্রান্তির বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করলেন। নির্দিষ্ট তারিখে হুজুর তার বাড়িতে এলে তিনি চাচাকে হুজুরের সাথে দেখা করার জন্য বললেন। চাচা সবে মাত্র মসজিদে এশার নামাজ আদায় করে এসেছেন। হুজুর কুশল বিনিময়ের সাথে সাথে তাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি এশার নামাজ পড়েছেন? তিনি জবাবে বললেন- জি, এইমাত্র পড়ে আসলাম। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, কত রাকাত পড়েছেন? তিনি বললেন, ফরজ চার রাকাত, সুন্নাত দু'রাকাত ও বিতির তিন রাকাত। হুজুর এবার প্রশ্ন করলেন, এশার ফরজ চার রাকাত হবে- তা কি কুরআন শরীফে আছে? এবার ইঞ্জিনিয়ার ব্যক্তি জবাব দিলেন- জি না, আমি ৩০ পারা কুরআন শরীফ অনুবাদ পড়েছি। কোথাও এশার নামাজের ফরজ কত রাকাত হবে তা পাইনি। এভাবে সুন্নাত ও বিতিরের রাকাত সংখ্যা কুরআন শরীফে নেই। এবার হুজুর তাকে বুঝায়ে বললেন, কুরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা নামাজ পড়ার নির্দেশ করেছেন, কিন্তু সে নামাজ কীভাবে পড়ব তা সবিস্তারে বলেননি। এর ব্যাখ্যা দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল এর উপর অর্পণ করেছেন যা কুরআন শরীফে আছে। আর আল্লাহ তায়ালা যেমন তাঁর আনুগত্য আমাদের উপর ফরজ (আবশ্যক) করেছেন তেমনি তাঁর রাসূলের আনুগত্যও ফরজ করেছেন, তাও কুরআন শরীফে আছে। আর এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস শরীফ মানতে আমরা বাধ্য। হাদীস শরীফ না মানলে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য হল না। এবার হাদীস শরীফ মানার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হুজুর কুরআন শরীফের আয়াত দ্বারা তাকে সামান্য বুঝাতেই তিনি হুজুরের সব কথা মেনে নিয়ে তার ভ্রান্তি বুঝতে পেরে নিজেই অনুতপ্ত হলেন। হুজুরের প্রতি কৃতজ্ঞ হলেন। সঠিক পথে ফিরে এলেন। এভাবে শাফাআত বিষয়ে হুজুর তাকে হাদীস শরীফ থেকে বয়ান শুনালে তিনি সে বিষয়েও সব কথা মেনে নিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! কি চমৎকার হেদায়েত? মহান আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞার দ্বারা কেবল তা সম্ভব।

আমি অধম কর্মজীবনে আমার মরহুম ওয়ালিদ মুহতারামের (শাহ সূফী হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম রহ.) নির্দেশক্রমে হুজুরের সান্নিধ্যে যাই। হুজুরের সাথে আব্বার পরম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় হুজুর আমাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। ইলমী জটিল যে কোন বিষয়ের সমাধানে প্রায়শ হুজুরের দ্বারস্থ হতাম এবং অকপটে প্রশ্ন করে জেনে নিতাম।

হাদীসের দারস দানে হুজুরের মূল্যবান বহু দিক নির্দেশনা ও সুপরামর্শ আমার জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। হুজুরের নিকট থেকে সহীহ বুখারী শরীফের বেশ কয়েকটি খুসূসী দারস গ্রহণ করে ইজাযত ও সনদ লাভে সমর্থ হই। হুজুরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত উক্ত দারসসমূহে অনেক মুহাদ্দিস ও মুদাররিস যোগদান করতেন। দারসের তাক্বরির ছিল অতি সারগর্ভ ও উঁচু মানের যা নবীন কারো পক্ষে উপলব্ধি করা দুরূহ ছিল। হুজুর মুসালসাল কয়েকখানা হাদীসের সনদ প্রদান করেও আমাকে ধন্য করেছেন।

আমি রতনগঞ্জ বাজার জামে মসজিদে থাকাবস্থায় মাসিক তাফসীর মাহফিলে হুজুর নিয়মিত তাশরীফ আনতেন। তখন কয়েকটি তাফসীর পূর্ণাঙ্গ শুনার সুযোগ হয়েছে। হুজুরের তাফসীর মাহফিলের বয়ান ছিল অতুলনীয় জ্ঞানসমৃদ্ধ, যা থেকে নিজে অভাবনীয় উপকৃত হয়েছি।

মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক খেদমতের পাশাপাশি মাহফিল-মজলিসে ওয়াজ- নসিহত, তাফসীর মাহফিল ও দারসে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করে জীবনব্যাপী খেদমত করে গেছেন। ধর্মীয় নানা বিষয়ে বেশ কয়েকখানা অমূল্য কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তাঁর হাতে গড়া অনেক বিদগ্ধ আলেম-উলামা উত্তরসূরী হিসেবে রেখে গেছেন। তাঁর সংগৃহীত কিতাবের ভাণ্ডার জ্ঞান পিপাসু আলেম-উলামার তৃষ্ণা নিবারণ ও ধর্মীয় গবেষকদের গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নিঃসন্দেহে। তাঁর রেখে যাওয়া এসব খেদমত কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্য সাদাক্বায়ে জারীয়াহ হিসেবে অব্যাহত থাকবে। তাঁর শাগরিদ ও নেক উত্তরসূরীগণের ইয়াদগারীও তাঁর দরজা বুলন্দি অব্যাহত রাখবে। এমন সুযোগ্য আরেক আদর্শ মনীষী আদৌ আমরা পাব কি না জানি না, তবে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ আমাদেরকে অনাগত দিনগুলোতে সঠিক পথের দিশা দেবে। তাঁর প্রবাহিত জ্ঞানের প্রশ্রবন থেকে জ্ঞান পিপাসুরা সুধা আহরণ করতে থাকবে কাল থেকে কালান্তরে।

লেখক: ইমাম ও খতীব, আল ইসলাহ জামে মসজিদ, মিশিগান- আমেরিকা; সাবেক মুহাদ্দিস, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদ্‌রাসা, সিলেট।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে তাঁর অবদান

(১৯৩৪-২০২২)

ড. মাওলানা মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজ

ভারত উপমহাদেশে প্রথম শ্রেণির হাদীস বিশারদ হিসেবে যে মহান ব্যক্তিবর্গের নাম গণনা করা হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান।[১] কুরআন, হাদীস, আকাইদ ও ফিকহ, ইলমে কিরাআত সহ ইসলামী শরীয়াহ এর মৌলিক বিষয়ের পাশাপাশি রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজকল্যাণ, প্রশাসন, আইন ও বিচারসহ যাবতীয় জাগতিক মানবিক বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী। মূলত: শিক্ষার বহুমুখী শাখায় এ বিচরণই তাঁকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে অধিষ্ঠিত করেছে।[২] বিশেষ করে ইখতেলাফী মাছাইলে বিভিন্ন মাযহাবের সমন্বয় সাধনে তার তুলনা তিনি নিজেই।[৩] আধ্যাত্মিক জগতেরও তিনি একজন রাহবার। কুরআনের তাফসিরে, হাদীসের তাদরিসে যিনি কাটাচ্ছেন পুরোটা জীবন। ইলমুল ওহীর জ্ঞান অর্জন ও তা হাজারো মুসলিম মানসে প্রতিস্থাপিত করার কাজে তিনি সত্যিই এক প্রশংসনীয় মুবালীগে দ্বীন। আলাহ রাব্বুল আলামীনের রঙে নিজের জীবনকে রঙিন করে তোলার প্রয়াস যে ক'জন উচুস্তরের বুযুর্গ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান তাঁদেরই একজন। রাহে লিলায় আপনাকে নিবেদিত করার মাধ্যমে একামতে দ্বীনের সুমহান দায়িত্বে এ পর্যন্ত রয়েছেন সচল ও কর্মতৎপর।

জন্ম

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ১৯৩৪ সালের ৩রা মার্চ সিলেটের জকিগন্জ উপজেলার রারাই গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাওলানা মমতাজ আলী (র.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম ও পরহেজগার লোক।[৪] ফিকহ, আকাঈদ ও ফরাইজ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন পারদর্শী। এতদঞ্চলের

১ মুহাম্মদ আব্দুন নূর সম্পাদিত, আহবাব স্মারক, মুহাম্মদ আব্দুন নূর, শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান ছাহেব: সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য, (সিলেট : ৩১ জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৯৭।

২ মাও: শায়খ তাজুল ইসলাম, চলমান জালালাবাদ: ইসলামী রেনেসাঁয় অনন্য যাঁরা, (সিলেট : প্রতিজ্ঞা সাহিত্য ফোরাম, অক্টোবর ২০০৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১

৩ মুহাম্মদ আব্দুন নূর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. -৯৭

৪ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের কথা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৯০।

ফরাইজ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার তিনিই সমাধান প্রদান করতেন।[৫] এছাড়া তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী এবং এলাকার গরীব দুঃখীদের আশ্রয়স্থল বিশেষ করে মেহমান নোয়াজ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মাতা আমিনা খাতুন একজন ধার্মিক, পর্দানশীল, বিদুষী ও গুণবতী মহিলা হিসাবে এলাকায় ছিলেন খ্যাত।[৬] সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়।[৭]

শিক্ষাজীবন

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছোট বেলায় পিতা মাওলানা মমতাজ আলী (র.) এর নিকট বুনিয়াদী শিক্ষা শুরু করেন।[৮] এলাকার প্রাইমারী স্কুলে কিছুদিন লেখাপড়া করেন।[৯] বাল্য বয়সেই বড়ভাই মাওলানা নজিবুর রহমানের সাথে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে বদরপুর (ভারত) চলে যান। বদরপুর সিনিয়র মাদ্‌রাসা হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। তারপর সড়কের বাজার আহমদিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করেন। এ সময় মেধাবী, সৎচরিত্রবান ও শিক্ষকদের প্রতি বিনীয় হিসেবে ছাত্র-শিক্ষক সবার একান্ত স্নেহভাজনে পরিণত হন। বিশেষ করে বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতের জন্য তাঁকেই আহ্বান করা হতো।[১০]

অষ্টম শ্রেণির জেলাভিত্তিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন।

অতঃপর গাছবাড়ী জামেউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। উল্লেখ্য ইতোপূর্বে কেউ গাছবাড়ী জামেউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় মেধাবৃত্তি লাভ করেননি। একই মাদ্‌রাসা হতে ১৯৫৭ সালে ফাযিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তলিকায় তৃতীয় স্থান এবং ১৯৫৯ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করেন।[১১] প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পর দেশ-বিদেশের বিজ্ঞ মুহাক্কিক মুহাদ্দিসগণের নিকট

---

৫ মাওঃ শায়খ তাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

৬ মুহাম্মদ আব্দুন নূর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. -৯৭।

৭ মো: আবদুল আউয়াল হেলাল ও অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হেকিম সম্পাদিত, জকিগন্‌জ মনীষা, (সিলেট: জকিগন্‌জ লেখক পরিষদ, ২৯ ডিসেম্বর ২০১২), পৃ. ৭০।

৮ মুহাম্মদ আব্দুন নূর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৯ মো: আবদুল আউয়াল হেলাল ও অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হেকিম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

১০ মাওঃ শায়খ তাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

১১ মাওঃ শায়খ তাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

থেকে ইলমে হাদীস অধ্যয়ন করে হাদীস শরীফের সনদ লাভ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- শামসুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.) সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা সাবেক অধ্যক্ষ বাহরুল উলুম আল্লামা মুহাম্মদ হোসেন সিলেটী, ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসার হেড মাওলানা শায়খুল হাদীস আল্লামা সৈয়দ আমিমুল ইহসান (র.), সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ সিলেটী (র.), মক্কা মুকাররামার হরম শরীফের সাবেক খতিব বহু গ্রন্থ প্রণেতা মধ্যপ্রাচ্য আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমাম ড. শায়খ সৈয়দ মুহাম্মদ আলাভী মালিকী মক্কী (র.), পাকিস্তানের ড. তাহির আল কাদরী, সিরিয়ার বিশিষ্ট বুযুর্গ শায়খ আসআদ সাগিরজী বিন মুহাম্মদ সাঈদ হানাফী দামেশকী প্রমুখ।[১২] সড়কের বাজার আহমদিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে তিনি সেখানকার কারী তজম্মুল আলী সাহেবের নিকট বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা করেন।[১৩] পরবর্তীতে মক্কা শরীফের বিশ্ব বরেণ্য কারী শায়খুল কুররা আহমদ হেজাজী মক্কী (র.)-এর সুযোগ্য উত্তরসূরী রইসুল কুররা ওয়াল মুফাসসিরীন শামছুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)-এর নিকট অধ্যয়ন করে ইলমে কিরাতের চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন।[১৪]

আধ্যাত্মিক জীবন

তাযকিয়া ও ইহসানের পথেও তিনি একজন সাধক পুরুষ। ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে যামান শামসুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.) এর হাতে বায়আত হয়ে তরীকতের খেলাফত লাভ করেন। ইলমে হাদীসের পাশাপাশি তিনি তরিকতের ও খিদমত আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কিতাবুলাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহর পূর্ণ অনুসরণের পাশাপাশি এপথে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।[১৫]

পারিবারিক জীবন

ব্যক্তিগত জীবনে আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ১৯৬০ সালে বিয়ানীবাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব শফিকুল হক সাহেবের কন্যা আনোয়ারা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আনোয়ারা খাতুন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন না করলেও গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে কুরআন ও হাদিসের অধ্যয়ন করেন। তিনি আট সন্তানের জনক। তারা হলেন-

---

১২ মুহাম্মদ আব্দুন নূর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

১৩ মাও: শায়খ তাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

১৪ মুহাম্মদ আব্দুন নূর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল, ইংল্যান্ডের মাদ্‌রাসায়ে দারুল হাদীস লতিফিয়ায় অধ্যাপনা করছেন। মাওলানা আব্দুর রব বিলাল, তিনি বর্তমানে ইংল্যান্ডের এক মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা করছেন, মাওলানা আব্দুল বাতিন ফয়ছল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। মাওলানা আব্দুল বাকী খালেদ। ছোট ছেলে আব্দুল লতিফ শাহেদ বাল্যকালে ইন্তেকাল করেন।[১৬] তিন মেয়ে যথাক্রমে রোকেয়া খাতুন, ছালমা খাতুন, ও শায়মা খাতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার জীবন অতিবাহিত করছেন।

রাজনৈতিক জীবন

অধ্যাপনা সমাজসেবা ও হাদীসে নববীর খেদমতের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান লক্ষণীয়।[১৭] ছাত্র জীবনে তিনি নেজামে ইসলামী পার্টির ছাত্র সংগঠন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া'র সাথে সম্পৃক্ত হন এবং বিভিন্ন সময় এ সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খাঁন শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ধর্মীয় শিক্ষাকে অবজ্ঞা এবং মাদ্‌রাসা শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্ধ বন্ধের সুপারিশ করা হলো তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। ছাত্র জনতার আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নেজামে ইসলাম পার্টির মনোনয়নে তিনি তখনকার সিলেট-৭ আসনে (জকিগন্‌জ, বিয়ানীবাজার, কানাইঘাট) এম.এন.এ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সম্মানজনক ভোট পান। ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ সমর্থিত বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সিলেট-৫ আসনে (জকিগন্‌জ-কানাইঘাট) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[১৮] দেশ, জাতি ও ইসলামের স্বার্থে সবকটি জাতীয় ও স্থানীয় আন্দোলনে তাঁর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।[১৯] বিশেষত: নাস্তিক, মুরতাদ বিরোধী আন্দোলনে তথা তাসলিমা নাসরিন, দাউদ হায়দার, সর্দার আলা উদ্দিন, আহমদ শরীফ, এনাম সহ আলাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।[২০] তিনি ১৯৯২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সুন্নিয়তের পতাকাবাহী সংগঠন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ এর কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল-ইসলাহ এর স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

---

১৬ মাওলানা শায়খ তাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

১৭ মুহাম্মদ আব্দুন নূর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

১৮ মাও: শায়খ তাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

১৯ মুহাম্মদ আব্দুন নূর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

২০ মাও: শায়খ তাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

শিক্ষকতা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সতেরটি গ্রন্থ রচনা করেন।[২১] তাছাড়া তাঁর লিখিত প্রবন্ধসমূহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে।[২২] ১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় সিলেট শহর থেকে নিয়মিত 'মাসিক শাহজালাল' নামক সাহিত্য ও গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে- (১) আল কাউলুল মাকবুল ফী মীলাদির রাসূল (উর্দ্দু ভাষায় রচিত তা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। ১৯৯৮ সালে এ কিতাব খানার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। (২) দোয়ায়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফযীলত। ১৯৯৬ সালে বাংলা ভাষায় এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০১২ সালে আগস্ট মাসে লন্ডন থেকে এ বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেন: মাওলানা ইউসুফ আহমদ। (৩) মাসআলায়ে উশর: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ। প্রথম প্রকাশকাল: জুন ২০০৬ সাল (৪) দুরূদ শরীফের ফযীলত ও ওযীফা (প্রথম প্রকাশকাল: ১৯৯৯ সাল, (৫) যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা (ফযীলত ও নিয়ম)। প্রথম প্রকাশকাল: মে ১৯৯৯ সাল (৬) আসহাবে বদর। প্রথম প্রকাশকাল: মে ১৯৯৮ সাল। (৭) ওযীফা। এ ওযীফাখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১ মে ১৯৯৮। (৮) হাদিয়াতুল লাবীব ফী নাবযাতিন মিন সীরাতিন নাবিয়্যিল হাবীব। আরবী ভাষায় রচিত এ কিতাব খানা ২০১২ সালের জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০১২ সালের আগস্ট মাসে 'সীরাতে হাবীবে খোদা" নামে এ কিতাব খানার বাংলা তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল। (৯) যাখীরাতুল আহাদিসিল আরবাঈন ফি ফাদিয়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন। এ কিতাবখানা জানুয়ারি ২০১১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। (১০) কানযুল আরবাঈন ফী মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যিল আমীন। এ গ্রন্থটি জানুয়ারী ২০১১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। (১১) তুহফাতুল লাবীব ফি আসানীদিল হাবিব। আরবী ভাষায় এ গ্রন্থটি ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। (১২) আত-তুহফাতুল লাতীফাহ ফি আহাদিসিল মুসালসালাতিন মুনীফাহ। আরবী ভাষায় রচিত এ কিতাব খানা অক্টোবর ২০০৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। (১৩) হজ্জ ও যিয়ারত (সংক্ষিপ্ত আহকাম ও নিয়ম)। বাংলা ভাষায় রচিত এ কিতাবখানা ২০০৩ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। (১৪) দালাইলুল খাইরাত। ইমাম আবু আব্দুলাহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর আল জাযুলী আল হুসাইনী (র.) কর্তৃক আরবী ভাষায় প্রণীত দুরূদ শরীফের এ ওযীফা খানাকে তিনি স্বীয় মুরশিদ হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.) নির্দেশিত পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করেছেন। ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে এ কিতাবখানা প্রকাশিত হয়। (১৫) আল

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

২২ মুহাম্মদ আব্দুন নূর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ.১০২।

হিযবুল আযম। ইমাম মোলা আলী কারী (র.) প্রণীত এ কিতাব তাহকীক করেছেন তিনি। ২০১৬ সালে কিতাবখানা প্রকাশিত হয়। (১৬) দারসে হাদীস। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছে দারসে হাদীস সিরিজের প্রথম গ্রন্থ। (১৭) সালাতুত তারাবীহ। ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[২৩]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে অবদান

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান বৃহত্তর সিলেট তথা বাংলাদেশ ও বহি:র্বিশ্বে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে তিন ধারায় অবদান রেখে চলেছেন। প্রথমত: অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরে ইলমে হাদীস ও কুরআনুল কারিমের খিদমত আঞ্জাম দেয়ার মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত: মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তৃতীয়ত: দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে।

প্রথমত: তিনি অর্ধশতাব্দীরও অধিকাকাল ব্যাপি মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারিম ও ইলমে হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত থেকে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখে যাচ্ছেন। তিনি ১৯৫৯ সালের ৩ আগস্ট ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় (প্রতিষ্ঠা সন-১৯৪৭) সহকারী মাওলানা পদে যোগদান করে ১৯৬৩ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৩ সালের ১০ এপ্রিল সিলেটের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফুলবাড়ি আজিরিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসায় সহকারী মাওলানা পদে যোগদান এবং ২২ নভেম্বর ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত দক্ষতার সাথে অধ্যাপনা চালিয়ে যান। স্বীয় মুরশিদ আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)-এর নির্দেশে ১৯৬৩ সালের ২৩ নভেম্বর সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায় (প্রতিষ্ঠা সন-১৯৪৮) প্রধান মুহাদ্দিস হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ইলমে হাদীসের খিদমাত আনজাম দেন। ১৯৭৪ সালের ১৫ জানুয়ারি ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৭৬ সালে সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসা পরিচালনায় সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যা নিরসন কল্পে স্থানীয় প্রশাসন ও এলাকাবাসীর অনুরোধে সে বছর ১১ সেপ্টেম্বর তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যে মাদ্‌রাসা স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে এলে ১৯৭৭ সালের ২ এপ্রিল সেখান থেকে চলে আসেন। ১৯৮২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর আবারও তিনি ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষ ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর নিয়মতান্ত্রিকভাবে অবসর গ্রহণ করেন।[২৪] ১৯৭৭ সালে তিনি সংযুক্ত আবর আমিরাতে গমন করেন। প্রথমে উম্মুল

২৩ মো: আবদুল আউয়াল হেলাল ও অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হেকিম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১।

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

কুওয়াইন শহরে একটি মসজিদে ইমাম ও খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অল্পদিনের মধ্যে প্রতিযোগিতামূল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সে দেশের বিচার বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি উম্মুল কুওয়াইন কোর্টে বিচারক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পাশাপাশি পূর্বোলিখিত মসজিদে খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, আরব আমিরাতের কর্মজীবনে সরকারী ছুটির দিন তিনি মরুচারী বেদুইনদের অবৈতনিক শিক্ষা দান করতেন।

বিশেষ করে বয়স্ক বেদুইনদের কুরআন শরীফ সহিহ-শুদ্ধ তেলাওয়াত শিখাতেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিলে তিলে ইছামতি মাদ্‌রাসা পূর্ব সিলেটের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় মাদ্‌রাসার অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়। মাদ্‌রাসার বিল্ডিং এবং সুবিশাল মসজিদ তার নীরব সাধনার স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমানে তিনি ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।[২৫] চাকুরী থেকে অবসর গ্রহনের পরও বর্তমান পর্যন্ত সপ্তাহে তিনদিন ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় নিয়মিত বুখারী শরীফের দারস দিয়ে থাকেন।[২৬] তাছাড়া তিনি দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের অধিনে প্রধান কেন্দ্র ফুলতলী, হযরত শাহজালাল দারুস সুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা কেন্দ্র, সোবহানীঘাট, সিলেট, ইছামতি দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসা কেন্দ্রে বিভিন্ন বছর পবিত্র রামাদ্বান মাসে বিশুদ্ধ কুরআন পাঠের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি দারুল কিরাত জোবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র বাবুর বাজার, ইছামতি দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসা কেন্দ্র ও মানিকপুর কেন্দ্রের নাজিম হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। দক্ষিণ সুরমা উপজেলার রাখালগঞ্জ বাজার জামে মসজিদে তিনি দীর্ঘদিন থেকে নিয়মিতভাবে দারসে হাদীস পেশ করছেন। নিজ বাড়িতে অনেক দিন যাবত নিয়মিতভাবে দারসে হাদীস পেশ করছেন, সেখানে সিলেটের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উস্তাযগণ দারস গ্রহণ করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছে 'মাওলানা ফখরুল ইসলাম শিক্ষা ট্রাস্ট' ও প্রত্যক্ষ 'আব্দুস সাত্তার শিক্ষা ট্রাস্ট' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি বইপত্র প্রদান করে ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা করছে।[২৭] তাছাড়া তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের 'বোর্ড কমিটি'র সদস্য এবং সরকার অনুমোদিত মাদ্‌রাসা সমূহের সিলেট বিভাগ ভিত্তিক সংগঠন বাংলাদেশ আনজুমানে মাদারিছে আরাবিয়ার চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[২৮]

২৫ মো: আবদুল আউয়াল হেলাল, শাইখুল হাদীস হবিবুর রহমান: সিলেটের কিংবদন্তি আলেম, https://faleh24.com (২০ আগস্ট ২০১৯ খ্রি.)।

২৬ মুহাম্মদ আব্দুন নূর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ.১০০।

২৭ মাও: শায়খ তাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

২৮ মো: আবদুল আউয়াল হেলাল ও অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হেকিম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় অনেক মাদ্‌রাসা মসজিদ ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তন্মধ্যে লালারগাঁও হাবিবিয়া হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা, ভূরকী হাবিবিয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, রায়সন্তুষ হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা, কেশবপুর হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা, নজিপুর দারুল কুরআন হাবিবিয়া মাদ্‌রাসা, ইছামতি মাদ্‌রাসা মসজিদ, থানা বাজার জামে মসজিদ, আল-হাবীব জামে মসজিদ (রারাই)।[২৯] তাছাড়া ২০০০ সালে থানাবাজার লতিফিয়া ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা সংলগ্ন স্থানে তিনি জমি ক্রয় করে থানাবাজার হাবিবিয়া হিফজুল কুরআন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১১ সালে তিনি হাবিবিয়া হিফজুল কুরআন মাদ্‌রাসার সাথে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন উল্লেখ্য যে, শাইখুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান এর ব্যক্তিগত সংগ্রহে তিন হাজারের অধিক মুল্যবান কিতাবাদি রয়েছে। স্বীয় প্রতিষ্ঠিত আল-হাবিব জামে মসজিদের পাশে বর্তমানে একটি তিন তলা বিল্ডিং নির্মাণ কাজ চলছে।[৩০] যেখানে তাঁর সংগৃহীত কিতাবাদি নিয়ে 'আল-হাবীব গবেষণা গ্রন্থাগার' অচিরেই যাত্রা শুরু করবে ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয়তঃ এ মহান মনীষী অর্ধশতাব্দীরও অধিককালব্যাপী সাধারণ মানুষের কাছে কুরআন হাদীসের শিক্ষা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মাহফিলে বয়ান পেশ করে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখে আসছেন। বিয়ানীবাজার, বড়লেখা, ফেঞ্চুগঞ্জ, রাখালগঞ্জ, জগন্নাথপুর, সিলেট সদরসহ বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত তাফসীর ও দারসে হাদীসের মাহফিল করেন। তাছাড়া সিলেট বিভাগের প্রায় প্রতিটি মাদ্‌রাসার বার্ষিক জলছায় তিনি সভাপতি অথবা প্রধান অতিথি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করে থাকেন। মহান আলাহপাক তাঁকে যেমন মেধা ও জ্ঞান দান করেছেন, তেমনি সেই জ্ঞান বিতরণের জন্য চিত্তকর্ষণ বয়ানের যোগ্যতাও দিয়েছেন। তাঁর বয়ান ও ওয়াজ শুনার জন্য দুর-দুরান্ত থেকে মানুষ চলে আসে। বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী নয়; সরাসরি কুরআন ও হাদীসের আলোকে ওয়াজ করেন। সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো এটা দরদমাখাভাষা ও যুক্তিসহ উপস্থাপন করেন যে, মানুষ সহজেই অভিভূত হয়ে যায়। উনার ওয়াজকে সাধারণ মানুষের জন্য দারসুল কুরআন ও দারসুল হাদীস হিসাবে গন্য করা হয়। উনার আলোচনা অত্যন্ত সাজানো গুছানো ও পরিপাটি। কঠিন থেকে কঠিন বিষয়কে সহজ ও সাবলীল ভাষায় বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে সহজ করে বুঝানোর ক্ষেত্রে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। উনার আলোচনার আরেকটি দিক হলো- সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও বিদআতের বিরুদ্ধে মজবুত দলিল ও যুক্তির উপস্থাপন এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকে শিক্ষনীয় ঘটনা তুলে ধরা।[৩১]

---

২৯ মুহাম্মদ আব্দুন নূর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. -১০১।

৩০ মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল, শাইখুল হাদীস হবিবুর রহমানঃ সিলেটের কিংবদন্তি আলেম, https://faleh24.com (২০ আগস্ট ২০১৯ খ্রি.)।

৩১ মুহাম্মদ আব্দুন নূর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে ও একামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনার্থে আল্লামা হবিবুর রহমান যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সিরিয়া, মরক্কো, ভারত, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বিভিন্ন সময় সফর করেন।[৩২] ১৯৮১ সালে তিনি স্বীয় পীর ও মুর্শিদ হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.) এর সাথে প্রথমবার যুক্তরাজ্য সফর করেন।[৩৩] এ সফরে তিনি গ্রেট বৃটেনের উল্লেখযোগ্য প্রতিটি শহরে বিভিন্ন মহফিলের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ইসলামী শিক্ষার আলো বিতরণের মহান দায়িত্ব পালন করছেন।

ব্রিটেনে অবস্থানর তাঁর ছাত্রগণের অনুরোধে ২০০৯ সালে তিনি একাধারে প্রায় নয়মাস সে দেশে অবস্থান করেন। সে সময় প্রতি শনিবার লন্ডনস্থ দারুল হাদীস লতিফিয়া শামায়েলে তিরমিযী নামক বিখ্যাত হাদিসের কিতাব সম্পূর্ণ দারস পেশ করেন। নিয়মিত সে দরসে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর থেকে প্রচুর সংখ্যক উলামা এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করতেন। দারস পূর্ণ হলে দুই শতাধিক আলিমকে শামায়েলে তিরমিযীর সনদ প্রদান করা হয়। বর্তমানেও ব্রিটেন সফরকালে বিভিন্ন শহরে (লন্ডন, লুটন, বার্মিংহাম, মানচেস্টার, ওল্ডহাম) রিয়াজুস সালেহীন এবং আদাবুল মুফরাদ নামক হাদিসের কিতাবদ্বয়ের দারস প্রদান করেন। ১৯৯৫ সালে তিনি দাওয়াতী সফরে যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন। তাছাড়া ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি সিরিয়া সফর করেন। সে সময় দামেস্কের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদগণের সাথে ব্যাপকভাবে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- দামেস্কের প্রখ্যাত হানাফী আলিম, আল ফিকহুল হানাফী ওয়া আদিলাতুহু সহ বহু মূল্যবান কিতাব প্রণেতা শায়খ ড. আসআদ মুহাম্মদ সাঈদ সাগিরজি, শায়খ ড. আজ্জাজ আল খতিব, শায়খ হিশাম বুরহানী, শায়খ আব্দুর রহমান হাম্মানী প্রমুখ। ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মরক্কো সফর করেন। ভারতের আসাম প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি বিভিন্ন সময়ে ব্যাপক দাওয়াতী সফর করেন। সেসব সফরে মাহফিলে যোগদান ছাড়াও উলামায়ে কেরামের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে হাদীস শরীফের দারস প্রদান করেন। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি মিশরে দাওয়াতী সফর করেন। সেই সফরে কায়রো শহরে সাহাবি উকবা ইবন আমির (রা.) এর মাজার প্রাঙ্গণে, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মাজার প্রাঙ্গণ এবং ইতিহাস খ্যাত আল-আজহার মসজিদে হাদীস শরিফের দারস প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে তাঁর প্রেরণা ও নির্দেশনায় বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামী সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩৪]

লেখক: অধ্যক্ষ, হলিয়ারপাড়া ফাযিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ

৩২ মো: আবদুল আউয়াল হেলাল, শাইখুল হাদীস হবিবুর রহমান সিলেটের কিংবদন্তী আলেম, https://faleh24.com; 20 August 2019 AD.

৩৩ মো: আবদুল আউয়াল হেলাল ও অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হাকীম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৩৪ মো: আবদুল আউয়াল হেলাল, প্রাগুক্ত।

তিনি ছিলেন ইলমে হাদীসের এক আলোক বর্তিকা

মাওলানা মোঃ নজরুল ইসলাম

আল্লাহ তা'লা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ এবং হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন জীবন্ত কুরআন। তাঁর কথা, কাজ, সমর্থন, দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড উম্মতের জন্য অনুসরনীয়। এই প্রত্যেকটি বিষয় যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয় তাকে বলা হয় হাদীস। এই হাদীস শিক্ষা করা, এর অনুশীলনে সর্বদা মনযোগী হওয়া, নিজের জীবনে হাদীসকে আমলকে বাস্তবায়িত করে শিক্ষা দানের মাধ্যমে যারা অন্যের নিকট হাদীস পৌঁছে দেয়ার অক্লান্ত সাধনায় রত থাকেন তাদেরকে মুহাদ্দিস বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধরাধাম থেকে বিদায়ের পর এ কাজে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন আল্লাহর সে সকল প্রিয় বান্দাহদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই দোয়া করে গেছেন আল্লাহ যেন তাদের চিরসবুজ রাখেন, তাদের জীবন যেন উজ্জ্বল হয়। সেই উজ্জ্বল বান্দাহগণের ত্যাগ এবং পরিশ্রমের মাধ্যমেই যুগ যুগ পেরিয়ে হাদীসে নববীর ভান্ডার আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। সেই নক্ষত্রগুলোর মধ্যে ছিলেন বিগত শতাব্দীর সূর্যতুল্য, বছরখানেক পূর্বে আল্লাহর দরবারে চলে যাওয়া অসংখ্য অগণিত মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফতি ও উলামাদের উস্তায শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ।

اللهم نور مرقده و اكرم نزله و اجعله مع النبين و الصديقين والشهداء والصالحين

হাদীসে নবীর এ খাদিমের সুঘ্রানে বৃহত্তর সিলেট তথা সারা বাংলা মোহিত হয়েছিলো। তাই ছোটকাল থেকেই আমাদের অনেক হুজুর এবং গুণীজনদের নিকট থেকে হুজুরের আলোচনা শুনতাম। মাঝে মধ্যে ওয়াজ মাহফিলে যখন যেতেন দূর থেকে দালিলিক ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা মনভরে শুনতাম। কিন্তু সরাসরি হুজুরের ইলমের ভাণ্ডার থেকে এ অধমের উপকৃত হওয়ার প্রথম সুযোগ ঘটে সৎপুর দারুল হাদীস আলিয়া মাদ্‌রাসায়। আমরা কামিল প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। হঠাৎ একদিন মাদ্‌রাসায় গিয়ে আলোচনা শুনি হুজুর আসবেন। প্রিন্সিপাল হুজুর আল্লামা শফিকুর রহমান সাহেব বলেন হুজুর আসবেন। হামজাপুরের মুহাদ্দিস সাহেব (আল্লামা রইছ উদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হুজুর আসবেন। অন্যান্য হুজুরেরাও বলাবলি করছেন, হুজুর আসবেন। সবার মুখে একই কথা, হুজুর আসবেন। তখন অনুমান করতে পারছিলাম না কে যে আসবেন। ক্লাসে ঢুকে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসলেন আমাদের বুখারীর উস্তায, হাদীস জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা রইছ উদ্দিন হামজাপুরী হুজুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ক্লাসে ঢুকেই মহা খুশীতে উনার ভাষায় "এই বেটাইন সামনের সোমবারে মুহাদ্দিস সাব

হুজুর মাদ্‌রাসাত তশরিফ আনবা, তোমরারে বুখারী শরীফের দারস দিবা। দোয়া কর হজুর ভালা থাকতা আর আইতা, আমরাও বহুত ফায়দামন্দ অইমু।"

হুজুরের কথায় আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেলো কার আগমন ঘটছে। কারণ সিলেট জেলায় অনেক মুহাদ্দিস ছিলেন, সবাই একেক ভাবে পরিচিত ছিলেন। যেমন হামজাপুরী মুহাদ্দিস সাব, শাদরার মুহাদ্দিস সাব, ছাতকের মুহাদ্দিস সাব (আল্লামা আবদুল হাই মাঃ আঃ)। কিন্তু মুতলাকান নাম না নিয়ে মুহাদ্দিস সাব হুজুর বললে যে মহান ব্যক্তিত্বের ছবি সবার মানসপটে ভেসে উঠত তিনি ছিলেন আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। যার কোন জুড়ি নেই।

নির্ধারিত সোমবার আসল, সময়ের পূর্বেই সকল ছাত্র শিক্ষক মাদ্‌রাসায় উপস্থিত, মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর আসছেন। আমারাতো মহাখুশি, আমাদের উস্তাযগণের উস্তায আসছেন, আমাদেরকে হাদীস পড়াবেন। কিন্তু হুজুরগণের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম না আমরা বেশি আনন্দিত নাকি হুজুরেরা। আমি ছাত্র সংসদের ভি.পি হওয়ায় সামান্য বেশি দৌড়া দৌড়ির দায়িত্ব পড়ল। এ সুবাদে হুজুরের সান্নিধ্য সামান্য একটু বেশি পাওয়ারও সৌভাগ্য হল। যথা সময়ে হুজুর তাশরিফ আনলেন, মনে করলাম বিশ্রাম নেবেন, কিছু খেদমত করব। তারপর ক্লাসে যাবেন। না তা হলো না। এসেই সামান্য নাস্তা আর চা খেয়ে পান মুখে দিয়ে বললেন, যে কাজের জন্য এসেছি চলুন ক্লাসে চলে যাই। চিন্তা করলাম কত নিরলস। আর এ ধরনের আল্লাহর মকবুল বান্দাহদের নিরলস প্রচেষ্টার কারণেই ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুর সারা দুনিয়ায় প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে।

আমাদের সময় কামিল ক্লাসে ৫৩ জনের বিরাট এক জামাত ছিলাম। সেদিন সবাই উপস্থিত ছিলেন কিনা মনে নেই। তবে শ্রেণি কক্ষ ছাত্রদের দ্বারা পরিপূর্ণ। হুজুরের পেছনে অন্যান্য হুজুরগণও বসা। হুজুর সহীহ বুখারী দারস দিচ্ছেন। সে এক অসাধারণ পাঠদান। হাদীসের পরিচিতি, এর খুটিনাটি বিষয়, সাথে উসুলে হাদীস, বিভিন্ন শব্দের শাব্দিক, ইসতেলাহী এবং শরয়ী ব্যাখ্যা, নাহু সরফ সর্বোপরী হাদীসের যথাযত শরাহ সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধের মত রেখে ছিল। মাঝে মধ্যে হজুরদের প্রতি তাকাতাম, মনে হতো তারাও যেন অবোধ বালকের মত বসে আছেন, আর কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন। পাঠদানের এক পর্যায়ে হুজুর সব কিছুর ইতি টানছেন এবং বাস্তব জীবনে হাদীসের প্রয়োগ এর উপর বক্তব্য রাখছেন।

মনে মনে অনেক চিন্তা করলাম, এতো ইলম একজন মানুষের নিকট কীভাবে এসে একত্রিত হল? তখন মনে হল, আমাদের উস্তাযগণ যখন হুজুরের কথা আলোচনা করতেন তখন বলতেন হুজুরকে আল্লাহ ইলমে লাদুনী দান করেছেন। চিন্তায় পড়ে গেলাম এটি কি লাদুনী? যদি যদি লাদুনী হয় তাহলে ইলমটা কী এবং কীভাবে অর্জন

করা যায়, হুজুরকে জিজ্ঞাস করার মত যথেষ্ট সাহসও হচ্ছিল না। আলোচনা কালেই হঠাৎ তিনি ইলমের প্রকারভেদে চলে গেলেন। আমার বুঝে আসলনা এটা পাঠদানের ধারাবাহিকতা, নাকি হুজুরের আধ্যাত্মিকতা। হঠাৎ বলে উঠলেন, আপনারা কি জানেন ইলমে লাদুনী কী, এবং এটা কীভাবে অর্জিত হয়? আমাদের কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিজ থেকে বলে উঠলেন-

من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم

অর্থাৎ, যে তার অর্জিত ইলম অনুসারে আমল করবে তাকে আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে এমন ইলম দান করবেন যা সে জানতনা। এটাই হলো ইলমে লাদুনী।

হাদীসের প্রচার এবং প্রসারের সর্বাত্মক সাধনা হুজুরের মধ্যে আজীবন লক্ষ্য করা যায়। লন্ডন আসার পর দেখেছি প্রায়ই হুজুর সফরে আসতেন তখন ইলমে দ্বীন এবং হাদীসের প্রসারেই সফরের সময়টুকু ব্যয় করতেন। বিশেষ করে হুজুর মাদ্‌রাসা থেকে যখন অবসর গ্রহণ করলেন তখন ব্রিটেনে এসে একটু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন, দেখেছি নিয়মিত রিয়াদুস সালেহীন ও শামাঈলে তিরমিযীর দারসসহ বিভিন্ন যায়গায় হাদীসের দারস নিয়ে মশগুল থাকতেন। আমরা যখন মাঝে মধ্যে গিয়ে নিকটে বসতাম তখন হাদীস এবং ইলমের বিভিন্ন বিষয় নিয়েই বেশিরভাগ আলোচনা করতেন। বলতেন, আমাদের সকলেরই সর্বদা উচিৎ আল্লাহর রাসুলের হাদীসগুলো চর্চার মধ্যেমে মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। উপদেশ ছলে বলতেন, আমরাতো প্রায়ই বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন নিয়ে বসি, গল্প গোজব করি। এই গল্প গোজবের মধ্যখানে যদি এক দুইটা হাদীস আলোচনা করি তাহলেও তো হাদীসের বহু খিদমাত হয়। এটা কত গভীর চিন্তা ভাবনার বিষয়। শেষ জীবনের অসুস্থতাও তাঁকে হাদীসের খিদমাত থেকে নিবৃত করতে পারেনি। কিতাব রচনা করেছেন, ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা সুস্থ হলেই হাদীসের দারস দিতেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সলফে সালীনের এক উত্তম নমুনা ছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদালত ঠিক রাখতেন। আমরা জানি বিগত দিন গুলোতে সহীহ হাদীস শব্দ ব্যবহার করে আমাদের কিছু ভাই বন্ধু সমাজকে অনেক ফিৎনা উপহার দিয়েছেন। পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম, এমনকি মাযহাবের ইমামগণ সম্পর্কেও কটুবাক্য ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেননি। অথচ উলামায়ে কিরাম জানেন, সহীহ, হাসান, জঈফ, হাদীসের কোন বিষয় নয় বরং তা হচ্ছে হাদীসের সনদের গুণগত মান। সহীহ সনদে অনেক বর্ণনা রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন কারণে আমল যোগ্য নয়। ফুকাহা এবং শারেহীন এগুলোকে ব্যাখ্যা করে যথার্থ ব্যবহার করেছেন। লেখার কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এবং পাঠকের মন যাতে বহুদুর চলে নায় না যায় সেজন্য ইবাদত এবং মাসয়ালার দিকে না গিয়ে দুটি উদাহরণপেশ করছি। যেমন -

সহীহ মসুলিম শরীফে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু

ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পানি পান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি বলেছেন, যদি কেউ দাঁড়িয়ে পান করে সে যেন বমি করে ফেলে দেয়। অন্য দিকে বুখারী শরীফের বর্ণনায় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট পানি আনা হলে তিনি দাঁড়িয়ে পান করলেন এবং বললেন, কিছু লোক দাঁড়িয়ে পান করা অপছন্দ করেন। অথচ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামকে এভাবে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখেছি। শারেহীনে হাদীস (হাদীস ব্যাখ্যা কারীগণ) এগুলোকে যথাস্থানে ব্যবহার করে বলেছেন, বসে পান করা সুন্নাত এবং প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয।

সহীহ সনদে অনেক বর্ণনা এসেছে কিন্তু বিষয়টি শুদ্ধ নয়। এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরাম এটাকে ভুল না বলে বলেছেন বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

উদাহরণত বুখারী শরীফের একটি হাদীসে আনাস রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেন, কেয়ামতের দিন অধিক সংখ্যক শহীদ হিসেবে আনসারগণ যে মর্যাদা লাভ করবেন আরবের অন্য কোন কবিলা এ রকম মর্যাদা পাবেন না। কেননা তাদের মধ্য থেকে উহুদের যুদ্ধে ৭০ জন, বি'রে মাউনায় ৭০ জন এবং ইমামার যুদ্ধে ৭০ জন শহীদ হয়েছেন। অথচ বাস্তবতা হল উহুদ যুদ্ধে শহীদ সবাই আনসারী ছিলেন না। কেননা হযরত হামজা এবং মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু সহ অনেক মুহাজির সাহাবী উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

এ ধরণের একটি হাদীসের ব্যাখ্যা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে জিজ্ঞাস করেছিলাম। সহীহ বুখারীর যে হাদীসটির সহজ অর্থ হলো, ইসলামের প্রথম বৃহৎ ফিতনা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাতলের সময় বদরী সাহাবীগণ জীবীত ছিলেন না। হুজুরকে বললাম, এই বর্ণনার সনদ তো সহীহ কিন্তু বাস্তবতা হল উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাহাদতের সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ অনেক বদরী সাহাবী জীবিত ছিলেন। হুজুর আমাকে বললেন, আমি অনেক দিন যাবৎ কিতাব থেকে দূরে। আপনি কষ্ট করে ফাতহুল বারী দেখে নিলে সমাধান পেয়ে যাবেন। আমরা জানি হুজুর ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পর থেকেই বুখারী শরীফের দারস দিয়ে আসছেন। দীর্ঘ এ জীবনে কত বার এ হাদীস পাঠদান করেছেন, শরাহ করেছেন। ফাতহুল বারীতে এর সমাধান আছে তাও জানেন। কিন্তু অবসর জীবনে পাঠদানে সামান্য বিরতি হওয়ার কারনে জানা বিষয়টিও বিনা দ্বিধায় বলেননি। এটা হচ্ছে সালফে সালেহীনের রীতি। হাদীস বেত্তাগণ হাদীসের ব্যাপারে এধরণের সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

ইলমের এই বিরাট ভাণ্ডার আজ জমিনের নীচে। আমরা দোয়া করি, তিনি ইলমের নূর দিয়ে যেভাবে দুনিয়াকে আলোকিত করে গেছেন, আল্লাহ তা'লা হুজুরের কবরকেও যেন রওজা পাকের সাথে মিলিয়ে সর্বদা আলেকিত রাখেন।

লেখক: প্রেসিডেন্ট, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে; মুহাদ্দিস, দারুল হাদীস লতিফিয়া, লন্ডন; ইমাম ও খতীব, ব্রিকলেন জামে মসজিদ।

হাদীসে নববীর এক উজ্জল নক্ষত্র

মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান

উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলিফা, বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর সাবেক মুহতারাম সভাপতি শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস জগতের এক উজ্জল নক্ষত্র, তরীকত ও তাসাওউফের বিশ্বস্ত আমানতদার। 'মুহাদ্দিস ছাহেব' নামেই তিনি ছিলেন খ্যাত। সিলেট জেলার জকিগন্জ উপজেলাধিন রারাই গ্রামে ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন প্রতিথযষা এ মহা মনীষী। তাঁর পিতা ছিলেন খ্যাতিমান আলিমে দীন হযরত মাওলানা মুমতায আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

পাখি ডাকা, ছায়া ঘেরা সবুজ শ্যামল বাংলাদেশে এমন কতক মহামনীষীর জন্ম হয়েছে যাদের কৃতিত্বপূর্ণ জীবন-কর্ম ও অবদানের কাছে গোটা দেশ ও দেশের মানুষ ঋণী হয়ে আছে। তাদের অনন্য হলেন কালজয়ী মহা-পুরুষ আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। যার অবদান শুধু বাংলাদেশে নয় বরং এর গণ্ডি পেরিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, আরব তথা বিশ্বব্যপী।

প্রখর মেধাবী, শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও মহানুভব, বহু প্রতিষ্ঠানের আদর্শ শিক্ষক, বৈচিত্রময় কর্মজীবনের অধিকারী,জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃত বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব, উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কৃতিত্বের সাথে ইসলামি শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে জকিগন্জ উপজেলাধীন দারুল উলুম ইছামতি আলিয়া মাদ্রাসার সহকারী মাওলানা হিসেবে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের সূচনা করে ১৯৬৩ সালের দশ এপ্রিল সিলেটের প্রাচীনতম ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদ্রাসায় স্থানান্তরিত হন।

ইলমে হাদীসের প্রয়োজনীতা ও গুরুত্বের কথা অনুধাবন করেই এ মহা মনীষী স্বীয় পীর ও মুরশিদ হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশে ১৯৬৩ সালের তেইশ নভেম্বর দেশের বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বনাথ উপজেলাধীন সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে হাদীস অধ্যাপনা শুরু করে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সুদীর্ঘ এগারো বছর সেখানে হাদীসে নববীর দারস প্রদান করেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯৭৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত জকিগন্জ উপজেলাধিন ইছামতি আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি হাদীস শরীফের অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে তিনি সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্রাসায় আবার ফিরে আসেন এবং হাদীস অধ্যাপনার পাশাপাশি

১৯৭৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। এ বছরের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে গমন করে উম্মুল কুওয়াইন শহরে একটি মসজিদে ইমাম ও খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ ১৯৮২ সালে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত উম্মুল কুওয়াইন কোর্টে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশে ফিরে আসার পর ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ইছামতি আলিয়া মাদ্‌রাসায় হাদীস অধ্যাপনার পাশাপাশি সুদক্ষ অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সুদীর্ঘ বর্ণাঢ্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকতা হতে নিয়মিত অবসর গ্রহণ করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের বাইরেও বিভিন্ন সময় তিনি আলিম উলামকে হাদীসের দারস প্রদান করতেন। বিশেষভাবে যে সকল উলামা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইলমে হাদীসের অধ্যাপনায় জড়িত তাঁদের জন্য নিজ বাড়িতে দারসে হাদীসের আয়োজন করতেন এবং ইলমে হাদীসের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয় ও শরীয়তের দুর্বোদ্ধ মাসআলা মাসাইল বিষয়ে সুস্পষ্ট সমাধান সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করতেন। তাঁদের সাথে ফিকাহর জটিল মাসআলা ও যুগের নতুন সম্যাবলীর সমাধান বিষয়ে মতামত আদান-প্রদান করতেন। বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে শিক্ষকতার সুবাদে ১৯৯৮ ও ৯৯ সালে কিছু দিন এ মহামনীষীর দারসে বসার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমরা সহকর্মী ক'জন ফুলতলী হতে হুজুরের দারসে শরীক হবার জন্য তাঁর বাড়িতে যেথাম, যেমন মাওলানা ছালেহ আহমদ বেতকুনী, বর্তমান ভাইস প্রিন্সিপাল সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসা, মাওলানা আবু নছর মুহাম্মদ কুতবুজ্জামান তাপাদার বর্তমান খতীব, আল ইসলাহ মসজিদ, মিশিগান আমেরিকা প্রমূখ। তাছাড়া ইছামতি আলিয়া মাদাসার মুহাদ্দিস ছাহেবগণসহ বিভিন্ন মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষসহ সিনিয়র শিক্ষকগণ উক্ত দারসে অংশগ্রহণ করতেন। মুহাদ্দিস ছাহেবের সাবলীল ও বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনায় আমরা আশ্চার্যন্বিত ও অনুপ্রাণীত হতাম, তাঁর আপ্যায়নে হতাম আপ্লুত।

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণের মধ্যমে শিক্ষবিদ, বিশিষ্ট জ্ঞানতাপস, শায়খুল হাদীস মুহাদ্দিসছাব হুজুরের হাদীস অধ্যাপনার ধারাবাহিকতা স্তব্ধ হয়নি। এ ধারাবাহিকতা চলে তাঁর জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত। তিনি যেথায় গেছেন, দেশে কিংবা বিদেশে হাদীসের দারস প্রদান অব্যাহত রেখেছেন। ওয়াজ ও দারসের মাধ্যমে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের বাণী মানুষের কাছে। আলিম-উলামা ছাড়াও সাধারণ মুসলমাগণ শরীক হতেন তাঁর দারসে। সকলেই নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী উপকৃত হয়েছেন। তাঁর নিকট হাদীস অধ্যয়নকারী হাজার হাজার সুযোগ্য ছাত্র বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইলমে হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁর ছাত্রদের অনেকেই মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে গেছেন।

অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরে ইলমে হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত এ মনীষী অধ্যাপনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আজীবন কাজ করে গেছেন। তিনি ছিলেন উদার, মহৎ, দুরদর্শী ও সবার কল্যাণকামী। ধর্মীয় জ্ঞানের সুরক্ষায় তিনি সদা জাগ্রত ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা মানুষদের থেকে জোর করে ইলম ছিনিয়ে নেবেন না, বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর যখন কোনো আলিম বাকী থাকবে না তখন লোকেরা জাহিলদেরই নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হবে, তারা না জেনেই ফাতওয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে, আর অপরকেও গোমরাহ করবে।

উপরোক্ত হাদীসে ইলম শব্দ দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহ এবং এ দু'টি সম্পর্কিত জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের অন্তর থেকে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন না। বরং তিনি ইলম উঠিয়ে নেবেন আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই। অর্থাৎ আলিমদের মৃত্যু ও তাঁদের আত্মা উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। যখন কোন আলিমকে আল্লাহ অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন লোকেরা জাহিলদেরকেই নেতা, প্রতিনিধি, বিচারক, মুফতি, ইমাম ও শাইখ হিসেবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তারা না জেনেই ফাতওয়া দেবে ও বিচার কার্য পরিচালনা করবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে, আর অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে। এ হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অচিরেই ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেওয়ার মতো যোগ্য আলিম জমিনে অবশিষ্ট থাকবে না। ফলে উম্মত ক্রমশ অবনতির দিকে যাবে এবং পথভ্রষ্ট হবে।

বর্তমান সময়ে আকাবির বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম একে একে দুনিয়া ছেড়ে পরপারে চলে যাচ্ছেন। তাঁদের উত্তরসুরি উলামায়ে কিরাম জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ না করলে মানুষ অজ্ঞানতার দিকে ধাবিত হবে, এ বিষয়টি ছিল মুহাদ্দিস ছাহেবের নিকট বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। তাই তিনি উলামায়ে কেরামকে সর্বদা অধ্যয়নের তাগিদ দিতেন। তিনি প্রায় সময় বলতেন, শুনে শুনে আপনারা সুন্নিয়তের দাবিদার হবেন না বরং কুরআন সুন্নাহ চর্চা করুন, কিতাব বেশি বেশি করে অধ্যয়ন করুন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা বিশ্বাস টিকিয়ে রাখতে এবং বিশুদ্ধভাবে আমল করতে জ্ঞানচর্চার বিকল্প নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে সঠিক পথের দিশা দেয়া আপনাদের দায়িত্ব।

সহিহ মুসলিম শরীফের মুকাদ্দামায় বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ

রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তুমি এমন কোন হাদীস লোকদের কাছে বলো না যা তাদের বুঝ শক্তির বাইরে, অন্যথায় এটা তাদের কারো কারো জন্য ফিতনার কারণ হবে।

বিংশ শতাব্দির ক্রান্তিলগ্নে শায়খুল হাদীস আল্লামা মুদাদ্দিছ ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যেন এ হাদীসের বাস্তব নমুনা ছিলেন। তিনি মানুষের কাছে তাদের বোধশক্তি বিবেচনায় কথা বলতেন। শরীয়তের জটিল বিষয় যা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা কষ্টকর এমন বিষয় যতটুকু তাদের জন্য প্রয়েজনীয় তা সাবলীল ভাষায় বলে দিতেন। আর উলামায়ে কিরাম, বিশেষভাবে তাঁর ছাত্রদের মধ্য হতে কেউ মাসআলা মাসাইল কিংবা ইলমী কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি সরাসরি উত্তর প্রদান না করে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতেন, যাতে তাঁরা এ বিষয়ে কিতাবাদী চর্চার মাধ্যমে সমাধান আয়ত্ব করার চেষ্টা করেন। সমাধান পেয়েছেন কি না পরবর্তীতে তাদের নিকট জানতে চাইতেন এবং এ বিষয় নিয়ে অলোচনা করতেন, সমাধান না পেয়ে থাকলে সমাধান বলে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের গভীরে পৌঁছার কলা-কৌশল, যুগোপযোগি সমাধান বের করায় পারদর্শী করে তোলার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান করা- দূরদর্শী, জ্ঞানে পরিপক্ষ, ইলমে নববীর উত্তরসূরীদের অন্যতম দায়িত্ব বটে। কেননা পরবর্তীদেরকে অধ্যাবসায়ী, পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে গড়ে উঠার উপরই দ্বীনি শিক্ষার স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব ছিলেন এ যুগে হাদীসে নববীর এক আলোকোজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ক্ষণজন্মা এই মনীষী ছাত্র হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে, মুহাদ্দিস হিসেবে, অধ্যক্ষ হিসেবে, মুবাল্লিগ হিসেবে, বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে, বিচারক হিসেবে প্রখর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা হাদীসে নববীর এ যুগান্তকারী খিদমতসমূহ যেন তাঁর পক্ষ থেকে কবুল করেন। এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে অধিষ্ঠিত করেন।

লেখক: সাবেক মুফাসসির, বাদে দেওরাইল ফুলতলী আলিয়া মাদ্‌রাসা; বর্তমান মুহাদ্দিস, দারুল হাদীস লাতিফিয়া, লন্ডন; বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা

উপাধ্যক্ষ মাওলানা মো. ছালেহ আহমদ (বেতকোণী)

মৃত্যু নামক যে স্বত্তা রয়েছে, তাকে এড়িয়ে চলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। জন্মিলে মরতে হবে এটাই নিয়ম ও অনিবার্য। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন

كل نفس ذاءقة الموت

"প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে।"

জনৈক দার্শনিক ও কবি বলেছেন-

موت كأس كل نفس شارب- بيت قبركل نفس داخل.

অর্থাৎ, মৃত্যুর পেয়ালা প্রত্যেক প্রাণীকে পান করতে হবে। কবরের ঘরে প্রত্যেককেই দাখিল হতে হবে।

তিরমিজী শরীফের ৫৫৯ পৃষ্ঠার ৫নং হাশিয়াতে বলা হয়েছে -

الموت تحفة المؤمن حيث يكون سببا للقاء المولى فى المقام الاعلى

মৃত্যু হলো মুমিনের জন্য একটি উপহার, যেটা মাওলায়ে কারীমের সাথে মাকামে আলাতে সাক্ষাৎ করার মাধ্যম। অর্থাৎ- মৃত্যুর দ্বারাই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে পরকালীন জীবনে, এ মৃত্যু না হলে এ রকম সুযোগ নসীব হতো না।

মহান রাব্বুল আলামীনের এ অমোঘ নিয়মের ধারাবাহিকতায় আমাদের পরম শ্রদ্বেয় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে। তিনি ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে দেশ ও বিদেশের হাজার হাজার ভক্তবৃন্দকে কাঁদিয়ে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। এ মহান ব্যক্তিকে নিয়ে কিছু লেখতে বার বার তাকিদ দেয়া হলে, তাতে অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে। কী করব কী না? তাঁর শান ও মান বজায় রেখে লিখতে পারব কিনা? এ সব চিন্তা ভাবনায় আমার অনেক সময় ব্যয় হয়েছে।

তিনি হাদীস জগতের একটি অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা ছিলেন, তাতে কোনো সন্দহে নেই। এ কথাটি অবিসংবাদিত সত্য। তাঁকে হারিয়ে মুসলিম উম্মাহর বড় ক্ষতি হয়ে গেল এ কথা সবাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। আর আহলে ইলমদের চলে যাওয়াটাই হলো এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্বের বসবাসকারী মানুষের অধঃপতনের দিকে ধাবিত হওয়া। এ বিষয়ে সুনানে দারিমীতে রয়েছে, হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর (রা.) কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন

ما علامة هلاك بنى ادم قال: اذا هلك علماءهم

অর্থ্যৎ, বনী আদম ধ্বংস হওয়ার নিদর্শন কী? তিনি উত্তরে বলেন, আলেমদের মৃত্যুই তাদের ধ্বংসের নিদর্শন।

অন্য হাদীসে রয়েছে,

إِنَّ الْعالِمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ منْ فِي السَّمَواتِ ومنْ فِي الأَرْضِ حتَّى الحِيتان فِي الماءِ رواه الترمذي

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে এবং পানিতে মাছসমূহ সবই হক্বানী আলেমের জন্য মাগফিরাত কামনা করে।" (তিরমিজী)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে - আসমান ও যমীনের সব কিছু ও সমুদ্রের প্রাণীগুলো প্রকৃত আলেমের জন্য মাগফিরাত কামনা করে- এর কারণ হলো, আলেমরা না থাকলে দুনিয়ার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আসমান, যমীনের এবং সমুদ্রের যা কিছু এ সবই ধ্বংস হলে তারাও নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই তারা নিজেদের হেফাজতের জন্য এরকম দোয়া করতে থাকে।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৮২ সালে। এ সময় আমি দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। সিংচাপইড় দাখিল (বর্তমানে আলিম) মাদ্‌রাসায় পড়া শুনা করতাম। সে সময় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর এক ওয়াজে গিয়েছিলেন। মা- বাবার ফজীলত ও মর্যাদা সম্বন্ধে ওয়াজ করতে গিয়ে হযরত জুরাইজ (রা.) এর ঘটনা বলেছিলেন। সে সময় থেকেই হুজুরের প্রতি আমার গভীর ভাব জন্মে যায়। সে সময়ে আমাদের একজন ময়মানসিংহের স্যার ছিলেন। তিনিও আমাদেরকে হুজুরের কথা স্মরণ করিয়ে বিভিন্ন উদাহরণ দিতেন। হুজুরের ওয়াজের প্রভাব এতো শক্তিশালী ছিল যে, এখন পর্যন্ত পূর্বের কথাগুলো হৃদয় কন্দরে দাগ কাটে। একটি হাদীসের কথা বার বার মনে পড়ে যদিও সে সময় এ হাদীসের মমার্থ এ রকম অনুধাবন করতে পারিনি। আর তা হলো -

ان من البيان لسحرا

"নিশ্চয়ই কিছু কিছু বয়ানের মধ্যে যাদু রয়েছে"।

হুজুরের বয়ানের প্রভাবে এ হাদীসের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি।

পরবর্তীতে কর্ম জীবনে এসে হুজুরের সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ কিছুটা বেড়ে যায়। যেহেতু আমি চাকুরী জীবনের প্রথমেই মুহাদ্দিস পদে ফুলতলী কামিল মাদ্‌রাসায় নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে এম.পি.ও ভুক্ত হই। এ সুযোগে মাঝে মধ্যে হুজুরের সাথে বিভিন্ন দারসে সাক্ষাৎ করতাম। হুজুর বিভিন্ন বিষয়ে দারস দিতেন। বিশেষ করে বরযানজী শরীফের দারস,

তায়ালুদ শরীফের দারস ইত্যাদি। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, বরযানজী শরীফ ও তায়ালুদ শরীফের দারস আবার কী? মূলত এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্যই তিনি এ দারস সম্পন্ন করতেন। মীলাদ শরীফ পড়তে বা পড়াতে গিয়ে অনেক সময় এগুলো পড়তে হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে প্রায় ৭০% পাঠকারী ইহাতে ভুল করেন। হরকাত ও শব্দের উচ্চারণ ভুল হলে অর্থের মধ্যেও যে ভুল হয় তা দেখানোর জন্য এ রকম দারসের ব্যবস্থা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, আমি সে সময় ইছামতি ডিগ্রি কলেজেও খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে ক্লাস নিতাম। কলেজটি যেহেতু ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসার নিকটে অবস্থিত, সেহেতু কলেজে যাওয়া আসার সুবাদে হুজুরকে বার বার দেখার সুযোগ হত। একদিন ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসা মসজিদে এক অনুষ্ঠানে প্রায় সকল শিক্ষককে কিছু কথা বলতে হয়েছিল। সবাই প্রায় একই বিষয় একই কথা বললেন। আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ও প্রায় একই কথা বললেন। কিন্তু এ সকল কথার মধ্যে হুজুরের বক্তব্যটা আলাদা হয়ে গেল। তাঁর মূখনিঃসৃত বাণী সবাইকে এতই মোহিত করল যে, উপস্থিত সবাই বলাবলি শুরু করলেন। "এটাই হল বক্তব্যের কৌশল ও যাদু।" একই কথা প্রায় সকলেই বললেন, কিন্তু হুজুরের বক্তব্যে আলাদা প্রভাব ও আলাদা সম্মোহনী শক্তি রয়েছে যা অন্যদের মধ্যে নেই। এ সময়ও আমি অত্র ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসায় অনারারী শিক্ষক ছিলাম। এজন্য বক্তব্যে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল।

জ্ঞানের গভীরতায় তিনি ছিলেন অনন্য। একবার এক আলোচনায় বালাউটি (রহ.) বলেছিলেন, মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের ইলমে হাদীসের জ্ঞান সম্বন্ধে কওমী আলেমেরা কিছু বলাবলি করছিলেন। এ কথা বুঝতে পেরে তিনি এলাকার এক মাহফিলে বয়ান রাখেন। বয়ানের মাধ্যমে সিহাহ সিত্তাহ থেকে এমন ইলমি আলোচনা পেশ করলেন যে, তারা হতবাক হয়ে গেল। অতপর তারা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে এবং বলতে বাধ্য হল যে, মছলকে একজন মুহাদ্দিস পেয়েছে, যাকে নিয়ে গর্ব করা যায়। এ ঘটনা বর্ণনার সময় আমি বালাউটি হজুরের বাড়িতে লজিংয়ে ছিলাম। সে সময় আমি বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদ্‌রাসার নতুন মুহাদ্দিস। আর আমার চাকুরী জীবনেরও শুরু। মূলত এসব উক্তি শুনে আমার মন ভক্তি-শ্রদ্ধায় ভরে যেত। প্রাণে শক্তি পেতাম। হুজুর সম্পর্কে এসব প্রশংসার কথা শুনে আরও বেশি করে অধ্যয়ন করার জযবা পয়দা হতো।

হুজুরের মধ্যে বিনয় নম্রতার বিষয়টিও ছিল শিক্ষনীয়। একজন বড় মাপের মানুষ ব্যতীত অনুরূপ নম্রতা প্রদর্শন ছিল বিরল। আমি একবার ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ নিয়েছিলাম। বিশেষ কারণে যেখানে স্থায়ীভাবে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল বিধায় সে সময় প্রায় ইছামতি মাদ্‌রাসায় হুজুরের রুমে আগমন করতাম এবং রাত্রে অবস্থান করতাম। হুজুরের বিশেষ একটা

পালং ছিল। তিনি আমাকে এ পালংয়ে তাঁর বিছানায় থাকার অনুমতি দিলেন। এতো বড় আলেমের বিছানায় থাকা, বাথরুম ব্যবহার করা- এসব আমার নিকট ছিল অপছন্দনীয় কাজ। তাই আমি সেখানে থাকতে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলাম। আমার এ মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে পাশে বসালেন এবং বললেন, "প্রয়োজনে আপনি এ রুমে থাকতে পারবেন এবং বাথরুম ও অন্যান্য জিনিসপত্র ব্যবহার করতে পারবেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই।" হুজুরের এরূপ কথা শুনে আমার মনের মধ্যে যে অন্য রকম একটা ভীতি ছিল তা কেটে গেল। আমার মনে উদয় হল নবীজির সেই বাণী, যেখানে তিনি বড়দের সম্মান ও ছোটদের মহব্বত করার কথা বলেছেন-

من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا.

"যে আমাদের ছোটদেরকে দয়া করল না এবং বড়দেরকে সম্মান করল না, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।"

তিনি ছিলেন নীতির প্রতি অটল ও অবিচল। ইলমী খেদমত তথা কুরআন ও সুন্নাহের খেদমতের পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজেও দক্ষ ছিলেন। ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়মিত হওয়ার জন্য তাগিদ দিতেন। শিক্ষকদের কেউ নিয়ম বহির্ভূত কাজ করলে সংশোধনের জন্য নীতিগত ব্যবস্থাও নিতেন। আমার চাচা শ্বশুর আল্লামা শামছুল হুদা ছিরামপুরী থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বলতে হচ্ছে যে, তিনি সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত নম্র, ভদ্র থাকলেও কেউ যদি দায়িত্ব পালনে অমনোযোগী হন বা কোনরূপ অবহেলা করেন এবং তাঁর নজরে পড়ে যায়, তাহলে তিনি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতেন। তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধেও একবার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, কয়েক দিনের বেতন কর্তন করা হয়েছিল।

জ্ঞানের গভীরতায় তিনি ছিলেন অনন্য, যার তুলনা মেলা ভার। আমি একবার তাঁর হুজরা শরীফে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে আরও কয়েকজন আলেম ছিলেন। তিনি আমাদের সবাইকে প্রশ্ন করলেন, বলুন তো আরবি لغات -এ কোন শব্দটি বিভিন্ন রূপে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে? আমরা সবাই চুপ করে বসে রইলাম। কোন জবাব দিতে পারিনি। তিনিই তখন বলে দিলেন, সেটা হল- القدر। - শব্দটি। ইহা বিভিন্নভাবে অভিধানে অন্য শব্দের তুলনায় বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আমাদের কারো এরকম জ্ঞান ছিল না। হুজুরের দেওয়া এ তথ্যটি জেনে আমরা খুবই আনন্দিত হলাম।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেবের পরহেযগারীর বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য এবং শিক্ষনীয় ছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাঁর একজন প্রিয়ভাজন শাগরিদ বলেছেন, হুজুরের সাথে আমি কিছু দিন ছিলাম। এক সময় হুজুর আরব আমিরাতে বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। আমি কিছুদিন তাকে একান্ত কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর একজন খাঁটি পরহেযগার মকবুল বান্দা।

মেহমানদারীতে আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ছিলেন স্মরণীয় ও বরণীয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তাঁর বাড়িতে অনেক আলেম উলামাদের সমাবেশ হত। কোন সময় খানকাহ, কোন সময় হাদীসের দারস, আবার কোন সময় ওয়াজ মাহফিল। আমার জানামতে কেহই তাঁর বাড়িতে গিয়েছেন আর আপ্যায়িত হননি এমন নজীর নেই। আর হক্কানী আলেমদেরতো এ রকমই হওয়া উচিৎ। কেননা মেহমানকে কদর করা, অন্যদেরকে খাদ্য খাওয়ানো অনেক পূণ্যের কাজ।

প্রিয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

ان الجنة تشتاق الى خمسة نفر تالى القران وحافظ اللسان ومطعم الطعام و مكسى العريان ومن صلى على حبيب الرحمان.

"নিশ্চই পাঁচ শ্রেণির মানুষের জন্য জান্নাত আগ্রহ প্রকাশ করে, কোরআন তেলাওয়াতকারী, জিহ্বা সংযতকারী, অন্যকে খাদ্য আপ্যায়নকারী, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দানকারী এবং আল্লাহর বন্ধু হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠকারী।"

বহুগুণে গুণান্বিত শিরতাজ আল্লামা মুহাদ্দিস হুজুরের সান্নিধ্যে গিয়ে অনেক নাকামিল লোক কামিল মানুষ হয়েছে, পথহারা পেয়েছে পথের সন্ধান, বাতিল লোক পেয়েছে ভীতি আর মহৎ লোক পেয়েছে শান্তনা। কোন কোন মানুষের মধ্যে বাতিলপন্থিদের জন্য ভীতি রয়েছে- এটা আল্লাহর দেওয়া একটি কৃপা।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

نصرت با الرعب مسيرة شهر

"আমাকে এক মাসের দূরত্বের রাস্তা পর্যন্ত ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে।"

নবীজির পূর্ণ ওয়ারিস হিসাবে হুজুরের মধ্যেও এ গুণটি পুরোপুরিভাবে পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষতো দূরের কথা অনেক বড় বড় আলেমও তাঁর সামনে কথা বলতে সাহস পেতেন না।

অন্যদিকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাঁকে ভালবেসেছেন এ রকম মানুষও অনেক। এজন্য দেখা যায় তাঁর নামে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন- "লালারগাঁও হাবিবিয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা," "ভূরকী হাবিবিয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা" ইত্যাদি। তাঁর প্রতি খাঁটি মহব্বতের নিরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে এসব প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাঁর প্রতি الحب في الله এর অবিসংবাদিত প্রমাণ হিসেবে ধরে নিতে পারি।

পরিশেষে বলা যায়, সব মানুষ সমান মর্যাদা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে জন্মায় না। আল্লাহ

রাব্বুল আলামিন বিশেষ বান্দাদেরকে বিশেষ গুণাবলী দিয়ে এ ধরাধামে পাঠিয়ে থাকেন। কেউ তার জীবনকে সৎকর্মতৎপরতা, অভিজ্ঞতা ও ইলম দ্বারা স্মরণীয় ও স্বার্থক করে তোলে। আর এটা অনেকেই পারেন না। আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর অনুরূপ একজন ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর জীবনকে গড়ে তুলেছেন আলাদা বৈশিষ্ট্যে। তাঁকে ঘিরে আলোকিত হয়েছেন হাজার হাজার বনি আদম। আমরা তাঁর ইন্তেকালে তাঁর কদর বুঝতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের হৃদয় কন্দরে বারবার ভেসে উঠছে-

قدر نعمت زوال نعمت -

"নিয়ামত চলে গেলে নিয়ামতে কদর বুঝা যায়।" এ বাণীর বাস্তব রূপায়ন।

অন্যভাবে কবির ভাষায় বলা যায়-

ادمی چل جاتا ے پھر اتا نے - لوگ ڈہنڈہتا ہے مگر پاتا نے

"মানুষ চলে যায় আর ফিরে আসে না, অন্য মানুষরা তাঁকে শত তালাশ করেও খুঁজে পায় না।"

এ মহান মনীষীর রূহের মাগফিরাত ও দরজা বুলন্দি কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন। আমিন।

লেখক: উপাধ্যক্ষ, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসা, সিলেট।

হাদীসে নববীর মহান খাদিম হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ কিছু স্মৃতি কিছু কথা

অধ্যক্ষ মাওলানা শিহাবুর রহমান চৌধুরী

উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অন্যতম খলিফা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শের মূর্তপ্রতীক। সর্বপ্রকার তাগুত ও বাতিলের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি দিন রাতের বেশিরভাগ সময় কিতাব মুতালাআ এবং ইবাদাত বন্দেগীতে অতিবাহিত করতেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সুন্নাতে নববীর অনুসরণ করে গেছেন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত হাদীসে নববীর খিদমাতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি তরীকতের প্রকৃত খাদিম ও উঁচু মাকামের একজন ওলী ছিলেন। একজন সফল মুমিনের যত গুণাবলী প্রয়োজন সবই তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। এই মনীষীর সুবিশাল কীর্তিময় জীবন নিয়ে বিস্তৃত কিছু লেখা আমার সাধ্যের বাইরে। তবে ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা সংশ্লিষ্ট কিছু কথা এবং আমার ব্যক্তিগত কিছু স্মৃতি নিম্নে তুলে ধরছি।

ইছামতি মাদ্‌রাসা ও মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর

অনস্বীকার্য বাস্তবতা হলো ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার ব্যাপক পরিচিতি ও খ্যাতির সবচেয়ে বড় নিয়ামক হলেন উস্তাযুল উলামা, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। হুজুরের সুহবতের আশায় এবং উনার কাছ থেকে হাদীসের ইলম হাসিলের জন্য বৃহত্তর সিলেটের নানা প্রান্ত থেকে ছাত্রগণ ছুটে আসতেন। একটা সময় ছিল আশপাশের কয়েক মাইল জুড়ে প্রতিটি গ্রামের মধ্যবিত্ত, এমনকি নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রত্যেক পরিবারে এই মাদ্‌রাসার ছাত্রগণ লজিং থাকতেন ; এখনকার সময়ে যা কল্পনারও অতীত।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ১৯৫৯ সালে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ডের অধীন গাছবাড়ি জামিউল উলুম মাদ্‌রাসা থেকে বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে প্রথম বিভাগে কামিল (হাদীস) উত্তীর্ণ হন। সেবছরই প্রথম ইছমতি দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতায় যোগদানের মাধ্যমে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে প্রথমে ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদ্‌রাসা এবং পরবর্তীতে পশ্চিম সিলেটের ঐতিহ্যবাহী সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান

করেন। ১৯৭৪ সালে জানুয়ারি মাসে ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ এবং শায়খুল হাদীস হিসেবে যোগ দেন। তখন থেকে অত্র মাদ্‌রাসার নবযুগের সূচনা হয়। ইতিপূর্বে শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল জব্বার গোটারগ্রামী রাহিমাহুল্লাহ কয়েকজন মাত্র তালাবা নিয়ে মাদ্‌রাসার মসজিদে হাদীস শরীফ পড়ানো শুরু করেন। কিন্তু মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের পুনরাগমনের মাধ্যমে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুতিউর রহমান চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং এলাকাবাসীর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে অত্র মাদ্‌রাসার সুনাম সুখ্যাতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। মূলতঃ উনার কর্ম দক্ষতা, নিষ্ঠা ও ইখলাস, সর্বোপরি মাকবুলিয়াতের কারণে এলাকার সর্বস্তরের মানুষ পূর্বের চেয়ে বহুগুণ বেশি মাদ্‌রাসার প্রতি আগ্রহী হন। ফলে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে মাদ্‌রাসার অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়। অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে সেমিপাকা একাডেমিক ভবনের কাজ সম্পন্ন হয়ে নতুন ভবন নির্মানের পদক্ষেপ নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা হয়। এ সময়ই প্রথমবারের মত ছাত্র শিক্ষকদের জন্য ছোট পরিসরে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর দিনের বেলা পাঠদানে ব্যস্থ থাকতেন। কামিল ক্লাসে তিনি মূলতঃ বুখারী শরীফ ও তিরমিযী শরীফ দারস দিতেন। আর রাতের বেলা কোমরে গামছা বেঁধে কুদাল হাতে ক্লাস রুমগুলোর মাটি কাটতেন। একদিন কোন এক কথা প্রসঙ্গে হুজুর আমাকে বলেছিলেন, মাওলানা শিহাবুর রহমান! এই মাদ্‌রাসার প্রতিটি ধুলিকণা আমি হবিবুর রহমানকে চিনে। ১৯৭৭ সালে উনার প্রচেষ্টায় অত্র মাদ্‌রাসা প্রথমবারের মত সরকারি উন্নয়ন মঞ্জুরী লাভ করে। মঞ্জুরীর এ অর্থে একাডেমিক ভবনের অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করা হয়। হুজুর প্রায় প্রতি বছরই কিছু দিনের জন্য যুক্তরাজ্য সফরে যেতেন; সেদেশ বসবাসরত শুভাকাঙ্খিগণের কাছ থেকে তিনি সব সময়ই মাদ্‌রাসার জন্য আর্থিক সহযোগিতা সংগ্রহ করতেন। তাঁর প্রচেষ্টায় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত শুভাকাঙ্খিগণের অনুদানে তিনি কামিল জামাতের জন্য একটি দু'তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে বোর্ডিংয়ের জমি ক্রয় ও মাদ্‌রাসার সুবিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন।

উল্লেখ্য যে, ইছামতি দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় দীর্ঘ দিন থেকেই কামিল জামাতে পাঠদান চলে আসছিল। কিন্তু মঞ্জুরী ছিল না , তাই ছাত্রগণ অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হতো। এলাকাবাসীর ব্যাপক চাহিদা ছিল কামিল স্তরের সরকারি মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়ে ঐতিহ্যবাহী স্বপ্নের এ প্রতিষ্ঠান যেনো পূর্ণতা লাভ করে। হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর সেই স্বপ্ন পুরণে চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এরই ফলশ্রুতিতে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মাওলানা আবদুল মান্নান মাদ্‌রাসা পরিদর্শন করে ইতিবাচক রিপোর্ট প্রদান করেন। ফলে দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণের দ্বার উন্মুক্ত হয়। বোর্ডের বিশেষ অনুমতি লাভ করে উক্ত মাদ্‌রাসার ছাত্রগণ ১৯৯৪ সালে কামিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সন্তোষজনক ফলাফল লাভ করেন। ১৯৯৫ সালের ১ জুলাই নিয়মতান্ত্রিক

হাদীস বিভাগে কামিল খোলার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসা থাকায় কামিল ক্লাসের একাডেমিক স্বীকৃতি আদায়ে বিশেষ সহযোগিতা করে অবদান রাখেন জকিগনজের কৃতি সন্তান তৎকালীন সচিব জনাব ফয়জুর রাজ্জাক ও তাঁর ভাই শিল্পপতি জনাব আনিসুর রাজ্জাক, জনাব ড. আহমদ আল কবির, জনাব ডা. শামসুদ্দিন আহমদ, জনাব শফিকুল হক তাপাদার ও জনাব আবদুল আহাদ চৌধুরী লাল। ২০০২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব মরহুম জনাব আবুল হারিস চৌধুরীর সহায়তায় কামিল স্তর এমপিও ভূক্ত হয়।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর অত্র মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু বিধি মুতাবেক অবসর গ্রহণ করলেও ২০১৪ সাল পর্যন্ত বেসরকারিভাবে শায়খুল হাদীস হিসেবে তিনি নিয়মিত পাঠদান অব্যাহত রাখেন। এলাকার মানুষের অনুরোধে তিনি মাদ্‌রাসাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং ছয় বছর গভর্ণিং বডির সভাপতি ছিলেন। মূলতঃ মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের কারণেই ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা দেশ বিদেশে ব্যাপক পরিচিতি ও সুখ্যাতি লাভ করে। হুজুরের সুহবতে এই মাদ্‌রাসা থেকে কামিল উত্তীর্ণ হয়ে বহু মানুষ কেবল বাংলাদেশ নয় ইউরোপ আমেরিকার ভিবিন্ন দেশে নানা প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ খিদমাতে নিয়োজিত রয়েছেন।

ব্যক্তিগত কিছু স্মৃতি

১৯৯৮ সালে আমি বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদ্‌রাসায় কামিল দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত ছিলাম। একদিন হুজুরের খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, আমি কামিল ক্লাসে আপনার কাছে হাদীস পড়তে গভীর আগ্রহী। হুজুর অনুমতি দিলে ক্লাস করবো, তবে পরীক্ষা দেবো ফুলতলী মাদ্‌রাসা থেকে। হুজুর তাৎক্ষণিক আমাকে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে নিয়মিত কামিল ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলাম। হুজুরের দারস পদ্ধতি, পঠিত হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এমন সুনিপুণ ও সহজবোধ্য ছিল যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। হুজুর যখন হাদীসের উপর তাকরীর করতেন তাসবীহ দানার মতো তথ্য ও তত্বপূর্ণ কথামালা যেনো ঝরে পড়তো। সর্বোপরি তাঁর মাকবুলিয়াতের কারণে ক্লাসে এমন নুরানী পরিবেশ বিরাজ করতো যা প্রত্যেক ছাত্র অনুধাবন করতে পারতো। সেই ঐশী অনুভুতি কোন ক্রমেই ভাষায় রূপ দেয়া সম্ভব নয়। ১৯৯৮ সালে বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদ্‌রাসা থেকে হাদীস বিভাগে কামিল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অংশ নিয়ে মা বাবা, আসাতিযায়ে কিরাম, বিশেষ করে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের দু'আয় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই। ফলাফল প্রকাশের পর হুজুরের সাথে দেখা করলে বললেন, তুমি অনিয়মিতভাবে কিছুদিন ইছামতি মাদ্‌রাসায় ক্লাস নাও। হুজুরের নির্দেশ পালনার্থে ক্লাস নিতে শুরু করি। কিছু দিনের মধ্যে চান্দগ্রাম আনোয়ারুল উলুম ফাযিল মাদ্‌রাসায় আরবী প্রভাষক পদে ইন্টারভিউ দিতে যাই।

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় আমি প্রথম হই। হুজুরের কাছে চান্দগ্রাম মাদ্‌রাসায় যোগদানের অনুমতি চাইলে বললেন, ইন্টারভিউয়ে দ্বিতীয় যে হয়েছে তাকে নিয়োগ দিতে জানিয়ে দাও। তুমি এখন সেখানে যোগ দিলে তাদের ঝামেলায় ফেলে দেবে। কারণ কিছুদিন পর তোমাকে ইছামতি মাদ্‌রাসায় আসতে হবে। তখন তারা পুনরায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নতুন করে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে শিক্ষক নিতে হবে। তারচেয়ে সহজ হলো এখন একটি রেজুলেশন করে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া। এই কথাগুলো হুজুর বলেছিলেন ২০০১ সালে।

২০২১ সালের ৫ অক্টোবর যেদিন ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করি হুজুরের সেদিনের বলা কথাগুলো বারবার মনে পড়ছিল। ইতিপূর্বে ইছামতি মাদ্‌রাসায় সহকারী মৌলভী পদে নিয়োগ নিয়েছিলাম। এর মধ্যে মুহাদ্দিস পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলো। আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তায হযরত মাওলানা আসদ্দর আলী চানপুরী হুজুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের রুমে গিয়ে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, শিহাবুর রহমান কি আবেদন করবে? হুজুর বললেন, আগেই তো বলেছিলাম পদ খালি হলে তাকে নেবো। তাই তাকে আবেদন করতে বলুন। চানপুরী হুজুরের মাধ্যমে অনুমতি পেয়ে আমি মুহাদ্দিস পদে আবেদন করলাম।

একদিন হুজুর আমাকে কাছে ডেকে প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় নিয়ে ইন্টারভিউয়ের লিখিত পরীক্ষায় মুহাদ্দিস পদের জন্য হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ বিষয়ে কোন কোন ধরণের প্রশ্ন হতে পারে এর একটি স্পষ্ট ধারণা দেন। সেই সাথে বলেন, আশা করি তুমি আমাকে লজ্জিত করবে না। এমনিতেই ঐ পদের জন্য আগ্রহী ছিলাম, তদুপরি হুজুরের কথায় প্রেসার বেড়ে গেলো। একটাই চিন্তা , আমার কারণে হুজুর যেনো লজ্জিত না হন। ব্যাপক পড়াশোনা করে নির্ধারিত তারিখে লিখিত পরীক্ষায় বসলাম। প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে চক্ষু চড়কগাছ, মাত্র একটি প্রশ্ন কমন পড়েছে। মনে গভীর ভয় ঢুকে গেলো, তাহলে আমি কি হুজুরকে লজ্জিত করে ফেলবো? তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত নিলাম প্রথমে কমন প্রশ্নটির উত্তর ভালোভাবে গুছিয়ে লিখবো, তারপর অন্য সবকটি প্রশ্নের উত্তর নিজে থেকে লিখতে চেষ্টা করবো। আল্লাহর উপর ভরসা করে লিখতে শুরু করলাম। মাথায় তখন একটাই চিন্তা, হুজুরের মুখ যেনো উজ্জ্বল করতে পারি।

অবস্থা এমন হলো, মনে হচ্ছিলো কে যেনো আমার কানে কানে উত্তর বলে দিচ্ছে। আল্লাহর কসম! সুরা ফাতিহা হয়তো এত দ্রুত লেখা সম্ভব হবে না আমি যতটা দ্রুত লেখা শেষ করে খাতা জমা দেই। ৭৮ নম্বর পেয়ে লিখিত পরীক্ষায় প্রথম হই। মৌখিক পরীক্ষা শুরু হলো, ইন্টারভিউ বোর্ডে হুজুরও আছেন। মনে আশা ও ভীতি উভয়ই কাজ করছিল। বোর্ড সদস্য সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসার সহকারী অধ্যাপক জনাব মাওলানা আবদুল মুসাব্বির আরবীতে প্রশ্ন করে চললেন, আমি আরবীতেই উত্তর

দিলাম। অন্য সদস্য একজন কলেজ অধ্যক্ষ ইংরেজিতে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন, আমি ইংরেজিতেই উত্তর দিলাম। একটা ঘোরের মধ্যে যেনো পুরো মৌখিক পরীক্ষা সমাপ্ত হলো। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমার অভিজ্ঞতা সনদ চাইলেন। আমার অভিজ্ঞতা সনদ তখন ছিল না। তিনি হুজুরকে লক্ষ করে বললেন, এ পদে প্রার্থীর কমপক্ষে আট বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। উনার তো তা নেই। হুজুর বললেন, দেখুন ইউএনও সাহেব! উনাকে দিয়ে কাজ তো আমি করাবো। আট বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক দ্বারা যে কাজ হবার কথা তা যদি একদিনের অভিজ্ঞতা নেই এমন কাউকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারি আপনার আপত্তি আছে? এ কথা শুনে ইউএনও বললেন, ঠিক আছে হুজুর।

মূলতঃ হুজুরের নেক নজরের কারণেই ইলমে দ্বীনের কিছুটা খিদমত করার সুযোগ লাভ করি। ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসাকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের অবদান ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে লিখা থাকবে। আমি অধমের জীবনেও হুজুরের ইহসান ভুলে যাওয়াটা নাফরমানী হবে। আমরা ব্যক্তিগত কিংবা সামষ্টিকভাবে হুজুরের কোন অবদান, ইহসানের বদলা দেয়ার সাধ্য নেই। রাহমান রাহীম আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ করি তিনি যেনো হুজুরের সব খিদমাত কবুল করেন। তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মাকাম দান করেন।

লেখক: অধ্যক্ষ, ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা, জকিগনজ, সিলেট।

কিছু স্মৃতি কিছু কথা

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মতীন চৌধুরী শাহবাগী

উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে বাংলাদেশে যে সব খ্যাতিমান আলেমে দ্বীনের অভ্যুদয় ঘটে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেব তাদের অন্যতম। কুরআন, হাদীস, আকাইদ ও ফিক্বাহসহ ইসলামী শরিয়াহ এর মৌলিক বিষয়ের পাশাপাশি রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ কল্যাণ, প্রশাসন, আইন ও বিচারসহ যাবতীয় জাগতিক মানবিক বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলের পুর্ণ অনুসরণের পাশাপাশি এ পথে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেব সিলেটের জকিগন্জ উপজেলার রারাই গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মাওলানা মমতায আলী সাহেব বিশিষ্ট আলেম ছিলেন, মাতা আমেনা খাতুন একজন পর্দানশীল, বিদুষী ও গুণবতী মহিলা হিসাবে এলাকায় ছিলেন সুপরিচিত।

হযরত মুহাদ্দিস সাহেব সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। তাঁরা পাঁচ ভাই আলেম ছিলেন। উনাদের একমাত্র বোন ছিলেন আমার আপন বেয়াইন।

আল্লামা হবিবুর রহমান সাহেব অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি সড়কের বাজার আহমদিয়া মাদ্‌রাসা হতে অষ্টম শ্রেণীর জেলা ভিত্তিক বৃত্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ২য় স্থান লাভ করেন। অতঃপর গাছবাড়ী জামিউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৫৫ সালে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দশম স্থান লাভ করেন। একই মাদ্‌রাসা হতে ১৯৫৭ সালে ফাজিল পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান এবং ১৯৫৯ সালে কামিল পরীক্ষার অংশগ্রহণ করে দ্বাদশ স্থান লাভ করেন।

১৯৭৪ সালের একটি ঘটনা মনে পড়ে। তিনি ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। তখন সরকারীভাবে মাদ্‌রাসা ও স্কুলের অডিট আরম্ভ হয়। জকিগন্জ, কানাইঘাট ও বিয়ানীবাজার এর সকল মাদ্‌রাসা ও স্কুলের অডিট শাহগলি বাজার হাই স্কুলে স্থান নির্ধারণ করা হয়। আমি তখন শাহগলী বাজার মাদ্‌রাসার শিক্ষক এবং বাজার মসজিদের খতিব ও ইমাম ছিলাম। মুহাদ্দিস সাহেব তাঁর কেরানী ও একজন শিক্ষক নিয়ে শাহগলী হাই স্কুলে আসেন। খাতাপত্র দেখে অফিসার সন্তুষ্ট হতে না পারায় খুব একটা ভাল ব্যবহার করেন নি। অডিট টিমের হেড অফিসারের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কারণ তিনি আমার পেছনে নামায পড়তেন এবং আমার হুজরায় বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। এক পর্যায়ে যোহরের নামায পড়ে মুহদ্দিস

সাহেব আমার হুজুরায় তাশরীফ আনলেন। আমি অফিসারের কাছে মুহাদ্দিস সাহেবের পরিচয় ভালভাবে যখন তুলে ধরলাম। তখন অফিসার শ্রদ্ধার সাথে তাঁর কাজ সম্পন্ন করে দিলেন। সেই দিন থেকে মুহাদ্দিস সাহেরের সাথে ভালো সম্পর্ক হয়ে গেলো।

১৯৭৬ সালে তিনি যখন সৎপর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন তখন চলতি পথে গাড়ীতে দেখা হয়। সালাম কালামের পর আমাকে সৎপুর মামাদ্‌রাসার মাহফিলে আমাকে দাওয়াত করেন। আমিও দাওয়াত কবুল করি। মাহফিলের দিন সময় মত পৌঁছে যাই। দিনের বেলা হযরত ফুলতলী ছাহেব এর ওয়াজের পূর্বে আমাকে সময় দেয়া হয়। সেদিন তাঁর ব্যবহার ও মেহমানদারীতে মুগ্ধ হই।

শিক্ষকতা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক কর্মকান্ডে ব্যস্ত সময় কাটানোর পরও তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি নিয়ে বিভিন্ন পুস্তক করেছেন করেছেন। ইসলামী শিক্ষা বিস্তার বিশেষতঃ সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী প্রচার করতে বিভিন্ন সময় তাঁর দাওয়াতী মাহফিলসমুহ গুরুত্ব ভূমিকা রাখে। তিনি একাধারে তিন বছর মাদ্‌রাসা বোর্ডের কমিটির সদস্য ছিলেন।

একামতে দ্বীন ও দাওয়াতী কাজে তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন। অনেকবার হজ্জ ও উমরা পালন করেছেন। বৃহত্তর সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর অনুপ্রেরণায় বহু মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি সিলেট ৭ আসনে জাতীয় পরিষদ সদস্য পদে (MNA) নেজামে ইসলাম পার্টির মনোনয়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের মনোনয়নে সিলেট ৫ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বিভিন্ন সময় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায় ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে তাঁর অগ্রণী ভুমিকা অনস্বীকার্য।

তিনি নিয়মিতভাবে প্রতি মাস, প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন স্থানে তাফসীর মাহফিল ও দারসে হাদীস প্রদান করতেন। অর্ধ শতাব্দী কালেরও বেশি সময় হাদীসের খেদমত করে গেছেন। বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে ইমলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তিনি অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে বৎসরে প্রায় একাধিকবার তাঁর সাথে একত্রিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। তাঁর ব্যবহারে সকল মসলকের আলেম উলামা সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর আপন ভাগনা বারঠাকুরী নিবাসী মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সাথে যখন আমার মেয়ের বিবাহ হয় তখন থেকে আমাকে সর্বদা বেয়াই সাহের বলে সম্বোধন করতেন।

মানুষের কাছে ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছে দিতে তিনি প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আজ তিনি দুনিয়াতে নেই। আল্লাহপাক যেন তাঁর সেই ভাল কাজ গুলোকে অছিলা করে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করেন। তাঁর পরিবার পরিজনকে সবরে জামীল দান করেন। আমীন।

লেখক: বিশিষ্ট দাঈ, সাবেক সুপার- রহমতাবাদ দারুসসুন্নাহ মাদ্‌রাসা, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

স্মৃতিতে অম্লান
আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

ড. এনামুল হক চৌধুরী

১৯৮২ সালে আমি মদীনা মনোয়ারার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস সিক্সের ছাত্র। আমার আব্বা মুজিবুল হক চৌধুরী সৌদী হেলথ মিনিস্ট্রির আন্ডারে মদীনার কিং ফাহাদ সরকারি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। তাই আমরা স্বপরিবারে সেখানে অবস্থান করতাম। আমাদের ৪ ভাই বোনের জন্ম সৌদী আরবে। আম্মার খালু সিলেট শহরস্থ সোবহানীঘাটের বাসিন্দা প্রখ্যাত সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষানুরাগি আলহাজ্ব আব্দুল খালিক নানা ও নানী হজ্জের সফরে মদীনায় অবস্থান করছেন। একদিন আমাদের বাসায় নানা ও তাঁর সফরসঙ্গীদের দাওয়াত দেয়া হল। সাথে আসলেন নানা সাহেবের একান্ত বন্ধু সৌম্য দর্শন একজন আলেম সাহেব। নানা আমাদের ডেকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদেরই একজন ছিলেন আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর সুদর্শন চেহারা, বিনয়ী আচরণ, আমাদের সাথে আরবীতে কথোপকথন ও ভাই বলে সম্বোধন ইত্যাদি ব্যবহার আমাকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করলো। এক পর্যায়ে নানা আমাকে তাঁর মতো আলেম হবার নসিহত করলেন। বলতে গেলে সেদিনই আমি তাঁকে দেখে দ্বীনি শিক্ষা লাভের প্রতি উদ্বুদ্ধ হই ও প্রেরণা পাই।

একবার আমার নানা আব্দুল খালিক সাহেব ও আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ মদীনায় আসেন। আমি তাদের সাথে মসজিদে কুবায় যাই। তিনি আমাকে মজা করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মদীনাবাসী? তুমি কি জানো বি'রে আরিছ কোথায়? তখন আমি উনাকে বললাম, কুবা মসজিদের পশ্চিমপার্শ্বে। তারপর আমি উনাকে নিয়ে সেখানে যাই। তখন তিনি আমাকে একটি কূপ দেখিয়ে বললেন, এই কূপের পার্শ্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন। তখন আমি বললাম, এই কূপটি মদীনাবাসীর কাছে এখন খাতাম (আংটি) কূপ নামে পরিচিত। এই নামকরণের কারণ- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে সীলমোহর আংটি ছিল সেটি খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হাতে পরতেন। সেটি তাঁর হাত থেকে এই কূয়াতে পড়ে গিয়েছিল। সেই থেকে এই কূপটি আংটি কূপ নামে পরিচিত হয়। সৌদী বাদশা ফাহাদের সময়ে কূবা মসজিদ সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে এটি সংযুক্ত করা হয়েছিল।

তখন আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, আমি আশা করি

সৌদী সরকার একটি উদ্ভাবনী উপায়ে কূপটি সংরক্ষণ করবে। সৌদী সরকার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি এর ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত মদীনার ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সুরক্ষা ও যত্নের জন্য একটি সরকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং পুরাকীর্তি কর্তৃপক্ষ একটি উদ্ভাবনী উপায়ে এসব সংরক্ষণের জন্য কাজ করছে।

এরপর থেকে মাঝে মধ্যে হজ্জে গেলে বা আমরা দেশে এলে কয়েকবার উনার সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। ১৯৯৭ সালে স্থায়ী বসবাসের জন্য সিলেট ফিরে এলে বিভিন্ন দ্বীনি ও সামাজিক প্রয়োজনে তাঁর সাথে প্রায়ই মোলাকাত হতো। ১৯৯৮ সালে তৎকালিন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ফতোয়া অবৈধ ঘোষণার প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফুঁসে উঠে দেশ। তখন আমি বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে সাক্ষাত করে এ বিষয়ে আলোচনা করি। উনার সম্মতি পাওয়ার পর আওয়ামী সরকারের ফতোয়া বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আল্লামা মো. হবিবুর রহমানের বড় জামাতা অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সালাম মাদানী, শায়খ ইসহাক আল মাদানী, মাওলানা জামিল আনসারী ও মাওলানা আব্দুল ফাত্তাহ সহ বৃহত্তর সিলেটের ওলামায়ে কেরামদের ঐক্যবদ্ধ করার মহান ব্রত নিয়ে মাজলিসুল উলামা বাংলাদেশ গঠন করার নিমিত্তে প্রচেষ্টা শুরুর প্রথম দিকে বেশ কয়েকবার তাঁর সাথে একান্ত সাক্ষাত করেছি। শেষ পর্যন্ত জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক সভাপতি, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান, মাওলানা আব্দুল বাসিত বরকতপুরী ও মাওলানা মুহিব্বুল হক গাছবাড়ীসহ আরো ৫ জন প্রথিতযশা আলেমে দ্বীনকে সহ-সভাপতি ও আমি ড. এনামুল হক চৌধুরীকে মহাসচিব করে মাজলিসুল উলামা বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠার দিন জিন্দাবাজারস্থ শ্যামলী কনভেনশন সেন্টারে স্বশরীরে মুহাদ্দিস মো. হবিবুর রহমান সাহেব উপস্থিত থেকে উলামায়ে কেরামদের ঐক্যের ব্যাপারে যে বক্তব্য রাখেন তা ছিল এক কথায় অসাধারণ।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমানের সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। কিন্তু মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পড়াশোনার পাশাপাশি ধর্মীয় বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও নানা হবিবুর রহমান সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ছিল। তবুও তা সত্ত্বে উনার সাথে আমার সম্পর্ক গভীর ছিল এবং আবেগ থাকলেও তা কাঁচা ছিল। আমাদের সম্পর্ক মতপার্থক্য উপেক্ষা করে সহযোগিতার নীতির উপর ভিত্তি করে হয়েছিল। আমি অবগত ছিলাম যে, মক্কা এবং মদিনায় তাঁর ঘন ঘন সফরের সময় তিনি হাদীস, সুফিবাদের বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও আলোচনা করার জন্য শায়খ মুহাম্মদ ইবন আলাওয়ী আল-মালিকির (সৌদি আরবের সুফিবাদের শায়খ) সাথে যোগাযোগ রাখতেন। শায়খুল হাদীস হিসেবে তাঁর ধর্মীয় অবস্থানের পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতি এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক

দলগুলোতে তাঁর একটি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এর কারণ তিনি একবার সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আমি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও ২০০৮ সালের সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়ার সৌদি আরব ও আরব দেশগুলোর (মধ্যপ্রাচ্য) বিশেষ দূত হিসেবে কাজের জন্য বিএনপিতে যোগদান করি। একদিন তিনি আমাকে বললেন, আপনি রাজনৈতিক কাজে যোগ দিলেন কেন? আমি বলেছিলাম, রাজনীতির ক্ষেত্র হল জাতির সেবার অন্যতম ক্ষেত্র, বাংলাদেশের মানুষের উন্নতি ও মানবতার সমৃদ্ধির জন্য কাজ করার ইচ্ছা আমার। আমি বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে রাজনীতিতে কাজ করার জন্য বেছে নিয়েছিলাম। যিনি তাঁর অখণ্ডতা, দেশের প্রতি ভালোবাসা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং বাংলাদেশে ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষার জন্য পরিচিত ছিলেন। আমি এসব কথা বলার সময় আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ নীরব ছিলেন। আমি জানতাম- নীরবতা সন্তুষ্টির লক্ষণ নির্দেশ করে।

তাঁর অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করলে ঈদুল আযহার দ্বিতীয় দিনে আমি তাঁর গ্রামের বাড়িতে তাঁকে দেখতে যাই। সেখানে গিয়ে সাক্ষাৎ হয় আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর সাবেক এমপি অধ্যক্ষ মাওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান, বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের ও তাঁর বড় জামাতা আব্দুস সালাম আল মাদানী সাহেবের সাথে।

এমন সময়ে তাঁর অসুস্থতা ও অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। আমার অবস্থা ও আমার সন্তানের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সেই সময় তিনি বললেন, আপনি কি বেগম খালেদা জিয়ার সাথে এখনও আছেন? আমি বললাম হ্যাঁ। আমার কথা শেষ হওয়ার আগে তাঁর বড় মেয়ের স্বামী আব্দুল সালাম আল-মাদানী বলে উঠলেন, ড. মুহাম্মদ এখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা একজন জাতীয় রাজনীতিবিদ।

আমার দীর্ঘ ৪০ বছরের জানাশোনা ও পর্যবেক্ষন মোতাবেক তাঁকে একজন দ্বীনদার, পরহেযগার ও ইলমে হাদীসের পণ্ডিত হিসেবে পেয়েছি। তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মালিকের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। রাব্বে কারিমের দরবারে আলিশানে মরহুমের মাগফিরাত ও দরজা বুলুন্দির বিনীত গুজারিশ করছি। তাঁর আওলাদ ও অগণিত ছাত্র শুভাকাঙ্খীদের ইলমে ওয়াহি ও মানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

লেখক: কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল; সদস্য, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলারস।

একজন 'বাহরুল উ'লুম', তাঁর অকৃত্রিম জীবনবোধ ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্য

মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীকুর রহমান চৌধুরী

আমাদের 'বাহরুল উ'লুম':
চোখের সামনে যুগের সূর্য ডুবে যায়!
আলোর প্রত্যাশা নিয়ে ভোরের আকাশে খোঁজে ফেরা চোখ
সন্ধ্যাকালের শোক মাহফিলে জ্যোতি ছড়ায়
কাফেলা চলে গেছে!
আলোর ঝিলিক বহু দূরের তারার মতো আমাদের পথ দেখায়
মরুর বালু-রাশির মাঝে, আমরা জেগে আছি
জ্ঞানী-সাধক পুরুষদের আলো নিয়ে।

আমাদের কালের এক মহান মুআল্লিম, যুগের বাহরুল উ'লুম-জ্ঞানের সমুদ্র, তাঁর উদাহরণ ছিলেন তিনি নিজেই। জীবনের অধিকাংশ সময় পার করেছেন হাদীসে নববী শরীফের শিক্ষা, প্রচার ও গবেষণার মধ্য দিয়ে। প্রবাসে অথবা নিজ আবাসে তাঁর চারপাশে জ্ঞানপিপাষুদের ভীড় লেগেই থাকতো। কয়েক যুগ ধরেই আ'ম অথবা খাছ মানুষজন 'মুহাদ্দিস ছাহেব' 'মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর' বলে তাঁকেই বুঝাতেন। উ'লুমে নববী শরীফের বিশাল ভান্ডার থেকে মণি-মুক্তা ছড়িয়েই তিনি অধিক আনন্দ পেতেন। তাঁর কর্ম কুশলতা ও জীবনাচার জুড়ে যে বিষয়টির প্রভাব সবচেয়ে বেশি উদ্ভাসিত ছিল, তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীর প্রচার ও তা'লিমের ঐকান্তিক সাধনা। উম্মতের এমনই মহান মুআল্লিমগণ সম্পর্কে প্রিয় রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যৎবাণী হলো: "(আমার সাহাবাগণ!) তোমরা আমার কাছ থেকে যেমনি আমার হাদীস শোনছ, তোমাদের কাছ থেকেও মানুষ তা শুনবে এক সময়, আর তোমাদের কাছ থেকে যারা আমার হাদীস শোনেছে, তাদের কাছ থেকেও তা শুনা হবে, আর যারা এঁদের কাছ থেকে শুনেছে, তাঁদের কাছ থেকেও তা শুনা হবে।"

[عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ مِنْكُمْ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ. (أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث/٠٦.)

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের তা'লিম-শিক্ষা ও প্রচারে জীবন ধন্য হয়েছে যাঁদের, প্রিয় রাসূল ﷺ উম্মতের সেই সকল মহান মানুষগণকে তাঁর খোলাফাগণের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে: "হে আল্লাহ! আমার খোলাফাগণকে (প্রতিনিধিত্বকারী) রহম

করুন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কারা আপনার খোলাফা? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার খোলাফা তাঁরাই যারা পরবর্তীতে আসবে, আমার হাদীস এবং সুন্নাহ মানুষের কাছে বর্ণণা করবে এবং শিক্ষা দিবে।"

[عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِ نَا. قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا خُلَفَاؤُكُمْ؟ قَالَ: اَلَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِي، يَرْوُوْنَ أَحَادِيْثِي وَسُنَّتِي، وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ. (أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٥٩٣/٦، الرقم/٢٤٨٥، والرامهرمزي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي/٣٦١، الرقم/٢.)]

প্রকৃত অর্থেই পবিত্র এই ব্রত-সাধনায় তিনি এমনই নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন যে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ সফরকালে আগ্রহী জ্ঞানপিপাসু মানুষজন এবং তাঁর ছাত্রগণ যখনই তাঁর কাছে হাদীস শিখতে ও শুনতে আবদার ধরতেন, তিনি সকল উ'যরকে উপেক্ষা করে এই পবিত্র কাজে নেমে পড়তেন। তিনি হরমে মক্কা ও মদীনা শরীফে এবং ইসলামী দুনিয়ার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বিদ্যাপীঠ জামে' আল-আযহারের গ্রান্ড মসজিদে ত্বালিবদের তৃষ্ণা মিটিয়েছেন হাদীসে নববী শরীফের দারস দিয়ে। এমন কি হাদীসে রাসূলের ﷺ দারস-তা'লীমে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে সমকালীন মুহাক্কিক মুহাদ্দিস মুহতারামের দরসেও হাজির হয়ে যেতেন এবং তাঁর ছাত্রদেরকেও উৎসাহিত করতেন। কোনো না কোনোভাবে রাসূলে কারীমের ﷺ পবিত্র বাণী ধারণে অগ্রণী হওয়া অথবা পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করাই হতো তাঁর ইখলাসপূর্ণ উদ্দেশ্য। প্রিয় রাসূল ﷺ -এর পবিত্র বাণীর নিবেদিতপ্রাণ ত্বালীব-জ্ঞানপিপাসু হিসাবে এই বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে তাঁর অনন্য বিশ্বস্ততার প্রমাণ। প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা হযরত ইবরাহীম ইবনে আশআস রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "যখন তোমরা এমন কোন ব্যক্তিত্বের দেখা পাও যিনি রাসূলে কারীমের হাদীসের অন্বেষণে এবং হাদীসবেত্তা উলামা-মাশায়িখগণের মজলিস ও সংশ্রব গ্রহণে খুবই আগ্রহী-উৎসাহী, তখন তোমরা এমন ব্যক্তিত্বের বিশ্বস্ততার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং তাঁর থেকে অবশ্যই বর্ণনা করবে।"

[عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الأَشْعَثِ، قَالَ: إِذَا وَجَدْتُمْ رَجُلًا مَعْرُوْفًا بِشِدَّةِ الطَّلَبِ وَمُجَالَسَةِ الرِّجَالِ، فَاكْتُبُوْا عَنْهُ.

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.(ابن حبان في المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ٤٢/١.)]

বাহরুল উলুম, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন, শায়খুল হাদীস আল্লামা মোহাম্মদ হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ (১৯৩৪-২০২২)-এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং ই'লমী অঙ্গনে উচ্চতায় শিরোতাজ তুল্য বিশালতা তাঁকে সমকালীন উলামা-মাশায়েখগণের মাঝে বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। দাঈ'ইলাল্লাহ হিসাবে তাঁর ভারসাম্যপূর্ণ কথামালা যেমন ছিল অনুসরণীয়, তেমনি অসংখ্য উলামা, মুহাদ্দিসগণের উস্তায হিসাবে তিনি ছিলেন অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর প্রতিটি বয়ান-বক্তৃতা দর্শন-হিকমাহ, কালামুল্লাহ ও

সুন্নতে নাবাওয়ী শরীফের সুচারু ব্যাখ্যা ও সহজবোধ্য উপস্থাপনায় অনবধ্য উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছত। তাঁর মজলিসের শ্রোতা শুধু তন্ময় হয়ে শুনতেনই না, মনে ও দেমাগে গভীর ও স্বচ্ছ চেতনাবোধ নিয়ে হৃদয়কে প্রশান্তির মেওয়া-মিস্রিতে আপোত করে নিতেন। সকল শ্রেণির শ্রোতাই তাঁকে বুঝতেন। যেভাবে অনেক কঠিন বিষয়কেও তিনি সাধারণের বোধগম্য করে তুলে ধরতেন, তা ছিল তাঁর অসাধারণ এক গুণ-বৈশিষ্ট্য। বক্তৃতায় অতিরিক্ত কথা তো থাকতই না, শব্দচয়ণ ও বাক্য বিন্যাস হতো আভিজাত্যপূর্ণ। অবাক হয়ে কখনো ভাবতাম, বছরের পর বছর আমরা তাঁর অসংখ্য উঁচুমানের বয়ান-বক্তৃতা শুধু শুনেই গেলাম! ইলম ও আ'মালের মহাসমুদ্র অথবা জ্ঞানের সিনাই পাহাড় যা'ই বলি, তাঁর অকৃত্রিম জীবনবোধ, জ্ঞানলব্ধ সক্ষমতা ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্য যুগ-যামানা নিঃসন্দেহে অবলোকন করেছে।

বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততার মিশন

ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের প্রাতিষ্ঠানিক দারস-চর্চা শুরু হয় ইমাম হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দীসে দেহলভী (১৫৫১-১৬৪২খ্রিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাধ্যমে। তিনি হিজাজের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ 'কানযুল উম্মাল'-এর সংকলক শায়খ আলী মুত্তাকী রাহিমাহুল্লাহ'র নিকট হাদীস পড়েন। তাঁর ইলমী খ্যাতি তাঁকে সমগ্র ভারতের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিল। হিন্দুস্তানের দূর-দূরান্ত থেকে হাদীসের তালিবগণ তাঁর খেদমতে হাজির হতেন এবং হাদীসের সনদ লাভ করতেন। হযরতের দৌহিত্র শায়খ নূরুল হক দেহলভী সহীহ বুখারীর ফার্সী ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন যা উলামাগণ প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করেন।

সম্মানিত এই মুহাদ্দিস-ইমামগণের পর দিল্লীর এই বুদ্ধিভিত্তিক আন্দোলন (ইলমী তাহরীক) ইমাম কুতবুদ্দীন আহমদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (জন্ম: ১১১৪হিঃ ওফাত: ১১৭৬ হিঃ/১৭৬২ খ্রীঃ)-এর পরিবারে স্থানান্তরিত হয়। শাহ সাহেবের পিতা শাহ আব্দুর রহিম মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১১৩১হিঃ/১৭১৯ খ্রিঃ) বাদশাহ মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর রাহিমাহুল্লাহ (শাসনকাল: ১৬৫৪-১৭০৭ খ্রীঃ)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় সংকলিত 'ফতওয়া-ই আলমগিরী' সংকলনে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন দিল্লীতে মাদরাসা-ই রহিমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা (প্রতিষ্ঠাকাল: ১০৭০হিঃ/১৬৬০খ্রিঃ) যেখানে দ্বীনি ইলমের বহুবিদ শাখায় উচ্চতর পাঠদানের সাথে তাসাউফের তা'লিমও গুরুত্বের সাথে দেওয়া হত। শাহ আব্দুর রহিম মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং চিশতিয়াহ ও নকশবন্দিয়াহ তরীকার বুজুর্গ ছিলেন। ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী তাঁর পিতার কাছে বায়আত গ্রহণ এবং খেলাফত লাভ করেন। কুরআন, হাদীস, ফিকহ্সহ তৎকালীন সময়ে প্রচলিত ও প্রয়োজনীয় সকল শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন।

পনের বছর বয়সে তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর মুহতারাম পিতার ইন্তেকালের পর তিনি মাদরাসা পরিচালনার আসনে বসেন। তখন থেকেই হাদীসে নববীর দারস ও সনদ প্রদানের সাথে সাথে তরীকতের বায়আত-তা'লিম দানও করতে থাকেন।

শাহ সাহেব ১১৪৩হিঃ/১৭৩১ সনে হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে হিজাজ সফর করেন এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবু তাহির ইবনে ইবরাহীম আল-কুরদী রাহিমাহুল্লাহ-এর নিকট দ্বিতীয়বার হাদীস পড়ে সনদ লাভ করেন। হারামাইন শরীফাইন সফর থেকে ফিরে এসে মাদরাসা-ই রহিমিয়ার সিলেবাসকে তিনি সম্প্রসারণ ও পুনর্বিন্যাস করেন। এই সময় মাদরাসা-ই রহিমিয়া পুরা ভারতবর্ষে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের মাদরাসাগুলোর সিলেবাস, সিহাহসিত্তা গ্রন্থসমুহের সিলেবাস ভুক্তি এবং আজও যে দারস-তাদরিসের অনন্য প্রচলন জারি আছে, তা শাহ সাহেব এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণের ত্যাগ-কোশেশ-মেহনতেরই ফসল।

[دهلی کی قدیم مدارس اور مدرس: ص-۹۱۱؛ الواح الصنادیر: ص:۳٤-٦٤]

মাদরাসা-ই রহিমিয়া শুরু থেকেই শিক্ষাবিপ্লব ও সমাজবিপ্লবের কেন্দ্র ছিল। এটা কেবলমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছিল না, উলামায়ে দ্বীন এখান থেকেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অসংগতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা রাখতেন। দখলদার ইংরেজদের জন্য এই প্রতিষ্ঠান সব সময়ই মাথা ব্যথার কারণ ছিল। ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী এই মাদরাসা থেকে যে তাজদীদ বা সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন, এর মাধ্যমেই উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায়।

ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী'র জন্ম হয়েছিল মোগল বাদশাহ আলমগীর রাহিমাহুল্লাহ'র মৃত্যুর চার বছর পূর্বে। তাঁর পিতা শাহ আব্দুর রহীম রাহিমাহুল্লাহ'র বয়স তখন ষাট বছর পুর্ণ হয়েছিল। তিনি তাঁর মুহতারাম পিতার কনিষ্ট সন্তান ছিলেন। তাঁর জন্মের পুর্বে পিতা স্বপ্নযোগে কল্যাণকর কিছু ইলহামপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। শাহ সাহেবের ইন্তেকাল হয়েছিল দিল্লীর অন্ধ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের আমলে। এ হিসাবে তিনি আলমগীর থেকে দ্বিতীয় শাহ আলম পর্যন্ত দশজন মোগল সম্রাটের শাসন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুতরাং দিল্লীর মসনদের বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে যাত্রা এবং অনেক উত্থান পতনের দৃশ্য তিনি অবলোকন করতে পেরেছিলেন। মারাঠা বিদ্রোহ, শিখ বিদ্রোহ, নাদিরশাহ'র অভিযান, পানিপথের যুদ্ধে আহমদশাহ আবদালীর বিজয় এ সবকিছুরই সাক্ষী ছিলেন তিনি। উপমহাদেশের প্রতি ইউরোপীয় জাতিগুলোর লোলুপদৃষ্টি এবং উত্থাল তরঙ্গের আঘাতে দিল্লীর মসনদ যে তখন অসহায়ভাবে দোল খাচ্ছিল, এ সবকিছু পূর্ণভাবেই তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন। ভবিষ্যতের হিন্দুস্থান এবং ইসলাম ও

মুসলমানদের বিষয়ে তাঁর ভাবনার বিষয়টি কিছু লেখনিতেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ'র সংস্কার আন্দোলন শুরুতে যদিও সাময়িক কোন মোভমেন্ট বা সংস্থার মতো শুরু হওয়া বিষয় ছিল না, শাহ সাহেবের পিতা প্রখ্যাত আলেম শাহ আব্দুর রহিম মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ'র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা এবং তাঁর ছাত্র ও মুরিদীনদের মধ্যে খেলাফত আদলে প্রবর্তিত মাসলাক বা আদর্শিক সমাজব্যবস্থা শাহ ওয়ালীউল্লাহ'র হাতে আরও ব্যাপক রূপ নেয় এবং নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন হিসাবে তিনি শূরা- কেন্দ্রীয় পরিষদও গঠন করেছিলেন। প্রকৃত অর্থে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী'র হাতে মুজাদ্দিদে আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র সংস্কার কর্মটিই আরও ত্বরান্বিত হয়। তিনি মুসলমানদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর সংস্পর্শে নিয়ে আসার তাগিদ অনুভব করেন। সেই সময়কার প্রচলিত ও রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সিতে কুরআন অনুবাদ করে প্রচার করেন। ইসলামের মৌলিক বিষয়ে তাঁর চিন্তা ও দার্শনিক ব্যাখ্যা, মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, বৈসম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা, দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ ও পদ্ধতি এবং কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল, ইজমা ও ক্বিয়াসের আলোকে খোলাফায়ে রাশেদীনের রাষ্ট্রদর্শন তিনি তুলে ধরেন। শাহ সাহেবের ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র ও প্রধান খলিফা শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১২৩৯ হিঃ/ ১৮২৪ খ্রিঃ)-এর মাধ্যমে পিতার শিক্ষা আন্দোলন ও সংস্কার কর্মসূচীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। তাঁর সময়ে পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সংস্কার আন্দোলনের আরও ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে, যা ছিল শাহ আব্দুল আযিয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র জীবনপণ প্রচেষ্টার ফসল। তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ'র সংস্কার আন্দোলনের বাস্তব রূপ দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায়ই তা জিহাদ আন্দোলনে রূপ নেয়। তিনি তাঁর ছাত্র এবং খলিফা সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (শাহাদাত: ১৭ জিলকাদাহ ১২৪৬ হিঃ/৬ মে ১৮৩০ খ্রিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্যে গড়ে তুলেন। শাহ সাহেবের নির্দেশে সায়্যিদ সাহেব পাঠান সর্দার আমীর খাঁনের সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়ে সশস্ত্র জিহাদের নেতৃত্বের জন্যে নিজেকে তৈরী করেন।

মুরশিদ ও রাহবার শাহ আব্দুল আযিয দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র নির্দেশনায় সিপাহসালার সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র হাতে মুজাহিদ বাহিনী জিহাদের শপথ গ্রহণ করেন। এই বাহিনীতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ'র খান্দানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও ছিলেন। মুহাদ্দিস শাহ ইসমাইল দেহলভী নায়েবে আমীর ছিলেন এই বাহিনীর। শাহ আব্দুল আযিয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র ইন্তেকালের পর সংস্কার ও জিহাদ আন্দোলনের রাহবার ও আমীর সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র নেতৃত্বে এই বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। ১৮৩০ সনের বালাকোট যুদ্ধের ফলাফল তো সকলেরই জানা আছে। মুজাহিদ বাহিনীর বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে শাহ

ওয়ালীউল্লাহ ও শাহ আব্দুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র আদর্শিক সংস্কার আন্দোলন যা সায়্যিদ আহমদ শহীদের হাতে 'তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া' নামে চূড়ান্ত রূপ পায় এবং হিন্দুস্তানের মাটিতে ইসলামী খেলাফতের সূর্য উঁকি দিতেই নিকষ অন্ধকার মেঘ যেন তা ঢেকে ফেলে। অপর দিকে ইংরেজদের দ্বারা এই আন্দোলনের সূতিকাগার মাদরাসা-ই রহিমিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রকৃত অর্থে বালাকোটে ইমাম সায়্যিদ আহমদ শহীদ ব্যর্থ হননি, ইমাম শাহ আব্দুল আযীযের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার ফসলও ব্যর্থ হয়ে যায়নি। আমীরুল মু'মিনীন ও তাঁর সাথীগণের শাহাদত লাভ ছিল উপমহাদেশে ইসলামী খেলাফত কায়েমের প্রথম কোরবানি। হিন্দুস্তানে ইংরেজ দখলদারিত্বের অবসানের প্রথম প্রচেষ্টা বালাকোটের জানবাজ মুজাহিদগণই করেন। তাঁরাই অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম মুক্তিবাহিনী। উপমহাদেশে ইসলামী খেলাফত কায়েমের প্রচেষ্টাকারী এঁরাই প্রথম মুজাহিদীন। ইমাম সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী-ই উপমহাদেশে সংক্ষিপ্ত সময়ের খেলাফত কায়েমকারী প্রথম সিপাহসালার ও আমীরুল মু'মিনীন। ইংরেজ বাহিনী বালাকোটে সরাসরি মুজাহিদীনদের মুখোমখি হয়নি, কিন্তু তাদের অনুগত ও ভাড়াটে শিখবাহিনী এবং এদেশীয় দোসর সামন্ত-সর্দার শ্রেণির গাদ্দারেরা তাদের হয়েই কাজ করেছিল। মুজাহিদ বাহিনীর গাজীগণ বালাকোট ট্রাজেডির পর যদিও নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েন কিন্তু যেভাবে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুজাহিদগণ সায়্যিদ আহমদ শহীদের পতাকা তলে সমবেত হয়েছিলেন সেভাবেই তাঁরা কাশ্মীর থেকে বাংলা এবং আফগান থেকে আরাকান পর্যন্ত বুকে আদর্শিক বাণী ও বালাকোটের যখম নিয়ে নিজ নিজ আবাসে ফিরে গেলেন। হাদীয়ে বাংগাল মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন এই সকল গাজীদের একজন। বালাকোট বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে হিন্দুস্তানের মাটিতে ইসলামী খেলাফতের ভিত্তি স্থাপনের প্রয়াস স্তিমিত হয়ে গেলেও হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর মর্দেমুজাহিদ, মুনকারের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সিপাহসালার সায়্যিদ আহমদ শহীদের তা'লিম ও পয়গাম অব্যাহত ধারায় আলোকরশ্মির মতো যুগ-যামানার অন্ধকার তাড়াতে সচল ভূমিকা রেখেছে।

হাদীয়ে বাংগাল গাজীয়ে বালাকোট হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১২৯০ হিঃ /১৮৭৩ ঈসায়ী) তাঁর পুরা জীবন ইসলামের খেদমতে ব্যয় করেন। বাংলা ও আসামের মুসলমানদের তিনি কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা দিতে ওয়াজ-নসিহত, কিতাব রচনা ও তাসাউফের তা'লিম দিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করে বেড়ান। শহীদে বালাকোট সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া আন্দোলন যা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সূচীত সংস্কার আন্দোলনেরই চূড়ান্ত রূপ, গাজীয়ে বালাকোটের জীবনাচারে এই দুই ধারারই পরিস্ফুটন ঘটে। তাঁর সময়ে মুসলিম সমাজে শিক্ষাহীনতার দরুন ঢুকে পড়া শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি আমরণ তাবলীগ ও ইসলাহী

আন্দোলন চালিয়ে যান। এমনিভাবে উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বালাকোট রণের গাজীগণ দ্বীনের জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে ইলমী ও আ'মালী রেনেসাঁর ধারা অব্যাহত রাখেন। ইসলামের জন্যে আজকের বাংলাদেশের উর্বর যমিন, যেখানে লাখো দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও এ থেকে মুআল্লিম মাশায়েখ তৈরি হয়ে আলো ছড়িয়েছেন-ছড়াচ্ছেন, তা যে হাজারো আউলিয়াদের ত্যাগ এবং হাদীয়ে বাংগাল, গাজীয়ে বালাকোট হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর উত্তরসূরী মুবাল্লিগ, মুআল্লিমগণের কোরবানিরই ফসল, তা বললে অত্যুক্তি হবে না। হাদীয়ে যামান হযরত মাওলানা হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (রাহঃ), হযরত মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রাহঃ), হযরত মাওলানা আব্দুল বাতিন জৌনপুরী (রাহঃ), হযরত মাওলানা শাহ আবু ইউসুফ মোহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (রাহঃ), শায়খুল মাশাইখ শামসুল উলামা হযরত আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল লতীফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রাহঃ), বাহরুল উলুম উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন শায়খুল হাদীস আল্লামা মোহাম্মদ হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এবং বিশুদ্ধ তাসাউফপন্থী উপমহাদেশের উলামা-মাশায়েখ ও মুহাদ্দিসীন, শুহাদায়ে বালাকোট ও বালাকোট-গাজীদের ত্যাগ এবং চিন্তানায়ক ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী'র শিক্ষাবিপ্লব (ইলমী তাহরীক), সংস্কার আন্দোলন এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেরই ফসল; যাঁরা এই মহান রেনেসাঁর অগ্রযাত্রায় সম্পৃক্ত তো ছিলেনই, চলমান আদর্শিক জিহাদের অগ্রনায়ক হিসাবেও তাঁদের জীবন গৌরবোজ্জ্বল হয়ে আছে।

আদর্শিক বিপ্লবের ধারকঃ

عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو
کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی

জীবন ও জগতের সব বিষয়-আসয়ের সমাধানের জন্যে জ্ঞান বা ইলম কেবলমাত্র সহায়ক হতে পারে না। রূহের শক্তি ও বিশুদ্ধতাই হলো মানুষের আসল গুণ। এই গুণ অর্জনের জন্যে চোখের পানিতে জায়নামায ভেজাতে হয়। অসংখ্য নিদ্রাহীন রাতের পর, যে ভোরের আগমন হয়, এর চেয়ে উপভোগ্য ও শান্তিদায়ক প্রভাত আর কোনটি হতে পারে? আত্তার, রুমী, রাযী ও গাজালীর মতো মহাজ্ঞানীগণ রাতের পর রাত নিদ্রাহীন কান্নায় কাটিয়েছেন। মহান শক্তিমান আল্লাহর দয়া ভিক্ষার জন্যে অসহায় নিঃস্বের বেশে হাত তুলে চেয়েছেন। তাঁরা এক একজন আলোর পাহাড়ে পরিণত হয়েছেন; সহস্র অন্ধকার রাতের নিঃশব্দ যাতনার আগুনে পুড়েই তবে আলোকোজ্জ্বল হিরায় হয়েছেন তাঁরা পরিণত। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হাকীমুল উম্মত দার্শনিক আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কবিতায় এ কথাগুলোই বলতে চেয়েছেন। একজন 'শামসুল উলামা' ও একজন 'বাহরুল উ'লুম' সুদীর্ঘ সফর শেষে অসংখ্য রোদনভরা

রাতকে বিদায় জানিয়ে প্রত্যাশার সুর্যের মতোই জাতির সামনে উদয় হন। দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সুর্যোদয়ের শুভা-সৌন্দর্য এবং আলোর উদার বিস্তার প্রত্যক্ষ করেই থাকেন, কিন্তু দৃষ্টিহীনের কাছে হাজারো সূর্যোদয়ের কোন মূল্যই নেই। আলো ও অন্ধকারের তফাতটাই যাদের বোধগম্যের বাইরে থেকে যায়, তাদের পক্ষে দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্য বোঝা যে মুশকিলই হবে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে বিশুদ্ধ প্রচেষ্টা ও ত্যাগের জন্যে প্রস্তুতি ছাড়াই 'ইকামতে দ্বীনের' আন্দোলন কখনও সফল হবার নয়। ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী'র পথ ও পদ্ধতির অনুসারী দাবীদার হওয়া সহজ, কিন্তু প্রকৃত অর্থে দ্বীন কায়েমের লক্ষ্য অর্জনে নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে শুদ্ধতার বিচারে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন। ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও ইমাম শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী'র আদর্শিক বিপ্লব এবং এর প্রকৃত ধারক-উত্তরসূরী ইমাম ও মুআল্লিমগণকে অনুধাবন না করে যতই অন্তহীন প্রচেষ্টাই চলুক, লক্ষ্য হাসিলে তা ব্যর্থই হবে। এটা বুঝতে আমাদের চিন্তা ও গবেষণায় প্রচুর সময় ব্যয় করার কোন প্রয়োজনই পড়ে না যে, আঠারো শতকে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী সূচীত বুদ্ধিবৃত্তিক, বৈজ্ঞানিক ও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব সাম্প্রতিক কাল পর্যন্তও যে অব্যাহত আছে কারণ, এর মৌলিক ভিত্তি হলো - ১. কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসা অর্থাৎ দ্বীনি ইলমের সকল বিষয়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন (রুজু' ইলাল কুরআন); ২. আত্মশুদ্ধির ভেতর ও বাহিরের পবিত্রতা অর্জন (তাসাউফ-তাযকিয়ায়ে নফস); ৩. একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা); ৪. আল্লাহর বিধান কায়েমের জন্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা (জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ লি আ'লাই কালিমাতিল্লাহ)।

আমাদের সম্মানিত উস্তায বাহরুল উলুম আল্লামা মোহাম্মদ হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি- এর সাথে ইলমী, আদর্শিক ও আত্মিক সম্পর্কসূত্র হাসিলে ধন্য হয়েছিলেন। ইলমে হাদীস এবং ইলমে তাসাউফ এ দুই সূত্রেই তাঁর ঊর্ধ্বতন বুজুর্গ হলেন ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমাদের গৌরববোধ করতে এটুকুই যথেষ্ট যে, চিন্তানায়ক শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী'র শিক্ষা বিপ্লব ও আদর্শিক আন্দোলনের ইতিহাস পাঠক হিসাবেই শুধু নয়, ইতিহাসের চলমান ধারায় সংশ্লিষ্টতার সৌভাগ্যও হয়েছে আমাদের। কুরআন ও সুন্নাহর সংস্পর্শে উপমহাদেশের মুসলমানদের নিয়ে আসার তাগিদ থেকে ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ যে বিপ্লবের সূচনা করেন, তাঁর ইন্তেকালের ১৫০ বছর পর অবিভক্ত ভারতে জন্ম নেয়া আরেক মুজাদ্দিদে যামান যিনি কুরআনের হেফাজত ও মুসলমানদেরকে বিশুদ্ধ দ্বীনি আকিদার তা'লিম দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন; শায়খুল মাশাইখ শামসুল উলামা আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল লতীফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (জন্ম: ১৯১৩খ্রী, ওফাত: ২০০৮খ্রীঃ) ছিলেন ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ও ইমাম সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা'র উত্তরসূরী রাহনুমা। যিনি এক ক্রান্তিকালে মুসলমানদেরকে ঈমান বিধ্বংসী আক্বিদা থেকে এবং কালামুল্লাহ কুরআনের বিকৃতি রুধে বাংলার যমীনে আদর্শিক বিপ্লব সাধন করেছেন। ইসলাম এবং ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে যখনই যে ষড়যন্ত্র হয়েছে, সর্বশক্তি দিয়ে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন। মুনকারের বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার প্রচেষ্টা শহীদে বালাকোট ও গাজীয়ে বালাকোটের তেজোদীপ্ত সংগ্রাম ও ত্যাগের ইতিহাস জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বার বার। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অনন্য ভূমিকা এবং তরীকতের তা'লিম ও তারবিয়াতে দ্বীনের এক আলংকারিক ব্যাখ্যাকার হিসাবে জীবনভর তাঁর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা এটাই প্রমাণ করে যে, ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী সূচিত আদর্শিক বিপ্লবেরই চূড়ান্ত রূপ তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। এক শ্রেণির মানুষ তাঁকে নিজেদের প্রতিহিংসার লক্ষ্যক্ষেত্র ভাবতে শুরু করেছিলেন। আর তিনি এইসব মানুষের হিংসার শিকারও হয়েছিলেন। তাঁর ত্যাগ, ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং ক্ষমাশীল গুণের সৌন্দর্যের কাছে হিংসাপরায়ণতা, অসুন্দর ও কুৎসিত মানসিকতার পরাজয় ঘটেছিল। তাঁর পূর্বসূরী বুজুর্গ ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীও এমনিভাবে প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিলেন। তিনি সত্যের উপর ছিলেন অবিচল, নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে ছিলেন আপোষহীন, আল্লাহ ও রাসূলে কারীমের সন্তুষ্টির জন্যে কোন ত্যাগই তাঁর জীবনে কঠিন ছিল না।

চিন্তানায়ক, দার্শনিক, মুজাদ্দিদে যামান ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে উপমহাদেশের মুসলমানদের রূহানী সংযোগ স্থাপনের যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব আনজাম দিয়ে গেছেন, উত্তরসূরী উলামা-মাশায়েখ, ত্যাগী পুরুষগণ তা সচল ও সজীব রাখার কোশেশ থেকে কখনও অব্যাহতি নেননি। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শাসকদল মুসলিম লীগের দেশ পরিচালনার নীতির সাথে উলামা-মাশায়েখ একমত হতে পারেননি। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তানের ক্ষমতাশীনদের দ্বারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের কোন সম্ভাবনাই নেই। যে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সমর্থনে ১৯৪৫ সনে মূল সংগঠন 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' থেকে পৃথক হয়ে 'নিখিল ভারত জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' প্রতিষ্ঠা হয় (এটা উলামায়ে কেরামের ইজতেহাদ ছিল, উভয় পক্ষই সঠিক ছিলেন) এবং উলামা-মাশায়েখের এই সংগঠন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। পরবর্তীতে তাঁরা ইসলামী শাসন কায়েমের প্রশ্নে মুসলিম লীগের কাছ থেকে পুরোপুরিই নিরাশ হন। ১৯৫২ সনে উলামা-মাশায়েখের এই সংগঠন মুসলিম লীগের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক হয়ে পাকিস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে 'নেজামে ইসলাম পার্টি' নামে নতুন দল গঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন মাওলানা আতাহার আলী রাহিমাহুল্লাহ এবং সেক্রেটারী মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন রাহিমাহুল্লাহ। শামসুল উলামা আল্লামা মোহাম্মদ

আব্দুল লতীফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ছিলেন অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় উলামা-মাশায়েখ যারা বিভিন্ন সময়ে ও পর্যায়ে নেজামে ইসলাম পার্টিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.), মাওলানা জফর আহমদ উসমানী (রহ.), মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী (রহ.), পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহ.), মাওলানা মোহাম্মদ আশরাফ আলী (রহ.) এবং মাওলানা এডভোকেট আব্দুর রকীব প্রমুখ। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের শরিক নেজামে ইসলাম পার্টির ৩৬ জন এমপি বিজয়ী হন। ১৯৭০ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে হযরত ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ'র খলিফা এবং স্নেহধন্য আলেমেদ্বীন শায়খুল হাদীস আল্লামা মোহাম্মদ হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ-কে নেজামে ইসলাম মনোনীত প্রার্থী করা হয়। তৎকালীন সিলেট ৭ আসনে (জকিগনজ - কানাইঘাট - বিয়ানীবাজার) তিনি বই প্রতিক নিয়ে নির্বাচন করেন।

আদর্শ সমাজ যা আদর্শ রাষ্ট্রেরই বুনিয়াদ। বাংলাদেশ আনজুমানে আল-ইসলাহ গঠন, তাঁর পীর-মুরশিদের বিপ্লবিক চিন্তারই ফসল। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। মুজাদ্দিদে যামানের শিক্ষা বিপ্লবেও ছিল তাঁর অনন্য ভূমিকা। 'আনজুমানে মাদারিসে আরাবিয়াহ'র বাংলাদেশের আলিয়া মাদরাসা কেন্দ্রিক প্রাচীন সংগঠনের একটি। এই সংগঠনের প্রথম এবং দীর্ঘ দিনের সভাপতি ছিলেন তিনি। বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া, ছাত্র-তালাবাদের সংগঠন, যা সময়ের উপযোগিতায় শামসুল উলামা রাহিমাহুল্লাহ'র সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল। আদর্শ সমাজের প্রথম ভিত্তি শিক্ষার্থীদের দিয়েই শুরু হয়। সুশিক্ষিত আদর্শ নাগরিক সমাজ হলো কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রথম ধাপ। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ-কে অন্যতম উপদেষ্টা হিসাবে পেয়ে এসেছে। ১৯৯৬ সনে বাংলাদেশ আনজুমানে আল-ইসলাহ মনোনীত ও সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের প্রার্থী হিসাবে সিলেট-৫ আসনে তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন। এই নির্বাচনে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ'র সন্তান আনজুমানে আল-ইসলাহ'র তৎকালীন মহাসচিব মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলীসহ আল-ইসলাহ মনোনীত মোট পাঁচজন প্রার্থী ছিলেন। এই সকল প্রচেষ্টা নিছক ক্ষমতায় যাওয় বা সরকারের অংশ হওয়া যে উদ্দেশ্য ছিল না, এটা বুঝতে কারোরই খুব বেশি অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বালাকোট পরবর্তী সংগ্রাম, প্রচেষ্টা বা আন্দোলন পরিবর্তিত সময়ের উপযোগিতার প্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছিল। সবক'টি আন্দোলনই যে সঠিক ছিল, এমন নয়। উপমহাদেশের উলামায়েদ্বীন, পীর-মাশায়েখ এবং তাঁদের অনুসারী সমাজের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফল-ফসলও যে কখনও ফলেছে, তা দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছে এবং করছে।

শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মুরশিদের নির্দেশেই জীবনের একটি বিশেষ সময় (১৯৭৭-১৯৮১)অভিজ্ঞতা অর্জনে ব্যয় করেছিলেন। আরব আমিরাতের প্রধান বিচারপতির সহযোগী হিসাবে বিচার কার্যে হানাফী শাখার বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন তিনি। জাতীয় ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আবার দেশে ফিরে এসে তাঁর মুরশিদ কিবলাহর শিক্ষাবিপ্লব ও আদর্শিক আন্দোলনে শরীক হন। দীর্ঘদিন তিনি দারুল হাদীস ইছামতি আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও সৎপুর দারুল হাদীসে প্রধান শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন। সুদীর্ঘ এই পথ চলায় জীবনের সকল সফলতা ও দয়াময়ের কল্যাণ হাসিলের কারণ হিসাবে তাঁর পূর্বসূরী বুজুর্গ ও উস্তাযগণের দোয়া'র কথা তিনি প্রায়ই স্মরণ করতেন।

ইতিহাসের কিছু অধ্যায় ফিরে দেখলে, আমাদের জাতীয় জীবনের গতি-প্রকৃতি এবং শুদ্ধাচার ও কল্যাণকর নীতি-আদর্শের মুআল্লিমগণের উত্তরসূরীদের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতার বিষয়টি স্পষ্ট না হয়ে পারে না। যে মাঠ নির্মিত হয়ে আছে, সে পথের লক্ষ্য-সীমা নির্ধারিত হয়েই আছে, শেষ মানযিলে পৌঁছার দায়িত্ব তো যাত্রীদেরই নিতে হবে। ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপমহাদেশের মুসলমানদের খোলাফায়ে রাশেদীনের পথে ফিরিয়ে নেয়ার যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর যোগ্যতর উত্তরসূরীগণ আদর্শিক বিপ্লব পরিচালনায় যে বিশ্বাস ও বিস্বস্ততার নযির স্থাপন করেছিলেন, পতনোন্মুখ মোগল শাসনের পর উপমহাদেশে ইমামের পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হত, যদি না এখানে ইংরেজ পরাশক্তির আবির্ভাব না হতো। উপমহাদেশের পরবর্তী ইতিহাস, ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি, আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের রক্তঝরা প্রচেষ্টা সব কিছুতেই আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গ ও মুআল্লিমেদ্বীনগণের অবদান জড়িয়ে আছে। বাহরুল উলুম, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন, শায়খুল হাদীস আল্লামা মোহাম্মদ হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন এই আদর্শিক বিপ্লবেরই ধারক, এক বিশ্বস্ত মুআল্লিমে যামান।

কখনো হৃদয়-মনের প্রশান্তির জন্যে আলোর মানুষদের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না। তাঁদের স্মৃতি, তাঁদের মহৎ কর্মশীলতা, তাঁদের উদার ও অকৃত্রিম জীবনবোধের সৌন্দর্যের কাছে কল্পনায় ফিরে যাবার মাঝেও অকৃত্রিম সুখের ছোঁয়া মিলে। জ্ঞানী- পুরুষদের কর্ম বিশালতা এবং তাঁদের সফল জীবনের উদাহরণ পরবর্তীদের জ্ঞান-পিপাষায় সহায়কই হয়ে থাকে। আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের কবিতা তাই বার বার পড়ি, অতীতের স্মৃতিময় দিনগুলোয় ফিরে যাই।

یادِ ایام سلف سے دل کو تڑپاتا ہوں میں
بہر تسکیں تیری جانب دوڑتا آتا ہوں میں
تو کہاں ہے اے کلیمِ ذروۂ سینائے علم

اب کہاں وہ شوقِ رہ پیمائِ صحرائے علم

“অতীতের স্মৃতিময় দিনগুলোর স্মরণে হৃদয় আমার ব্যথিত হয়,
প্রশান্তির খোঁজে ফিরে ফিরে আসি (হে প্রিয় উস্তায),
তোমার স্মৃতির অঙ্গণে;
হে জ্ঞানের সিনাই পাহাড়! আপনি আজ কোথায়?
জ্ঞানের মরুভূমির প্রতিটি ধুলিকণা গুণে ফেলার শখ ই-বা আজ কোথায়?”

তথ্যসূত্র:

১. معرفة علوم الحديث، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري
২. المعجم الأوسط، المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٠٦٢ - ٠٦٣ هـ)
৩. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبَدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (ت ٤٥٣ هـ)
٤. منتخب التواريخ ، ملاّ عبد القادر بدایونی
৫.. دهلی کی قدیم مدارس اور مدرس: ص-٩١١
٦. الواح الصنادير، ص: ٣٤-٢٤
৭. شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک، عبید اللہ سیندی
৮. سیرت سید احمد شہید، سید علی حسن ندوی
৯. نالۂ فراق، بانگ درا، علامہ محمد اقبال
০১. بال جبریل، علامہ محمد اقبال
১১. التحفة اللطيفة في الأحاديث المسلسلة المنيفة، شيخ الحديث علامة محمد حبيب الرحمن رحمه الله
১২. বাংলার আলেম সংসদ সদস্য, একাত্তর প্রকাশনী।

লেখক: শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ-এর ছাত্র, চেয়ারম্যান, ইসলামিক রিসার্স এন্ড দা'ওয়াহ কাউন্সিল ইউকে, ফাউন্ডার, তানযীমুস সুন্নাহ ফাউন্ডেশন ইউকে।

হারিয়ে খুঁজি তাঁরে

মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী

জাতি হিসেবে আমরা মরনত্তোর স্মরণ কিংবা সম্মাননা প্রদানে খুবই পটু। যখন যে নিয়ামত আমাদের নাগালের মধ্যে থাকে তার মূল্যায়ন করতে জানি না। কিন্তু যখন হাতছাড়া হয়ে যায় তখন আফসোসের শেষ থাকে না। কথাটি এ জন্যই শুরুতে উল্লেখ করলাম, হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেবের ইন্তেকালের পর সব সময় মনে আসে আমরা এমন একজন ব্যক্তিত্বকে পেয়েও যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারি নি। তাঁর কাছ থেকে আমাদের যা নেয়ার ছিলো তার সামন্যটুকু অংশও আমারা নিতে পারিনি। এই ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে বেড়াতে হবে চিরকাল। কোন দিনও সে আফসোস শেষ হবে না।

ছোট বেলা দেখতাম আমাদের ফ্যামেলির কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আমাদের বাবা চাচাদের সাথে আরো একজন ব্যক্তির সক্রিয় উপস্থিতি। তখন মনে হতো আমাদের তিনি কোন চাচা। নাম জানতাম মুহাদ্দিস ছাহেব।

উল্লেখ্য যে, সে সময় মুহাদ্দিস ছাহেব নামে দুইজন ব্যক্তিকেই চিনতাম। তখন মনে হত এগুলো হয়তো উনাদের নাম। একজন শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব এবং অন্যজন শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল জব্বার ছাহেব রাহিমাহুমাল্লাহ।

হজ্জের সফর

জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সফরে একজন সৌভাগ্যবান মানুষ হিসেবে আমি হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের সফর সঙ্গী হয়েছিলাম। সে বছর হজ্জের সফরে হযরত বড় ছাহেব কিবলাহ, মুফতি ছাহেব চাচা ও প্রিন্সিপাল চাচার সাথে আমারও যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল (প্রিন্সিপাল চাচার প্রস্তাবে দাদা ছাহেব আমার হজ্জে যাওয়ার সকল খরচ দিয়েছিলেন)। একই রুমে থাকার সুবাদে হুজুরের সাথে তখন সহজে মেশার সুযোগ হয়েছিল। তখনকার হুজুরের একটি আদেশ এ জীবনে কখনো ভুলব না ইনশাআল্লাহ। আমার একটি বদঅভ্যাস হলো সবকাজ বাম হাতে করা। সেদিন আমরা সকলে একসাথে দুপুরের খাবার খাচ্ছি, তখন অভ্যাসবশত আমি যখন বাম হাতে পানির গ্লাস তুলেছি তখন হুজুর আমাকে উদ্দেশ্য করে শুধু বলেন "চাচা", এরপর থেকে যখনি বাম হাতে কোন কাজ করতে যাই তখনই "চাচা" শব্দটি শুনতে পাই। এধরণের অজস্র ঘটনা অনেকের সাথে আছে, যার ধারা মানুষের জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিটি সুন্নাত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন যেন তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। সময়ানুবর্তিতা, উত্তম ব্যবহার এগুলো যেনো তাঁর সহজাত

প্রবৃত্তি।

হজ্জের সফরে বিদায়ী তওয়াফের সময় প্রিন্সিপাল চাচা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর, আমি এবং হুজুরের সফর সঙ্গী হাফিয তাজুল ইসলামকে নিয়ে বের হয়েছিলেন। কিন্তু তাওয়াফের প্রথম চক্করের পর উনাদেরকে আমরা হারিয়ে ফেলি। তখন হুজুরের হাত ধরে আমি বাকী তাওয়াফ শেষ করি। তাওয়াফ শেষে হুজুর আমাকে একটু দূরে নিয়ে যান এবং নামায শেষে আবেগঘন দোয়া করেন। এটা ছিলো আমার জীবনের একটি স্মরণী সময়।

মিশর সফর

২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে হুজুরের সাথে মিশর সফরের সুযোগ হয়। তখন বৃটেন থেকে আমরা পঞ্চাশ জনের বেশি মানুষ হুজুরের সাথে মিশর সফরের সুযোগ গ্রহন করি। আলহামদুলিল্লাহ ! সফরটি অনেক ফলপ্রসু ও আন্দদায়ক ছিলো। সফরে একজন প্রকৃত রাহবারের উতকৃষ্ট আচরণ আমাদের সকলকে অভিভূত করেছিল। এই সফরে হুজুর কায়রো শহরে সাহাবী হযরত উকবা ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাযার প্রাঙ্গন, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ এর মাযার প্রাঙ্গন এবং আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে বসে আমাদেরকে হাদীস শরীফের দারস প্রদান করেন। ইসকান্দারিয়া শহরে ইমাম বুসিরী রাহিমাহুল্লাহ এর মাযারের পাশে বসে সবাইকে নিয়ে কাসিদায়ে বুরদা শরীফের খতম করেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান খুব আগ্রহের সাথে সকলকে নিয়ে সফর করেন এবং সে জায়গার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বর্ণনা করেন। এতে ইসলামের ইতিহাসের অনেক অজানা বিষয় আমরা জানতে পারি।

এই সফরে হুজুরের সময়ানুবর্তিতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা সকল সফর সঙ্গীর কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

মুর্শিদের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর একজন প্রথম সারির খলিফা হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মুর্শিদের প্রতি সম্মান ও আন্তরিকতা তাঁর সকল কাজের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ করে আমরা যারা হযরত ছাহেব কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির সন্তান/ নাতি

আছি তিনি এত বড় একজন মানুষ হয়েও আমাদের প্রতি যে সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শন করতেন তা অনেক সময় আমাদেরকে লজ্জায় ফেলে দিতো। আমরা বিশ্বাস করি মুর্শিদের প্রতি সম্মান থেকেই উনি আমাদের সাথে এধরণের আচরণ করতেন। আল্লাহপাক উনাকে আখেরাতের জীবনে উত্তম বদলা দান করুন, সাথে সাথে আমাদেরকেও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফিক দান করুন।

মানুষের সাথে ব্যবহার

মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। যে কোন মানুষ একবার কাছে যাওয়ার সুযোগ পেলে হুজুরের মাধুর্যপূর্ণ কথাবার্তা ও বিনীত আচরণ দেখে বিমুগ্ধ হয়ে যেতো। শত ব্যস্থতার মাঝে সময়ে অসময়ে যখন কেউ উনার সাথে দেখা করতে গেছে তিনি তাকে সময় দিতেন, তার সাথে উত্তম আচরণ করতেন। তার কথা মন দিয়ে শুনতেন এবং অনেক জটিল সমস্যা খুব সহজভাবে সমাধান করে দিতেন। বিশেষ করে বৃটেন সফরে দেখেছি অনেকের পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা হুজুরের একান্ত প্রচেষ্টায় সমাধান হয়েছে। সে সকল ফ্যামেলি এখন সুন্দরভাবে সংসার জীবন অতিবাহিত করছে। আলহামদুলিল্লাহ!

ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক বিষয় এমন আছে যা লিখা যায় না, সব সময় স্মরণও হয় না। তবে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক সতর্কতা রক্ষা করা উচিত। কারণ এমন কোন কথা বলা যাবে না যাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো ভাবে যেনো হুজুরের সম্মান হানী হয়। তবে একটি কথা বলতে হয়, আমরা এমন একজন মনীষীকে এতো সহজে কাছে পেয়েও তাঁর যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে পারিনি। তাঁর কাছে থেকে যে ইলমি ফায়দা নেয়ার সুযোগ ছিলো তাও কাজে লাগাতে পারিনি। এটা আমাদের চরম ব্যর্থতা। এখন আমরা বক্তৃতা বিবৃতিতে কিংবা একে অন্যের সাথে যখন হুজুরের স্মৃতিচারণ করি তখন সকলের কথায় আফসোস শুনা যায়। এজন্য বলতে হয় হারিয়ে খুঁজি তাঁরে।

পরিশেষে আল্লাহ পাকের কাছে হুজুরের দারাজাত বুলন্দী কামনা করছি।

লেখক: প্রিন্সিপাল, দারুল হাদীস লতিফিয়া, লন্ডন। জেনারেল সেক্রেটারী, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সাথে আমার কিছু স্মৃতি

মাওলানা মুহাম্মদ ফরিদ ফরিদগঞ্জী

মানুষ পৃথিবীতে আসে যায়। কিন্তু মানুষের স্মৃতি থেকে যায়, সে স্মৃতি ভালো অথবা খারাপ। কিছু মানুষকে স্মরণ করা হয় অত্যন্ত ঘৃনার সাথে। আবার কিছু মানুষকে স্মরণ করা অত্যন্ত সম্মানের সাথে। কিছু মানুষ অনন্তকাল বেঁচে থাকে তাঁর কাজ ও অবদানে। ভক্তি ও সম্মানে মাথা নিচু করে শ্রদ্ধা জানানো হয় তাঁকে। আবার কিছু মানুষ আছেন যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। হাদীস শরীফে আছে

عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا أخبركم بخياركم قالوا : بلى ، يا رسول الله. قال: الذين رؤوا ذكر الله تعالى- الحديث مسند احمد (المكتبة الشاملة) ٦/٤٥٩

অর্থাৎ, হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে জানিয়ে দেবো না? সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ তা'লার কথা স্মরণ হয় তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। মুসনাদে আহমাদ।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ তেমনি একজন মানুষ ছিলেন। ১৩৫২ হিজরি মুতাবেক ১৯৩৪ ঈসায়ি সালে সিলেটের জকিগন্জ উপজেলার রারাই গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় নব্বই বছর জীবনকাল অতিবাহিত করে ২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার পরপারে পাড়ি জমান। তিনি জীবনের প্রায় ৬২ বছরব্যাপী ইলমে দ্বীন, বিশেষে করে হাদীসে নববীর দারস তাদরীসে সময় অতিবাহিত করেছেন। যারাই তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন,তাঁর চেহারার দিকে তাকালে আল্লাহর কথা স্মরণ হতো।

আমার জন্য খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো বহুবার মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। বারবার যাওয়া আসাতে তাঁর সাথে গড়ে উঠেছিল অকৃত্রিম সম্পর্ক ও হৃদ্যতা। তাঁর অমায়ীক আচরণ আমাকে যেমন বিমোহিত করেছে, অনুরূপ মুগ্ধও হয়েছি। এত বড় আলিমের আচরণ এত সাধারণ! এত অমায়ীক!! তাঁর কথাবার্তা অবাক করেছে আমাকে। ইলমী ব্যক্তিত্বের জবান থেকে ইলমী কথাবার্তা বের হবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু তিনি স্বাভাবিকতাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছেন। উপকৃত হয়েছি তাঁর ইলম থেকে। ধন্য হয়েছি তাঁর সনদ পেয়ে। নিজেকে সুরভিত করেছি তাঁর

অমায়ীক আচরণে। হৃদয়ের মনিকোঠায় তিনি আছেন, থাকবেন অনন্তকাল। আমার মোনাজাতে তাঁর কথা স্মরণ হলে নিজের ভেতর একটা আশা জেগে ওঠে - এ মোনাজাতটা বুঝি কবুল হবে।

তিনি ছিলেন আল্লাহর দরবারে একজন মাকবুল মুহাদ্দিস

আমি মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের নিকট ছাত্রদের নিয়ে সনদ নেয়ার জন্য দ্বিতীয়বার যখন গেলাম তখন তিনি বেশ অসুস্থ। পরিবারের লোকজনের কথায় তাঁর সাথে দেখা করার আশা অনেকটা ছেড়েই দিয়েছিলাম। তিনি ঠিক মত কথাও বলতে পারছিলেন না তখন। যখন তাঁকে জানানো হলো ঢাকা থেকে ফরিদগঞ্জী হুজুর দারুননাজাতের ছাত্রদের নিয়ে সাক্ষাত এবং সনদ নেয়ার জন্য এসেছেন। তখন তিনি আমাদের সাথে দেখা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আমরা এত দূর থেকে যে বাসনা নিয়ে এসেছি তা পূর্ণ না হলে মনে কষ্ট পাবো তাই তিনি আমাদের সাথে দেখা করবেন ।

ছাত্রদের নিয়ে সিলেট শহরে তাঁর মেজো জামাতার বাড়ির গেস্টরুমে সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি। তখন তিনি হাটতে পারেন না। পা শরীরের ভার সয়ে নেয়ার উপযোগীতা হারিয়েছে। হুইল চেয়ারে করে আনা হলো হযরাতকে। কী মধুর চেহারা তাঁর। নূরানী চেহারা থেকে যেনো ঠিকরে নূর বের হচ্ছে । জান্নাতী আভায় উদ্ভাসিত চেহারা আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেলো। তিনি খুব ক্ষীণ স্বরে আমাদের সাথে কুশল বিনিময় করলেন । মনে হচ্ছে তাঁর আওয়াজ ভেতর থেকে কেউ টেনে ধরেছে, বের হতে দিচ্ছে না।

আমরা সনদ নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তিনি হাদীসের দারস শুরু করলেন। আমরা সবাই অবাক হয়ে অপলকনেত্রে তাঁর চাঁদমাখা চেহারার দিকে হা করে তাকিয়ে আছি। কী দারাজ কণ্ঠ! কী স্পষ্ট কথা! কী বিশুদ্ধ উচ্চারণ!! আমরা তো রীতিমত অবাক। যে মানুষ একটু আগেও কথা বলতেই পারছেন না, অথচ দারস শুরু করা মাত্র পূর্ণ সুস্থ মানুষের মতো স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলছেন। হাত নেড়ে বুঝাচ্ছেন। প্রশ্ন করলে উত্তরও দিচ্ছেন। মনে হলো তিনি বুঝি কখনো অসুস্থ ছিলেন না। কেবল বার্ধক্যের কারণে একটু ন্যুব্জ হয়েছেন মাত্র। আল্লাহর মাকবুল বান্দাগণ বার্ধক্যের কারণে ভেঙ্গে পড়লেও দারস-তাদরীসের সময় এক ঐশী শক্তি ফিরে পান। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর এর বাস্তব উদাহরণ। সেদিন তিনি দীর্ঘ সময় দারস প্রদান করলেন। আমাদের সনদ দিলেন। আমাদের জন্য দুআ করলেন। আমরা তাঁর মাকবুল মোনাজাতে আমিন আমিন বললাম।

হাদীসে মুসালসাল এর দারস

মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় ফিকহুস সুনান ওয়াল আছার কিতাবে একটি মুসালসাল হাদীস সংকলন করেছেন। হাদীসটি হলো-

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الراحمون يرحمهم الرحمٰن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. (الترمذي)

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দয়াকারীদেরকে আল্লাহ মেহেরবান দয়া করেন। তোমরা জমিনবাসীদের প্রতি দয়া করো তাহলে আসমানবাসীও তোমাদের প্রতি রহম করবেন। (তিরমিযী)।

মূলতঃ উল্লিখিত মুসালসাল হাদীসটির সনদ নেয়ার জন্য আমরা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের খিদমতে গিয়েছিলাম। তিনি এ হাদীসটির দারস এবং সনদ প্রদান করলেন, সেই সাথে মুহাদ্দিসুল হিজায সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ সূত্রে আরো তিনটি মুসালসাল হাদীসের দারস ও সনদ দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন।

সনদ প্রদানের ইজাযাত

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সাথে আমার সম্পর্কটা অনেক মধুর ছিল। কয়েকবার যাওয়া আসা করায় তাঁর সাথে আমার যে হৃদ্যতা তৈরি হয়েছিল তা কখনো ভোলার নয়। তিনি আমাকে সিহাহ সিত্তাহসহ অন্যান্য কিতাবের সনদ দেয়ার পাশাপাশি তাঁর সূত্রে অন্যদের সনদ প্রদানের ইজাযাতও আমাকে দিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেন, আপনি আমার সনদে হাদীসের দারস প্রদান করতে পারবেন। আমি অতি নগন্য একজন মানুষ। যদিও অন্যকে সনদ প্রদানের দুঃসাহস আমার নেই, তবুও আমার প্রতি মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের হুসনে যন (সুধারণা) এবং স্নেহকে পরকালে নাজাতের উসিলা বিবেচনা করি। হয়তো আল্লাহ তা'লা এর উসিলায় আমাকে মাফ করবেন।

আমাদের ছাত্র যুবাইর ফিকহুস সুনান ওয়াল আছার কিতাবখানা মুখস্থ করেছে শোনে তিনি খুবই খুশি হলেন। তাকে একটি হাদীস শোনাতে বললেন, সে শোনালো। তিনি দুআ করে দিলেন। অনেক্ষণ আমাদের সাথে কথা বললেন। তাঁর কথাগুলো আজো আমার কানে সুরেলা ধ্বনির মতো বাজে। তাঁকে হারিয়ে আমরা শূন্যতায় ভোগছি। তাঁর মতো মানুষ আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে জাতি আরো অনেক উপকৃত হতে পারতো।

মেহমানদারী

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের মেহমানদারীতে আমি বরাবরই অভিভূত হয়েছি। একজন বয়োবৃদ্ধ মুহাদ্দিসের মেহমানদারী এতটা আন্তরিকতা ও জাঁকজমকপূর্ণ হতে পারে তা আমার কল্পনাতেও ছিল না। মেহমানদের জন্য আলাদা ব্যবস্থাপনা করে রাখতেন তিনি। অসুস্থ অবস্থায়ও বারবার আমাদের খোঁজখবর নিয়েছেন। একবার তো তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও হুইল চেয়ারে করে এসে সব ব্যবস্থাপনা ঠিক আছে কি না খোঁজ নিয়ে

গেছেন। রাজকীয় আইটেমের মেহমানদারী করাতেন তিনি। কোন দিক থেকে মেহমানের যেনো কষ্ট না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি যেমন ক্লাসে হাদীসের দারস প্রদান করতেন তেমনি জীবনাচরণেও হাদীসে নববীর বাস্তবায়ন করতেন। মেহমানদারীতে তাঁর কোন তুলনা হয় না। তিনি এক্ষেত্রে বিরল ছিলেন। মহান আল্লাহ যেনো জান্নাতে তাঁকে উত্তম মেহমানদারী করান।

ভাই বলে সম্বোধন করতেন আমাকে

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সাথে আমার হৃদ্যতার একটি উদাহরণ হলো- তিনি আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করতেন। আমার মতো নগন্য একজন সাধারণ মানুষকে তাঁর মতো এতো উচ্চ মর্যাদার আহলে ইলম এবং মহান মুহাদ্দিস ভাই বলে সম্বোধন করাটা অকল্পনীয় হলেও এটি ছিল তাঁর সুমহান আচরণের বহিঃপ্রকাশ। আমি সব সময়ই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম তাঁর দিকে - এতো উঁচু মর্যাদার মানুষের এতো অমায়ীক এতটা সাধারণ আচরণ!

তাঁর জবান থেকে যখন ভাই সম্বোধন শুনতাম- তাঁর প্রতি সম্মানে বিগলিত হয়ে যেতাম, চোখে পানি চলে আসতো। ভাবতাম- একজন মানুষ অন্য মানুষকে কতটা আপন করে নিলে নিজের পদ পদবী, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও ভাই বলে সম্বোধন করতে পারে!

তিনি ছিলেন একজন মাকবুল আলিমে দ্বীন

কোন ব্যক্তির ইলম থাকা এক বিষয় আর মাকবুলিয়াত ভিন্ন বিষয়। সাধারণতঃ কারো ইলম থাকার পরও কোন কারণে মাকবুলিয়াত নাও থাকতে পারে। কোন আলিম আল্লাহর দরবারে মাকবুল হওয়ার আলামত হলো তিনি সর্বত্র আহলে ইলমের কাছে গ্রহণযোগ্য ও পছন্দনীয় হবেন। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের জীবন নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে দেখা যায় তিনি দেশ কিংবা ভিন্ন কোন দেশে যখনই সফরে গিয়েছেন সবখানেই আহলে ইলমগণ তাঁর সাথে আগ্রহ সহকারে সাক্ষাত করেছেন। কেউ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে ইলমী ইস্তিফাদা হাসিল করেছেন। কেউ তাঁর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেছেন, কেউ তাঁর কাছ থেকে বরকতের জন্য সনদ গ্রহণ করেছেন। সর্বাবস্থায় তিনি আহলে ইলমের কাছে বরণীয় এবং সম্মানের পাত্র ছিলেন। এমন কি ভিন্ন মতের উলামার কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মান ছিল।

তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রিয়ভাজন অলি

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ছিলেন আল্লাহ তা'লার এক মহান অলি। আল্লাহর ইবাদাতে তাঁর খুলুসিয়াত এবং একাগ্রতা ছিল অতুলনীয়। প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি মহান মালিকের ইবাদাতে খুবই যত্নশীল ছিলেন। শত ব্যস্ততাও তাঁকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে গাফিল

রাখতে পারেনি। আল্লাহর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এতটাই ছিল যে, রাতে আরামের বিছানার চেয়ে নামাযের মুসাল্লা তাঁর বেশি পছন্দনীয় ছিল।

আল্লাহর অলিগণের পরিচয় সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رجل يا رسول الله من أولياء الله؟ قال: الذين إذا رؤوا ذُكر الله

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর অলি কারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় (তারাই আল্লাহর অলি)। (মুসনাদে বাযযার)।

উল্লিখিত হাদীসের আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর মহান আল্লাহর অলি ছিলেন। কারণ যারাই তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন একথা স্বীকার করবেন হুজুরের নূরানী চেহারার দিকে তাকালে মানুষের অন্তরে আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত হতো।

মাকবুল মুনাজাত

একবার কয়েকজন সফরসঙ্গীসহ মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সাথে দেখা করতে গেলাম। হুজুরের সাথে দীর্ঘ সময় কথাবার্তা বলে বিদায় বেলা মোনাজাতের আবদার করলাম। তিনি মোনাজাতে হাত উঠালেন। খুব সাধারণ ভাষায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাক্যে মোনাজাত করলেন। অথচ আমার মতো কঠিন হৃদয় ওয়ালা মানুষের চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। হৃদয়ের গহীনে পৌঁছলো তাঁর মোনাজাতের সিক্ততা। অশ্রুসিক্ত চোখে পুরো মোনাজাত জুড়ে আমিন আমিন বললাম।

একজন মানুষ আল্লাহর কাছে মাকবুল না হলে তাঁর সাদামাটা মোনাজাত এতটা হৃদয়গ্রাহী হয় না। সত্যি তিনি আল্লাহর একজন মাকবুল বান্দা ছিলেন। তাঁর আচার আচরণ, কথাবার্তা, চাল চলন সব কিছুতে নববী আদর্শের স্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান ছিল।

ইন্তেকাল ও জানাযা

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সোমবার সন্ধ্যায় তিনি ইন্তেকাল করেন। পরদিন ৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকাল তিনটায় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। মুহাদ্দিস ছাব নামে সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত এ মনীষীর জানাযায় সিলেটসহ সারা দেশের আলিম উলামা, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদসহ নানা শ্রেণি পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। কম হলেও পঞ্চাশ ষাট হাজার মানুষ তাঁর জানাযায় উপস্থিত ছিলেন । (এই সংখ্যা নিছক আনুমানিক। এরচেয়ে কম নয় বরং বেশি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল)। হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলা ফুলতলী এর উপস্থিতে তাঁর নির্দেশে জানাযায় ইমামতি করেন হুজুরের

বড় ছেলে দারুল হাদীস লতিফিয়া লণ্ডন এর সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল।

নাজাতের উসিলা হতে পারে মনে করে ঢাকা থেকে একদল ছাত্রসহ হুজুরের জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। আল্লাহ ওয়ালা মানুষের জানাযায় শরীক হওয়া মুক্তি প্রাপ্তির একটি উসিলা। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। প্রখ্যাত সূফি শায়খ বিশর হাফি রাহিমাহুল্লাহর জানাযার বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে একজন তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! আল্লাহ আপনার সাথে কি রকম আচরণ করেছেন? তিনি বলেন, আল্লাহ তা'লা আমাকে এবং আমার জানাযায় যারা উপস্থিত হয়েছিল সবাইকে মাফ করে দিয়েছেন।

আল্লাহর মাকবুল বান্দাগণের জানাযায় আল্লাহর অংশগ্রহণ করতে পারা সত্যি সৌভাগ্যের ব্যাপার। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ছিলেন একান্ত প্রিয় এবং মাকবুল বান্দা। তাই তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। এ উপস্থিতি নিজের নাজাতের উসিলা হবে বলে আশা করি।

লেখক: ভাইস প্রিন্সিপাল, দারুননাজাত মাদ্‌রাসা কিতাব বিভাগ, ঢাকা।

মানুষ গড়ার কারিগর আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ

হাফিজ মাওলানা মোঃ হেলাল উদ্দিন

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, আর শিক্ষকরা হলেন সেই মেরুদণ্ড গড়ার কারিগর। আদর্শ, নীতি - নৈতিকতা বোধ সম্পন্ন জাতি তৈরির জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষা। তাইতো সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, সকল নবী রাসূলগণ তাদের উম্মতদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আদর্শ মানুষরুপে গড়ে তুলেছেন।

বিশ্বনবী, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন -'আল্লাহ তা'লা ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝেই তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদের কে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ঠ।' (সুরা আল ইমরান, আয়াত ১৬৫)

শিক্ষা- আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার,আর শিক্ষক হলেন তার সুনিপুণ কারিগর। শিক্ষা ছাড়া আলোকিত মানুষ সৃষ্টি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। একজন শিক্ষকের দায়বদ্ধতা রয়েছে, সহকর্মীর কাছে,সমাজ দেশ ও জাতির কাছে, আগামি প্রজন্মের কাছে। সকল মানুষের কাছে আদর্শ শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষক হচ্ছেন সভ্যতার ধারক-বাহক। শিক্ষক শুধু শিক্ষাদানই করেন না, তিনি সফল ও ভালো মানুষ গড়ার কারিগর ও বটে।

যাকে উদ্দেশ্য করে লিখছি তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শায়খুল হাদীস, ত্বরীক্বতের রাহবার, শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব ক্বিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অন্যতম খলিফা, শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ শিক্ষক শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ; যিনি মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর নামে সর্ব মহলে পরিচিত। তিনি জীবনের সর্বাধিক সময় শিক্ষাদানে অতিবাহিত করেছেন। ছাত্র গড়া, শিক্ষক গড়া, সমাজ গড়ার দায়িত্বে তিনি ছিলেন অটল ও অবিচল।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

মুহাদ্দিস সাহেব যে সময় সিলেবাস ভিত্তিক অংশগুলো পড়াতেন শিক্ষার্থীদের মনে অনেক প্রশ্ন উকি ঝুকি দিত, কিন্ত দারস শেষ হলে দেখা যেত দারসের মধ্যে সেই প্রশ্নগুলোর সমাধান চলে আসত। আলোচনার শব্দ উপস্থাপন এতই শক্তিশালী ছিল- ছাত্রদের অমনোযোগী হওয়া তো দূরের কথা, সময় কীভাবে চলে যেত বুঝে উঠা কঠিন ছিল। বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের তারতম্য অনুসারে তিনি দারস প্রদান করতেন।

দারসে হাদীস

জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি দারসে হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর দারসে হাদীসে যারা অংশ নিয়েছেন, তারা বলতে পারবেন - হাদীস ওয়ালার ইশক ও মহব্বতে প্রাণে অসাধারণ স্পন্দন জাগ্রত হত। বিপরীতমুখি দুটি হাদীসের এত সুন্দর সমাধান দিতেন, যার তুলনা দেয়া কঠিন।

তাসাওফ শিক্ষা

তিনি যখন তরীকতের প্রশিক্ষণ দিতেন, তখন অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করতেন এবং অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাব ধারণ করতেন। বিভিন্ন শুগুলে এমনভাবে মশগুল হতেন যেন এ লোকালয় থেকে দূরে বহুদূরে চলে যেতেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি তাঁর পীর ও মুর্শীদের সাথেই বিভিন্ন চিলায় অংশ নিয়েছেন।

ছাত্রদের প্রতি মহব্বত

তিনি ছাত্রদের আপন সন্তানের চেয়ে অধিক মহব্বত করতেন। যার ফলে যে-ই তাঁর সাহচার্যে এসেছে সে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। ইলম-আমল এবং সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসারী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজার হাজার ছাত্র এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

তাফসীর ও বয়ান

তিনি যখন পবিত্র কুরআন শরীফের তাফসীর করতেন, অথবা বিভিন্ন মাহফিলে বয়ান করতেন- তখন মনে হতো সকল শ্রেণির মানুষের জন্য এটা একটি উন্মুক্ত শ্রেণি কক্ষ। অনেক জ্ঞান পিপাসুদের নোট লিখতে দেখা যেত। মাদ্‌রাসার ছাত্রদের জন্য আরবী ব্যাকরণের খুটিনাটি বিষয়ও বলে দিতেন।

আদব শিক্ষা

ইলম-আমলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আদব। কথাবার্তা, বক্তৃতা, ওয়াজ-নসিহত, শিক্ষাদান-চলাফেরা, সর্বত্র তাঁর আদব ও আখলাক ছিল অতুলনীয়। তাঁর ছাত্রসমাজও সেরূপ আদবে প্রশিক্ষিত ছিল। কথা বলার আদব সংক্রান্ত একটি উদাহরণ পেশ করছি, কোন এক বয়ানে একবার মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর বললেন, আমি কি আপনাদেরকে বিষয়টি বুঝাতে পেরেছি? এ কথার ব্যাখ্যা এরূপ যদি বলেন, আপনি কি বুঝেছেন? উত্তর যদি না হয় তাহলে দায় পড়ে শ্রোতার উপর। অর্থাৎ শ্রোতার বোধ শক্তি কম থাকায় তিনি বুঝতে পারেননি। পক্ষান্তরে বুঝাতে পেরেছি কি না। এ কথার দায় বক্তার উপর থাকে। যদি শ্রোতা বুঝতে না পারেন, তাহলে শ্রোতার দূর্বলতা নয়, বরং বক্তা বিষয়টি বুঝাতে পারেননি। মাহফিলে এ কথাটি শুনে একজন সাধারণ মানুষ বলেছিলেন, সুযোগ পেলে কথাবার্তার আদব শিক্ষার জন্য কিছুদিন হুজুরের সান্নিধ্যে থাকতাম।

লেখক তৈরি

তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে সর্বদা লেখালেখির প্রতি উৎসাহিত করতেন। বিভিন্ন ম্যাগাজিন এবং বিশেষ করে 'মাসিক শাহজালাল' এর মাধ্যমে তিনি অনেক প্রতিভাবান লেখক তৈরি করেছেন।

'তুহফাতুল হুফফাজ' এবং 'প্রশ্ন উত্তরে যাকাত' এ দুটি ছোট বই আমি অধম তাঁরই উৎসাহে লিখতে ও প্রকাশ করতে সক্ষম হই।

তিনি যেমন ছিলেন ছাত্র তৈরির কারিগর, তেমন শিক্ষক তৈরিরও কারিগর ছিলেন। কোন বক্তা কীভাবে আরও উপরে উঠবে, কোন শিক্ষক কীভাবে উচ্চস্তরে পৌঁছবেন সব সময় তিনি সে চেষ্টা করে যেতেন। হাজারো মৃত্তিকা খণ্ড তিনি স্বর্ণখণ্ডে পরিণত করেছেন।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক পৃথিবীর সেরা সম্পর্কের একটি। এজন্য শিক্ষার্থীকে হতে হয় বিনয়ী, আর শিক্ষককে হতে হয় মস্তবড় সুকৌশলী। মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর তাঁর স্নেহের চাদরে আবৃত করে ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করে রেখে গেছেন মানুষ গড়ার অসংখ্য শ্রেষ্ঠ কারিগর, যা সমাজ, দেশ, জাতি গঠনে ভূমিকা রাখবে কাল থেকে কালান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে।

লেখক: ইমাম ও খতীব, কিথলী জামে মসজিদ, ইউকে।

হাদীসে নববীর অনন্য ভাষ্যকার
শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহ মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে সৃষ্টি করলেও বাস্তবে কতজন মানুষ প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত হক আদায় করতে পারে? কতজন মানুষ আল্লাহর শোকরগুজার বান্দায় পরিণত হতে পারে? আল্লাহ তাআলার ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর শোকরগুজার বান্দার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সেই অল্পসংখ্যক বান্দাদের একজন ছিলেন শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ। তাঁকে তাঁর পরিচয়ে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার সামর্থ্য আমার নেই। তাই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণকে প্রাধান্য দিয়ে এ লেখা শুরু করছি।

শৈশব থেকেই আমরা তিনটি নাম-পরিচয়ের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত হই- ছাব, বড় ছাব ও মুহাদ্দিস ছাব। 'ছাব' বলতে শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.), 'বড় ছাব' বলতে মুরশিদে বরহক হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী আর 'মুহাদ্দিস ছাব' বলতে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। বড় ছাহেবকে শৈশবেই দেখেছি আমাদের বাড়িতে, গ্রামে-গঞ্জে অসহায় গরীব-দুঃখী মানুষের দুয়ারে দুয়ারে। শুকনো মৌসুম কিংবা বাদলা দিনে, রাত-বিরাতে, ঝড়-বৃষ্টিতে কাদামাখা পথে, বন্যার সময় মালবোঝাই নৌকাসমেত নিরবে-নিভৃতে গরীব-দুঃখীর দুয়ারে তাঁকে হাজির হতে দেখেছি। আমাদের কাছে তাঁর অন্যতম বড় পরিচয়- তিনি যুগের হাতেম তাঈ। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) কেও শৈশব থেকেই দেখেছি, বিছানায় শুয়ে শুয়ে আব্বার কাছ থেকে তাঁর মহত্ত্বের গল্প শুনেছি। আর যখন কুরআন শরীফ পড়া শুরু করি তখন থেকেই পরিচিত হতে শুরু করি তাঁর মহান জীবন ও কর্মের সাথে। মুহাদ্দিস ছাহেবের গল্পও শৈশবে বার বার আব্বার মুখে শুনেছি। তিনি আব্বার হাদীসের উস্তায ছিলেন। আব্বাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আব্বাও তাঁকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন হৃদয় দিয়ে। কিছুটা বড় হলে আমাদের ফুলতলী মাদরাসার জলসায় তাঁকে প্রথম দেখেছি, তাঁর বয়ান শুনেছি। কী এক আকর্ষণ তাঁর চোখে মুখে! কী মোহময় তাঁর ভাষা! ধীরে ধীরে তাঁর সাথে পরিচয় ও সম্পর্ক হয়। আব্বার পরিচয়ে তিনিও আমাকে মন থেকে ভালোবেসে নেন। তাঁর হাদীসের দারসে শরীক হয়ে আমিও তাঁর ছাত্র হবার সুযোগ লাভ করি। এটি আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের একটি বিষয়।

মনে পড়ে, ২০০৫ সালে হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর নাতি হযরত মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ও আমাদের উস্তায দারুল হাদীস লাতিফিয়া

ইউকে'র বর্তমান মুহাদ্দিস ছাহেব হযরত মাওলানা আশরাফুর রহমান (বিশ্বনাথী হুজুর) এর সাথে ইছামতি দারুল উলূম কামিল মাদরাসায় গিয়েছিলাম। দিন-ক্ষণ পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল। আমাদের তিনজনকে মুহাদ্দিস ছাহেব (র.) হাদীস শরীফের বিশেষ দারস প্রদান করেছিলেন। এ দারসে আমরা তাঁর নিকট থেকে আল হাদীসুল মুসালসাল বিল আউয়ালিয়্যাহ, মুসালসাল বিল মুহাব্বাহ, মুসালসাল বিল মুসাফাহা ও মুসালসাল বিল আসওয়াদাইন শুনেছিলাম। তাঁর সাথে বা-সনদ মুসাফাহার সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছিলাম। তিনি আমাদের খেজুর ও পানি দ্বারা আপ্যায়ন করিয়েছিলেন এবং তাঁর সকল সনদে সিহাহ সিত্তাহসহ সকল হাদীসের ইজাযত প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় তাঁর বিভিন্ন দারসে শরীক হয়েছি। সর্বশেষ ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে তিনি সিলেটে তাঁর মেজো জামাতার বাসায় অসুস্থ অবস্থায়ও বিশেষভাবে মুসালসাল হাদীসের একাধিক দারস প্রদান করেছিলেন। সেসময়ও তাঁর দারসে শরীক হয়েছি এবং ইজাযত লাভে ধন্য হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সিলেটের আলিম-উলামার অনেকেই কোনো না কোনোভাবে তাঁর ছাত্র কিংবা ছাত্রের ছাত্র ছিলেন। তবু তিনি সাধারণত তাদের নাম ধরে সম্বোধন করতেন না; বরং 'মাওলানা' বলে সম্বোধন করতেন। আমাকেও তিনি কখনো অনুরূপ সম্বোধন করতেন, কখনো 'খান ছাব' বলে সম্বোধন করতেন; কোনোদিন নাম ধরে সম্বোধন করেননি। তাঁর ইন্তেকালের কিছুদিন আগে সিলেটে তাঁর মেজো জামাতার বাসায় বুখারী শরীফের খতম হয়। তাঁর জামাতা আমাকে খতমে শরীক হওয়ার জন্য দাওয়াত করলে আমি অপারগতা প্রকাশ করি। তিনি তখন জানান মুহাদ্দিস ছাহেব নাকি আমার কথা বলেছেন। এ কথা শুনে আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যাই। খতমের পর আমার ছোট ভাই হাফিয মাওলানা আমিনুল হুদা খান মুহাদ্দিস ছাহেবের নিকট থেকে দুআ নেয়ার কথা বললে আমি তাকে নিয়ে যাই। তাকে আমার ছোট ভাই হিসাবে পরিচয় দিলে তিনি বলেন, "এই হাফিয ছাহেবকে তো চিনি। কিন্তু এই পরিচয় জানি না। আপনাদের ওয়ালিদ ছাহেব আমার কাছে পড়েছেন। আমার উপর আপনাদের দাবী আছে। আপনাদের উপরও আমার দাবী আছে। আমার জন্য খাস করে দুআ করবেন।" তাঁর এই কথা আমাকে বিশেষভাবে আবেগাপ্লুত করে। এরপর আমরা তাঁর নিকট খাস দুআর আরজ করে বিদায় নেই।

তিনি যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। ইলমে হাদীসে তাঁর পাণ্ডিত্য অতুলনীয়। তিনি সময়ের সেরা উলামা-মুহাদ্দিসীনের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি স্বীয় পীর ও মুরশিদ হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর নিকট থেকে ইলমে কিরাত, ইলমে হাদীস ও ইলমে তাসাওউফ অর্জন করেন এবং এ তিন শাস্ত্রের সনদ ও ইজাযত লাভ করেন। এছাড়া

দালাইলুল খায়রাত, আল হিযবুল আযম, আল হিসনুল হাসীনসহ বিভিন্ন ওযীফারও ইজাযত তিনি তাঁর নিকট থেকে লাভ করেন। হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) তাঁকে যেমন অপরিসীম স্নেহ করতেন তেমনি তিনিও ছাহেব কিবলাহ (র.) কে শ্রদ্ধা করতেন প্রাণভরে। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্কের নমুনা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রই অবলোকন করে থাকবেন। তিনি ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর মুরীদ ও খলীফা হওয়া স্বত্ত্বেও ছাহেব কিবলাহ (র.) তাঁকে 'মুহাদ্দিস ছাহেব' বলে সম্বোধন করতেন। ইলমী বিষয়াবলিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তিনিও কোনো বিষয়ে সন্দেহে নিপতিত হলে ছুটে আসতেন ছাহেব কিবলাহ (র.) এর কাছে। তাঁর ভাষ্য থেকে শুনেছি, অনেক সময় হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-কে বলার আগেই তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমাধান দিয়ে দিতেন।

তিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও শায়খুল হাদীস হওয়া স্বত্ত্বেও হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর সামনে নিজেকে অত্যন্ত ছোট করে উপস্থাপন করতেন। একান্ত পরিবেশে ছাহেব কিবলাহ (র.) এর পাশে চেয়ারে না বসে তাঁর সামনে মাটিতে বসতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। একবার ফুলতলী ছাহেব বাড়িতে ছাহেব কিবলাহ'র শয়নকক্ষে তিনি তাশরীফ নেন। ছাহেব কিবলাহ (র.) তখন বিছানায় বসা ছিলেন। মুহাদ্দিস ছাহেবকে চেয়ার এগিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি খাদিমকে নির্দেশ দেন। খাদিম চেয়ার এগিয়ে দিলেও তিনি তাতে না বসে মাটিতে বসে পড়েন। এটি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। মুরশিদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল এমনই। তিনি নিজেই বলেছেন, জীবদ্দশায় ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) যখন বাড়িতে থাকতেন তখন তিনি ছাহেব বাড়ির দিকে পা দিয়ে বসতেন না। আর ছাহেব কিবলাহ (র.) এর ইন্তেকালের পর তিনি কখনো সুস্থ ও সচেতন অবস্থায় ছাহেব বাড়ির দিকে পা দেননি। তাঁর বাড়ি 'রারাই' থেকে ফুলতলী ছাহেব বাড়ির অবস্থান উত্তর দিকে। ইন্তেকালের পূর্বে ভীষণ অসুস্থ অবস্থায় তাঁর সেবা ও চিকিৎসার সুবিধার্থে বাড়িতে তাঁকে যে কক্ষে রাখা হয়েছিল সেখানে উত্তর দিকে পা দিতে হতো। এ কারণে তিনি খুব বিব্রত বোধ করতেন। তাঁর মধ্যে প্রবল অনুশোচনা কাজ করত। আমরা তাঁর সাক্ষাতে গেলে তিনি নিজে তাঁর অনুশোচনার কথা ব্যক্ত করেন। আমাদের বিশ্বাস, মুরশিদের প্রতি তাঁর এমন শ্রদ্ধা ও নিরঙ্কুশ আনুগত্যের কারণেই তিনি তাঁর শীর্ষস্থানীয় ও অত্যন্ত প্রিয় খলীফা হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) ছাড়াও তিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ আরো অনেক উলামা-মুহাদ্দিসীনের সান্নিধ্য অর্জন ও তাঁদের নিকট থেকে সনদ লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাহরুল উলূম আল্লামা মুহাম্মদ হোসাইন সিলেটী, মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী, মুহাদ্দিসুল হিজায আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ বিন আলাভী মালিকী, গাছবাড়ি জামেউল উলূম কামিল মাদরাসার শায়খুল

হাদীস আল্লামা সাঈদ আলী, আল্লামা শফীকুল হক, আল্লামা ইদরীস আহমদ শিবনগরী, আল্লামা মুফতী আব্দুল গণী ও সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল ওয়াহিদ (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ। 'সুলতানুল উলামা' খ্যাত প্রখ্যাত ইয়ামানী বুযুর্গ শায়খ সায়্যিদ আল হাবীব সালিম বিন আব্দুল্লাহ শাতিরী (র.) তাঁকে হাদীস, তাফসীর, ফিকহসহ সকল বিষয়ের ইজাযত প্রদান করেছেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলার আল্লামা ড. মুহাম্মদ তাহির আল কাদিরী, শায়খ ড. সায়্যিদ ই'জায আল খতীব আদ দামিশকী, ফকীহুশ শাম শায়খ ড. আসআদ শাগিরজী ও সায়্যিদ আল হাবীব আসিম আদী ইয়াহইয়া এর নিকট থেকে তিনি সনদ ও ইজাযত গ্রহণ করেছেন। শেষোক্ত দুজন আবার তাঁর নিকট থেকেও সনদ গ্রহণ করেছেন। মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসে নববীর সিলসিলার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করাকে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় মনে করেন। এক্ষেত্রে নিজের থেকে বয়স ও যোগ্যতায় ছোট কারো নিকট থেকে সনদ গ্রহণেও তাঁরা দ্বিধাবোধ করেন না। আমাদের শিরতাজ মুহাদ্দিস ছাহেব (র.)ও এর ব্যতিক্রম করেননি। তিনি যাঁদের নিকট থেকে সনদ গ্রহণ করেছেন তাঁদের একাধিক ব্যক্তির চেয়ে তিনি বয়সে অগ্রজ ও যোগ্যতায় অগ্রগণ্য ছিলেন।

তিনি আপন জীবনের সিংহভাগই হাদীসে নববীর দারস-তাদরীসে অতিবাহিত করেছেন। ১৯৫৯ সালে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে হাদীস বিভাগে কামিল পাশ করার পর সে বছরই ইছামতি দারুল উলূম কামিল মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। সর্বশেষ আবার ইছামতি কামিল মাদরাসায় অধ্যক্ষ হিসাবে দীর্ঘকাল খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। মধ্যখানে কয়েক মাস ফুলবাড়ি আজিরিয়া সিনিয়র মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। দশ বছরের অধিককাল সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসাবে হাদীসে নববীর দারস প্রদান করেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত প্রায় চার বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রথমে উম্মুল কুওয়াইন শহরের একটি মসজিদে ইমাম ও খতীব, পরে উম্মুল কুওয়াইন কোর্টের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তিনি প্রায় তিন যুগ হাদীসের নববীর খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন। এর বাইরে বিভিন্ন মসজিদ, মাদরাসায়ও বিভিন্ন সময় দারস প্রদান করেছেন। ইন্তেকালের পূর্বে সপ্তাহে একদিন নিজ বাড়ির মসজিদে দারস প্রদান করতেন। এ হিসাবে তিনি অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল দারস-তাদরীসে কাটিয়েছেন। তাঁর দারস অত্যন্ত প্রাণবন্ত হতো। দীর্ঘক্ষণ দারস প্রদান করলেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো ক্লান্তি আসতো না। দারস প্রদানকালে তিনি হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেন। রাবী'র সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পাশাপাশি তাঁর সংশ্লিষ্ট বিশেষ কোনো ঘটনা থাকলে তা উল্লেখ করতেন। হাদীসের মধ্যে কোনো ফিকহী মাসআলা থাকলে তা আলোচনা করতেন। হাদীসে নববীর অনন্য ভাষ্যকার ছিলেন তিনি। শুধু হাদীস নয়; বরং তাফসীর, ফিকহসহ ইলমে দ্বীনের সকল বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রবাদতুল্য। এক কথায় বলতে

গেলে তিনি ছিলেন বাহরুল উলূম-জ্ঞানের সাগর। তাঁর দারসে যারা বসেছেন তাঁরা তাঁর সাগরতুল্য জ্ঞানের নমুনা নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ করেছেন।

দলমত নির্বিশেষে সকল ঘরানার আলিম-উলামা তাঁকে সম্মান-সমীহ করতেন। ইলমী নানা বিষয়ে সকলেই তাঁর দ্বারস্থ হতেন। এমনকি ভিন্ন ঘরানার অনেকে নিজ প্রতিষ্ঠানে তাঁকে দাওয়াত করতেন। তিনিও তাঁদের দাওয়াত কবূল করতেন। ছোটোখাটো ইখতেলাফকে প্রাধান্য না দিয়ে সকল ধারার আলিম-উলামার মধ্যে ঐক্য তিনি কামনা করতেন। তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সহজেই যে কাউকে আপন করে নিতেন। তিনি সবার সাথে মিশতেন, সাক্ষাতপ্রার্থী কাউকে দেখামাত্র হাসিমুখে সাদর অভিবাদন জানাতেন। ছোট-বড় সকলের উদ্দেশ্যে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতেন। কেউ মুসাফাহা না করে কদমবুসি করতে চাইলে ধমক দিতেন। বলতেন, মুসাফাহা সুন্নাত; আগে মুসাফাহা, পরে কদমবুসি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ অনুসরণের প্রতি তিনি সর্বদা তাকীদ দিতেন। নিজের কোনো কথা ও কাজ যেন সুন্নাহ'র খেলাফ না হয় সে বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। হুব্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য। বলতে গেলে তাঁর জীবন ছিল ইত্তেবায়ে রাসূল ও হুব্বে রাসূলের বাস্তব নমুনা। হাদীসের খিদমাতে তাঁর নিবেদিত হবার পিছনেও রয়েছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক ইশারা। হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইশারা পেয়ে তাঁকে সৎপুর দারুল হাদীসে মুহাদ্দিস হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর বয়ানে হুব্বে রাসূল ও আযমতে রাসূল সর্বদা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাশারিয়্যাত ও আযমত এবং রিসালত ও উবূদিয়্যাত এর হাকীকত তিনি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপন করতেন। কালিমায়ে শাহাদাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে তা উল্লেখ করে তিনি বলতেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু 'আবদ' তথা আল্লাহর বান্দা সেহেতু তিনি আল্লাহর সমান নন। তিনি মাখলুক। খালিক ও মাখলুক কখনো এক বরাবর হতে পারেন না। অন্যদিকে যেহেতু তিনি আল্লাহর রাসূল সেহেতু তিনি দশজনের মতো একজনও নন। তাই তাকে আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষের কাতারে গণ্য করা যাবে না। এ ধরনের তাত্ত্বিক বর্ণনার মাধ্যমে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা সুস্পষ্ট করে দিতেন।

তাঁর ভাষা ছিল অত্যন্ত মোহনীয়। তিনি কোনো আলোচনা পেশ করলে শ্রোতামণ্ডলী তন্ময় হয়ে সে আলোচনা শুনতো। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। কিন্তু আলোচনা পেশকালে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কখনো কখনো বজ্র-হুঙ্কার ছুড়তেন। ২০০৪

সালে হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর আহ্বানে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসা ময়দানে আন্তর্জাতিক শানে রিসালত মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কুয়েতের সাবেক মন্ত্রী আল্লামা সায়্যিদ ইউসুফ হাশিম রিফাঈ, আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলার ড. মুহাম্মদ তাহির আল কাদিরী, মিশরের আল আযহারের শায়খ ড. আবূ লায়লাসহ দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা বহু আলিম-উলামা সে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি ধর্মমন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত হজ্জ গাইডে হজ্জের পর করণীয় কাজের মধ্যে 'মসজিদে নববীর যিয়ারত' শিরোনামের অন্তরালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাওদ্বা শরীফ যিয়ারতকে গৌণ করে উপস্থাপন করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং এমন নব্য পরিভাষার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন। তাঁর সে বজ্র-হুঙ্কার এখনো কানে ভাসে। শুধু এ দিনই নয়; বরং সময়ে সময়ে ইসলাম, মুসলমান ও প্রকৃত ইসলামী আকীদার পক্ষে তিনি বজ্র-হুঙ্কার দিয়েছেন।

তিনি একজন সুলেখকও ছিলেন। দারস-তাদরীস, ওয়ায-নসীহতের পাশাপাশি তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখা, তাহকীক ও বিন্যাসে এ পর্যন্ত ১৮ টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখার বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে হাদীস ও আসার, সীরাত ও মীলাদ, তারীখ ও তারাজিম, ফাতাওয়া ও মাসাইল, মাসনুন দুআ ও ওযাইফ ইত্যাদি। তাঁর সম্পাদনায় 'মাসিক শাহজালাল' নামে একটি পত্রিকাও দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয়েছে। তিনি যেমন লেখালেখি করতেন তেমনি লেখার প্রতি অন্যদেরও উৎসাহিত করতেন। আমি যখন 'শবে বরাত' শিরোনামীয় আমার একটি বই তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলাম তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন, প্রাণভরে আমার জন্য দুআ করেছিলেন এবং লেখালেখি চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সৌদি আরবের সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের সাবেক প্রধান শায়খ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন হুমায়দ (র.) এর লিখিত ঈসালে সাওয়াব সংক্রান্ত একটি রিসালাহ অনুবাদ করে প্রকাশের পর সেটি যখন তাঁর হাতে তুলে দেই তখনো তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং আমাকে এ ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান (র.) যুগের শীর্ষস্থানীয় মহামনীষীদের অন্যতম ছিলেন। তাঁকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হলে যে যোগ্যতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন তা আমার নেই। আল্লাহ তাঁর মর্যাদাকে বুলন্দ করুন, জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন এবং তাঁর ইলমী ফায়য দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন। আমীন।

লেখক: মুহাদ্দিস, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল (এম.এ) মাদরাসা, জকিগন্জ, সিলেট। বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

ফুলতলি মসলকের শীর্ষস্থানীয় আলিম ইছামতির মুহাদ্দিস ছাহেব

আবদুল মুকিত মুখতার

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর'র নামের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৭৫ সালের দিকে। তখন দোয়াল্লিন ও জোয়াল্লিন দলাদলি নিয়ে আমাদের জগন্নাথপুর এলাকা উত্তপ্ত। গরম গরম ওয়াজ আর আলোচনা পর্যালোচনা চলছে সর্বত্র। কখনও ইকড়ছই মাদরাসা কেন্দ্রিক ওয়াজ মাহফিল। আবার কখনও সৈয়দপুরভিত্তিক জোয়াল্লিন সমর্থিত মাসআলা মাসায়েল।

জগন্নাথপুর বাজার এলাকায় থমথমে ভাব বিরাজ করছে। আমি তখন স্বরূপচন্দ্র হাইস্কুল থেকে মেট্রিক ফেল। বেকার আড্ডাবাজি করে বেড়াচ্ছি জগন্নাথপুর বাজারে।

উল্লিখিত থিম বা প্রাসঙ্গিক ইস্যু নিয়ে আমার কখনও কোন মাথাব্যথা নেই। এমনকি পর্যালোচনামূলক আগ্রহও নেই বিন্দুমাত্র। তারপরও টক অব দ্যা টাউন সাবজেক্টের আলোচনার এক পর্যায়ে এক ব্যক্তি বলে ছিলেন, 'ফুলতলি মসলকের শীর্ষস্থানীয় আলিম একজনই। তিনি হচ্ছেন ইছামতির মুহাদ্দিস ছাহেব'। বাক্যটি আমার হৃদয়ের খাতায় ব্রঞ্জের সিলমোহরের মতো গেঁথে যায়।

কেটে যায় দীর্ঘ যুগ। চলে আসি লন্ডনে। জীবন শুরু হয় এখান থেকে। আমরা তখন ইসলামি সমাচার এবং সাপ্তাহিক হিজরত প্রকাশ করতাম। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কাজ করেছি। অনেকে অবশ্য পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সাবজেক্ট উসকেও দিয়েছে। তবে উল্লিখিত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আমরা কখনও কলম ধরিনি। এসব হলুদ মানসিকতা আমাদের ছিল না। এখনও নেই।

২০০২ সাল। আমার বড় ছেলে তখন কিডারমিনস্টার কওমি মাদরাসায় অধ্যয়নরত। আঠারো পারা হিফজ করার পর হঠাৎ মাদরাসা ছেড়ে বাড়িতে চলে আসে। সে আর কোনোভাবেই মাদরাসায় যেতে রাজি নয়। শত চেষ্টা করেও তাকে মানানো যাচ্ছে না। বিষয়টি আমাকে দারুণভাবে মনকষ্ট দিচ্ছে। মাত্র আঠার বছরের ছেলে! লেখাপড়া করতে চায় না। এর চেয়ে পীড়াদায়ক ব্যাপার আর হতে পারে না। কী করবো চিন্তা করে কূল পাচ্ছি না। সব সময় মনের ভেতর এই জ্বালা। একই দুঃশ্চিন্তা। সহকর্মীরাও আমার চিন্তায় চিন্তিত।

এদিকে সাপ্তাহিক হিজরত অফিসে সর্বস্তরের আলিম-উলামার আনাগোনা। দেশ-বিদেশের শীর্ষস্থানীয় আলিম-উলামা আসা-যাওয়া করতেন নিয়মিত। পরিবেশটাও ছিল সেরকম। অনেকের চেহারার দিকে তাকালেই মনের ভেতর একপ্রকার আফসোস

অনুভব করতাম। হায়রে! আমার ছেলেটা যদি আলিম কিম্বা হাফিজ হয়ে যেত! তাহলে কত ভালো হতো! আমার মনস্তাপপ্রবণ মানসিকতা লক্ষ্য করে সহকর্মী মাওলানা জালাল উদ্দিন কালারুকি একদিন কানে কানে বললেন, মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ইদানিং লন্ডনে আছেন। আপনি চাইলে উনার কাছে দোয়া নিতে পারেন। হয়তো কাজ হয়ে যাবে। সাথে সাথে আমার মনে পড়ে গেল সেই উক্তিটি। প্রশ্ন করলাম, উনি কী ইছামতির মুহাদ্দিস ছাহেব? প্রশ্ন করেই নিজেকে হতোদ্যম লাগছিল যে, ইছামতি কী এবং কোথায়, তা তো আমি জানি না! এমনকি মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের পুরো নামটা পর্যন্ত তখনও আমার জানা হয়নি। মুখ খুলে বলতেও পারি না। সহকর্মীরা মনে মনে 'বোকা হাইভান'র তালিকায় আমার নাম লিখাবে হয়তো!

জী জী। উত্তর দিলেন মাওলানা জালাল উদ্দিন। আবার বললাম, আমি তো হজরত শায়খে কাতিয়ার মুরীদ। এ কথাটা আপনি কাউকে জানিয়েছেন? না হলে জানাবেন না। প্লিজ।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের ডায়রি চেক করে একদিন দুপুরে আমার বাসায় দাওয়াত করা হলো। হুজুর তখন পূর্ব লন্ডনের ওয়াটনি মার্কেটের দ্বিতীয় তলার একটি বাড়িতে অবস্থান করতেন। সময়মতো মাওলানা জালাল উদ্দিন হুজুরকে নিয়ে চলে এলেন বাসায়। আমাদের বাসা তখন পূর্ব লন্ডনের সীমান্তবর্তী পপলার এলাকায়।

আমার বড়ো ছেলে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে খাদিম করে খাওয়াচ্ছে। খাবার খেতে খেতে হুজুর তাকে প্রশ্ন করলেন- তোমার নাম কি। কোথায় লেখাপড়া করো।

-'মামুন' আমার নাম। মদিনাতুল উলূম আল ইসলামিয়া মাদরাসা, কিডারমিন্টার। বললো সে।

'এটাতো মাওলানা ইউসুফ মু'তালা সাহেবের মাদরাসা। তিনি তো হজরত ইউসুফ কান্দলভি রাহিমাহুল্লার ছাত্র। তাই না?' তারপর তিনি নিজেই বলতে লাগলেন, ইসলাম প্রচারে তাঁর অনেক অবদান। শুনেছি ডজনখানেক মাদরাসা মসজিদ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্বজুড়ে। কথাগুলো বলতে বলতে তিনি খাবার শেষ করলেন। তারপর দোয়া করলেন।

ঘর থেকে বিদায় নিতে নিতে মামুনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বড়ো গাছের ছায়াতলে থাকলে নিরাপদ থাকা যায়! একথাগুলো বুঝতে হলে লেখাপড়া করতে হবে, শিখতে হবে, জানতে হবে।'

হুজুরকে নিয়ে আমরা গাড়িতে উঠলাম। এইদিনই হুজুরের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সরাসরি কথা বলার সুযোগ হয়। চলন্ত গাড়িতে নিরিবিলি কথা বলা যায়। পথ যেতে যেতে হুজুরকে প্রশ্ন করলাম, পায়ে ধরে সালাম সম্পর্কে কিছু বলুন। বিষয়টা সম্পর্কে

আরও জানতে চাই। হুজুর তৎক্ষনাৎ কিছু বললেন না। তিনি এমনিতেই কম কথা বলেন। মিনিট খানেক অপেক্ষা করলেন। সম্ভবত আমার প্রশ্নের মোটিভ বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'পায়ে ধরে কোন সালাম নেই। এগুলো হারাম। সমাজে প্রচলিত পায়ে ধরে যা করা হয়, তা কদমবুসি। এটা মুসতাহাব'।

আমি আর এ ব্যাপারে মন্তব্য বা বাড়তি কোন প্রশ্ন সৃষ্টি করলাম না। সাংবাদিকেরা সাধারণত প্রশ্নের ভেতর প্রশ্নবিদ্ধ সুযোগ সৃষ্টি করে সাবজেক্টগুলোকে ঘোলাটে বানাতে পারে। আমি তা পারি না।

আমাদের গাড়ি থামল ওয়াটনি মার্কেটের সামনে। জনবহুল ব্যস্ত রাস্তা। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। মিনিটের বেশি দাঁড়ানোও বোআইনি। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে নামিয়ে দিলেন মাওলানা জালাল উদ্দিন। গাড়ি থেকে নেমেই তিনি হুজুরের কদমবুসি করলেন। তারপর হুজুরের সাথে করমর্দন বা মুসাফা করে বিদায় দিয়ে গাড়িতে এসে উঠলেন। ইতোমধ্যে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরও নিজের পথ ধরে চলে গেলেন। আমরাও গাড়ি ঘুরিয়ে অফিসের দিকে রওয়ানা করি।

২০০৫ সাল। বৈশ্বিক পরিবেশ দুস্তর বেকায়দা। ইতোমধ্যে ইসলামী সমাচার ও সাপ্তাহিক হিজরত দু'টোই বন্ধ হয়ে গেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও সঙ্গীন। ইসলাম ও মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। পর্যায়ক্রমে মুসলমানরাও ইসলামের শত্রুতে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে। মুনাফিকতায় ভরে গেছে সমস্ত মুসলিম বিশ্ব। আমরা তখন ইসলামী সমাচার অফিসে শুধু প্রেসের ব্যবসা করে দিনযাপন করি। অফিসে আর আগের মত উলামায়ে কেরামের পদচারণাও নেই। তেমন একটা ব্যস্ততাও নেই আমাদের।

মাওলানা জালালের ঐকান্তিক উৎসাহে শুরু হয় 'আমি কেনো মুসলমান' গ্রন্থ রচনার কাজ। কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রন্থখানা লেখা শেষ হয়ে যায়।

পাণ্ডুলিপি রেডি। আমার জীবনের প্রথম ইসলামী গবেষণামূলক গ্রন্থ। মনে মনে আবার ভীষণভাবে ভীত-সন্ত্রস্তও। আমি নিজে যেহেতু মাদরাসায় লেখাপড়া কিরিনি। আলিম নই। তাই ইল্‌মি ভুল হওয়া স্বাভাবিক। গ্রন্থে যদি কোন ভুল থেকে যায়, তাহলে সর্বনাশ। নিজের সুনাম কিম্বা দুর্নামের পরিবর্তে ক্ষতি হবে ইসলাম ও মুসলমানদের। প্রতিফল হিসেবে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে পড়ে থাকতে হবে সমস্ত জীবন। ইত্যাদি চিন্তা নিয়ে হন্যে হয়ে খুঁজছি প্রুফ রিডার। যিনি গ্রন্থখানা রিভিউ অর্থাৎ, বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনাও করে দেবেন নিজগুণে।

ঠিক এই সময় একদিন অফিসে এসেছিলেন জনৈক মাওলানা। তিনি কওমি লাইনের বিজ্ঞ আলিম। বৃটেনে তাঁর বিরাট নামডাক। তার বাসায় প্রচুর কিতাবাদিও দেখেছি।

তাকে বললাম আমার গ্রন্থের কথা। আমার কণ্ঠে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা শুনেই তিনি বলতে লাগলেন, 'এ বিষয়ে আপনি আর নতুন কী লিখবেন? আমি তো অনেক আগেই এ বিষয় নিয়ে লিখেছি। অবশ্য প্রকাশ করা হয়নি এখনও। তবে বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছি।' সাথে সাথে সহকর্মী মাওলানা জালাল উদ্দিন কালারুকির কটাক্ষময় দৃষ্টি আমার দিকে পড়লো। জনৈক বিজ্ঞ মাওলানা সাহেবের উক্তি ও মন্তব্য শুনে তাকে পাণ্ডুলিপি দেখানোর উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম।

শেষ পর্যন্ত মাওলানা জালালের কথায় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের দারস্থ হই। তিনি পাণ্ডুলিপি খানা হাতে নিয়েই একটা মুচকী হাসি দিলেন। গ্রন্থের মলাটে একটি চুমু দিলেন। তারপর বললেন, আমি তো আজ বাইরে চলে যাচ্ছি। ম্যানচেস্টার ইত্যাদি ঘুরে সপ্তাহ দেড়েক পরে ফিরব ইনশাআল্লাহ? উত্তরে বললাম- কোন সমস্যা নেই। আপনি একটিবার বইখানা পড়ে দেখুন। আমার কোন তাড়া নেই।

ওদিকে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বড়ো ছাহেবজাদা মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল হুজুরকে আমার উদ্দেশ্যের কথাটা জানিয়ে দিলেন।

ঠিক দুই সপ্তাহ পরে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সাথে দেখা করলাম। তিনি তখনও ওয়াটনি মার্কেটের সেই বাড়িতেই মেহমানদারিতে অবস্থান করছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, আপনার গ্রন্থ খানা আবার পড়তে চাই। ইতোমধ্যে দুইবার পড়া হয়েছে। তবে গভীর মনোযোগ দেয়া হয়নি। সাথে সাথে বললাম, ঠিক আছে হুজুর। কোন তাড়াহুড়ো নেই।

আরও প্রায় সপ্তাহখানেক পর মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল আমাকে টেলিফোন করে এক বাড়িতে দাওয়াত দিলেন। তিনি দিন তারিখ ও সময় জানিয়ে বললেন, আমরা আপনার গাড়িতে আব্বাকে নিয়ে ওখানে যাব।

আমিও সময়মতো গাড়ি নিয়ে হুজুরের বাসার নিচে উপস্থিত হলাম। মাওলানা হেলালের সাথে তিনি বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন। আমরা প্রায় কুড়ি মিনিটের মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছাই। যথাস্থানে গাড়ি পার্ক করে বাসায় ঢুকেই আমি রীতিমতো হতভম্ব।

বাসাটি মুফতি আব্দুল মুনতাকিম সাহেবের। এখানে দাওয়াতের ইন্তেজাম করেছেন তাঁর শ্বশুর মাওলানা কাজী আব্দুস সুবহান সাহেব। যিনি এক সময় সিলেট বন্দরবাজার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত হোসাইন আহমদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহর খলিফা মাওলানা আব্দুল গফফার শায়খে মামখানি রাহিমাহুল্লার জামাতা। ওদিকে মাদানী ছাহেবের আরেক খলিফা হজরত মাওলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী বদরপুরি সাহেবেরও তিনি খলিফা। দুইদিক থেকে তিনি কুতবে জামান হজরত হোসাইন আহমদ মাদানী

রাহিমাহুল্লাহর স্নেহধন্য। এদিকে তাবলীগ জামাতের সমর্থক ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের একনিষ্ঠ কর্মী। মতাদর্শগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও মসলকের ব্যক্তিত্ব।

বাসায় ঢুকতেই মাওলানা কাজী আব্দুস সুবহান সাহেব মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের হস্তবুচি করলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর আমার উস্তায। আমি তাঁর কাছে হাদীস পড়েছি। তারপর তিনি নিজ হাতে খাদিম করে খাওয়ালেন। আথিতেয়তা করলেন।

২০০৮/২০০৯ সালের দিকে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর দীর্ঘদিন লন্ডনে ছিলেন। হাদীসের দরস দিয়েছেন দারুল হাদীস লাতিফিয়া মাদরাসায়। মনমুগ্ধকর পরিবেশ। অপ্রকৃতিস্থের মতো উপস্থিত হতাম নিয়মিত। এই উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর থেকে দু'টি বিষয়ের উপর হাদীসের সনদপ্রাপ্ত হই। যেগুলোকে আমি আমার বেহেশতের সার্টিফিকেট মনে করি।

ইতোমধ্যে রচিত হয়েছে 'আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় জুমুআর খুতবা একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা' গ্রন্থ। ঠিক আগের সেই সংশয়। ইল্‌মি ভুল থাকার সম্ভাবনায় আমরা শঙ্কিত।

অনেকের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। 'খুতবা' শব্দটির অর্থ প্রচলিত 'বক্তব্য' নাকি 'ইবাদতমূলক বিশেষ বক্তব্য' সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি। সন্তুষ্টসূচক জবাব পাইনি। জনৈক মুফতির সাথে দীর্ঘ এক ঘণ্টা টেলিফোনে আলাপ-আলোচনা করেছি। বার বার তিনি আমার প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে বক বক করেছেন। সমাধান দিতে পারেননি।

২০১১ সালে স্বদেশ ভ্রমণ করি। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর তখন বাড়িতে অবস্থান করছেন। জগন্নাথপুর থেকে জকিগন্‌জ। অনেক দূরের পথ। তিনটি উদ্দেশ্যকে একত্র করে রওয়ানা দিলাম হুজুরের বাড়ির উদ্দেশ্যে। প্রথমত- মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করা। যেহেতু তিনি অসুস্থ। দ্বিতীয়ত- সদ্য প্রয়াত শায়খে ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহর কবর জিয়ারত। তৃতীয়ত- আমাদের রচিত গ্রন্থখানা হুজুরকে দেখানো এবং ইজাজত গ্রহণ করা।

দিনটি ছিল শুক্রবার। আমার সাথে ভাতিজা জাবেদ। সে তখন কাজির বাজার মাদরাসায় লেখাপড়া করে। ফুলতলী মসলকের সাথে তাদের বিরোধপূর্ণ মানসিকতা। ফজরের নামাজ আদায় করেই আমরা বাড়ি থেকে যাত্রা করি। সিলেট শহরে পৌঁছুতে সকাল দশটা বেজে যায়।

সিলেট থেকে জকিগন্‌জ যেতে দু'টো ভিন্ন রাস্তা। কোনটা দিয়ে যাব সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। এক ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা ফুলতলী গিয়ে জুম্মা পড়তে চাই। সদয় ড্রাইভার ফুলতলী সাহেবের নাম শুনতেই অন্য একটি গাড়ি দেখিয়ে বললেন, উনি ফুলতলীর পাশ দিয়ে জকিগন্‌জ যাবেন। আপনারা ঐ গাড়িতে চলে যান।

বিচক্ষণ ড্রাইভার। ঠিক বারোটায় পৌঁছে দিলেন আমাদের গন্তব্যে। গাড়ি থেকে নেমে একটা দোকানে সামান্য চা-নাস্তা খেলাম। তারপর টমটম গাড়িতে ফুলতলী পৌঁছুলাম। ফুলতলী সম্পর্কে অনেক সমালোচনা শুনেছি আজীবন। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে আমার চোখ দু'টো ছানাবড়া। সবচে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছি পুকুরের উত্তর-পূর্ব পার্শ্বের এতিমখানা ও ছাত্রাবাস দেখে। হাজার হাজার মানুষ ফ্রি থাকা খাওয়ার মাধ্যমে দিনযাপন ও বিদ্যার্জন করছে। সমস্ত এলাকা লোকে লোকারণ্য। ফুলতলী মাদরাসা ও মসজিদ কেন্দ্রিক বিশাল একটি টাউন মনে হলো।

আমরা প্রথমেই ফুলতলী সাহেবের কবর জিয়ারত করলাম। ইতোমধ্যে আজান শুরু হলো। মসজিদে ঢুকলাম। আমাদের পিছন পিছন ঢুকলেন মাওলানা হুছামউদ্দিন চৌধুরী (ছোট ছাহেবজাদা)। ইচ্ছে করেই আমি তাকে পাশ কেটে সরে পড়ি। সরাসরি দেখা হয়ে গেলেই আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে সন্দেহ নেই। ওদিকে মুহাদ্দিস ছাহেবের বাড়িতে যেতে দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া সাংবাদিকের দৃষ্টিতে ফুলতলীর বেমালুম দৃশ্যটা অবলোকন করতে চাই। নামাজ শেষ করে আমরা ফুলতলী থেকে বিদায় নিলাম।

মুহাদ্দিস ছাহেবের বাড়ি জকিগন্জের রারাই গ্রামে। এই কথাটা আমি জকিগন্জ টু সিলেট মহাসড়কের ফুলতলী পয়েন্টে গিয়ে জানতে পারি। একজন টমটম গাড়ির ড্রাইভার থেকে এটাও জানতে পারি যে, এক সময় তিনি ইছামতি মাদরাসায় মুহাদ্দিসের দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই থেকেই তিনি 'ইছামতির মুহাদ্দিস ছাহেব' নামে পরিচিত।

ফুলতলী থেকে রারাই যেতে পথিমধ্যে জকিগন্জ শহর। কুশিয়ারা নদীর তীরে সমস্ত এলাকা ভারত সীমান্তে অবস্থিত। নদীর ওপারে দেখা যায় ভারতীয় বিএসএফ জোয়ানদের চলাফেরা। অবশ্য বিজিবি'র কোন সদস্য আমাদের চোখে পড়েনি। হয়তো তারা অদৃশ্য স্থানে অবস্থান করছিলেন।

আমার সীমান্ত ভ্রমণের বড়ো শখ। একটু এগিয়ে গেলাম। নদী তীরের এক দোকানি বললেন, আপনারা অযথা সীমান্ত তীরে হাঁটাচলা করবেন না! মাঝেমধ্যে ওপার থেকে গুলি ছোড়া হয়। বোঝাও যায় না। শব্দও শোনা যায় না। কিন্তু ঘায়েল ব্যক্তি পড়ে থাকে এই পারে। এই সমস্যা ইদানিং একটু বেশি বেশি ঘটছে। দোকানির সতর্কতামূলক সংবাদ শুনে আতঙ্কিত হলাম। ফিরতি পথে কুশিয়ারা নদীর সীমান্তকূল উপভোগ করার উদ্দেশ্য আর বাস্তবায়ন হলো না।

আমরা স্থানীয় গাড়িতে উঠে চলে গেলাম রারাই। বাড়িতে পৌঁছতেই জানানো হলো যে, 'তিনি ভেতর বাড়িতে চলে গেছেন। আজ হয়তো দেখা করা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া হুজুরের শরীর কিছুটা অসুস্থ।'

তাহলে তো দেখা করতেই হবে! মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে বললাম, 'হুজুরকে বলুন আমরা

জগন্নাথপুর থেকে এসেছি। অন্তত কুশল বিনিময়ে করেই চলে যাব।' বার্তাবাহক আমাদেরকে টঙ্গি ঘরে বসিয়ে ভেতর বাড়িতে গিয়ে মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন হুজুরের বিশ্রামাগার ফটিকরুমে।

সারাদিনের মেহমানদারি ও দুপুরের ক্লান্ততা নিয়ে সবেমাত্র বিছিনায় শরীর লাগিয়েছেন। দরোজার সামনে আমাকে দেখেই যেন লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন। আমি সাথে সাথে হুজুরকে জড়িয়ে ধরলাম। আস্তে আস্তে বসালাম। বললেন, আপনি কোথা থেকে? দেশে কখন এলেন? ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন। অনেক কথা। হুজুরের পাশে বসা ছিলেন জনৈক হাফিজ সাহেব। তাকেও আমার পরিরচয় দিলেন।

এক পর্যায়ে আমার ভাতিজা জাবেদকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তিনি জাবেদকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কী করো? সে বললো, আমি কাজির বাজার মাদরাসায় লেখাপড়া করি। একথা শুনে তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলে তাকে দোয়া দিলেন। তারপর আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, জানেন, কাজির বাজারের মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব আমার কাছে লেখাপড়া করেছেন। মাধ্যমিক জীবনে তিনি আমার শিক্ষার্থী ছিলেন।

একথা শোনে জাবেদ রীতিমতো চমকে উঠলো। তার ধরাণা ছিল এরা দু'টো ভিন্ন মেরুর মাদরাসা প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে কিম্বা প্রচলিত রাজনীতির ময়দানে তারা প্রতিপক্ষ হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু মুরব্বিদের মাঝে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক তাকে শিহরণ লাগিয়ে দেয়। তারপর আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সে জানতে চাইল। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর জাবেদের সাথে খুশ গল্প করলেন। নসিহত করলেন।

ইতোমধ্যে হুজুরের ছোট ছাহেবজাদা আমাদের খাবার ঘরে ডাকলেন। আমি বিস্মিত হলাম। মাত্র দশ মিনিট হলো আমরা এসেছি। আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। এ সময়ে খাবার গ্রহণ করার উদ্দেশ্যও ছিল না। হুজুরের নির্দেশেই খেতে বাধ্য হই।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর আমাদের পাশে বসলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে দেখালাম পাণ্ডুলিপিখানা। 'আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় জুমুআর খুতবা একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা' গ্রন্থখানা একটি স্পর্শকাতর বিষয় এবং সঙ্গীন সময়ে রচিত। তাই হুজুরের ইজাজত পাওয়াটা অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি পাণ্ডুলিপিখানা হাতে নিয়ে নাকে লাগিয়ে শুকলেন। তারপর সাথে সাথে আমার হাতে দিয়ে ছাপাতে নির্দেশ করলেন। আমি থ হয়ে গেলাম।

ঐদিন মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের শরীর ভালো ছিল না, তবুও উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। আমরা চলে এলাম। জাবেদ চলে গেল তার মাদরাসায়। আমি উঠলাম শহরের বাসায়। পরেরদিন থেকেই গ্রন্থ প্রকাশের কাজ শুরু হলো। মাত্র সপ্তাহ দেড়েকের মধ্যেই প্রকাশিত হলো 'আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় জুমুআর খুতবা একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা' গ্রন্থ।

আমার পরিচিত অনেকেই জানেন আমি শায়খে কাতিয়ার মুরিদ। অথচ উল্লিখিত গ্রন্থখানা আমি উৎসর্গ করেছি ইছামতির মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের নামে। বিষয়টা অনেকের কাছে অযাচিত ঠেকেছে। কেউ কেউ কটাক্ষও করেছেন। হিংসুটের উক্তি এক কান দিয়ে ঢুকলেও অন্য কানে বেরিয়ে যায়।

২০১৮ সাল। দীর্ঘ ১৩ বছরের পরিশ্রমে রচিত হয়েছে 'ইসলাম ও আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা' গ্রন্থ। অনেকেই পাণ্ডুলিপি পড়েছেন। আমার ভাগ্য ভালো মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর তখন লন্ডনে ছিলেন। সুযোগ করে হুজুরের হাতে তুলে দিলাম পাণ্ডুলিপি। হুজুরের তখন ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। শারীরিকভাবে অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছেন। তারপরও বই পড়া বন্ধ হয় না কখনও কোনদিন। যখনই হুজুরকে দেখতে গেছি, হাতে বই কিংম্বা কুরআন শরিফ পেয়েছি। এতো পড়তে পারেন তা কল্পনা করাও কঠিন।

আমরা যারা লেখালেখির চর্চা করি তাদেরকে নিয়মিত পড়তে হয়। কিন্তু পড়ার ধৈর্যের একটা লিমিট থাকে। রুটিন করে পড়তে হয়। কিন্তু হুজুরের কোন রুটিন নেই। পড়ার জন্য কোন সময়সীমা ও নিয়মকানুন মেনে চলেন না। পড়ছেন তো পড়তেই থাকেন যতক্ষণ চোখ খোলা থাকে। আলহামদুলিল্লাহ। হুজুরের দৃষ্টিশক্তিও দারুণ প্রখর। আমরা চশমা দিয়েও যে লেখাগুলো পড়তে কষ্ট হয়, তিনি তা বিনা চশমায় দেখতে পান।

এ বিষয়েও একটা চমকপ্রদ ঘটনা শুনেছি হুজুরের স্বকণ্ঠে। তিনি একবার মদীনা শরীফের বিভিন্ন গ্রামে অবস্থান করছিলেন। বিশেষ করে আরবের গ্রামিন আরবি ভাষা শেখার উদ্দেশ্যে। এই সময় তাঁর চোখে একটু সমস্যা দেখা দেয়। তিনি দুঃশ্চিন্তায় পড়ে যান। মনে মনে দরুদ শরীফ পড়তে থাকেন। এরই মধ্যে হঠাৎ বালুঝড় এসে তাঁর চোখে লাগে। কয়েকটি বালুকণা চোখের ভেতর ঢুকেও যায়। তিনি দুই হাতে চোখ কচলাতে থাকেন। ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেন তাঁর চোখের প্রদাহ কমে গেছে এবং তিনি পরিষ্কার দেখতে পারছেন।

'ইসলাম ও আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা' বি-৫ সাইজের বই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছয় শত। সাধারণ বইয়ের সাইজে পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় নয় শ'র উপরে। পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে বললেন, এবার আমার হাতে সময় কম তবুও পড়বো ইনশাআল্লাহ। ঠিক এক সপ্তাহ পরে আমাকে দেখা করতে খবর পাঠালেন। আমি উপস্থিত হতেই পাণ্ডুলিপি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'ছাপা হয়ে গেলে আমার কপিটা যেন পাই। যেটি আমাদের নির্মিতব্য পাঠাগারে রাখা হবে।' হুজুরের আবদার শোনামাত্রই অপ্রত্যাশিতভাবে আমার চোখের কোণে অশ্রু জমে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছলাম।

পাণ্ডুলিপি বাড়িতে নিয়ে এসে খুলে দেখি প্রায় প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় প্রুফ রিডিংয়ের চিহ্ন এবং কারেকশন সংকেত। এত কম সময়ে কীভাবে হুজুর সমস্ত পাণ্ডুলিপি পড়লেন সেই চিন্তায় আমি হতভম্ব। নিজের লেখা পাণ্ডুলিপি পড়তে আমার সময় লেগেছিল প্রায় দেড়মাস।

তাও প্রকাশকের তাড়া দেয়ার কারণে। অথচ মাত্র কয়েকদিনে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর কীভাবে বইখানা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়লেন। সে হিসেবটা মিলাতে পারিনি।

প্রায় তেতাল্লিশ বছর আগের শোনা উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে বাস্তবে। সত্যিকার অর্থেই মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ছিলেন বিজ্ঞ আলিম। এমনকি যুগশ্রেষ্ঠ বলা উচিত। তাঁর মাঝে ছিল 'সিরাজাম মুনিরা'র পরিপূর্ণ গুণাবলী। নিরহংকার এবং সত্যিকারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন আমাদের ইছামতির মুহাদ্দিস ছাহেব। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের শ্রেষ্ঠ মাকাম দান করুন। আমাদেরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আমিন।

লেখক: যুক্তরাজ্য প্রবাসী কবি, সাংবাদিক, গবেষক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

আল্লামা হবিবুর রহমান ছিলেন বহুভাষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব

সাঈদ চৌধুরী

আল্লামা হবিবুর রহমান বিশ শতকে বাংলাদেশী বরেণ্য ইসলামিক স্কলার্সদের মধ্যে ছিলেন শীর্ষস্থানীয় বহুভাষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। শায়খুল হাদীস হিসেবে ছিলেন সুপরিচিত। কুরআন-হাদীসের উপর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং আরবী ভাষায় বিশেষ দক্ষতার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষকে জাগাতে পেরেছেন। শিক্ষার আলো ছড়িয়েছেন সর্বত্র। দেশ-বিদেশে অসংখ্য মসজিদ-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

আল্লামা হবিবুর রহমান ব্যাপকভাবে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করতেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ ইসলামী আলোচনায় চিন্তাশীল লোকেরা প্রভাবিত হতেন। তিনি বলতেন, ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর বিধান অনুসরণের সাথে সাথে সামষ্টিক জীবনে সে বিধান কায়েমে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আলেমদের প্রধান কাজ হচ্ছে, আদ্দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে লোকদেরকে ডাকা। সারাটা জীবন সমাজে ইসলামের প্রধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা তিনি তুলে ধরেছেন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান সাউদী আরবের শীর্ষ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক রাহবারদের সান্নিধ্যে গিয়েছেন। ইসলাম চর্চা ও ইসলামী ঐতিহ্য প্রত্যক্ষ করার জন্য আরো অনেক দেশ সফর করেছেন। তিনি ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে সিরিয়া, ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে মরক্কো এবং ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে মিশর সফর করেন। সফরের সর্বত্রই ইসলামী চিন্তাবিদগণের সাথে ব্যাপকভাবে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেছেন।

হাজারো উলামার উস্তায শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান আদর্শ শিক্ষক ও সফল অধ্যক্ষ হিসেবে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার উস্তায ও অধ্যক্ষ হিসেবে এবং ইছামতি দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় উস্তায ও অধ্যক্ষ হিসেবে অসংখ্য শিক্ষার্থীকে উচ্চ মানের আলেম তথা ইসলামিক স্কলার হিসেবে গড়েছেন।

প্রায় ষাট বছর ধরে ইলমে হাদীসের খিদমতে নিরলসভাবে নিয়োজিত ছিলেন এই মনীষী। তিনি হাদীস শরীফের যে দরস দিয়ে গেছেন তা এক অমূল্য সম্পদ। আশার কথা, মূল্যবান সে দরসসমূহ সংকলিত করে 'দরসে হাদীস' শিরোনামে প্রকাশনার কাজ শুরু করে দিয়েছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র বিশিষ্ট আলেম ও সুলেখক মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল। ইতোমধ্যে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে 'আল হাবীব ফাউন্ডেশন' থেকে। তিনি মুহাদ্দিস সাহেব প্রণীত বেশ কিছু আরবি গ্রন্থের সফল অনুবাদও করেছেন।

জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়ার পাশাপাশি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায়ও আল্লামা হবিবুর রহমান প্রেরণা যোগাতেন। নতুন প্রজন্ম যাতে পার্থিব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়, সে লক্ষ্যে তিনি নিজ বাড়িতেও একটি অত্যাধুনিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল-হাবীব গবেষণা গ্রন্থাগারে আরবি, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত নতুন পুরাতন বিপুল সংখ্যক বই-কিতাব সংগৃহীত হয়েছে। এরমধ্যে তাঁর নিজের লেখা ১৭টি গ্রন্থ রয়েছে।

আল্লামা হবিবুর রহমানের গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে আল কাউলুল মাকবুল ফী মীলাদির রাসূল, দোয়ায়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফযীলত, মাসআলায়ে উশর: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, দুরূদ শরীফের ফযীলত ও ওযীফা, যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা (ফযীলত ও নিয়ম), আসহাবে বদর, ওযীফা, হজ্জ ও যিয়ারত (সংক্ষিপ্ত আহকাম ও নিয়ম), হাদীয়াতুল লাবীব ফী নাবযাতিম মিন সীরাতিন নাবিয়্যিল হাবীব, যাখীরাতুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী ফাদায়িলি সায়্যিদিল মুরসালিন, কানযুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যিল আমীন, তুহফাতুল লাবীব বি আসানীদিল হাবীব, আত তুহফাতুল লাতীফাহ ফী আহাদীসিল মুসালসালাতিল মুনীফাহ, দালাইলুল খাইরাত (তাহকীক ও বিন্যাস) ও আল হিযবুল আযম (তাহকীক), সীরাতে হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুনতাখাবুস সুনান ওয়াল আছার (হাদীস গ্রন্থ) ইত্যাদি।

১৯৯১ সালে আল্লামা হবিবুর রহমানের সম্পাদনায় সিলেট থেকে 'মাসিক শাহজালাল' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সম্পাদক হিসেবেও তিনি সফলতা ও নান্দনিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

'মুহাদ্দিস ছাহেব' নামে খ্যাত আল্লামা হবিবুর রহমান সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার রারাই গ্রামে ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি ভারতের বদরপুর সিনিয়র মাদ্‌রাসা, কানাইঘাট সড়কের বাজার আহমদিয়া মাদ্‌রাসা ও গাছবাড়ি জামেউল উলুম মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করেছেন। ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ডের অধীন আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ এবং ১৯৫৭ সালে ফাজিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে হাদীস বিভাগে কামিল পরীক্ষায়ও সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান অর্জন করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ইছামতি দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসা এবং ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৭৪ সালের ১৫ জানুয়ারি ইছামতি দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৭৬ সালের অক্টোবরে আবারো সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আল্লামা হবিবুর রহমান ১৯৭৭ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে গমন করেন। প্রথমে উম্মুল কুওয়াইন শহরে একটি মসজিদে ইমাম ও খতিব হিসেবে নিযুক্ত হন। এরপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সে দেশের বিচার বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি উম্মুল কুওয়াইন কোর্টে বিচারক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পাশাপাশি একটি মসজিদে খতিবের দায়িত্ব পালন করেছেন।

দেশে ফিরে ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরে আবারও তিনি ইছামতি মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেখানে আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণীর সরকারি মঞ্জুরি এবং স্বীকৃতি আদায়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া মাদ্‌রাসার ভবন ও মসজিদ নির্মানে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

২০০৯ সালে লন্ডন এসে আল্লামা হবিবুর রহমান প্রায় বছর খানেক ছিলেন। সে সময় প্রতি শনিবার দারুল হাদীস লতিফিয়ায় শামায়েলে তিরমিজি থেকে দারস পেশ করতেন। এতে বিলেতের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুল সংখ্যক উলামা অংশগ্রহণ করেছেন। ইউকে সহ বিভন্ন স্থানে মসজিদ ও ইসলামি সেন্টার প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে।

রাজনৈতিক জীবনে আল্লামা হবিবুর রহমান নেজামে ইসলাম পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নেজামে ইসলামের মনোনয়নে তখনকার সিলেট-৭ আসনে (জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার ও কানাইঘাট) এমএনএ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল-ইসলাহ'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে আঞ্জুমানে আল-ইসলাহ মনোনীত ও সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে জাতীয় নির্বাচনে সিলেট-৫ আসনে (জকিগঞ্জ-কানাইঘাট) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

সংসার জীবনে আল্লামা হবিবুর রহমান চার পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের জনক। সন্তানদের মধ্যে ১ম রোকিয়া বেগম দুই মেয়ে ও চার পুত্র সন্তানের জননী। স্বামী অধ্যক্ষ শায়েখ আব্দুস সালাম আল মাদানী একজন খ্যাতিমান ইসলামিক স্কলার। ২য় মো. আবদুল আউয়াল হেলাল লন্ডন প্রবাসী লেখক ও অনুসন্ধানী আলেম। ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা থেকে কামিল (হাদীস) এবং সিলেট এমসি কলেজ থেকে বাংলা অনার্স। তিন মেয়ে ও এক পুত্র সন্তানের জনক। ৩য় মাওলানা মো. আবদুর রব বিলাল ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা থেকে কামিল (হাদীস) এবং এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ঢাকা থেকে মাস্টার্স (ইসলামিক স্টাডিজ)। তিন মেয়ে ও দুই পুত্র সন্তানের জনক। ৪র্থ সালমা বেগম এক মেয়ে ও দুই পুত্র সন্তানের জননী। স্বামী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাওলানা ইমাদ উদ্দিন। ৫ম মাওলানা আবদুল বাতিন ফয়সল কামিল (হাদীস) এবং

শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স- মাস্টার্স (ইকোনমিক্স)। তিন কন্যা সন্তানের জনক। ৬ষ্ঠ মাওলানা আবদুল বাকী খালিদ কামিল (হাদীস)। দুই মেয়ে ও চার পুত্র সন্তানের জনক। ৭ম শায়মা বেগম এক মেয়ে ও তিন পুত্র সন্তানের জননী। স্বামী ব্যবসায়ী ও শালিস ব্যক্তিত্ব মাওলানা ছালিক আহমদ।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান দুনিয়ার সফর সমাপ্ত করে ২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না-লিলা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রা-জিউ-ন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন।

লেখক: সময় সম্পাদক, কবি ও কথাসাহিত্যিক

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

সৈয়দ মবনু

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে তাঁর নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল-এর পিতা। আব্দুল আউয়াল হেলাল বর্তমানে যুক্তরাজ্য প্রবাসী এবং একজন গবেষক আলিম। তাঁর সাথে আমার লেখালেখির সূত্রে পরিচয় বা বন্ধুত্বের সূচনা ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ বা এর কিছুদিন পূর্বে। দীর্ঘদিন দেশে-বিদেশে একসাথে চলাফেরা হয়েছে। বন্ধুর বাবা হিসাবে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ-কে আমি হৃদয় থেকে অনুভব করতাম।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ-এর নামের সাথে আমার পূর্বপরিচয় থাকলেও সরাসরি প্রথম দেখা হয়েছিল যখন ১৯৯৩ বা ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর সিলেটে ব্যাপক বন্যা হয়েছিল, তখন। সেই সময় জকিগন্জ-কানাইঘাটের এমপি ছিলেন শায়খুল হাদীস মাওলানা উবায়দুল হক উজিরপুরী (র.)। আমরা এমপি সাহেবের নেতৃত্বে জকিগন্জ-কানাইঘাটের বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিতরণে গেলে তিনি আমাদেরকে নিয়ে জকিগন্জের ইছামতি মাদরাসায় যান তাঁর বন্ধু শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ সাহেবের সাথে দেখা করতে। সেদিন আমরা নীরব দর্শক হয়ে উপভোগ করছিলাম তাদের দুই বন্ধুর অনেক মজাদার গল্প। আমাদের জন্য অনেক আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেদিনের দুজনের আলোচনায় বুঝতে পারি যে এমপি উবায়দুল হক উজিরপুরী (র.) এবং তাঁর বন্ধু শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ দুজনই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ইলমি মানুষ। দুজনই সাধক।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ সাহেবের সাথে আমার দ্বিতীয় দেখা আজ থেকে বেশ আগে সম্ভবত ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বার্মিংহামের হেনসওয়ার্থের ব্রড স্ট্রিট জামে মসজিদের এক ইসলামি সম্মেলনে। তিনি সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা অ্যাডভোকেট মাওলানা আব্দুর রকিব। এই মসজিদের খতিব ও ইমাম ছিলেন আব্দুর রকিব সাহেবের ভাগিনা। নাম স্মরণ হচ্ছে না। বক্তা হিসাবে আমারও দাওয়াত ছিল। শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ সাহেবকে সামনে রেখে আমি প্রায় পনেরো মিনিট বক্তব্য রাখি, যা সেই সময় আমার জন্য বেশ ভয়েরই কারণ ছিল। আমার বক্তব্যের শেষে বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট মাওলানা আব্দুর রকিব, এই ফাঁকে হবিবুর রহমান সাহেবের সাথে আমার কিছু কথা হয় এবং তিনি আমার বক্তব্যের প্রশংসা করেন। সেদিন আমার

বক্তব্যের বিষয় ছিল 'মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য এবং বর্তমান অনৈক্যের কারণ। ' এরপর তাঁকে দূর থেকে বেশ কয়েকবার দেখেছি। বন্ধুর বাবা হিসাবে শ্রদ্ধায় দূরত্ব বজায় রেখে চললেও নিয়মিত তাঁর খবর রেখেছি।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ-এর জন্ম সিলেটের জকিগন্‌জে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পিতা মাওলানা মুমতায আলী (র.)। তিনি এলাকায় প্রাইমারি শেষে প্রথমে জকিগন্‌জের পাশে ভারতের বদরপুর সিনিয়র মাদরাসায়, পরে কানাইঘাটের সড়কেরবাজার আহমদিয়া মাদরাসায়, এরপর সিলেটের গাছবাড়ি জামিউল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। এই মাদরাসা থেকে তিনি পূর্বপাকিস্তান মাদরাসা এডুকেশন বোর্ডের অধীনে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করে প্রথম বিভাগে, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ফাজিল পরীক্ষায় বোর্ডের সম্মিলিত মেধাতালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করে প্রথম বিভাগে, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে হাদীস বিভাগে কামিল পরীক্ষায় বোর্ডের সম্মিলিত মেধাতালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইছামতি দারুল উলূম সিনিয়র মাদরাসায় সহকারী মাওলানা পদে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। তবে এ বছরই তিনি প্রধান মুহাদ্দিস হয়ে চলে যান সৎপুর দারুল হাদীস মাদরাসায়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি তিনি ইছামতি দারুল উলুম মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। এরপর কিছুদিন সৎপুর দারুল হাদীস মাদরাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব আদায় করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরব-আমিরাতে ছিলেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে আবার ইছামতি মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বৃটেন-আমেরিকাসহ বিশ্বের বেশ কিছু দেশ সফর করেছেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি নেজামে ইসলাম পার্টি এবং বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল-ইসলাহ'এর সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। আধ্যাত্মিকতায় তিনি মাওলানা আব্দুল লতিফ ফুলতলী (র.)-এর খেলাফত লাভ করেন। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জকিগন্‌জের থানাবাজারে হিফজুল কুরআন মাদরাসা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ-এর লেখালেখিতেও প্রচুর অবদান রয়েছে। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাঁর সম্পাদনায় সিলেট শহর থেকে 'মাসিক শাহজালাল' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যা ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। তাঁর লেখা ১৭টি বই প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ-এর ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে (৩০ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে) তাঁর স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। তিনিও বার্ধক্যজনিত কারণে

অনেকদিন ধরে শারীরিক নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটের দিকে তিনি নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। ৪ ছেলে ৩ মেয়েসহ তাঁর অসংখ্য ভক্ত, অনুসারী, মুরিদান, শিক্ষার্থী ও শুভাকাংখী রয়েছেন। তিনি জীবদ্দশায় অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মৃত্যুর প্রায় ২ মাস পূর্বপর্যন্ত তিনি নিয়মিত হাদীসের দরস দিয়েছেন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ-এর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে হাজার-হাজার মানুষ একনজর তাঁকে দেখার জন্য সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গিয়ে উপস্থিত হন জকিগন্জে তাঁর বাড়িতে। ৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় জকিগন্জের থানাবাজার সংলগ্ন মাঠে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। কম হলেও পঞ্চাশ থেকে ষাটহাজার মানুষ তাঁর জানাযায় উপস্থিত হয়েছিলেন। জানাযায় ইমামতি করেন মাওলানা হবিবুর রহমানের বড়ছেলে মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল। জানাযায় দেশের শীর্ষ আলিম, রাজনীতিক, সরকারি কর্মকর্তাসহ দেশের বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নেন। জানাযা শেষে তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত রারাই গ্রামস্থ আল-হাবীব জামে মসজিদের উত্তরপাশে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ-এর প্রতি আমাদের হৃদয়ের গভীরে অনেক প্রেম-ভালোবাসা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে আমরা সিলেটবাসী সত্যিই একজন দ্বীনি অভিভাবক হারালাম। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু মাকাম দান করুন।

লেখক: সেক্রেটারি, সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ (কেমুসাস); বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

স্মৃতির মণিকোঠায় আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

আশরাফ হাসান

সেই ছেলেবেলা থেকে যে কয়েকটি নাম শোনামাত্র আমার অন্তরে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার উদ্রেক হতো; অজানা থেকেই এক আশ্চর্য হৃদয়াবেগে যেনো আপ্লুত হয়ে পড়তাম, তন্মধ্যে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ অন্যতম। শৈশবে যে আরো ক'জনের নাম আমার আত্মার অলিন্দে পরম শ্রদ্ধায় অনুরণিত হতো তার কয়েকটি উল্লেখ না করে পারছি না। সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ (আমার নানা), খতীব মাওলানা উবায়দুল হক, মাওলানা আমিন উদ্দিন (শায়খে কাতিয়া), মাওলানা আকবর আলী, অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল মান্নান (সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসায় আমার উস্তায), হাফিজ মাওলানা জিল্লুর রহমান (সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসায় আমার উস্তায), আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহ। প্রতিটি নাম যেনো সমকালে আমার অন্তর্লোকে সত্যি পরিশুদ্ধ প্রেরণার প্রত্যয়দীপ্তি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমার ওয়ালিদ সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসার দীর্ঘ সময়ের অধ্যক্ষ মাওলানা সইদুল হাসান রাহিমাহুল্লাহ এবং আমার মাতা মরহুমা লতিফুন্নেছা খাতুনের (শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ'র জ্যেষ্ঠ কন্যা) কাছ থেকে উনাদের অনেকের সম্পর্কে প্রশংসামূলক আলোচনা শুনেছি।

বহুগুণে গুণান্বিত, সৃষ্টিশীলতায় যিনি মহীরুহ সদৃশ; আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেবের সাথে সম্ভবত আমার জীবনে একবারই সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে নয়ের দশকের শেষ দিকে উনার সুযোগ্য পুত্র, লেখক-গবেষক মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলালের শুভ বিবাহ উপলক্ষে জকিগঞ্জে তাদের বাড়িতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করেছিলাম। চমৎকার একটি দিন কেটেছিল। আনন্দ- আতিথেয়তায় ভরে উঠেছিল পুরো একটি দিন যেনো নয়, মনে হয়েছিল উপভোগে- আহলাদে কেটেছে অনেক দিন। আমাদের সাথী ছিলেন মুসলিম সাহিত্য সংসদের নির্বাহী সম্পাদক ইতিহাসবেত্তা মরহুম মনির উদ্দিন চৌধুরী, বন্ধুজন কবি দেওয়ান মাহমুদ রাজা চৌধুরী, লেখক মোহাম্মাদ মারুফ, ছড়াকার মতিউল ইসলাম মতিন সহ আরও কয়েকজন। সেদিন মুহতারাম হবিবুর রহমান সাহেবের লাজনম্র স্বভাব, সবিনয় মধুর আচরণ, ইলমি প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা, প্রাণ উজাড় করা আতিথেয়তায় বিপুলভাবে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেখানে আরও অনেকে মেহমানদারিতে নজর কেড়েছিলেন। তাদের মধ্যে বন্ধুজন কবি মহিউদ্দিন হায়দারের নাম উল্লেখ করতেই হয়।

প্রসঙ্গত আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ আমার নানা খলীফায়ে মাদানী, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসার তৎকালীন শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ শায়খে পাইকরাজী রাহিমাহুল্লাহ'র সুযোগ্য শাগরিদ ছিলেন। অর্থাৎ, শায়খ হবিবুর রহমান তাঁর কাছে ইলমে হাদীসের তা'লিম ও সনদ লাভ করেন। আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ইন্তেকালের কয়েকমাস পূর্বে আমার পিতা মাওলানা সঈদুল হাসান কর্তৃক সুলিখিত আমার নানা সাহেবের জীবনী গ্রন্থটি সম্পাদনার কাজ শুরু করি। এ মর্মে ফেইসবুকে একটি পোস্ট দেখে বন্ধুজন আবদুল আউয়াল হেলাল আমাকে অবগত করেন যে, তার পিতা মাওলানা হবিবুর রহমান আমার নানা মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ'র শাগরিদ ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেছেন। একথা শুনে আমি আবদুল আউয়ালকে উক্ত গ্রন্থটিতে তার পিতার একটি অভিমত দেওয়ার অনুরোধ করি। আবদুল আউয়াল সানন্দচিত্তে আমার আবদার গ্রহণ করেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে আল্লামা মো. হবিবুর রহমানের মূল্যবান অভিমত আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। বলা বাহুল্য, অভিমতটি এ গ্রন্থের পাঠ -সৌন্দর্য ও সৌকর্য অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। আর আমি একজন প্রিয় ব্যক্তির জীবদ্দশায় তাঁর দুর্লভ কথামালা আমার সম্পাদিত গ্রন্থে সন্নিবেশিত করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি।

আজীবন ইলমে দ্বীনের খেদমতে নিবেদিতপ্রাণ বরেণ্য শিক্ষাবিদ, ইসলামের একনিষ্ঠ দা'ঈ, মানবতার খাদেম, ইলমে হাদীসের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, বহুগ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ'র স্মৃতিগাঁথা আমার হৃদয়ে চির অম্লান হয়ে থাকবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর এ পূণ্যকর্মশীল প্রিয় বান্দাকে জান্নাতে আ'লা মাকাম দান করুন। আমীন।

লেখক: কবি, শিক্ষক, সম্পাদক-গোলার্ধ, উত্তর আমেরিকা।

فخر المحدثين العلامة حبيب الرحمن رحمه الله تعالى

مولانا فريد الدين اطهر

بسم الله الرحمن الرحيم

الكلمة الافتتاحية:

الحمد لله الذى هدانا الى الدين بنبيه الامين واختار له اصحابه الصادقين ثم ورث به العلماء الصالحين وجعلهم حرثة ودفاعا للدين. اما بعد ,فاقول فى احد هؤلاء العلماء

هو استاذي ومثالي ,استاذ العلماء والمحدثين العلامة حبيب الرحمن ابن مولانا ممتاز علي رحمه الله تعالى، ولد سنة ١٣٩١م في قرية ' رارای' بزكيغنج تحت محافظة سلهت، بنغلاديش، في اسرة شريفة مخزن العلماء والفضلاء، فما رأى عند مفتحة عينيه من اول يوم الا وجوه العلماء الاذكياء المتادبين الصالحين قولا وفعلا وشيما وخلقا وتلاقينهم على التبع. فكان والده المحترم من كبار علماء اهل السنة وامه عاملة صالحة. وله ستة شقق وثلاث اخوات كلهم من العلماء، واولاده اربعة ابناء وثلاث بنات كلهم كذلك من العلماء الميزة. فهو كما لم يتورث الا علما لم يترك ايضا الا علما وعلماء وكتبا وتلاقين حكيمة وسلسلة توزيع النور بين ابناء الروح في الاجيال المتعاقبة

فكان شيخه ومرشده العلامة عبد اللطيف الفولتلي الذي لم يورث الا خدمات علمية من احياء السنة النبوية وتلاقين الهداية ومنظمة تعليم قراءة القران ودور الايتام والمساجد والمدارس وكل ما يتعلق بخدمة الدين حسب سعة عبده

والشيخ العلامة حبيب الرحمن كما كان صادقا في اسمه لنيل حب الرحمن قد قطف حب العلماء المحققين والمحدثين والمسلمين المخلصين جميعا لتلاقينه الحكيمة وآرائه الصائبة

ومباحثه اللذيذة، فلم تحصر مقبوليته في مسلك ما، بل اصبح شيخا لعلماء جميع المسالك المتحرين علما والمفكرين دينا

ونذكر هنا اهم خدماته العلمية ومنهجه التعليمية ما يعجبكم. وقبل ذلك نبذة من حياته في لمحة قصيرة

اما ولادته قد ذكرت. واما الطفولة والتعليم كما يلى

تعلم الابتدائية في إسكول ابتدائي

قرب مكانه

ثم في مدرسة بدر فورالعالية مع اخيه مولنا نجيب الرحمن سنة ٦٤٩١ فى الصف السادس في الهند، ثم جاء في مدرسة كانايغات ببنغلاديش واتم الثانوية بها، وفي اثناء دراسته بها نال منحات عديدة. ثم التحق بالمدرسة القديمة العريقة في سلهت 'جامع العلوم غاسبارى' فى صف العالم ونال المكانة الثانية وعشرين بين اعالي الممتازين فى نتيجة إتمام هذه الطبقة تحت مجلس التعليم لمدارس باكستان الشرقي السابق. فلم يزل يدرس ههنا ,فنال المكانة الثالثة في نهاية طبقة الفاضل على سبيل واحد. ثم في نهاية طبقة الكامل مع الحديث النبوي (ص) حصل على المكانة الثانية عشر بين اصحاب الميزة سنة ٩٥٩١م. وهذه كانت اشرق نتيجة في تاريخ المدرسة هذه. ونلاحظ ههنا ان حصول الدرجة الاولى في ذلك الوقت كانت شاذة مشاق الوصول اليها الا لمن اعطاه الله ملكة من عنده، والممتازون كانوا هم ٠٢ الاولون من بين اصحاب الدرجة الاولى

شواهد زملائه: وقد سمعنا من زملائه انهم كانوا اذا اشكلت عليهم مسالة او عبارة لجوءه فيشرحهم بما لها وما عليها ويقدم لهم على طريق سهل كأن الماء ينحدر من شلالة. وكان له هذا الامر في كل فن من الفنون العلمية. فكان اصحابه يزعمون انه من شرح الله صدره بنور من عنده. وهو كما كان سريع الفهم على مشاكل

علمية كان حازقا في مسائل التقنية ومصلحات المجتمع والاصحاب ومشوقا لادراك المسائل الخارجية وحصول التجربة مما يعملها الناس. وكان مؤدبا ذا خلق حسن لين الكلام وحسن المعاملة مع الجميع. وفي الحين نجد احدا من زملائه حيا، هو الشيخ الكبير الفاني العلامة بشير الدين الذي كان يرافقه فى القراءات والاسفار. يقول انه كان ذا خلق حسن من صغره ,و يعتنى مساءل اصدقاءه ,لم نجد منه سلوكا سيأ قط. ويعرفه هذا الصديق مجملا بقوله: طابت حياتي رفاقة بحبيبي+ عفيفا زكيا محسنا لاصحاب

تعلم علم القراءة والتصوف: وتعلم الاستاذ حبيب الرحمن علم القراءة والتجويد عند شيخه شمس العلماء العلامة عبد اللطيف الفولتلي سنة ٥٥٩١م وتلقن على علم التصوف والاخلاق. وهو شيخ كبار العلماء في بنغلاديش على علم القراءة

والحديث والتصوف ومثال لحب الرسول عليه السلام وقدوة المبذلين للدين والملة. وقد سبق ذكره في مجلة اخرى. وكان الاستاذ هو احب التلاميذ عند الشيخ من بين المتلقين عنه لما فيه من شيمة الوفاء والمروة والطاعة الاقتداء والافتداء

اعماله: بدأ عمله مدرسا في مدرسة دار العلوم عيسامتى بعد ان اتم طبقة الكامل. ثم درس في مدرسة عالية قديمة "فولبارى اجيرية" شهورا في سنة ٣٦٩١ . ثم انتقل الى مدرسة عريقة مصدر المحدثين 'دار الحديث ستبور' نهاية هذه سنة رئيسا للمحدثين. و عمل هناك احد عشر سنة حتى سنة ٤٧٩١ وولد هناك كثيرا من المحدثين والعلماء والفقهاء ,وسارت شهرة تلاقينه ومهارة علمه بواسطة طلابه واحبابه ومن لقيهم

فقد كان علماء جميع انحاء البقعة ياتيه لحل بعض مشاكل علمية ولغوية ويشبعون منه. فقد بدأ شيء من التنازع بين المدارس العظمى ليكون هو منهم. فلما خلا منصب المدير في "مدرسة

عيسى متى العالية" ومست الحاجة اليه ذهب اليه لحل مشكلاتها سنة وملأ فراغها سنة ٣٧٩١

ثم احتاج اهل ستبور الى مدير ذكي حاذق مثله لحل مشكلات كثيره فجاء اليها مديرا سنة ٦٧٠١ وعمل هناك سنة كاملة وسد المشكلات كما شاء الله

ملاقته مع علماء العرب: وبعد ان عاد من دار الحديث ستبور اشتاق الى ان يجامل مع علماء اهل العرب و يتعارف مع اوضاع مجتمعهم وشئونهم ,فذهب اولا الى الامارات المتحدة سنة ٧٧٩١ واختار عمل الامامة في مسجد كبير حكومي "مسجد ام القوين" وهذا البلد يعين كبار العلماءه في مساجده ,لا كما في الهند و بنغلاديش. فاتيحت له فرصة الملاقات مع كبار العلماء والكلام معهم ,فلقيهم وكلمهم وعرف مصطلحاتهم العلمية والاجتماعية وبعض ميولهم في في مسائل مختلفة فى الدين والشريعة وعن بعض شعورهم واحساساتهم في الحياه البادية والمدنية. ولما اختمست الحكومة عن عموق علمه عينه قاضيا في المدينة هذه. فعمل هناك اكثر من اربع سنوات الى ان عاد الى البلاد. وكان في خلال وظيفته يلاقي اهل البادية الساذجة ويعلمهم علم القراءة.

في مدرسة عسى متي للمرة الثانية: ولما عاد من الامارات المتحدة اجبره الناس لتحمل عملية ادارة "دار الحديث عيسامتى" فتقبلها وعين مديرا وعمل هنا حتى

التقاعد فى دسمبر سنة ٩٩٩١

فهذا المقام كان اكبر معمله وابرع مخدمه ,لانه جود المدرسة وقومها ورقاها الى طبقة الكامل وجعلها افضل المدارس العلمية في شرق سلهت كله. والمسجد الكبير الجامع والعمارات الطويلة والمكاتب المنسقة والساحة الجميلة شاهدة عليها.واشراك الجمهور مع المدرسة ايضا من اعماله العظيمة وتوليد مئات العلماء كل عام ثمرة خدماته العلمية. تقبل الله منه

نشر الدين والعلم: كان الاستاذ في اثناء وظيفته يخالط بالناس في محافل داعية ومجمعات ومؤتمرات ويلقي خطبات راشدة علمية ويعالج مشكلات الشريعة ويدافع الخرافات الساطعة بين المجتمع وعوام الناس. وعملها فى البلاد والخارج على السواء. فكانت محافله اذا كلم مزدحمة ساكتة الافواه مجذوبة العيون حتى لا تسقط ابرة غير مسموعة، لما فيه من اسلوب تقديم سهل واختيار كلام ساذج موافق لتفهيم العوام والخواص. وقسم ضخم من مجالسه كان مع العلماء وطلبة الحديث النبوي الشريف. وحين كثرت عرائض الناس في خارج البلاد سافر بعض البلدان. فمنها

سفر بريطانيا: فكان اول سفره في الخارج الى بريطانيا (لندن). وكان مبدأ السفر من الامارات المتحدة بأمر شيخه ومرشده العلامة الفولتلي. وقضى السفر مع الشيخ نصف شهر القى فيها خطبات في مدنها المختلفة. فاستفاد الناس وازداد شوقهم الى خطباته فاجبروه سفرا كل سنة ما امكنه. ونلاحظ هنا ان عددا

كبيرا من مدن بريطانيا غلب فيها سكان بنغلاديش واقاموا بها مدارس ومساجد ومصادر اسلامية. ففي سنة٩٠٠٢ حين سافرها الشيخ بدؤا تدرس شمائل الترمذى عنده في مدرسة 'دار الحديث اللطيفية' بلندن، فمكث له مزيدا قدر تسعة اشهر متتالية ,ودرس الكتاب ووزع الاسانيد لمأتى متدرسين تقريبا. وفى اسفار اخرى درس كتابي 'رياض الصالحين و'الادب المفرد' للبخاري كما درسهما في الوطن

سفر امريكا: ثم كان نداء المغتربين بالولايات المتحدة (امريكا) كالنداء بلندن ذهب اليها سنة ٥٩٩١م ولقي المسلمين في المدن فنصح لهم ما نصح وحل لهم بعض مسائل شرعية مضطربة فى سكان غير دار الاسلام، وشجعهم في تاسيس مساجد ومعاهد اسلامية ومكث بها شهورا

سفر سوريا: ثم سافر سوريا سنة ٨٠٠٢م بلد الصحابة والفقهاء والمحدثين. فزار قبورالاسلاف وتبرك منهم وزار بعض شواهد تاريخية ولقي كبار علمائها الاحياء، منهم الشيخ الدكتور اسعد محمد سعيد الصاغرجي صاحب 'الفقه الحنفي وادلته' والشيخ الدكتور عجاج الخطيب والشيخ هشام البرهاني وكثيرا سواهم فى

في مباحث علميه وكلمهم فى مسائل مختلفة. وقد قرأ الشيخ الصاغرجي احاديث منه واخذ السند تبركا

سفر مراكش: كان من شوقه ان يزور الامام الجازولي صاحب 'دلائل الخيرات' فسافر مراكش وزار قبره وقبر الامام قاضى عياض والامام السهيلي وغيرهم سنة ٠١٠٢

سفر الهند: وبلاد الهند التى قد تدرس الشيخ فيها في صغره، ثم انه سافر اليها مرارا لتعليم القراءة وتدريس الحديث وزيارة الاماكن الطيبة. مثل زيارة قبر الشيخ البدر الفوري والشيخ خواجه معين الدين الجشتي والشاه ولي الله المحدث الدهلوي وعلماء اسرته والشيخ انوارشاه الكاشميري والمجدد للألف الثانى وغيرهم من كبارعلماء الاسلاف

سفر مصر: وسافر مصر سنة ٨١٠٢ لزيارة ائمة الاسلاف ولقاء علماءها الكبار. وفى اثناء السفر القى درس الحديث في مسجد جامعة الازهر الشريف وتبرك بزيارة قبر الصحابي الجليل عقبة ابن عامر رضى الله عنه والامام ابن حجر العسقلانى وغيرهم

سياسته: وكان واعيا في السياسة. فكان يرى انه لا يمكن اقامة الدين باهمال السياسة وقضايا الوطن. فكان متصلا بحزب 'نظام اسلام' في شرق باكستان قبل الاستقلال. وقام عريضا لعضو البرلمان سنة ٠٧٩١ لرقم الكرسى البرلمانى ٧ من سلهت. ونال عددا كبيرا من الاصوات ولم يفز. ثم لما شكل شيخه الفولتلى "انجمن الاصلاح' انضم اليها وأدى وظيفة الصدر سنوات. وفي سنة ٦٩٩١م

قام لمرة اخرى عريضا لعضو البرلمان من جانب منظمة 'الاصلاح' ومنظمة 'التحريك المشترك' فى رقم الكرسى البرلمانى ٥ لسلهت. وعمل لاصلاح المجتمع والحكومة حسب طاقته بتحريكه وجهده تحت علم المنظمة

الصحافة: وهو كما كان شيخا جليلا في الحديث وعلوم الشريعة وداعيا كبيرا للدين ورئيسا في السياسة كان ايضا من اجلة الصحافيين البارعين .وتشهد على براعة

صحافيته "مجلة شاهجلال الشهري' حررها بيده التي اشتهرت في منطقة سلهت في قليل من الزمان ,وبث بها نهضة فكرية في قرائها. وجرى تحريرها حتى سنة٣٩٩١م.

مؤلفاته : ثم ان استاذ الاساتذة لم يقف على العمليات ما ذكرنا، بل ترك لنا ايضا كثيرا من الكتب المفيدة والهدايات المخطوطة. واشهرها كما تلي

القول المقبول في ميلاد الرسول: في اثبات حفلة المولد النبوي الشريف. كتبه في اللغة الاردوية سنة ٧٧٩١م. ثم ترجمه ولده مولانا عبد الرب بلال سنة ٨٩٩١م

الدعاء المسنونة و٣٣ ايات: يحتوي الادعياء والايات القرانية المقروءة في بعض الأحيان. وقد ترجم في البنغالية والانجليزية

مسألة عشر: فى حل مسألة زكاة الزرع والاثمار وزكاة الارض وما يتعلق بذلك الذي كانت غير موضحة في بنغلاديش. ونشرت سنة ٦٠٠٢م

فضاءل الصلاة على النبي ووظيفتها: نشرت سنة ٠٠٠٢م

زيارة المدينة المنورة: هي احكام واداب الزيارة. ستنشر ان شاء الله.

اصحاب بدر: تعريفات اصحاب بدر. وجمع فيها الروايات المختلفة في هذا الشأن مع فضائلهم. نشرت سنة٨٩٩١م

الوظيفة اليومية: جمع فيها الادعياء والصلوات المقروءة يوميا. نشرت سنة٨٩٩١م

الحج والزيارة: جمع فيها احكام الحج والزيارة مع اسلوب سهل. نشرت سنة٩٩٩١م

هدية اللبيب في نبذة من سيرة النبي الحبيب: في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. جمع فيها الروايات المختلفة موجزا مع اضاءة فضل الرسالة ,نشرت سنة ٢١٩١م. وترجم في البنغالية ولده الشيخ مولانا عبد الاول هلال

ذخيرة الاحاديث الاربعين في فضاءل سيد المرسلين: نشرت سنة١١٠٢م

كنز الاحاديث الاربعين في مناقب اهل بيت النبي الامين: نشرت سنة ١١٠٢م

تحفة اللبيب باسانيد الحبيب: جمع فيها اسانيد الشيخ للقراءة والحديث والتصوف والفقه والتفسير، وكلها بالعربية. نشرت سنة ٥٨٩١م

التحفة اللطيفية فى احاديث المسلسلة المنيفة: جمع فيها الاحاديث المسلسلات مع

اسانيد الشيوخ

دلائل الخيرات (محزبا): نسق فيها وظيفة قراءة دلائل الخيرات يوميا. نشرت سنة٢٠١٠م

الحزب الاعظم (تحقيق): وثق فيها كتاب ملا على القارى رحمه الله تعالى. نشرت سنة ٢٠١٦م

دروس الحديث: تاليف دروس الاستاذ في الحديث والفقه وفى فضاءل اهل بيت الرسول ومساءل مختلفة. الفها ولده الشيخ مولانا عبد الاول هلال.نشرت سنة ٢٠١٨م

القول الراجح في صلاة التراويح: جمع فيها ادلة صلاة التراويح مع اثبات عشرين ركعة. نشرت سنة ٢٠١٩م

وهؤلاء الكتب موجودة في مكاتب سلهت وفي مكتبته المسمى 'مكتب الحبيب' ويمكن تنزيلها من عنوان انترنت

www.rokomari.com

المخطوطات

المقالات المنتخبة: جمع فيها مقالات منشورة في بعض الجرائد والصحف حسبما امكنه

منتخب التفاسير: جمع فيها تفسيرات الاستاذ لبعض سور القران التي بينها في حفلات التفسير. كتبت من شريطة الاصوات

دروس شمائل الترمذي: هذه مؤلفة دروس شمائل الترمذي التي القاها في حفلات بلندن. كتبت من شريطة الاصوات

دروس رياض الصالحين: وهذه ايضا مؤلفة دروس الكتاب التي القاها الشيخ في اوقات مختلفة. كتبت من شريطة الاصوات

تاسيس المساجد والمدارس ودور الايتام: ثم ان الشيخ اسس كثيرا من المساجد والمعاهد والمدارس كما فعله شيخه ومرشده. فالتأسيسات التى انشأت باشرافه مباشرة هي

مدرسة حفظ القران الحبيبية: في تهانا بازار. انه اسس في سنة ٢٠٠٠م هذه المدرسة لحفظ القران في. وسماها الناس باسم

مدرسة حفظ القران الحبيبية ضما باسمه. وهي في جانب مسكنه

بناء عمارات لمدرسة الداخل: وفي سنة هذه بنى عمارتين وسيعتين لمدرسة الداخل

فى تهانا بازار لصفوف الدرس، واعد بها غرفا لمجمع الاساتذة ومكتب المدير وأمينه كما اعد غرفة كبيرة لصلاة البنات مرافقا بغرفة الوضوء والتطهير

اعادة بناء مسجد دار العلوم عسى متي: فقد كان مسجد دار العلوم عيسى متي ضيقا جدا لا يحتوى المصلين والطلبة، فاعاد الشيخ بنائه بشكل كبير تحت اشرافه باعانات المغتربين

وكذلك لما رأى مسجد المدرسة الفرقانية اللطيفية بتهانا بازار ضيقا لا يتم استيعاب المصلين اعاد بناء المسجد بشكل كبير سنة ٢٠٠٠م

ثم في سنة ٢٠١٦م بنى مسجدا وسيعا جميلا في قريته بقرب من منزله الذي سماه الناس بمسجد الحبيب

مكتبة الحبيب ودار البحوث: وفى قرب من مسجد الحبيب بنى مكتبة كبيرة للقراءة والبحوث للعلماء والطالبين، وجهز بها قاعة المؤتمرات والمكتب والمطبخ وغرفة الاستراح. وهي مكتبة شاملة بألوف من الكتب القديمة والجديدة ,حيث احتفظ اكثر من ثلاثة آلاف كتاب من مجموعته إياه وعدة الاف من الخارج، التي تشهد على حبه للكتب وتعطشه للمعرفة

اعداد تعليم الحديث فى المدارس: لما كان شيخ الحديث يشتاق في بث علوم الحديث والسنة كان يلقى الدروس على ذلك في كثير من المدارس في سلهت ,وفي كل مدرسة يسافر اليها. ثم هو افتتح فى كثير من المدارس العليا قسم الحديث في طبقة الكامل بإشرافه وتوجيه. فاولا مدرسته عيسى متي، ثم المدرسة المحمدية

بفنسوغنج. ثم مدرسة جلالفور. ودرس في كلها حين وجد فرصة. وقد كانت عليه اشارة صريحة من النبي عليه الصلاة والسلام على اعداد تعليم الحديث في مدرسة فنسوغنج، والكاتب الحقير شاهد على ذلك بالامانة. فذات يوم في سنة ١٩٩٩م كان الشيخ في سفر في فنسوغنج، فاستراح بعد الظهر في غرفتى. فلما استيقظ للعصر توضا وصلى بنا ثم توجه الينا في المصلى وقال رايت عجبا في المنام فقد رايت مشعلين سائحين الينا معا في السماء ,وخمنت انهما اطلقا من المدينة المنورة. حتى اذا وصلا في سماء فنسوغنج سقط احدهما الى غازيفور، وعله في قبر السيد نور العارفين، وآخرهما في مدرسة فنسوغنج.فاستيقطت وقد تعرق جسمى. ففكرت قليلا ,فاول ما خطر بذهني عن تعبير هذا الامر انه سيدرس الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم في هذه المدرسة ويثق صلة النور بالمدينة، والله اعلم. فينبغي عليكم ان تفتحوا طبقة الكامل وتعدوا لتعليم الحديث النبوي فيها

فهذه الرؤيا التى قد نفذت سنة ٢٠١٧م بافتتاح طبقة الكامل بالحديث باجازة الجامعة الاسلامية العربية. وهذه الطبقة تدفع نفقاتها 'لجنة اصحاب بدر' التي انشئت بتوجيه إياه وبمساهمة الجوادين معا. جزاه الله بها خيرا كلما تلى فيها "قال رسول الله" وجعله صدقة جارية له

اسرته: ان الشيخ عاش حياة طيبة بصاحبتها المتدينة الاليفة المساعدة في عملياته الخيرية. فرزق منها اربعة ابناء كلهم علماء جياد، واكبرهم الشيخ عبد الاول هلال ,الاستاذ في دار الحديث لندن، وثلاث بنات كلهن عالمة جيدة

وفاته: وتوفي الشيخ يوم الاثنين ٧ فبراير سنة ٢٢٠٢ م في مكانه. فملأت الفضاء بالانات وضجت بها السماء وسطعت غمامة الاحزان على العلماء وتفجر القلوب بصوت الاعلان بكلمة "انا

لله" ,فدفق الناس الى زكيغنج لتوضيع محبوبهم الوداع الاخير ورؤية وجهه المنير للمرة الاخيرة والصلاة عليه للجنازة ,حتى اذا اجتمع الناس وملأت طرق زكيغنج زحما ثقلت هواءها باهات الناس وحضر فيهم اولاد الشيخ العلامة الفولتلى وكبار علماء الزمان وعامتهم من كل فرقة وناحية. كلموا في المحكى عن شعورهم وحبهم له. فقال بعضهم ان موت علماء الحق من علامات القيامة فموت هذا الشيخ من اكبرها. ثم صلى عليه ولده الشيخ عبده الاول الهلال مع الناس ودعا له مرشد الزمان الشيخ العلامة عماد الدين شودهورى الذي كان صديقه الاليف منذ صغره. ثم دفن بين المسجد والمكتبة الذين اسسهما الشيخ بيده وباشرافه. والان يزاحم في روضته العلماء وعامة الناس كل يوم للزيارة والفاتحة، شاكرين لما فعله من خدمات الدين والعلم ومستفيضين منه. فرحم الله عبده وسقى له سراه وجعل الجنة مثواه ـ

মানসপটে চির অম্লান থাকবে যার স্মৃতি

অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ শেহাব উদ্দিন আলীপুরী

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব মানুষকে দিয়েছেন। তাদের অন্যতম নবী রাসূলগণ। তারপর সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়িদের পরম্পরায় আউলিয়ায়ে কিরাম ও উলামায়ে উম্মাহ। প্রায় পনেরোশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল নবীজির রেখে যাওয়া ইসলামের। নবীজির প্রচারিত ইসলামের হুবহু রূপ আজও ধারণ করে আছেন আল্লাহ'র পেয়ারা বান্দাহ আউলিয়ায়ে কিরাম।

গাউসুস সাকালাইন মুহি উদ্দিন সুলতানুল আউলিয়া, বুরহানুল আম্বিয়া, মাহবুবে এলাহী, কুতুবে রাব্বানী শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী হতে সিলসিলায়ে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, রেফাইয়া, মাশিশিয়া, মুরছিয়া, শাযূলিয়া, যাযুলিয়া, সুহরাওয়ার্দিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, মুহাম্মদিয়া হয়ে আমরা জৌনপুরী হতে ফুলতলী তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিস্তৃত ছায়াতলে আশ্রয় পেয়েছি এদেশের প্রতীথযশা ওলী, বিশ্ব নন্দিত রঈছুল কুররা, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরীন, আয়নায়ে জামালে আহমদী, শামসুল উলামা আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহ.) এর মাধ্যমে। আর ফুলতলী কাননের প্রস্ফুটিত অন্যতম তারকা ইছামতি দারুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ, যুগসেরা শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান (র.) (মুহাদ্দিস ছাহেব নামে খ্যাত)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ছিল তাঁর মহান মু'জিযা। যা কিয়ামত পর্যন্ত জীবন্ত ও চলমান। তাঁর সুমহান আদর্শকে যারা তাঁদের জীবনে লালন করেছেন তাঁরা হয়ে উঠেছেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। আখলাকে নববীর মশাল বহন করে জীবন পরিচালনা করে একজন জ্যোতির্ময় মানুষে পরিণত হয়েছিলেন হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। জীবনের প্রতিটি পরতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুস্মরণ করতেন বলে সমকালীন উলামাদের মাঝে স্বীকৃত। স্মরণ হয় জীবনে অনেকবার তাঁকে ওজুর পানি তুলে দিতে চেষ্টা করলে প্রতিবারই ব্যর্থ হই। একদিন চুম্বক বললেন-

ولايشرك بعباد ربه احداة

আল্লাহ'র ইবাদত কাউকে অংশীদার করো না। পরবর্তীতে এক সময় কোন এক কিতাবে তাই দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজু করতে কারো সাহায্য গ্রহণ করতেন না।

ছোটবেলা থেকে মুহাদ্দিস ছাহেবের ইলমী মাহারতের গল্প শুনতাম সকল ঘরানার

আলিমদের থেকে। তাতে মনোস্থির করেছিলাম আল্লাহ তাওফিক দিলে বুখারী শরীফের ছাত্র হওয়ার চেষ্টা করবো। ঠিকই আল্লাহর ইচ্ছায় ফাজিল ও কামিল জামাতে পড়া হয় ইছামতি দারুল উলমু কামিল মাদ্‌রাসায়। দীর্ঘ ৪ বছরব্যাপী মাদ্‌রাসার ছাত্রাবাসে অবস্থানের সুবাদে তাঁকে নিকট থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। পাঠদান থেকে শুরু করে আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, চাল-চলন, কথাবার্তা, মেজাজ-মর্জি, আদাত-আখলাক ইত্যাদি কোমলমতি ছাত্র হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছি। জ্ঞানের দীনতা, বয়সের স্বল্পতা ও বুদ্ধির অপরিপক্কতায় যদিও তাঁকে যথাযথ উপলব্ধি করতে পারিনি তথাপি মনে হতো তিনি আমার আত্মার আত্মীয় ও হৃদয়ের শান্তনা পাশে দাঁড়ালে মনে অনাবিল শান্তি অনুভব হতো। তাঁকে রেখে ছাত্রাবাসে যাওয়া মুনাসিব মনে করতাম না আর গেলেও শান্তিবোধ হতো না। কারণ তিনি আমাদেরকে এত আপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তাঁর বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম। তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারা আমাকে কেন সর্বসাধারণকেও চরমভাবে আকৃষ্ট করতো। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে হরেক রকম সমস্যার সমাধানকল্পে জনমানুষের ভীড় থাকতো তাঁর কাছে। বিভিন্ন মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফতি, আদিব থেকে শুরু করে মসজিদের ইমাম সাহেবান এমনকি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক-অধ্যাপক পর্যায়ের মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে ভীড় জমাতেন। নিরবে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর অনুভব করতাম একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে পারলে তিনি সকল শ্রেণির মানুষের আশ্রয়স্থলে পরিণত হতে পারেন।

শীত মৌসুমে মাঝে মধ্যে লক্ষ্য করতাম ফজরের নামাযের কিছুক্ষণ পূর্বে শাহী পাগড়ী মাথায় মসজিদে প্রবেশ করে যথা সময়ে ইমামতি করতেন। ৪০ আয়াত বিশিষ্ট সূরা, মাসনূন তরিকায় অপরূপ সুরলহরী আর তারতীলের তিলাওয়াত মনোমুগ্ধকর। আজো মাঝে মাঝে কর্ণকুহরে ভেসে আসে সেই শ্রুতিমধুর সুর। মুসল্লিদের দিক ফিরে বসলে মনে হতো জান্নাতী নূরানী চেহারা। মসনূন দু'আ ইত্যাদির পর হাত তুলে দু'আ করতেন অশ্রুসিক্ত নয়নে। একটি দু'আ কোনো দিনও ভুলা যাবে না। হুজুর বলতেন "আল্লাহ তুমি অনেক মাটির ঢেলাকে স্বর্ণে পরিণত করতে পারো। আমাদের কাছে পড়েছে এমন ছেলেদেরকে তুমি কাজের মানুষে রূপান্তরিত করো। বেকার করে আমাদেরকে লজ্জিত করো না।

হুজুরের দারস কতটা উচ্চাঙ্গের ছিল তা বলাবাহুল্য। তাত্ত্বিকাত, তাওজিহাত আর তারজিহাত যে কত সাবলিল ভাষায় ও পাণ্ডিত্যের ছিল তা বর্ণনাতীত। এক্ষেত্রে সকল মাযহাবের রায় বা সিদ্ধান্ত উপস্থাপন পূর্বক একে একে হানাফী মাযহাবের তারজীহ বা প্রনিধান প্রদান ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। দারস যত দীর্ঘ হতো তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্য ততো বাড়তে থাকতো। কপাল ও চেহারা থেকে ছোট ছোট ঘামের ফোটা দৃশ্যমান হতো। আর ঘামের ফুটার উপরে আলোকচ্ছটা ভাসতো, মনে হতো এ যেন চেহারায় তারকার মেলা।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন একজন উঁচুমার্গের ইলমী ওয়ায়িজ। তাঁর ওয়াজের শব্দ চয়ন ছিল সাবলীল ও সার্বজনীন। কারো প্রতি আক্রমনাত্মক ভাষা যেমন তাঁর না জানা। এতটা তৃতীয় পক্ষীয় ছিল তাঁর উপস্থাপনা যাতে কেউ কষ্ট পেলেও নিখুঁত বর্ণনার দরুন উল্টো মন্তব্যের জায়গা নেই বললেই চলে। দুর্বোধ্য বিষয়গুলোকে তিনি সাধারণ শ্রোতাদের বুঝাতে সক্ষম হতেন।

বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষসহ নানা মতের মানুষের আবাসস্থল পূণ্যভূমি সিলেট। মতে ভিন্নতা থাকলেও শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর ব্যাপারে সবাই একমত যে, তিনি একজন উচ্চমার্গের মুহাদ্দিস ও মুবাল্লিগ। তাঁর ভাষা মানুষকে কাছে টানতো। তিনি দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে ছিলেন গ্রহণযোগ্য। কোনো এক সফরে একটি টাইটেল মাদ্‌রাসার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তিনি বললেন, উনারা আমাকে বলেন, তাদের দলে যোগ দিলে আমাকে তারা উচ্চাসনে সমাসীন করবেন। আমি কেন এত বড় আলিম হয়েও ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর দামনে বা হাত ধরে আছি। তখন আমি বলেছিলাম আপনারা যদি আমাকে বড় আলিম মনে করেন তবে বুঝবেন, আমি জেনে-বুঝে হযরত ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ-এর কদম ধরে আছি। আপনারা আমার পীর ও মুরশিদের ইলমের মাহারিয়ত পরিমাপ করে কি দেখেছিলেন যে, তাঁর ইলমি গভীরতা কতটুকু?

জীবনে হুজুরের সাথে অনেক ওয়াজ মাহফিলে সফর সঙ্গী হওয়ার পাশাপাশি একবার উমরা পালনের জন্য হারামাইন শরীফাইনের সফরেও সুযোগ হয়েছিল। পবিত্র ভূমি মক্কা শরীফ থেকে মদিনা মুনাওয়ারা যাওয়ার পথে গাড়ির চালককে বদর প্রান্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলে চালক তা প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুদূর অতিক্রম করার পর মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ-এর সাথে তাঁর একটি সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তোমাদের কি এই দরূদ শরীফ স্মরণ আছে?

اللهم صل على سيدنا محمد مااختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان بلغ روحه وارواح اهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا-

আমাদের অনেকেই বললেন জী আছে হুজুর। বলেন এই দরূদ শরীফটি মদিনা শরীফের কোনো এক সফরকালে আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে বেশি বেশি পাঠ করতে বলেছিলেন। শুকুর আল্লাহ'র দরবারে- গাড়ির চালক আমাদেরকে অযাচিতভাবে ঠিক ইফতারের সময় বদরে অবস্থিত মসজিদে আরিসে পৌঁছায়। উল্লেখ্য যে, সফরকালীন মাস ছিল পবিত্র রামাদ্বান মাস। ইফতারের পর

হালকা অন্ধকারে বদরের প্রান্তরে গিয়ে পেলাম আমাদের বাংলাদেশের অধিবাসী এক কিশোরগঞ্জের শ্রমিক ভাইকে। তিনি আমাদেরকে ঘুরে ঘুরে বদরের জিহাদে মৃত কাফিরদের দাফন করা গর্তগুলো দেখালেন। পরবর্তীতে বদর থেকে মদিনা মুনাওয়ারার দিকে যাত্রাপথে গাড়ি চালককে বি'রে শিফায় নিয়ে যাওয়ার কথা বললে তিনি বিরক্তিবোধ করলেন। কিন্তু একপর্যায়ে বি'রে শিফায় আমাদেরকে নিয়ে পৌঁছলেন এবং গাড়ি থেকে নেমে আমরা বি'রে শিফার পানি পান করলাম ও বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য বোতলে করে পানি সংরক্ষণ করলাম।

মদিনা শরীফ পৌঁছার পর আমরা একদিন মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর খিদমাতে হাদীস শরীফের দারস প্রদানের জন্য জোর অনুরোধ করতে থাকি। একদিন তিনি তাঁর মর্জি অনুযায়ী আমাদেরকে হাদীসের দারস প্রদানে সম্মত হলেন। হাদীসের দারস শুরু হলো। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্যকার কোনো একজন হুজুরের উদ্দেশ্যে অপ্রাসঙ্গিক একটি কথা বললে, এতে তাঁর চেহারা রাগে লাল বর্ণের হয়ে যায় এবং বারংবার একটি কথা তিনি বলতে লাগলেন, আপনি আমার লাইন বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন। আবার দারস শুরু করেন এবং আবারো বলেন, আপনি আমার লাইন বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন। দারস সমাপনান্তে আমাদেরকে নিয়ে দো'আ করেন।

আমরা বিশ্বাস করি আমাদের মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এমন একজন জ্যোতির্ময় মহান পুরুষ যার সংস্পর্শে অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষক ও জনসাধারণ সোনার মানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। দেশ বিদেশে তাঁর নানামুখী খিদমত সর্বজনবিদিত। হযরত ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ-এর সকল দ্বীনি খিদমতে তিনি ছিলেন অন্যতম সহযোগী। মুরশিদের একজন আদর্শ অনুসারী ও শীর্ষস্থানীয় খলিফাদের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের সু-উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং আমরা তাঁর রেখে যাওয়া দ্বীনি খিদমাতের নগন্য খাদিমের ভূমিকা পালন করতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাওফিক দান করেন। আমীন।

লেখক: অধ্যক্ষ, রাখালগঞ্জ দারুল কোরআন ফাযিল মাদ্‌রাসা, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

আমার দেখা আল্লামা মুহাদ্দিস হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান

কখন এবং কীভাবে তাঁর সাথে আমার মতো ক্ষুদ্রাদপীর মোলাকাত নসিব হয়েছিল সে কথাই বলছি। গত বিশ শতকে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে পুন্যভূমি সিলেটর বিশ্বনাথ উপজেলাধীন ঐতিহ্যবাহী সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসার বাৎসরিক জলসা হতে যাচ্ছে। সে বারের জলসায় মাদ্‌রাসার কামিল জামাত প্রতিষ্ঠার বিশ বৎসর পুর্তি (১৯৬৫-১৯৮৫) উপলক্ষ্যে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। প্রধান অতিথি মাদ্‌রাসার প্রধান উপদেষ্টা ও অভিভাবক আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ তৎকালিন প্রাজ্ঞ আলিম মাও. হারিছ উদ্দিন সাহেবের আরবিতে লেখা একটি মানপত্র এবং নবীন শিক্ষক হিসেবে আমার লেখা একটি বাংলা মানপত্র ছাহেব কিবলাহকে দেয়া হয়েছিল। বর্ণাঢ্য এ মাহফিলের মঞ্চে রাজপুরুষের মতো তিনি বসে ছিলেন। বলা বাহুল্য জনাব ফুলতলী সাহেব শুধু গুণী ছিলেন না - গুণজ্ঞও ছিলেন। তিনি যথারীতি দাঁড়িয়ে আমার মতো পুচকে শিক্ষকের হাত থেকে মানপত্র নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, আমি যখন তাঁকে কদমবুচি করতে যাচ্ছি- তখন পাশে বসা আরও এক জন সৌম্য দর্শন সুদর্শন হুজুরকে দেখতে পেলাম। সহকর্মী ও ছাত্রদের মারফত জানতে পারলাম, তিনি অত্র মাদ্‌রাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিস, অধ্যক্ষ এবং ছাহেব কিবলাহর প্রধান খলিফা রারাইর মুহাদ্দিস জনাব হবিবুর রহমান সাহেব। তাঁর সৌন্দর্যমণ্ডিত চেহারা ও ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

কিছুদিন পর শুনতে পেলাম মুহাদ্দিস হুজুর সৎপুর গ্রামের হাফেজ রহমতুল্লাহর বাড়িতে এক মিলাদ মাহফিলে তাশরিফ এনেছেন। তখনো তিনি হয়তো আমাকে চিনেন না। প্রকাশ থাকে যে, রাত্রে আমি এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখলাম। কোন এক অজ্ঞাত স্থানে বহুলোক স্রোতের মতো যাচ্ছে। কারণ সেখানে এমন একজন মহিমাময় মহাপুরুষ তাশরিফ এনেছেন- যাঁর নাম মোবারক আমার মত পাপিষ্ঠ বিনা অজুতে নেয় না। বাংলার কাব্য দুলাল কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় -'তিনি এতই আপন আপনি খোদা লুকিয়ে তারে রাখে।' আমিও ছুটলুম ভক্ত জনতার সাথে। কি অদ্ভুত ব্যাপার! যেয়ে দেখি সেই মানব মুকুটরুপি জগত বরেণ্য মহাপুরুষ সেখানে নেই, তাঁর অন্তর্ধান হয়েছে, সেখানে বসে আছেন রারাইর মুহাদ্দিস হুজুর। রহস্য ভেদ করতে পারলাম না। ভোর হতে না হতেই ছুটলাম হাফিজ রহমতুল্লাহর বাড়ি। হুজুরকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানালাম, হুজুর মুচকি হেসে বললেন ঐ মোবারক স্থানে আমাকে না দেখে আমার চেয়ে যোগ্যতর কাউকে দেখলে ভাল করতেন। তাঁর বিনয় নম্রতা শরাফতি আমাকে আকর্ষিত করল। আমার মতো দীন ভক্ত সাগরেদ বিদ্যাবুদ্ধিহীন ব্যক্তির মন ও আমার অজান্তে সেদিন বলে উঠলো হুজুর মানুষটি নানা কারণে অসাধারণ। তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করলেন। এক মায়াবী

বন্ধনে বেঁধে ফেললেন। অনেক বাধা-বিপত্তি ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে আমাকে তিনি তাঁর ইছামতি আলিয়া মাদ্‌রাসায় খণ্ডকালীন বাংলা প্রভাষক হিসেবে নিয়ে নিলেন।

সৎপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা এ বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই সুনজরে দেখেনি। অনেক অম্লমধুর তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাকে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। হুজুরের অপার্থিব স্নেহ মমতা সর্বোপরি তাঁর মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শোভনীয় শিষ্টাচারে যাতায়াতের শত মাইলের ক্লান্তি ভুলে যেতাম।

আমি মুহাদ্দিস হুজুরের জীবনীকার নই। তাঁর বহুমুখী কর্মময় মহাজীবনের এক খণ্ডিত অংশে আমি তাঁর সাহচর্য পেয়েছি। আমার জানামতে ইছামতি আলিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ মহোদয়ের তদানীন্তন আবাসিক কার্যালয়টি ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক বহুমাত্রিক বিষয়ের মীমাংসার কেন্দ্রস্থল। একবার কালীগঞ্জ বিশাল গরুহাটের ইজারার কঠিন বিচার মীমাংসা হুজুর করেছিলেন এবং ইছামতি আলিয়া মাদ্‌রাসাকে ইজারার অংশীদার করেছিলেন। এদিক থেকে তিনি ছিলেন ধর্ম নেতার পাশাপাশি জননেতা। দল-মত ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল আকাশ ছোঁয়া।

জনাব মুহাদ্দিস হুজুর ছিলেন কিংবদন্তিতুল্য কৃতি শিক্ষক। তাঁর ছাত্রদের মতে হুজুরের মতো খোলাসা ও সাবলীল তাকরির তারা আর কোথাও পাননি। ইলমে হাদীসে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সুগভীর কিন্তু পাণ্ডিত্যভিমান ছিল না। মাওলানা ইরশাদ হোসেন গুয়াহরি সাহেবের মতো শরিফ, মাওলানা আব্দুল হাই ছাতকী সাহেবের মতো প্রতিভাবান জকি ছাত্রের তিনি ছিলেন প্রাণপ্রিয় শিক্ষক।

মুহতারাম মুহাদ্দিস ছাহেব ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আমাদেরকে বলেছিলেন, সৎপুর দারুল হাদীস আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মুহতামিম ছাহেব ইন্তেকালের অব্যবহিত পরে মাদ্‌রাসা এক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে কামিল জামাত ছাত্র শূন্য হয়ে যায়। মাদ্‌রাসার ঐ ক্রান্তিলগ্নে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ আমাকে মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণের আহবান জানান। আমি কিছুটা দ্বিধাবোধ করছিলাম। ছাহেব কিবলাহ আমাকে বলেছিলেন, হযরত ঈসমাইল (আ.) এর উপর হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর যেমন অধিকার রয়েছে আপনার প্রতিও আমার এক প্রকার অধিকার রয়েছে। আমি কথাটা নির্দেশের মতো মনে করে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। উল্লেখ্য যে, তদানীন্তন সরকারি কর্মকর্তা আমাকে বলেছিলেন, হুজর মাদ্‌রাসায় ভয়ানক গুলমাল হচ্ছে, পরিস্থিতি মোটেই অনুকূলে নয়। আপনার সাথে কিছু ফোর্স পাঠিয়ে দেই। হুজুর উক্ত কর্মকর্তাকে নির্ভিক কণ্ঠে বলেছিলেন, "আমি ডাকাত নই যে, শক্তি প্রদর্শন করবো, আবার চোরও নই যে, মাথা নিচু করে যাব। আমি একজন শিক্ষকের আত্মমর্যাদা নিয়েই মাদ্‌রাসায় প্রবেশ করবো।" বলা বাহুল্য যে, চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে মুহাদ্দিস হুজুরের ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বও মানুষকে তেমনি আকর্ষিত করতো। মাদ্‌রাসার ছাত্র সংখ্যা

এতো অধিক সংখ্যক হয়েছিল যে, জাগির দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল।

আমার ক্ষুদ্র শিক্ষকতা জীবনের সবচেয়ে বরণীয় শ্রদ্ধাভাজন হুজুর জনাব মাওলানা কমরুদ্দীন (র.)। তিনি ছিলেন রারাইর মুহাদ্দিস হুজুরের সরাসরি উস্তায। সেই মাওলানা কমরুদ্দীন আগিরামী হুজুরকে একদিন আমি ইছামতি মাদ্‌রাসায় রারাইর মুহাদ্দিস হুজুরের দারসে হাদীসের ক্লাসে বিনয়াবত তালেবে এলেমের মতো বসা অবস্থায় দেখেছি। পরে জানতে পারলাম, সেদিন কালিগঞ্জ হাটবার। হুজুর হাঁটে এসেছেন- সুযোগ পেয়ে তাঁর প্রিয় সাগরেদ রারাইর মুহাদ্দিস হুজুরের ক্লাসে উপবেশন করেছেন। এটাই নাকি ইলমে হাদীসের আদব- শিষ্টাচার। দৃশ্যটি ছাত্র-শিক্ষক ও গুণগ্রাহীদের কাছে ছিল চমৎকার। জগত বরেণ্য ইমাম আজম হযরত আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি নাকি ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি এর দারসে এমন করেই বসতেন।

মসনবী শরীফে পড়েছিলাম-

শায়খে কামেল বুদ ও তালেব মোশতাহি
চাবুকে মরদ বুধ ও মরকব দরগাহি।

অর্থাৎ, ওস্তাদ ছিলেন খুব যোগ্য, ছাত্র ছিল আগ্রহী, আরোহী ছিল সুচতুর বাহন ছিল খাড়া। উল্লেখ্য যে, তদানীন্তন ছাত্র মাওলানা আব্দুন নুর, মাওলানা সিরাজুল হক শায়েস্তা এরা সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসার হলেও হুজুর তাদেরকে আলাদাভাবে পড়াতেন।

আল্লামা মুহাদ্দিস হুজুর ছিলেন বিগদ্ধ গুণী আলোচক। সাহিত্যের একজন খাঁটি সমঝদার। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন ক্ষুদ্র পাঠক হিসেবে আমি বাংলার বুলবুল কাজী নজরুল ইসলামকে মাদ্‌রাসা ভুবনে তুলে ধরতাম। নজরুল সম্পর্কে অনেক ভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করতাম। আমি জানতাম সিলেটবাসী বাংলার কাব্য কুঞ্জের বুলবুল কাজীর নজরুল ইসলামকে অপরিমেয় ভালোবাসা দিয়েছে। সিলেটের ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী, অধ্যক্ষ দেওয়ান আজরফ, আল্লামা হরমুজ উল্লাহ সায়দা প্রমুখ নজরুলকে উচ্চশিত প্রশংসা করেছেন। কবির বন্ধু দেওয়ান একলিমুর রেজা চৌধুরী বলতেন, নজরুল তুমি হলে অখ্যাত পিতার ফার্স্ট ক্লাস পুত্র, আমি হলাম ফার্স্ট ক্লাস পিতার থার্ড ক্লাস পুত্র।

একবার ইছামতি মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ভবনে মুহাদ্দিস হুজুর শুয়ে আছেন। আমি তাঁকে গানের রাজা সুর সম্রাট কাজী নজরুল ইসলামের নিম্নের নাতে রাসূল শুনাচ্ছিলাম-

ইসলামের ঐ সওদা লয়ে
এলো নবীন সওদাগর
বদ নসীব আয়- আয় গুনাহগার
নতুন করে সওদা কর।

কেয়ামতের বাজারে ভাই
মুনাফা যে চাও বহুত
এই ব্যাপারি হও খরিদার
লওরে ইহার সিল মোহর।।
আরস হতে পথ ভুলে ঐ
আসলো মদীনা শহর
নামে মোবারক মোহাম্মদ
পুঁজি আল্লাহু আকবার।।

সত্যিই হুজুর স্থিতধী পুরুষ। তাঁকে কখনও আবেগাপ্লুত হতে দেখিনি। কিন্তু তিনি সেদিন কাজী নজরুল ইসলামের রাসূল প্রেমের উত্তাপ সইতে পারলেন না। তিনি কিছুটা উত্তেজিত হয়ে শোয়া থেকে উঠে বসলেন এবং ভক্তি মিশ্রিত আনন্দের আতিশয্যে বললেন "গানের শেষ লাইনটা আবার বলেন তো।" আমি পুরো গানটা আবার শোনালাম এবং এ নাত লেখার পটভূমি ব্যাখ্যা করলাম। হুজুর আবেগঘন ভাষায় এক অসাধারণ মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন- "রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বচক্ষে দেখে সাহাবি কবি কাব বিন জুহাইর যদি নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখে তাঁর গাত্রাবরণ উপহার পেয়ে থাকেন- তাহলে চৌদ্দশত বছর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে না দেখে এমন ভক্তিভরা নাতে রাসূল লেখে নজরুল কেন হাশরের মাঠে রাসূল প্রেমের বদলা পাবেন না, অবশ্যই পাবেন।" প্রসংগত এখানে বলে রাখা ভালো যে, পূর্বে উল্লেখিত হুজুরের উস্তায জনাব আগিরামী হুজুরও কাজী নজরুল সম্পর্কে তাঁর 'মরু ভাস্কর' কাব্য পাঠ করে অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন 'নজরুল আল্লাহর দরবারে মাকবুল হয়েছে।'

যাহোক সেদিনের ভক্ত শ্রোতাবৃন্দ হুজুরের সাহিত্যের সমঝদারিতায় মোহিত হয়েছিলাম। সত্য সুন্দরের বাণী বাহক তিনশত ষাট আউলিয়ার সোনালি স্মৃতি বিজড়িত তাঁদের পবিত্র পদধূলিতে পরিশোভিত, পূণ্যতোয়া সুরমা কুশিয়ারার পলল গঠিত এক মহান জনপদ সিলেট। ধর্ম, দর্শন, সমাজ, রাষ্ট্র-রাজনীতি শিক্ষা-সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক তীর্থস্থান হলো সিলেট। আমি মুহাদ্দিস হুজুর ও ভক্তবৃন্দের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে যেয়ে বিশেষ করে ইসলামী জ্ঞানের দিকপাল, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব সিলেট সরকারি আলিয়া ও গাছবাড়ি আলিয়া মাদ্‌রাসার মাও. ফজলে হক ফাজিল সাব, মাও. শফিকুল হক, মাও. সওহুল উসমানি, মাও. মাহমুদ হোসেন, মাও. হুরমুজ উল্লাহ সায়দা, মাও. আব্দুর রব কাসেমী প্রমুখের নাম জানতে পেরেছি। বৃহত্তর সিলেটে ইলমে কেরাত ও শাশ্বত সুন্দর ধর্ম ইসলামের নির্যাস ইলমে তাসাউফের চর্চায় আল্লামা ফুলতলী সাহেবের নেতৃত্বে এক যুগান্তকারী আন্দোলন হয়। ঐ ইসলাহি আন্দোলনের এক পুরোধা পুরুষ

ছিলেন আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব। আমাদের জাতীয় দুর্গতির নিরন্দ্র অন্ধকারে নুরুন আলা নুরের মশাল নিয়ে ইলমে দ্বীনের আলো ছড়িয়েছেন তিনি।

ইসলামী দুনিয়ার সুফি সম্রাট জালালুদ্দীন রুমি বলেছেন-

"আত্তার রূহ বুদ ও সানায়ী দো চশমেউ
মা আয পায়ে আত্তারও সানায়ী আমাদেম।

অর্থ্যাৎ, ফরিদুদ্দীন আত্তার হলেন তাসাউফের প্রাণ। আর হাকিম সানায়ী হলেন তার দুটি চক্ষু, আমি রুমী অন্ধের মতো তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি মাত্র। আমরাও বলতে পারি- আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী হলেন এ আন্দোলনের প্রাণ- আর জনাব মুহাদ্দিস হুজুর এবং জনাব আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী এঁরা হলেন দুটি চক্ষুর মতো- আমরা জ্ঞানান্ধ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি মাত্র।

জনাবে আলা মুহতারাম মুহাদ্দিস ছাহেব ছিলেন একজন খান্দানি পরিবারের সুরুচি সম্পন্ন মানুষ। মহত্ত- মহিমা- মহানুভবতা এ শব্দগুলো আমরা সাহিত্যে পড়েছি, অভিধানে দেখেছি। ব্যক্তি জীবনে অতি অল্প লোকের জীবনে তা মূর্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলতেন 'হামবড়া দোষের নয়- তোম ছোটা বলাই দূষণীয়। জনাব মুহাদ্দিস ছাহেব গভীর আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও আত্মাভিমানী ছিলেন না। গুণী ও সুধীজনের যথার্থ কদর করার মতো মহানুভবতা তাঁর ছিল। সিলেটের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসা ও এম.সি. কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ জনাব আব্দুল মান্নান স্যার ১৯৫৬ সালে মাদ্‌রাসা বোর্ডে কামিল পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। মুহাদ্দিস হুজুর আমাকে বলেছেন 'আমরা তৎকালিন সিলেটী ছাত্ররা তাঁর সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিলাম। জনাব মান্নান স্যারের অমর উক্তি - 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুধু তারিফ করলে হবে না তাঁর কথা কাজকে তামিল করতে হবে।' প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে জনৈক ছাত্র অন্যায়ভাবে মুহাদ্দিস হুজুরের প্রতি কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করে। হুজুর বিষয়টি আমলে নিলেন না বরং মৃদু হেসে বললেন- 'ওর কাছে আমি ঋণী- ও এক সময় আমার অনেক জামা কাপড় ধুয়ে দিয়েছে।' হুজুর তাঁর প্রতিপক্ষ আলিমকে 'আমার দোস্ত' বলে সম্বোধন করতেন।

আল্লামা মুহাদ্দিস হুজুর আজ আর আমাদের মাঝে নেই। আমরা হারিয়েছি আমাদের দরদী অভিভাবককে, সিলেট হারিয়েছে তাঁর কৃতী সন্তানকে, ইসলামী দুনিয়া হারিয়েছে ইলমে দ্বীনের এক কুতুব মিনারকে, স্মৃতির আরশিতে আজ অতীতের অনেক ছবি ভেসে উঠছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সিরাজীর ভাষায় সুদূর টাঙ্গাইল থেকে নিরবে নিভৃতে বলছি- "চোখের জলে ধোয়াতাম পা যদি গো আবার আসিতে ফের।"

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), হেমনগর ডিগ্রী কলেজ, গোপালপুর, টাঙ্গাইল।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ইলমে নববীর এক মহান পরিবাহক

মাওলানা মারজান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী

পবিত্র কুরআনে ইলম তথা জ্ঞানের দুটি ধারার কথা উল্লেখ আছে। একটি ধারা হচ্ছে Knowledge of the Creation তথা সৃষ্টিগত বা বস্তুগত জ্ঞান। আরেকটি ধারা হচ্ছে Knowledge of the Creator তথা স্রষ্টার পরিচয় ও স্রষ্টা সংক্রান্ত জ্ঞান। এই ধারাকে আমরা হিদায়াতও বলতে পারি। জ্ঞানের এই দুটি ধারাই প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী আদম আলাইহিস সালাম এর হাত ধরে শুরু হয়েছিল। প্রথম ধারার ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"তিনি (আল্লাহ) আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।" (সুরা বাকারাহ, ৩১)

আদম আলাইহিস সালামকে শিক্ষা দেয়া সেই নামসমূহ যাবতীয় সৃষ্টিগত বা বস্তুগত জ্ঞানের বীজ ছিল, যা থেকে আদম সন্তানরা পরবর্তীতে প্রয়োজনমত জ্ঞান আহরণ ও আবিষ্কার করেছে। পক্ষান্তরে জ্ঞানের অপর ধারা তথা হিদায়াত মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি ও গবেষণার অতীত। তাই আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার সময় আল্লাহ বলে দিয়েছেন-

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"অনন্তর আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট যে হিদায়াত আসবে; যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" (সুরা বাকারাহ, ৩৮)

হিদায়াত-ই হচ্ছে জ্ঞানের সেই ধারা, যা যুগে যুগে নবী-রাসূল ও আসমানি কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দান করেছেন।

হিদায়াতের যে সিলসিলা প্রথম নবী আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয়েছিল, তা সামনের দিকে এগোতে এগোতে সর্বশেষ নবী সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ ﷺ এর হাতে পরিপূর্ণতার সাথে সমাপ্তি লাভ করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পার্থিব জগত থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে হিদায়াতের সেই ইলমকে বহন করার দায়িত্ব তাঁর উম্মাতের কাঁধে সপে দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِين

"প্রত্যেক আগত যুগের নেক ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরা (কুরআন-সুন্নাহর) এই ইলমকে

বহন করবে। তারা এই ইলমকে সীমালঙ্ঘনকারীদের রদবদল, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করবে।" (মিশকাত, হাদীস-২৪৮)

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন এই যুগে নববী ইলমের এক বিশ্বস্ত পরিবাহক, যিনি জীবনভর নববী ইলমের স্বাতন্ত্র, গরিমা ও সৌন্দর্যকে নিজের চরিত্র, তাকওয়া ও অধ্যবসায়ের দ্বারা এ দেশের মুসলিম সমাজের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। হাজারো শিক্ষার্থী তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, হাজারো জ্ঞান-পিপাসুর তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছে তাঁর জ্ঞান-সাগরের কিনারা ঘেষে, হাজারো মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শের সাথে পরিচিত হয়েছে মুহাদ্দিস ছাহেবের সংস্পর্শে এসে। মুহাদ্দিস ছাহেবের দ্বারা নববী ইলমের অমিয় স্বাদ গ্রহণ করা সৌভাগ্যবানদের মধ্যে আমি অধমও আছি। আমি সেই সর্বশেষ ব্যাচের একজন ছাত্র, যারা মুহাদ্দিস ছাহেবের কাছ থেকে রীতিমতো হাদীসের দারস গ্রহণ করে তাঁর পরিপূর্ণ সনদ লাভ করেছেন।

সেই ছেলেবেলা থেকে যাদের ওয়ায-নসীহত শুনে বড় হয়েছি, মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর তন্মধ্যে অন্যতম। ২০০০ ও ২০০৫ সালে হজের সফরে একত্রে ছিলাম। ২০১৮ সালে আমি যখন মিশরে ছিলাম, তখন একদিন হুজুরের বড় ছেলে মাওলানা হেলাল যোগাযোগ করলেন। বললেন, ভাই, আব্বা মিশর আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। আপনি কি থাকবেন? আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম যে, মিশরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হুজুরের সাথে সফর করব। কিন্তু ভিসা জটিলতার কারণে হুজুর যাওয়ার এক সপ্তাহ আগেই আমাকে চলে আসতে হয়েছিল। উজবেকিস্তান সফরে গিয়েছিলাম ২০১৯ সালে। ফিরে আসার পর একবার একটি মাহফিলে সাক্ষাৎ হয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ বসে মধ্য এশিয়া সফরের পুরো অভিজ্ঞতা শুনালাম। হাদীস ও তাসাওউফের বরেণ্য ইমামদের কবর যিয়ারত করেছি শুনে হুজুর খুব আগ্রহী হলেন এবং একবার উজবেকিস্তান সফরের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু সেদিকে তিনি আর যেতে পারেননি। এভাবে স্মৃতি গুনলে ডজনখানেক পাওয়া যাবে। কিন্তু কেবল স্মৃতিচারণ করাই এখানে উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর জীবন সায়াহ্নে তাঁর সংস্পর্শে এসে যা কিছু শিখেছি, তার মধ্যে কিছুটা তুলে ধরা।

হুজুর তখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে সিলেট শহরে তাঁর মেয়ের বাসায় অবস্থান করছেন। মানুষজন প্রায়ই তাঁকে দেখতে যায়। এক রাতে আমরা ক'জন গেলাম। হুজুর তখন সবাইকে চিনতে পারছিলেন না। কথার ফাঁকে বললেন, "সুবহানীঘাটের প্রিন্সিপাল সাবের (আমার বাবা) এক ছেলে ওয়ায করেন। তার ওয়ায আমার বড় পছন্দ। আমি কয়েকবার শুনেছি।" পাশ থেকে কেউ একজন বললেন, উনি আপনার পাশেই বসে আছেন। আমি মাথা এগিয়ে দিলাম। হুজুর কোনোমতে আমার মাথায় হাত রাখলেন।

দু'একদিন পর বাবা বললেন, "আমি মুহাদ্দিস ছাহেবকে অনুরোধ করেছি, যেন তোমাকে একটু কিনারা লাগিয়ে দেন। তুমি প্রস্তুত থাকবে। হুজুর তোমাকে ডাকবেন।" পরদিন

ডাক পড়ল, সহীহ বুখারী সাথে নিয়ে হুজুরের (মেয়ের) বাসায় যেতে। আমি দৌড়ে গেলাম। হুজুর প্রথমে হাদীসের সনদ ও মতন কীভাবে পড়তে হয়, কীভাবে আদব রক্ষা করতে হয়, কীভাবে শুরু এবং শেষ করতে হয়, তা শেখালেন। হাদীসশাস্ত্রের ইতিহাস ও গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বললেন। তাঁর নিজের সনদের ব্যাপারেও কিছু কথা বললেন। এরপর সহীহ বুখারীর প্রথম অধ্যায় থেকে সামান্য পড়তে বললেন। কথা বলতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবুও শখ করে পড়ালেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, হুজুর যখন কিছুটা শারীরিক সুস্থতা অনুভব করবেন, তখন আমাকে ডাকবেন।

পরের দারস থেকে যুক্ত হলেন মাওলানা রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী (সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা), মাওলানা কুতবুল আলম (উপাধ্যক্ষ, শাহজালাল ডি. ওয়াই. কামিল মাদ্‌রাসা) এবং মুহাদ্দিস ছাহেবের বড় ছেলে মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল। হেলাল ভাই প্রথম দিনও আশেপাশে ছিলেন। হুজুর তাঁকে নির্দেশ দিলেন পুরো দারসে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমরা চারজন মিলে একটি নিয়মিত ব্যাচ হয়ে গেল। হুজুরের আত্মীয় ও খাদিমদের মধ্যে আরও কিছু লোক মাঝে মধ্যে সঙ্গী হতেন।

হুজুর আমাকে বললেন, "আমি জীবনে দেশে-বিদেশে ইলমে হাদীসের বহু দারস দিয়েছি। কিন্তু কখনও আমার পুরো সনদের ওপর দারস দেয়া হয়নি। আমার খুব শখ, কেউ একজন আমাকে আমার পুরো সনদ পড়ে শুনাবে। আপনি এই কাজ করবেন। পুরো সনদ এবং মুসালসাল হাদীসসমূহ শেষ হলে আমরা আবার বুখারী শরীফে ফিরে যাব।" শুরু হলো এক বরকতময় যাত্রা। হুজুর অসুস্থ শরীর নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকেন। আমরা চারজন মেঝের ওপর বসি। আমি এক মনে হুজুরের সনদ "تحفة اللبيب باسانيد الحبيب" পড়ে যাই। বাকি তিনজন সঙ্গ দেন। হুজুর কিছুক্ষণ পরপর আমাদেরকে থামিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা ও নিজের অভিজ্ঞতা বলেন। হাদীসের উসূল (মূলনীতি), ইস্তিলাহ (পরিভাষা) ও তারিখ (ইতিহাস) আমার মোটামুটি জানা ছিল, যেহেতু আমার কামিল হাদীস বিভাগ থেকে এবং মাস্টার্সে (ইসলামিক স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) আমার মেজর সাবজেক্ট ছিল সিহাহ সিত্তাহ। সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমা, মুকাদ্দিমা ইবনুস সালাহ, শারহে নুখবাতুল ফিকর, মিযানুল আখবার, তাইসীরু মুস্তালাহুল হাদীস এবং বাংলাভাষী লেখকদের লিখিত হাদীসশাস্ত্রের ইতিহাস আমার পড়া ছিল। তবু, ওসব কিতাবের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, হুজুর আমাদেরকে হাদীসের দীর্ঘ ইতিহাসের অলিগলিতে যে অভাবনীয় সফর করিয়েছেন, তা কেবল কিতাব পড়ে সম্ভব নয়। তিনি যখন হাদীসের ইমামদের জীবন ও অবদানের কথা বলতেন, তখন মনে হতো আমরা ঐ ইমামকে চোখের সামনে দেখছি।

বিশেষত, আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ, আল্লামা মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান, আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ ইবন আলাওয়ী এবং হুজুরের অন্যান্য উস্তায (রাহিমাহুমুল্লাহ) যারা ছিলেন, আমাদের মনে হয়নি যে, তাঁরা কেবল হুজুরের উস্তায। হুজুর এমনভাবে

তাঁর উস্তাযদের পরিচয় করিয়েছেন, মনে হয়েছে তাঁরা আমাদেরই উস্তায। আমি লিখে এই অভিজ্ঞতার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারব না। বহুদিন চলল সেই দারস। ইলমুল হাদীসের প্রথমদিকে কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো, এরপর লিখিত যুগে তা কীভাবে বিকশিত হয়েছিল, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ায় হাদীস কীভাবে পৌঁছেছে, এতে কার কী অবদান ছিল, হাদীস ও ফিকহের মধ্যে ইমামদের সম্পর্ক কীরূপ ছিল, হাদীস ও তাসাউফের ইমামদের সম্পর্ক কী রূপ ছিল এবং হুজুরের নিজের দীর্ঘ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জীবন তিনি আমাদেরকে সবই খুলে বলেছেন। তুলনা দিচ্ছি না, তবে আমার মনে হতো, মুসা আলাইহিস সালাম যেভাবে তাঁর সাগরিদ ইউশা ইবন নূনকে সাথে নিয়ে এক বিশেষ ইলমের সন্ধানে অভিযাত্রা করেছিলেন, হুজুর সেই সুন্নাহ অনুসরণে তাঁর কিছু সাগরিদকে সাথে নিয়ে ইলমে হাদীসের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং আসহাবুল হাদীস তথা মুহাদ্দিসীনের জীবন ও কর্মের সন্ধানে বেরিয়েছেন। নিঃসন্দেহে হুজুরের কাছে ইতিপূর্বে অনেক বড় বড় উলামা ইলমে হাদীস পড়েছেন। আমাদের চেয়ে অনেক বেশিই পড়েছেন। কিন্তু হুজুরের জীবন সায়াহ্নে এসে তাঁর সনদের এই দীর্ঘ যাত্রা আমরাই পাড়ি দিয়েছি, এটি আমাদের অনন্য সৌভাগ্য।

এরপর যখন মুসালসাল হাদীসসমূহ পড়ে শুনিয়েছি, তখন অসুস্থতার ভার সহ্য করেও হুজুর উঠে বসেছেন। *মুসালসাল বিল মুসাফাহা* পড়ানোর পর তিনি হাত বাড়িয়েছেন, আমরা এক এক করে তাঁর সাথে মুসাফাহা করেছি। *মুসলসাল বিল মাহাব্বাহ* পড়ানোর পর কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেছেন, "জানি না, আমার মহব্বতে আপনাদের কোনো ফায়দা হবে কিনা। তবুও আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাদেরকে মহব্বত করি।" আমাদের চোখ ভিজে গেছে।

তুহফাতুল লাবীব (হুজুরের সনদ) শেষ হতে কয়েক সপ্তাহ সময় লেগেছিল। আমার সৌভাগ্য যে, পুরো সনদ, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমিই পড়ে শুনিয়েছি। এরপর আমরা ফিরে গেলাম সহীহ বুখারীতে। এবার আমি একা পড়িনি। আমরা এক একজন এক একটি করে হাদীস পড়তাম, আর হুজুর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে যেতেন। বুখারীর প্রথম অধ্যায় (কিতাবু বাদউল ওয়াহঈ) শেষ করার পর হুজুর বললেন, আর থাকুক। আমরা অনুরোধ করলাম, প্রথম অধ্যায় যখন পড়েছি, শেষ অধ্যায়ও পড়ে ফেলি। হুজুরের সম্মতিতে বুখারীর শেষ অধ্যায় (কিতাবুত তাওহীদ) পড়া হলো। হুজুরের শারীরিক অবস্থা তখন দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। আমরা প্রতিদিন যেতাম, বসতাম, কিন্তু হুজুরের শরীর কুলাতো না। মাঝেমধ্যে ডাকতেন, একটি বা অর্ধেক হাদীস পড়াতেন। আবার শরীর খারাপ করত। এভাবে করে করে সহীহ মুসলিমের প্রথম (ঈমান) অধ্যায় অনেকটা পড়া হলো। আমরাও বুঝতে পারলাম, আর জোরাজুরি করা মানে হুজুরকে কষ্ট দেয়ার নামান্তর। হুজুর আমাকে এবং মাওলানা রেদওয়ান আহমদ চৌধুরীকে তাঁর পরিপূর্ণ সনদ প্রদান করলেন। বাকি দুজনের আগে থেকেই সনদ নেয়া ছিল। ইলমে

নববীর বরকতময় সিলসিলায় নিজের নাম সংযুক্ত হতে দেখাটি ছিল আমার ক্ষুদ্র জীবনের পরম পাওয়া।

পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে হুজুর অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলতেন, অনেক উপদেশ প্রদান করতেন। প্রথমদিন বলেছিলেন, "বাবা, কুরআন ও হাদীসে কিছু সুক্ষ্ম ও জটিল পরিভাষা পাওয়া যায়। যেমন, *ইস্তিওয়া আলাল আরশ*, *ইয়াদুল্লাহ*, *ওয়াজহুল্লাহ* ইত্যাদি। এগুলো আকীদা বা ইলমুল কালামের গভীরতম বিষয়। নিজের পড়ার শখ হলে পড়বেন, কিন্তু এসব আলোচনা ওয়াযের মাহফিলে বা সাধারণ মানুষের মজলিসে উপস্থাপন করবেন না। সহজেই সন্দেহের মুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।" আমি এমনিতেও ইলমুল কালামে আগ্রহী নই, ছিলামও না কোনোদিন। ওসব জটিল বিষয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজেও লাগে না। কবরে বা হাশরের দিন যেসব প্রশ্ন করা হবে, তার মধ্যে ইলমুল কালামের এসব জটিল বিষয় অন্তর্ভুক্ত নয়। তার ওপর হুজুরের নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে আমি একদমই এসব নিয়ে ভাবা বাদ দিয়েছি।

সুন্নাতে রাসূলের প্রতি হুজুরের যে অভাবনীয় টান, সেটি কারও অজানা নয়। হুজুর প্রায়ই শায়খ আহমদ সারহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী রাহিমাহুল্লাহ এর উদাহরণ টানতেন। বলতেন, শায়খ মুজাদ্দিদ কীভাবে ভারতের বুকে সুন্নাতে রাসূলকে জিন্দা করেছেন। হুজুর আমাদেরকে কয়েকবার নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন সুন্নাতের প্রচার-প্রসারে অধিক যত্নবান হই। বলেছেন, "আপনারা যার সাথে কথা বলবেন, যে মজলিসে বসবেন, যে আলোচনাই করবেন, চেষ্টা করবেন উঠে আসার আগে শ্রোতাদেরকে অন্তত একটি সুন্নাহ শিখিয়ে আসতে। এতে সহজেই সুন্নাতের প্রসার হবে। মুজাদ্দিদে আলফেসানী এরকমই করতেন।"

আজকাল অনেক ভাইদের মধ্যে হুটহাট করে হাদীসকে দ্বয়িফ বা ক্ষেত্রবিশেষে জাল বলতে দেখি। তারা সামান্য একটি ছুতো পেলে বা একজন মুহাদ্দিসের তাহকীক অনুসরণ করে অসংখ্য হাদীসকে বাতিল করে দেন। নিজের পছন্দসই হাদীস গ্রহণ করেন। হুজুরকে আমরা এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি আঁতকে উঠেছেন। বলেছেন, "এটি খুবই দুঃখজনক। এভাবে কেউ একজনের মতের ওপর ভিত্তি করে হাদীস ফেলে দেয়ার অর্থ হচ্ছে হাদীসের সাথে দুষমনি করা। আমাদেরকে হাদীস গ্রহণ করার অজুহাত খুঁজতে হবে, হাদীস বর্জন করার অজুহাত নয়।"

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সনদ যে কেবল হাদীসে সীমাবদ্ধ তা নয়। তিনি ইলমে কিরাতের একজন খাদিম। নিজের উস্তায ও মুর্শিদ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ'র কাছ থেকে ইলমে কিরাতের সনদ তিনি গ্রহণ করেছেন। সারাজীবন ইলমে কিরাতের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। হুজুর ইমাম তিরমিযীর শামাইলে মুহাম্মাদিয়া, ইমাম কাযী আয়াযের আশ-শিফা, ইমাম সুয়ূতীর তাফসীরে জালালাইন, ইমাম জাযুলীর দালাইলুল

খাইরাত প্রমুখ বিশ্বখ্যাত হাদীস, সীরাত, তাফসীর ও দুরূদের কিতাবের অবিচ্ছিন্ন সনদও হাসিল করেছেন। একইভাবে তিনি ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রাহিমাহুমুল্লাহ), তথা আহলে সুন্নাতের চারজন ইমামের সাথেই মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন সনদে যুক্ত হয়েছেন। বরেণ্য আলিমে দ্বীন আল্লামা ড. তাহির-উল-কাদরীর কাছ থেকে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ইলমে ফিকহের চারজন শ্রেষ্ঠ ইমামের সনদ লাভ করেছেন। অথচ ড. কাদরী মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। কিন্তু হুজুর ইলমে দ্বীনের স্বার্থে বয়সের পার্থক্যকে গণ্য করেননি। আবার স্বীয় মুর্শিদ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ'র মাধ্যমে ইলমে তাসাওউফের সিলসিলায় হুজুর যুক্ত হয়েছেন। ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পদচারণা, বিশেষত সনদের প্রতি তাঁর গুরুত্বারোপ দেখে স্মরণ হয় ইমাম আবদুল্লাহ ইবন মুবারকের অমর উক্তি-

إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

"সনদ হচ্ছে দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদি সনদ (যাচাই-বাছাই করার প্রবণতা) না থাকত, তাহলে যার যা ইচ্ছা, তা-ই বলে বেড়াত।"

আমাদেরকে সনদ প্রদান করার পর হুজুরের শরীরিক অবস্থা খুব দ্রুত অবনতির দিকে চলে গেল। হুজুরকে সিলেট শহর থেকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি হুজুরের বাড়িতে দুবার তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। প্রথমবার যাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন। জানালাম, আমি জার্মানিতে যাচ্ছি মাস্টার্স থিসিসের জন্য। বললেন, "বাবা দুইটা কথা আপনার উদ্দেশে আমি বলতে চাই। প্রথমটি হলো, আমি চাই আপনি পিএইচডি শেষ করবেন। এর আগে থামবেন না। আর দ্বিতীয়টি হলো, আমার সনদখানা জারি রাখবেন। হয়তো কিছুদিন পর মানুষ আপনার কাছে আসবে হাদীস শুনার জন্য। তাঁদেরকে হাদীস শুনাবেন এবং আমার সনদ তাঁদেরকে দেবেন।" আমি ওয়াদা তো করলাম হুজুরের কাছে, কিন্তু তখন এবং এখনও জানি না, ওই বরকতময় সনদখানা সামনে এগুনোর যোগ্যতা আমার কখনো হবে কিনা!

দ্বিতীয়বার যখন দেখতে গেলাম, তখন শরীর আরও বেশি খারাপ করেছে। বললেন, "বাবা আমি কিছু খেতে পারি না। পেটের ক্ষুধায় খুব কষ্ট পাই।" আমি কান্না ধরে রাখতে পারিনি। পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "এই জীবনে এশিয়া, ইউরোপ, আরব, আফ্রিকা সব দেশে আমি গিয়েছি। যে আল্লাহ আমাকে দুনিয়ার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়েছেন, সে আল্লাহ যদি দুইটা দিন বিছানায় বন্দী করে রাখেন, তাহলে তো শিকায়াতের কোনো কারণ নেই, তাই না?" হুজুর যখন তাঁর রবের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছিলেন, আমি তখন তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে আল্লাহর এক ওলীকে দেখতে পাচ্ছিলাম। এমন একজন ওলী, যার পুরো জীবন কেটেছে ইলমে

নববীর পবিত্র ও শুদ্ধতম ভার নিজের কাঁধে বহন করে। এমন একজন ওলী, যিনি হাজারো মানুষের হৃদয়পটে 'মুহাম্মাদ' নামের মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন। এমন এক ওলী, যাদের ব্যাপারে খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ

"আল্লাহ ওই ব্যক্তির চেহারাকে চিরউজ্জ্বল রাখুন, যে আমার একটি হাদীস শুনল, সেটিকে সংরক্ষণ করল, এবং সেভাবেই অন্যের কাছে তা পৌঁছে দিল।" (তিরমিযী, হাদীস-২৬৫৬)

এই মুবারক হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দিল আরেকটি ঘটনা। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের কাছ থেকে সনদ গ্রহণ করার পরই মনের মধ্যে আরেক শূন্যতা দেখা দিল। চলে গেলাম মুর্শিদে বরহক আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ'র কাছে। একটু ঘুরিয়ে বললাম, "ছাব, আমি মুহাদ্দিস ছাহেবের মাধ্যমে সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ এর হাদীসের সনদে যুক্ত হয়েছি। আমার খুব শখ, যদি এই সনদে আরেকবার যুক্ত হতে পারি।" বড় ছাহেব বুঝতে পারলেন আমি তাঁর কথাই বলছি। কারণ বড় ছাহেব সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ এর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। হেসে বললেন, "তুমি আমার কাছ থেকে সনদ নেওনি?" বললাম, "আগেরবার যখন আপনি সনদ দিয়েছিলেন, তখনও আমার কামিল শেষ হয়নি। আমি আগামী মাসে জার্মানিতে চলে যাব। তাই চাচ্ছিলাম।" বড় ছাহেব তাঁর ছোট ছেলে সাদীকে ডেকে বললেন, "মারজানের জন্য একখানা সনদ প্রস্তুত করো।" এরপর আমাকে বললেন, "খানেকায় রাতে দারসে হাদীসে অংশগ্রহণ করে আমাকে হাদীস শুনিয়ে যেও।" এর আগেও বহুবার বড় ছাহেবের দারদে হাদীসে বসেছি। কিন্তু সেবার আমার জন্য বিশেষ এক রাত ছিল। হাদীস শুনালাম। পরদিন বড় ছাহেব সনদে স্বাক্ষর করে দিলেন। আমি অধম আল্লাহর আরেক মহান ওলীর নামের সাথে নিজের নাম যুক্ত করে নিলাম।

কথাগুলো শুনতে কেবল স্মৃতিচারণ মনে হলেও এগুলো এরচেয়ে বেশি কিছু। ইলম, আমল ও আখলাকের এই অবনতির যুগে এসেও আল্লামা ছাহেব কিবলাহ, বড় ছাহেব ও মুহাদ্দিস ছাহেবের মতো ব্যক্তিত্বের ওয়াসীলায় আমরা আল্লাহর হাবীব ﷺ পবিত্র সনদে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারছি। এটি একদিকে যেমন পরম সৌভাগ্য, অপরদিকে এক ভারি দায়িত্বও বটে। আমাদের পূর্বসূরিরা তো আমাদেরকে বিশ্বাস করে এই দায়িত্বগুলো দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা কি পারব তাঁদের দেয়া আমানত রক্ষা করতে? আমরা কি আল্লাহর দ্বীনের সার্থে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত? আমরা কি দ্বীনের খিদমত এমনভাবে আঞ্জাম দিতে সক্ষম যে, কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে যাবেন? বারবার নিজেদেরকে এই প্রশ্ন করা উচিত।

লেখক: গবেষণারত, এয়ারফোর্ট ইউনিভার্সিটি, জার্মানি।

A great Muhaddith of our time

Moulana Muhammad Abdul Qahhar

Shaikhul Hadith Allamah Muhammad Habibur Rahman Rahimahullah, (Muhaddith Saheb as he is commonly known as) was a great Ni'mah for the Muslim World in general and for the Bengali community in particular. His presence will be missed by the passing of time. He touched the hearts of countless people from all walks of life, especially students and ulama.

This miskeen, is also one of those fortunate ones to have the privilege to sit by his blessed feet and carry his shoes. I will endeavour to share some moments and experiences that I shared with him, and benefitted from him, over the years. I embark on this with a great deal of trepidation and it is indeed a difficult task to write about the Awlia, as any inaccuracy or misinformation would be of personal detriment.

First Meeting

In the early 1980's there were only few mosques in East London. Brick Lane Jame Masjid was one of the largest and busiest. Muslims from around greater London and surrounding towns would attend the Jumu'ah Salah and Taraweeh in Ramadan.

When prominent Scholars and Awlia would come to the UK to impart knowledge of the Deen to quench the thirst of the believers and fill their hearts with the love of Allah Ta'ala and His Beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, the atmosphere generated by their presence would be akin to that of Eid.

During the visits of Muhaddith Saheb Huzur, there would be a buzz in the community that 'a Great Muhaddith is here'.

As a teenager and a novice just starting out in my pursuit of Islamic Sciences, I was intrigued to know more about him. My honourable teacher Hafiz Abdus Shahid briefly explained that he is an expert and specialist in the field of Hadith and that he is the teacher of thousands of Ulama. This was my first exposure to Muhaddith Saheb Huzur and set in train my affiliation with him from which I have benefited immensely.

During one of these particular visits by Muhaddith Saheb Huzur, there was a gathering arranged in which he had agreed to attend and speak in order to impart benefit and knowledge of the local community. I was excited and eager to meet a great muhaddith of our time.

Subhanallah! When I first saw his illuminated face, my heart witnessed that this is indeed a Wali of Allah. That day, his blessed face was glowing and to me it seemed as if it was emitting light.

As he started his bayan, his voice carried through the halls of the masjid as though powered by a current and the eloquence of his rhetoric coupled with the profundity of his points, penetrated the heart. The topic of his bayan was, as far as I can remember, on love of Allah Ta'ala.

That initial exposure of his presence and his bayan left a profound impact in my heart and, I believe, members of the rest of the gathering also experienced some degree of spiritual elevation on that blessed occasion. I earnestly wished that day if I could be amongst his students.

By the grace of Allah Ta'ala, my wish was granted and had the wonderful opportunity to be his student but, sadly, I harbour deep regrets that I was unable to utilise that opportunity in the best possible way.

Meeting him as a student

I had to wait five years before I was accepted as a full time student of Hadrat Muhaddith Saheb Huzur Rahimahullah. It was only when I reached Kamil Jama'at at Isamoti Darul Uloom Alia Madrasah, Zakigonj, Sylhet, that I had the blessed opportunity to learn and study Sahih al Bukhari and Jami Tirmidhi directly from him. Through my years of studying at his madrasah, I tried to accompany him in his tours locally and nationally carrying his bag. I treasure those moments.

Ta'leem and Tarbiyyah

Hadrat Muhaddith Saheb Huzur Rahimahullah had a unique way of teaching and imparting knowledge to the mass. He was always well prepared for his lessons. When he would teach Hadith Shareef, he would avoid taking his favourite 'Paan' and would refrain from asking anyone for any favour.

In every Hadith lesson his mood would be extremely sharp, serious and cautious. It is difficult to express in words just how seriously he would take those classes and he aspired and demanded the highest level of adab from all involved. The class environment would feel different and only when the lesson ended, would the atmosphere return to some degree of normality.

Ijazah and indication from Madeenah Tayyibah to teach Hadith

Hadrat Muhaddith Saheb Huzur Rahimahullah mentioned a profound story in one of his interviews regarding the commencement of his journey in teaching the blessed knowledge of Ilmul Hadith. He explained that his Spiritual Master and Murshid, Qutb e Rabbani, Shamsul Ulama, Allamah Muhammad Abdul Latif Chowdhury, Saheb Qiblah Fultali Rahimahullah after opening the Kamil Jama'at at the legendary madrasah of greater Sylhet, Satpur Darul Hadis Alia Madrasah, that he was struggling to find a suitable Muhaddith for the post.

One night, he saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Crown of the Creation and expressed the matter as to who should he recruit for teaching

Hadith. Then, Sarwar e Kainaat sallallahu alaihi wasallam indicated towards Hadrat Muhaddith Saheb Huzur Rahimahullah.

I believe, due to this blessed selection from Madeenah Tayyibah and Khas Dua from Peer o Murshid, Hadrat Saheb Qiblah Fultali Rahimahullah, the atmosphere in his classes and in public gatherings were at a different level to ordinary scholars.

Durood e Khidr

Another reason his Bayan, Ta'leem and Dars e Hadith were extremely effective is due to Huzur Rahimahullah being blessed to receive a Durood Shareef from Hadrat Khidr Alaihis Salam in a dream.

Although I had the extreme privilege to carry Huzur's shoes for many years, I only found out the story behind this special Durood Shareef much later – such was the degree of his humility. He used to teach us this Durood Shareef with special care.

Huzur Rahimahullah was overcome by worry and out of humbleness he thought he wasn't ready and qualified enough to teach higher level classes. Even though he obtained first class in all of his student exams, and even came top 20 nationally in some of his exam. To be more precise, he came in 10th Place in Alim Final Exam, 3rd Place in Fazil Final Exam and 12th Place in Kamil Final Exam of then East Pakistan Madrasah Board.

One night he saw Hadrat Khidr Alaihis Salam in his dream and expressed his weakness as a teacher. Khidr Alaihis salam then taught him the following Durood Shareef.

Allahumma Salli 'ala Sayyidina Muhammadin Mamba'il Judi wal Karami
wa Salli 'ala Sayidina Muhammadin Makhzanil 'Uloomi wal Hikami
wa Salli 'ala Sayyidina Muhammadin Matla'il Anwari
wa Salli 'ala Sayyidina Muhammadin Mazaril Asrari
wa 'ala Aalihi wa Sahbihi wa Barik wa Sallim

A Dua after the final exam.

Hadrat Shaikhul Hadith Rahimahullah had a unique trait of looking after the overall wellbeing of his students and showed deep love and compassion to them. He would always try to help them progress in life, especially in matters of the Deen. His regular dua amongst many that I have seen, were for his students and loved ones to keep them on the straight path and to make them pious.

After the final exam for Kamil, as I accompanied him to a dawat, in the Rickshaw he told me to keep reading the following Dua:

Allahummahdina Wahdibina wa Ja'alna Hudatam Muhtadeen

'O Allah, guide us and guide through us and make us rightly guided guides.'

The importance and significance of this dua gets stronger by the day. He would teach us important duas from the Hadith and he made sure that we practiced them regularly. He wrote a book on Masnoon Duas, which was first published in 1974.

His dua and involvement in opening Darul Hadis Latifiah, London

Shaikhul Hadith, Hadrat Muhaddith Saheb Rahimahullah, was always pushing his students to keep studying further. However, when I expressed to him my intentions to study further, he told me not in Bangladesh, but that first I should go to the UK and help Mufti Ilias Hussain who has been instructed by Shamsul 'Ulama, Allamah Saheb Qiblah Fultali Rahimahullah to start a full-time madrasah in London.He was present in the opening ceremony of Darul Hadis Latifiah formerly known as Madrasah e Darul Qirat Majidiah. I have seen how Mufti Ilias Hussain would go to Hadrat Muhaddith Saheb Rahimahullah frequently for advice and guidance.

During his tours around the UK, he would encourage and instruct his students and followers to support the Madrasah. He would always make dua for the madrasah and everyone involved with it.

UK tours

Out of deference to his Murshid's instructions when travelling, Hadrat Shaikhul Hadith, as mentioned many times, would whenever he would go on travels outside of Bangladesh, seek permission and advice from his Shaikh, Allamah Fultali Rahimahullah. He would fulfill any such nasihah word for word and, at times, would narrate them to us.

His first visit to the UK was in 1981 during that time he was serving as Judge in UAE. After that he visited UK almost every year.

I had the great opportunity to travel with him extensively and carry his bags. That was a dream come true for me. I realised how he would make every trip for the sake of Allah SWT. He used to emphasise the fact that his trip to the UK is a task given by Hadrat Fultali Rahimahullah. All his da'wah tours and invitations to people's houses were for the sake of Allah SWT. I have witnessed many occasions where he declined invitations because of the lack of Khulusiat. He treated all equally, whether rich or poor and I never saw him complain.

On some travels, whilst I was admiring the luxuries on offer at various houses, he would gently but firmly admonish me for such indulgence. He rectified his students in every way possible but in the gentlest way possible. During such trips, at daytime he would often talk about Fiqhi issues as well as other aspects of Shari'ah. However, at night, his discussions were more about spiritual aspects and the love of Allah SWT.

Throughout the UK, he has students spanning almost every major city, from Scotland

in the north to Southampton in the south. He enjoyed attending Tafseer and Dars e Hadith sessions more than the conventional bayan at masajid and conferences. His Dars e Hadith at DHL London were the longest and most consistent. He completed the Shamail e Tirmidhi and about half of Riyadus Saliheen in one of his visits.

International tours

He enjoyed travelling abroad and meeting scholars and immersing himself in the significance of historical places.

One such trip was to Egypt which was his last travelling abroad (other than the UK and Umrah). More than 70 people accompanied him on that trip, the majority of whom were from the Ulama.

During that trip, he had three sessions of Dars e Hadith; at the Mosque next to the shrine of famous Sahabi Uqba bin Aamir RA, at the shrine of Imam Ibn Hajar Asqalani RA and at the Mosque of Al Azhar University. A khatam of Qasida Burdah near the shrine of Imam Busiri RA.

He also travelled to Damascus in Syria. This trip was historical as he met many leading scholars in Damascus, such as Shaikh Asad Shaghirji, Shaikh Hisham Burhani, Shaikh Sayyid Dr Ajjaj and many others. His eldest son, Moulana Muhammad Abdul Awal Helal is writing a fuller account of his various travels and tours which will be of benefit and interest to readers. He also travelled to the historical city Marrakech which he made ziyarah of some great Awliya and historically significant figures of the Maghreb including Imam Jazuli, Imam Qadi Iyad and Imam Suhaili Rahimahumullah.

Around about this time and as he advanced in age, I had this fear and worry that he might leave us much in the same way that a similar thought occurred when we saw off Hadrat Saheb Qibla Fultali Rahimahullah at the airport and his final torch over our heads which I still feel the benefit of above us.

This Ummah is indebted to the likes of Hadrat Muhaddith Saheb Rahimahullah who dedicated his life to serving the Ummah and explaining the Ahadith of Rasulullah SAW to all.

The farewell meeting

During the Covid 19 pandemic, Huzur was in the UK. It was a difficult time for all. Despite the depressing news every day of counting the number of dead, our feelings were a combination of relief and sadness at the same time. We felt relieved because Huzur was with us and was making dua for all of us, but we also felt trepidation due to his advanced age and fragility which exposed him to greater risk.

As he began his departure from the UK, he was leaving from his residence in East London. It just felt different. Normally we always had hope and

anticipation that he will return the following year and that we will be enlightened again by his presence along with the opportunity to travel to another important destination with him.

Around about this time and as he advanced in age, I had this fear and worry that he might leave us much in the same way that a similar thought occurred when we saw off Hadrat Saheb Qibla Fultali Rahimahullah at the airport and his final touch over our heads which I still feel the benefit of above us.

This Ummah is indebted to the likes of Hadrat Muhaddith Saheb Rahimahullah who dedicated his life to serving the Ummah and explaining the Ahadith of Rasulullah SAW to all.

Hajj

His Hajj and Umrah: We find in many scholars' biographies making mention of the number of Hajj they have performed, such as Imam Abu Hanifa Rahimahullah completed Hajj 50 times and Imam Makki Ibn Ibrahim Rahimahullah did so 60 times. Likewise, Hadrat Muhaddith Saheb Rahimahullah has also performed Hajj and Umrah many times. However, I can mention here that his first Hajj was in 1978 and last Umrah trip was in 2020 and in between he went to haramain shareefain almost every year, either for Hajj or Umrah.

During his Hajj and Umrah trips he would meet many prominent Ulama and Mashaikh. Such as Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki Rahimahullah from who he obtained Ijazah of Hadith, Tafseer, Fiqh and other Islamic Sciences.

He used to say regarding going to Haramain Shareefain out of humbleness and extreme longing that if there was a chance that someone kicked him to the Haramain Shareefain, he would have asked to be the recipient of such kick. There is a profound lesson in humility and longing to learn from this upon reflection

Fortunately, my first Hajj was with him. We went from the UK and Huzur came from Bangladesh with his family, his wife and eldest son Moulana Abdul Awal Helal in 1999.

I can share one 'amal Huzur taught me during Tawaf. As we were doing Tawaf and I would try to be as close as possible behind him, he turned around and said with a degree of importance and seriousness which I cannot explain with words, namely that, Saheb Qibla Fultali Rahimahullah told him to recite the dua of Tawajjuh at the last round of Tawaf.

The dua of Tawajjuh is the dua read in Khaneqa after every round of zikr.

Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allah, Dullani Bika…

Seclusion with his Murshid

During the first Isale Sawab of Saheb Qibla in the UK, I remember Huzur narrating his experience during a Chilla seclusion in a mountain. He had to be in

the same Chilla Khana as his one was not ready before sunset, so Saheb Qibla told him to stay in his until the other one is ready.

Two things he expressed during the seclusion: firstly, the way Saheb Qiblah Rahimahullah used to cry to Allah SWT in such a way that he never saw before. Secondly, he said that at night his gaze fell on the door (normally made of bamboo sticks for temporary uses). To his shock he saw a tiger sitting by the door and looking at Saheb Qibla Rahimahullah. He said Saheb Qibla Rahimahullah reassured him to not worry. Just to comfort him, he told him if he wants, he can go and hold the tiger's tail by reading a certain dua. There are many other prominent eyewitnesses of similar incidents.

Few other incidents

Shahazpuri Qari Raisuddin Rahimahullah was a great wali in his own right who was well- known for his kashf. He was the Khalifah of Hadrat Abdul Mannan Chowdhury Hingairkuri Rahimahullah and a close friend of Huzur. He was in Khilwah (seclusion) for 12 years in the mountains and jungle all by himself. He once said that he saw in a dream that Hadrat Shaikhul Hadith Allamah Mushahid Ahmed Bayampuri Rahimahullah was seated on a chair on an ocean. After a while, he stood up and left and he subsequently saw Hadrat Muhaddith Saheb sitting in his place!

Cessation of teaching

Huzur narrated once that he was considering the stopping of teaching hadith due to students' lack of enthusiasm and adab. He did not express it to anyone.

During a Hajj Safar, while in Madeena Tayyibah, after coming out from Ziyarah, Saheb Qibla Rahimahullah took him to a side and told him: you have embarrassed us Muhaddith Sab.

In shock, Huzur wanted to know how. Saheb Qibla Rahimahullah continued: "Have you intended to stop teaching hadith? Rasulullah indicated this to me, don't you know how I got ijazah for you from Darbare Risalah?"

Huzur mentioned that he was terrified and asked forgiveness from Saheb Qibla and requested him to intercede for him to Darbare Risalah and he will never stop teaching hadith until his last breath.

Huzur in Madeena Tayyibah with Saheb

In one of the rare moments when Huzur was missing Saheb Qibla, he narrated a dream to us.

It was during one of his Hajj Safar. After arriving in Madeena Shareef, many people from the group approached Huzur and requested him to ask Saheb Qibla if he would accompany them to ziyarah to give Salam to Rasulullah SAW. He said, when I asked Saheb Qibla about their request, Saheb Qiblah replied: "We didn't come out of our own whims. We were invited. Go to sleep and see if you get any indication about our ziyarah". After that, huzur told everyone to have

some rest and to go to sleep.

In the dream, Huzur saw the Crown of Creation SAW. Huzur Sarware Kainat SAW was sitting on a beautiful horse carriage, which stopped in front of the house they were staying. Huzur approached and asked with adab about the visit. By then Saheb Qibla came out, He SAW indicated to Saheb Qibla and said: "I came to take him". He SAW indicated that Saheb Qibla should come and sit next to him. Saheb Qibla was hesitant as to how he could sit next to Rasulullah SAW. He SAW moved a bit to make space for Saheb Qibla to sit comfortably. Huzur then heard a knock on the door and woke up.

He opened the door and it was Saheb Qibla saying: Get ready we are asked to go now.

Huzur said: I was surprised and amazed as to how close Saheb Qibla Rahimabullah was to Rasulullah ﷺ

Shahr Qutb and Hadrat Muhaddith Saheb Huzur Rahimahullah

The books of Tasawwuf mention that there are two types of Qutb. The first type are called Qutbul Irshaad who guide people to Allah Ta'ala through bayan, ta'leem and tarbiyyah. The other type is Qutbul Maknoon who are hidden and unknown such that not many people recognise them and most of the time they are in disguise as they wish to remain anonymous. They are also called Mahjub.

There are many stories about them and Hadrat Muhaddith Saheb Huzur Rahimahullah. Even as a child, when he was attending Hafizi madrasah, he encountered one such hidden Qutb.

One day, as he was returning from the Isapur Hafizi Madrasah, he saw many children asking this Mahjub Sharafat Ali RA to give them something, but he refused them all.

Hadrat Muhaddith Saheb Huzur Rahimahullah also asked him and, surprisingly, he was given a leaf. He later ate it and experienced the supernatural realm. He was being pulled towards them but luckily Hadrat Saheb Qiblah Fultali Rahimahullah treated him and eventually he recovered from that state after a year.

Conclusion

These are just a small selection of my personal reflections following my suhba and encounters with Hadrat Muaddith Saheb Huzur over a span of many years. I have shorted this due to brevity but if I wanted to, I could go on for some time relating further such inspirations I gained from him along with others. Needless to say, he had a profound impact on my life and my greatest regret was not taking more benefit from the time I had with him. I pray Allah ta'ala elevates his station in the hereafter and to reunite us in the best of circumstances in the hereafter.

Writer: Vice Principal, Darul Hadis Latifiah London.

The Ghazzālī of our Age

Ed Husain

My first memories of Allamah Habib al-Rahman are from age nine when he would visit England, stay at our home, laugh and joke with my father, and yet be sternly serious in the presence of their spiritual master: Shaikh Abd al-Latif. This trio and their network shaped my early religious life and now, far from England, I am based in the United States but the light of faith from that great master of law and jurisprudence, widely known as Muhaddith Saheb, continues to guide me.

Five traits stand out for me from the life of the sage that was Muhaddith Saheb. He taught not only through words, but deeds.

1. **Patience**

   In the thirty years that I knew him, sat in his presence, carried his books, drove him across England with my father, he never lost his temper. Amid the questions of the masses, complaints of the egotistical, neglect by those who sought attention, Muhaddith Saheb was unstintingly patient. He raised his words, always brief and witty, never raised his voice. On long journeys, tens of times food was unavailable or the car seating was tight or the accommodation, uncomfortable or the bathroom at a lower standard. Not once did he complain. The Sufis say that complaining is to deny the blessings of God. Muhaddith Saheb manifested that way of being.

   In my twenties, I tried to memorize the Quran. His support, constant encouragement, praise and wisdom kept me going. I failed, but his love and mentoring never stopped.

2. **Humility**

   Today, we hear Jewish rabbis or Muslim imams introduce themselves by their titles. Muhaddith Saheb would always speak in subdued tones and introduce himself as ‘Habib al-Rahman’, not as ‘mawlana’ or ‘shaikh’ – it was a state of mind that was far more confident in faith and humble in knowing that there was so much more to know, that titles did not define or motivate him. In order to avoid drawing attention, he avoided wearing a turban in public and chose to do so only after express request from his spiritual lineage. He was happy to be led in prayers by much younger people and rarely gave direct orders. When in his sixties and living on the ground floor of a three-storey building, he once said to me ‘My son, please get some exercise and search if possible for a luggage on the top floor.’ It was never a sense of entitlement, always an approach kindness and leaning on youth, but with love.

He honored young and old. Teachers from Arab lands or Pakistan who knew a lot less than Muhaddith Saheb never understood that they were rivers beside his ocean, but his depth kept them flowing. He sought their blessings when, in my free mind, it should be they who seek his. I digress.

3. **Love for the Prophet**

The Arabs say that the lover always remembers the beloved. There was no encounter, prayer, lecture or class in which Muhaddith Saheb ever overlooked recalling the most beloved of God, the Prophet Mohamed. And it was no ordinary love. He woke up one day from afternoon nap smiling and elated, but saying nothing. He had that rare ability to anticipate and answer a question from the silence in a room. 'Yes, the moonlight appeared again. He was happy, standing over there and said…' His visions of the Prophet were regular and he coded them so as not to appear vainglorious. I do not wish to betray confidences, but such moments were frequent. Aged 17, I went with him to Mecca and then Medina. In Mecca, at every point, from the Ka'bah to Safa and Marwa, he held my hand taught me the prayers, always explaining this was how and what the Prophet did for God.

In Medina, he would not attend the chamber of the Prophet, but wait in the hotel, until the Prophet appeared in dreams with approval. In life, if such matters were discussed, he would change the subject. Instead, he would teach powerful prayers that believers closer to the source of belief, the Prophet, and thereby to God.

4. **Love for Books**

I was in my thirties and began to collect classical Arabic texts. Rather than eat or drink on time, he would peruse the books of fiqh or sira on my shelves. In his travel luggage, there were always several books. Growing up with him in my life, instilled in me and my family that love of books and hence knowledge, history, ideas, impact, and continuity. Caught between cultures, I often found it difficult to explain my books or audiences, but he always listened to ideas and encouraged writing. Taking him to a bookshop was literally like taking a child to a candy store, as they say in America. He would have remarks to make on every book, genre and gaps in the market.

5. **Mysticism**

He was an astute observer of humans because he had a metaphysical approach to reality. There was always another dimension at work with Muhaddith Saheb. One could enter his presence and he immediately seemed to know what to say to answer a thought that had not yet been formulated into a question. There was a serenity in his companionship, a shelter from the chaos of the world. Now in my forties, I remember two predictions he made

about life. Both came true. Twenty years ago he said that I would travel much and far. And then he said something else that remains between God, him and me. Both mystical insights were proven right for an ordinary kid from London who had the blessing of carrying his shoes.

Rare was that combination of his personality, patience, humility, love for books, the Prophet, writing and teaching, and then deep mysticism. He was a Hanafi loyalist, but the man with whom he compares most is the great teacher from almost a millennium ago from the Shafi'i-Ash'ari school: Imam Abu Hamid al-Ghazzālī. It was that synthesis between books and reality, law and mysticism, love and loyalty, students and masses, at home and also travelling abroad, and keeping the believers within the tradition while ensuring ease and moderation ran supreme.

Will another thousand years pass until someone else emerges as balanced and beloved as Muhaddith Saheb? To get a taste of these great teachers, I recommend reading *Ayyuha al-Walad* by Ghazzali in Arabic or *Letter to a Disciple* in English.

Author: *Ed Husain is an author of several books, advisor to governments, and a professor at Georgetown University's School of Foreign Service in Washington DC.*

অনন্য রাহবার

মো. মাহতাব উদ্দিন

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আ'লামীনের, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়। দয়াময় দয়াল আমাকে মানবকুলে জন্ম দিয়েছেন এবং মানবতার মুক্তিদূত শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। লাখো দুরূদ ও সালাম আখেরী নবী, হাবীবে খোদা, দু'জাহানের বাদশাহ, সৃষ্টির রাহমাত, নবীকুল শিরোমনি আহমাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি।

রারাই গ্রামের সাথে আমার নাড়ির সম্পর্ক। এ গ্রামেই আমার এবং বাবা, চাচা ও ফুফুদের মাতুলালয়। অতি শৈশব থেকেই রারাই গ্রামে যাতায়াত। তৎসময়ে থানাবাজার থেকে মুমিনপুর হয়ে বাখরশাল তথা কুশিয়ারা নদীর তীর পর্যন্ত একটি জঙ্গল ছিল। ইহা রারাই গ্রামের পশ্চিম সীমা স্পর্শ করে গিয়েছে। উক্ত গ্রামের উত্তর- পশ্চিম কোণার বাড়ির পাশে প্রায়ই পায়চারী করতে দেখা যেতো শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডিত, চেহারায় নবী প্রেম সঞ্চিত জ্যোতির্ময় এক দ্বীনদার খর্বকায় ব্যক্তিকে। মামা-খালাদের জিজ্ঞেস করে জানলাম, ইনি এ গ্রামেরই বাট্টি মুলইছাব (খর্বকায় মৌলবী সাহেব)। পরিণত বয়সে বুঝতে পারলাম, ইনিই আমাদের শিরোতাজ মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর এবং দ্বীনের খাঁটি জ্ঞান সমৃদ্ধ কয়েকজন আলিমের জনক।

যতখানি মনে পড়ে সালটি ছিল ১৯৬৩। থানাজার ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল। মাগরিবের পর কোন এক মাওলানা সাহেব বয়ান পেশ করছিলেন। ঐ সময়ে ছোট্ট মাদ্‌রাসা গৃহের একাংশে একটি চৌকির উপর বসে তিনজন আলিমে দ্বীন আলাপ করছিলেন। তাঁরা ছিলেন মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর, বালাউটি হুজুর হযরত মাওলানা শুয়াইবুর রাহমান এবং খাদিমানী হুজুর হযরত মাওলানা কারী আব্দুল লতিফ রাহিমাহুমুল্লাহ। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর তখন সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে খ্যাত ছিলেন। ঐ দিনই হুজুরকে আমার প্রথম দেখা।

কৈশোর থেকেই মসজিদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে আদায়ে সচেষ্ট থাকতাম। এ সুবাদে অনেক আলিম উলামার সাক্ষাত পেয়েছিলাম। সকল মাসলাকের আলিমগণ হুজুরকে ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ বলে স্বীকৃতি দিতেন এবং তাঁর বয়ান শোনার নিমিত্তে বিভিন্ন মাহফিলে উপস্থিত হতেন। রারাই গ্রামের আমার মামা মরহুম শায়খ আব্দুল লতিফ বলতেন, ফুলতলী মাসলাকের আলিমদের মধ্যে সবচেয়ে নিখুঁত জ্ঞানী ছিলেন আমাদের হুজুর। আমার মামার জানাযা পূর্ববর্তী বক্তব্য দিতে গিয়ে হুজুর বলেছিলেন, তিনি এবং আমার মামা একে অপরকে চাচা বলে

ডাকতেন। আমার মামা প্রায় দিন আরবী ব্যাকরণ, বিভিন্ন মাসাঈল এবং তাফসীর বিষয়ে আলোচনার জন্য হুজুরের বাড়িতে আসতেন।

ফুলতলী গ্রামের মাওলানা সিরাজ উদ্দিন খান এক সময় বীরশ্রীর সোনাপুর মাজহারুল উলুম মাদ্‌রাসার সুপার ছিলেন। আমি তখন গুরুসদয় উচ্চ বিদ্যলয়ের শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক। উভয়ের লজিং একই বাড়িতে। থাকতাম প্রাগুক্ত মাদ্‌রাসার অফিস কক্ষের লাগুয়া রুমে একই বিছানায়। তিনি বলেছিলেন, গাছবাড়ি কামিল মাদ্‌রাসার প্রথম ব্যাপক খ্যাতি ছড়িয়েছিল হুজুরের মাদ্‌রাসা বোর্ডের ফাইন্যাল পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফলের মাধ্যমে। তিনি আরো বলেছিলেন যে, বিষয়ভিত্তিক এবং সময় নির্ধারিত বক্তব্যে হুজুর ছিলেন উক্ত মাদ্‌রাসায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ও সময় একই সাথে শেষ হতো।

কে একজন বলেছিলেন, ব্যক্তি মনে নেই, তবে বিষয়টি মনে আছে। একদিন হুজুর বাসে করে যাচ্ছিলেন। বাসটি যখন কসকনকপুর পৌঁছে তখন ওখান থেকে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রয়াত বাবু সুধীর রঞ্জন দত্ত বাসে উঠেন। তিনি ইছামতি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। বাসে বসার জায়গা তো নেই, দাঁড়ানোও কষ্টকর। হুজুর স্যারকে দেখেই সিট ছেড়ে দিয়ে তাঁকে বসার অনুরোধ করেন। স্যার বসতে না চাইলে হুজুর কিছুটা জোর করে তাঁকে সিটে বসিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন। একজন বয়স্ক শিক্ষকের প্রতি হুজুরের এই শ্রদ্ধাবোধ ও বিনম্র আচরণ নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়।

হুজুরের প্রতিটি বয়ানে ওয়াজ এবং নসীহত একসাথে থাকতো। দালিলিক নিশ্চায়নে তাঁর বয়ান ছিল সমৃদ্ধ। অতি সাধারণ মানুষ থেকে নিয়ে আলিম উলামাগণও সমানভাবে উপকৃত হতেন তাঁর মধুর বয়ানে। কখনো বয়ানে তিনি আক্রমনাত্মক কোন শব্দ ব্যবহার করতেন না।

আমাদের হুজুর ছিলেন হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অত্যন্ত স্নেহভাজন খলিফা। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ছাহেব কিবলাহ তাঁকে নেজামে ইসলাম পার্টি থেকে জকিগন্‌জ - বিয়ানীবাজার-কানাইঘাট (সিলেট ৭) আসনে জাতীয় পরিষদ সদস্য (এমএনএ) পদে প্রার্থী মনোনীত করেন। হুজুরের নির্বাচনী প্রতীক ছিল বই। হুজুরের প্রতিটি নির্বাচনী সভায় ছাহেব কিবলাহ উপস্থিত থাকতেন। ঐ নির্বাচনে হুজুর সম্মানজনক ভোট পেয়েছিলেন।

দ্বীনি জ্ঞান আহরণের স্পৃহা, সার্বিক দিক থেকে রাসূল প্রেমের ব্যাকুলতা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ এবং খোদা ভীতি ইত্যাদি ছিল হুজুরের বৈশিষ্ট। যারা তাঁর সাহচর্যে গিয়েছে তারাই যেনো কষ্টিপাথর ছুঁয়েছে। পড়ন্ত বেলায় এসে এই অধম তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নৈকট্যলাভের আশায় হুজুরের নির্দেশিত পথ অনুসরণের চেষ্টা করি।

হুজুর সকলের মধ্যে নিজেকে অতি সাধারণ ভাবতেন। দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট অনুমোদিত জোবেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শাখা কেন্দ্রে হুজুরকে নাজিম হিসেবে রাখা হতো। একবার দারুল কিরাতের সমাপনী সভায় হুজুর তাঁর বক্তব্যে কথা প্রসঙ্গে বললেন, তাঁর ওয়ালিদ মুহতারাম কোন প্রয়োজনে কাউকে চিঠি লিখলে খামের উপর কিতমির শব্দটি লিখে দিতেন। এর কারন জানতে চাইলে তাঁর ওয়ালিদ মুহতারাম নাকি বলেছিলেন, খামের উপর কিতমির লিখে দিলে চিঠি হারায় না। হুজুর বলেন, কিতমির ছিল আসহাবে কাহাফের সঙ্গে থাকা কুকুরটির নাম। এটি বেহেশতে যাবে। হুজুর নিজেকে কিতমিরের সাথে তুলনা করে বলেন, আসহাবে কাহাফের সঙ্গী ঐ কুকুরটির মত আমিও আপনাদের সাথে দারুল কিরাতের খিদমতে সাথে আছি।

হুজুর যেকোন বিপদে অবিচল থাকতেন। একবার জোবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বুখারী শরীফ খতমে হুজুর উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে আমি হুজুরের পাশে বসা ছিলাম। তখন ইশার নামাযের সময় হয়ে আসছে, হুজুর দুআ করবেন। ঠিক সেই সময় উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প শুরু হয়। ঘরসহ মঞ্চে মারাত্মক কাপুনী শুরু হলো। দেখলাম হুজুর অবিচল এবং নির্ভয়ে মঞ্চে বসে ইসতিগফার করছেন। হুজুরের স্থিরতায় সামিয়ানা এবং ঘরে থাকা মুসল্লিগণ নির্ভয়ে যিকরে মগ্ন হলেন।

কুতুববিনি ছিল হুজুরের অনন্য বৈশিষ্ট্য। রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও তাঁর হাতে কিতাব থাকতো। জীবন সায়াহ্নে এসে রোগাক্রান্ত হয়েও তিনি শত কষ্টকে অবজ্ঞা করে হাদীস শরীফের শিক্ষা বিতরণে সচেষ্ট ছিলেন।

হুজুরের অন্তর্ধানে আমারা হারিয়েছি আমাদের আধ্যাত্মিক রাহবার, জ্ঞান পিপাসুরা হারিয়েছেন তাদের জ্ঞানের বাতিঘর, রক্ত সম্পর্কিতগণ বঞ্চিত হয়েছেন তাঁর নিখাদ অভিভাবকত্ব থেকে। দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলো আর পাবে না তাঁর নির্ভুল দিক নির্দেশনা। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের হুজুরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান করুন। আর আমাদেরকে তাঁর রূহানী ফয়েজ দ্বারা ফয়েজিয়াব করুন। আমীন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, জোবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জকিগন্জ, সিলেট।

আমার অনুভবে আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

আব্দুল খালিক তাপাদার

বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ ও সমাজ সেবক মরহুম আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে দু'কলম লেখার মত জ্ঞান বা সাহস কোনটিই আমার মত মানুষের নেই। তবুও একই গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে দু'চারটি কথা না লিখলে অকৃতজ্ঞ হয়ে যাব।

শুরু করছি আল্লাহর রহমত ও করুনা প্রত্যাশা করে। বিশেষ করে মুহাদ্দিস সাহেবের রূহের মঙ্গল কামনা করছি।

বুরব্বিদের কাছে বহুলভাবে শুনা সিলেট অঞ্চলে ব্যাপক প্রচলিত একটি প্রবাদ 'ভাগ্তে বাচ্চা'; আমাদের গর্ব মরহুম মুহাদ্দিস সাহেব এর বাস্তব উদাহরণ।

ছোটকালে গ্রামের মুরব্বিগণের অনেকের কাছ থেকে শুনেছি, একবার রাতের বেলা মুহাদ্দিস সাহেবের আব্বা মরহুম মাওলানা মুমতাজ আলী সাহেবের ঘর চুরি হয়ে যায়। সকালে খবর শুনে গ্রামবাসি উনার বাড়িতে জড়ো হলেন। অন্দর মহলে আশপাশ বাড়ির কিছু মহিলাও খোঁজ খবর নিতে চলে এসেছেন। দেখলেন, মুহাদ্দিস সাহেবের মরহুমা আম্মা খুব বেশি কান্নাকাটি করছেন। তারা ভাবলেন মালামাল সব চুরি হয়ে যাওয়ায় তিনি কাঁদছেন। মহিলারা তাঁকে সান্তনা দিতে গেলে বললেন, সিঁদেল চোর সম্পদ নিয়ে গেছে তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমি তো ঘুমে অচেতন ছিলাম। চোর আমাকে কোন অবস্থায় দেখেছে, বেপর্দা হয়ে গেলাম, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন কি না এই ভয়ে বারবার কান্না চলে আসছে।

আশ্চর্য এই সংবাদ তখন গ্রামের মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এই ঘটনা থেকে সহজে অনুমান করা যায়, মহিয়ষী এই মহিলা কতটা শরীয়তের অনুসারী ছিলেন, নিজের মনে কতটা গভীরভাবে আল্লাহ ভীতি ধারণ করতেন। তাই তো কালক্রমে তাঁর গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া সন্তানদের মধ্যে পাঁচজন ছেলে খ্যাতিমান আলিম হয়েছিলেন। বিশেষ করে আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস সাহেবের মত বিরল প্রতিভাধর যুগশ্রেষ্ঠ একজন বরেণ্য আলিমে দ্বীন জন্ম দিয়ে ছিলেন এই তপস্বী মহিলা। মূলতঃ অজ পাড়াগাঁয়ে জন্ম নেয়া বর্তমান সময়ের মত কোন ধরণের সাপোর্ট ছাড়াই মুহাদ্দিস সাহেব কেমনে যে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে এমন যশস্বী ও স্মরণীয় হয়েছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

মুহাদ্দিস সাহেবের মাঝে আল্লাহ প্রদত্ব এমন ক্যারিশমেটিক ব্যক্তিত্ব ছিলো যে, তিনি যে

প্রতিষ্ঠানেই গেছেন অল্প সময়ে সেটি একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদরাসার কথা। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি সৎপুর দারুল হাদীস মাদরাসা থেকে এখানে প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদান করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইছামতি মাদরাসা অবকাঠামো এবং শিক্ষা দীক্ষায় পূর্ব সিলেটে শ্রেষ্ঠতম ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এ প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ইউরোপ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

মুহাদ্দিস সাহেবের বহুমূখি গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম হলো প্রতিভা সনাক্তের ক্ষমতা। তাইতো দেখা যায় তিনি রাস্তা থেকে তুলে এনে বহু মানুষকে শিক্ষিত ও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। আমাদের আশপাশে এর অসংখ্য নজির বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর অন্য একটি গুণ ছিলো তিনি দল মত, শ্রেণি বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে যথাযথ মূল্যায়ন ও মর্যাদা প্রদান করতেন। সব মানুষের সাথে বিনম্র আচরণ ও সব সময় হাসিমুখে কথা বলতেন। এত গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্বেও তাঁর কথা ও আচরণে কোন সময়ই ইলমের গরিমা প্রকাশ পেতো না। একারণেই তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং সর্বমহলে মান্যবর হতে পেরেছিলেন।

এলাকার সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি বা আমরা যখনই দিক নির্দেশনা ও পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে গিয়েছি সব সময়ই তিনি একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতেন, নিয়ত সহীহ শুদ্ধ রেখে যেকোন ভালো কাজ শুরু করে দাও, যত কঠিন হোক সে কাজ আল্লাহ পূর্ণ করে দেবেন। নিজে দেখে যেতে পারো কিংবা না পারো একদিন সমাজের মানুষ এর সুফল ভোগ করবে।

মুহাদ্দিস সাহেবের উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হওয়া দরকার। যাতে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের মানুষ তাঁর কর্মবহুল জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

পরিশেষে আল্লাহপাকের দরবারে ফরিয়াদ, তিনি যেনো মুহাদ্দিস সাহেবের কবরকে অপার রাহমাতের চাদরে আবৃত করে রাখেন। আর শেষ বিচারের দিন তিনি যেনো আমাদেরকে হাউজে কাওসারের কিনারে একত্রিত করেন।

লেখক: আমেরিকা প্রবাসী। সাবেক সভাপতি, জকিগনজ প্রেসক্লাব।

ডালপালা বিছানো এক মহীরুহ

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

বাংলাদেশের ইতিহাসে যে কয়েকজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস ইলমে হাদীস অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় চৈতন্যবোধের অবক্ষয়কে রুখে দিয়ে 'রাসূল প্রেম' এর চৈতন্যবোধকে পূণর্জাগরন করেছেন, তাদের দিকপাল হলেন মুহাদ্দিসে আযীম শাইখুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। বাংলাদেশ তো বটেই সমকালিন মুসলিম দুনিয়ার শীর্ষ আলেমদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন শাইখুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। বিশ্বের নানা প্রান্তের হাজারো আলেমের শিক্ষক তিনি। দেশে দেশে ছড়িয়ে আছেন তার অগণিত ভক্ত ও অনুগামী।

সবার কাছে 'মুহাদ্দিস ছাহেব' নামে খ্যাত শাইখুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান। বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেটের জকিগন্জের রারাই গ্রামে ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এলাকার খ্যাতিমান আলিমে দ্বীন মরহুম মাওলানা মুমতায আলী ও মাতা মরহুমা আমিনা খাতুন। ৭ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়।

তিনি ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদরাসায় অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। তাঁর দীর্ঘ শ্রম, ঘাম ও একান্ত প্রচেষ্টা ইছামতি মাদরাসা পূর্ব সিলেটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। তাঁর একক প্রচেষ্টায় মাদরাসার অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়। আলিম, ফাজিল ও কা'মিল ক্লা'শের সরকারি মঞ্জুরি এবং স্বীকৃতি আদায়ে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ইছামতি মাদরাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি সৎপুর কামিল মাদরাসার প্রথম শায়খুল হাদীস ছিলেন। অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরে ইলমে হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত এ মনীষী অধ্যাপনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন মাহফিলে বয়ান পেশ করতেন।

বাংলাদেশের ইসলামি আন্দোলন তথা আধ্যাত্মিক আন্দোলনে বটবৃক্ষ আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন সুন্নতে নববীর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। প্রচুর অধ্যয়ন, সাধনা ও 'ছাহেব কিবলাহ'র কাছে তাসাউফের বাইয়াত গ্রহণ করে নিজেকে ইলম-আমলের একজন মহীরুহ হিসেবে গড়ে তুলেন। প্রথমেই তিনি বেছে নেন মানবগড়ার হাতিয়ার শিক্ষাকতাকে। আরবি, উর্দু, ফার্সি ভাষায় পান্ডিত্য অর্জনকারী আল্লামা হবিবুর রহমান মাতৃভাষায় ইসলামের চিরসবুজ সৌন্দর্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে দেয়া ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষা ছাত্রদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তিনি 'মাসিক শাহজালাল'

ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন। হালজামানায় কোকিলকণ্ঠের বক্তা বলতে যাদেরকে বুঝায় তেমন কোনো বক্তা না হলেও মুহাদ্দিস হুজুরের বয়ানে ছিল প্রভাব। তিনি কোরআন হাদীসের উদ্ধৃতি ছাড়াও যুক্তি উপমা দিয়ে বয়ানে ছিলেন অনন্য। বাগ্মীতায়ও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। বাংলা, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় সমান দক্ষ ছিলেন তিনি।

উর্দুতে বক্তব্য দিয়ে তিনি দেশী বিদেশী আলেমদেরকে তাক লাগিয়ে দিতে পারতেন। ঠিক তেমনি সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের বিমোহিত করে রাখতে পারতেন। লেখালেখিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সহিহ শুদ্ধভাবে কোরআন পড়ার ব্যাকরণ ছাড়াও তিনি গবেষণামূলক কিছু বই রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও রচনার ক্ষেত্রে একজন সফল লেখক এবং অনুবাদক। তার প্রকাশিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংখ্যা ১৯টি।

মুহাদ্দিস হুজুর তার শায়েখ, পীর ও মুরশিদ হযরত ফুলতলী রহ. এর চেতনার দেদীপ্যমান বাতিঘর ছিলেন। তাঁর কাছে তাসাউফের বাইয়াত গ্রহণ করে নিজেকে ইলম-আমলের একজন মহীরূহ হিসেবে গড়ে তুলে ছিলেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়াকে যেমন মেনে নিতে পারেননি; তেমনি ১৯৭১ এ স্বাধীনতার বিপক্ষেও যেতে পারেননি। তিনি স্বাধীনতার একজন অকুণ্ঠ সমর্থক ছিলেন। সংগোপনে, সুসংগঠিত করেছেন যোদ্ধাদের।

বর্তমান খ্যাতনামা আলিম-মুহাদ্দিস, বুদ্ধিজীবি, হাফেজসহ অসংখ্য বিখ্যাত মানুষের দীক্ষাগুরু তিনি। হাদীসের ময়দানে ছিলেন কিংবদন্তি। বাংলা, উর্দু, আরবি ভাষার পন্ডিত। তাই তাঁর দরসের ঝলকানিও ছিল অনন্য সাধারণ। দরসে হাদীসে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সর্বজন স্বীকৃত। মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন এক কালজয়ী প্রতিভা। তাই দল মত ও মসলক নির্বিশেষে তিনি ছিলেন সমাদৃত। ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ রাজনীতির মাঠেও ছিলেন সক্রিয়। করেছেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনও। তিনি ছিলেন একজন প্রথিতযশা পণ্ডিত আলেম। অথচ অহংকারের বিন্দুমাত্র তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

ছিলেন অকুতোভয় সিপাহসালার। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নাস্তিক্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন আল্লামা ফুলতলীর নির্ভরযোগ্য মানুষ। ইসলাম ও দেশ বিরোধী সকল আন্দোলনে মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ আল্লামা ফুলতলীর সাথে থেকে সামনের সারিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যুগপৎ সুফীবাদ ও রাজনীতির সংস্কারের প্রয়াস চালিয়েছেন তিনি।

ইসলামী বিশ্বের একজন মহান ব্যক্তিত্ব, গ্র্যান্ড মুহাদ্দিস আমাদের সকলের ভালোলাগা ভালোবাসর প্রিয় মানুষ, শিক্ষকদের শিক্ষক, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষক, আল্লামা হবিবুর রহমান ২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি না ফেরার দেশে চলে যান। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন এবং তিনি থাকবেন আমাদের হৃদয়ে তাঁর কর্মে তাঁর কৃতিত্বে।

লেখক: অধ্যক্ষ, জহুর চান বিবি মহিলা কলেজ, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর সান্নিধ্য

মোঃ নজরুল ইসলাম

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন পূর্ব সিলেটের জকিগন্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার স্বনামধন্য অধ্যক্ষ। সর্ব মহলে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল "মুহাদ্দিস ছাব" হিসেবে। উনার এ নামের খ্যাতি এতো ব্যাপ্তি ছিল যে "মুহাদ্দিস ছাব" বলতে সকলে এক কথায় হুজুরকেই বুঝতো, জানতো ও মানতো।

আমি অধমের পরম সৌভাগ্য যে, শিক্ষকতার চাকুরি সূত্রে দীর্ঘদিন হুজুরের স্নেহ মাখা সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছি। এ জন্য রাহমানুর রাহিম আল্লাহর দরবারে লক্ষ-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতায় যুক্ত হওয়া সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ ইংরেজি তারিখে সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায় প্রভাষক (বাংলা) পদে যোগদান করে দায়িত্বরত অবস্থায় বর্তমানে ইংল্যান্ড প্রবাসী বন্ধুবর হাফিজ মাওলানা হেলাল উদ্দিন ছাহেব আমাকে অত্র মাদ্‌রাসায় প্রভাষক (বাংলা) পদে আবেদন করতে উৎসাহিত করে বলেন, "আমি যদি ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় চলে আসি তবে মুহাদ্দিস ছাব হুজুর খুব খুশি হবেন।" ব্যক্তিগত ভাবে আমি জানি আমার তেমন যোগ্যতা নেই। কিন্তু হুজুরের সান্নিধ্যলাভের আশায় প্রভাষক (বাংলা) পদে চাকুরি হোক বা না হোক - হুজুরকে একান্ত পরিবেশে কিছুক্ষণ দেখতে পাবো; এই আশায় আবেদন করলাম। ছোট বেলা থেকেই রাখালগঞ্জ ডি. কিউ আলিয়া (বর্তমানে ফাজিল) মাদ্‌রাসায় হুজুরের সুমিষ্ট কণ্ঠের ওয়াজ শুনে আসছি। তবে এ কথা স্বীকার করছি, ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতায় আসার ইচ্ছা ছিল না। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ইং জকিগন্জ থানা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে ইন্টারভিউতে এসে হুজুরের সামনের চেয়ারে বসলাম। হুজুরকে দেখার সাথে সাথে মনের মধ্যে আমুল পরিবর্তন হয়ে গেলো। এমনকি টাকা ছাড়াও হুজুরের মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করার আগ্রহ সৃষ্টি হল। মুহাদ্দিস ছাহেবের পদ ধূলি নেয়ার জন্য মানুষজন মাসের পর মাস অপেক্ষা করতো। আমি হুজুরের মাদ্‌রাসায় স্থায়ীভাবে শিক্ষকতা করবো তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে। ২১/০৯/১৯৯৭ইং সনে অত্র মাদ্‌রাসায় প্রভাষক (বাংলা) পদে যোগদান করে অদ্যাবধি শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছি। ১৯৯৯ইং সনে হুজুরের বয়স শিক্ষা সনদ অনুযায়ী ৬০ বৎসর হওয়ার পর মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডি হুজুরকে মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে পর পর তিন বার সময় বাড়িয়ে নিয়োজিত রাখেন। মাদ্‌রাসায় যোগদান করে সময় সময় হুজুরের আচার আচরণ ও সুশোভন ব্যবহারে হুজুরের প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রা দিন দিন আরো প্রগাঢ় হয়।

মাদ্‌রাসায় আসার পর জকিগঞ্জের পাঠানচক গ্রামের মরহুম মুহিব আলী খান এডভোকেট সাহেবের ছোট মেয়ের সাথে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই ১৯৯৯ সানের ০৯ এপ্রিল তারিখে। আমার শ্বশুর বাড়ির সাথে হুজুরের পারিবারিক সর্ম্পক স্থাপিত হয়েছিল অনেক পূর্ব থেকেই। আমার স্ত্রীর মামার বাড়ি ভারতের করিমগঞ্জ জেলার শরীফ নগরে । পাকিস্তান-ভারত আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার কারণে আমার শ্বাশুড়ী হুজুরকে বড় ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর প্রসঙ্গক্রমে আমার শ্বাশুড়ির অনেক তারিফ করেছিলেন। আমার বিয়ের যখন আলাপ চলছিল তখন আমার মাথায় লম্বা কোকড়ানো চুল ছিল, সেগুলোকে সোজা করা যেতো না। সে সময় আমার স্ত্রীর বড় ভাই আমার সম্পর্কে জানতে হুজুরের কাছে মাদ্‌রাসায় এসেছিলেন আমার অবর্তমানে। হুজুর উনাকে আমার সম্পর্কে অবশ্যই ভালো বলেছিলেন। পরবর্তীতে আমাকে সরাসরি না বলে এ রকম মন্তব্য করলেন 'আপনারা চুল টুল ঠিক করে রাখবেন একটু সুন্দর করে, আমাকে বিপদে ফেলবেন না। কে কোন উদ্দ্যেশে মাদ্‌রাসায় আসে আমি তো তা বলতে পারি না।' হুজুরের এ কথা শুনে সবাই হাসলেন। আমিও আমার বেয়াড়া চুলকে ছোট করে রাখার চেষ্টা করলাম। কিছুদিন পরতো ০৯ এপ্রিল ১৯৯৯ইং এসে গেল।

২রা সেপ্টেম্বর ২০০৪ সনে আমার ২য় ছেলে আরিবের জন্ম হয়। বড় অসুবিধায় পড়লাম। বড় ছেলে সাকিবের বয়স তখন তিন বছর আট মাস। আমার স্ত্রীও শিক্ষক। এমতাবস্থায় শাহ জালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় প্রভাষক (বাংলা) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে মনে আশার আলো সঞ্চারিত হলো। হুজুরকে কোন কিছু না জানিয়ে প্রভাষক (বাংলা) পদে আবেদন পত্র জমা দেওয়ার জন্য সেই মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হুজুর জনাব মাওলানা কমর উদ্দিন চৌধুরী সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি দরখাস্ত হাতে নিয়ে বললেন, আপনি মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের মাদ্‌রাসায় আছেন। হুজুর কি আপনার দরখাস্ত দেখেছেন। আমি না সূচক জবাব দিলে অধ্যক্ষ মহোদয় বললেন মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে আবেদন পত্রটি দেখিয়ে নিয়ে আসবেন- তখন আপনার চাকুরি হয়ে যাবে। আমি তো মহা খুশি, সমস্যা সমাধান হবে, ছেলেদের কাছে চলে আসতে পারবো। উল্লেখ্য আমার বাড়ি দক্ষিণ সুরমা উপজেলার দৌলতপুর গ্রামে। পরদিন ক্লাস শেষে দরখাস্ত নিয়ে নিরিবিলি পরিবেশে কথা বলার জন্য হুজুরের বাড়িতে চলে গেলাম। হুজুর আমাকে দেখে হতবাক। বললেন, আমি তো মাদ্‌রাসায় গেলাম তখন দেখা করলেই তো পারতেন। আমি দরখাস্তটি হুজুরকে দেখানো চেষ্টা করতেই তিনি তা হাতে না নিয়ে বললেন এটা কী? তখন আমি বিস্তারিত অসুবিধার কথা বলে সুবহানীঘাট মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ মহোদয়ের কথা বললাম। হুজুর বললেন দরখাস্ত নিয়ে বাড়িতে আসার দরকার ছিল না। আগামীকাল মাদ্‌রাসায় আসবো তখন অফিসে দরখাস্ত নিয়ে আসবেন। আমি তখনও আশাবাদী সোবাহানীঘাট মাদ্‌রাসায় চলে যাওয়ার ব্যাপারে।

পরের দিন হুজুরের অফিসে দরখাস্ত নিয়ে আবার উনার হাতে তা দেওয়ার চেষ্টা করলে মামদরচকী হুজুরসহ উপস্থিত অন্যান্য শিক্ষক মহোদয়কে বললেন, যার সারমর্ম এ রকম "আপনারা কি বলেন, আমি ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত দিবো। আমি তো বাংলার স্যারকে ইছামতি মাদ্‌রাসা থেকে বিদায় দেওয়ার জন্য নিয়ে আসিনি, আপনারা বাংলার স্যারকে জিজ্ঞাসা করুন।" আমি আমার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলে উনারা বললেন "বাংলার স্যার চলে যেতে চাইলে আমরা আন্দোলন শুরু করে দিবো।" আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। হুজুর অন্য আলাপ শুরু করলেন। কিছু সময় আমাকে পর্যবেক্ষণ করে বললেন "জোর করে কাউকে আটকিয়ে রাখা যায় না, আপনি যদি চলে যেতে চান তাহলে সেই মাদ্‌রাসায় আবেদন করতে পারেন।" আমি বললাম হুজুর, আপনি দরখাস্তটি একবার হাতে নিন। হুজুর স্মীত হেসে বললেন "এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়" আমি বললাম আপনি দরখাস্তটি স্পর্শ না করলে আমি সেখানে যাবো না। মুহাদ্দিস ছাহেব এমন মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন- হুজুরকে অখুশি করে অন্য কোথায় যাওয়া ছিল আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। রয়ে গেলাম হুজুরের প্রাণ প্রিয় মাদ্‌রাসায়। কিছু দিন পরে হুজুর আমাকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দিয়ে ছিলেন ২০০৪ইং সনে।

২০০৫ইং সন থেকে হুজুর আমাদের মাদ্‌রাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এর দায়িত্ব পালন করেন বেশ কয়েক বছর। অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব পান মামদরচকি হুজুর (রাহ)। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর সে সময় আমাকে একটি বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে ছিলেন-মাদ্‌রাসার গর্ভনিং বডির রেজুলেশনের মাধ্যমে আমাকে পূর্বে না জানিয়ে। আমি সবিনয়ে হুজুরকে বলি আমি এ কঠিন দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। দয়া করে আমার পরিবর্তে অন্য কোন শিক্ষক মহোদয়কে দায়িত্ব দিয়ে দেন। হুজুর বললেন আপনি দায়িত্ব পালনে সফল হবেন। অনেক ঝড় ঝাপটার পর আল্লাহর মকবুল অলী মুহাদ্দিস ছাহেব এর কথা সঠিক হলো- আমি দায়িত্ব পালনে সফল হয়েছিলাম।

২০০৫ইং সনে আমি আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর হাতে বাইআত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করি। এ ব্যাপারে হুজুর অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করে বলেন, "লক্ষ লক্ষ মানুষ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলার হাতে বাইআত হচ্ছেন। আপনি ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর হাতে বাইআত হন।" আমার যুক্তি ছিল ছাহেব কিবলাহর লক্ষ লক্ষ মুরিদানের মধ্যে আমি একজনকে ছাহেব কিবলাহ ব্যক্তিগতভাবে চিনবেন কীভাবে? আমি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। আপনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনেন, তাই সবসময় আমার জন্য খাছ দোয়া করবেন। আমার নাছোড়বান্দা ভাব দেখে শেষ পর্যন্ত হুজুর আমাকে বাইআত করেন।

আরেকটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। ঐ সময় হুজুর বিশেষ একজন ব্যক্তিকে বলেছিলেন এই ব্যাপারে এটাই আমার শেষ কথা। হুজুরের সুন্দর চেহারা তখন কিছুটা

লাল হয়ে গিয়েছিল। আমি ছিলাম হুজুর এবং ঐ বিশেষ ব্যক্তি থেকে কিছু দূরে। সম্ভবত হুজুর যা বলেছিলেন ঐ বিশেষ ব্যক্তি হুজুরের কথামতো কাজ করেননি। যার ফল স্বরূপ পরবর্তীতে উনি অত্যন্ত নাজেহাল হয়েছিলেন। আমার তখন পবিত্র কোরআন শরীফের সূরা বাকারার একটি আয়াতের ভাবানুবাদের কথা মনে পড়লো। "জ্ঞানী লোকদের তোমরা অনুস্মরণ করিও এবং ব্যক্ত কথার চেয়ে অব্যক্ত কথার তথ্য অনুসন্ধান করিও।" ঐ ভাবানুবাদটি অনেক দিন আগে পড়েছিলাম। স্মৃতি থেকে লিখছি ভুল হলে সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আমার কাছে হুজুরের উপর্যুক্ত কথার মর্ম এরকম প্রতিভাত হয়েছে। আপনি যদি সঠিক পথ অবলম্বন না করেন তার দায়-দায়িত্ব আপনার।

২০১৭ ইংরেজি সনের ১৬ মার্চ আমি আমার স্ত্রী এবং বড় ছেলে সাকিবুল ইসলাম পবিত্র উমরাহ পালনের জন্য পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরীফে গিয়েছিলাম। সৌদিতে আসার পূর্বে সাকিব হুজুরের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল দোয়া নিতে। হুজুরের সাথে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সে হুজুরের কাছে দালাইলুল খায়রাত পাঠের অনুমতি প্রর্থনা করে। হুজুর বলেন উমরাহ এখন যাচ্ছ- পবিত্র মদিনা শরীফে গিয়ে পবিত্র রাওদ্বা মোবারক জিয়ারত করে তোমার আব্বার মোবাইল থেকে আমাকে ফোন দিও। আমি তখন অনুমতি দিব। সাকিব সেখান থেকে দালাইলুল খাইরাত পাঠের অনুমতি নিয়েছিল।

একান্ত ব্যক্তিগত আরেকটা কথা এখানে উল্লেখ করার ইচ্ছে সংবরণ করতে পারছি না। আমার আব্বা মোহতারম ২০১৯ ইংরেজি সনের ২৩ ডিসেম্বর রোজ সোমবার দুপুর ১.৪৫ মিনিটের সময় ইন্তেকাল করেন। দুপুর ২টা ১৫ মিনিটের সময় এই সংবাদটি আমাদের মাদ্‌রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল জনাব মাওলানা শিহাবুর রহমান চৌধুরী ছাহেবকে জানাতে ফোন করি, তখন তিনি আমাকে মাননীয় প্রিন্সিপাল বলে সম্বোধন করেন। আমি তাকে বললাম আমার খুব কঠিন সময়- আমার আব্বা কিছুক্ষণ আগে ইন্তেকাল ফরমাইয়াছেন- আপনার রসিকতার কথা শোনার আমার সময় নেই, আব্বার জন্য দোয়া করবেন। ২৪ ডিসেম্বর আমার সহকর্মী মাওলানা জিল্লুর রহমান আমাকে ফোন করে প্রিন্সিপাল হিসেবে সম্বোধন করে অভিনন্দন জানান। আমি গোলক ধাঁধাঁয় পড়লাম। বিষয়টা কী? মাওলানা জিল্লুর রহমান বললেন, গতকাল মাদ্‌রাসা্‌র গভর্নিং বডির সভায় আমাকে সর্বোসম্মতিক্রমে ইছামতি দারুস উলুম কামিল মাদ্‌রাসা্‌র ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে মনোনীত করছেন- মাদ্‌রাসার স্থায়ী অধ্যক্ষ নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত। ইতিপূর্বে আমার সাথে এ ব্যপারে কেউ কিছু আলাপ করেননি। মাদ্‌রাসা তখন শীতকালীন অবকাশ ছিল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কোন অবস্থাতেই এই দায়িত্ব আমি নেব না। ইতিপূর্বে ২০০৮ সনে গভর্নিং বডির সকল সম্মানীত সদস্যগণ আমার কাছে মাদ্‌রাসার আয়-ব্যয়ের যাবতীয় দায়িত্ব দিতে একমত হয়েছিলেন- আমি সেই দায়িত্ব নেইনি। ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ ছুটি শেষে মাদ্‌রাসা খোলার দিন মাদ্‌রাসায় এসে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব

মাওলানা শিহাবুর রহমান চৌধুরী ছাহেবকে আমি এ দায়িত্ব নিতে অপারগতা জানিয়ে দেই। এ কথাও বলি আমি কোন অবস্থাতেই এ দায়িত্ব নেব না। কিন্তু আল্লাহর কী মনশা কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লামা মুহাদ্দিস ছাব মাদ্‌রাসায় এসে উপস্থিত হলেন- উনি জগন্নাথপুর সফর শেষে বাড়িতে যাওয়ার পথে মাদ্‌রাসায় এসে কিছু সময় কাটিয়েছিলেন। আমি সমস্যা সমাধানের আশায় হুজুরের শ্মরণাপন্ন হলাম। হুজুর আবার স্মীত হেসে বললেন-আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করুন। এই দায়িত্ব পালনে আপনি সফল হবেন ইনশাআল্লাহ। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমার জানামতে ইতিপূর্বে দুইজন ব্যক্তি হুজুরের কথা না মেনে ভয়াবহ ফলাফল ভোগ করেছেন। আমি হুজুরের কাছে দোয়া চেয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। মুহাদ্দিস ছাব না হয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বললেও আমি এ দায়িত্ব নিতাম না। স্বল্প দিন এই গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলাম, শুধুমাত্র মুহাদ্দিস ছাব হুজুরের আদেশ পালন করার জন্য। পরবর্তীতে মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির অন্যতম সদস্য জনাব সফিকুল হক তাপাদার ছাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করে ২০ জুলাই ২০২০ইং তারিখে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেই।

মুহাদ্দিস ছাব হুজুর যখন অসুস্থ ছিলেন তখন কয়েক বার হুজুরকে দেখতে যাই। জটিল রোগও হুজুরের নূরানী চেহারা ম্লান করতে পারেনি। হুজুরের চেহারা থেকে যেন নূর ঝরে পড়তো। আল্লামা মুহাদ্দিস ছাব রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর একজন মকবুল অলী ছিলেন- হুজুরের প্রতিটি কথায় কাজে তা প্রমাণ করেছেন। মুহাদ্দিস ছাহেবের মূল্যবান নসিহত গুলো যুগ যুগ ধরে মানুষের জীবন চলার পাথেয় হয়ে থাকবে এবং মানুষ তা থেকে উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাহমানুর রাহীম আল্লাহ আল্লামা মুহাদ্দিস ছাব রাহিমাহুল্লাহ এর মর্যাদা লক্ষ কোটি গুন বৃদ্ধি করুন এবং উনার জিসমানী ও রূহানী আওলাদগণের দ্বীন দুনিয়া উজালা করে দিন- দয়াময়ের দরবারে এই প্রার্থনা করি।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা, জকিগন্‌জ, সিলেট।

আধ্যাত্মিক রাহবার : আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল

উপমহাদেশের প্রখ্যাত শায়খুল হাদীস, বিশিষ্ট সমাজচিন্তক আল্লামা হবিবুর রহমান (রহ.) ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ আদর্শ শিক্ষক। তাঁর বহুবিধ পরিচিতি ছিল। তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ গবেষক, লেখক ও সংগঠক। ইসলামি দর্শন তাঁর চিন্তার মূল বুনিয়াদ। তিনি আপাদমস্তক ইসলামি ভাবাদর্শে বিশ্বাসী একজন মানুষ। দেশে-বিদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে ছিল তাঁর একটি আলাদা গ্রহণযোগ্যতা। আজীবন ছিলেন ইসলামি তাহজিব তমদ্দুনে অনুরাগী ও দৃঢ়বিশ্বাসী, সত্যের সাধনায় লালিত, ঐতিহ্যের চেতনায় সমৃদ্ধ একনিষ্ঠ মননকর্মী একজন শুদ্ধচারী মানুষ।

আল্লামা হবিবুর রহমান কর্মজীবনে ছিলেন আরব আমিরাতের সাবেক বিচারপতি, জকিগঞ্জ ইছামতি কামিল (এমএ) মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ ও সভাপতি। তিনি গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সোমবার ইন্তেকাল করেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

যে জন্মেছে সে মরবেই। যার সূচনা হয়েছে তার সমাপ্তি ঘটবেই। এটা আল্লাহ তায়া'লার শাশ্বত চিরন্তন বিধান। এ অমোঘ বিধানের কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন নেই। পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে চির ও অনড় সত্য হলো মৃত্যু। মৃত্যু অবধারিত। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানচর্চা কিংবা গবেষণার প্রয়োজন নেই। মানুষের জন্য বেঁচে থাকাটা অস্বাভাবিক কিন্তু মৃত্যুটা খুবই স্বাভাবিক। পৃথিবীর প্রথম মানুষ থেকে শুরু করে নির্ধারিত জীবনযাপনের পর কেউ আর বেঁচে নেই। এ জন্য পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে কবরের সংখ্যা বেশি। মৃত্যুর অনিবার্য স্বাদ প্রত্যেক প্রাণীকে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন : 'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।' (সুরা আল-আনআম : ১৮৫)

মৃত্যু মানুষের নাগাল পাবেই

জীবন ফুরিয়ে গেলে পৃথিবীতে থাকার কারোরই অধিকার নেই। মৃত্যু থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য লুকানোর স্থান নেই। পালিয়ে বেড়ানোর জায়গা নেই। কেউ চাইলেও মৃত্যুকে পাশ কাটাতে পারবে না। সময় হলে মৃত্যু ব্যক্তিকে পাকড়াও করবেই। ব্যক্তির নাগাল পাবেই। তাকে অবকাশ দেওয়া হবে না। প্রয়োজন পূরণের সুযোগ দেওয়া হবে না। আল্লাহ বলেন : 'তোমরা যেখানেই থাকো (একদিন না একদিন) মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, চাই তোমরা সুরক্ষিত কোনো দুর্গে থাকো না কেন।' (সুরা আন-নিসা : ৭৮)

বিলম্ব করার অবকাশ নেই

মৃত্যু কোনো সংবাদপত্র নয়। ডাক পিয়নও নয়। সে সংবাদ না দিয়ে না জানিয়ে চলে আসে। কোনো বিলম্ব করে না। আল্লাহ তায়া'লা বলেন : 'যারা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, তাদের নিশ্চিত থাকা উচিত, আল্লাহর নির্ধারিতকাল অবশ্যই আসবে।' (সুরা আনকাবুত : ৫)

পালানোর পথ নেই

মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। আল্লাহর আদেশ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ ভুলে যায়। দুনিয়া নিয়ে অধীর মত্ত হয়ে পড়ে। দুনিয়াকে নানা কৌশল ও নানা ব্যবস্থাপনায় সাজাতে ব্যস্ত থাকে। মৃত্যু নামক চিরন্তন সত্যকে মন থেকে মুছে ফেলে। দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়ানোর অলিক স্বপ্নে বিভোর থাকে। অথচ মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেঁচে থাকার কোনো সুযোগ নেই। মৃত্যু প্রাণকে পাকড়াও করবেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেন : 'মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যিই আসবে। (হে মানুষ!) এটাই সে জিনিস, যা থেকে তুমি পালাতে চাইতে।' (সুরা কাফ : ১৯)

মৃত্যুর স্থান জানা নেই

মৃত্যু কাউকে জানান দিয়ে আসে না। কোনো সময় বা নির্ধারিত স্থান ধরে উপস্থিত হয় না। মানুষ জানে না কার মৃত্যু কোথায় কোন জমিনে হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেন : 'এবং কোনো প্রাণী এটাও জানে না যে কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে।' (সুরা লুকমান : ৩৪)

দুনিয়ার জগৎ হলো ক্ষণস্থায়ী। একদিন জগৎ নাশ হয়ে যাবে। পৃথিবী অস্তিত্ব হারাবে। পৃথিবীতে কোনো মানুষের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না। এই ধ্বংসশীল দুনিয়াতে মানুষও ধ্বংসশীল।

একজন মুসাফির ভবঘুরে যেমন আপন ঠিকানাবিহীন পথ-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়, তেমনই দুনিয়াতে মানুষের কোনো স্থায়ী বাসস্থান নেই। যা আছে তা ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার ময়দানে মানুষ হলো–মুসাফির। তার হায়াতের নির্ধারিত সময়ের ভেতর পুঁজি সংগ্রহ করে পথ চলতে হবে। ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাহুমূলে ধরে বললেন, দুনিয়াতে এমনভাবে অবস্থান করো যেন তুমি মুসাফির বা পথিক।' তিনি আরো বলেন, 'যখন সন্ধ্যা হয়ে যায়, সকাল বেলার অপেক্ষা করো না। আর যখন সকাল হয়ে যায় সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। সুস্বাস্থ্যের দিনগুলোতে রোগব্যাধির প্রস্তুতি নাও। আর জীবদ্দশায় থাকাকালীন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করো।' (সহিহ বুখারি : ৬৪১৬)

মৃত্যুর স্মরণ অন্তরকে সজাগ করে

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সবাইকে মৃত্যুর উন্মুক্ত দরজায় প্রবেশ করতে হবে। তাই আমাদের মমচিত্তকে পরিশুদ্ধ করা প্রয়োজন। মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা দরকার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : '(দুনিয়ার) স্বাদ গন্ধকে বিলুপ্তকারী মৃত্যুকে তোমরা বেশি বেশি স্মরণ করো।' (তিরমিজি : ২৩০৭)

নশ্বর পৃথিবীর শাশ্বত চিরন্তন সত্য হলো মৃত্যু। মৃত্যুর চেয়ে অপরিবর্তনীয় অনড় শব্দ জগতের অভিধানে নেই। জগতে একমাত্র আল্লাহই চিরঞ্জীব। তিনি ছিলেন। এখন আছেন এবং থাকবেনও। তিনি ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনকি মৃত্যুর ফেরেশতারও মৃত্যু হয়ে যাবে।

পৃথিবীতে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করেছেন এবং সুন্দর, শৃঙ্খল ও শান্তিময় সমাজ উপহার দিয়েছেন। তাঁদের ওয়ারিস হিসেবে আলেমগণও যুগে যুগে সেই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। আলেম সমাজ দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তাগুত শক্তিগুলো আলেম-উলামাদেরকে বিভিন্ন ধরনের জুলুম নির্যাতন করেছে। তখন আলেম-উলামাদের কেউ কেউ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন আবার কেউ কেউ নির্জনে গিয়ে চুপচাপ থেকেছেন। আজও আলেমরা জেল-জুলুম ও মামলা-হামলার শিকার হচ্ছেন। আবার কেউ কেউ হামলা-মামলা ও জুলুমের ভয়ে তাগুতের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন না। অপমানের ভয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে শুধু আঁতুড় ঘরে দাওয়াতী কাজ করতে চান। বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়্যাহ (৬৬১-৭২৮ হি.) তাতারগোষ্ঠী, ইহুদি-খ্রিস্টান ও শিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। বহুবার জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন। ব্রিটিশ-বেনিয়া গোষ্ঠী উপমহাদেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন নির্যাতন শুরু করলে মুসলিম উম্মাহকে তাদের জুলুম থেকে রক্ষা করার জন্য অকুতোভয় আলেম সমাজ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। মুজ্জাদিদ আলফেছানী আহমাদ সারহিন্দী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, শাহ আব্দুল আযীয, শাহ ইসমা'ঈল শহীদ, সাইয়িদ আহমাদ শহীদ, সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীর, আল্লামা এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী প্রমুখ বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় খতিব উবায়দুল হক, মাওলানা মহিউদ্দিন খান, আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী, শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান, নূর উদ্দিন আহমদ গহরপুরী, শাহ আহমদ শফী, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মুফতি আমিনী, শায়খুল হাদীস আজিজুল হক, প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবিবুর রহমান, মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী প্রমুখ। আজকে সম্মানিত আলেম সমাজ যদি পূর্বসূরিদের মানহাজ অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহ

তায়া'লা সমাজ ও দেশকে যাবতীয় অপশাসন থেকে মুক্ত করবেন ইনশাআল্লাহ।

ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বীন প্রচার, কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সমাজের অবদান অতুলনীয়। যা কখনো অস্বীকার করার মতো নয়। জাতির উত্থান-পতনের সভ্যতা বিনির্মাণে আলেম সমাজের দায়িত্ব সর্বযুগেই অপরিসীম। যা পৃথিবীর ইতিহাসে মোহরাঙ্কিত হয়ে আছে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষী মহলের মুখোশ উন্মোচন করে জাতিকে সর্বদা সচেতন রাখতে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সোচ্চার সংগ্রামী আলেম সমাজ। স্বাধীনতার জন্য আলেমসমাজ নির্দ্বিধায় জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। কখনো সংকোচ, সংশয়বোধ করেন না কারাবরণ কিংবা শত্রুর দুরভিসন্ধির। যদি আলেম সমাজ এ দেশের স্বাধীনতায় সংগ্রামী ভূমিকা পালন না করত, তাহলে বাংলার স্বাধীনতা এত সহজে আসতো না। আলেমসমাজ আছে বলেই ওই বন্ধুপ্রতীম (!) দেশ লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেও পারছে না ভোগ করতে। সিলেট অঞ্চলে দ্বীন প্রচার এবং আন্দোলন সংগ্রামে যে-সকল আলেম সমাজ সর্বদা সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন আল্লামা হবিবুর রহমান। আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ একজন ক্ষণজন্মা আলেমে দ্বীন। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে দ্বীনের প্রচার এবং প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর হাতেগড়া অসংখ্য আলেমে দ্বীন এবং ইসলামিক স্কলার দেশ-বিদেশে ইলমে দ্বীনের প্রসারে নিরলস ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। এছাড়া আরো অসংখ্য উলামায়ে কেরাম বৃহত্তর খেদমতের মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করছেন। অসংখ্য অগণিত আলেমে দ্বীনের তিনি আধ্যাত্মিক রাহবার।

আমাদের দেশে একশ্রেণির কথিত বুজুর্গরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের যে দাওয়াতের চূড়ান্ত মূলনীতি, তাকে অবজ্ঞা করে শুধু ফজিলত ও তোষামোদের বয়ান ও বায়াত নিয়ে ব্যস্ত। আর ভণ্ড পীর-দরবেশরা তো শুধু মুরিদদের নজর-নেওয়াজ খাওয়ায় ব্যস্ত। তাওহীদ, আক্বীদা ও মানহাজের দাওয়াত নিয়ে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করেন না। কিন্তু নিজের স্বার্থে দরবারী আলেম সাজতে তারা একটুও ছাড় দেন না। ঠিক সেই সময় আল্লামা হবিবুর রহমান ছিলেন এসব অন্যায়, অনিয়মের বিরুদ্ধে সর্বদা প্রতিবাদী। তিনি মানুষের মধ্যে ইসলামে ন্যায়বিচারের শিক্ষা তুলে ধরার পাশাপাশি কল্যাণমুখী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আন্তরিকভাবে কাজ করে গেছেন। এছাড়া মানুষকে একথাও জানিয়েছেন–কেবল মুখে শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হবার দাবির কোনো মূল্য আল্লাহপাকের কাছে নেই। আমাদের নিজ জীবনে মহানবীর অনুপম আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে আমরা যখন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো, তখনই আমরা আল্লাহর প্রেমিকও হতে পারবো আর খায়রে উম্মত হিসেবে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারবো এবং আল্লাহর দরবারে মুমিন হিসেবে বিবেচিত হব।

আল্লামা হবিবুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ সেই মুত্তাকি, নির্লোভ এবং মুখলিস আলেমে দ্বীন, যিনি ইলমে দ্বীনের প্রচার এবং প্রসারকেই জীবনের মকসুদ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। দুনিয়াবি পদ এবং স্বার্থ ইলমে দ্বীনের খেদমত থেকে তাঁকে একচুলও সরাতে পারেনি। জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার সকল সুযোগকে অগ্রাহ্য করে নীরবে নিভৃতে ইলমে ওহির বার্তাকে অগণন মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। একটি সীমান্তবর্তী উপজেলায় থেকেও তিনি ইলমের দ্যুতি ছড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। দ্বীনের পথের মুজাহাদা তাঁর সম্মানকে করে তুলেছে অতুলনীয়।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ব্যক্তিজীবনেও ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী, বিনয়ী এবং অমায়িক আলেমে দ্বীন। তাঁর সঙ্গে যতবারই সাক্ষাৎ হয়েছে, একজন নির্ভীক দ্বীনের রাহবার হিসেবে আমার অন্তরে স্থায়ী আসন গেড়ে নিয়েছেন ভালোবাসার মাধ্যমে। তাঁর ইন্তেকালে মুসলিম উম্মাহ একজন খালিস-মুখলিস রাহবারকে হারালো। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর সকল নেক আমলকে কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহবান বানিয়ে দিন। আমিন

লেখক: প্রাবন্ধিক, প্রকাশক ও সংগঠক।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর খেদমতে উপস্থিতির সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ

মাওলানা আবু বকর তাওহীদ

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১, শনিবার বিশেষ উদ্দেশ্যে পূণ্যভূমি সিলেটে এক সফরে গিয়েছিলাম আমার কয়েকজন সম্মানিত আসাতিযা ও ছাত্রভাইসহ প্রায় চল্লিশ জনের স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক এক সফর ছিল। সিলেটের বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শায়খ মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ, এর কাছে হাদীসের সনদলাভের জন্য গিয়েছিলাম।

হযরত সম্পর্কে অনেক আগেই জানার সুযোগ হয়েছে। দারুননাজাতে থাকায় সেখানে পড়ুয়া সিলেটের ছাত্রভাইরা হযরতকে নিয়ে আলাপ করতেন। আমিও মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। বিশেষ করে হুজুরের নাতি মাওলানা মাসউদ আহমাদ থেকে ভালোভাবে জানার সুযোগ হয়েছিল। আমি উলুমুল হাদীস নিয়ে বহুদিন ধরেই মেহনত করেছি। মাওলানা মাসউদ আমার বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। উলুমুল হাদীস নিয়ে বেশ আগ্রহী ছিল বিধায় আমার কাছাকাছিই থাকতো। তার কাছে উলুমুল হাদীস এর ভালো ভালো কিতাব দেখতাম। কার বই জিজ্ঞেস করলে বলতো, মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের বই। আমিও বিস্ময়াভূত হয়ে যেতাম এটা ভেবে যে, এত দামী দামী উঁচুমানের কিতাব হুজুরের সংগ্রহে আছে। এতে হুজুরের অকল্পনীয় ইলমী যওক ও উঁচুমানের রুচিবোধের পরিচয় পাই। এ যামানায় আমাদের দেশে এরকম উলুমুল হাদীসের শাস্ত্রীয় আলিমের নজির পাওয়া যায় না বললেই চলে।

তাই বহুদিন হতে ইচ্ছে ছিল হুজুরের দরবারে উপস্থিত হবো আল্লাহ তায়ালাও তা মঞ্জুর করেন।

উপরোল্লিখিত তারিখে যোহরের পর আমরা যাত্রা শুরু করি। ইশার পরপরই হুজুরের দরবারে উপস্থিত হই। হযরতের বাসায় উপস্থিত হলে অসুস্থ শরীর নিয়েও আমাদের ঘণ্টাখানেক সময় দেন। দারুননাজাতের ছাত্রদের জন্য হযরতের আলাদা দরদ ও মহব্বত ছিল। নিতান্তই ছোট হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে অনেক মূল্যায়ন করেন।

হযরত আমাদেরকে মুসালসাল বিল আওয়ালিয়্যাত, বিল মাহাব্বাত, বিদ দিয়াফাত, বিল মুসাফাহা হিসেবে মোট চারটি সনদের ইজাযত দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। শেষে আমাদের সকলকে অনেক আন্তরিকতার সাথে অ্যাপ্যায়নের আয়োজন করেছিলেন। হযরতের ছেলে মুহতারাম মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল সাহেবও আমাকে বেশ স্নেহ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। ইলমী ময়দানে কাজ করার উৎসাহ যুগিয়েছেন। দুটো বইও হাদিয়া দিয়েছেন।

৮৯ বছর বয়সী ফুলতলী হযরতের খলিফা এ মহা মনীষী দীর্ঘদিন ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসায় হাদীসের খিদমাত করেছেন। এরপর দীর্ঘদিন আরব আমিরাতে বিচারক কাজীর দায়িত্ব পালন করেছেন। আরবের বিখ্যাত আহলুস সুন্নাহর আলিমদের সাথে হযরতের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

সনদ গ্রহণ শেষে আমরা শাহজালাল রহ, এর মাজার জিয়ারত করি। নির্ঘুম রাত কাটিয়ে ফজরের পর দারুননাজাতে উপস্থিত হই। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ সফরকে কবুল করুন।

মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর আমাদেরকে যে সনদগুলো দিয়েছেন তা ছিল প্রখ্যাত দুজন শায়খের সূত্রে যথা-

১। আল্লামা মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান রহ, এর সূত্রে, ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার গ্রন্থের লেখক।

২। আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী মালিকী রহ, এর সূত্রে। মসজিদে হারামের বিখ্যাত উস্তায, মাফাহিম ইয়াজিবু আন তুসাহহাহা এর লিখক। এ দুজন বুযুর্গ মহামনীষীর সনদের সাথে নিজের সম্পৃক্তি আমার জন্য অনেক আনন্দের বিষয়।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে হুজুরের ইন্তেকালের সংবাদ পাই। ইচ্ছে ছিল সুযোগ পেলে আবারও হুজুরের দরবারে হাজিরা দিয়ে কুতুবে সিত্তাহ সহ অন্যান্য কিতাবের ইজাযাত নিব। কিন্তু তাকদীরে তা ছিল না, হুজুর আল্লাহর প্রিয় মেহমান হয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

আল্লাহ তায়ালা হুজুরকে ও এসমস্ত মহামনীষীদের জান্নাতের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করুন, আর আমাদেরকেও তাদের যথোপযুক্ত উত্তরসূরী হিসেবে কবুল করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

লেখক: প্রিন্সিপাল, দারুননাজাত আইডিয়াল মাদ্‌রাসা, কিতাব বিভাগ।

মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. এর সোহবতস্মৃতি : কিছু কথা

মাওলানা মুহাম্মাদ হবিবুর রহমান[১]

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। জন্ম ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ। ইন্তেকাল ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ। প্রায় ৯০ বছরের জীবনকাল। ইলমে দীনের বিভিন্ন শাস্ত্র রপ্ত করে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি ইলমে দীন বিতরণের মহান কাজে নিয়োজিত হন। সেই থেকে আমৃত্যু তিনি ইলমে দীন বিশেষত ইলমে হাদীসের সুবাস ছড়িয়েছেন বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। রচনা করেছেন ১৮টির বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। তাঁর ইলমে হাদীসের সুবাস পেয়ে ধন্য হয়েছি আমি অধমও। তাঁর ক্ষণিক সোহবত আমার জীবনের অমূল্য প্রাপ্তি। আমার হাদীসের শায়েখ মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. এর সোহবতস্মৃতি নিয়ে এখানে কিছু কথা উপস্থাপন করব ইনশাল্লাহ।

পরিচয় লাভ

মুহাদ্দিস মো. হবিবুর রহমান সাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর নাম প্রথম দেখি দারুল কিরাতের পাঠ্যবই "আল-কওলুস ছাদীদ" এ। ২০১০ বা ২০১১ সালের দিকে। সেখান থেকে উনার নামের সাথে পরিচয় লাভ। উনার নাম ও আমার নাম একই হওয়ায় উনার পরিচয় জানার জন্য আমার বেশ আগ্রহ তৈরি হয়। ঐ বই থেকে জানতে পারি উনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিচারক ছিলেন। তখন কিশোর মনে প্রশ্ন জাগত- বাংলাদেশি একজন আলিম সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিচারক হলেন কীভাবে? এরকম নানা কৌতূহল জাগত মনের ভিতর।

এর কিছুদিন পর দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসার বিশিষ্ট ফকিহ শায়খ মুহাম্মাদ বদরুল আমীন (কুষ্টিয়ার হুজুর) এবং আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মাদ মুফাজ্জল হোসেন (মাগুরা হুজুর) উদ্যোগ নিলেন মুফতি সায়্যিদ আমিমুল ইহসান রহ. এর বিখ্যাত হাদীস সংকলন "ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার" পুনঃমুদ্রণ করবেন। এজন্য প্রয়োজন এ কিতাবের স্পষ্ট ও মূল কপি। তখন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মুফতি সায়্যিদ আমিমুল ইহসান রহ. এর হাতেগোনা কয়েকজন ছাত্র জীবিত আছেন। মুহাদ্দিস হবিবুর রহমান রহ. তাঁদের অন্যতম। তখন উনার নিকট থেকে "ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার" আনা হয়েছিল। এ কিতাবটি মুফতি আমিমুল ইহসান রহ. স্বহস্তে উনাকে প্রদান করেছিলেন। এভাবে উনার ব্যাপারে নানা বিষয় জানা শুরু হল।

সাক্ষাতের প্রবল আগ্রহ

আলিম ক্লাস থেকে আজীবন বন্ধুত্বের পদ অলঙ্কৃত করেন বহুমুখী মেধা ও প্রতিভার অধিকারী নিয়াজ ভাই। নিয়াজ ভাই মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের স্নেহধন্য অন্যতম কাছের ছাত্র। নিয়াজ ভাইয়ের কাছে ধীরে ধীরে মহান মনীষী মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের অগাধ জ্ঞান-গরিমার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে লাগলাম। আমাদের আড্ডার চুম্বকাংশ থাকতো মুহাদ্দিস হুজুরকে নিয়ে। উনার মাকতাবায় কত প্রাচীন কিতাব আছে, কত ধরণের কিতাব আছে, বিদেশি কোন কোন শায়খ উনার কাছ থেকে সনদ নিয়েছেন, কোথায় কোথায় উনার দারস হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে সব সময় আমাদের কথা হত। মুহাদ্দিস হুজুর সম্পর্কে এত এত কথা শুনে উনার সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠে।

প্রথম সাক্ষাৎ

অবশেষে শুভক্ষণ চলে আসে। ২০১৫ সালের কথা। তখন আমাদের অনার্স ২য় বর্ষের পরীক্ষা চলতেছিল। নিয়াজ ভাই বললেন, হাবিব ভাই, মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের সাথে দেখা করতে যাব। পরের দিন পরীক্ষা ছিল, তবুও চলে গেলাম হুজুরের সাক্ষাত লাভে ধন্য হতে। হুজুর তখন মগবাজারের এক প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বন্ধু নিয়াজ ভাই ও হুজুরের ভাতিজা মাহফুজসহ আমরা হুজুরের সাথে দেখা করলাম। হুজুর আমার নাম-পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। এরপর হুজুরের ক্ষণিক সোহবতে ধন্য হয়ে চলে আসলাম।

হুজুরের ছেলের সাথে পরিচয়

হুজুরের চার ছেলের মধ্যে বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক আবদুল আউয়াল হেলাল সাহেব হুজুরের সাথে পরিচয় হয় নিয়াজ ভাইয়ের মাধ্যমে। ফেসবুক মেসেঞ্জারে বা ফোনকলে উনার সাথে দীর্ঘ সময় কথা হতো বিভিন্ন ইলমি বিষয়ে। বিশেষ করে জালালুদ্দীন সুয়ুতি রহ. কৃত আবু হানিফা রহ. এর জীবনী ও মানাকিব সংক্রান্ত "তাবয়ীদুস সহীফা" র অনুবাদের ব্যাপারে উনি যে পরিমাণ সহযোগিতা করেছেন, তা লিখে প্রকাশ করার মত নয়। মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, তথ্য দিয়েছেন। অথচ উনার সাথে তখনও আমার সরাসরি কোনদিন সাক্ষাৎ হয়নি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর হায়াত ও কর্মে বরকত দান করুন। আমীন।

আর-রিহলাহ লিতলাবিল ইসনাদ আল-আলী

১১ রবিউস সানি, ১৪৪৩ হিজরী। ১৭ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। বুধবার। ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম তথা বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী রহ. এর ওফাত দিবস। আমরা দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসার এক কাফেলা ছুঁটে চলি আধ্যাত্মিক রাজধানী

পূণ্যভূমি সিলেটের উদ্দেশ্য। লক্ষ্য একটাই 'আল-ইসনাদ আল-আলী' (الإسناد العالي) তথা সুউচ্চ সনদ অর্জন। পূর্বসূরী মুহাদ্দিসগণের চিরাচরিত নিয়ম ছিল- তাঁরা 'আল-ইসনাদ আল-আলী' এর জন্য সফর করতেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. বলেন,

طلب الاسناد العالي سنة عمن سلف لأن اصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة الى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه.

অর্থাৎ 'আল-ইসনাদ আল-আলী' অন্বেষণ করা পূর্বসূরীদের সুন্নাত। কেননা, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর সাথীবর্গ কুফা থেকে মদীনায় সফর করে হযরত উমর রা. থেকে শিক্ষা লাভ করতেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনতেন।[২]

ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন রহ. কে তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার শেষ ইচ্ছা কী? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, بيت خالي وإسناد عالي অর্থাৎ নির্জন গৃহ এবং সুউচ্চ সনদ।[৩]

ফজর নামায আদায় করে আমরা রওয়ানা করি সিলেটের উদ্দেশ্যে। মুহাদ্দিস মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর বাড়িতে পৌঁছি জোহরের নামাযের কিছুক্ষণ পূর্বে। সেখানে গিয়ে যোহরের নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। মসজিদে অনেক লোকসমাগম দেখলাম। জানতে পারলাম, ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম উপলক্ষ্যে আজ খতমে কুরআন, খতমে বুখারী শরিফ ও মুসালসাল হাদীসের দারস অনুষ্ঠিত হবে।

মাকতাবাতুল হাবিব পরিদর্শন

হুজুরের বাড়ির পাশেই আল হাবীব জামে মসজিদ। মসজিদের পাশেই মাকতাবাতুল হাবীব (আল হাবীব গ্রন্থাগার) এর দ্বিতল ভবন। ভবনের দ্বিতীয় তলায় বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য কিতাব সাজানো। তাফসীর, হাদীস, উলুমুল হাদীস, হাদীসের ব্যাখ্যা, ফিকহ, ফতোয়া, ইতিহাস, আকীদা সব শাস্ত্রের মহামূল্যবান কিতাবের বিশাল সংগ্রহশালা রয়েছে এ মাকতাবায়। পূর্ববর্তী মুসান্নিফগণের কিতাবের পাশাপাশি আধুনিক ও সমকালীন বিখ্যাত আলিমগণের কিতাবও এখানে স্থান লাভ করেছে। এ যেন অতীত-বর্তমানের অপূর্ব মেলবন্ধন। সময়ের স্বল্পতায় শুধু কিতাবগুলোর দিকে তাঁকিয়েই ছিলাম। আমার মনে হয়, আল হাবীব গ্রন্থাগার সিলেট জেলার অন্যতম বৃহৎ আরবি কিতাবের সংগ্রহশালা। আরবি কিতাবের বিশাল সমাহার দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছি, তেমনি এ কিতাবগুলো পড়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা মনের মাঝে আশা বেঁধেছে।

---

[২] আল-জামি লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি', খ. ০১, পৃষ্ঠা নং ১২৩

[৩] মুকাদ্দিমা ইবনিস সলাহ, পৃষ্ঠা নং ১৫০

মুসালসাল হাদীসের দারস

যোহর নামায আদায় শেষে মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর মুসালসাল হাদীসের দারস প্রদান ও মুনাজাত পরিচালনা করেন। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি ২১ মিনিট ব্যাপী মুসালসাল হাদীসের দারস ও মুনাজাত করেছিলেন। হুজুরের দারস আল হাবীব ফাউন্ডেশনের ফেসবুক পেজ থেকে সম্প্রচার করা হয়।[৪] এটি ছিল হুজুরের জীবদ্দশায় মুসালসাল হাদীসের সর্বশেষ আনুষ্ঠানিক দারস। মুসালসাল হাদীসের দারসে অংশগ্রহণ ছিল আমার জীবনের অন্যতম বিশাল প্রাপ্তি। হুজুরের আলোচনার সারাংশ নিম্নরূপ :

- প্রথমে তিনি ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম উপলক্ষ্যে খতমে কুরআন, খতমে বুখারী শরিফ ও খতমে দালায়েল শরিফে অংশগ্রহণকারীদের সম্বোধন করেন। পাশাপাশি ঢাকা থেকে আগত মুসালসাল হাদীসের দারসগ্রহণকারী (আমাদের কাফেলা)কে সম্বোধন করেন।
- পরবর্তীতে তিনি মুসালসাল হাদীসের সংজ্ঞা প্রদান করেন।
- এরপর তিনি মুসালসাল হাদীসের গুরুত্ব এবং মুসালসাল হাদীসের শ্রবণ ও সনদ গ্রহণের জন্য উলামায়ে কেরামের সফর করার বিষয় উল্লেখ করেন।
- পরবর্তীতে তিনি তাঁর শ্রুত চারখানা মুসালসাল হাদীসের শায়েখ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। এছাড়াও তিনি আরো চারখানা মুসালসাল হাদীস বর্ণনার ইজাযতপ্রাপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন।
- তিনি প্রথম মুসালসাল হাদীস তথা الحديث المسلسل بالأولية শ্রবণ করেন তাঁর উস্তায মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রহ. এর নিকট। পরবর্তীতে এ হাদীসখানা তিনি মক্কা শরীফের শায়েখ সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ বিন আলাভী রহ. এর নিকটও শুনেছেন।
- বাকি তিন খানা মুসালসাল তথা الحديث المسلسل بالمحبة, الحديث المسلسل بالصافحة الحديث المسلسل بالضيافة على الأسودين তিনি শায়েখ সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ বিন আলাভী রহ. এর নিকট শুনেছেন।
- এরপর মুসালসাল হাদীস বর্ণনার শুরুতে তিনি নিম্নোক্ত খুতবা পাঠ করেন-

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ ، وإنَّ أفضلَ الهديِ هديُ سيدنا محمدٍ ، وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها ، وكلَّ مُحدَثةٍ بدعةٌ.

---

[৪] https://web.facebook.com/alhobibfoundation/videos/1421949248201251, স্ক্যান করুন-

- এরপর তিনি পর্যায়ক্রমে চারখানা মুসালসাল হাদীস তথা الحديث المسلسل بالأولية, الحديث المسلسل بالمحبة, الحديث المسلسل بالضيافة على الأسودين الحديث المسلسل بالمصافحة বর্ণনা করেন। হাদীস বর্ণনার পাশাপাশি হাদীসের সরল অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা তুলে ধরেন।
- 'আমার হাদীস পড়ানো হয়তো আজকে শেষ' হাদীসের দারস শেষে এ কথা বলে তিনি তাঁর জীবনাবসানের ব্যাপারে ইঙ্গিত করেন। এ কথা শুনে উপস্থিত সকলে হাউমাউ করে কেঁদেছিলেন।
- অস্বাভাবিক অসুস্থতার কারণে হুজুর দোয়া-মুনাজাত পরিচালনার দায়িত্ব মাওলানা মুহাম্মাদ ফজলুর রহমানের উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু সবার আকুল আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন।
- তিনি মুনাজাতের মধ্যে দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সম্মানিত সেকেন্ড মুহাদ্দিস মুফতী শাহজালাল হামিদী রহ. (পিরোজপুরী হুজুর) এর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন। উল্লেখ্য যে, মুফতী শাহজালাল হামিদী রহ. (পিরোজপুরী হুজুর) মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় আহত হয়ে ১২ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। মুহতারাম পিরোজপুরী হুজুর রহ. মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. এর নিকট থেকে মুসালসাল হাদীসের সনদ লাভ করেন।

আথিতেয়তা গ্রহণ

হুজুরের হাদীসের দারস ও দোয়া-মুনাজাত শেষে আমাদের সবার জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হলো। মসজিদ প্রাঙ্গনে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। হুজুরের পরিবারের আথিতেয়তায় আমরা মুগ্ধ হলাম।

হুজুরের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎ এবং হাদীসের ইজাযত ও সনদ লাভ

দুপুরের খাবার শেষে হুজুরের ভাতিজা মাহফুজের বাড়িতে সামান্য বিশ্রাম নিলাম। আমাদের মনে বিশাল আশা ছিল- হুজুরের নিকট থেকে সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবের সনদ গ্রহণ করব। কিন্তু হুজুরের শারীরিক অবস্থা মোটেই অনুকুল নয়। এ অবস্থায় সনদ গ্রহণের জন্য আবেদন করাটা এক রকম জুলুম। তাই এ বিষয়টি আমরা হুজুরের পরিবারের সিদ্ধান্তের উপর ন্যস্ত করলাম। এই সফরেই প্রথমবারের মত সাক্ষাত হয় হুজুরের ছেলে মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল সাহেব হুজুরের সাথে। যার সাথে কয়েক বছর ধরে অনলাইনে কথোপকথন, তাঁর সাথে প্রথম বার সরাসরি সাক্ষাতে অকল্পনীয় আনন্দ লাভ করি। তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন, আপনারা বিশ্রাম নেন। দেখি আব্বা একটু ভালো অনুভব করলে, আপনাদেরকে ডাকবো।

আমরা অধীর আগ্রহে 'আল-ইসনাদ আল-আলী'র আশায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের আশা আল্লাহ তায়ালা কবুল করলেন। আসরের আযানের কিছুক্ষণ পূর্বে মাহফুজ আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বললেন। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ নিকটবর্তী হল। আমরা চলে গেলাম হুজুরের কামরায়। হুজুর বিছানায় শোয়া। প্রায় নব্বই বছর বয়সী, বিছানায় শায়িত অসুস্থ শায়েখের নিকটে আমরা হাজির হলাম। এমন অবস্থায় হুজুরকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি এখনো নিজেকে অপরাধী মনে করি। কিন্তু হুজুরের মাঝে সেদিন কোন বিরক্তির ছাপ দেখিনি। হুজুর আমাদেরকে সহীহ বুখারীর প্রথম হাদীস পাঠ করতে বললেন। আমাদের মাঝ থেকে মুয়াজ্জেম ভাই, পরবর্তীতে আব্দুর রহমান দিদার ভাই সহীহ বুখারীর প্রথম দুইখানা হাদীস পাঠ করলেন। হুজুর আমাদেরকে সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাব বর্ণনা করার ইযাযত প্রদান করলেন। এ যে এক পরম প্রাপ্তি। ক্ষুদ্র জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। এ অর্জনের আনন্দ লিখে প্রকাশ করবার মত নয়।

এরপর আমরা হুজুরের সাথে মুসাফাহা ও কদমবুচি করলাম। দোয়া চাইলাম। হুজুর আমাকে চিনলেন। পাঁচ/ছয় বছর আগে মগবাজারের হাসপাতালে হুজুরের সাথে পরিচয় হয়েছিল। হুজুর তা ভুলেননি। এটিই ছিল হুজুরের সাথে সর্বশেষ সাক্ষাত।

এরপর মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল সাহেব হুজুর হাদীসের সনদ ও ইজাযতনামা সম্বলিত কিতাব তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب) প্রদান করেন। এ কিতাবের শেষে মুহাদ্দিস সাহেব স্বাক্ষরিত ইযাজতনামা তথা অনুমতিপত্র রয়েছে। এর মাধ্যমে মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার লিখিত অনুমতি লাভ করি।

এরপর মাগরিব নামায শেষে আমরা হুজুরের পরিবার; বিশেষত মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল সাহেব হুজুরের নিকট থেকে বিদায় ও দোয়া নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি।

সফর মূল্যায়ন

এ সফর আমার জীবনের অবিস্মরণীয় এক সফর। এ সফর আমার জন্য ইলমে হাদীসের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের বাড়ি থেকে ফেরার পথে ফেসবুকে পোস্ট করি এভাবে, 'আলহামদুলিল্লাহ। সিলেটের ইলমি ও রূহানি সফর সমাপ্ত। সিলেটবাসীর আন্তরিকতা ও আতিথেয়তায় ঋণগ্রস্ত। ইলমে হাদীসের অমূল্য সম্পদ নিয়ে ঢাকার পথে প্রত্যাবর্তন। সকলের দোয়া কামনা।'

পরবর্তীতে এ সফরকে আমি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করি। যেমন :

প্রথমত

আমাদের এ সফর ছিল বুধবার। মুসালসাল হাদীস ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবের দারস বুধবারে প্রদান করা হয়। একদিকে যেমন এ দিনটি ছিল ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম। অন্যদিকে এ বারটি ছিল কোন বিষয়ের সবক গ্রহণের জন্য উত্তম বার। এ ব্যাপারে তা'লিমুল মুতায়াল্লিম কিতাবে বলা হয়েছে-

كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يوقف بداية السبق على يوم الأربعاء وكان يروي في ذلك حديثا ويستدل به ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من شيئ بدئ في يوم الأثنين إلا وقد تم، وهكذا كان يفعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى.

আমাদের উস্তায শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন রহ. বুধবারকে সবক শুরুর দিন হিসাবে নির্ধারণ করতেন। তিনি এ ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণনা করে দলীল উপস্থাপন করতেন। তিনি বলতেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- যে বিষয়টি বুধবারে শুরু করা হয়, সেটি পূর্ণতা লাভ করে। ইমাম আবু হানীফা রহ.ও এমনটি করতেন।[৫]

দ্বিতীয়ত

সনদ ইসলামী শরীয়তের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আবু আলী আল-জিয়ানী রহ. বলেন,

خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد، والأنساب، والإعراب.

আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, যা ইতিপূর্বের কোন উম্মতকে দেননি। তাহলো- ইসনাদ, নবসনামা এবং ইরাব।[৬]

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء অর্থাৎ সনদ হলো দ্বীনের অন্যতম বিষয়। যদি সনদ না থাকতো, তাহলে যে কেউ যা ইচ্ছা তাই বলত।[৭]

হাদীস গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার পর সনদ শুধুমাত্র বরকতের জন্য হলেও এর সীমাহীন গুরুত্ব রয়েছে। এ সফরের মাধ্যমে আমি যে সব বিষয়ের সনদপ্রাপ্ত হয়েছি; তা নিম্নরূপ-

১. পূর্বোক্ত চারখানাসহ মোট আটখানা মুসালসাল হাদীসের সনদ

২. কুতুবুস সিত্তাহ তথা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী এবং সুনানে ইবনে মাজাহ কিতাবের সনদ

---

[৫] তা'লীমুল মুতায়াল্লিম, পৃষ্ঠা নং ৮৫

[৬] তাদরীবুর রাবী, খ. ০২, পৃষ্ঠা নং ১৬০

[৭] মুকাদ্দিমা ইবনিস সলাহ, পৃষ্ঠা নং ১৫০

৩. ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. পর্যন্ত সনদ

৪. ইমাম মালিক বিন আনাস রহ. পর্যন্ত সনদ

৫. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফিঈ রহ. পর্যন্ত সনদ

৬. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. পর্যন্ত সনদ

৭. ইমাম তিরমিযী রহ. এর 'আশ-শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়া' কিতাবের সনদ

৮. ইমাম দারিমী রহ. এর 'সুনানুদ দারিমী' কিতাবের সনদ

৯. ইমাম হাকিম রহ. এর 'আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন' কিতাবের সনদ

১০. ইমাম নববী রহ. এর 'রিয়াদুস সালিহীন', 'কিতাবুল আযকার'সহ তাঁর সকল কিতাবের সনদ

১১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. এর 'আল-জামিউস সগীর', 'তাফসীরে জালালাইন'সহ তাঁর সকল কিতাবের সনদ

১২. ইমাম তবারী রহ. এর 'জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন' তথা তাফসীরে তবারীর সনদ

১৩. ইমাম কুরতুবী রহ. এর 'জামিউ আহকামিল কুরআন' তথা তাফসীরে কুরতুবীর সনদ

১৪. ইমাম ইবনে কাসীর রহ. এর 'তাফসীরুল কুরআনিল আজীম' তথা তাফসীরে ইবনে কাসীরসহ তাঁর সকল কিতাবের সনদ

১৫. কাজী ইয়াদ্ব বিন মুসা আল-ইয়াহসুবী রহ. পর্যন্ত সনদ

১৬. ইমাম গাজ্জালী রহ. এর 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন'সহ তাঁর সকল কিতাবের সনদ।

মুসালসাল হাদীসসহ এ কিতাবসমূহের সনদ বর্তমানে বিরল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট নেই বললেই চলে। সনদের ঐতিহ্য রক্ষার্থে এ কিতাবসমূহ সনদ লাভ করতে পারা আমার জন্য এক অভাবনীয় প্রাপ্তি।

তৃতীয়ত

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রহ. এর হাদীসের সনদ বর্তমান সময়ের অন্যতম উলু' সনদ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সংযুক্ত সনদ পরম্পরায় রাবী বা বর্ণনাকারীর সংখ্যা তুলনামুলক কম থাকলে, সে সনদকে الإسناد العالي (সুউচ্চ সনদ) বলা হয়। এর গুরুত্ব অপরিসীম الإسناد العالي (সুউচ্চ সনদ) জন্য এর পূর্বেকার মুহাদ্দিসগণ সফর করতেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও الإسناد العالي (সুউচ্চ সনদ)কে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্তির কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ বিন আসলাম আত-তুসী রহ. (ওফাত ২৪২ হি.) বলেন,

قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله عز و جل . وهذا كما قال لأن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - والقرب إليه قرب إلى الله عز و جل .

সনদের নিকটত্ব হচ্ছে নৈকট্য লাভ; অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ। কেননা সনদের নিকটত্ব হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে নিকটবর্তী হওয়া। আর তাঁর দিকে নিকটবর্তী হওয়া আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করা।[৮]

মুহাদ্দিস হুজুর রহ. এর الإسناد العالي (সুউচ্চ সনদ) হলো নিম্নের সনদ-

١ محدث الحرم المكي الشيخ السيد محمد بن علوي المالكي المكي

٢ الشيخ السيد علوي بن عباس المالكي المكي

٣ الشيخ أحمد بن صالح السويدي البغدادي

٤ الحافظ السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي

٥ الشيخ محمد بن سنة الفلاني

٦ الشيخ أحمد بن محمد العجل اليمني

٧ الشيخ المعمر قطب الدين محمد ابن أحمد النهروالي

٨ الشيخ أبي الفتوح أحمد بن عبد الله الطاؤوسي

٩ الشيخ المعمر يوسف الهروي

١٠ أبو عبد الرحمن بن شاذ بخت الفارسي الفرغاني

١١ الشيخ أبو لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني

١٢ الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري

١٣ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله تعالى.[৯]

এ সনদের মধ্যে তাঁর থেকে ইমাম বুখারী রহ. পর্যন্ত মোট ১২ জন রাবী রয়েছেন। ইমাম বুখারী রহ. সহ মোট ১৩ জন।

অপরদিকে, সহীহ বুখারীর সর্বোচ্চ সনদ হলো তিন জন রাবী বিশিষ্ট। যাকে ثلاثيات (সুলাসিয়াত) বলা হয়। যেমন:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ[১০]

---

[৮] গ্রাগুক্ত

[৯] তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব, পৃষ্ঠা নং ৩২

[১০] সহীহ বুখারী, كتاب العلم، باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم, হাদীস নং ১০৯

এ হাদীসে ইমাম বুখারী রহ. এর সনদে মাত্র তিনজন রাবী রয়েছে। তাঁরা হলেন,

১ مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رحمه الله تعالى

২ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ رحمه الله تعالى

৩ سَلَمَةَ بن الأكوع رضي الله عنه

মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. এর সনদে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করলে সনদে সর্বমোট রাবী হবেন ১৬ জন। অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ হাদীসখানা মাত্র ১৬ জন রাবী পরম্পরায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. এর নিকট পৌঁছেছে। হুজুরের সনদে আমি অধম এ হাদীস বর্ণনা করলে সনদে মোট ১৭ জন রাবী থাকবেন। আলহামদুলিল্লাহ। এরকম সুউচ্চ সনদ বর্তমান সময়ে সত্যিই বিরল।

চতুর্থত

কোন শায়েখ থেকে হাদীস গ্রহণের পদ্ধতিকে উলুমুল হাদীসের পরিভাষায় طرق تحمل الحديث।বলা হয়। হাদীস গ্রহণের জন্য স্বীকৃত ও অনুমোদিত আটটি পদ্ধতি রয়েছে।[১১] এর প্রথম তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. থেকে হাদীস গ্রহণ করতে পেরেছি। যেমন:

০১ السماع من لفظ الشيخ | (শায়েখের মুখ থেকে সরাসরি শ্রবণ): মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. এর নিকট থেকে চারখানা মুসালসাল হাদীস এ পদ্ধতিতে গ্রহণ করেছি। এ পদ্ধতি হাদীসগ্রহণের সর্বোত্তম পদ্ধতি।

০২ القراءة على الشيخ | (শায়েখের সামনে হাদীস পাঠ): সহীহ বুখারীর প্রথম দুই হাদীস এই পদ্ধতিতে মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. এর নিকট থেকে গ্রহণ করেছি। এ পদ্ধতিকে العرض (উপস্থাপন)ও বলা হয়ে থাকে। ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম মালিক রহ., ইবনে আবি জি'ব রহ. প্রমুখের মতে, এ পদ্ধতিটি السماع من لفظ الشيخ (শায়েখের মুখ থেকে সরাসরি শ্রবণ) থেকেও অগ্রগণ্য।[১২]

০৩ الإجازة | (অনুমতি প্রদান): মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. থেকে অন্যান্য হাদীসের সনদ পেয়েছি الإجازة পদ্ধতিতে এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। সর্বোত্তম প্রকার হলো الإجازة لمعين بالمعين (নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কিতাবের অনুমতি প্রদান)। মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. থেকে নির্দিষ্ট কিতাবসমূহের অনুমতি পেয়েছি। নির্দিষ্টভাবে আমার নাম, পিতার নাম লিখে হুজুরের স্বাক্ষর সম্বলতি অনুমতিপত্র আমাকে দেয়া হয়েছে। যা হুজুরের সনদের কিতাব তুহফাতুল লবীব বিআসানীদিল হাবীব (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب) এর শেষে রয়েছে।

---

[১১] মুকাদ্দিমা ইবনিস সলাহ, পৃষ্ঠা নং ৭৫

[১২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৭৮

ভাবতে ভালোই লাগে যে, طرق تحمل الحديث এর প্রথম তিনটি পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে কিভাবে মিলে গেল? আবার الاجازة। এর ক্ষেত্রে কিভাবে প্রথম প্রকার الإجازة لمعين। المعين মিলে গেল? হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রেও সময়ের ধারাবাহিকতার সাথে এ পদ্ধতিগুলোর حسن الموافقة বা কাকতালীয় অপূর্ব মিল সত্যিই আমাকে অবাক করেছে।

পঞ্চমত

মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. এর নাম ও আমার নাম একই- মো: হবিবুর রহমান। শায়েখ ও ছাত্রের একই নাম হওয়ার বিষয়টিকে উলুমুল হাদীসের পরিভাষায় الرواية عن مُتَّفِقي الاسم। (একই নামের কোন শায়েখ থেকে হাদীস বর্ণনা) বলা হয়।[১৩] এছাড়াও নাম এক হওয়ার বিষয়টি উলুমুল হাদীসে الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ (নাম এক, ব্যক্তি ভিন্ন, الْمُتَشَابِهُ (সাদৃশ্যপূর্ণ নাম) প্রভৃতি শাখায় আলোচনা করা হয়েছে। এসব বিষয় পাঠদানের ক্ষেত্রে আমি মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. এবং আমার নামের অভিন্নতার বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে থাকি।

ষষ্ঠত

মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. ২৩ নভেম্বর ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। এ মাদ্‌রাসায় হাদীসের দারসকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হুজুরের প্রথম হাদীসের দারস বিবেচনা করলে দেখা যায়, হুজুর প্রায় ৬০ বছর ব্যাপী হাদীসের দারস প্রদান করেছেন। সেই সময়ে ২০ বছর বয়সেও যারা হুজুরের নিকট থেকে হাদীসের দারস গ্রহণ করেছেন, তাদের বয়স এখন ৮০ বছরের উপরে। তাঁদের অনেকেই হয়ত দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যারা ১৭ নভেম্বর ২০২১ এ হাদীসের দারস গ্রহণ করেছি, তাদের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ এর মধ্যে। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছানুসারে আমরাও দুনিয়া থেকে বিদায় নিব। কিন্তু হুজুরের প্রথম সময়ের ছাত্রবৃন্দের মৃত্যু এবং আমাদের মৃত্যুর মাঝে যে ব্যবধান হবে, সে বিষয়টিকে উলুমুল হাদীসের পরিভাষায় السابق واللاحق (মৃত্যুতে অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী) হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এর উপকারিতা হচ্ছে- আমাদের মধ্য থেকে যারা আরো ৪০ বছর পর মৃত্যুবরণ করবে, তারা আরো ৪০ বছর হুজুরের সুউচ্চ সনদকে জারি রাখতে পারবে।

হুজুরের লিখিত কিতাবের সোহবতে

সোহবত বা সাহচর্য দু'ধরণের হতে পারে। এক. শারিরীক সাক্ষাৎ ও সাহচর্য গ্রহণ, দুই. অশরীরী সাহচর্য। প্রথম প্রকারটি সকলের জানা। দ্বিতীয়ত প্রকারটির সংজ্ঞা হতে পারে এরকম- কারো অনুপস্থিতে তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলি থেকে জ্ঞান লাভ করা। এটাও আমার

[১৩] নুযহাতুন নাজর ফী তাওদ্বিহি নুখবাতিল ফিকার, পৃষ্ঠা ১৫৩

নিকট সোহবতের অন্তর্ভূক্ত। কারণ গ্রন্থকারের জ্ঞান-গবেষণা, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার লিখিত আকারে গ্রন্থের রূপ ধারণ করে। জীবদ্দশায় কারো সান্নিধ্যে যে উপকার লাভ হয়; মৃত্যু পরবর্তী সময়ে তাঁর গ্রন্থাবলি পাঠেও সে উপকার লাভ করা সম্ভব। মুহাদ্দিস হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে দু'ভাবে আমার সোহবত অর্জিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। হুজুরের লেখা বেশ কয়েকটি কিতাব আমার সংগ্রহে রয়েছে। যা পাঠ করে আমি উপকৃত ও অনুপ্রাণিত হই। মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর যে কিতাবগুলো আমার সংগ্রহে আছে, তা হলো-

০১। **দারসে হাদীস (১)**

এ কিতাবটি মূলত সহীহ বুখারীর প্রথম হাদীসের দারসের সংকলন, সম্পাদনা ও টীকা-টিপ্পনী উল্লেখ করেছেন হুজুরের ছেলে মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল। এ দারসে ইলমে হাদীসের সংজ্ঞা, হাদীসের মর্যাদা, হাদীস সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় পরিভাষার ব্যাখ্যা প্রভৃতির পাশাপাশি নিয়্যাত সংক্রান্ত সহীহ বুখারী প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সুনিপুনভাবে ফুঁটে উঠেছে। বিশেষত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নসবনামা বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা আমাকে বিমোহিত করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসবনামা জানার গুরুত্ব, নসবনামার পবিত্রতা ও তাঁর পিতা-মাতা নাজাতপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়গুলো অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে এ দারসে আলোচনা করা হয়েছে।

০২। **আল-কওলুর রাজিহ ফী সলাতুত তরাবীহ** (القول الراجح في صلاة التراويح)

এ পুস্তিকাটি হুজুরের দারসের অনুলিখন। এর অনুলেখক মো: আবদুল বাকী খালিদ এবং সম্পাদক মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল। এ পুস্তিকাটি সালাতুত তারাবীহের ফযিলত, রাকাত সংখ্যা, বিশ রাকাতের দলীল এবং আট রাকাতের দলীল পর্যালোচনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি সালাতুত তারাবীহ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসয়ালাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ৪৫টি কিতাব থেকে এ পুস্তিকায় তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

০৩। **তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব** (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب)

এ কিতাবটি মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. এর সনদের কিতাব। এ কিতাবটি আরবী ভাষায় লিখিত। ইলমুল ক্বিরাত, হাদীস, তাফসীর, তাসাওউফসহ বিভিন্ন কিতাব এবং প্রসিদ্ধ ইমামগণ পর্যন্ত হুজুরের সনদ এখানে রয়েছে। এ কিতাব আমার প্রেরণার উৎস ও এগিয়ে যাওয়ার মাইলফলক। কেননা এ কিতাবের মাঝে রয়েছে আমার সনদ, যা আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ।

০৪। **আত তুহফাতুল লতীফাহ ফী আহাদীছিল মুসলসলতিল মুনীফাহ** (التحفة اللطيفة في احاديث المسلسلة المنيفة)

এ কিতাবটি মুসালসাল হাদীসের কিতাব। এ কিতাবে মোট আটখানা হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে চারখানা মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. শায়েখ থেকে শ্রবণ করেছেন, বাকি চারখানা বর্ণনার ব্যাপারে তিনি ইজাযতপ্রাপ্ত হয়েছেন।

০৫। **মুনতাখাবুস সুনান ওয়াল আছার** (منتخب السنن والأثار)

এ কিতাবটি মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. এর হাদীস সংকলন। এ কিতাবের শুরুতে তিনি হাদীসের প্রয়োজনীয় পরিভাষা ও উলুমুল হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক আলোচনা সন্নিবেশ করেছেন। এ কিতাবটি তিনটি অধ্যায় রয়েছে। كتاب الإيمان এ ঈমান-আকীদা বিষয়ক ৬৫টি হাদীস, كتاب الصلاة এ নামায সংক্রান্ত ১১৫টি হাদীস এবং كتاب الفتن এ ২৩টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ কিতাবের সর্বমোট হাদীস সংখ্যা ২০৩। এ কিতাবের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- প্রতিটি باب বা অধ্যায়ের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক হাদীস সংকলন করা হয়েছে।
- হাদীসের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ থেকে হাদীস চয়ন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন পরিচ্ছেদের শুরুতে পবিত্র কুরআনের আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে।
- হাদীসের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ থেকে বিভিন্ন হাদীসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।
- হাদীস উল্লেখের পাশাপাশি বিভিন্ন হাদীসের ক্ষেত্রে সনদগত আলোচনা ও হাদীসের মান উল্লেখ করা হয়েছে।
- আহলুস সুন্নাত ওয়া জামায়াতের আকীদা এবং হানাফী মাযহাবের মতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে এ কিতাবটি তালিবুল ইলমের হাদীস মুখস্থের জন্য খুবই উপযোগী ও অনবদ্য।

৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. ইন্তেকাল করেন। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম। ফেসবুকে হুজুরের ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে খুবই মর্মাহত হয়েছি। দূরত্বের কারণে হুজুরের জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারিনি। আল্লাহ তায়ালা হুজুরের আমৃত্যু ইলমে হাদীসের খেদমতকে কবুল করুন। হুজুরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন। তাঁর পরিবার-পরিজনের ইলম ও আমলে বরকত দান করুন। আমীন।

লেখক: প্রভাষক (আল-হাদীস), দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, এম.ফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

হাদীসের আলোকে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ'র মাহাসিনসমূহ: একটি পর্যালোচনা

মাওলানা আবু সালেহ্ মুহাম্মাদ মামুন

উপমহাদেশের মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে যারা হাদীসে নববীর আমলকে বাস্তব জীবনে পূর্ণ অনুসরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, তাদের মধ্যে আল্লামা মো হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন অন্যতম। মানুষের সাথে চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া ও দ্বীনি দারস প্রদানসহ অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের উপর তাঁর আমলের এক অপূর্ব মিল খুঁজে পাওয়া যায়। হুজুরের এধরণের কয়েকটি আমলের মাহাসিন তথা গুণাবলীর চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. কম কথা বলার অভ্যাস

কম কথা বলা বা স্বল্পভাষিতা ছিল মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের মহৎ গুণগুলোর একটি। তিনি যে কোন বিষয়ে হুট করে কোন মন্তব্য করতেন না। সর্বোপরি ভেবেচিন্তে কথা বলতেন। সম্ভবত তিনি নিম্নের এই হাদীসের উপর আমল করতেন-

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫৯৪)।

২. নিজেকে নিয়ে কখনো গর্ব না করা

মুহাদ্দিস সাহেব রাহিমাহুল্লাহ নিজের ইলম নিয়ে কখনো গর্ব করতেন না। বরং সর্বদা নিজেকে ছোট মনে করতেন। আর এটি ছিল সালাফে সালেহীনেরও নীতি। তারা সর্বদা নিজেদেরকে অন্যের চাইতে হীন মনে করতেন। যেহেতু রাসূল ﷺ এর হাদীসে রয়েছে:

إنَّ اللهَ أوحى إليَّ أن تواضَعوا حتى لا يبغيَ أحدٌ على أحدٍ، ولا يفخرَ أحدٌ على أحدٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও। তোমাদের কেউ যেন একে অপরের উপর গর্ব না করে এবং একে অপরের উপর বাড়াবাড়ি না করে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৬৫)।

৩. পারস্পরিক দোষ-ত্রুটি গোপনে সংশোধন করে দেয়া

হুজুরের আরেকটি গুণ ছিল যে, কোন লোকের মধ্যে দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে আড়ালে নিয়ে সংশোধন করে দিতেন। যেটি অন্য কোন বুজুর্গের মাঝে খুব কমই দেখা যায়। তাঁর এই গুণটা নিম্নের হাদীসের সাথে মিলে যায়, রাসূল ﷺ বলেন-

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ، إِذَا رَأَى فِيهَا عَيْبًا أَصْلَحَهُ.

অর্থাৎ, মুমিন হচ্ছে তার ভাইয়ের আয়না। যখন সে তার মাঝে কোন ত্রুটি দেখে তখন তা সংশোধন করে দেয়। (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ১৭৭)

৪. ওয়াজ-নসিহতের ক্ষেত্রে অশালীন ভাষা পরিহার করা

ওয়াজ-নসিহত বা হাদীসের দারস প্রদানে তিনি কখনো গালি-গালাজমূলক শব্দ বা অশ্লীল অথবা কঠোর ভাষা প্রয়োগ করতেন না। যেটি আজকাল কিছুসংখ্যক ওয়াজকারীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মুহাদ্দিস সাহেব এক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর অন্যতম এই গুণটির প্রতি আমল করতেন, যেটি হাদীসে রয়েছে:

لَمْ يَكُنِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَبَّابًا، ولَا فَحَّاشًا، ولَا لَعَّانًا

অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গালি-গালাজকারী, অশালীন ও লা'নতকারী ছিলেন না। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৩১)।

৫. কথা বলার পূর্বেই সালাম দেয়া

দেখা-সাক্ষাতে বা ফোনে কারো সাথে কথা-বার্তায় হুজুর ছিলেন সালাম প্রদানে অগ্রগামী। তাঁর আগে কেউ সালাম দিতে পারতেন না। ছোট-বড় সবার ক্ষেত্রে তিনি এই সুন্নাহ প্রয়োগ করতেন। আর এটিই হচ্ছে রাসূল ﷺ এর হাদীস। তিনি বলেন-

إِنَّ أولى الناس باللهِ ؛ من بدأَهم بالسلامِ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট উত্তম সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়া। (সুনান আবু দাঊদ, হাদীস নং ৫১৯৭)।

৬. মানুষের সাথে পদমর্যাদানুযায়ী আচরণ

সমাজের মানুষের সাথে আচার-আচরণে মুহাদ্দিস সাহেব ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। যে কোন বয়সের লোক তাঁর সাথে মিশলে সুন্দর ব্যবহার পেত। দয়া, নম্রতা, নরম মেজাজ ও হাস্যোজ্জল চেহারা নিয়ে মানুষের সাথে তিনি মিশতেন এবং তাদের কথা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে শুনতেন। তাঁর এই সুন্দর আচরণের আমলটা আমরা নিম্নের হাদীস থেকে পাই; হাদীসটি হলো-

أنزِلوا النَّاسَ مَنازِلَهم

অর্থাৎ, তোমরা মানুষের সঙ্গে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করো। (সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৮৪২)।

৭. সুন্নাতী খাবার গ্রহণের প্রতি আগ্রহী

রাসূল ﷺ কিছু খাবার পছন্দ করতেন। যেমন- আজওয়া খেজুর, মিষ্টি দ্রব্য, মধু, কালোজিরা, যাইতুন ও লাউ ইত্যাদি। এসব খাবারসমূহ প্রয়োজন ও পরিমাণমত মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের পছন্দের তালিকায় থাকতো। এগুলোর উপর হাদীসসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

মিষ্টি দ্রব্য ও মধু-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ "

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি দ্রব্য ও মধু অধিক পছন্দ করতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪৩১)।

عليكم بالشِّفائين العسلِ والقرآنِ

অর্থাৎ, তোমরা কুরআন ও মধু দিয়ে ব্যাধি নিরাময়ের ব্যবস্থা করবে। (সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৪৫২)।

আজওয়া খেজুর-

مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ভোরে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন কোনো বিষ ও জাদুটোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না। (সহাহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৬৮)।

কালোজিরা-

في الحَبَّةِ السوْدَاءِ شِفَاءٌ من كل دَاءٍ إلاَّ السَّام

অর্থাৎ, কালোজিরায় মৃত্যু ব্যতীত সব রোগের নিরাময় আছে। (সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৪৪৮)।

যাইতুন তৈল-

كُلُوا الزَّيْتَ, وَادَّهِنُوا بِهِ, فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

অর্থাৎ, তোমরা যায়তুন তৈল খাও এবং তা মালিশ করো। কারণ, তা বরকতময় বৃক্ষ হতে উৎপন্ন। (মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৩৫০৪)।

>লাউ-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ

অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউ খুবই পছন্দ করতেন। (শারহুস সুন্নাহ, হাদীস নং ২৮৬১)।

উপরোক্ত হাদীসসমূহের উপর হুজুরের আমল আমার নিজ চোখে দেখা।

৮. আল্লাহভীতি তথা পরহেজগারী

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন-

لَيْسَ الْعِلْمُ لِلْمَرْءِ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ وَلَكِنَّ الْعِلْمَ الْخَشْيَةُ

অর্থাৎ, অধিক হাদীস বর্ণনা করা মানুষের প্রকৃত জ্ঞানার্জন নয়। বরং আল্লাহভীতি হলো প্রকৃত জ্ঞান। (সিফাতুস সাফওয়াহ, খ.১, পৃ.১৯০)।

মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের পরহেজগারিতার চিত্র আমরা কাছ থেকে যারা দেখেছি তাদের সবার জানা। তিনি ছিলেন একজন নিয়মিত তাহাজ্জুদগুজার আল্লাহর বান্দা, খুব কম সংখ্যক মানুষই তাঁর এই গোপন আমলের কথা জানতেন।

ইলমে হাদীসের এই মহান খাদিম আজ আমাদের মাঝে নেই, তবে তাঁর রেখে যাওয়া খিদমাতসমূহ আমাদের সবার সামনে বিদ্যমান রয়েছে। আসুন, আমরা হুজুরের এই আমলগুলোর চর্চা বাস্তব জীবনে করি এবং তাঁর আখিরাতের দরজা বুলন্দির জন্য মহান রবের কাছে প্রার্থনা অব্যাহত রাখি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সেই তাওফিক দান করুন। আমীন।

লেখক : ইমাম ও খতীব, মদীনা মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার ওল্ডহাম, ইউকে।

ইসনাদে আ'লী : একটি স্মৃতিময় সফর

মাওলানা মোয়াজ্জেম হোসাইন সিদ্দীকি

মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান র. এর ইলমী মাকাম অবগত নন এমন আহলুল ইলম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আর তিনি কোন স্তরের আলিম ছিলেন তা তাঁর দুই একজন ছাত্রের ইলমী অবস্থান দেখলেও কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। যদিও তাঁর ছাত্র জগদ্বিখ্যাত মুহাক্কিক আলিম শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র. এর বিবেচনায় আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের লোকজন তাঁর ইলমের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারিনি। মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান র. এর আরেক ছাত্র, বাংলা ভাষায় ইসলামি সাহিত্যের পথিকৃত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান র. এর কথায়ও এর সত্যতা পাওয়া যায়। প্রবল ইচ্ছা ছিলো ইলমের এ মহান সাধকের কোনো ছাত্রের সোহবত লাভ করে নিজেকে ধন্য করার। খুঁজতে থাকলাম তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী কোনো ছাত্র আছে কি না।

অবশেষে পরিচিত হলাম সিলেটের প্রথিতযশা মুহাদ্দিস শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর নামের সাথে। তিনি মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান র. এর সোহবতপ্রাপ্ত যোগ্য ছাত্র। তাঁর সাথে পরিচয় লাভের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার এ নগন্য বান্দার মনোবসনা পূর্ণ করলেন। আমিসহ আমরা অনেকেই তাঁর ছাত্র হয়ে হাদীসে মুসালসালসহ সিহাহ সিত্তার সনদ লাভের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনার ইজাযতপ্রাপ্ত হলাম। সেই মুহূর্ত এবং দৃশ্যটি ছিল অবিস্মরণীয়।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর জন্ম ১৯৩৪ সনে। আর ইন্তেকাল ২০২২ সনে। সুদীর্ঘ প্রায় ৯০ বছরে তিনি ইলমে নববীর অমীয় সুধা বিলিয়ে দিয়েছেন অকাতরে, জীবনভর। তাইতো স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুহাদ্দিস উপাধি দিয়েছেন। আর সে সুধা পানে তৃপ্ত হয়েছেন অসংখ্য হাদীস পিপাসু অন্বেষী। আলহামদুলিল্লাহ, খুব অল্প ও স্বল্প হলেও আল্লাহ তাআলা পান করিয়েছেন আমাকে ও আমাদেরকে।

২০১৫ সালের দিকে মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ অসুস্থ হলে মগবাজারের একটি প্রাইভেট হসপিটালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বন্ধুবর ছোটভাই দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসার স্বনামধন্য প্রভাষক মাওলানা হাবীবুর রহমান ও আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত, দারুননাজাতের মেধাবীমুখ, হুজুরের অত্যন্ত স্নেহধন্য ছাত্র মাওলানা নিয়াজ উদ্দিন হুজুরকে দেখতে যান। পূর্বে কম-বেশ জানা থাকলেও সেদিনের পর থেকে মুহাদ্দিস হুজুর সম্পর্কে জানার ও তাঁর সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হতে থাকে। অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকি এ প্রিয় মুহাদ্দিসের দিদার লাভের জন্য। কেননা আমি

অধমের ইলম-না থাকলেও আহলে ইলমদের ভালোবাসি, মহব্বত করি। তাদের সোহবত পেলে নিজেকে ধন্য মনে করি; সে যে ঘরানারই হোক না কেন। আর সে যদি হন প্রিয় নবীর হাদীসের ধারক ও বাহক; আমাদের আকীদা ও মতাদর্শের; তাতো আরো আনন্দ ও তৃপ্তির বিষয়। কেননা, তাদের সাক্ষাত লাভ তো সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাত লাভের ন্যায়। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী র. বলেন,

أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم، وكان يقول : إذا رأيتُ صاحب حديثٍ فكأني رأيتُ أحدًا من أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ, "প্রত্যেক যুগের মুহাদ্দিসগণ তাদের যুগে সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়। আর তিনি (ইমাম শাফেয়ী র.) বলতেন, যখন আমি কোনো মুহাদ্দিসকে দেখি, আমার কাছে মনে হয়, কেমন যেন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সাহাবীকে দেখেছি।"

মাহফুজ আহমাদ মিনহাজ। মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর স্নেহধন্য ভাতিজা। আমাদের প্রিয় ছাত্র। অত্যন্ত মেধাবী, আখলাকী ও বিনয়ী। ২০১৯ সনে নিয়াজ ভাইয়ের মাধ্যমে জকিগঞ্জে একটি মাহফিলের প্রোগ্রামে মিনহাজ রাহবারের ভূমিকা পালন করে। সাথে ছিলো আরেক ছাত্র ওর ক্লাসমেট নুরুল আমিন। যেহেতু মিনহাজের বাড়িও জকিগঞ্জে এবং ওদের বাড়ির পাশের রোড দিয়ে যেতে হবে, তাই ও ওদের বাড়িতে আপ্যায়নের আবদার জানাল। আমিও ওর আবদার এক বাক্যেই গ্রহণ করলাম মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে দেখা করার সৌভাগ্য হবে ভেবে। ওদের বাড়িতে পৌঁছতে প্রায় আসর হলো। অনেক কিছু দিয়ে আপ্যায়ন করালো। সিলেটিরা মেহমানদারী ও মেহমানকে সম্মানিত করার ক্ষেত্রে প্রশংসিত। আমার কাছে মনে হয় তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীস, من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فاليكرم ضيفه এর পূর্ণ মেছদাক। ওর মায়ের হাতের রান্নায় বেশ স্বাদ। অনেক নাস্তা ও অনেক পদের মাছ ও তরকারি দিয়ে আপ্যায়ন করালো। মিনহাজের আম্মু কয়েক মাস আগে উচ্চস্বরে কালিমা পড়তে পড়তে ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ তাআলা মিনহাজের মাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। মিনহাজের বাবা ও বড় ভাই মাওলানা জুহায়ের আহমাদ সাহেবের আন্তরিকতা ভুলবার নয়।

এবারে মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে জীবনের প্রথম সাক্ষাতের সেই ক্ষণ। মিনহাজ আমাকে নিয়ে গেলো হুজুরের বাসায়। সামনের রুমে অপেক্ষা করছিলাম। মনের মাঝে আবেগ আর উৎকণ্ঠা। একটু পরেই দীদার হবে মুজাদ্দেদী, বারাকাতী র. এর সোহবতধন্য ছাত্র, যুগের সেরা মুহাদ্দিসের সাথে। অপেক্ষার প্রহর ভেঙে হুজুর আগমন করলেন। কী সুন্দর অবয়ব! চেহারায় ইলমে নববীর নূরের ঝলকানি। মিনহাজ পরিচয় করিয়ে দিলো। সালাম দিলাম, মুসাফাহা করলাম। কদমবুচি করতে গেলে তাঁর

বিনয়ের প্রকাশ দেখলাম। হুজুর বললেন, একি! আপনি কী করছেন, আপনি আমাকে এতো সম্মান কেন দিচ্ছেন? আপনি তো একজন আলিম। সেদিন হুজুরের বাড়ির মসজিদে তাঁর ধারাবাহিক দারস ছিলো। মাহফিলের প্রোগ্রামের কারণে দারস গ্রহণের সৌভাগ্য হলো না। দেখতে দেখতে কেটে গেল দুটি বছর। মুহাদ্দিস হুজুরের সাথে সাক্ষাত হলেও দারস ও সোহবত নেয়ার সুযোগ হয়নি।

সনদে আলী বা সুউচ্চ সনদ অর্জন আহলে ইলমদের কাছে একটি সৌভাগ্যের বিষয়। পূর্বেকার মুহাদ্দিসগণ সনদে আলী লাভের জন্য সফর করতেন। এজন্য মুহাদ্দিসগণের কাছে সনদে আলীর গুরুত্ব অপরিসীম।

মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর হাদীসের সনদ বর্তমান যুগের আলী বা সুউচ্চ সনদ। অর্থাৎ, তাঁর থেকে ইমাম বুখারি এবং ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত বর্ণনাকারীর সংখ্যা তুলনামূলক কম। আমরা যারা দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসা অথবা ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে হাদীসের সনদ গ্রহণ করে থাকি, সে সনদ দেওবন্দ হয়ে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রায় ২৫/২৬ জন। অন্যদিকে মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সনদে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত বর্ণকারীর সংখ্যা মাত্র ১২/১৩ জন। এ কারণে আমার প্রবল আগ্রহ ও ইচ্ছা ছিলো হুজুর থেকে এ আলী সনদ গ্রহণ করার। এছাড়াও হুজুরের সোহবত লাভের আকর্ষণের আরেক কারণ ছিলো হাদীসে মুসালসালের দারস গ্রহণ ও সনদ লাভ।

ইতোমধ্যে দারুননাজাত মাদ্‌রাসার কিছু শিক্ষক ও ছাত্রসহ সংশ্লিষ্ট আরো অনেকেই হুজুরের দারস গ্রহণের মাধ্যমে সোহবতে ধন্য হয়ে সনদে আলী লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আমিও অপেক্ষা করছিলাম এবং সুযোগ খুঁজছিলাম। ১৭ নভেম্বর ২০২১ সাল। অবশেষে সে আশাও পূরণ হলো। শিক্ষক-ছাত্র মিলে আমরা ১৩/১৪ জনের একটি কাফেলা পূণ্যভূমি সিলেটের বরকতময় জায়গা জকিগঞ্জের মুহাদ্দিস হুজুরের বাড়িতে উপস্থিত হলাম।

এক্ষেত্রে মাহফুজের অবদান অনস্বীকার্য। মাহফুজ আমাকে অনেক মহব্বত করে। আমিও ওকে বিশেষভাবে মহব্বত করি। ওর বারবার ফোন করে স্মরণ করিয়ে দেয়া, যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান, কখন আসবেন, কতজন আসবেন এমন পীড়াপীড়ির কারণেই হয়তো সম্ভব হয়েছে।

আমাদের পৌঁছতে যোহরের সময় হয়ে গেল। আমরা যোহরের নামায আদায় করলাম। যোহরের নামাযের পরে মসজিদে মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ মুসালসাল হাদীসের দারস প্রদান করেন। খতমে বুখারি ও ফাতেহা-ই-ইয়াজ দাহম উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান ছিলো। মুসালসাল হাদীসের দারসে অংশগ্রহণ আমার ইলমি জীবনের এক অন্যরকম

স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা। হুজুর শারিরীকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তবুও প্রায় ২৫ মিনিট মুসালসাল হাদীসের ওপর আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনায় তিনি মুসালসাল হাদীসের গুরুত্ব, সনদ, তাঁর শায়খ প্রসঙ্গসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। এমনকি তিনি আমাদের কাফেলা প্রসঙ্গ ও দারুননাজাতের মরহুম পিরোজীপুরী হুজুর র.এর জন্য দুআও চেয়েছেন। অতঃপর তিনি চারখানা মুসালসাল হাদীস বর্ণনা, অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করেন।

দারস শেষে হুজুরের একটি কথা সকলের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ সৃষ্টি করে। হুজুর বলেন, হয়তো এটাই আমার জীবনের শেষ দারস। এ কথা শুনে উপস্থিত মজলিসে কান্নার রোল পড়ে যায়। আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দারা এভাবেই তাঁদের শেষ বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন। মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এ দারসের পরে আনুষ্ঠানিক আর কোনো দারস দেয়ার আগেই তার রফিকে আলার ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

আমরা দুপুরের খাবার খেলাম। হুজুরের ছেলে মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল সাহেবের সাথে এই প্রথম সরাসরি সাক্ষাত হলো। যদিও হাবিব ভাইয়ের মাধ্যমে অনলাইনে পূর্বে পরিচয় হয়েছে। অসাধারণ অমায়িক সদালাপী একজন মানুষ। অনেক বড় মাপের একজন আলেম হয়েও আমাদের সাথে সাধারণের মতোই মিশেছেন। আমাদেরকে মসজিদের পাশেই মুহাদ্দিস হুজুরের নামে প্রতিষ্ঠিত মাকতাবাতুল হাবিব লাইব্রেরি ঘুরিয়ে দেখালেন। বিভিন্ন ফন্নী কিতাবের বিশাল সমাহার। আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের ছবি ও ভিডিও করে নিলাম আমাদের লাইব্রেরির জন্য কিতাবগুলো সংগ্রহ করব বলে।

মাকতাবা পরিদর্শন শেষ করে প্রিয় ছাত্র মাহফুজের বাড়িতে আমরা বিশ্রাম নিলাম। এবারের অপেক্ষা মুহাদ্দিস হুজুরের সাথে বিশেষ সাক্ষাত এবং সিহাহ সিত্তাসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবের ইজাযত ও সনদ গ্রহণ। কিন্তু হুজুর অসুস্থ থাকায় আমরা বলার সাহস পাচ্ছিলাম না। হুজুরের ছেলে ও মাহফুজ আমাদেরকে আশ্বস্ত করলেন। এক্ষেত্রে মাহফুজের আন্তরিক চেষ্টার কথা স্মরণ না করলেই নয়।

আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর মাহফুজ আমাদেরকে অনুমতি লাভের খুশির সংবাদ জানালো। আমরা হুজুরের রুমের ভেতরে চলে গেলাম। হুজুর শোয়া ছিলেন। মনের মাঝে আগ্রহ, আবেগ আর উৎকণ্ঠা। যুগের অন্যতম সেরা মুহাদ্দিস আমাদের হাদীসের দারস দিবেন, বর্ণনার ইজাযত দিবেন, সনদ দিবেন। সালাম দিলাম, কদমবুচি করলাম। হুজুর এতো অসুস্থ সত্ত্বেও কোনো ধরণের অস্বস্তি বা বিরক্তিবোধ তাঁর মাঝে পরিলক্ষিত হয়নি। আমাদের কেউ খাটের পাশে বসলেন, কেউ বা দাঁড়িয়ে রইলেন।

সে ক্ষণটি আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত ছিল। হুজুর সহীহ বুখারি থেকে আমাদের

একজনকে পড়তে বললেন। আলহামদুলিল্লাহ, কোনো চিন্তা না করে সহীহ বুখারী শুরু থেকে باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل বলে পড়া শুরু করলাম। প্রথম হাদীস পুরোটা পড়ার সুবর্ণ সৌভাগ্য হলো। আমার পরে দ্বিতীয় হাদীস পড়লেন মাওলানা আব্দুর রহমান দিদার হামিদী। মুহাদ্দিসগণ বা কোনো শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণের যে আটটি পদ্ধতি রয়েছে যাকে উসুলে হাদীসের পরিভাষায় طرقُ تحَمُّلِ الحديث বলা হয়। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো قراءة التلميذ على الشيخ বা القراءة على الشيخ। অর্থাৎ শায়খের সামনে ছাত্র হাদীস পড়বেন, শায়খ শুনবেন। এ পদ্ধতিতে আমরা হুজুরের থেকে হাদীস গ্রহণ করলাম। যদিও হুজুরের কাছ থেকে হাদীসে মুসালসাল শোনার মাধ্যমে প্রথম পদ্ধতিতেও হাদীস গ্রহণ করেছি। হুজুর আমাদের সিহাহ সিত্তাসহ অন্যান্য কিতাবের হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদান করলেন। আলহামদুলিল্লাহ, এ এক পরম পাওয়া, জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ অর্জন।

হুজুরের কামরা থেকে আমরা আবার মাহফুজদের ঘরে আসলাম। মুহাদ্দিস হুজুরের ছেলে মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল সাহেব (মা.জি.আ) মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ স্বাক্ষরিত হাদীসের সনদ ও ইযাযত বা অনুমতি সম্বলিত কিতাব (تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب) তুহফাতুল লাবিব বি আসানিদীল হাবিব প্রদান করেন। এ ইযাযতের মাধ্যমে আমরা হাদীসে মুসালসাল, সিহাহ সিত্তা, চার মাযহাবের ইমাম পর্যন্ত, ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ এর শামায়েল, সুনান দারেমী, আল মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন, রিয়াদুস সালেহীন ও কিতাবুল আযকারসহ লেখকের সকল কিতাব, আলজামেউস সগীর ও তাফসীরে জালালাইনসহ লেখকের সকল কিতাব, তাফসীরে তবারি, তাফসীরে কুরতুবি, তাফসীরে ইবনে কাসিরসহ লেখকের সকল কিতাব, কাজি ইয়াদ্ব বিন মুসা আল ইয়াহসুবী র. পর্যন্ত, ইমাম গাযযালী রাহিমাহুল্লাহ এর ইহইয়াউ উলুমুদ্দীনসহ তার সকল কিতাবের সনদ লাভ করি। শেষে মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল সাহেব হুজুর মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর সংকলিত এবং তার সম্পাদনার কিছু কিতাব আমাদেরকে হাদিয়া প্রদান করেন।

মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর বাড়ি থেকে বিদায় নিলাম। নিয়াজ ভাইয়ের আবদারে কিছু সময়ের জন্য তার বাড়িতে মেহমান হলাম। অনেক আইটেমের নাস্তা ও ফল দিয়ে আপ্যায়ন করালো।

পূণ্যভূমি সিলেটে ঘুমিয়ে আছেন সাহেব কেবলা ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ। আমরা গেলাম ফুলতলী দরবারে। সাহেব কেবলা ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ এর রূহানী ফায়েজ হাসিলের আশায়। সাহেব কেবলা রাহিমাহুল্লাহ এর মাকবারা যিয়ারত করলাম। সেখানে পবিত্র ইশার নামাজ আদায় করলাম। দায়িত্বশীলরা আমাদেরকে পুরো কমপ্লেক্স ঘুরিয়ে দেখালেন। তাদের আপ্যায়ন ও আতিথেয়তায় যারপরনাই আমরা মুগ্ধ হলাম। ফুলতলী

থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম।

০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২, সোমবার, বাদ মাগরিব। অনলাইনে প্রবেশ করতেই হৃদয় ভেঙে খানখান হওয়ার মতো সংবাদ দেখতে পাই। সিলেটের মুহাদ্দিস মো. হবিবুর রহমান হুজুর আর নেই। সর্বপ্রথম দেখতে পাই হুজুরের ভাতিজা মাহফুজের পোস্টে। ওর পোস্টটা দেখে হৃদয়টা দুমড়েমুচড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। কারণ ও ছিলো মুহাদ্দিস হুজুরের অত্যন্ত স্নেহ ও আদরের। কিন্তু ইন্তেকালের সময় ওর পাশে থাকার সুযোগ হয়নি। ও লিখেছিল, "চাচা আপনাকে আল্লাহর হাওলা, শেষ বিদায় আমার কপালে নেই।" আহ্! আর কোনোদিন সরাসরি দারসে বসা হবে না মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর। একে একে সবার ওয়ালেই ভাসতে দেখি হুজুরের ইন্তেকালের সংবাদ। মুহূর্তেই দেশ থেকে বিদেশে সর্বত্রই নেমে আসে শোকের ছায়া। হুজুরের জানাযা দাফন-কাফনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। সারাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-শিক্ষক, ভক্ত-মুহিব আসতে থাকেন হুজুরের জানাযায়। হুজুরের জানাযায় কল্পনাতীত লোক শরীক হওয়াই প্রমাণ করে হুজুর কতটা আল্লাহ তাআলার কাছে মাকবুল হয়েছেন। এজন্য ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল র. বলেছেন, জানাযার দিন হলো আমাদের মাঝে আর বাতিলদের মাঝে পার্থক্য করার দিন।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শরয়ী প্রয়োজন থাকায় প্রিয় ওস্তাদ মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারিনি।

০৭ মার্চ ২০২২, সোমবার। মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর প্রথম ঈসালে সাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। হুজুরের জানাযায় শরীক হতে না পারলেও প্রথম ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে অংশগ্রহণ করতে পেরে হৃদয়ে কিছুটা প্রশান্তি অনুভব করি। মুহতারাম মাওলানা ফরিদ বিন আব্দুল আউয়াল (ফরিদগঞ্জী হুজুর) ও কয়েকজন ছাত্রসহ আমরা অংশগ্রহণ করি। মসজিদের পাশেই হুজুরের মাকবারা যিয়ারত করি এবং প্রাণভরে দুআ করি। এক্ষেত্রে আবারো কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় প্রিয় মাহফুজের প্রতি, মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল হুজুরের প্রতি, মাহফুজের বড় ভাই মাওলানা জুবায়ের আহমাদ সাহেবের প্রতি, হুজুরের প্রথম ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য। মুহাদ্দিসদের মর্যাদা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার সুযোগ হয়। মুহতারাম ফরিদগঞ্জী হুজুর শিক্ষক ও দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করেন। এ ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে সাক্ষাত হয় যুগের ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নের আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার সাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ এর সুযোগ্য সাহেবজাদা আল্লামা হুসাম উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী হুজুরের সাথে। সাক্ষাত হয় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অতন্দ্র প্রহরী আল্লামা আইনুল হুদা হাফিজাহুল্লাহর সাথে। পবিত্র ইশার নামাজ ও রাতের খাবার খেয়ে রওয়ানা দেই।

এ সফরেও মুহাদ্দিস হুজুরের ছেলে মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল সাহেব হুজুর ও মাহফুজের আন্তরিকতায় আবারো মুগ্ধ হলাম। বিদায়ের সময় মুহাদ্দিস হুজুরের ছেলের সাথে অনেক কথা হলো, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বললেন, জোর করে হাদিয়া দিয়ে সম্মানিত করলেন। আল্লাহ তাআলা হুজুরের মনের সকল নেক আশা পূরণ করুন।

মুহাদ্দিস হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর ঈসালে সাওয়াব মাহফিল থেকে ফেরার পথে আমরা আল্লামা আইনুল হুদা হুজুরের বাসায় কিছু সময়ের মেহমান হলাম। অনেক রাত পর্যন্ত নানা বিষয়ে কথা হলো। আমাদের আন্তরিকতার সাথে আপ্যায়ন করালেন। অত্যন্ত সরল মনের সদালাপী আন্তরিক একজন মানুষ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের জন্য তার অবদান জাতি আজীবন স্মরণ রাখবেন। সেখান থেকে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম।

ভেবেই এখন আনন্দিত যে, আমি শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সরাসরি ছাত্র। আমার ইলমের সনদ বিশেষ করে ইলমে হাদীসের সনদ তাঁর মাধ্যমে মাত্র ১৬/১৭ জন হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। আরো আনন্দিত এ ভেবে যে, যদিও আমি আলিম বা নেককার নই, তবুও নেককারদের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে তাঁদের উসিলায় শাফায়াতের আশা রাখি, পরকালে নাজাতের আশা করি। স্মরণ করি ইমাম শাফেয়ী র. এর বিখ্যাত বাণী,

أحب الصالحين و لستُ منهم ، لعلي أن أنال بهم شفاعة.

হে প্রিয় মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ, আপনি শান্তিতে ঘুমান। এ জীবনে আর দেখা ও দারস গ্রহণের সুযোগ না হলেও জান্নাতে যেন দেখা হয়, দারস নেয়ার সুযোগ হয়। রূহানী ফুয়ুজাতদানে ধন্য করুন এ অধমকে। দুআ রইল আপনার প্রতি, দুআ ও ভালোবাসা আপনার আহল-পরিবারের প্রতি।

লেখক: প্রভাষক, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, সহযোগী সম্পাদক, মাসিক নতুন বিকাশ।

আমার দেখা আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা মুহাম্মাদ সদরুল আমিন (জগন্নাথপুরী)

হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর পশ্চিম সিলেট অঞ্চলে বড় মুহাদ্দিস ছাব হিসাবে পরিচিত। কেউ আবার মাদরাসার নিসবতে ইছামতির মুহাদ্দিস ছাব হুজুর বলতেন (যদিও তিনি ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন)। আমি যাদের বয়ানে নড়াচড়া করতাম না উনাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মরহুম ও মগফুর আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ। যেহেতু জীবনে কোনদিন হুজুরের নাম উচ্চারণ করে আমরা সম্বোধন করিনি, তাই আজও সেভাবেই লিখবো।

আমাদের বিভিন্ন মাদরাসার মাহফিলে হুজুরের বয়ান শুনলেও সরাসরি সাক্ষাৎ হয় ২০০১ ইংরেজী সনের পহেলা সেপ্টেম্বর হুজুরের প্রিয় দরসগাহ ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদরাসায়। আমার সম্পাদিত একটি ম্যাগাজিনে অভিমত আনার জন্যে সেদিন হুজুরের খেদমতে হাজির হয়েছিলাম।

হুজুর কামিল জামাতে বুখারী শরীফের দারস দিচ্ছিলেন। মাদরাসার পূর্ব পাশের ভবনের দু-তলায় আমরা গেলাম। আমাদেরকে দারসে বসায় ইজাযত দিলেন, আমরা বসলাম। চমৎকার উপস্থাপনা, সাবলিল বাচনভঙ্গি, সমৃদ্ধ দালিলিক আলোচনায় প্রাণবন্ত একটি দারস উপভোগ করলাম। আর মহান রবের দরবারে শোকর গোজার হলাম।

যোহরের নামযের পর হুজুর আমাদেরকে সময় দিলেন। কুশল বিনিময়ের পর জানতে চাইলেন, অভিমত লিখে আনছি কি না! আমি মাথা নেড়ে লেখাটি সামনে পেশ করলাম, হুজুর এটি পড়লেন এবং একটি মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, আমি অত্যন্ত খুশি হলাম যে, এখানে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইসিম মোবারক লিখে পূর্ণ দরুদ শরীফ লেখা হয়েছে। এভাবেই লিখা উচিৎ। কিন্তু আজকাল সংক্ষেপে লিখা হয়, যা মোটেও উচিৎ নয়।

দরুদ শরীফের প্রতি হুজুরের মহব্বত অত্যন্ত মশহুর। হুজুর তরিকতের প্রতিটি মাহফিলেই দরুদ শরীফের উপর গুরুত্বারোপ করে আমাদেরকে তাগিদ দিয়ে বলতেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি হবে যে আমার প্রতি বেশি পরিমাণে দরূদ পাঠ করেছে।

হাদীসটি ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে ইমাম ইবনে হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় সহীহ ইবনে হিব্বানে (৪৫৯), ইমাম তিরমিযী স্বীয় সুনান গ্রন্থে (৪৮৪), ইমাম বায়হাকি শুআবুল ঈমান কিতাবে (১৫৬৩) বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি অনেক তালাশ করেছি, ঠিক কত সংখ্যক হলে أَكْثَرُ এর উপর আমল হবে। অবশেষে ইমাম সাখাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ এর القول البديع। আমি পেয়েও গেলাম, তিনি লিখেছেন রোজ তিনশত বার পড়ে নিলে أَكْثَرُ এর উপর আমল হবে ইনশাআল্লাহ। যেহেতু أَكْثَرُ শব্দের অর্থ 'বেশি' সেহেতু ন্যূনতম ৩ সংখ্যাই أَكْثَرُ হবে।

হুজুরকে আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি। তিনি যা নসিহত করতেন তার শতভাগই নিজে আমল করতেন। হুজুরের আমলের মধ্যে রিয়ার (লোক দেখানোর) কোন লেশ মাত্র ছিল না। এজন্যে হুজুরকে দেখলেই আলাদা একটি ভাব মানুষের মধ্যে কাজ করতো। আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ হতো। আর এটাই তো আউলিয়ায়ে কেরামের আলামত।

আমি হুজুরকে যত দেখেছি শুধুই অবাক হয়েছি। এত উঁচু মাপের একজন আলেম অথচ ইলমের কোন বড়াই নেই। হুজুরকে যারাই দেখেছেন, সহবত নিয়েছেন তারা সবাই এ বিষয়ে একমত হবেন অবশ্যই, হুজুরের মধ্যে কোন অহংকার-অহমিকা ছিল না। তাঁর ইলমই তাঁকে বিনয়ী করেছিল।

২০১৪ সনের প্রথম দিকে আমি তখন রসুলগঞ্জ বাজার জামে মসজিদে নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত ইমাম ও খতিব। হুজুর রসুলগঞ্জে সফরে গেছেন। জুমআর দিন একটু আগেই বয়ান শুরু করেছি। উদ্দেশ্য হুজুর তাশরিফ আনলেই শেষ করে দেবো। কিছু সময়ের ভেতরেই হুজুর তাশরীফ আনলেন। আমরা সবাই ইস্তেকবাল জানালাম। আমি সহ মুসল্লীয়ানে কেরামের চাহিদা ছিল হুজুর বয়ান রাখবেন। কিন্তু হুজুর আমাকে বয়ান চালিয়ে যেতে বললেন। আমার তো তখন পালস বেড়ে গেছে! কেমনে কি, হুজুরের সামনে বয়ান দেবার যোগ্যতা কই আমার! কিন্তু নির্দেশ মানার আদবই এখানে রক্ষা করা উচিৎ তাই দাঁড়িয়ে গেলাম।

হুজুর মেহরাবের সামনে মুসল্লীদের দিকে মুখ করে একটি চেয়ারে বসলেন। আমি উনার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুরু করলাম। বয়ান ছিল 'ইসমতে আম্বিয়া' তথা নবীগণ নিষ্পাপ বিষয়ে। ১টা ১০ মিনিট পর্যন্ত ৫৫ মিনিটের বক্তব্য। হুজুরের সামনেই প্রায় ৪০ মিনিট কথা বললাম। হুজুর আবেগ ঘন মোনাজাত করলেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এরপর থেকে যত মানুষই আমার সামনে থাকুক বয়ানে আর ভয় পাই না, আমার সকল ভয় একদিনেই দূর হয়ে যায়।

আমার আদত হলো, ইক্বামত শুরু হলে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা হয়েছে কি না দেখে নেয়া। আর ইক্বামতের পর কাতার সোজা করা এবং মোবাইল বন্ধ করার ঘোষণা দিয়ে নামায শুরু করা। এ নিয়ে অনেকেই বিরক্তি প্রকাশ করেন!

আমি হুজুরকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, আমার এই পদ্ধতি সঠিক কি না। হুজুর জবাব

দিলেন, আমার তো মনে হচ্ছে, এরকমই সুন্নত। আমি হুজুরের কাছে অনুমতি চাইলাম, হুজুর আমি এই বিষয়ে একটি রিসালা লিখতে চাই। হুজুর যদি দোয়া খায়ের করেন আর অভিমত লিখে দেন তাহলে আমি এটি ছাপানোর ব্যবস্থা করবো। তিনি বললেন, আপনি লিখুন। আমি দস্তখত দেব ইনশাআল্লাহ।

বই লিখে জগন্নাথপুর থেকে আমি রারাই গ্রামে হুজুরের বাড়িতে উপস্থিত হই। হুজুর কি লিখেছি পড়ে শুনাতে বললেন। আমি পড়ে শুনালাম, হুজুর খুব খুশি হলেন এবং দস্তখত দেবার সময় জিজ্ঞেস করলেন, দস্তখত বাংলায় দেব নাকি আরবিতে? আমি আরবি পছন্দ করলে তিনি আরবিতে দস্তখত করলেন।

এরকম অসংখ্য বিষয়ে হুজুরের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। এমন কোন একটি বিষয় নেই যে বিষয়ে হুজুর জগতের তালে ফতওয়া দিয়েছেন। যেটা হক তিনি সেটিই বলতেন। এতে কে বেজার হলেন আর কে খুশি হলেন সেটা হুজুর চিন্তাও করতেন না।

একদিন আমাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরি নাকি মাটির তৈরি এ বিষয়ে বয়ান দিতে দেখে ডেকে নিয়ে বললেন, মাওলানা সাব! এসব কথাবার্তা আম মানুষের সামনে আলোচনা না করাই মোনাসিব হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূর এখানেই বক্তব্য শেষ। এ বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বয়ান দেয়ার জরূরত নেই। আরোও অনেক অনেক বিষয় রয়ে গেছে যেগুলো মানুষের জন্যে জানা জরুরী, সেগুলো আলোচনা করবেন। এরপর থেকে আমি এ নিয়ে আর আলোচনা করিনি।

মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে হুজুর উপায় বলে দিতেন। দোয়া-দরুদের পাশাপাশি তিনি তেল, পানি, কালোজিরা ইত্যাদি পড়ে দিতেন। এমনকি তিনি তাবিজও লিখে দিতেন। আমার বড় মেয়ে ঘুমে ভয় পেতো, ঘুম থেকে কেঁদে উঠতো। আমি হুজুরকে বিষয়টি জানালে তিনি একটি তাবিজ লিখে দিলেন। আমি অবাক হয়েছি, তাবিজটি গলায় পরিয়ে দেয়ার পর সাথে সাথেই মেয়ে আমার শান্ত হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত আর কোন দিন ভয় পায়নি, আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর আমাদের ভরসার জায়গা ছিলেন। সুযোগ হলেই তিনি ইলমি আলোচনা করতেন। কঠিন বিষয় গুলো হুজুরের দিক নির্দেশনায় সহজ হয়ে যেতো। কিন্তু আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। মহান আল্লাহ পাকের নিকট কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন হুজুরের দরজা বুলন্দ করে দেন। আমাদেরকে যেন তাঁর ফয়েজ দান করেন। হুজুরের আওলাদগণের জীবন উজালা করে দেন। আমিন!

লেখক: সাবেক ইমাম ও খতীব রসুলগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্থতার প্রতীক আমাদের গরীবখানায় প্রথম দেখা হয় হুজুরের সাথে

অলিউল্লাহ নোমান

শুরুতে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি হেলাল ভাইয়ের কাছে। কারণ, তাঁকে ওয়াদা করেছিলাম হুজুরকে নিয়ে কয়েক প্যারা লিখবো। হুজুরকে নিয়ে স্মারক বের হচ্ছে শুনে খুশি হয়েছিলাম এবং লেখার লোভও সামাল দিতে পারছিলাম না। এরকম একজন বরেণ্য আলেমে দ্বীনকে নিয়ে দুই কলম লেখার সুযোগ পাওয়াটাও সৌভাগ্যের বিষয়। তবে দেরি হয়ে গেছে নানা ব্যস্ততার কারণে।

উস্তাযুল উলামা ও শায়খুল হাদীস বা হাদীস বিশারদ আল্লামা মো. হবিবুর রহমানকে প্রথম দেখেছিলাম ছোট বেলায়। আমার আব্বা ইটাখোলা সিনিয়র মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন। এছাড়া সিলেট বিভাগ হওয়ার আগে বৃহত্তর জেলা জমিয়তুল মোদাররেসিনের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছেন অনেক বছর। সেই সুবাদে সিলেটের বড় বড় আলেমের পদধুলি আমাদের বাড়িতে পড়েছে। এর মধ্যে অন্যতম একজন হলেন আল্লামা মো. হবিবুর রহমান।

ইটাখোলা সিনিয়র মাদ্‌রাসার মাহফিল ছিল বড় উলামায়ে কেরামদের একটি মিলন কেন্দ্র। যতটুকু মনে পড়ে প্রথম আল্লামা মো. হবিবুর রহমান হুজুর এসেছিলেন মাদ্‌রাসার মাহফিলে। ঐ মাহফিলে আল্লামা সাহেব কিবলাহ ফুলতলীও এসেছিলেন। মাহফিলে আরো অনেক উলামায়ে কেরাম ছিলেন। তাঁদের রাতে বিভিন্ন জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরমধ্যে সাহেব কিবলাহ এবং আল্লামা মো. হবিবুর রহমান হুজুর ছিলেন আমাদের গরীবখানায়।

মাহফিলের রাতে শেষ দিকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের বাংলা ঘরটিতে (মেহমান খানা) উপরে ছিল ছনের ছাউনি। বৃষ্টির ফোটা বিভিন্ন জায়গা দিয়ে ঘরের মধ্যেও প্রবেশ করছিল। দু/এক ফোটা বিছানার উপরেও পড়তেছিল। এনিয়ে আমরা অনেক বিব্রত এবং লজ্জিত হয়েছিলাম। কিন্তু তাঁদের কাউকে সামান্য বিব্রত হতে দেখিনি। আমি দেখলাম সেই রাতে হুজুর ঘুমাননি। ঘণ্টাখানেকের মত বিছানায় ছিলেন। বলা চলে সারা রাত জায়নামাজে দেখেছি হুজুরকে। যেহেতু আমাদের গরীবখানায় বড় দুইজন আলেম রাত্রিযাপন করছেন। তাই বাড়ির বড় ছেলে হিসাবে দেখাশোনা করার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। ফজরের নামাযের পর সকাল বেলা হুজুর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক দোয়া করলেন। এভাবে অনেক আলেমে দ্বীনের সামান্য খেদমত এবং আন্তরিক দোয়া পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

আল্লাহ'র রাহমাতে সেই বছরই আমাদের ছনের ঘর টিনের ছাউনি দেওয়া হয়। আমার আম্মা সব সময় বলতেন আলেমদের দোয়া আল্লাহ কুবল করেছেন। রাতে ঘরের মধ্যে বৃষ্টির ফোটা ঢুকায় আলেমরা দোয়া করেছিলেন বলেই আমার বাড়ির সব ঘরে দ্রুত টিন লাগানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আল্লাহ।

এটা তো গেল হুজুরের সাথে পরিচয় পর্ব। আমার বেসিক শিক্ষা মাদ্‌রাসায়। মাদ্‌রাসায় যতই উপরের শ্রেণিতে উঠেছি, ততই আলেমদের সম্পর্কে জানার এবং বোঝার সৌভাগ্য হয়েছে। হুজুর এরপরও অনেকবার আমাদের এখানে এসেছেন। হাদীস শাস্ত্রে কামিল ডিগ্রী লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তাই হাদীস বয়ান কেউ করলে সেটা কিঞ্চিৎ হলেও বোঝার তৌফিক আল্লাহ দিয়েছেন। তিনি আমার সরাসরি শিক্ষক ছিলেন না। তারপরও হুজুরের অনেক বয়ান শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। ফুলতলীতে দারুল কেরাত পড়ার সময়ও হুজুরের বয়ান একদিন শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। কামিল হাদীস শাস্ত্রের ক্লাস করে মুহাদ্দিস হুজুরদের নিকট থেকে যতটুকু শিখেছি, তার চেয়ে কম শিখিনি আল্লামা মো. হবিবুর রহমান হুজুরের খণ্ড সময়ের বয়ান থেকে। এত প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি হাদীসের আলোকে বয়ান করতেন, যা আমার কাছে এখনো অদ্বিতীয় মনে হয়। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে মনে হত কামিলের হাদীস ক্লাসটা যদি আল্লামা মো. হবিবুর রহমান হুজুরের কাছে করতে পারতাম তাহলে হয়ত আরো অনেক কিছু জানতে এবং বুঝতে পারতাম। হাদীসের মূল আরবী ভাষাকে বাংলায় এত সুন্দর ভাবে বোঝাতেন, মনে হত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে শুনে তিনি বলছেন। অনেকেই হাদীস, তাফসির ও ফিকায় অনেক জ্ঞান রাখেন। কিন্তু বাংলায় বলার ক্ষেত্রে বা বোঝানোর ক্ষেত্রে এতটা সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বলতে পারেন না। কিন্তু আল্লামা মো. হবিবুর রহমান হুজুরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পাশাপাশি প্রাঞ্জল ভাষায় বলার অসাধারণ শক্তি ছিল। সিলেট বিভাগ জুড়ে এরকম আরেকজন হাদীস বিশারদ কবে জন্ম নেবে বা আদৌ জন্ম নেবে কি না সেটা বলা মুশকিল।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান হুজুরের আরবী ভাষা জ্ঞান ও আরবী সাহিত্যেও দখল ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। মাধ্যপ্রাচ্যের আরবী ভাষার দেশ আরব আমিরাতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তাঁর এই দায়িত্ব পালন বাংলাদেশের আলেমদেরই শুধু নয়, গোটা দেশের মানুষের জন্য তিনি সৌভাগ্য বলা চলে। আমি ঢাকা আলীয়া মাদ্‌রাসায় কামিল আরবী সাহিত্যে পড়েছি। ঢাকা আলীয়া মাদ্‌রাসায় সাধারণতঃ দেশের সেরা শিক্ষকরাই নিয়োগ পেয়ে থাকেন। তবে এটা নির্দ্বিধায় বলতে পারি আল্লামা মো. হবিবুর রহমান হুজুরের বয়ানে আরবী সাহিত্যের যে দখল ও পাণ্ডিত্য দেখেছি সেটা ঢাকা আলীয়ার শিক্ষকদের মধ্যে দেখিনি। আমি ঢাকা আলীয়ার আমার শিক্ষকবৃন্দকে ছোট করার জন্য বলছি না। আল্লামা মো. হবিবুর রহমান হুজুরের পাণ্ডিত্যের গভীরতা

বোঝানোর জন্য এই উদাহরণটি টেনেছি।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান হুজুর কোরআন-হাদীসের খেদমতের পাশাপাশি আঞ্জুমানে আল-ইসলাহ'র দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘ সময়। এই সুবাদেও হুজুরকে কাছে থেকে দেখেছি। আমি আনজুমানে তালামীযে ইসলামীয়ার নগন্য একজন কর্মী হিসাবে হুজুরকে দেখেছি কীভাবে দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান হুজুরের শূন্যতা সহজে পূরণ হবে না। যুগে যুগে আল্লামা মো. হবিবুর রহমান এর মত মানুষের আবির্ভাব হয় না দুনিয়ায়। দোয়া করি হুজুরের খেদমত আল্লাহ কবুল করুণ। হুজুরকে জান্নাতের মেহমান বানিয়ে রাখুন। হুজুরের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজগুলো যেন দেশ ও জাতির খেদমতে এগিয়ে নেওয়া যায়, সকলে মিলে এই চেষ্টা করাই হচ্ছে এখন আমাদের দায়িত্ব।

দেশের এই সঙ্কটকালে এবং আধিপত্যবাদ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবিলায় উনার মত একজন দৃঢ়চেতা আলেমে দ্বীনের নেতৃত্ব মিস করছে সিলেটবাসী। দেশের সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং হিন্দুত্ববাদের আধিপত্যবাদী কালো থাবা থেকে দেশের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে কোরআন-সুন্নাহ'র আলোকে নেতৃত্বের অভাব রয়েছে দেশে। আল্লাহ হুজুরের মত একজন দৃঢ়চেতা ও কোরআন-হাদীসে পাণ্ডিত্যের আলোকে গড়ে উঠা নেতৃত্ব আমাদের দান করুন।

লেখক: যুক্তরাজ্যে নির্বাসিত সাংবাদিক, কামিল হাদীস ও আরবী সাহিত্য, এম এস এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)।

মুসালসাল হাদীস শরীফের শেষ দারস আল হাবীব জামে মসজিদে কান্নার রোল

মাওলানা মোঃ ফদ্বলুর রহমান

আল উলামাউ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া। উলামাগণ নবীগণের ওয়ারিস। দুনিয়ার পথ হারা মানুষকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী রাসূলগণ পাঠিয়েছেন। কিন্তু যখন নবী রাসূলের আগমন বন্ধ, তখনকার পথহারা মানুষকে নবী রাসূলের ওয়ারিসগণ পথ দেখিয়েছেন এবং তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মকে পথ দেখাতে যোগ্য ওয়ারিস তৈরি করে গেছেন।

বাংলাদেশে কোন নবীর আগমন ঘটেছে বলে ইতিহাসে উল্লেখ নেই। তবে বাংলাদেশে এতো ধার্মিক মানুষ তৈরি হলো কীভাবে, কারা এ সকল মানুষের পেছনে শ্রম দিলো? উত্তরে বলা যায়, নবীগণের ওয়ারিস আলিম উলামাগণই এ সকল আল্লাহ প্রেমিক, রাসূল প্রেমিক মানুষ তৈরির মূল কারিগর।

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জানা শোনা যে সকল মুহাদ্দিসীনে কিরাম ইলমে হাদীসের খিদমত করে পরপারে চলে গেছেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত হাদীসবেত্তা, মুফাসসিরে কুরআন, উস্তাযুল উলামা শায়খুল মাশায়েখ হযরত আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহু অন্যতম। আমাদের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে তিনি মুহাদ্দিস ছাহেব নামে সর্ব মহলে পরিচিত এবং সমাদৃত।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব সম্পর্কে কিছু লিখবো ভেবে প্রায় দু'বছর চলে গেলো। এতো বিশাল কর্মবহুল জীবন। মহান এই মনীষী সম্পর্কে কিছু লিখতে কলম ধরা দুঃসাহস বৈ কী হতে পারে। যেহেতু মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহকে নিয়ে স্মারক প্রকাশ হচ্ছে। হুজুরের সাথে হাজারো স্মৃতি, হুজুরের খিদমতে হাজারো উপস্থিতি, হুজুরের দারসে কতো অংশগ্রহণ, জন্মের পর থেকেই হুজুরের খ্যাতি শুনে শুনে বড় হওয়া। যেনো কিছু না লিখলে আক্ষেপ থেকেই যাবে।

মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে আমার মাতা পিতার মুখ থেকেই প্রথমে মুহাদ্দিস ছাহেবের নাম যশ খ্যাতি শুনে শুনে বড় হয়েছি।

১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ সালে জকিগন্জ ফাজিল সিনিয়র মাদ্‌রাসা থেকে ফাজিল পাশ করার পর কামিল জামাতে বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল (এমএ) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হবো, না ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হবো, চিন্তায় পড়ে যাই। কারণ একদিকে

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ অন্য দিকে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ। উভয়ের কাছে হাদীসে নববী পড়ার অশেষ আকর্ষণ ছিল। শেষ পর্যন্ত বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল (এমএ) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে কামিল (হাদীস) সমাপ্ত করি। কিন্তু মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহর কাছে দারস গ্রহণ না করতে পারার আক্ষেপ থেকেই যায়। আল হামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অশেষ দয়ায় উলামা মাশায়েখগণের অনুরোধে হুজুর পরবর্তীতে দুই দফায় প্রথমে প্রতি শনিবার নিজ বাড়িতে এবং পরে প্রতি মঙ্গলবারে আল হাবীব জামে মসজিদে সাপ্তাহিক দারস শুরু করেন। এই দুই বারের দারস দীর্ঘদিন চলতে থাকে। সপ্তাহের এই দুইবারে মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহ কোথাও কোন প্রোগ্রাম রাখতেন না। একান্ত কোন প্রোগ্রামে যেতে হলে আগেই জানিয়ে দেয়া হতো ঐ তারিখের দারস পরবর্তী কখন বা কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। দুইবারের প্রথম দারস চলাকালিন সময়ে জকিগন্‌জ ফাজিল সিনিয়র মাদ্‌রাসার সুনামধন্য অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম ছাহেবের তত্বাবধানে আমরা কয়েক জোড়া ডেক্স বানিয়ে ছিলাম। পরে সেগুলো থানাবাজার হাবিবিয়া হিফজুল কুরআন মাদ্‌রাসায় প্রদান করা হয়। আমাদের কাঙ্খিত বাসনা পুরণ হলো। প্রায় নিয়মিত চলমান সেই উভয় দারসে অংশগ্রহণ করে হুজুরের কাছ থেকে সনদ লাভ করি। উভয় দারসে জকিগন্‌জের প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়াও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আলিম উলামা, আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গানে দ্বীন, মাদ্‌রাসার সুপার প্রিন্সিপাল, মসজিদের ইমাম ও খতীবসহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকতেন। তাছাড়া নিজ এলাকা জকিগন্‌জের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষজন উপস্থিত থাকতেন।

হাদীস শরীফের নির্দিষ্ট কিতাবের দারস ছাড়াও দুইবারেই হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহ নিজ বাড়িতে মুসালসাল হাদীসের দারস দিয়ে সনদ প্রদান করেন। মুসালসাল হাদীসের উভয় দারসে অংশগ্রহণ করে সনদ লাভ করার গৌরব অর্জন করি। শেষ বারে ২০১৪ সালে মুসালসাল হাদীসের সনদ প্রদান করা হয়।

আলোচ্য নিবন্ধের শিরোনামের আলোকে কিছু স্মৃতিচারণ করতে চাই। আগে থেকেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লার মুসালসাল হাদীস শরীফের দারস দেবেন। দিনটি ছিল শনিবার ২০২১ সালের ১৭ নভেম্বর। সকাল থেকেই আলিম উলামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাহুল্লাহ এর বাড়িতে জড়ো হতে থাকেন। মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিন, মাদ্‌রাসার শিক্ষক, মুহাদ্দিস, প্রিন্সিপাল প্রভাষক, সুপারসহ বিভিন্ন দায়িত্বশীল আল্লাহ ওয়ালা মানুষের ঢল নামতে শুরু করে ঐ দিন। আল হাবীব জামে মসজিদের ভেতরে সকাল নয়টায় শুরু হয় খতমে বুখারি শরীফ। মসজিদের বারান্দার একপাশে খতমে কুরআন শরীফ, অন্য পাশে খতমে দালাইলুল খাইরাত শরীফ। সময় যতো বাড়তে থাকে লোকের সমাগম ততো বাড়তে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের

সমাগমে লোকারণ্য হয়ে উঠে মুহাদ্দিস ছাহেববের বাড়ি ও মসজিদ কমপ্লেক্স এলাকা। এক দিকে খতমে বুখারী, খতমে কুরআন শরীফ ও খতমে দালাইলুল খাইরাত শরীফসহ অন্যান্য খতমের আওয়াজ। অন্য দিকে সকাল সাড়ে এগারোটায় আল হাবীব গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় তলায় শুরু হয় মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর বড় ছাহেবজাদা মাওলানা মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল ছাহেব রচিত *পবিত্র হাদীসের আলোকে কদমবুসি* শীর্ষক গ্রন্থ পাঠ অনুষ্ঠান। সবকিছু মিলিয়ে ভিন্ন এক আবহ বিরাজ করছিল। এ এক ব্যতিক্রমী আয়োজন। বাড়ির ভেতর বাহির, মেহমানখানা, বাংলোয় বহুসংখ্যক মানুষের আনাগোনা। মসজিদের ভেতর বাহির, লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ের উপর নিচতলাসহ আশপাশের সকল এলাকা এক বর্ণিল আয়োজনে সাজসাজ রবে যেনো মানুষগুলো তাদের আত্মার আত্মীয়কে খুঁজছিল পরম মমতায়। সকলের মনে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল। কিসের ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছিল সকলের হৃদয়ে। আজ আমরা পেতে চাই। নিতে চাই। সেই সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্ব থেকে চলে আসা প্রিয় নবীর বাণী 'আনা উহিব্বুকা' আমি তোমাকে মহব্বত করি।

বলে রাখা প্রয়োজন ১৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখটি ছিল বড়পীর মহি উদ্দিন হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকাল দিবস। এ দিনে হযরত বড়পীর মুহি উদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে জকিগন্জের হাজারিচক গ্রামের জনাব মোঃ আবদুল মুকিত সাহেবের পক্ষ থেকে খতমে বুখারী শরীফ, খতমে কুরআন শরীফ, খতমে দালাইলুল খাইরাত শরীফসহ অন্যান্য খতমের আয়োজন করা হয়েছিল।

সালাতুয যুহর সমাপ্ত। সকল খতমের তেলাওয়াতের আওয়াজ, মাইক, সাউন্ড বক্স, দুআ দরূদসহ সকল আওয়াজ বন্ধ। নিস্তব্ধ নিরব মসজিদের ভেতর বাহিরসহ আশপাশের এলাকা। শতাব্দীর মহীরুহ হাদীস শরীফের অনন্য খাদিম, প্রায় আধ একশতাব্দীকাল যিনি কা-লা কা-লা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে কাটিয়েছেন। অসংখ্য অগনিত মুহাদ্দিস, মুফতি, মুফাসসির ও ফকিহ তৈরির কারিগর সেই কিংবদন্তি শায়খুল হাদীস আল্লামা মোঃ হবিবুর রহমান রাহমাহুল্লাহকে প্রথমে হুইল চেয়ারে করে, পরে দু'জনের কাঁধে ভর করে মসজিদে নিয়ে আসলেন। তিনি মসজিদের মিম্বরে তশরীফ রাখলেন। নূরানি চেহারায় উদ্ভাসিত হচ্ছিল এক আলোকোজ্জ্বল বেহেশতি আভা। যার চেহারা দেখলেই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের কথা স্মরণ হয়। মিম্বরে তশরিফ রেখেই অশ্রুসিক্ত নয়নে সকলকে উদ্দেশ্য বললেন السلام عليكم, আজ আমার জানামতে পবিত্র ফাতেহা ইয়াজ দহম উপলক্ষে এখানে বুখারী শরীফের খতম, কুরআন শরীফের খতম ও দালাইলুল খাইরা শরীফের খতম হয়েছে। আর এগুলোর আয়োজন করেছেন আমার এক ভাই হাজারিচক গ্রামের আবদুল মুকিত। আশা করি

খতম শেষ হয়ে গেছে। আপনারা কেউ খতমের দুআ করবেন। সাথে সাথে কিছু মেহমান হযরাত ঢাকা থেকে এসেছেন মুসালসাল হাদীস পড়ার জন্য। বিস্তারিত ভাবে সনদ সহকারে মুসালসাল হাদীস পড়ার তৌফিক আমার নেই। আশা করি আমার সিলেটী কথাগুলো আপনারা বুঝতে পারবেন। মুসালসাল ঐ সমস্ত হাদীসকে বলা হয়, যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিশেষ কোন কউল বা কৈফিয়ত জাহির হয়েছে এবং পরবর্তীতে কোন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে জারী রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়াও কোন সাহাবী বা কোন তাবেয়ী অথবা তবে তাবেয়ী কোন আমল করেছেন বা কৈফিয়ত বর্ণনা করেছেন এবং তা জারী রয়েছে। ঐ সমস্ত হাদীসকে মুসালসাল হাদীস বলা হয়। এই মুসালসালাত হাদীসকে বিশেষ বরকতের কারণ মনে করে বহুদূর দূরান্তে গিয়ে হাসিল করার প্রচলন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। যদিও আমাদের দেশে এর তেমন কদর নেই। আমি মুসালসালাতের মধ্যে চারখানা হাদীস শরীফ উস্তাদের কাছে পড়েছি। আর অন্য চারখানা পড়ি নাই। তবে ইজাযাত দিয়েছেন। কেউ আগ্রহ প্রকাশ করলে এই হাদীসসমুহের ইজাযাত ও সনদ দিয়ে থাকি। এ ক্ষেত্রে একটা ভুল বুঝাবুঝি হয়। কেউ কেউ মুসালসাল হাদীসের সনদকে সকল হাদীসের সনদ মনে করে থাকেন। মূলতঃ মুসালসাল হাদীসের ইজাযাত কেবল এই এক বা একাধিক হাদীসের ইজাযাত ও সনদ, কোন ক্রমেই এর বাইরে কোন হাদীস বা কোন হাদীসের কিতাবের ইজাযাত ও সনদ নয়। আমি মুসালসাল হাদীসের যে চারখানা পড়েছি, এর প্রথম হাদীস হলো মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত। হযরত সুফিয়ান ইবন উইয়াইনাহ (১০৭-১৯৮ হি.) রাহিমাহুল্লাহ এর আদত ছিল কেউ হাদীস পড়তে এলে এই হাদীস তিনি প্রথমে পড়াতেন। পরে অন্যান্য হাদীস পড়াতেন। এই হাদীসের তাসালসুল তাঁর কাছ থেকে শুরু হয়েছে। অর্থাৎ, যেহেতু তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে এই প্রথম পড়াতেন তাই তাঁর ছাত্ররাও পরবর্তীদের এই হাদীস প্রথম পড়িয়েছেন। এভাবেই তাসালসুল বা ধারাবাহিকতা শুরু হয়। আমি মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত দেশে হযরত মাওলানা মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট পড়েছি। আর এটি সহ বাকি সব পড়েছি মক্কা শরীফের উস্তাদ সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মাক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট। উভয়ে আমাকে ইজাযাত ও সনদ দিয়েছেন।

আমি মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াতের শুধু মতন পড়বো মাত্র। আমার উস্তাদ সনদ সহকারে পড়িয়ে শুনায়েছেন। আমার সেই তৌফিক নাই যে, আমি সনদ পড়বো।

এর পর তিনি বলেন-

المتصل الي الاءمة المحدثين ، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم - اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله ، وخيرالهدي هدي محمد صلي الله عليه وسلم ، وشرالامور محدثاتها ،وبالسندقال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمان ارحموا من في الارض يرحمكم منمن في السماء

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন- দয়াশীল লোক যারা তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা দয়া করে থাকেন। এর পরে ফরমায়েছেন-

ارحموا من في الارض

তোমরা জমিনবাসির প্রতি দয়ার ব্যবহার করো। ইনসান হোক, মুমিন হোক, কাফির হোক, পশু হোক, গাছপালা হোক সবকিছুর সাথে দয়ার ব্যবহার করো।

يرحم كم من في السماء

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

এই হাদীসের এক নাম হলো হাদীসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত। অন্য নাম হলো হাদীস রাহমাত। যেহেতু ইমাম সুফিয়ান উইয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ থেকে এই হাদীস প্রথম পড়ানোর তাসালসুল চলে এসেছে তাই এর নাম হয়েছে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত। আর যেহেতু আল্লাহর রাহমাত পাওয়ার বিশেষ উপায় বাতানো হয়েছে তাই হাদীসে রাহমাত। এই মুসালসাল হাদীস জানার পর থেকে হাদীস পড়াতে গেলে বুযুর্গানে কিরামের তাসালসুল তথা ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে সর্ব প্রথম এই হাদীস পড়িয়ে থাকি।

দ্বিদীয় হাদীস, হাদীসে মুসালসাল বিল মুহাব্বাত। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু হতে রেওয়ায়ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন-

يامعاذ اني احبك -وفي رواية اخري والله يامعاذ اني احبك لا تدعن بعد كل صلواة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু আনহুকে বলেছেন, হে মুয়াজ! আমি তোমাকে মুহাব্বাত করি, অন্য বর্ণনায়- আল্লাহর কসম আমি তোমাকে মুহাব্বাত করি। (তাই তোমাকে দুআ শেখাচ্ছি) কোন নামাযের পর এই দুআ থেকে বিরত থাকবেনা।

اللهم اعني علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

এই হাদীসের তাসালসুল হলো যখনই হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু এ

হাদীস বর্ণনা করতেন শ্রুতাকে বলতেন اني احبك বা নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মুহাব্বাত করি। এই ধারাবাহিকতায় মুহাদ্দিসীনে কিরামও এ বর্ণনার সময় اني احبك বলে এসেছেন।

মুহাদ্দিসীন হযরতে তাসালসুল রক্ষার জন্য আমাকেও বলতে হচ্ছে। যদিও আমি না আহাল, নাকিস, বদআমল। আমার মুহাব্বাতে আপনাদের কোন ফায়দা হবে না। যারা এই হাদীস পড়তেছেন আমিও আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাদেরকে মুহাবাত করি। আল্লাহর ওয়াস্তে মুহাব্বাত করি। হাদীসটির সনদ পড়ার এখন আমার সময় নেই।

তৃতীয় হাদীস হলো মুসালসাল বিল আসওয়াদাইন। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু ফরমায়েছেন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে দাওয়াত করে আসওয়াদাইন খাইয়েছেন। ভাষার সংক্ষিপ্ত করণে একত্রে পানি এবং খেজুরকে আসওয়াদাইন বলা হয়। অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একত্রে পানি ও খেজুর খাওয়ালেন।

চতুর্থ হাদীস হলো মুসালসাল বিল মুসাফাহা। হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বহুবার মুসাফাহা করেছেন। কারণ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে থাকতেন। হাদীস শরীফে আছে তিনি দশ বছর যাবৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরায় অবস্থান করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মোবারকে সবসময়ই খুশবু থাকতো। যেকোন আতরের চাইতে বেহতর খুশবু থাকতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মোবারকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদন মোবারকে এমন খুশবু থাকতো যে, তিনি যখন কোন রাস্তা দিয়ে তাশরিফ নিতেন কিছু সময় পরে মানুষ ঐ রাস্তা দিয়ে গেলে বুঝে নিতে পারতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পথেই গিয়েছেন।

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে যে কেউ আসলে তাঁকে বলতেন, আপনার হাতখানা দিন আমি মুসাফাহা করবো, যে হাত দিয়ে আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুসাফাহা করেছেন। এই হলো মুসাফাহা করার সিলসিলা।

শারীরিক মাজুরির কারণে আমি এই জমায়েতে আপনাদের সবার সাথে মুসাফাহা করতে পারবো না। আমি অতি অল্প সময়ের জন্য বসেছি। খেজুর এবং পানি দিয়ে এই হাদীস যারা পড়েছেন তাদের মেহমানদারী করা দরকার। এইটাও আমার জন্য সম্ভব নয়।

ততক্ষণে মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির বড় ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল ছাহেব মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে জানালেন খেজুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দারস শেষে মেহমানগণ যখন খাবার টেবিলে বসবেন তখন সকল মেহমানকে খেজুর দেয়া হবে।

এ পর্যায়ে তিনি বললেন, খতমে বুখারী শরীফের দুআ আপনারা কেউ করেন। আমার হাদীস পড়া হয়তো আজ শেষ। আপনাদের কাছে আমি দুআ চাইছি। বড় কষ্ট করে তারা আমাকে এখানে উঠিয়ে এনেছেন। এখন চলে যাব। তিনি আবার বললেন, বুখারী শরীফ খতমের দুআ আপনারা কেউ করেন, আমি পারব না। আসমায়ে বদরীন পড়ে নিন। তিনি বলেন, সিংগাইরকুড়ির হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান চৌধুরী ছাহেব কী এখানে আছেন। তিনি দুআ করবেন। আজকের খতমে বুখারী, খতমে কুরআন শরীফ ও খতমে দালাইলুল খাইরাত শরীফ হযরত বড়পীর ছাহেবের ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। তিনি বার বার সিংগাইরকুড়ির হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান চৌধুরী ছাহেবকে দুআ করার অনুরোধ করেন। পরে সকলের বিনীত অনুরোধে তিনি দুআ করেন।

শেষ পর্যায়ে হুজুর বললেন, আজ আমার জীবনের শেষ দারস। আমি আর দারসের সুযোগ পাবো না। হুজুরের এ কথা শোনার সাথে সাথেই মসজিদের ভেতর বাহির বারান্দা সকল স্থান থেকে ক্রন্দনের সুর ভেসে আসে। হুজুরের দুআ'র সেদিনকার দৃশ্য বর্ণনা করার কোন ভাষা নেই। বিভিন্ন খতম শরীফ, হুজুরের শেষ মুসালসাল হাদীসের দারস, মীলাদ শরীফ, ফাতেহা ইয়াজদহম উপলক্ষে ঈসালে সাওয়াব মাহফিল, শিরনীর ব্যাপক আয়োজন ও গ্রন্থপাঠ অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজন। ঢাকা দারুননাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্‌রাসার বেশ কয়েকজন মুহাদ্দিস ছাহবেবান এবং বহুসংখ্যক ছাত্র এবং সিলেট মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জসহ সিলেট বিভাগের দুর দুর অঞ্চল থেকে আশিকানে মোস্তফা, আলিম বুজুর্গ, পীর মাশায়েখ, প্রিন্সিপাল সুপার, ইমাম খতীব, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, চাকুরিজীবী, স্কুল কলেজ মাদ্‌রাসার মুয়াল্লিম, সাংবাদিক, আমজনতাসহ সকল শ্রেণি পেশার যে লোকজন উপস্থিত হয়েছিলেন সকলের চোখ ছিল অশ্রু সজল। কেউ কারো দিকে তাকাবার যেনো সুযোগ নেই। কেউ আস্তে কেউ জোরে, কেউ সরবে কেউ নিরবে, কেউ উপরে তাকিয়ে, কেউ নিচে তাকিয়ে সকলেই মনোবাসনা পেশ করছিলেন জুলজালালের দরবারে। কারো চক্ষু বেয়ে, কারো গন্ডদেশ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সকলেরই মনে সেই একই অনুশোচনা আমরা কী আজ হারাতে যাচ্ছি আমাদের আত্মার শান্তিরস্থল হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবকে। হৃদয় উজাড় করে মানুষগুলোর সেই কান্নার দৃশ্য আজও হৃদয়ে ভেসে উঠে বারবার।

হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর সফর সঙ্গী হিসেবে ২০১৯ ও ২০২০ সালে পবিত্র হারামাইন শরীফাইন যিয়ারতের সুযোগ আমার হয়েছিল। ২০১৯ সালের ৩০ এপ্রিল তারিখে আমরা পবিত্র মক্কা মুকাররামায় পৌছি এবং হুজুরের সাথে প্রথম ওমরাহ আদায় করি। ৯ মে ২০১৯ তারিখে আমরা পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছি। এর একদিন পর ১০ মে বাদ মাগরিব বুখারি শরীফের দারসের ব্যবস্থা করা হলো। আমরা

ছিলাম মালাজ ডায়মন্ড নামক হোটেলে। সেখানেই দারসের ব্যবস্থা করা হলো। দারস শুরুর পূর্বে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ফরমালেন, আমাদের এই দারস মসজিদে নববীতে দেয়া সমিচীন হতো। আমরা আগেও চেষ্টা করেছি। কিন্ত মসজিদে নববীতে সৌদি সরকার অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কারো দারস দেয়ার সুযোগ নেই। তাই আমরা হোটেলেই দারস এর ব্যবস্থা করেছি। এ দারসে আমেরিকা প্রবাসী আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন কুলউড়ার হুজুর মাওলানা মোঃ আব্দুন নুর, জকিগন্জের ভরণসুলতানপুর গ্রামের জনাব মাহতাব আহমদ, সোবহানীঘাট মাদ্রাসার শিক্ষক জনাব মাওলানা জোবায়ের আহমদ, মাওলানা শামসুদ্দিন, হযরত মাওলানা মোঃ লুৎফুর রহমান, হাজি নুর উদ্দিন, হাফিজ মাওলানা শামছ উদ্দিন সাবেলসহ বহু সংখ্যক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। এ সময় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের দারস শেষে মীলাদ শরীফ পড়া শুরু করেন আমেরিকা প্রবাসী জনাব মাহতাব আহমদ। তিনি ওয়ালাম্মা তাম্মা থেকে তাওয়াল্লুদ শরীফ পড়া শুরু করলে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাকে থামিয়ে দিয়ে হাফিজ শামছ উদ্দিন সাবেলকে পবিত্র নসবনামা পড়তে হুকুম করেন। হাফিজ শামছ উদ্দিন সাবেল নসবনামা পড়া শেষ করলে কিয়ামে দাঁড়িয়ে شعر মুহাদ্দিস ছাহেব নিজেই পড়তে শুরু করেন اشرق البدر علينا এই شعر এর চার শ্লোকের মধ্যে তিন শ্লোক পড়ার পূর্বেই মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের চোখের পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। তিন শ্লোক পড়েই হুজুর আর এগুতে পারেননি। কেঁদে কেঁদে বসে পড়েন। হুজুরের নুরানি চেহারা তখন লাল হয়ে গিয়েছিল। মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর বড় ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল ছাহেব এ সফরে থাকার কথা ছিল। কিন্ত তাঁর আহলিয়ার বড় ধরণের একটা অপারেশন থাকায় তিনি লন্ডন থেকে আসতে পারেননি। ১৫ মে ২০১৯ তারিখে হুজুরের সাথে আমরা দেশে ফেরত চলে আসি।

২০২০ সালের উমরা সফর ছিল আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর জীবনের শেষ উমরা সফর। মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ দয়ায় এ বছরও শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর সফর সঙ্গী হিসেবে পবিত্র উমরা পালনের সুযোগ আমার হয়। এ বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে হুজুরের সাথে সিলেট টু জিদ্দা যাওয়ার কথা থাকলেও ফ্লাইট জটিলতায় আমরা কয়েকজন ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখেই মক্কা শরীফ পৌছি। আমরা ইহরাম অবস্থায় একদিন উমরা আদায় না করে হুজুরের সাথে উমরা আদায়ের আশায় অপেক্ষা করি। পরের দিন ২৫ ফেব্রুয়ারি মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর জিদ্দায় পৌঁছেন। হুজুরের বড় ছাহেবজাদা মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল, জকিগন্জের ইলাবাজ গ্রামের জনাব মাওলানা মোঃ মখলিছুর রহমান এবং আমি, আমরা তিনজন হুজুরকে জিদ্দা এয়ারপোর্টে রিসিভ করি এবং মক্কা শরীফে মিসফালাস্থ ইব্রাহিম খলিল রোডের রুবা আল হিজাজ হোটেলে নিয়ে যাই। এ সফরে হুজুরের সাথে কয়েকবার উমরা আদায়ের সুযোগ হয়। মার্চের ৪ তারিখে সৌদি সরকার

করোনা জনিত কারণে সমগ্র পৃথিবী থেকে সকল প্রকার ফ্লাইট বন্ধ করে দিলে আমাদের ভাগ্যের দুয়ার খোলে যায়। মক্কা মুকাররাম এবং মদিনা মুনাওয়ারায় আগত সকল উমরা পালনকারী এবং যিয়ারতকারী চলে যেতে থাকে কিন্ত কেউ আসতে পারছে না। বিধায় খুবই শান্তিতে এবং এক্কেবারে ধিরস্থিরভাবে উমরা আদায় করি। একদিন উমরা আদায় করার পর মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর বললেন, জীবনে বহুবার এসেছি। কিন্ত এমন সুবর্ণ সুযোগ কখনো পাইনি। আমার যতটুকু মনে পড়ে পবিত্র কা'বা শরীফ তাওয়াফের সময় মানুষ এতই ফাঁকা ছিল যে, গায়ে গায়ে লাগা তো দুরের কথা প্রতি পাঁচ সাত হাত দূরে দূরে থেকে হেটে হেটে তাওয়াফ করি। হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করা ছিল খুবই সহজ সাধ্য। মোট কথা সকল মাকামে মুকাদ্দাসা ছিল ফাঁকা। সহজে নিবরে নিস্তব্ধে সকল হুকুম আহকাম সালাত, যিয়ারাহ, তাওয়াফ সায়ীতে কোন কষ্ট হয়নি। বাংলাদেশ ছাড়া লন্ডন আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশ থেকে হুজুরের সাথে উমরা আদায় করতে ৬৫ জনের এই কাফেলায় মুহাক্কিক আলিম ও আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। সফর সঙ্গীদের প্রতি হুজুরের এতোই মুহাব্বাত ছিল যে, আমরা যে হোটেলে অবস্থান করছিলাম সেটি ছিল হরম শরীফ থেকে প্রায় পনের মিনিটের দূরে। সফর সঙ্গী জনাব ইঞ্জিনিয়ার ইউসুফ ছাহেব চেয়ে ছিলেন মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে হরম শরীফের একেবারে পাশের কোন হোটেলে নিজ খরচে নিয়ে যাবেন। কিন্ত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর এবং মাওলানা মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল ছাহেব তাতে রাজি হননি। তাঁদের কথা হলো, এতোগুলো মানুষ হুজুরের সাথে উমরা করতে এসেছেন। কিন্তু সকলকে দূরে রেখে হুজুর কীভাবে হরম শরীফের পাশে যাবেন। হুজুর কোন অবস্থাতে রাজি হননি।

এ সফরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৩৯তম বংশধর হযরত সায়্যিদ আসিম আদি মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছাহেবের মদিনা শরীফস্থ বাসায় হুজুর তাশরীফ নেন। হুজুরের সাথে আমাদেরও যাওয়ার সুযোগ হয়। এ সময় হুজুরের সফর সঙ্গী ছিলেন ফেঞ্চুগঞ্জ মোহাম্মদিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল বর্তমান আমেরিকা প্রবাসী জনাব মাওলানা মোঃ আব্দুন নুর, আমেরিকা প্রবাসী কবি মাওলানা মোঃ মুখলিছুর রহমান, মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল, লন্ডন প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার জনাব ইউসুফ ছাহেব, কবি মহীউদ্দিন হায়দার, কুলাউড়ার জনাব মাওলানা মুদ্দছির আলী, হাফিজ শামছ উদ্দিন সাবেল, হাজি নুর উদ্দিন, জনাব হাজী আছাদ উদ্দিন প্রমূখ। সায়্যিদ ছাহেবের বাসায় ঘন্টা দেড়েক সময় আমরা অবস্থান করি। এই সময়ের মধ্যে সায়্যিদ ছাহেব এবং মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে তা আমরা প্রাণ ভরে শুনছিলাম। দীর্ঘ এই আলোচনা ছিল কেবল মাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুহাব্বাত এবং প্রতিটি কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করা। হযরত সায়্যিদ ছাহেবের হাদীস শরীফ বর্ণনাকালীন সময়ে চোখে পানি চলে আসতো। সায়্যিদ ছাহেব প্রতিটি কথার ফাঁকে ফাঁকে দুরূদ শরীফ পাঠ করছিলেন।

আমরাও সকলে তখন দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিতাম। সায়্যিদ ছাহেব আমাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আপ্যায়ন করিয়ে ছিলেন। সেদিনকার সে দৃশ্য চোখের সামনে আজও ভেসে উঠছে বারবার।

হারামাইন শরীফাইনের সেই সফর শেষে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ৬ মার্চ লন্ডন চলে যান এবং ১০ মার্চ আমরা দেশে চলে আসি।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের নিকট থেকে দালালাইলুল খাইরাত শরীফের ইজাযত নেয়ার কামনা ছিল আমার দীর্ঘ দিনের। সময় সুযোগ ও সাহস করে বলতে অনেক দিন চলে যায়। এমন বহুদিন হুজুরের সাথে সাক্ষাত করেছি শুধু মাত্র হুজুর এবং আমি ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু সাহস করে বলতে পারিনি। আল হামদুলিল্লাহ! ২৪ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে দালাইলুল খাইরাতের পুরাতন কোন প্রকাশনীর কপি নিয়ে রারাই হুজুরের খিদমতে উপস্থিত হই। হুজুর প্রিয় সালমানকে ডেকে বললেন, সালমান তোমার দালাইলুল খাইরাত খানা নিয়ে আস। এই কপি মাওলানা ফদ্বলুকে দিয়ে দাও। তুমি অন্য কপি নিয়ে নেবে। সালমান তার নিজের দালাইলুল খাইরাতের কপি খানা নিয়ে আসলে হুজুর লিখিতভাবে নিয়মিত পড়ার অনুমতি প্রদান করেন। খুশিতে বাগবাগ হয়ে সেদিন বাড়িতে ফিরি।

জকিগন্জ ফাজিল সিনিয়র মাদ্‌রাসার আলিম প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন আলম নগর জামে মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করছিলাম। তখন জকিগন্জ বাজারস্থ আজিজ সুপার মার্কেটের সত্ত্বাধিকারী জনাব মোঃ মুনির হোসেন, বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ নাসিম আহমদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব বিলাল আহমদ, কেছরি গ্রামের জনাব কাওছার আহমদ, বিলেরবন্দ গ্রামের জনাব মোঃ আবদুল মুমিত, হাইদ্রাবন্দ গ্রামের আব্দুল লতিফ লছনু এবং খলাছড়া গ্রামের জনাব এনাম উদ্দিনসহ কিছু উদ্যোগী তরুণের ব্যবস্থাপনায় আলম নগর জামে মসজিদে মাসে দুই দিন হুজুর তাফসীর পেশ করতেন। আমার সুস্পষ্ট মনে পড়ে, একদিন মসজিদে প্রবেশ করতেই মসজিদের বারান্দায় গাছের কিছু শুকনো পাতা দেখতে পেয়ে হুজুর নিজ হাতে সেগুলো উঠিয়ে মসজিদের বাইরে ফেলে দেন। সেদিন থেকে আজও অবধি যখনই কোন মসজিদে যাই কোন শুকনো পাতা, কাগজসহ কোন কিছু দেখা মাত্রই পরিস্কার করে থাকি।

২০০৭ সালে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং হুজুরের বড় ছাহেবজাদা মুহতারাম মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল ছাহেবের তত্বাবধানে বৃটেন প্রবাসী জনাব হাজী আবদুল হান্নান এর অর্থায়নে আমাদের মানিকপুর গ্রামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সৈয়দ আহমদ রাহ, মানিকপুর বায়তুন নাজাত জামে মসজিদ নামীয় এই মসজিদটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর। মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন সকালে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে নিয়ে আসার জন্য হুজুরের

বাড়িতে যাই। হুজুর গাড়িতে উঠেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন মাওলানা ফদ্বলু! তোমার বংশ সম্পর্কে তুমি কী জান? আমি নিরব থেকে হুজুরের নিকট থেকে এ সম্পর্কে জানতে চাইলাম। হুজুর বললেন, তোমাদের বংশ ফকির বংশ। তোমাদের এই গোষ্ঠীকে ফকির টোল বলা হয়। তবে ভিক্ষার ফকির নয়, আল্লাহর রাস্তার ফকির। হুজুর আরো বললেন, তোমাদের বংশের পূর্বপুরুষদের মধ্যে বড় মাপের একজন ওলী ছিলেন। তিনি আল্লাহর খুবই প্রিয় বান্দা ছিলেন। তখনকার সময়ে বিভিন্ন এলাকায় কলেরা জাতীয় বড় বড় বেমার (রোগ) দেখা দিত। তখন তোমাদের বংশের সেই ওলীকে (পরবর্তিতে তাঁর উত্তরসুরীদের) ঐ এলাকায় নেয়া হত। তিনি এবং তারা তোমাদের বংশের পীর ফকিদের উসিলা নিয়ে দুআ করলে সেই এলাকা থেকে ঐ সকল রোগ, বালা-মুছিবত চলে যেতো। হুজুর আরো অনেক তথ্য বলেছেন। নিজের বংশ সম্পর্কে অনেক তথ্য সেদিন হুজুরের নিকট থেকে জানতে পেরেছি। আল্লাহ তায়ালা হুজুরের দরজা বুলন্দ করুন।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের শেষ অসুস্থতার প্রথম দিকে তিনি তাঁর জামাতা হযরত মাওলানা মোঃ এমাদ উদ্দিন সাহেবের সিলেট উপশহরস্থ তেরো রতনের বাসায় অবস্থান করে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। একদিন বাদ সন্ধ্যা হুজুরের ভাতিজা নুরই মিয়া আমাকে ফোনে জিজ্ঞেস করলেন হুজুরের খিদমতে যাব কিনা। ততক্ষনাৎ তাঁদের সাথে হুজুরকে দেখতে সিলেট যাই।

হুজুরের খিদমতে উপস্থিত হয়ে খাটের পাশে ফ্লোরে পা বিছিয়ে বসে তাঁর খিদমতে আমার আহলিয়ার জন্য দালাইলুল খাইরাত শরীফ পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করি। হুজুর তখন বললেন, আমার অন্তিম সময়। তোমার পরিবার পরিজন ছেলে মেয়ে সকলকে দালাইলুল খাইরাত এবং হিযবুল আযম পড়ার অনুমতি দিলাম। সকলে পড়বেন আর আমার জন্য দুআ করবেন।

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বহু দারস, বহু ওয়াজ মাহফিল ও বহু অনুষ্ঠানে অনেক বক্তব্য সরাসরি এবং ফেইসবুক এ ইউটিউবে শুনেছি। এর আলোকে বলতে পারি, বালাগাত ফাসাহাত, অলংকার মিশ্রিত ভাষায় সাজিয়ে গুজিয়ে সুন্দর উপস্থাপনে সুস্পষ্ট বক্তব্য খুবই কম মানুষের মুখে শুনেছি। এ ক্ষেত্রে হুজুরের উপমা হুজুর নিজেই। যতো বড় মাহফিল হোক না কেনো মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বয়ানের সময় পিনপতন নিরবতা বিরাজ করতো গোটা মাহফিল এলাকায়।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বড় ছাহেবজাদা মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল ছাহেব আমার ইয়ারমিট এবং বাল্যবন্ধু হওয়াতে এবং হুজুরের বাড়ি আমার বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায় একদম বাল্যকাল থেকেই হুজুরের সকল ছাহেবজাদার সাথে আমার খুবই সুসম্পর্ক রয়েছে। হুজুরের ইন্তেকালের বছর আমাদের গ্রামের সৈয়দ আহমদ রাহ, মানিকপুর বায়তুন নাজাত জামে মসজিদে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের ঈসালে সাওয়াব

মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হুজুরের ছোট ছাহেবজাদা মাওলানা মোঃ আবদুল বাকী খালেদ ছাহেব হুজুর সম্পর্কে বলেছিলেন, আব্বাকে জীবনে বাড়িতে যখনই দেখেছি তখন হয়তো কিতাব হাতে ছিল, নয়তো তাসবিহ হাতে ছিল। কিতাব এবং তাসবিহ ছাড়া আব্বাকে কখনো দেখি নি। সুবহানাল্লাহ!

হুজুরের বড় ছাহেবজাদা মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল ছাহেব একদিন আমাকে বললেন, ইন্তেকালের পূর্বে একদিন হুজুর বাড়িতে ছেলে ভাতিজাসহ অন্যান্যদের নিয়ে হাটছিলেন এবং বাড়ির বিভিন্ন স্থানে গাছপালার মধ্যখানের ফাঁকা জায়গাগুলো দেখিয়ে সুপারিগাছসহ অন্যান্য গাছের চারা লাগানোর মতামত ব্যক্ত করে বললেন, এ হলো আমার মতামত, আপনারা কেমন মনে করেন। আপন পরিবারের লোকজনের প্রতি নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দিয়ে তুচ্ছ একটি বিষয়েও তাদের মত প্রকাশের সুযোগ দেয়া কতো বড় মানসিকতার পরিচয়। এমন উদার এবং সহনশীল আচরণ কেবল মহামনীষীরাই করতে পারেন।

হুজুরের প্রথম ইন্তেকাল বার্ষিকী উপলক্ষে ঈসালে সাওয়াব মাহফিলের ব্যবস্থাপনার জন্য তাঁর বড় ছাহেবজাদা মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল ছাহেব দেশে আসলে তাঁর সাথে দেখা করতে হুজুরের বাড়িতে যাই। তিনি হুজুরের মাজার শরীফের ড্রয়িংয়ের একজন ইঞ্জিনিয়ারের কথা আমাকে আগেই বলেছিলেন। আমরা তখন ইঞ্জিনিয়ারের আসার অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি কথা প্রসঙ্গে আমাকে জানালেন, মাজার শরীফের দেয়ালের উচ্চতা কতটুকু হবে, কীভাবে হবে, মানুষজন কোথায় দাঁড়িয়ে কীভাবে যিয়ারত করতে সুবিধা হবে সব কিছু হুজুর নিজেই তাঁর কাছে বলে গেছেন।

সুন্নতে নববীর প্রতি হুজুরের ভালোবাসা ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি দুরূদ শরীফ পড়ার জন্য মানুষকে খুবই তাগিদ করতেন। হুজুরকে বারবার বলতে শুনেছি, সোনা অখলরে ছফছফাইয়া খালি দুরূদ শরীফ পড়িও। গাড়িতে হোক বা অন্য কোথাও হোক বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়ার তাগিদ করতেন।

জকিগন্জের গদাধর গ্রামের জনাব মাওলানা মোঃ আবদুল মুকিত ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ সালে ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা থেকে কামিল পাশ করছেন। তিনি বলেন, মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর সুন্নতে নববীর প্রতি এতই আসক্ত ছিলেন যে, একদিন ক্লাসে তিনি لولا ان اشق عن امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلواة- এই হাদীস শরীফ পড়াচ্ছিলেন, এমন সময় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন পকেটে মিসওয়াক আছে কিনা। ইনশাআল্লাহ আছে বললে হুজুর বললেন, দেখাও। আমি মিসওয়াক বের করে দেখিয়ে রেহাই পেয়েছি। মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন দ্বীনের খিদমত করেছেন, সুন্নতে নববী পালনে মানুষকে উৎসাহিত করেছেন।

জকিগন্জ ফাজিল সিনিয়র মাদ্‌রাসার চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি রেদ্বওয়ানুর রহমান কছির

আমাকে এ নিবন্ধ লিখতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন হুজুর কি লিখতেছেন। আমি বললাম, মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর সম্পর্কে লিখতেছি। তিনি একটি দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বললেন, একদিন মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর মাদ্‌রাসায় তাশরীফ এনেছিলেন। আমি দায়িত্বশীল হিসেবে চা পানি দিয়ে খিদমত করছি। ইতোমধ্যে হুজুর শুনতে পেয়েছেন আমার নাম কছির আহমদ। আমাদের মাদ্‌রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল হুজুর হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম হুজুরের সন্মুখে আমার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন রেদ্বওয়ানুর রহমান।

আল্লাহ তায়ালা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের দরজা বুলন্দ করুন এবং লায়েক জাযা দান করুন।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর শুধুমাত্র একজন মুহাদ্দিস ছিলেন না, বরং একজন দক্ষ দাঈ ইলাল্লাহ ছিলেন। তিনি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ ঘুরে ঘুরে ইসলামের দাওয়াত দিয়ছেন মানুষকে। লন্ডন, আমেরিকা, আরব আমিরাত, সৌদি আরব, মিশরসহ বহু সংখ্যক দেশে তিনি ইসলামের দাওয়াত পৌছিয়েছেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। সুদুর আরব আমিরাতে সুদীর্ঘ কাল যাবৎ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করা কোন বাংলাদেশীর জন্য বিরল ঘটনা। যা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। একজন দক্ষ এবং চৌকস সংগঠক হিসেবে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব আনজাম দিতে হয়েছে দীর্ঘ দিন। ইসলাম. মুসলমান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুরআন শরীফ ও দেশের উপর যখনই কোন শকুনের চোখ পড়েছে, যখনই কোন শত্রুর আঘাত এসেছে, সিংহের মতো গর্জে উঠেছেন এই মর্দে মুজাহিদ। রাতে খানকা আর দিনে তলোয়ার, আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির সেই নীতিতে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ভুমিকা দেখিয়েছেন এই শতাব্দীর সেরা ব্যক্তিত্ব।

হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু প্রতিষ্ঠানের খিদমত করে গেছেন জীবনভর। বহু প্রতিষ্ঠান নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। হুজুরের বাড়ির পাশের আল হাবীব জামে মসজিদ, আল হাবীব গ্রন্থাগার, থানাবাজার হাবিবীয়া হিফজুল কুরআন মাদ্‌রাসাসহ বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ সালে বাংলাদেশে কিছু নাস্তিক মুরতাদ রাষ্ট্র ও ধর্মদ্রোহিদের আবির্ভাব ঘটে। এর মধ্যে তাসলিমা নাসরিন, কবির চৌধুরী, এম কে সোবহান, শামসুর রহমান সহ অন্যান্য নাস্তিকরা কুরআ শরীফ, বিশ্বনবী, ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পর্কে নানা বিরূপ মন্তব্য ও কটাক্ষ করতে থাকে। তারা বলতে শুরু করে কুরআন শরীফ বিশ্বনবী হেরা গুহায় বসে নিজে বানিয়ে নিয়ে এসে আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করেছেন। দেশে একের পর এক মসজিদ গজিয়ে উঠেছে। মসজিদের সিঁড়িতে চোর ও টাউট বাটপারদের সাক্ষাৎ

মেলে। পনের মিনিট আজানের ধ্বনি বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। চৌদ্দশত বছরের পুরনো কুরআন এখন আর উপযোগি নয়। কুরআনের আমুল পরিবর্তন আনতে হবে। এভাবে নানা মন্তব্য করে মুসমানদের কলিজায় আঘাত করে বসে। শুরু হয় নাস্তিক মুরতাদ বিরোধী আন্দোলন। সিলেটের সকল ঘরানার উলামা মাশায়েখদের নিয়ে গঠিত হয় ইসলামী ঐক্য পরিষদ। ইসলামী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে বিভিন্ন আন্দোলনে সিলেটের জমিন থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। এ সকল সংগ্রাম ও আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আল্লামা মোঃ হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ, শায়খুল হাদীস আল্লামা নুল উদ্দিন গহরপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, শায়খুল হাদীস আল্লামা মোঃ আবদুল করিম শায়খে কৌড়িয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি, অধ্যক্ষ মাওলানা ইসহাক আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ হবিবুর রহমান কাজির বাজারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ। নাস্তিক মুরতাদ বিরোধী আন্দোলনে এই সকল মর্দে মোজাহিদরা ১৯৯৪ সালের ৩০ জুন যে হরতাল করেছেন তা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল। সকলেই পরকালে চলে গেছেন। আল্লাহ সকলকে জান্নাতুল ফেরদৌসের আলা মাকাম দান করুন।

দলমত নির্বিশেষে সকল ঘরানার মানুষের কাছে আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র এবং সমাদৃত ব্যক্তিত্ব। কওমি ঘরানার লোকেরাও মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে ভালবাসতেন। কওমী ঘরানার অনেক আলেম মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বিভিন্ন মাহফিলে বয়ান শুনতে চেষ্টা করতেন। হযরত আল্লামা আবদুল গাফফার রায়পুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতিষ্ঠিত লামারগ্রাম দারুস সুন্নাহ মাদ্‌রাসার মাদ্‌রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে তাঁকে দাওয়াত করা হতো। একবার (সন মনে নেই) লামারগ্রাম মাদ্‌রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে হুজুরের বয়ান আমি নিজেই শুনেছি। এছাড়া জকিগন্‌জের ভরণ সুলতানপুর হাফিজিয়া মাদ্‌রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে হুজুরের বয়ান কয়েকবার শুনেছি।

হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ শুধুমাত্র একজন ওয়াইজ দাঈ ইলাল্লাহ মুহাদ্দিস মুফাসসির সালিস প্রিন্সিপাল এবং দ্বীনের খাদিম ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠকও। তিনি আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ এর একজন সফল সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে বই প্রতিক নিয়ে নেজামে ইসলাম পার্টি থেকে সংসদীয় এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ সালে তিনি সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ মনোনীত ও আনজুমানে আল ইসলাহ সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে সিলেট -৫ (জকিগঞ্জ -কানাইঘাট) আসনে টেবিল ঘড়ি প্রতিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ ছাড়া ইসলাম মুসলমান ও রাষ্ট্রের ওপর যখন কোন

শকুনের কুদৃষ্টি পড়েছে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর সিংহের মতো গর্জন করে এর প্রতিবাদ করেছেন, নিয়েছেন যথাযথ পদক্ষেপ।

নব্বইয়ের দশকের শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জকিগঞ্জের কসকনকপুর, মানিকপুর ও বারঠাকুরি ইউনিয়নের কিছু এলাকাকে টার্গেট করে খ্রিস্টান মিশনারীদের কিছু তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।তারা সেবার নামে গরিব অসহায় ও আর্থপীড়িত অসহায় মানুষকে সাহায্যের নামে তাদের কর্মতৎপরতা শুরু করে। তারা জকিগঞ্জের সোনাসার এলাকার জনৈক মুরব্বীকে টার্গেট করে উনার মাধ্যমে তাদের কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। তারা এলাকার গরিব ও অসহায় মানুষকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে এবং তাদের উক্ত সেবা সংস্থার সদস্য বানিয়ে ফেলে। কসকনকপুর এলাকার খোজার মহল্লার জনৈক বিদেশ ফেরত ব্যক্তিকে উক্ত সংস্থায় যথেষ্ট সময় ব্যয় করে এবং সদস্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে দেখা যায়। সুলতানপুর ইউনিয়নের নোয়াগ্রাম এলাকার জনৈক ব্যক্তিকেও উক্ত সংস্থার সাথে যথেষ্ট সময় দিতে দেখা যায়। মোট কথা তারা কসকনকপুর ইউনিয়ন, বারঠাকুরী ইউনিয়ন মানিকপুর ইউনুয়ন ও সুলতানপুর ইউনিয়নের কিছু কিছু এলাকায় তাদের সদস্য সংগ্রহ ও সহায়তা কার্যক্রম বিস্তৃত করেছিল। তখন ইছামতি কামিল মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ শায়খুল হাদিস আল্লামা মোঃ হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সভাপতিত্বে মাদরাসার কতিপয় শিক্ষক, জকিগঞ্জ ফাযিল সিনিয়র মাদ্রাসার কতিপয় শিক্ষক (অত্র নিবন্ধের লেখকও) এবং জামেয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর মাদ্রাসা বিয়ানীবাজার এর কতিপয় শিক্ষক এবং জামেয়া ইসলামিয়া ছায়ীদিয়া মাইজকান্দি মাদরাসার তৎকালীন মুহতামীম মাওলানা মোঃ মুখলিছুর রহমান এবং সোনাসার এলাকার কিছু সংখ্যক আলেম উলামা খ্রিষ্টান মিশনারীদের উক্ত কার্যক্রমের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা ও প্রতিবাদ করতে দুটি সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উভয় সভায়ই সভাপতিত্ব করেন আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ। তাদের কার্যক্রমের প্রতিবাদে স্মারক প্রকাশের উদ্যোগ নিলে কার্যক্রম একটু স্তিমিত হয়ে পড়ে। পরে তারা তওবা করে ফিরে আসে।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর যে কেবল একজন সুদক্ষ প্রিন্সিপাল, চৌকস রাজনীতিবীদ, মহান দ্বীন প্রচারক, সুস্পষ্ট ওয়াইজ, সুক্ষ্ম মুফতি, সুশৃঙ্খল সংগঠক, দূরদর্শী আলেমে দ্বীন, বিজ্ঞ বিচারক ও সকল বিষয়ের ইনসাফ ভিত্তিক সমাধানকারী ছিলেন তা নয়। তিনি একজন দক্ষ কলম সৈনিকও ছিলেন। নব্বইয়ের দশকে তাঁর সম্পাদনায় সিলেট থেকে মাসিক শাহজালাল নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হতো। যাতে ধর্ম জাতি রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেতো। এ ছাড়া তিনি বহু গ্রন্থ গ্রণেতা হিসেবে সুপরিচিত।

মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে লিখতে হলে উঁচু মাপের লেখকদের প্রয়োজন। যারা হুজুরের জীবনের একেক অংশ নিয়ে গবেষণা করবেন, লিখবেন। একেক অংশ

একেকটি বিশালাকার গ্রন্থে রূপ নেবে। আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষ মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর সম্পর্কে লিখতে যাওয়া মানে সমুদ্রের পানি চামচ দিয়ে সিঞ্চনের ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর কর্মবহুল জীবন নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন। হুজুরের প্রাতিষ্ঠানিক খিদমত, দারুল কিরাতের খিদমত, দ্বীন প্রচারে বিভিন্ন দেশ সফর করে ইসলামের বাণী প্রচারের খিদমত, সাংগঠনিক খিদমত, প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে খিদমত, দারস প্রদান, আন্দোলন ও সংগ্রামে অবদান সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একঝাক দক্ষ মানুষের দায়িত্বশীল মানুষের কলম ধরার প্রস্তাব করছি। আল্লাহ তায়ালা হুজুরের দুনিয়ার জীবনের সকল খিদমতকে কবুল করুন। হুজুরের রূহানি ফয়েজ দ্বারা আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবি দান করুন। আমিন।

লেখক: ইবতেদায়ী প্রধান, জকিগন্জ ফাজিল সিনিয়র মাদ্‌রাসা; প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি, জকিগন্জ লেখক পরিষদ; বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

শিষ্টাচার-সৌজন্যতার বে-নজীর উপমা যিনি

মাওলানা মনজুরে মাওলা

তাঁর ইলম ও প্রজ্ঞার গভীর দরিয়া মাপার কোন স্কেল নেই আমাদের। নেই তাঁর আমল পরিমাপেরও কোন নিক্তি আমাদের কাছে। কিন্তু তাঁর মানবিক গুণ ও সুন্দর আচরণের মিষ্টি-মধুর স্বাদ-অনুভব বহমান আছে সবার মাঝে। নরম-কোমল ব্যবহারে সৌন্দর্য্য আর মুগ্ধতার যেন শেষ ছিলনা তাঁর মাঝে। বসন্তের স্নিগ্ধ সমিরণ যেভাবে হয় অবিরাম ভালোলাগার। ভোরের সোনালী রবির স্নিগ্ধ আভা যেমনি হয় চোখ খুলে শুধু তাকিয়ে থাকার। তেমনি এক সম্মোহনি ব্যক্তিত্বের সম্রাট ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ, জ্ঞানের সিন্দুক, আমাদের উস্তাদ, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান -মুহাদ্দিস ছাব হুজুর রহমতুল্লাহি আলাইহি।

কুরআন মাজীদের সুরা হুজরাত, সুরা নিসা, সুরা লোকমান, সুরা নূরসহ বিভিন্ন আয়াতে রয়েছে মুমিনদের ব্যবহারিক সৌন্দর্য্য ও শিষ্টাচারের শিক্ষা। হাদীসের বিশাল ভান্ডার সমৃদ্ধ আছে ভদ্রতা, সৌজন্যতা ও উত্তম জীবনাচারের নানা অলংকার ও সবক নিয়ে। আমরা দেখতে পাই মুআমালাত-মুআশারাত-শিষ্টাচারে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনার উপর পুরোপুরি আমল রয়েছে হযরত মুহাদ্দিস ছাব হুজুরের জীবনের সকল স্তরে।

হুজুর ছিলেন উত্তম আচরণ, সৌজন্যতা ও সৌন্দর্য্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের এক বে-নজির মিছাল ও উপমা। শান্ত, সৌম্য ও পরিতুষ্ট চিত্তের এই মহান বুজুর্গের মাঝে সমাবেশ ঘটেছিল নানান মানবিক গুনাবলীর। ঘটেছিল ইসলামের মুআমালাত-মুআশারাতের সকল শিক্ষা ও সৌন্দর্যের স্ফুরন। সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে তাঁর হুসনে সুলুক ও সুসম্পর্কের সৌধ এত উঁচু ছিল যে, আমাদের পক্ষে যার নাগাল পাওয়া সুকঠিন। মানুষের সাথে ছিল তাঁর এতই মধুর সম্পর্ক, যার অমলিন স্বাদ অনুভব করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব।

শিষ্টাচার, সৌজন্যতা, ভদ্রতা ও বিনয়ের তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ উপমা। জীবনভর মানুষের সাথে ছিল তাঁর সুন্দর-কোমল ব্যবহার। তিনি খুব ভালো ভাবে জানতেন মানুষকে, আল্লাহর কোনো বান্দাকে কিভাবে একরাম করতে হয়। কিভাবে অপরকে সম্মান জানাতে হয়। সমাজের মাঝে যার যেটুকু সম্মান ও স্নেহ পাওয়ার হক, তার ততটুকুই প্রদান করতে তিনি ছিলেন সজাগ-সচেতন। তিনি ছিলেন আনযিলিন্না-সা মানা-যিলাহুম" -এর মিসদাক। যেন ছিলেন পবিত্র কুরআনের সুরা হুজরাতের এক চমৎকার প্রতিচ্ছবি। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে কোন বড়কে খাট করে দেখেননি। দেখাননি ছোট করে। তাঁর চরিত্রে অহংকার ছিলো না। কিবির-অহংকারের তাশবীহ

থেকেও ছিলেন হাজার মাইল দূরে। তিনি ছিলেন তাঁর আমলনামা সুরক্ষার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক-সজাগ। হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত-শেকায়েতের রোগ তাঁকে আক্রান্ত করতে পারেনি। রিয়ার মত সুক্ষ রোগও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। ফিসক-ফুজুরের কোন বু-বাতাস লাগেনি তাঁর গায়ে। কটুকথা ও গালমন্দের উচ্চারণ কোনদিন কেউ শুনেনি তাঁর মুখ থেকে।

সবর-ধৈর্য্যেরও ছিলেন তিনি এক শক্ত হিমালয়। বহু কঠিন প্রতিকুলতার মুখোমুখি হয়েও তিনি ছিলেন তাওয়াক্কুলে বিলকুল অনড়-অটল। আপনজনের দেয়া কষ্টের দীর্ঘ নদী নিরবেই হজম করতে পেরেছিলেন তাঁর প্রশস্ত বুকে।

চেয়ারম্যান-এমপি থেকে মন্ত্রী-মিনিষ্টার এবং কৃষক-শ্রমিক থেকে একদম কুলি-মজুরের সাথেও তাঁর আলাপ-সংলাপের সুন্দর ধরন আমি দেখেছি অনেক। কোন মানুষকে সম্মান করতে তাঁর মাঝে কোন কার্পণ্য দেখিনি কভু। তিনি জী-আপনি বলে সম্বোধন করতেন সবাইকে। ৫ বছরের কোন পিচ্চি শিশুকে কোলে নিয়ে ওকে ১৬ বছর পাঠ শিখিয়ে অতঃপর ঐ শিশুকে আপনি সম্বোধন করাটা ন্যচারাল না। কিন্তু হুজুরকে দেখেছি তাই করে যেতে অবলিলায়। ইছামতি মাদ্‌রাসায় তখনকার প্রায় সমস্ত শিক্ষক স্টাফই ছিলেন তাঁর সরাসরি ছাত্র। কিন্তু এঁদের কোন একজনকেও সম্মান প্রদর্শন ছাড়া কথা বলতেন না তিনি। তাঁর সংকলিত "দালাইলুল খাইরাত" কিতাবখানি প্রথম সংস্করণ ২০০৬ সালে মুদ্রিত হয় ঢাকাস্থ আমার কর্ডোভা প্রিন্টিং প্রেস থেকে। কোন ইবারত-এ'রাবে খটকা লাগলে মাঝে মাঝে মোবাইলে কথা বলতে হত হুজুরের সাথে। লক্ষ্য করতাম, ভয় ও শ্রদ্ধায় যেখানে আমি কথা শুরু করতেই সাহস পাচ্ছিনা, তিনি কিন্তু সেখানে একেবারে বা-দুরুস্ত আমার সাথে জ্বী-আপনি বলে কথা বলে যাচ্ছেন। অথচ তিনি কেবল আমার নয়; ছিলেন আমার পিতারও উস্তাদ।

দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী কাল ধরে দারস তাদরীস ও ওয়াজ-নসীহত চালিয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ে দারসে কিংবা মাহফিলে তাঁর মতের বা ভিন্নমতের কোন আলেমের গীবত, শেকায়েত করেছেন, এমন উদাহরণ নেই। কোন মানুষকে কিংবা গায়র মাসলাকী কোন আলেমকে তাচ্ছিল্যের সাথে সম্বোধন করেছেন এমন কোন এক্সিডেন্টের সংবাদও কেউ প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন না।

শরীয়তে রাগের হুকুম ও রাগ নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ পাই আমরা কুরআন-হাদীসে। এ বিষয়ের কঠিন আমলও দেখতে পাই হুজুরের জীবনে। শিক্ষকতা অধ্যাপনার দীর্ঘ অধ্যায় তিনি পাড়ি দিয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক-প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন যুগের পর যুগ। কিন্তু তাঁর রাগ বা রাগের অনিয়ন্ত্রিত বহিঃপ্রকাশ আমি দেখিনি। দেখেনি কেউই।

ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের বে-নজির মিছাল ছিলেন তিনি। ওয়াজ মাহফিলে তাঁর বয়ানের ভাষা ছিল নেহায়েত শরীফ ও সুন্দর। ভিন্নমতের উলামায়ে কেরামের প্রসংগ আসলে পূর্ণ

শ্রদ্ধা ও একরাম সহকারে তাদের আলোচনা করতেন। মতামত খন্ডাতেন। মেহমানদের অভ্যর্থনা জানিয়ে দিল-দরাজ আচরণ করতেন। নিজ হাতে তাদের আপ্যায়ন করতেন। মনযোগ সহকারে সময় দিতেন। অনেক উঁচুতে অবস্থান করেও তিনি সহজেই একরামের সম্পর্ক রেখে চলতে পারতেন সাধারণ পেশার মানুষের সাথে। আবার রাষ্ট্র ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্তাদের সাথে কথোপকথন করতেন পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সাথে। তিনি যে কাউকেই সালাম দিতেন আগেভাগে। তাঁকে আগে সালাম করার জন্য সতর্ক থাকতে হত সাধারণ মানুষকেও। শাগরিদেরা তাঁর কদমবুসী করতেন। তিনি মুসাফাহা করতে উৎসাহিত করতেন। হাত বাড়িয়ে দিতেন। সাবলিল ও স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতেন। ওয়াজের কথা, বাক্য ও উদাহরণ আনতেন শ্রোতাদের বোধ ও মান বিবেচনায় রেখে। তাঁর ওয়াজ ছিল দরদমাখা। তাঁর বিনয় ছিল তাঁর যুগের এবং তাঁর পরের যুগসমুহেরও উপমা। তাঁর বিনয়-তাওয়াজু দেখে বিস্মিত হতেন সাধারণ মানুষ।

আমার বাড়ির পাশের ইছামতি মাদ্‌রাসা ছিল হুজুরের সুদীর্ঘ সময়ের কর্মস্থল। তাই শৈশবে চোখ খুলেই দেখতে শুরু করি হুজুরের আলোকিত জীবনাচরণ। মক্তব আউয়াল থেকে আমার পড়ালেখা ঐ মাদ্‌রাসায়। তাই সুযোগ হয়েছিল সহজে তাঁকে জানার-দেখার। অফিসে, দরসে, বয়ানে, মাহফিলে, মসজিদে, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনে, রাস্তায়, বাজারে, গাড়ি চড়তে, পয়দল হাঁটতে, ওজু-ইস্তেঞ্জা করতে, নামাজ পড়তে, মুক্তাদী হতে, ইমামতি করতে, মুনাজাতে, সালিশ-বিচার করতে, ইফতারের মুহুর্তে, এ'তেকাফের হালতে, ঈদের সকালে, খুশীর সময়ে, রাগের মুহুর্তে হর হালতে হুজুরকে দেখেছি আমি সর্বদাই কাছে থেকে। একেবারে শৈশব থেকে নিয়ে হুজুরের জীবনের শেষ বিদায় পর্যন্ত হুজুরকে দেখেছি আমি চোখ জুড়ে, প্রাণ ভরে।

অবাক, আশ্চর্য্য এবং তাজ্জবের ব্যাপার যে, এই সুদীর্ঘ কালে হুজুরকে দেখিনি কভু তাঁর দ্বীনদারি ও জীবনাচরণ থেকে সামান্যতম টলে যেতে। জীবনভর দেখেছি তাঁকে একটি সাবলিল ঝর্ণাধারার মত। সন্ধ্যার আকাশে প্রতিদিন একই রুটিনে তারকারাজির উদয়ের মত। যেখানে কোন ব্যত্যয় নেই। ভারসাম্যহীনতা নেই। আঁকা-বাকা নেই। চিৎকার চেঁচামেচি নেই। নেই কোন ছন্দপতন। দেহ কাঠামো ছিল যেমন অতি সুন্দর। তেমনি ঠোটে লেগে থাকতো তাবাসসুমের আভা। তাঁকে দেখে কেউ ভয় পেতনা কখনো। কিন্তু শ্রদ্ধা ও তা'জীমে নুয়ে যেত সবাই। তিনি অর্জন করেছিলেন কৃষক থেকে নিয়ে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, মন্ত্রী-মিনিষ্টার সকল পেশার মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা পাওয়ার বিরল যোগ্যতা। সুন্নতে রাসুলের নির্দিষ্ট রেলওয়েতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলমান ছিল তাঁর জীবনের দীর্ঘ ট্রেন। তিনি ছিলেন সহজ ও সরল, কিন্তু বোকা ছিলেন না। ছিলেন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান, কিন্তু চালাক ছিলেন না।

মুতালাআ ও পাঠাভ্যাসেও তিনি ছিলেন বে-মিছাল। বই-কিতাব ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়

সম্পদ। সফরে-হজরে কোন পরিস্থিতিতেই তাঁর দিন যেতনা মুতালাআ বিহীন। এমনকি তাঁর বালিশের পাশও বইমুক্ত হতনা কোনদিন। হুজুর কথা বলতেন, গল্প করতেন। হালপুরসী করতেন। হাস্যরসও করতেন। তথাপি তাঁর জবান থেকে শুনেনি কেউ কোন জুমলায়ে গায়র মুফীদ বা উপকার বিহীন অনর্থক কথা। তিনি ছিলেন উদার চিন্তার ও ঐক্যকামী। ইন্তেকালের বছর গোলাপগনজের একটি কওমী মাদ্‌রাসার বার্ষিক মাহফিলে তাঁর ওয়াজের তারিখ আনতে ঐ মাদ্‌রাসার মুহতামিম মাওলানা সালেহ নাজীব এবং আমি তাঁর বাড়িতে গেলাম। বার্ধ্যক্যের দুর্বলতায় ঐ সময় দূরের দাওয়াত রাখতেন না। তবু সেদিন এ রকম একটি দাওয়াতের কারণে হুজুর যারপর নাই খুশী হন এবং গুরুত্ব দিয়ে দাওয়াত রাখেন। কিন্তু বদনসীব! ঐ বছর মাহফিলের আগেই তাঁর ডাক আসে চলে যাওয়ার।

আমার যারপর নাই আনন্দ ও গৌরব, কাছে থেকে পাশে থেকে হুজুরকে দেখার সুযোগ পেয়েছি দীর্ঘকাল। তবু আমার বুকে সীমাহীন আফসোস ও কান্না, হুজুরের আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি বলে!

ইয়া রব! ইয়া রহমান!! হে দয়াময়!!! হযরত মুহাদ্দিস ছাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তুমি ক্ষমা কর। ভালোবাসো। দরজা ও মরতবা বুলন্দ কর। তাঁর মাকবারাকে বানাও জান্নাতের টুকরো। আর রোজ হাশরে প্রশস্ত জান্নাতের কোন সবুজাভ কর্ণারে এই গোনাহগারের সাক্ষাৎ ঘটাও হুজুরের সাথে!

লেখক: প্রিন্সিপাল, দারুল আযহার মডেল মাদ্‌রাসা, সিলেট ক্যাম্পাস।

আমাদের মুহাদ্দিস সাব
শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

মাহমুদ রহমান

শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান হুজুরের নাম জেনেছি অনেক বড় হয়ে। কিন্তু তাঁকে চিনতাম ভিন্ন নামে, মুহাদ্দিস সাব হিসেবে। আবার কখনও কখনও রারাইর মুহাদ্দিস সাব নামেও। উনাকে কবে প্রথম দেখেছি সেটা মনে করতে পারছি না। তবে কবে উনি যে গুরুত্বপূর্ণ একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব তা বুঝতে পেরেছি তা আজও মনে আছে।

দিন তারিখ মনে নেই। খুব ছোট ছিলাম। প্রতি বছর ফুলতলী মাদরাসার ওয়াজে আমরা নানা বাড়িতেই (ফুলতলী খানবাড়ি) থাকতাম। ওয়াজের মঞ্চ তৈরি করা হতে উত্তরমুখী করে মাদরাসার সামনে। তখন ফুলতলী মাদরাসার টিন শেড বিল্ডিংয়ের সামনের এই ছোট্ট মাঠটি সপ্তাহে দু'একদিন এলাকার বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মাঠের উত্তর পাশে যতদূর মনে পড়ছে ছোট্ট একটি পুকুরও ছিল। এরপর সামনের দিকটা খালি ছিল। আরও কিছু সামনে গেলে হাতের বামদিকে একটি গোরস্থান এবং ডানদিকে একটি বাড়ি। এরপর কৃষি জমি এবং কৃষি জমির পরই ফুলতলী খানবাড়ি। বর্তমানে এই কৃষিজমিতে দু'একটি বাড়ি হয়ে গেছে। তখনকার সময়ে খানবাড়ির পশ্চিমের পুকুর পাড়ে দাঁড়ালে ফুলতলী মাদরাসা দেখা যেতো। কিন্তু ওয়াজের সময়ে খানবাড়ির পশ্চিম-দক্ষিণ দিকের কৃষিজমিতে বসতো ওয়াজের বাজার (গ্রাম্য মেলা)। আমরা তখন নানাবাড়ি (খানবাড়ি) এবং ওয়াজের মেলায় সারাদিন ঘুরাফেরা করতাম। বড়দের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে খেলনা কেনা, এই সেই খাওয়া এগুলো ছিল সারাদিনের কাজ। ওয়াজ শোনার জন্য কত সময় বসতাম তা অবশ্য মনে নেই। এদিকে নানাবাড়িতে দিন-রাত মানুষে গমগম করতেন। বিশাল বড় বাড়ি। এমনিতেই বাড়ি ভর্তি মানুষ, এর উপর ওয়াজের দিন আরও আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতির কারণে অনেক সময় এই বাড়িতেই একজনের কথা আরেকজনে শোনা কঠিন হয়ে পড়তো।

নানাবাড়ির এই হই-হুল্লোড়ের মধ্যে হঠাৎ আমার আম্মা খালারা 'এই মুহাদ্দিস সাবের ওয়াজ শুরু হয়ে গেছে' বলে মলি পাড়ের দিকে (বাড়ির পশ্চিমের পুকুর পাড়) দৌঁড় দিতেন। ওখানে সবাই নিরবে বসে মুহাদ্দিস সাবের ওয়াজ শুনতেন। দিন-রাত অনেক আলেম-ওলামা ওয়াজ করতেন, কিন্তু মুহাদ্দিস সাবের ওয়াজের সময় হলেই বাড়ির সব মহিলারা খুব সচেতন হয়ে পড়তেন। এই ওয়াজ তাদের শুনতেই হবে। এই সময় আমরা কেউ পয়সা বা অন্য কিছুর জন্য তাদের কাছে গিয়ে ক্যাচর ম্যাচর করলে বকাঝকা

নিশ্চিত ছিল। ভাগ্য খারাপ হলে চড় থাপ্পড়ও জুটতো।

আরও বড় হয়ে মায়ের কাছ থেকে শুনলাম, মুহাদ্দিস সাবের ওয়াজে অনেক কিছু শেখা যায় তাই এরকম অতিরিক্ত মনোযোগ। আমরা বড় হওয়ার পর যখন আমাদের বাড়ির সামনে মুন্সীপাড়া দাখিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও ওয়াজে মুহাদ্দিস সাবের বয়ান শোনার এই আগ্রহ দেখেছি। অবশ্য ততদিনে আমি নিজেও উনার বয়ান শোনে ছোটবেলায় দেখা মহিলাদের অতিরিক্ত মনোযোগের কারণ ধরতে পেরেছি।

মুহাদ্দিস সাবের দ্বীনি ইলমি জ্ঞানের স্তর সম্পর্কে কিছু বলার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু আমি দেখেছি শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান ছিলেন সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য একজন আলেম। তিনি আল্লামা ফুলতলী সাহেব ক্বিবলা'র অনুসারী হলেও জমিয়ত-জামায়াতসহ অন্যান্য ইসলামী দলের কারো মুখে উনার সমালোচনা কিংবা উনার কোনো বক্তব্যে দুঃখ পেয়েছেন এরকম বলতে শুনিনি। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করি উনার বক্তব্যগুলো। বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে মুহাদ্দিস সাব উনার চিন্তা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে ভিন্নমতের ভ্রান্তির জায়গাগুলোও ধরিয়ে দিতেন। উনার প্রতিপক্ষরা এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে না পারলেও কষ্ট পেত না। অন্যকে কষ্ট না দিয়ে ভিন্নমত প্রকাশের জাদুকরি ক্ষমতা ছিল মুহাদ্দিস সাহেবের। লেখালেখির ক্ষেত্রে আমি মুহাদ্দিস সা'বের এই নীতিকে ফলো করার চেষ্টা করে প্রায়ই ব্যর্থ হই।

শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান (মুহাদ্দিস সাব) এর মতো বড় আলেমের জন্ম কোনো এলাকায় প্রতিবছর নয়, প্রতিযুগেও হয় না। প্রতি শতাব্দীতে দু'একজনের জন্ম হয়। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি এজন্য যে, এরকম একজন মনীষীকে দু'চোখে দেখেছি, দু'কানে উনার বয়ান শোনার সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে এগুলো আমল করার তৌফিক দিন, আমাদের মুহাদ্দিস সাবকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন।

লেখক: যুক্তরাস্ট্র প্রবাসী, ব্যাংকার, কলামিষ্ট, গ্রন্থ প্রণেতা।

মহান তপস্বীর শিয়রে একদিন

সরওয়ার ফারুকী

'আমীন। আল্লাহুম্মা আমীন' প্রাণস্পর্শী এমন উচ্চারণের অদ্ভুত তরঙ্গ আমায় নাড়িয়ে দিচ্ছিল, মোহাবিষ্ট রূহ যেনো আকাশে উড়ছিল সেদিন। সূর্যাস্তের ঠিক আগ মুহূর্তে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান জকিগঞ্জির শিয়রে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখী জোড়া হাতের দোয়ায় 'আমীন আমীন' বলতে পেরে ধন্য ভাবছিলাম নিজেকে। মকবুল ওয়াক্ত, মকবুল বয়সের আবশ্যম্ভাবিতা আমি হৃদয় থেকে উপলব্ধি করছিলাম, বিশ্বাস করছিলাম এ দোয়া কবুল হচ্ছে, আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করছেন, তিনি যে ক্ষমাশীল।

দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে দেখার, দোয়া নেয়ার গোপন ইরাদা মনের কোণায় উঁকি দিলেও জাগতিক ধোঁকায় প্রলম্বিত হচ্ছিল! অবশেষে মোহের বেড়ি ভেঙে দেখতে গেলাম, তাঁর সোহবতে ধন্য হলাম। সফরসঙ্গী হলেন 'দলইমাটি মহিলা ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা কানাইঘাট'র সুপার, শ্রদ্ধেয় মুহিব উল্লাহ ভাই। কোনদিকে, কীভাবে, কত সহজে শায়খুল হাদীসের বাড়ি পৌঁছব তা বাৎলে দিলেন আহমদ আল মনজুর ভাই। মনজুর ভাইয়ের দরাজ দিলের ছোঁয়া সবসময় আমাকে মুগ্ধ রাখে! জাযাকুমুল্লাহ।

লতাপাতা ঘেরা শান্ত-শ্রান্ত শায়খুল হাদীসের বাড়ি, তার মেঠোপথ, প্রাচীন বৃক্ষরাজি, সারিসারি সুউচ্চ সুপারি গাছ ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট স্মারক। ঐতিহ্যের প্রতি শায়খুল হাদীসের প্রচুর কদর! তাই ছেলে মো. আবদুল আউয়াল হেলালের প্রতি তাঁর নসিহত "বাবা, খেয়াল রেখো, ইলমী ঐতিহ্যমণ্ডিত এক পরিবারের সন্তান তুমি। এ নেয়ামতের খেয়ানত বা অবহেলা যেন না হয়।" হেলাল ভাই নসিহতের এই মুক্তমালা বুকের পাঁজরে জীবনভর জিন্দা রেখে ছুটছেন দেশ-দেশান্তরে। তিনি নেয়ামতের কদর করছেন, চর্চা করছেন শুকরিয়া জানাচ্ছেন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমানের বয়স তখন ৮৮ বছর ছুঁইছুঁই! বয়সের চাপে ন্যুব্জ, জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় ঋদ্ধ। সুদীর্ঘ জীবনের সকল তৎপরতা কুরআন-সুন্নাহ কেন্দ্রিক। তাঁর জবানে, বয়ানে 'আল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন'-এর বাইরে যেন অন্য উচ্চারণ নেই! এমন এক তপস্বীর দোরগোড়ায় আমি! সে আনন্দ-অনুভূতি আমাকে মোহাচ্ছন্ন রাখে দীর্ঘকাল।

ওস্তাযের প্রতি শায়খুল হাদীসের অকৃত্রিম ভক্তির মাত্রা উপলব্দি করি, যখন শুনি ওস্তাযের বাড়ির দিকে পা রেখে ঘুমানো নিজের জন্য তিনি বেয়াদবি মনে করেন! আমাদের জন্য বিস্ময়কর হলেও, তিনি আপন ওস্তাযের বাড়ির দিকে সুদীর্ঘ জীবনে পা দিয়ে ঘুমাননি! আরও বিস্ময় জাগে, যখন আপন সন্তানের প্রতি নসিহত শোনান, বাবা, জীবনেও আমার

কোনো ওস্তাযের সম্মুখে ওজুহীন অবস্থায় দাড়াইনি! এমন অকল্পনীয় শ্রদ্ধা যিনি ওস্তাযের প্রতি ধারণ করেন আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি তাহলে কতটা ইশক তিনি ধারণ করতে পারেন! এমন মানুষের হাততোলা দোয়ায় 'আমীন আমীন' বলতে পেরে অঝোরধারায় নোনা নীর ঝরে যায় আমার।

জীবনভর আমি পুঁজি ভেঙে খাওয়া এক লোক! হযরতও পুঁজির মূল্য দিলেন! পূর্বপুরুষের সুনাম-ধ্বনিতে ঋণী করলেন। বললেন, তোমার পরদাদাদ্বয় ইবরাহিম তশ্না (রহ.) ও ইসমাঈল আলম (র.)-কে চোখে দেখিনি, কিন্তু তাঁদের কর্মময় জীবনের এতো আলোচনা শুনে বড় হয়েছি যেনো তাদেরকে দেখতে পাই। মাওলানা ওলিউর রহমান (র.)-এর সাথে সম্পর্কের কথাও স্মরণে আনলেন। আব্দুল আউয়াল হেলাল ভাইকে সুবিশাল লাইব্রেরি ভবন দেখানোর কথা বললেন। আমরা লাইব্রেরি ভবন দেখলাম, অবাক হলাম। আলহামদুলিল্লাহ।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমানের শিয়রে আমার উপস্থিতি ক্ষণিকের, কিন্তু তার অনুরণন কাল-কালান্তরতক! মুহিবুল্লাহ ভাইও অনুরূপ অনুভব করলেন। আমরা ফিরে এলাম সন্ধ্যায়। এ সফরের ক'দিন পরেই শায়খুল হাদীস আল্লাহর মেহমান হলেন। বাংলাদেশ যেনো সেদিন এতিম হয়ে গেল। এ শূন্যতা পূরণ হবার নয়।

লেখক: সভাপতি, কানাইঘাট লেখক পরিষদ, সিলেট; বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

ইছামতির নাবিক একজন মুহাদ্দিস সাহেব

লুৎফুর রহমান

টিনশেডের একটি বৈঠকখানা। পিনপতন নিরবতা। গাছপালা আর চারপাশের পরিবেশও যেন দ্বীন ও সমাজের সেবায় মগ্ন। দুপুরবেলা তিনি আসলেন বৈঠকখানায় আমাদের দেখতে। বয়সের ভারে শরীরে তাঁর ছাপ পড়লেও মন ও মননে ছিলো তারুণ্যের উদ্দীপনা। সঠিক পথের দিশা দেখাতে বিরামহীন নাবিকের মতো নোঙর ফেলতে এসে বসলেন। শোনালেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিচারপতি থাকাকালীন সময়ের গল্প। একইসাথে তাঁর শ্বশুরবাড়ির এলাকার লোক জেনে বাড়তি কদরে যেন ধন্য করলেন আমাদের। এমন মহামানবের কাছে পরম আত্মীয়তা পাবার ভাগ্য হয়তো পৃথিবীর হাতেগোণা কিছু মানুষের হয়। বলছিলাম উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাবেক বিচারপতি শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমুল্লাহ'র কথা। ২০১৫ সালের ২২ জুলাই আমাদের একটি টিম তাঁরই বড়পুত্র কবি ও গবেষক জনাব মো. আবদুল আউয়াল হেলাল এর সাথে দেখা করতে তাঁদের বাড়িতে যাওয়া। টিমে ছিলেন বড়লেখার শিক্ষক ও কবি নাজিম উদ্দিন, সংগঠক আব্দুল বাকি বাকের, বিশ্বনাথের ছড়াকার পিয়ার মাহমুদ, জকিগন্জের ছড়াকার হাসান স্বজন ও মাওলানা আবদুল হালিম লিমন সাহেব।

আমাদের যাবার কথা শুনেই মুহাদ্দিস সাহেব আসলেন ঐতিহ্যবাহি এ বৈঠকখানায়। আরব আমিরাতের বাংলাদেশিদের মুখপত্র মাসিক মুকুল (আমার সম্পাদিত) সংখ্যা দিতেই পরম সানন্দে তিনি পাঠ করতে লাগলেন। চোখ বেয়ে যেন স্মৃতি ঝরছিলো ফেলে আসা অতীতের। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যোগ করছিলেন হারানো দিনের নানা স্মৃতিময় ক্ষণ। একইসাথে আমার সিলেটি ভাষায় লেখা ছড়ার বই 'সুরমা ফারর ছড়া' পড়ে উচ্ছসিত প্রশংসা করলেন তিনি। ব্যক্তিজীবনে তিনি বিচারপতি, অধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস এসব পরিচয় ছাপিয়ে নিজেও একজন লেখক। একইসাথে তাঁর সুযোগ্য সন্তানেরাও লেখালেখিতে স্বতন্ত্র জনপ্রিয়তা পেয়েছেন সুরমা পেরিয়ে টেমসের ওপারেও।

ইছমাতি একটি পরগনার নাম। এই পরগনার নামেই যে মাদরাসা সে মাদরাসাকে সন্তানের মতো ভালবেসেছিলেন মুহাদ্দিস সাহেব। তাঁর বাগানের প্রস্ফূটিত এসব ফুল দেশ বিদেশে সৌরভ ছড়াচ্ছে অনায়াসে। ইছামতি এলাকার উত্তর পূর্ব দিকে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত রেখা টেনে সুরমা নদী বয়ে চলেছে আপন মনে। নদীর কলকল শব্দের মতো মুহাদ্দিস সাহেবের কাজের বিস্তৃতি আর মানবিক দর্শন পৃথিবী যতোদিন থাকবে ততোদিন জ্বলজ্বল করবে আপন মহিমায়। এরপর পারিবারিক বিশাল

লাইব্রেরিতে বসি আমরা। একের পর এক বই উল্টাতে যেন জ্ঞানের সুরমা কুশিয়ারা পেরিয়ে বঙ্গোপসারে ডুবি। এসব বই যে কোন গবেষকের কাজে আসবে গবেষণাকাজে। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮২ সাল। ৫ বছর সময়ে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের উম আল কোয়াইনের একটি ওয়াকফের মসজিদে খতিব এবং উম আল কোয়াইন আদালতের বিচারক ছিলেন। এই অর্ধ দশকে তিনি প্রবাসের জীবন-যাপন ধারণ করেছেন বুকের গহিনে। প্রবাসিদের সুখ কষ্ট নিজের করে নিয়ে নানা জায়গায় তা উল্লেখ করেছেন নিপুণভাবে। ব্যক্তিজীবনে বিয়ানীবাজারের সুপাতলায় (আমার পাশের গ্রাম) তাঁর শ্বশুরবাড়ি। অন্যদিকে প্রবাসি আমি। এই দুটো কারণেই হয়তো তাঁর সান্নিধ্য আর আশীর্বাদ পেয়েছিলাম সেদিন।

২০২২ সালে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর কবরের পাশেই বিশাল জায়গায় গড়ে ওঠেছে লাইব্রেরি। আল হাবীব পাঠাগার। এ পাঠাগার সিলেট অঞ্চলের ইতিহাস সন্ধানি মানুষ এবং গবেষকদের কাছে অথেনটিক ঠিকানা হতে পারে। আগামি দিনে ইসলামি গবেষণা ও সামাজিক মূল্যবোধ তৈরিতে এ লাইব্রেরি কাজে আসবে। সিলেট অঞ্চলে 'মুহাদ্দিস সাহেব' নামে অধিক পরিচিত ছিলেন তিনি। মুহাদ্দিস সাহেব বললেই মানুষ চিনে একজনকেই, তিনি আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ। ইছামতির এ নাবিক চরম সংকটেও মানুষের পাশে ছিলেন ছায়া হয়ে। মানুষের সেবা করাই ছিলো যেন তাঁর ব্রত। দ্বীনের দিশা এবং অমানিশা কাটাতে সঠিক নির্দেশনা সেই সাথে অর্থ সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন দিনের পর দিন। তাঁর উঠোনে এখনো সে দুপুরবেলায় রোদ আছে, শুধু নেই তিনি। তবে তিনি আছেন সমষ্টির চেতনায়, মানুষের ভালবাসায়। তাঁর দেখিয়ে যাওয়া কাজ অব্যাহত রাখা সকলের দায়িত্ব। তাঁর নামে জকিগন্জে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠুক। গড়ে ওঠুক কোন চত্বরের নাম সিলেট শহরে। এমন প্রাণজ কামনা।

লেখক: সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রবাসী, সাংবাদিক- একাত্তর টিভি; সম্পাদক- বায়ান্ন টিভি।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের শেষ বৃটেন সফর, আমার কিছু স্মৃতি

মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন উপমহাদেশের এক জন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবীদ, হাদীস বিশারদ ও শামছুল উলামা হযরত আল্লামা মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব ক্বিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর প্রথম যুগের অন্যতম এক জন খলিফা। দীর্ঘ দিন তিনি পূর্ব সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার সুনাম ধন্য অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু রেখে গেছেন অসংখ্য খিদমাত; যার মধ্যে আমরা তাঁকে খুঁজে পাই। এই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে লেখার যোগ্যতা আমার নেই। তারপরও মনের আগ্রহ এবং তাঁর রুহানী ফয়েয পাবার আশায় কিছু লেখার চেষ্টা করছি।

ইবতেদায়ী পর্যায় থেকে ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার ছাত্র ছিলাম বিধায় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে আমার হাজারও স্মৃতি আছে, যা লিখে শেষ হবে না। এখানে আমি হুজুরের শেষ ইংল্যান্ড সফরের কিছু স্মৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করব। এই সফর অন্যান্য বারের সফরের চেয়ে ছিল ব্যতিক্রম। কারণ অন্যান্য সফরে সব সময় হুজুরের সান্নিধ্যে যাবার সুযোগ ছিল, কিন্তু এই সফরের সময় কোভিড ১৯ থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সব সময় যেতে পারিনি।

হুজুর উমরা আদায় শেষে ২০২০ সালের ৬ মার্চ শুক্রবার ইংল্যান্ড আসেন। আমি হিথরো এয়ারপোর্টে হুজুরকে আনতে গিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! যথা সময়ে আমরা হুজুরকে নিয়ে পূর্ব লন্ডনের ওয়াপিং এলাকায় তাঁর ভাতিজীর বাসায় নিয়ে আসি। তার পর কিছু সময় বসে আমি চলে আসি। এরপর প্রতি দিন হুজুরের খেদমতে গিয়েছি।

১৩ মার্চ ২০২০ শুক্রবার জনাব কমর উদ্দিন চৌধুরী পাপলু ভাইর বাসায় হুজুরের দাওয়াত ছিল। আমার গাড়িতে করে হুজুরকে পাপলু ভাইর বাসায় নিয়ে গেছি। রাত্রে উনার বাসায় খাওয়া দাওয়া শেষে হুজুরকে রেখে আমরা চলে আসি। সাথে মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল ভাই সহ আরও অনেকে ছিলেন।

তখন করোনা ভাইরাস ক্রমান্বয়ে বাড়তেছে। ২০ মার্চ শুক্রবার সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম লকডাউনের ঘোষণা আসে। ২৩ মার্চ সোমবার থেকে খাবারের দোকান ছাড়া মসজিদ সহ সব কিছু বন্ধ করে দেয়া হয়। তাই এই দিন থেকে হুজুরের সাথে কয়েক দিন দেখা হয় নাই তবে ফোনে কথা হয়ছে।

তখন দিন দিন করোনা ভাইরারাসের প্রকোপ সব দিকে বাড়তেছে, অনেক পরিচিত

লোক এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন, অনেক ইন্তেকাল করছেন। আমি ফোনে হুজুরের কাছে তাঁদের জন্য দোয়ার আবেদন করতাম, হুজুর বলতেন আমি দোয়া করব। ১ এপ্রিল বুধবার থেকে আমি কোভিড ১৯ আক্রান্ত হলাম। হুজুরকে ফোন দিয়ে জানালাম, তিনি সাহস দিয়ে বললেন, চিন্তা করনা আমি দোয়া করতেছি ইনশাআল্লাহ তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে।

পরবর্তীতে আমার খরব নেয়ার জন্য কিছু সময় পর পর হুজুর ফোন করতেন, আমি সব সময় ফোন ধরতে পারতাম না, অনেক সময় আমার স্ত্রী ফোন রিসিভ করে খবর জানাতেন। তখন অনুভব করতে পারি হুজুর আমাকে কতটুকু স্নেহ করতেন। যাই হোক সাত আট দিন পর আমি মোটামুটি সুস্থ হলাম। তার পর প্রত্যেক দিন হুজুরের সাথে ফোনে কথা হত। লক ডাউনের কারণে দেখা সাক্ষাৎ করা সম্ভব হচ্ছিলনা।

ইতিমধ্যে পবিত্র রামাদান মাস আরম্ভ হল। তখন মনে মনে খুবই খারাপ লাগত যে, হুজুর লন্ডন থাকা সত্বেও দেখা করতে পারছি না, এক সাথে ইফতার করতে পারছিনা। এভাবেই রামাদান শেষ হওয়ার পথে। এক দিন মাওলানা হেলাল ভাইকে বললাম, হুজুরের সাথে কম পক্ষে এক দিন ইফতার না করলে মন মানছে না। তিনি বললেন, আব্বার সাথে কথা বলেন। আমি হুজুরের সাথে কথা বললাম, বললেন একদিন এক সাথে ইফতার করা যেতে পারে। ২০ মে, ২৭ রামাদান বুধবার হুজুরের সাথে ইফতার করার তারিখ নির্ধারণ করলাম। নির্দিষ্ট দিন আমি ঘর থেকে ইফতারী নিয়ে ওয়াপিং হুজুরের ঘরে গেলাম। হুজুর, আমি, পাপলু ভাই, হেলাল ভাই, সাইদুর রাহমান ভাই আমরা এক সাথে ইফতার করলাম। সে দিন ইফতারের পর হুজুরের আদেশে মাগরিব নামাজের ইমামতি আমাকে করতে হয়ছিল। এটি আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি স্মরণীয় ও স্মৃতিময় দিন। সেসময় সরকারী বিধি নিষেধের কারণে সব সময় হুজুরের সাথে দেখা হয় নি, কিন্তু ফোনে সব সময় কথা হত। ২৪ মে ২০২০ রবিবার বৃটেনে পবিত্র ঈদুর ফিতর অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন রাত্রে হুজুরের সাথে দেখা করেছি, দীর্ঘ সময় হুজুরের খিদমতে অবস্থান করেছি। এসময় সাইদুর রাহমান ভাই ও আবদুল করিম ভাইও উপস্থিত ছিলেন। হুজুরের প্রথম ইছামতি মাদ্‌রাসায় আসা ও আমাদের এলাকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন। তখনও লক ডাউনের বিধি নিষেধ ছিল তাই সবাই খুবই সাবধানতা অবল্বন করতেন। ৭ জুন রবিবার আমি হুজুরের সাথে দেখা করি। ১৪ জুন রবিবার আমার বাবার ২৪তম ইন্তেকাল বার্ষিকী ছিল, তাই আমি কিছু শিরনী নিয়ে হুজুরের খিদমতে গেছি, মাগরিবের নামাজের পর হুজুর আমার বাবার জন্য দোয়া করেছেন। ঐ দিনও অনেক সময় হুজুরের খেদমতে বসি, তিনি বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে হুজুর আমাদের কাছে সিলেটের সাবেক মেয়র জনাব মরহুম বদর উদ্দিন আহমদ কামরান সাহেবের কথা জানতে চান। মেয়র সাহেব তখন কোভিড

আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। হেলাল ভাই উপস্থিত ছিলেন, পরে আমরা চলে আসি। ঘরে আসার পর পরই জানতে পারি মেয়র কামরান সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। সাথে সাথে ফোনে হুজুরকে সংবাদ জানাই। এভাবে দিন যাচ্ছে, সরকারী বিধি নিষেধের কারণে হুজুর বাইরে কোন কোথাও যেতে পারছেন না, আর আমরাও সব সময় হুজুরের খেদমতে যেতে পারছিনা। ২০ জুন শনিবার হুজুরের সাথে দেখা করি। আবার ১ জুলাই বুধবার আমি হুজুরের ঘরে গিয়ে দেখা করে অনেক সময় বসে অনেক কিছু আলোচনা করে চলে আসি। ৪ জুলাই শনিবার থেকে লকডাউন কিছুটা শিথিল করা হয়। শর্ত সাপেক্ষে মসজিদ খুলে দেয়া হয়ছে। ঐ দিন থেকে হুজুর বুখারী শরীফের দারস শুরু করেন। আমরা জুমের মাধ্যমে দারসে শরীক হয়ছি। ১০ জুলাই ২০২০ শুক্রবার লন্ডনের একটি হাসপাতালে হযরত আল্লামা মোঃ মোজাহিদ উদ্দিন চৌধুরী দুবাগী ছাহেব ইন্তেকাল করেন। শুনার সাথে সাথে আমি হুজুরকে ফোন দিয়ে জানিয়েছি, হুজুর খুবই আফসোস করেছেন। পরদিন আমি হুজুরের দারসে বুখারীতে সরাসরি শরীক হয়েছি। দারস শেষে হুজুর দুবাগী ছাহেবের জন্য বিশেষ দোয়া করেছেন, দোয়ার পূর্বে তাঁর আদেশে আমি কিছু তিলাওয়াত করেছি। তখন হেলাল ভাই, মাওলানা শেহাব উদ্দিন সাহেব ও মুফতি ইহসান আহমদ ছাহেব উপস্থিত ছিলেন। পর দিন ১২ জুলাই রবিবার বাদ যোহর ব্রিকলেন জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আল্লামা দুবাগী ছাহেব এর জানাযায় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর শরীক হন। সেদিনও হুজুরের দেখা হয়ছে, কথা হয়ছে।

আমি হেলাল ভাইকে বললাম হুজুরতো প্রত্যেকবার আমার ঘরে তাসরীফ আনেন, এবার যদিও অনেক বিধি নিষেধ তার পরও আমার ঘরে এক দিন হুজুরকে নিতে চাই। হেলাল ভাই বললেন, আব্বার সাথে কথা বলেন। আমি হুজুরের সাথে কথা বললাম, হুজুর প্রথমে বললেন প্রতিবার আমি তোমার ঘরে যাই এবার না গেলে কি হয় না? আমি বললাম হুজুরের মর্জি। পরে হুজুর বললেন, হয়ত আর ইংল্যান্ড আসা হবে না, হয়ত এটিই আমার শেষ সফর, তাই তোমার ঘরে একবার যাব। ডায়রী দেখে বললেন, আগামী ২৪ জুলাই শুক্রবার জুমুআর নামাজের পর যাব ইনশাআল্লাহ।

১৭ জুলাই শুক্রবার ব্রিকলেন জামে মসজিদে আল্লামা দুবাগী ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর ঈসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরও মাহফিলে উপস্থিত হন। ১৯ জুলাই রবিবার আমি হুজুরের ঘরে গিয়ে সাথে দেখা করে আসি। ২২ জুলাই বুধবার হুজুরের ঘরে বুখারী শরীফ দারসে শরীক হই। দারস পরে অনেক সময় হুজুরের খেদমতে অবস্থান করে চলে আসি। ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার আল্লামা দুবাগী ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ঘরে দোয়া মাহফিল ছিল, মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরও সেখানে তাসরীফ নিয়েছেন। হেলাল ভাই, আমি, কয়েস ভাই ও মাওলানা নিজামী ছাহেব সহ অনেক মানুষ ছিলেন। ঘরে মিলাদ, দোয়া ও খাওয়া শেষে হুজুর সহ আমরা লন্ডস্থ

কবর স্থানে যিয়ারতে যাই। পর দিন ২৪ জুলাই শুক্রবার দারুল হাদীস লতিফিয়ায় জুমুআর নামায আদায় শেষে আমি হুজুরকে আমার ঘরে নিয়ে আসি। দুপুরে খাওয়ার পর হুজুর কিছু বিশ্রাম নিলেন। আমি, আমার সহধর্মিনী ও বাচ্চাদের কিছু নসীহত করলেন। এক পর্যায়ে বললেন, এবার হয়তো আমার শেষ ইংল্যান্ড সফর, আর আমি আসতে পারবনা। আমার জন্য দোয়া সবাই দোয়া করবে। তার পর দোয়া করে বিদায় নিয়ে বের হলেন। আমার গাড়িতে করে হুজুরকে ওয়াপিং নিয়ে গেলাম। কিছু সময় বসে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

পরে বিকেলে আবার আমি হুজুরের ঘরে গিয়ে দারসে বুখারীতে শরীক হলাম। সেদিন অনেক মানুষ দারসে শরীক হন। ঐ দিনের দারসে বুখারী ছিল লণ্ডনে হুজুরের শেষ দারস। এর দুই দিন পর হুজুর দেশে চলে যান।

২৬ জুলাই রবিবার হুজুর বাংলাদেশের রওয়ানা দেন। আমি হিথরো এয়ারপোঁট হুজুরকে বিদায় দেবার জন্য গেছি। হুজুরের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় বলেন, আর হয়ত ইংল্যান্ড আসা হবে না, তোমাদেরকে আল্লাহর হাওলা করে গেলাম। আমার জন্য দোয়া করবে। অনেক ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হুজুরকে বললাম, ইনশাআল্লাহ হুজুরের সাথে আবার দেখা হবে, কথা হবে। এর পর হুজুরের কাছে বিশেষ দোয়া চেয়ে সালাম ও কদমবুছি করে বিদায় নিয়ে আসলাম।

এটাই ছিল হুজুরের শেষ বৃটেন সফর। আর কোন দিনও আসবেন না। এই দিনও আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ও স্মৃতি বিজড়িত দিন হয়ে থাকবে।

আজ হযরত আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ আমাদের মাঝে নেই। বিগত ০৭/০২/২০২২ সোমবার আমাদের ছেড়ে আল্লাহ তায়ালার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

যদিও তিনি আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর অবদান, ভূমিকা, স্মৃতি আছে, সারা জীবন থাকবে। এগুলো ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে।

পরিশেষে দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা হুজুরের সমস্ত খিদমাত কবুল করে উনাকে যেন জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করেন, আমিন।

লেখক: ভাইস প্রেসিডেন্ট, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে, গ্রেটার লন্ডন ডিভিশন; সাধারণ সম্পাদক, জকিগনজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ
কিছু স্মৃতি কিছু অনুভূতি

উপাধ্যক্ষ মাওলানা পিয়ার মাহমুদ

আল্লাহ পাক মানব জাতির হেদায়তের জন্য সর্বযুগে সর্বকালে এক বা একাধিক নবী-রাসূল একই সাথে প্রেরণ করেছেন। এমনিভাবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার প্রেরিত নবী-রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হলেন আমাদের প্রিয় নবী সায়্যিদুল মুরসালীন ওয়ান নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনির পরে আর কোনো নবী রাসূল কিয়ামত পর্যন্ত আসবেন না। তাই যুগ যুগান্তরে মানুষ জাতি বিপথগামী হলে তখন তাদের হেদায়তের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য সকল কালের সকল সময় কুরআন হাদীসের জ্ঞানে মহাজ্ঞানী মনীষীগণ বিদ্যমান থাকবেন, যাদেরকে আমরা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বা নবীগণের উত্তরসূরী বলে অবিহিত করে থাকি। তাঁরা-ই দিকভ্রান্ত মানুষদেরকে রাসূলের দেখানো পথে দিকনির্দেশনা প্রদান করছেন বা করবেন। তাঁরা-ই শিরক-বিদআত, অন্যায়-অভিচার ও পাপাচারে নিমজ্জিত সমাজটাকে দিয়ে থাকেন কোরআন হাদীসের আলোয় আলোর দিশা।

এমনিভাবে সময় সময় জন্ম নেওয়া মহামনীষীদের একজন হলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মুজাদ্দিদ, আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন ওয়াল মুফাসসিরীন হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী (ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রহ.)। তাঁরই আলোয় প্রজ্জলিত হয়েছেন হাজার হাজার আলোর মশাল। যে মশালসমূহের দ্বারা আলোকিত হয়ে আসছে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল। এদের মধ্যে অন্যতম দ্বীনি এক মশাল ছিলেন, শায়খুল হাদীস, উস্তাযুল উলামা হযরত আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ, যিনি মুহাদ্দিস ছাহেব নামে সর্বাধিক পরিচিত। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.) এর খোলাফায়ে কেরামগণের মাঝে এবং মুরীদানের মধ্যে লাখো লাখো উলামায়ে কেরামদের মধ্যে মুহাদ্দিস ছাহেব শীর্ষতম। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর মোবারক হস্ত থেকে কিরাত, তরিকত ও হাদীসের সনদ লাভ করে ধন্য হলেও স্বীয় মুর্শিদ এর কাছে মুহাদ্দিস ছাহেবের আসন ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে। আপন মুর্শিদ কিবলাহর খাস স্নেহে ধন্য হয়ে কী করে এত কাছাকাছি পৌঁছলেন এবং শরিয়ত ও তরিকতের দিক থেকে এত উচ্চ আসনে আসীন হলেন তার সামান্যতম বুঝতে হলে স্বীয় মুর্শিদের প্রতি তাঁর কি পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল তার দিকে লক্ষ করতে হবে। আমার মতো নালায়েক এ বিষয়ে জানি আর বুঝি কতটুকু, যা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। পাশে থেকে কাছে থাকার সে সুযোগ ও বুঝার মতো বোধশক্তি আল্লাহপাক যাদের দিয়েছেন তারা-ই এ ব্যাপারে

বলা বা লিখার অধিকার রাখেন।

মুহাদ্দিস ছাহেব এর 'জীবন ও কর্ম নিয়ে স্মারক বের হচ্ছে জেনে এ সময় আমার অবুঝ এ-মনে সংরক্ষিত দু'চারটে স্মৃতি তুলে ধরার প্রয়াস নিলাম। মুহাদ্দিস ছাহেব এর ব্যক্তি সত্ত্বার যে বিশাল পরিধি, তা যারা বুঝতে পেরেছেন তারাই লিখবেন, আমি শুধু স্মৃতিচারণে আটকে থাকলাম।

এক

আমি তখন ফুলতলী কামিল মাদিরাসার ছাত্র। ছাহেব বাড়ি মসজিদে বুখারী শরীফের খতম চলছে। ছাহেব কিবলাহ তিনির বৈঠকখানার বারান্দায় বসা। আমরা তাঁর পাশে দাঁড়ানো। হঠাৎ ছাহেব কিবলাহ বলে উঠলেন মুহাদ্দিস ছাহেব এখানে আছেন কি? কোনো একজন দৌঁড়ে গিয়ে মুহাদ্দিস ছাহেবকে বললে তিনি সাথে সাথে চলে আসলেন। দাঁড়িয়ে রইলেন ছাহেব কিবলাহর এক পাশে। ছাহেব কিবলাহ বলতে লাগলেন, মুহাদ্দিস ছাহেব! নামাযের সময়ে তাশাহুদে যে দুরুদ শরীফ পড়া হয়, তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামের আগে সায়্যিদুনা শব্দ লাগিয়ে পড়া মুস্তাহাব, এটা আপনি পেয়েছেন কি?

মুহাদ্দিস ছাহেব উত্তরে বললেন- ছাব! আমার মতো আলিমে কিতাব আর কয়খানা পড়েছি। আমার জন্য ছাবই আমার কিতাব। এক মাহফিলে ছাব আপনি এই কথা বলেছেন আর আমি সেদিন থেকে আমল করার চেষ্টা করি। আর এই কয়দিন আগে একটা কিতাবে পেয়েছি। এই কাহিনী থেকে সামনে থাকা আমরা যারা কে কি বুঝেছেন জানি না, তবে আমার মনে ছাহেব কিবলাহর ইলমের গভীরতা এবং অন্যদিকে মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহর স্বীয় মুর্শিদের প্রতি যে সম্মান এবং বিনয় তা উল্লেখযোগ্য। নিজেকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করে উপস্থাপনা তাও আবার আমরা তিনির ছাত্রের ছাত্রের ছাত্রের মত মানুষগুলোর সামনে, এটা কতটুকু নিরহংকার- বিনয়ী মানুষ হলে পারা যায়, তা অবশ্যই ভাববার বিষয়। কেননা, ছাহেব কিবলাহ যখন জানতে চেয়েছিলেন, তখন এক কথায় বলে দিতে পারতেন, জি পেয়েছি। সেখানে দোষের কিছু ছিল না। কারণ, তিনিতো এই সময়ের কয়দিন আগে পেয়ে গেছেন। এমনিতে তা না বলে উপস্থাপন ভংগিমায় নিজেকে অত্যন্ত ছোট করে তুলে ধরলেন। এই মনোভাব এবং মানসিকতাই তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে নিয়েছে অবশ্যই।

দুই

আমি তখনও ফুলতলী কামিল মাদ্‌রাসার ছাত্র। খানিক দূরে অবস্থিত আল্লামা ছাহেব কিবলাহ (র.) এর অন্যতম খলিফা আল্লামা আব্দুল জব্বার গোটারগ্রামী মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. প্রতিষ্ঠিত 'গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা'। মাদ্‌রাসার বার্ষিক জলসায়

আমিও শ্রোতা। মুহাদ্দিস ছাহেব বয়ান পেশ করছেন, প্রসঙ্গক্রমে এক পর্যায়ে বলে উঠলেন, কেউ কেউ বলতে চান ছাহেব কিবলাহ শুধুমাত্র একজন কারীছাব বা পীরছাব। শরীয়তের ইলম বলতে তেমন কিছু নেই। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই বলে বর্ণনা শুরু করলেন, আমি তখন বিশ্বনাথ সৎপুর দারুল হাদীস টাইটেল মাদ্‌রাসায় হাদীস শরীফ পড়াতাম। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহও এই মাদ্‌রাসায় সপ্তাহে একদিন হাদীস শরীফের দারস দিতেন। এক সময় ছাহেব কিবলাহ তিনির ব্যস্ততার কারণে আর সৎপুর মাদ্‌রাসায় হাদীস শরীফ পড়াতে যেতে পারবেন না এ সিদ্ধান্ত নিয়ে সমাপনী দিন ধার্য্য করে হাদীস শরীফের শেষ দারস আরম্ভ হল। সকল আসাতাজায়ে কেরাম উক্ত দারসে অংশগ্রহণ করতে উপস্থিত, সাথে আমিও। ছাহেব কিবলাহকে হাদীস শরীফের কিতাব দেওয়া হলো। ছাহেব কিবলাহ পাতা উলটালেন এবং যেখান থেকে বের হলো সেখান থেকেই পড়াতে লাগলেন। তিনি ঐ হাদীস শরীফই পড়াতে লাগলেন যে হাদীস শরীফ আমি ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে একটি শব্দের অর্থ না জানার কারণে আমি তার অর্থ না বলে আরবী শব্দ বলেই পড়িয়ে আসতাম। অনেক লুগাত খোঁজ করেও এ শব্দের অর্থ পাইনি। তাই, ছাহেব কিবলাহ যখন ঐ হাদীস শরীফ পড়াতে লাগলেন আমি মনে মনে বললাম আজ আমার কাজ হয়ে গেছে! আর একটু জোরেই বললাম আলহামদুল্লিাহ! আশ্চর্যের বিষয় ছাহেব কিবলাহ পড়াতে গিয়ে আমি যে শব্দের অর্থ অনেক খোঁজাখুজির পরও পাইনি ঐ শব্দে গিয়ে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন- সবাই খেয়াল করো, অনেক লুগাত তালাশ করেও এই শব্দের অর্থ সকলে পাবে না, তার অর্থ হচ্ছে- গোবরে থাকা পোকা। (মুহাদ্দিস ছাহেব সে দিন আরবী শব্দটাও বলেছিলেন, কিন্তু আজ আর আমার স্মরণ নেই, তাই বলতে পারলাম না) এই হচ্ছে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর ইলমের গভীরতা। তিনি আরো বললেন- ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ এত ব্যস্ততার মাঝে যখন হঠাৎ কোন দারস প্রদানে বসতেন, উপস্থাপনার ধরণ এবং বাচন ভঙ্গিতে মনে হতো রাত্রে কিতাব মুতায়ালা করে এসেছেন কিন্তু না।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো- সাধারণ মানুষ কেন, অনেক নামীদামী উলামা মাখায়েখ যেখানে মনে করতেন ছাহেব কিবলাহ থেকে মুহাদ্দিস ছাহেব এর ইলম অনেক বেশি হবে, সেখানে একটা নয় একাধিক ওয়াজ মাহফিলে সর্ব সাধারণের উপস্থিতিতে মুহাদ্দিস ছাহেব স্বীয় মুর্শিদের ইলমে দ্বীনের গভীরতার বহুবিধ বাস্তব উদাহারণ তুলে ধরতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না বরং এটাকে তিনি গৌরবের কারণ মনে করতেন।

তিন

ফুলতলী কামিল মাদ্‌রাসার বার্ষিক জলসা, মুহাদ্দিস ছাহেব বয়ান পেশ করছেন। এর কিছু দিন আগে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ছাহেব কিবলাহর নির্দেশে মুহাদ্দিস ছাহেব ছিলেন সে নির্বাচনে একজন সংসদ সদস্য প্রার্থী। নির্বাচনের ফলাফলে

মুহাদ্দিস ছাহেব উল্লেখযোগ্য ভোট পেলেও বিজয়ী হতে পারেননি। এ নিয়ে মুহাদ্দিস ছাহেবের অনেক শুভাকাঙ্খীকে এমন আলোচনা-সমালোচনা করতে শুনা যাচ্ছে যে, মানুষের মাঝে মুহাদ্দিস ছাহেবের মান-মর্যাদা বা সম্মানের আসন দিন দিন এমনিভাবে বাড়ছে। হঠাৎ কোনদিন ফুলতলী ছাহেব থেকে মানুষের মাঝে মুহাদ্দিস ছাহেবের কদর বেড়ে যায় কি না এ সন্দেহে ফুলতলী ছাহেব মুহাদ্দিস ছাহেবকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে মানুষের মাঝে বিতর্কিত করতে চেয়েছেন।

মুহাদ্দিস ছাহেব এ বিষয়ের প্রসঙ্গ টেনে বর্ণনা করতে লাগলেন, আমার এমন শুভাকাঙ্খী ভাইদের উদ্দেশ্য করে বলবো, তোমারা জেনে রাখো, আল্লাহপাক তাঁর হাবীবের অসিলায় ফুলতলী ছাহেব কিবলাহকে এত উচ্চ আসনে আসীন করেছেন যে, আমার মতো লাখো হবিবুর রহমানকে যদি একজনের কাঁধে আরেক জন তোলা হয় তবুও ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর পা মোবারক ছোঁয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তাঁর বান্দা ফুলতলী ছাহেবকে এত উচ্চ মর্যাদায় রেখেছেন। তাই বেহুদা এসব আলোচনা করে নিজের দুনিয়া আখিরাত নষ্ট করো না। আর বিতর্কিত বলতে কি বুঝাতে চাইছো জানি না, তবে তোমরা জেনে রাখো নির্বাচনের আগে যে দাওয়াত খেতাম তার চেয়ে এখন কয়েক গুণ বেশি দাওয়াত খাচ্ছি, সময় দিতে পারছি না। আরো জেনে রাখো, আপনারা যারা আমাকে মুহাদ্দিস ছাব বলে ডাকেন। এই মুহাদ্দিস ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর হাতে গড়া মুহাদ্দিস। তাই, এসব অমুলক কথাবার্তা বলে নিজের ক্ষতি নিজেরা ডেকে আনবেন না।

চার

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করে খ্যাতনামা আলিমদের কাছে থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সনদ সংগ্রহ করেছেন। পাশাপাশি ঐ সমস্ত উলামা হযরতও তাঁর কাছ থেকে সনদ সংগ্রহ করে নিজেদের ধন্য করেছেন ও বরকত লাভ করেছেন। তিনি ওয়াজ মাহফিলে এমনিভাবে বয়ান করতেন যা শুনে উপস্থিত শ্রোতাদের মনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মুহাব্বত বৃদ্ধি হতো এবং নেক আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হতো। মানুষ তাঁর অমীয় বাণীগুলো তন্ময় হয়ে শুনতে থাকতো। একজন মুসলমানের ভেতর বাহির সংশোধনের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। এ প্রসঙ্গে এক মাহফিলে বলেছিলেন, আমরা যে ভাবে শরীরে কোনো রোগব্যাধি হলে ডাক্তারের শরনাপন্ন হই, ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে ঔষধ দেয়ার চেষ্টা করেন, ঠিক তেমনি রূহের ডাক্তার হলেন আউলিয়ায়ে কেরাম। তিনি বর্ণনা করলেন- একদিন মৌলভীবাজারের কোন এক মাহফিল শেষে তাকে এক বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হলো এবং ফুলতলী ছাহেব কিবলাহকে পাশেই অন্য এক বাড়িতে আরাম করার ব্যবস্থা করা হলো। মুহাদ্দিস ছাহেব বললেন- আমি যখন রাত ঘুমাতে যাবো তখন একা একা মনে আসলো জীবনতো শেষ করে দিচ্ছি কিন্তু নিজের রূহ সর্ম্পকে কিছুই জানলাম

না। সেটা ভালো না মন্দ বা তার অবস্থা কেমন? এমনি জল্পনা কল্পনার এক পার্যয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে এখান থেকে বিদায় নিয়ে ছাহেব কিবলাহ যে বাড়িতে অবস্থান করছেন সেখানে গেলাম এবং দেখতে পেলাম কিছু লোক একটা রুমে ছাহেব কিবলার অপেক্ষা করছেন। তিনি আরো বললেন- ছাহেব কিবলাহর অভ্যাস হলো, কেউ তাঁর অপেক্ষা করছে জানার পর আর ভেতরে থাকতেন না। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বাহির হয়ে সাক্ষাৎ করতেন। তাই, তিনি বের হয়ে এ অপেক্ষমান কক্ষে চলে আসলেন। এসে বসেই বলতে লাগলেন, আমরা অনেক এমন আছি নিজের রূহ কেমন? কি অবস্থায় আছে? সেটা জানতে আগ্রহী, এই বলে রূহের অবস্থা জানার সংক্ষিপ্ত উপায়ও সেদিন বলে দিলেন।

এ সময় তিনি আরো বললেন, শরীরের রোগের ঔষধ দিতে যেমন রোগ চিহ্নিত করতে হয়। তেমনি রূহের অসুখে নিরাময়ের পথ বলে দেয়ার জন্য ভেতরের খবর রাখেন এমন কামিল ওলীর প্রয়োজন। কোথায়, কখন আমি আমার রূহ নিয়ে ভাবলাম আর ছাহেব কিবলাহ কোথায় থেকে এ বিষয়ে সমাধান দিলেন। তাই, নিজের ভেতর-বাহির সংশোধনের জন্য একজন হক্কানী ওলী আল্লাহর সংস্পর্শ ছাড়া অসম্ভব।

পাঁচ

মুহাদ্দিস ছাহেব যে কতটুকু নিরহংকার এবং বিনয়ী ছিলেন তার প্রতিটি কাজ-কর্ম ও কথাবার্তায় তা ফুটে উঠতো। একদিন এক মাহফিলে ছাহেব কিবলাহর বিপ্লবী জীবন নিয়ে বলতে গিয়ে একটি ঘটনার বর্ণনা করলেন এভাবে যে, কুদরত-এ খোদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণের বিরুদ্ধে যখন আলিম-উলামা সোচ্চার। তখন সরকার কর্তৃক প্রতিবাদী সভা সমাবেশ, মিছিল মিটিং নিষিদ্ধ হলো। এমতাবস্তায় ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ সিলেটে প্রতিবাদ সভার আহ্বান করলেন। অবস্থা থমথমে, এ পরিস্থিতিতে মতবিনিময় এর জন্য সরকারী উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল ছাহেব কিবলাহকে সার্কিট হাউসে ডাকলেন। ছাহেব কিবলাহ উপস্থিত হলেন সাথে আমিও ছাহেব কিবলাহর পানের বাটা নিয়ে খেদমতে ছিলাম। ছাহেব কিবলাহ তাদের অনেক বাঁধা-আপত্তি এমনকি কারফিউ ঘোষণার হুমকির তোয়াক্কা না করে তিনির সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন এবং সভা করলেন। এখানে আমার অদ্যকার প্রসঙ্গ হলো মুহাদ্দিস ছাহেব এর বিনয় নিয়ে।

ঐ বৈঠকে মুহাদ্দিস ছাহেবের উপস্থিতির কথা আমরা অনেক হলে এভাবে বলতাম, ঐদিনে ঐ বৈঠকে ছাহেব কিবলাহ ও আমি ছিলাম। কিন্তু তা না বলে মুহাদ্দিস ছাহেব বললেন আমিও সেদিন পানের বাটা নিয়ে ছাহেব কিবলার খেদমতে ছিলাম। আল্লাহু আকবর। এরকম বিনয়ী হওয়ার কারণেই হয়তো আল্লাহ পাক শুধু ফুলতলী মসলক নয় বরং সকল ঘরানার উলামা হযরতের কাছে তাঁর অবস্থান ছিলো শীর্ষে এবং ওরাসাতুল আম্বিয়া হিসেবে ছিলেন নির্দ্ধিধায় গ্রহণযোগ্য।

ছয়

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহ. দেশে-বিদেশে হাজারো দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে নিজের জীবনে অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মুহাদ্দিস ছাহেবও স্বীয় মুর্শিদের হাতে গড়া এসব দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে নিজের আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সারাটা জীবনভর। নিজেও প্রতিষ্ঠা করেছেন বিভিন্ন দ্বীনি মাদ্‌রাসা। পশ্চিম সিলেটের ঐতিহ্যবাহী এমন একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 'হযরত শাহচান্দ শাহকালু ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসা', যা মিয়ারবাজার আলিম মাদ্‌রাসা নামে সর্বাধিক পরিচিত। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর মোবারক হাতে ভিত্তি স্থাপিত এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি মুহাদ্দিস ছাহেবের আন্তরিক টান ও মুহাব্বত ছিল অপরিসীম। বিশেষ করে আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় জনাব মাওলানা মো. আব্দুল মুক্তাদির খান ছিলেন হুজুরের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন একজন ব্যাক্তি। আমি অধমও ছিলাম এ মহামনীষীর স্নেহধন্য মানুষ। যখন যেখানেই দেখা হয়েছে, ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করার শুরুতে মাদ্‌রাসার খবর নিতেন। মুহাদ্দিস ছাহেব যখন খুব অসুস্থ আমরা শিক্ষকবৃন্দ দেখতে এলাম সিলেট হুজুরের দামান্দের বাসায়। এই মুমূর্ষ অবস্থাও হুজুর আমাদেরকে বললেন, মিয়ারবাজার মাদ্‌রাসায় ফাজিল জামাত চালু করো। এ বিষয়ে উৎসাহমূলক আরো অনেক কথাই বললেন। আমরা চলে আসলাম। ঐদিন হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার শরীফ জিয়ারত শেষে কিছু পরিচিত ভাইদের পেলাম। তারা জিজ্ঞাস করলেন আপনারা মুহাদ্দিস ছাহেবকে দেখতে গিয়েছিলেন? আমি বললাম! আপনারা জানলেন কি করে? তখন একজন বললেন মুহাদ্দিস ছাহেব বলেছেন- মিয়ার বাজার থেকে শিক্ষকবৃন্দ আমাকে দেখতে এসেছিলেন। আমি তাদেরকে বলেছি- মারা যাওয়ার আগে মিয়ারবাজার মাদ্‌রাসা ফাজিল স্থরে যেন উন্নতি হয়, তা দেখে যেতে চাই। আলহামদুলিল্লাহ! একেকটা দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রতি মুহাদ্দিস ছাহেবের হৃদয়ের টান এ থেকেই কিছুটা উপলব্ধি করা যায়।

সাত

মুহাদ্দিস ছাহেব স্বীয় মুর্শিদের ইজ্জত হুরমত রক্ষায় কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। তা হলো-

আমাদের মিয়ার বাজার আলিম মাদ্‌রাসায় গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য রয়েছে একটা 'গরীব তহবিল'। এ তহবিলকে সমৃদ্ধ করার নিমিত্তে গঠন করা হয়েছে 'গরীব ছাত্র কল্যাণ ট্রাস্ট'। এ ট্রাস্টের অর্থায়নে নির্মিত হবে একটি চারতলা বিশিষ্ট 'গরীব ছাত্র কল্যাণ কমপ্লেক্স'। এ কমপ্লেক্স এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজে বরকত এবং দোয়া লাভের জন্য এক কথায় কাজের মকবুলিয়ত হাসিলের জন্য প্রধান অতিথি হিসেবে দাওয়াত দেওয়া হলো মুহাদ্দিস ছাহেবকে। তিনি আসলেন। আমরা ভিত্তি প্রস্তর কাজের একটা নেমপ্লেট তৈরি করে আনলাম। যাতে লিখা ছিলো তাঁর বিভিন্ন পরিচিতির

সাথে 'খলিফায়ে ফুলতলী' এ পদবীটুকু। হুজুর তা দেখে তিনির নরম স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে অধ্যক্ষ মহোদায়কে বললেন, যা লিখেছো তার লায়েক আমি নই। তবুও মেনে নিলাম, কিন্তু খলিফায়ে ফুলতলী এ অংশটুকু বাদ দিয়ে দাও। অধ্যক্ষ সাহেব অনেক কাকুতি মিনতি করে তা রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছেন এমন পর্যায়ে আমাকে খবর দিয়ে এনে হুজুরের সাথে আলোচনার তাগিদ দিলেন। আমি কথা বলার শুরুতেই বললেন, খান সাহেব এখন তোমাকে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য পাঠিয়েছেন। কারণ, তুমি আমার মায়ার মানুষ। তাই, আমি এক কথায় বলছি আমাকে যদি সত্যিকার ভালোবেসে থাকো, তাহলে এ শব্দ দুটি এখান থেকে বাদ দিয়ে দাও। তিনি বলতে লাগলেন- কোথায় ছাহেব কিবলার শান এবং মান। আমার মতো একজন সামান্য গোলাম এ মহান ওলীর খলিফা পরিচয় দেবো এরকম স্পর্ধা বা সাহস আমার নেই। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর মকবুলিয়ত আল্লাহর কাছে যা আছে তাঁর খলিফা পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা আমি রাখি না। আমাকে সত্যিকার ভালোবাসলে আমার এ কথা তোমাদের মানতে হবে। এটাই হচ্ছে আমার শেষ কথা। আমরা কি করবো অসহায় হয়ে এ দুটি শব্দ কাগজ দিয়ে ঢেকে দিলাম এবং শিক্ষা নিলাম, মুর্শিদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, ভালোবাসা এবং কতটুকু নিরহংকার এবং বিনয়ী হলে এ পূর্ণ সত্যটি গোপন রাখার ত্যাগ হাসিল করা যায় সে দৃষ্টান্ত।

আট

মুহাদ্দিস ছাহেব স্বীয় মুর্শিদ ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তি ও আকাশচুম্বি ভালোবাসা যেমন করে হৃদয়ে গেঁথে রেখেছিলেন ঠিক তেমনি ছাহেবজাদাগণের নয় শুধু তাদের আওলাদগণের প্রতিও অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তির দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন জীবনের সকল পরতে পরতে।

বিশেষ করে ছাহেব কিবলাহ ইন্তেকালের পরে মসলকের সকল মুহিব্বীন মুরীদীনদের প্রতি নসীহতের সুযোগ আসলেই মুহাদ্দিস ছাহেব জোর দিয়ে একটি কথা বলতেন- যারা ছাহেব কিবলাহর সাথে রূহানী সর্ম্পক বা ছাহেব কিবলাহ হতে ফয়েজ হাসিল করতে চান তাদের কর্তব্য হলো ছাহেব কিবলাহর ছাহেবজাদাগণ তথা তাদের আওলাদগণের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখা এবং তাঁর রেখে যাওয়া সকল খিদমাতে নিজেকে শরীক রাখা। শুধু বয়ানে বলতেন তা নয় তিনি তাঁর জীবনের সকল কাজকর্মে প্রায় বাস্তব উদাহরণ রেখে গেছেন। ছাহেবজাদা অনেকের উস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি বা ছাহেবজাদাগণের আওলাদগণের প্রতি যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন তা আমাদের জন্য অনুস্মরনীয়, অনুকরণীয় হয়ে থাকবে যুগ যুগান্তরে।

নয়

ছাহেব কিবলাহর পরেই মসলকের বা মসলকের বাহিরেরও খ্যাতনামা উলামা হযরত এর

কাছে ইলমে দ্বীনের মহাপণ্ডিত হিসেবে মুহাদ্দিস ছাহেবের স্থান ছিল অনন্য। মুহাদ্দিস ছাহেবের ইলমের গভীরতা নিয়ে কারো কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা আপত্তি ছিল না তাঁর সমকালীন সময়ে। এক বাক্যে সবাই তার স্বীকৃতি দিতেন। এমনতর ইলমের খনি হওয়া সত্তেও তিনি কিতাব মুতালায়া করতেন সব সময়। জীবনে বহুবিধ ব্যস্ততার ফাঁকেও কিতাব নিয়ে মগ্ন থাকতেন। নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত বিশাল আকৃতির কুতুবখানাই তার প্রদীপ্ত উদাহরণ। এমনকি আমরা যখন তাকে অসুস্থতায় দেখতে যেতাম, এমন অবস্থা যে নিজে কিতাবখানা তুলে ধরতে অক্ষম, সে সময়ও পার্শ্বে থাকা ব্যক্তিটি কিতাব ধরে রাখছেন আর মুহাদ্দিস ছাহেব তন্ময় হয়ে তা পাঠ করে যাচ্ছেন। এমন নমুনা আমরা বহুবার দেখতে পেয়েছি। এ থেকেই বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, তিনি কেমন করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুতুবখানার কিতাবগুলো পাঠ করেছেন। শুনেছি, কুতুবখানায় সাজানো কিতাবগুলোর প্রতিটি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রয়েছে এ মহামনীষীর মোবারক হাতের চিহ্ন।

দশ

মানুষের প্রতি মুহাদ্দিস ছাহেবের যে কতো মহব্বত ছিল তা আমার মতো ক্ষুদ্র একজন মানুষ বারবার বুঝতে পেরেছি। মুহাদ্দিস ছাহেবের নিকট থেকে খাস দোয়া নেওয়ার জন্য বা তিনির ছাহেবজাদাগণের প্রায় সবার সাথে আমার আন্তরিক সম্পর্ক থাকার সুবাদে যখনই আমি হুজুরের বাড়িতে গিয়েছি, খাবার সময় হলেই খেয়েছি।

হুজুর আমাকে পাশে বসিয়ে নিজ হাতে পরিবেশন করে খাইয়েছেন। আমার সাথে পরিচয় আছে এমন মানুষদের খোঁজখবর নিতেন। বিশেষ করে পরিচিত শিক্ষিত বেকার লোকদের জন্য আফসোস করে আমাকে ওদেরকে কোন কাজ পাইয়ে দিতে সহযোগিতা করার জন্য দেখা হলেই বলতেন। জামাতের সহিত নামায আদায় করতে হুজুর ফজর হলে ছেলেদের দরজায় কড়া নাড়তেন এবং ঘুম থেকে তুলে নিজ ইমামতিতে জামাত কয়েম করতেন। আমি অসংখ্য রাত থেকেছি এবং এসব নিজ চোখে অবলোকন করার সৌভাগ্য হয়েছে।

এগারো

মুহাদ্দিস ছাহেবকে আল্লাহপাক এমন চিন্তাশক্তিও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করেছিলেন, তা একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে কিছুটা উপলব্দি করা যায়। যেমন মসলকের ভিতরে বাহিরে অনেকের এই ধারণা ছিলো যে, ছাহেব কিবলাহ (রহ.) এর ইন্তেকালের পর এ মসলকের মানুষগুলো ছাহেব কিবলাহর খলিফাগণের মাধ্যমে বহুধা বিভক্ত হয়ে যাবেন। প্রত্যেক খলিফাই নিজ নিজ মুহিব্বীন-মুরীদিন নিয়ে ব্যস্ত থেকে আপন আপন পথ আবিষ্কার করবেন। এই দুর্ভাবনায় চিন্তাশীল অনেকেই অনেক সময় চিন্তামগ্ন থাকতেন। কিন্তু না, আমরা দেখলাম মুহাদ্দিস ছাহেব ছাহেব কিবলাহর ইন্তেকালের মাত্র কয়দিন পর যে ঈসালে সাওয়াব মাহফিল হয়েছিলো তাতে ছাহেব কিবলাহর সকল খলিফাগণকে সাথে

নিয়ে ছাহেব কিবলাহর বড় ছাহেবজাদা হযরত আল্লামা বড় ছাহেব কিবলাহর হাত মোবারকে পুনরায় বাইয়াত গ্রহণ করলেন। এর মধ্য দিয়ে চিন্তাগ্রস্থ মানুষেরা খুব সহজেই চিন্তামুক্ত হলেন এবং ফুলতলী মসলক আপন গতিতে এগিয়ে চললো। এ ঘটনায় মুহাদ্দিস ছাহেবের বিনয় ত্যাগ ও কুরবানী এককথায় স্বীয় মুর্শিদ কিবলাহর প্রতি আনুগত্যের বিরল দৃষ্টান্ত শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বারো

ছাহেব কিবলাহ ইন্তেকালের পর আমরা ছাহেবজাদাগণের সাথে মুহাদ্দিস ছাহেবকে পেয়ে কিছুটা সান্তনা পেতাম। ছাহেবজাদাগণও মুহাদ্দিস ছাহেবকে অতুলনীয় মুহব্বত করতেন। মুহাদ্দিস ছাহেব এর বিগত ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে আল্লামা বড় ছাহেব কিবলাহ অত্যন্ত আবেগ ভরে বলেছিলেন- 'আমাদের সামনে জটিল কোন বিষয় আসলে মুহাদ্দিস ছাহেবের শরনাপন্ন হলে তা পানির মতো সহজ হয়ে যেতো'।

এভাবে হাজারো স্মৃতি রয়েছে হৃদয় কন্দরে। আমার মতো ক্ষুদ্র প্রাণী মুহাদ্দিস ছাহেবকে দেখে বোঝার মতো দিল-চোখ কতটুকুই বা আছে। আল্লাহর কাছে শুধু তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির দোয়া করছি এবং তাঁর রূহানী ফয়েজ যেন ভাগ্যে নসীব হয় মহান আল্লাহর কাছে করজোড়ে এই ফরিয়াদ।

লেখক: উপাধ্যক্ষ, হযরত শাহচান্দ শাহকালু ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসা, মিয়ারবাজার, বিশ্বনাথ, সিলেট।

অন্তরে গাঁথা স্মৃতি

হাফিয মাওলানা কয়েছুজ্জামান

যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে আল্লাহপাক যুগে যুগে তাঁর দ্বীনের ঝান্ডাকে উঁচু রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন উস্তাযুল উলামা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেব রাহিমাহুল্লাহ। আমি বিশ্বাস করি একজন নায়েবে নবী হিসেবে উনার দায়িত্ব যথাযত ভাবে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। হাদীসে নববীর একজন খালিস খাদিম হিসেবে হুজুরকে খুব কাছে থেকে দেখেছি অন্ততঃ ৩৫/৪০ বছর। অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় এ মহান ব্যক্তির সান্নিধ্য পেয়ে নিজেকে চরম ধন্য মনে করছি।

যতটুকু মনে পড়ে, মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সাথে প্রথম পরিচয় ১৯৮৪ সালে। সেসময় আমি সিলেট কুদরত উল্লাহ মাদ্‌রাসায় হিফয পড়ছি। আমার লজিং ছিলো আলহাজ আব্দুল খালিক সাহেবের সুবহানী ঘাটের বাসায়। হুজুর সফর থেকে ফেরার পথে এখানে কিছু রেস্ট করলেন। নিরিবিলি পরিবেশে অল্প সময়ে হুজুর আমাকে অতি আপন করে নিলেন। লেখাপড়ার পাশা পাশি পরিবারের ভাই বোনসহ সব খবর জানলেন। আমিও হুজুরের কাছে জিজ্ঞেস করলাম হুজুরের সন্তানাদি কয়জন। হুজুর আমারমত করে উত্তর দিলেন। বললেন, বড় ছেলে হেলাল সপ্তম শ্রেণিতে পড়েন। এর আগে হুজুরকে বিভিন্ন মাহফিলে দূর থেকে দেখেছি তবে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি।

আমি জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হই পরের বছর। শ্রদ্ধেয় চাচা আবদুল খালিক সাহেব পরামর্শ দিলেন হুজুর বাসায় আসলে যেন খুব ভাল করে অসুস্থতার কথা বলি। হুজুর দোয়া করলে সেরে যাবে। ১/২ দিনের মধ্যে বাসায় হুজুর তশরীফ আনলেন। হুজুরের সে সময়কার সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল হামিদ লাল ভাইকে অনুরোধ করলে তিনি অন্য রুমে গিয়ে আমাকে সুযোগ করে দিলেন। একান্তে পেয়ে আমি হুজুরের দুই পায়ে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দেই। হুজুর আমাকে উনার বুকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করলেন। যারপর নাই মনে প্রশান্তি পেলাম। হুজুর একটি বনাজী ঔষধ বলে দিয়েছিলেন। আমি সুস্থ হলাম। আমার পুরো মাথাটা সেদিন হুজুরের বুকে অনেকক্ষণ ছিল। এই ফিলিংসটা আজো আমি অনুভব করি।

১৯৮৫ সালের রামাদান মাসে সুবহানীঘাট মাদ্‌রাসায় দারুল কিরাতে আমি রাবে জামাতের ছাত্র। হুজুর ছিলেন নাজিম ও প্রধান ক্বারী। চাচা আব্দুল খালিক সাহেবের বাসায় পুরো মাস হুজুর তশরীফ রাখলেন। এই সুবাদে পুরো রামাদান মাস রাত-দিন আমাদের ছিলো উৎসবমুখর। সবচেয়ে আনন্দের সময় ছিল তারবীর নামাযের পর থেকে ফজর পর্যন্ত। এ সময় হুজুর উনার জীবনের নানা ঘটনা বলতেন। অনেক শিক্ষনীয়

কাহিনী বলতেন। এতে একদিকে থাকতো অনেক বাস্তবমুখী শিক্ষা অপরদিকে হাসি আনন্দ। আমরা ৭/৮ জন সব সময়ই তারাবীর পরের সময়ের জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় থাকতাম।

হুজুর যখন ক্লাশে যেতেন আমাদের ছোট-খাটো বিষয়েও খেয়াল করতেন। একদিন ক্লাশে হুজুর আমাকে বললেন, দুই হাঁটু ক্লোজ করে বসতে। আমি বেশ কিছুটা লজ্জা পেলাম। ঐ দিন বিকেলে চাচা খালিক সাহেবের সামনে হুজুর বললেন, আপনার কয়েছকে আজ ক্লাশে বসার নিয়ম শিখিয়েছি। ডেস্ক-বেঞ্চে বসার আদব সেদিনই শিখলাম। আমরা ইফতার মাহফিলের আয়োজন করলাম। আছর পরে হুজুর আমাদেরকে অফিসে ডেকে নিয়ে মাহফিলের প্রস্তুতি সংক্রান্ত সকল খবর জানলেন। আমাদেরকে ইফতার বণ্টনের পদ্ধতি বলে দিয়ে এতটুকু সাবধান করে দিলেন যেন পিরিচ আর চামচ একটি আরেকটির সাথে লেগে আওয়াজ না হয়।

১৯৮৮/৮৯ সালে আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ বেশ অসুস্থ হওয়ায় আমাদের মত অনেকে খুব চিন্তিত ছিলেন। তালামীযে ইসলামিয়ার তৎকালীন সভাপতি মাওলানা আব্দুন নূর সাহেব সহকর্মী কয়েকজনকে নিয়ে পরামর্শ করলেন যে, ছাহেব কিবলাহর হাতে আমরা বাইয়াত গ্রহণ করব। দুই একজন বললেন প্রতি সপ্তাহে জুমুআর নামাযের পর তো ছাহেব কিবলাহ বাইয়াত করান, আমরা হামেশা সেটায় শরীক হই, নতুন করে আবার দরকার আছে কিনা? আরো ২/১ জন বললেন, আমরা ছাত্র মানুষ বাইয়াত গ্রহণের সময় এখনো হয়নি। সংগঠনের দায়িত্বশীল হিসেবে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাব। পিরাকী শুরু করে দিলে আন্দোলন করবে কে? আবার কেউ কেউ বললেন, আমাদের বয়স কম, বাইয়াত গ্রহণের পর যদি আবার কোন গুনাহ করে ফেলি তাহলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হব। বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনার পর কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হচ্ছে না। একজন প্রস্তাব করলেন মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর আজ সিলেট আছেন, বিষয়টি হুজুরকে জিজ্ঞেস করা যাক। সবাই একমত। সুবহানীঘাট মসজিদে হুজুর মাগরিবের নামাযে তশরীফ আনলেন। নামায শেষে আমরা সবাই মসজিদের ভিতরে একান্তে হুজুরকে পেলাম।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে আমি ভাল করে প্রস্তুতি নিয়ে গেলেও কেন জানি ঠিক মত বলতে পারতাম না। হুজুর আমাদের দিকে ফিরে বসলেন। সবাই নিরব। কেউ কিছু বলছেন না। মাওলানা আব্দুন নূর সাহেবের দিকে তাকিয়ে হুজুর বললেন, 'মাওলানা আব্দুন নূর কোনতা কইতায় লাগের।' নূর ভাই দুই হাত জোড় করে বললেন, জ্বি হুজুর, "বয়ত করার পরে কোন গুনা করলে কোনতা অইব নি?" আমরা ২/৩ জন মুখে হাত দিয়ে হাসি থামালাম। আমি নিশ্চিত হলাম যে, হুজুরের কাছে কিছু বলতে না পারার সমস্যা শুধু আমার একার নয়। যাহোক হুজুর আমাদের অন্তরের ভাষা ভাল করে

বুঝে ৩০ মিনিটের মত আলোচনা করলেন। আমাদের সিলসিলা এবং ছাহেব কিবলার পরিচয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছাহেব কিবলাহর নিগুঢ় রূহানী সম্পর্ক ইত্যাদি। আমরা সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম। পরিবেশ এতটাই আবেগঘন হয়েছিলো যে, সবাই কান্না করছেন। এক পর্যায়ে কান্না থামিয়ে হুজুরকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন আমাদেরকে ছাহেব কিবলার খেদমতে নিয়ে যান।

আমি লন্ডনে আসার পর পপলার সেন্ট্রাল মসজিদে তারাবীর নামায পড়ায়ে কিছু হাদিয়া পাই। আমার শ্বশুর মরহুম হাজী রজব আলী সাহেব প্রস্তাব দিলেন আমার আব্বাকে এই টাকা দিয়ে যেন হজ্জের ব্যবস্থা করি। বিষয়টি নিয়ে আমি বেশ চিন্তায় পড়ে যাই। কারণ আম্মা আব্বা দুই জনকেই হজ্জে পাঠাতে চাচ্ছি। তাদের সুবিধার জন্য আমাকেও সাথে যেতে হবে। কিন্তু তিন জনের ব্যয় নির্বাহের সামর্থ আমার নেই। তখন মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর লন্ডন সফরে ছিলেন। হুজুরের খেদমতে গিয়ে বিস্তারিত বললাম। হুজুর খুব মনযোগ সহকারে শুনে পরামর্শ দিলেন- কয়েছ কষ্ট করে যদি মা বাবা দুই জনকে নিয়ে যেতে পার, আর তারা খানায়ে কাবার দিকে চেয়ে একবার যদি বলেন আল্লাহ! আমার ছেলে এতো কষ্ট করে আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে। এর চেয়ে বেশি তুমি কি চাও। হুজুরের খাস দোয়া চেয়ে আমি চেষ্টা শুরু করি। আলহামদুল্লিাহ, আমার টাকা পয়সায় এমন বরকত হলো যে, মা বাবাকে নিয়ে হজ্জের সফর শেষ করে ফিরে আসার পরও আমার কাছে অনেক টাকা উদ্ধৃত থাকে। এই সফরটি ছিল আমার জীবনের এক স্মরণীয় ও বরকতময় সফর। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর, বড় ছাহেব, মাইজম সাহেব, সুবহানীঘাট মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল সাহেব, ছোট সাহেব, মাওলানা আব্দুন নূর সাহেব, মরহুম মাওলানা ছালিক আহমদ সাহেবসহ অনেক সম্পর্কিত উলামায়ে কেরাম এই কাফেলায় ছিলেন। পুরোটা সফরে হুজুর আমাদের প্রতি কি পরিমাণ খেয়াল রেখেছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। যারা হুজুরের সাথে সফর করেছেন, তাদের অজানা নয়, হুজুর সফর সঙ্গীদের কিভাবে খেয়াল রাখতেন।

হুজুরের সাথে সফরে গেলে গাড়ীতে বা কোথাও একা হলেই আমি কিছুটা ভয়ে ভয়ে থাকতাম। হুজুর কোরআন শরীফের আয়াত জিজ্ঞেস করতেন এটি কোন পারায়? মানুষের সামনে জিজ্ঞেস না করার কারণ পরে বুঝেছি, সঠিক উত্তর দিতে না পেরে যদি লজ্জা পাই।

লন্ডনে হুজুর যখন তশরীফ রাখতেন আমার সৌভাগ্য হতো মাঝে মধ্যে হুজুরকে গাড়ী দিয়ে বিভিন্ন মাহফিলে অথবা দাওয়াতে নিয়ে যেতাম। আমি যত বেশি চেষ্টা করে সময়ের আগে হুজুরের খেদমতে গিয়ে হাজির হয়েছি, সামনে যাওয়ার পরে মনে হত দেরী হয়ে গেছে। হুজুর সময়ের এত গুরুত্ব দিতেন।

একবার হুজুর লন্ডন থেকে দেশে যাবেন। বিকাল ৬টায় বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট।

সকাল ৯টার গিয়ে দেখি হুজুর একেবারে পুরো প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। হুজুরের এই নীতির গুরুত্ব সে দিন খুব ভাল করে অনুভব করেছি, যে দিন আমার ঘর থেকে ২০ মিনিটের দূরত্বে সিটি এয়ারপোর্ট থেকে হল্যান্ডের ফ্লাইট আমরা মিস করি।

হুজুরের সাথে সর্বশেষ সাক্ষাতের স্মৃতি মনে পড়লে এখনো কাঁদি। মাওলানা আব্দুন নূর সাহেব আমেরিকা থেকে দেশে গিয়েছিলেন। আমিও ফ্যামিলি নিয়ে দেশে। নূর ভাইর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ১৫ জানুয়ারি সাহেব কিবলাহর ঈসালে সাওয়াব মাহফিলের দিন সকালে একসাথে হুজুরের বাড়িতে যাই। অনেক কিছু বলতে পারিনি হুজুরের মন দূর্বল হয়ে যাওয়ার ভয়ে। তবুও ক্ষমা চাইলাম অনেক ভুলের জন্যে। বিশেষ করে তালামীযের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে আমাদের কারণে হুজুর অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বিরূপ পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলেন। হুজুরের স্মৃতিশক্তি তখনো চমৎকার ছিল। আমাদের সাথের সকলের হাল অবস্থা ভাল করে জিজ্ঞেস করেছেন। অশ্রুসজল নয়নে শেষ বারের মত চাঁদ মাখা চেহরার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিদায় নিলাম। হেলাল ভাই আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন পাশের রুমে। সেখান থেকে শুনলাম হুজুর বলছেন, "আল্লাহ আমার ইতারে আর দেখমুনি"! এই ছিলো শেষবারের মত হুজুরের জবান শুনা।

হুজুরের অসংখ্য স্মৃতি আমার জীবনে আলোকবর্তিকা হয়ে আছে। উনার সীমাহীন এহসান আমাদের পশমে পশমে। হুজুরের মত মহান ব্যক্তিত্বের আলোচনা আমি অধমের পক্ষে অসম্ভব। রাব্বুল আলামীন যেন হুজুরের দরজা বুলন্দ করেন।

লেখক: প্রেসিডেন্ট, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে গ্রেটার লন্ডন ডিভিশন।

বাল্য স্মৃতির আয়নায় উস্তাযুনাল মোকাররাম মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ

উপাধ্যক্ষ মাওলানা মো. আব্দুল জলিল

উপমহাদেশের ক্ষণজন্মা হাদীস বিশারদ, উস্তাযুনাল মোকাররাম, আশিকে রাসূল আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর আমার জীবনের জীবন্ত আয়না স্বরূপ। কারণ জীবনের সূচনা লগ্নে অর্থাৎ, সেই বাল্য বয়স থেকেই আশিকে রাসূল, হাদিয়ে জামান, তরিকার প্রখ্যাত বুযুর্গ, হাদীসে নববীর আমরণ খাদিম আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সোহবত লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। পরিচিত মহলে আমাকে অনেকেই মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের ঘরের মানুষ বলে ভাবতেন। উচ্চ মাকামের অধিকারী আল্লাহর মহান ওলীর স্মৃতিচারণে আবেগের তাড়নায় আমি কিছু লিখতে অপারগ। কারণ এ বিষয়ে আমার সাহস অত্যন্ত দুর্বল এবং ভয় ও অযোগ্যতা আমার উপর রাজত্ব কায়েম করে আছে। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের মত মহান বুযুর্গের একান্ত সোহবত লাভ করার পরও আমার ভাগ্য আমাকে অনেক অনেক পিছিয়ে রেখেছে। জীর্ণ শীর্ণ মরুভূমির মরিচিকায় সাঁতার কাটা, শত পিচ্ছিল পথচলায় অযোগ্য অধম আমার রাহবরের কোন আমানত, কোন আদর্শ ধরে রাখতে পারিনি। তাই বলে আমি নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত। তবুও মনের তাকিদ ও বাল্য বন্ধু মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরে বড় ছাহেবজাদা বহু প্রতিভার অধিকারী প্রিয় হেলাল ভাইয়ের তাগিদে তাড়িত হয়ে অযোগ্য হাতে হুজুরের রূহানী ফয়েয লাভের আশায় সামান্য কিছু বাল্য স্মৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

হুজুরের ঘরে আমার লজিং

আমি যখন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র, নিজ গ্রাম ঘেচুয়া প্রাইমারি স্কুলে পড়ি। বছরের মাঝামাঝি সময়ে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর প্রথম জামানার কেরাতের ছাত্র, আমাদের দাদা মরহুম কারী ইমতিয়াজ আলী ছাহেব আমি ও আমার চাচাত ভাই বদরুল আলমকে নিয়ে মাওলানা কারী আব্দুল লতীফ খাদীমানী ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পরিচালিত থানাবাজার লতিফিয়া ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি করে দেন। এ মাদ্‌রাসাটিতে তখন ইলমে কিরাতের পাশাপাশি ইবতেদায়ী পর্যায় পর্যন্ত পড়ানো হতো। থানাবাজার মাদ্‌রাসা আমাদের বাড়ি থেকে আড়াই তিন মাইল দূর। আমরা দুই চাচাত ভাই নিয়মিত মাদ্‌রাসায় যাতায়াত করতে লাগলাম। থানাবাজার মাদ্‌রাসার তখনকার অংক শিক্ষক ও স্থানীয় পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার মরহুম সাজ্জাদ স্যার এতদূর থেকে আমাদের আসা যাওয়ার কারণে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন। প্রায়ই বলতেন, এতদূর পথ আসা যাওয়ায় তোমাদের কষ্ট হয় না? আমি নিরব থাকতাম, বুঝতাম স্যার আমাকে অনেক স্নেহ করেন। যাইহোক, পরীক্ষার সময় হলো পরীক্ষা

দিলাম। পরীক্ষায় প্রথম হলাম। এতে মাদ্‌রাসার শিক্ষকগণের নজরে করম লাভ করলাম। হঠাৎ একদিন স্যার আমাকে ডেকে পাঠালেন পোস্ট অফিসে। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি লজিং থাকবে? জবাব দিলাম, থাকব। সেই সাথে এও বললাম, স্যার আমার পরিবার অভাবী, লজিং হলে আমার জন্য ভালো হয়। সপ্তাহ খানেক পর স্যার আমাকে নিয়ে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বাড়িতে লজিং দিলেন। বাল্য বয়সের লজিং! তখন আমি চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে খুবই উৎসাহের সাথে পড়ছি। মরহুম সাজ্জাদ স্যারের দেয়া মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বাড়িতে লজিং আমার জীবনে কতবড় নেয়ামত ছিল তখন তা না বুঝলেও এখন বুঝি, হতভাগার ভাগ্য কত ভালো।

হুজুরের নিকট প্রথম সবক

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর তখন সংযুক্ত আরব আমিরাতের উম্ম আল কুওয়াইন আদালতে বিচারক। আমার সৌভাগ্য যে, হুজুরের বাড়িতে লজিং হওয়ার ৩/৪ মাসের মধ্যে তিনি দেশে আসেন। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের মমতাময়ী আম্মা আমাদের দাদীজান তখনও জীবিত আছেন। ঘরের ছোটরা সবাই তাঁকে দাদী না ডেকে দাদা বলে ডাকত, আমিও দাদা বলে ডাকতাম। ইতিমধ্যে আমি দাদার মায়ার মধ্যে ঢুকে গেছি। সন্ধ্যার পর হুজুরের সন্তান ছালমা, ফয়সাল ও খালেদ এই তিন জনকে নিয়ে পড়তে বসতাম। যতটুকু সম্ভব তাদের পড়ায় সাহায্য করতাম। তখন তারা বয়সে অনেক ছোট। বাকি সময় হুজুরের পূর্বের বাংলা ঘরে আমার পড়া আমি পড়তাম। দাদার ঘরে দাদার বিছানার পাশে বড়ো বড়ো দুটো চৌকি জোড় ভাবে রাখা ছিল। এই চৌকিতে বসে আমরা খাবার খেতাম। আমি দেখতে ছোট ও কালো ছিলাম। একদিন শুনলাম হুজুর উনার আম্মার কাছে আরজ করছেন, মাই ই হুরু মেছাবে আমার ইতারে কিতা পড়াইবা। কিতা দেখিয়া এনরে রাখছ (এই ছোট হুজুর এদেরকে কী পড়াবে, কি দেখে তাকে রেখেছেন।) দাদাজান বললেন, দেকিয়ার তো ভালাউ পড়াইত পারের (দেখছি তো ভালোই পড়াচ্ছে)। এর একদিন পর হুজুর ইশার নামায পরে উনার রুমে আমাকে ডেকে নিয়ে মিজানুস সরফ থেকে প্রশ্ন করলেন, আমি উত্তর দিলাম। পরে আমাকে ইসমে আলা পাঠ বুঝিয়ে দিলেন। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের মহব্বতের এ সবক আমি গ্রহণ করলাম। বললেন, ভালো করে পড় এবং আমার এখানে থাকো। এই যে আমার প্রথম লজিং এবং হুজুরের কাছে প্রথম সবক, এ জীবনে এগিয়ে যাওয়ার আলোক বর্তিকা হিসেবে আজো কাজ করছে।

খাওয়ার আদব

হুজুরের অভ্যাস ছিলো বাড়িতে থাকলে ঘরের সব পুরুষ এবং মেহমান থাকলে খাওয়ার সময় সবাইকে নিয়ে একসাথে খেতেন। আমি তো খুব ছোট, মাত্র পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। হুজুর তাঁর ছেলে সন্তানদের সাথে আমাকেও নিয়ে রাতে খেতে বসতেন। খাওয়ার আগে

ইশার নামায জামাতে পড়তে হতো। কোন কারণে কেউ জামাতে শরীক না হলে জবাবদিহি করতে হতো। হুজুরের সন্তান মো. আবদুল আউয়াল হেলাল, মো. আবদুর রব বিলাল ও আমি হুজুরের সাথে খেতে বসলে হুজুর আমাদেরকে খাওয়ার আদাব অর্থাৎ, হজুরে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত তরিকা শিক্ষা দিতেন। বড় হয়ে সব কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত পেয়ে মনে হতো আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর কত বড়ো আশিকে রাসূল ছিলেন। হুবহু খানা খাওয়ার সব আদাব নিজে আমল করেছেন এবং আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

ঘড়িওয়ালা কলম

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর যখন বিদেশ থেকে বাড়ি আসতেন, তখন পরিবারের সকলের জন্য বিভিন্ন ধরণের সামগ্রী নিয়ে আসতেন, তাতে সমান অংশ আমারও থাকতো। একদিন সকালবেলা হেলাল ভাই (হুজুরের বড় ছাহেবজাদা, আমার প্রিয় বাল্য বন্ধু। পরবর্তীতে ইছামতি মাদ্‌রাসায় আলিম থেকে কামিল পর্যন্ত এবং এমসি কলেজে অনার্সে আমরা সহপাঠী ছিলাম) আমাকে একটি ঘড়িওয়ালা কলম দেখালেন। এ ধরণের কলমের আমার খুব শখ ছিল। কিন্তু দেশে এই কলম পাওয়া যেত কি না তা আমার জানা ছিলো না। আমি জানতাম কেবল বিদেশেই এই কলম বিক্রি হতো। হেলাল ভাইয়ের নিকট এ কলম দেখে আমার মনে হলো হেলাল ভাইয়ের আব্বা বিদেশ থাকেন, ঘড়িওয়ালা কলম তারাই পাবে। আমার আব্বা তো আর বিদেশে নয় তাই এ কলমের জন্য আফসোস করে লাভ নেই। হেলাল ভাইয়ের নিকট থেকে কলম হাতে নিলাম, হেলাল ভাই ঝাপটা মেরে নিয়ে গেল। আমি দুঃখ পেলেও কিছু বললাম না। ঠিক সে রাতেই মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর আমার হাতে একটি ঘড়িওয়ালা কলম ধরিয়ে দিলেন। বললেন, সময় দেখে দেখে লিখবে। আমি যার পর নেই খুশি হলাম। ভাবলাম আব্বা তো আব্বাই।

পুলিশের ভয়

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বাড়ি রারাই গ্রামের দক্ষিণ দিকে একেবারে পাশেই ছিলো কুশিয়ারা নদী। আর দক্ষিণ পশ্চিম কোণ ঘেঁষে মানিক পুর গ্রামের পাশে ছিলো একটি বিডিআর ক্যাম্প। আমি ছোটবেলা থেকেই পুলিশ ভয় পাই। পুলিশ আর বিডিআর এর পার্থক্য তখন বুঝি না, খাকি পোশাক মানেই আমার কাছে তখন পুলিশ। হুজুর বাড়িতে থাকলে মাঝে মধ্যে ভোরবেলা এই ক্যাম্প থেকে দুজন খাকি পোশাকধারী ব্যক্তি হুজুরের বাড়িতে এসে বসে থাকতো। প্রায়ই তারা আসা যাওয়া করতো। আমি পুলিশ মনে করে ভয় পেতাম। সেই পুলিশরা (আসলে বিডিআর সদস্য) দীর্ঘ সময় বসে বসে হুজুরের সাথে কি যেনো আলাপ করে চলে যেতো। তারা যত সময় থাকতো আমি ঘর থেকে বের হতে চাইতাম না। কিন্তু দুষ্ট পুলিশ আমাকে বের করে হুজুরের খবর নিতো। ভয়ে আমার শরীর কাঁপতো। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর আমার অবস্থা দেখে ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে

একদিন আমাকে বললেন, তুমি পুলিশ দেখে ভয় পাও বুঝি! ভয় পেয়ো না এরা আমার নিকট বিভিন্ন দোয়া কালাম শিখতে আসে। সেদিন থেকে আমি আর ভয় পাইনি।

দোয়ায়ে মাসনুনা

একদিন মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর তাঁর সংকলিত সে সময়কার লেটার প্রেসে ছাপানো দোয়ায়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফযীলত বইটি আমাকে দিয়ে বললেন, এই দোয়াগুলো মূখস্ত করে পড়বে। আমি খুব খুশি মনে বইখানা মুখস্থ করতে লাগলাম। আজও কোন দোয়া পড়তে গেলেই সেদিনের স্মৃতি আমার মন আলোময় করে। সেই ঘ্রান আমি আজো অনুভব করি। হুজুর জীবনে আরো অনেক বই লিখে গেছেন যা আমাদের জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। দোয়ায়ে মাসনুনা বইয়ে সংকলিত প্রত্যেকটি দোয়া হাদীসের বিভিন্ন কিতাব থেকে চয়নকৃত। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সময় সংশ্লিষ্ট দোয়াসমুহ নিয়মিত আমল করা সকলেরই কর্তব্য।

পরিবারের মহব্বত

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের পরিবার ইলম ও আমলে পরিপূর্ণ এক মায়াবী পরিবার। মহান আল্লাহ ও মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহব্বতের আলো জ্বলজ্বল করে জ্বলতো। বাল্য বয়সেই মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বাড়িতে লজিং থাকার বরকতে আমার চোখ খুলে যায়। আমি এক নতুন জগতের অস্তিত্ব অনুভব করি। আমার বিশ্বাস জীবন চলার পথে আজো সেই আলোতে পথ চলি। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের পরিবারের মহব্বত এতটাই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল যে, আমি আজীবন হুজুরের বাড়িতে আমার লজিং মনে করি। হুজুর আজ বেঁচে নেই, কিন্তু আমার লজিং এর দাবি সসম্মানে বহাল আছে। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের আম্মা, আমাদের দাদাজান ও হেলাল ভাইয়ের আম্মা আমাকে এত স্নেহ করতেন যে, তাঁদের আদর ও মহব্বতে আমি যে লজিং থাকি এ কথা ভুলে যেতাম, মনে হতো নিজের বাড়িতেই আছি।

লম্বা চুল

একদিন খাওয়ার সময় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর উনার আম্মাকে বললেন, মাই আবদুল জলিলরে লম্বা চুল রাখার অনুমতি তুমি দিছোনি (মা, আবদুল জলিলকে লম্বা চুল রাখার অনুমতি তুমি কি দিয়েছো)? দাদা বললেন, অততা দেখইন না বা, হুরুতার জাত (এতটা দেখতে নেই, বাচ্চা মানুষ)। খাওয়ার পর দাদাজান কিছু টাকা দিয়ে বললেন, চুল কেটে ফেলবে। আমাকে লজ্জা দেবে না। হায়রে দাদাজান! এই বয়সে এসেও চুল কাটার সময় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সেই ইঙ্গিত ও দাদাজানের স্নেহমাখা তাগিদ খুব মনে পড়ে।

বড় আপা

বাল্য বয়সে হেলাল ভাই কিছুটা চঞ্চল এমনকি বলতে গেলে কিছু উশৃংখল প্রকৃতির

ছিলেন। কিন্তু কেন জানি ওপথে আমাকে টানতেন না। আমি কিন্তু যেতে চাইতাম, আবার হুজুরের ভয়ে ফিরে আসতাম। এ সময় আমাদের ভরসাস্থল ছিলেন বড় আপা, (হুজুরের বড় ছাহেবজাদী)। আমরা যখন যা চাইতাম পেয়ে যেতাম। তবে শর্ত ছিল পড়তে হবে। এই আপার জন্য আজও দোয়া করি। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর এর তিন মেয়ে ও পাঁচজন ছেলে। রুকিয়া আপা সবার বড়। আর সবার ছোট ছাহেব খুব ছোট বেলায় ইন্তেকাল করেছেন। এই ছোট ভাইয়ের মুচকি হাসি আজো আমার চোখে ভাসে। বড় আপা একজন নিবিড় পাঠিকা ছিলেন। আম্মার তত্বাবধানে প্রচুর বই কিতাব পড়তেন।

পাঠক মুহাদ্দিস ছাহেব

সেই বাল্য বয়সে আমি মুহাদ্দিস হুজুরকে কিতাব নিয়ে সময় কাটাতে দেখেছি। কিতাব আর হুজুর যেনো একাকার। আমি হুজুরের বাড়িতে লজিং থাকা অবস্থায় ভাবতাম এত কিতাব পড়া কীভাবে সম্ভব? হুজুরের আলমারি ভর্তি কিতাব, টেবিল ভর্তি কিতাব। হুজুর যখন পড়তেন কিতাবের মধ্যে যেনো ডুবে যেতেন। চারপাশে কী হচ্ছে খেয়ালই রাখতেন না। দেখে মনে হতো এ দুনিয়ার সাথে যেনো তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।

শেষ রাতের স্মৃতি

শেষ রাতে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর উঠতেন, অজু করে পাগড়ি পরিধান করতেন, তাহাজ্জুদ নামায পড়ে ধ্যান করতেন। ফজরের সময় আমাদেরকে ডেকে তুলে মসজিদে নিয়ে যেতেন। হেলাল ভাই ও আমি পাশাপাশি দুটি চৌকিতে ঘুমাতাম, হুজুরের ডাকে উঠে যেথাম। হুজুর বাড়িতে না থাকলে ফজরের সময় আমাদের মসজিদে যাওয়া হতো না। তখন ফজর নামায পড়ে মাঝে মধ্যে ঘুমাতাম। তখনকার অপার মহব্বত ও ভয়ের স্মৃতি আজো বিদ্যমান আছে।

আমি অশেষ ঋণী

সেই বাল্যকাল থেকে আমার জীবনভর কত স্মৃতি, কত আদর, কত মহব্বত ও অবদান আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ও হুজুরের পরিবারের অন্য সদস্যগণের রয়েছে যা লিখতে বড় পরিসর লাগবে। এ জীবনে যা কিছু পেয়েছি মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের উসিলা ও দোয়ায় পেয়েছি। আমি হুজুর ও তাঁর পরিবারের কাছে অশেষ ঋণী, এ ঋণ অপরিশোধ্য।

মহান আল্লাহ তা'লা হুজুরের দরজা বুলন্দ করুন। হুজুরের পরিবার পরিজনের প্রতি রহম করুন। যারা দুনিয়ার সফর শেষ করে কবরবাসী হয়েছেন তাঁদের কবরকে জান্নাতের বাগান করে দিন। আর যারা জীবিত আছেন তাঁদেরকে সুস্থতার সাথে দ্বীনের খিদমাতে নিয়োজিত রাখুন।

লেখক: উপাধ্যক্ষ, মুকিমপুর রাশিদিয়া আলিম মাদ্‌রাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

ناموس رسالت کے عظیم پاسبان

مولانا مفتی عبد المنتقم

بنگلہ دیش کے ضلع سلہٹ کو دینی اور تاریخی اعتبار سے بجاطور پرایک مرکزی مقام ہونےکا شرف حاصل ہے، اسی سلہٹ کے نہایت مردم خیز علاقے "ذکی گنج" میں پیدا ہونے والی شخصیت، شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ(۱۳۹۱--۲۲۰۲) بلاشبہ ایک ناقابل فراموش حیثیت کے حامل بزرگ تھے، نصف صدی سے زیادہ مدت تک آپ کو خدمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی اعزاز نصیب ہوا، اس بناء پر آپ "حضرت محدث صاحب" کے معزز لقب سے ہر خاص و عام میں یکساں شہرت رکھتے تھے۔

تمام دینی علوم میں گہرائی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمہ وقتی مشغلہ، فقہی مسائل میں تحقیقی ذوق، غیر معمولی شغف مطالعہ اور بلا امتیاز سب کے ساتھ حسن اخلاق کا شیریں برتاؤ، شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اوصاف جمیلہ تھے، جن کو زبان و بیان کے قالب میں ڈھالنے کے لئے مجھے الفاظ کی تنگ دامانی اور اپنی نالائقی و کم مائیگی کا احساس شدت سے دامنگیر ہے، اللہ تعالیٰ نے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم خدمات سر انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سطح پر اجاگر کرنے اور فروغ دینے کےلئے علمی انداز میں عشق ومحبت کے جو انمٹ نقوش آپ نے مرتسم کئے ہیں ، ان کا تفصیلی جائزہ پیش کرنے کے لئے سچی بات یہ ہے کہ سبق آموز معلومات کی ایک طویل داستان سپردقلم کرنے کی ضرورت ہے، جی بھی چاہتاہے کہ اس شہسوار علم و عمل، آفتاب فن و ادب اور جامع کمالات ہستی کی عظیم خوبیوں کا پر لطف تذکرہ تفصیل کے ساتھ کرتے ہوئے مشام جان کو معطر کیا جائے، لیکن میرے لئے مقام افسوس یہ ہے کہ طویل علالت کے بعد اس وقت سفر در سفر کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے اور اپنی بے ہنگم مصروفیات کے عین درمیان زیر نظر، چند سطور ضبط تحریر میں لانے کی نوبت آرہی ہے، نالائقی تو اس پر مستزاد ہے ہی، اس لئے موبائل فون کی مدد سے حالت سفر میں لکھے جانے والے ان قلم برداشتہ الفاظ کے بارے میں مجھے یہ خوف بھی لاحق ہے کہ کہیں یہ شکستہ الفاظ اور بے ربط جملے، عظمت رسول کے ایک مستعد پاسبانکی شان میں گستاخی کا سبب نہ بن جائیں، حضرت کے علمی و عملی مقام کے بارے میں

یقیناً وہی حضرات خامہ فرسائی کے زیادہ حقدار ہیں، جو علمی صلاحیتوں سے بہرہ ور ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ لمحات فرصت سے بھی اس وقت مالامال ہیں

اپنی نالائقی، علالت اور کمزوریوں کی بناء پر مجھ ناچیز کے لئے عافیت کا راستہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں حضرت مولانا رحمۃاللہ علیہ کے وقیع علمی، تحقیقی اور عملی کارناموں کی تفصیلات میں جائے بغیر کچھ بے ساختہ اور سادہ الفاظ میں اپنےان جذبات کا بے تکلفانہ اظہار کروں، جو حضرت شیخ الحدیث صاحب مرحوم کے ساتھ ذاتی تعلقات اور نجی ملاقاتوں کے نتیجے میں میرے دل میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے حضرت کی عظیم الشان شخصیت کے بارے میں ایسی انمٹ یادیں لوح دل پر نقش کیں، جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا،

حقیقت یہ ہے کہ

میں اس مردِ درویش سے اپنے تعلق کو اِس وقت کوئی نام نہیں دے پارہ

بےشک بعض تعلق، رشتہ وپیوند کے رسمی سابقوں اور لاحقوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اُن سے ملاقات طبیعت کو نہال کردیتی تھی۔ جب بھی ملا، دل میں ایک چمنستان سا کھِل گیا، اپنائیت و محبت کے جذبات چونکہ ان کے نہاں خانۂ دل میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، اس لئے ہر ملاقات میں ان کی ذرہ نوازی اور خوئےدلنوازی کا خوشگوار تجربہ ہوتا رہا، میں جب نو سالہ قیام کے بعد مادر علمی جامعہ دارالعلوم کراچی سے وطن واپس آیا، تو حضرت والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد المصور صاحب دام ظلہ نے مجھ تک یہ مسرت بخش خبر پہنچائی کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب (محدث رارائی) نے بڑی بیتابی کے ساتھ تمہیں یاد فرمایاہے، تمہارے لکھے ہوئے ایک فتوے کو دیکھ کر تمہاری اردو زبان سے بھی وہ بہت متأثر ہوئے ہیں، تمہاری دستی تحریر کی خوشخطی دیکھ کر بھی انہوں نے بیحد خوشی کا اظہار کیا ہے اور وہ تم سے ملاقات کے لئے خواہشمند ہیں، سالھا سال کے بعد مادر وطن پہنچنے کے بعد اس

حوصلہ افزاء خبر نے میرے دل میں مسرت کی جو لھر پیدا کی، اس کا لطف بیان سے زیادہ ادراک میں ہے، میں ملاقات کے لئے موقع کی تلاش میں تھا کہ نانا جان شیخ المشایخ مولانا عبد الغفار صاحب (جو شیخ مامر خوانی رح کے لقب سے زیادہ مشہور تھے اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رح کے اجلِ خلفاء میں سے تھے) کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ مرض وفات کی حالت میں سلہٹ کے مرکزی ہسپتال میں داخل کئے گئے، عیادت کے لئے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، حضرت

محدث مولانا حبیب الرحمن رح بھی بڑے اہتمام کے ساتھ نانا جان کو دیکھنے کے لئے

ہسپتال تشریف لائے، مجھے شرم محسوس ہورہی تھی کہ خود ملنے کے لئے ابھی تک حاضر خدمت نہیں ہوسکا، اب ہسپتال میں کس منہ سے اپنا تعارف کراؤں گا؟ شرم سے پانی پانی ہوکر اپنا نام عرض کیا اور تعارف کرانے لگاہی تھاکہ حضرت نےفرمایاکہ آپ کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم ہیں، صرف اتنا بتائیں کہ اس وقت کہاں ہوتےہیں؟ اور دارالعلوم کراچی سے واپسی کے بعد اب کیا خدمت انجام دے رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ دارالعلوم کراچی سے واپسی پر استاذ مکرم، امام درگاہ مسجد سلہٹ، ولئ کامل حضرت مولانا اکبر علی صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر ان کے ادارے جامعہ قاسم العلوم درگاہ حضرت شاہ جلال رح میں تدریس اور افتاء کی خدمت پر مامور ہوں، یہ سن کر حضرت محدث صاحب نے بے پناہ مسرت اور نیک تمناؤں کا اظہار فرمایا، دعاؤں سے نوازا اور تفصیلی ملاقات کے لئے اپنے گھر آنے کی بھی دعوت دی، شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن صاحب سچ مچ اخلاص و تواضع کے ایک پیکر مجسم تھے، لندن میں مجھ ناچیز کے غریب خانے میں حضرت کی کم از کم دو دفعہ تشریف آوری ہوئی، ایک دفعہ میری نیاز مندانہ درخواست پر جبکہ دوسری مرتبہ میرے والد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد المصور صاحب مدظلہم العالی کی عیادت اور تیمارداری کے لئے ۔ یہاں یہ تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میرے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد المصور صاحب (مدیرمنتظم جامعہ اسلامیہ منشی بازار، ذکی گنج ،سلہٹ) کے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانوں پر محیط احترام اور دوستی کا گہرا تعلق تھا، اس کا ایک پس منظر بھی ہے، مختصر لفظوں میں جس کا تذکرہ امید ہے قارئین کے لئے مفید ثابت ہوگا، ہمارے علاقے

ذکی گنج (سلہٹ) کے سنجیدہ حلقوں میں

شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ناچیز کے والد محترم حضرت مولانا عبد المصور صاحب، دونوں بزرگوں کو ماشاءاللہ احترام و اعتبار کا بڑا اعلی مقام حاصل ہے،خاص طور پر ذکی گنج کے علاقے میں مختلف مقامی تنازعات کے تصفیہ اور منصفانہ حل کے لئے اگر یہ کہا جائے کہ والد صاحب اور شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غیر اعلانیہ جج کی حیثیت سے عوامی سطح پر غیر معمولی پذیرائی حاصل تھی، تو اس میں شاید کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، چنانچہ آئے دن دونوں حضرات کے درمیان باہمی تفصیلی ملاقاتیں مختلف عوامی فورم پر ہوجایا کرتی تھیں، اس دوران تفصیلی تبادلہ خیال کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا ، ان ملاقاتوں کا تذکرہ حضرت محدث صاحب باربار لطف لیکر فرمایا کرتےتھے،

ہمارے ملک کی زمینی فصلوں کے عشرو خراج کے مسئلے کے بارےمیں شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن صاحب بہت حساس رہتے تھے، اس اہم مسئلے کے بارےمیں عوام تو درکنار، اہل علم بھی عدم توجہ کی وجہ سے غفلت میں مبتلاء نظر آتے ہیں، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس اہم مسئلے کی ضروری تفصیلات بیان کرتے ہوئے بنگلہ زبان میں باقاعدہ ایک رسالہ بھی تصنیف فرمایا، بلاشبہ اس عظیم رسالہ کی تصنیف کے ذریعے تمام علماء کی طرف سے ایک فرض کفایہ اداء ہوا ہے، حضرت محدث صاحب تقریباً ہر ملاقات میں جذبۂ تشکر سے لبریز لہجے میں یہ فرمایا کرتےتھے کہ ہمارے علاقے کے طبقہ علماء میں صرف آپ کے والد صاحب (یعنی مولانا عبد المصور صاحب) واحد شخصیت مجھے ایسی نظر آئی، جو اس مسئلے کے بارے میں حساس ہیں اور ذاتی طور پر وہ شروع ہی سے عشر کی ادائیگی کا اہتمام کرتے آرہےہیں، راقم الحروف کا ناچیز خیال ہے کہ ان باتوں میں ہمارے لئے بڑا سبق پوشیدہ ہے، امت کے بے شمار سلگتے ہوئے ایسے مالیاتی، معاشرتی، اخلاقی اور ایمانی ایشوز ہیں، جو مشترکہ طور پر خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، اس کے لئے آپس میں مل بیٹھنے کا اہتمام ہمارے اکابر نے ہمیشہ کیا ہے، ایک دوسرے کا احترام ان کی سب سے بڑی خوبی تھی، آج ان خصوصیات سے ہم محروم ہوتے جارہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آج عالمی سطح پر خوفناک سازشیں عروج پر ہیں، بدترین مظالم کے سارے پہاڑ توڑے جارہے ہیں، پوری امت مسلمہ چاروں طرف سے تاریخ کے خطرناک ترین حملوں کی زد میں ہیں، ایسے میں حالات صرف وقتی اتحاد کا تقاضا نہیں کر رہے، مستقل بنیادوں پر دائمی اورمضبوط اتحاد کی مؤثر شکلیں وجود میں لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں

شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دلائل کی روشنی میں یہضروری خیال کرتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ عظمت شان اور رفعت مقام کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور عشق و محبت کے جو لازمی تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے میں یہ امت کبھی کوتاہی کا ارتکاب نہ کرے، بدعات و خرافات کی تردید لازمی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کوئی ادنیٰ آنچ نہ آنے پائے،امت مسلمہ کو عظمت و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہراہ پر گامزن رکھنے کی کوشش ہر قیمت پر جاری رکھنی چاہئے، جن بدباطن افراد کی باتوں یا طرز عمل سے مقام رسالت کی ادنی تنقیص کا کوئی شائبہ بھی نظر آتا، ایسے افراد کی علمی تردید کے لئے حضرت مولانا کی بےچینی قابلِ دید ہوتی تھی، اگر یہ کہا جائے کہ شان رسالت اور عظمت نبوت کا تحفظ اور بھرپور دفاع، حضرت محدث صاحب کی زندگی کا عظیم مشن تھا تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں

ہوگا، شب وروز احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت چرچا ان کا محبوب مشغلہ تھا، مطالعۂ کتب میں ہمہ تن مصروف رہنا ان کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی، ان کی ذاتی لائبریری میں دنیا بھر سے منگوائی ہوئی تمام علمی موضوعات کی ہزاروں کتابوں کا انبار دیکھ کر علم کی ایک چھوٹی بستی کا گمان گذرنے لگتا ہے، شوق مطالعہ کے فقدان کے موجودہ افسوسناک دور میں محدث صاحب کی عظیم الشان لائبریری کا منظر ہروقت ہمیں دعوت غور وفکر دیتا رہے گا

گاؤں دیہات کا ماحول وقیع علمی کتابوں کی تصنیف وتالیف کے لئے واقعی حوصلہ شکن ثابت ہوا ہے، لیکن حضرت محدث مولانا حبیب الرحمن صاحب نے بہت سی تحقیقی کتابیں تصنیف کرکے اپنے عمل سے یہ ثابت کیاکہ ناسازگار حالات اور ناموافق ماحول میں بھی اگر ہمت سے کام لیا جائے، دنیاوی امیدیں اگر قلیل ہوں اور مقاصد جلیل ہوں تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جاسکتا ہے،

عاجزی، انکساری ، ملنساری، وضعداری اور خوش مزاجی کے پاکیزہ اوصاف اور پُرکشش اطوار نے حضرت المحدث مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو جاودانی رفعتوں سے ہمکنار کردیاتھا، علماء کرام کے درمیان باہمی احترام کو فروغ دینے کا بہترین سبق ان کی زندگی سے ملتا ہے، بزرگوں کے نام زبان پر لیتے وقت ادب و احترام کا اسلوب کبھی انہوں نے فراموش نہیں کیا ، مثلاً میں نے کئی مرتبہ اس طرح کہتے ہوئے سنا "حضرت تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں اس طرح فرمایا"

اسی طرح ناموں کے تلفظ اور خطاب کے مختلف اسالیب میں ان کا لحاظِ ادب، مثالی ہوتاتھا، متانت اور سنجیدگی ان کی طینت تھی، کسی سے اختلاف بھی اگر کرنے کی نوبت آتی تو احترام کا دامن ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیتےتھے ، یہ اور اس طرح کی نہ جانے کتنی خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محدث صاحب کو آراستہ کیا تھا کہ آج ان کو شمار کرنا بھی آسان معلوم نہیں ہوتا، مجھ ناچیز کو جس شفقت و محبت بلکہ فراواں احترامات سے انہوں نے نوازا ہے،اس سے حضرت کی غیر معمولی شانِ تواضع کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے، حضرت محدث صاحب رح کی بڑائی اور عظمت ہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹانے کا سبق سیکھا تھا۔

آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔

محرر: سابق استاذ، دارالعلوم کراچی، مؤسس و مدیر، جامعۃ الخیر الاسلامیہ سلہٹ

অগোছালো কিছু স্মৃতি ও বেদনায় আল্লামা মুহাদ্দিস ছাব রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা রফীকুল ইসলাম মুবীন

বহু দিন আগের কথা বলছি। ভুরকি হাবিবিয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদ্‌রাসার বার্ষিক জলসায় যাওয়ার জন্য আমরা এলাকার কয়েকজন যুবক বন্ধু মনস্থ করলাম। আমাদের আকর্ষণ ছিল জলসার প্রধান অতিথি শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেবের সাথে সাক্ষাত করা। যথারীতি আমরা মাহফিল শেষে আল্লামা মুহাদ্দিস সাবের সাথে সাক্ষাতের জন্য ভুরকির মুহতামিম সাহেব মাওলানা আব্দুল মতিন র. এর বাড়িতে গেলাম যেখানে মুহাদ্দিস সাহেব বিশ্রামে ছিলেন। সালাম কুশলাদির পর আলোচনার এক ফাঁকে হুজুরকে আমার ইসলামী সংগীতের ২য় প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রাণের চেয়ে প্রিয় নবী' হাদিয়া দিলাম। হুজুর বই হাতে নিয়েই পৃষ্ঠা উল্টে পড়তে শুরু করলেন। একটা নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে গিয়ে তিনি আটকে গেলেন। আমার দিকে স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'আপনার বাড়ি কোথায়?' হুজুরের মায়াময় সেই চাহনি আমাকে বেশি করে নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখতে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর সেই নেক নজর আজও আমি ভুলতে পারিনি। সেদিন ভুরকির জলসায় হুজুর নামাযের খুশু খুজু নিয়ে স্বারগর্ভ আলোচনা করেন। আত্মার খোরাক সেই আলোচনা আজও আমার সালাত সংশোধনে সূর্যের প্রোজ্জ্বল আলোর মত আমাকে পথ দেখায়।

বুরাইয়া কামিল মাদ্‌রাসার বর্ষিক জলসায় মুহাদ্দিস ছাব হুজুর কখনো সভাপতি কখনো প্রধান অতিথির চেয়ার অলংকৃত করতেন। হুজুর যেখানেই আলোচনা করতেন সেখানে যেন রাহমাতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেক তাওয়াজ্জুহ প্রবাহমান ঝর্ণার মতো বহমান ছিল। আর আশিকজন মূল্যবান বয়ান থেকে হিরক মুক্তো সংগ্রহ করতে কার চেয়ে কে বেশি মনযোগী সেই প্রতিযোগিতা যেন দৃশ্যমান হতো।

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ র. এর প্রতি হুজুরের যে পরম শ্রদ্ধা ও অগাধ ভক্তি তা তাঁর আলোচনায় আমার ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ, আমাদের ছাহেব কিবলাহ কথাটি থেকে ভক্তবৃন্দ মুর্শিদ প্রেমে আন্দোলিত হতেন। ফুলতলী ছাহেব বাড়িতে গেলে হুজুর কী পরিমাণ বিনয়ী হতেন তা আমার ভাষায় প্রকাশ করতে ব্যর্থ হচ্ছি।

আজ যদি প্রিয় মুহাদ্দিস ছাব হুজুর বেঁচে থাকতেন তাহলে আমার এই অগোছালো স্মৃতি ও কথাবার্তা তাঁকে প্রাণভরে শুনাতাম। তাঁর দু'চোখ জুড়ে হয়তো মুক্তোর দানার মতো জল খেলা করতো। আর আমি তাঁর পবিত্র দোয়া নিয়ে ধন্য হতাম!

লেখক : সম্পাদক, মাসিক অভিযাত্রিক।

কিয়ৎক্ষণের অবলোকন

মাওলানা মোঃ আবদুল হামিদ লাল

বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এবারে ঈদের পরপর দিনও কি খতম শরীফ হবে?' বাবা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালেন। আনন্দে উল্লসিত হয়ে আরও গোটাকয়েক প্রশ্ন করলাম। বাবা তেমনি হু, হ্যাঁ করে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন। তারপর মোক্ষম প্রশ্নটি ছুড়ে দিলাম, 'বাবা! মুহাদ্দিস ছাহেব আসবেন তো? বাবা উত্তর দিলেন, ইনশাআল্লাহ অবশ্যই'। তার একটা কারণ আছে। আমাদের বাড়ির নিকটস্থ চার মহল্লার শাহী ঈদগাহ'র তখন স্থায়ী ইমাম ছিলেন জনাব মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ। নিয়ম অনুযায়ী ঈদের নামাজের পর বাড়ি বাড়ি যেয়ে কিছু সময় ব্যয় করা; আমাদের বাড়িও সে রুটিনে ছিল। তাছাড়া প্রতি বছর কোরবানির ঈদের পরদিন বাবা আমাদের বাড়িতে বিশজন আলেম জমা করে খতমে ইউনুস পড়াতেন এবং মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এতে অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন। আমি তখন এত ছোট যে, খাওয়া দাওয়ার পর্বে আমাদের সরিয়ে দেয়া হতো। যখন খতম শরীফ আরম্ভ হতো তখন থেকে টঙ্গী ঘরের সামনের রাস্তায় ঘোরাফেরা করতাম, উদ্দেশ্য কখন মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ আসবেন? যখন দেখতাম সদা প্রফুল্ল নূরানী চেহারা নিয়ে দ্রুত গতিতে তিনি আসতেছেন, তখন দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতাম এবং কাছাকাছি আসলে সালাম দিতাম, যেহেতু কদমবুসি করার সাহস হতো না। তিনি কোনদিন সালামের জবাব দিয়ে বলতেন, 'ভালো আছ তো?' এদিন সমস্ত সময় আমার পুলকিত হৃদয়ে কাটত। পক্ষান্তরে যেদিন কিছু বলতেন না সেদিন বিমর্ষ হয়ে কাটাতাম।

খুব সম্ভব তখন আমি জকিগন্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। আমার পরম শ্রদ্ধেয় আরবী স্যার ছিলেন মরহুম মাওলানা আজিজুর রহমান দুদু মিয়া। একদিন স্বপ্নে দেখলাম, তিনি হজ্জ করতে যাচ্ছেন। পরদিন স্কুলে গিয়ে তাঁর পিরিয়ডে কাছে গিয়ে স্বপ্নটি বল্লাম। স্যার অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন। বলা বাহুল্য, তখন স্যারের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা হজ্জে যাওয়ার মত ছিল না। যাক ঐ বছর ঈদের পরের দিনের খতম শরীফে স্যারও উপস্থিত ছিলেন। যোহরের নামাজের পরে মসজিদ থেকে ফিরার পথে স্যার আমার হাত ধরে মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ'র নিকটে গিয়ে বলেন, 'হুজুর আমার এ ছাত্রটি আমাকে নিয়ে ঐ স্বপ্ন দেখেছে'। হুজুর তখন সদা হাস্যময় নূরানী চেহারা আমার দিকে ফিরিয়ে স্যারকে উদ্দেশ্য করে বলেন,'মাছুম বাচ্চা স্বপ্ন দেখেছে। কোনদিন হয়তো বাস্তব হবে'। উল্লেখ্য স্যার পরবর্তীতে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করেছেন এবং একাধিক বার হজ্জ পালন করেছেন। এই স্যারেরই চেষ্টায় আমার জীবনের ধারা পরিবর্তন হয় এবং আমি নগন্য জনাব

মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ'র একান্ত সান্নিধ্য লাভ করি।

জনাব মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ কোন অভিভাবককে বাচ্চা মাদ্‌রাসায় দেওয়ার পক্ষে লবিং করতে কোনদিন শুনি নাই। বরং উনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অভিভাবকগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজ সন্তানকে উনার প্রতিষ্ঠানে মানুষ হওয়ার জন্য দিতেন। ফলত প্রত্যেক এলাকায় প্রত্যেক শ্রেণি ও পেশার মানুষের পরিবারে উনার হাতে গড়া মানুষের আজ অভাব নেই। তিনি শুধু উপদেশদাতা ছিলেন না, যা কিছু আদর্শ প্রত্যেকের পালনীয়, তা উনার নিজের জীবনে সযত্নে পালন করতেন। উদাহরণ স্বরুপ দু'একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। তিনি বলতেন কখনও খালি মাথায় শৌচাগারে যেতে নেই, অথবা জুতা খুলতে বাম পায়ের আগে এবং পরার সময় ডান পা আগে পরতে হয়। অতি সাবধানে নিরীক্ষণ করেছি। আল্লাহর ক্বসম! কোনদিন উনার নিজের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখিনি।

সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর সবার সাথে উনার ঘনিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকের অবস্থা ছিল উনার নখদর্পনে। কোন কোন সময় দেখেছি ছাতার বান্ডিল কিনে এনেছেন, বা অন্য সময় লেপ-মশারি ইত্যাদি এনেছেন। চৌকিদারকে ডেকে বলতেন, অমুক শ্রেণির অমুককে বল এখানে আসতে। কাছে এনে চুপি চুপি বলতেন, তোমার তো ছাতা নেই, এই নাও ছাতা; বা তোমার মশারী নেই, নিয়ে যাও মশারী। কীভাবে যে অবগত হতেন অমুকের লেপ নেই, তমুকের কোর্তা নেই তা আল্লাহ জানেন।

প্রথমদিকে হুজুরের একজিমা রোগ ছিল, যা প্রবাসে অবস্থানকালীন সময় থেকে আপনা আপনি বিলীন হয়ে যায়। মাঝে মাঝে এ রোগে হাত পা ফেটে যেত, এ সময় বাড়িতে প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম হত। খাওয়ার সময় কে দূর থেকে এসেছেন আর কে পাশের বাড়ির, তার বাছ-বিচার নেই। যতজন উপস্থিত আছেন সবার প্লেট রেডি। না করেও পার পেয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

আগে হুজুরের নিজস্ব গাড়ি ছিল না। তখন প্রতি বৃহস্পতিবারে বাড়ি আসতেন ও শনিবার ভোরে আবার কর্মস্থলে সার্ভিসের গাড়িতে যেতেন। এসময় যতজন আমরা উনার সাথে গাড়িতে উঠতাম, সবারই ভাড়া নিজে পরিশোধ করতেন। দূরবর্তী কোন ছাত্র বাড়ি যাওয়ার সময় বিদায় নিতে আসলে ভাড়া আছে কি না জিজ্ঞেস করতেন এবং অধিকাংশ সময় নিজ পকেট থেকে দিয়ে দিতেন। প্রবাসী অভিভাবকের বাচ্চাদের পড়ার খরচ উনার কাছে জমা থাকত। উনার প্রচুর প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট মানিব্যাগ ছিল। প্রতি জনের টাকা একেক প্রকোষ্ঠে থাকত। এমনকি নোটের উপর যার যার নাম লিখা থাকত। নোটটা পর্যন্ত পরিবর্তন হত না।

কোন ব্যক্তির নামাজের প্রতি যে অপরিসীম গুরুত্ব, আমার জীবনে আমি তা খুব কমই দেখেছি। নামাজের সময় যে কেউ সামনে থাকুক তাকে নামাজের তাগিদ দিতেন এবং

নিজেও সব কথা, কাজ বাদ দিয়ে নামাজের প্রস্তুতি নিতেন। নিজ জীবনের শেষ মুহূর্তে অর্ধচেতন অবস্থায়ও নামাজের জন্য ছটফট করতেন। সবসময়ই জিজ্ঞেস করতেন নামাজের সময় হয়েছে কি? পাশে যারা থাকতেন তাদেরকেও তাগিদ দিতেন নামাজ পড়ার জন্য।

আত্মপ্রচারে চরম বিমুখতা হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেক বড় বড় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব উনার ছাত্র ছিলেন। কোনদিন বলতে শুনি নাই অমুক আমার ছাত্র, তমুক আমার কাছে পড়েছেন। আল্লামা শুয়াইবুর রহমান বালাউটি রাহিমাহুল্লাহ উনার ছাত্র ছিলেন একথা হযরত বালাউটি রাহিমাহুল্লাহ-এর জানাজার দিন হযরত মাইজম ছাহেবের (আল্লামা নজমুদ্দিন চৌধুরী মাঃআঃ) কাছ থেকে প্রথম শুনি। আমরা প্রায় সবাই জানি যে আল্লামা ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ উনাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে ছাহেবজাদাগণের উপরও প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু কোনদিন হুজুরের মুখে শুনি নাই যে ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ আমাকে অতিশয় স্নেহ করেন বা সবকিছুতে আমাকে প্রাধান্য দেন। ওয়াজের মাহফিলে যখন যেতেন লোকেরা উৎফুল্ল হয়ে তাকবির ধ্বনি দিতেন, তিনি তখন প্রাণপণ বাধা দিতেন। লোকেরা বাধা না মানলে মোবারক চেহারায় তখন বিরক্তিভাব ফুটে উঠত।

হুজুর রাহিমাহুল্লাহ খুব বেশি পরিচ্ছন্নতা প্রিয় ছিলেন। পরনের কাপড়চোপড় সবসময় ধবধবে থাকত। সবসময় উভয় কাঁধে একটি সাদা রুমাল ব্যবহার করতেন। কখনও রুমালটি ময়লাযুক্ত হত না। প্রচুর পান খেতেন কিন্তু ওষ্ঠদ্বয় বা ঠোঁটের কোণ কিংবা দাঁত দেখে কখনও তা বোঝা যেত না। পানের পিক ফেলা বা কাপড়ে দাগ লাগা এসমস্ত কিছুই কখনও দেখিনি। আবার সামান্যতম জিনিস তিনি কখনও অবহেলা করতেন না। একবার পানে চুন লাগানোর পর আঙুলে লেগে থাকা অবশিষ্ট চুন আমি ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। তা দেখে তিনি বলেন,'মনে রেখ, কোন হালাল জিনিসকে অবহেলা করলে আল্লাহ ঐ জিনিসটি দিয়েই তোমার উপর প্রতিশোধ নিবেন'।

পরিশেষে একটি ঐতিহাসিক ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অবতারণা করছি। ঘটনাটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাওলানা আজিজুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ'র কাছ থেকে শুনা। ঘটনাটি এই, তখন মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ ফুলবাড়ি মাদ্‌রাসায় কমর্রত। এসময় সৎপুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় কামিল জামাত শুরু করা হয়। ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ তখন খুবই পেরেশান হয়ে পড়েন। কোথাও মুহাদ্দিস পদের উপযুক্ত মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ একরাতে ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ স্বপ্নে দেখলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম তাসরিফ এনে এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, উনাকে হাদীস পড়ানোর জন্য পাঠিয়ে দিন। তখন আবছা অন্ধকারে দেখলেন,

যার প্রতি তিনি আঙুল মোবারক দিয়ে ইশারা করলেন, তিনি হবিবুর রহমান (আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ)। সুবহানাল্লাহ! সুতরাং তিনি কোথা থেকে হাদীসের সনদ ও ইজাজত লাভ করেছেন, চিন্তা করে দেখুন।

এহেন মহান ব্যক্তিত্বের তিরোধান আমাদের তথা মুসলিম উম্মাহ'র জন্য কতবড় শূন্যতা তা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি তিনি যেন আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর সুযোগ্য উত্তরসুরী সৃষ্টি করে আমাদের এ শূন্যতা পূরণ করেন এবং আমরাও আমাদের বংশানুক্রমিক পরবর্তী প্রজন্মকে উনার মোবারক পদাঙ্ক অনুসরণ করে পথচলার তৌফিক দান করেন। আমিন।

লেখক: সাবেক শিক্ষক, জকিগন্জ ফাযিল সিনিয়র মাদ্‌রাসা, সিলেট। শায়খুল হাদীস ছাহেবের প্রাক্তন সেক্রেটারি।

স্মৃতির পাতায় চিরভাস্বর
শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা মোঃ ওহীদুজ্জামান চৌধুরী খছরু

সমস্ত প্রশংসা মহান রাহমান রাহীমের। যিনি অত্যন্ত দয়া পরবশ হয়ে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানবকুল সৃষ্টি করছেন। শত কোটি দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির অগ্রদুত সাইয়্যিদুল আম্বিয়া রাসুলে আকরাম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি এবং তাঁর আহলে বাইত,সকল সাহাবায়ে কেরাম, বিশ্বের সকল ওলী আউলিয়া ও আসফিয়াদের প্রতি।

বনি আদমকে হেদায়তের পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য অগণিত নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হিসেবে এ ধরায় প্রেরণ করেন আমাদের প্রিয় নবী রাসুলে আরাবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তাঁর পরে আর কোন নবী কিংবা রাসুল আগমন করবেন না। তাঁর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত নবুয়তের সিলসিলাহ বন্ধ হলেও আল্লাহ তায়ালা বেলায়তের দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন উলামায়ে কেরামগণই নায়বে নবীর সমূহ দায়িত্ব আনজাম দেবেন। মহান আল্লাহ তায়ালা শায়খুল মাশায়েখ, হাদিয়ে জামান,রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মত একজন উচুস্তরের ওলী ও মকবুল মুহাদ্দিসকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, যিনি পথ হারা বনি আদমকে দেখিয়ে দিয়েছেন হেদায়তের পথ। তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। স্থাপন করে দিয়েছেন নূরানী নিবিড় সর্ম্পক। দেখিয়েছেন আল্লাহর আদেশ ও রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতকে অনুসরণ অনুকরণ এর মাধ্যমে সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর অবিচল থেকে জান্নাতের পথে ধাবমান হওয়ার রাস্তা। সারা জীবনের দ্বীনি খেদমতের ওসিলায়, বিশেষত ইলমে হাদীসের খিদমাতের ওসিলায় আল্লাহ তায়ালা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন।

হুজুরের সাথে প্রথম পরিচয়

আমার প্রাথমিক লেখা পড়া দক্ষিণ দুবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরম্ভ হলেও কিছু দিন পর দুবাগ বাজার হাফিজিয়া ও দাখিল মাদ্‌রাসার হিফজ শাখায় ভর্তি হয়ে পবিত্র কুরআন মজিদ নজরানা পড়তে থাকাবস্থায় ১৯৮২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আমার পিতার ইন্তেকাল হয়। তখন আমার চাচা লন্ডন প্রবাসী আল্লামা মুজাহিদ উদ্দিন চৌধুরী দুবাগী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বড় ছাহেবজাদা আমার বড় ভাই লন্ডন প্রবাসী হযরত

মাওলানা মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী দুবাগী দুবাগ মাদ্‌রাসায় মেওয়ার মেছাবের কাছে কিতাব পড়তেন। পরবর্তীতে তিনি ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় চলে যান। একদিন দুবাগ মাদ্‌রাসায় এসে তিনি আমাকে ইছামতি মাদ্‌রাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার উস্তায (আকাখাজনার) বড় মেছাব এর অনুমতি চান। আমার উস্তায (আকাখাজনার) বড় মেছাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত খুশি মনে আমাকে বিদায় দেন। ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উনার সঙ্গে ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় চলে যাই। তিনি আমাকে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। তিনি আমাদের ফুফুত ভগ্নিপতি। কিন্তু ইতিপূর্বে কোন দিন হুজুরকে দেখিনি। কখনো আমরা হুজুরকে আত্মীয় হিসেবে দেখিনি বরং আমার শিক্ষা জীবনের উস্তাযগণের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের চোখে দেখেছি। আমি যেদিন ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় প্রথম যাই সেদিন হুজুর সফরে ছিলেন। পরদিন তিনি মাদ্‌রাসায় আগমন করলে মামুন ভাই আমাকে হুজুরের রুমে নিয়ে যান এবং পরিচয় করিয়ে দেন।

তখন আমার সাথে লেখা পড়া করতেন মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর বড় ছাহেবজাদা আমার ভাগ্না মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল, হযরত আল্লামা আব্দুল জব্বার গোটারগ্রামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এর দ্বিতীয় ছাহেবজাদা মাওলানা মুহি উদ্দিন ছাহেবসহ আরো অনেকেই। তবে আমরা ৩ জনই মাদ্‌রাসার ছাত্রাবাসে থাকতাম। যথারীতি বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ যখন মাদ্‌রাসায় অবস্থান করতেন তখন ফাজিল কামিলের ছাত্র বড় ভাইয়েরা হুজুরের রুমে যেতেন এবং ইলমী সহ বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করতেন। আমি তখন ছোট ছিলাম তাই ভয়ে হুজুরের রুমে যাওয়ার সাহস করতাম না। তবে মাঝে মধ্যে হুজুর আমাকে তলব করে আমার হাল কুরসী জিজ্ঞেস করতেন। তখন মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর সেক্রেটারি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ লাল সাহেব। এ সময়ে মাঝে মধ্যে মাওলানা আব্দুল হামিদ লাল সাহেব লোকাল প্রোগ্রামে আমাকে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সাথে যাওয়ার জন্য বলতেন, আমি তো মহাখুশি। হুজুরের সাহচর্য পাওয়ার আশায় যেতে লাগলাম। পরবর্তীতে মাওলানা মোঃ আব্দুল হামিদ লাল সাহেব কামিল পাশ করে মাদ্‌রাসা হতে বিদায় নিয়ে গেলেন। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত স্থায়ীভাবে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর খাদিম হিসেবে সার্বক্ষণিক খেদমতে থাকার সুযোগ লাভ করি।

সফরে হুজুরকে যেমন দেখেছি

মূলত খুব আগ্রহী হয়ে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ কোনো প্রোগ্রামে যেতেন না বরং আপন পীর ও মুর্শিদ শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশনায় মাহফিলে যাওয়া শুরু করেন। মানুষের একান্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে

বিভিন্ন মাহফিলে যাওয়ার সম্মতি জ্ঞাপন করতেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগে দেখা যায় বড় বড় অনেক বক্তার সেক্রেটারি মাধ্যমে প্রোগ্রামের সিডিউল করে থাকেন এবং বিশেষ সুবিধা পেয়ে তারিখ পরিবর্তন করে ফেলেন। কিন্তু মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর কোন খাদিম কোন মাহফিলের তারিখ দেয়া কিংবা পরিবর্তন করার কোন এখতিয়ার ছিল না। কোথাও মাহফিলের তারিখ নিতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরাসরি মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সম্মতি দিলে পরে ডায়রীতে লেখার দায়িত্ব ছিল শুধু হুজুরের খাদিমের। এর বেশি কোন কাজ করার সাহস কোন দিন ছিল না কোন খাদিমের। হুজুরের আদেশ উপদেশ মান্য করাই ছিল তাদের ব্রত। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ সর্বাবস্থায় সুন্নাতে নববীর অনুসরণ করতেন। জমা কাপড় পরিধান করা থেকে শুরু করে হাটা চলা, কথা বলা, ওঠা বসা, খাওয়া, ঘুমানোসহ সব কিছুতে তিনি সুন্নাতে নববী অনুসরণ করতেন। সকল সাথীদেরকে সুন্নাত অনুসরণের তাগিদ দিতেন। বিশেষত যারা হুজুরের যত বেশি কাছে থাকতেন তাদের প্রতি হুজুর ততবেশি সুন্নাতে নববীর অনুসরণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। কোন মাহফিলে যেতে হলে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যথাস্থানে উপস্থিতি হওয়ার চেষ্টা করতেন। সকাল বেলা মাদ্‌রাসায় ক্লাস শুরু আগেই সফরের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতেন। সফরের সময় এক বা একাধিক কিতাব সঙ্গে নিতেন। আমি যখন হুজুরের খেদমতে ছিলাম তখন হুজুরের ব্যক্তিগত গাড়ি ছিল না। লাইনের গাড়িতে করে সফর করতেন। মাহফিল শেষে যেখানে রাত্রি যাপন করবেন সেই ঘরে ১টি জায়নামায, ওজুর পানি এবং বাথরুম কোথায় আছে তা জেনে নিতেন। মাদ্‌রাসার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে লাইনের বাসে করে এসে মাহফিলে বয়ান করে রাত্রি বেলা সকল মানুষ যখন ঘুমের ঘুরে বিভোর তখন মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ আরামের ঘুম ত্যাগ করে খালিক ও মালিক রব্বে কারীমের কুরবত হাসিলের জন্য জায়নামাযে নফল নামাযে দাঁড়িয়ে শেষ রাত্রি অতিবাহিত করতেন। পাশে মসজিদ থাকলে জামাতে শরীক হতেন, নতুবা ঘরের লোকজন নিয়েই ঘরের মধ্যে ফজরের নামায জামাতে আদায় করতেন। একটু নাস্তা শেষেই মাদ্‌রাসার উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়ে যেতেন। যত দূরেই মাহফিল হোকনা কেন পরদিন যথা সময়ে মাদ্‌রাসায় উপস্থিত হয়ে পুরোদিনের দায়িত্ব আনজাম দিতেন। তাছাড়া সফরের মধ্যে একটু সময় পেলেই কিতাব পড়তেন। চলার পথে গাড়িতেও কিতাব পড়তেন। মাদ্‌রাসার আশপাশ কোথাও গেলে সাধারণত রিক্সা নিয়ে যেতেন। রিক্সায় বসে হুজুর আমাকে নাহু ছরফের মৌলিক কায়দা কানুনগুলো বুঝাতেন। হুজুরের সোহবতে দীর্ঘ দিন থেকে যতটুকু হাসিল করার ছিল তা হয়তো পারিনি।

ভারত সফর

আমি মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে ১৯৯১ সালে প্রথমবার এবং ১৯৯৩ সালে দ্বিতীয় বার ভারত সফর করি। এ সময় শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব

কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে হযরত আল্লামা বিস্কুটি ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহিও ছিলেন। করিমগঞ্জ হয়ে ভারত গিয়ে প্রথমে হযরত বদর পুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির এর মাজার শরীফ জিয়ারত শেষে বদরপুর ছাহেব বাড়িতে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির সফর সঙ্গী সকলকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে হাইল্লাকান্দি, রাতাবাড়ি, শিলচর, বিস্কুটি ছাহেব বাড়ি এবং উজানডিহি সায়্যিদ জুনাইদ আল মাদানী ছাহেব এর বাড়িতে বিশাল ইসালে সাওয়াব মাহফিলসহ আরো অনেক মাহফিলে আল্লাহর মকবুল ওলীদের সাথী হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল কেবল মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর খাদিম হওয়ার কারণে।

মুহাদ্দিস ছাহেব হিসেবে খ্যাতি ও মকবুলিয়াতের প্রেক্ষাপট

আমি দীর্ঘ দিন হুজুরের খাদিম হওয়ার সুবাদে একাধিক সূত্র এবং স্বয়ং হুজুরের বাচনিক জানার সুযোগ হয়েছে যে, সিলেট জেলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী বিদ্যাপীঠ সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায় কামিল জামাত শুরু করা হলে হাদীসের কিতাবাদী পড়ানোর জন্য উপযুক্ত উস্তায খুঁজে দেয়ার জন্য মুহতামিম ছাহেব হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহকে অনুরোধ করেন। ছাহেব কিবলাহ বিষয়টি নিয়ে পেরেশানীতে পড়ে যান। এ অবস্থায় স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীদার নসীব হয়। তখন ছাহেব কিবলাহ স্বপ্নের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে বিষয়টি পেশ করেন। নবীজি ইশারায় হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহকে দেখিয়ে বলেন, উনাকে হাদীস পড়ানোর জন্য পাঠিয়ে দিন। এই মুবারক ইশারার প্রেক্ষিতে হযরত ছাহেব কিবলাহ মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে সৎপুর মাদ্‌রাসায় পাঠান। কামিল প্রথম বর্ষে অন্যান্য কিতাব পড়ালেও মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর নিজের সালাহিয়াতের অভাব আছে মনে করে দ্বিতীয় বর্ষে বুখারী পড়াতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। এ সময় পশ্চিম সিলেটের খুব সম্ভব হাউসা এলাকায় কোন এক মাহফিলে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর সাথে দেখা বুখারী শরীফ পড়াতে নিজের অক্ষমতা পেশ করেন। ছাহেব কিবলাহ বলেন, আমি ইশারা পেয়ে আপনাকে সেখানে পাঠিয়েছি। এছাড়া আমি সিজদায় পড়ে দুআ করি আল্লাহপাক যেনো আপনাকে সালাহিয়াত দান করেন। আল্লাহর উপর ভরসা করে বুখারী শরীফ পড়াতে শুরু করুন। ছাহেব কিবলাহর হুকুম মত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর বুখারী শরীফ পড়াতে শুরু করেন। হুজুরের কাছে যারা হাদীস শরীফ পড়েছেন তারা প্রত্যেকেই একেকজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়েছেন। হুজুরের একেকজন ছাত্র দ্বারা একটি অঞ্চল আলোকিত হয়েছে। যার প্রমাণ আমাদের সকলের চোখের সামনেই আছে।

দরবারে রিসালাতের ইশারা এবং আপন মুর্শিদের দুআর বরকতে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ একজন মুহাদ্দিস হিসেবে এতো খ্যাতি এবং মাকবুলিয়াত লাভ করেছিলেন।

আমার দেখা ইছামতি মাদ্‌রাসার উন্নয়নে হুজুরের অবদান

সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলাধীন ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসাটি একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি বিদ্যাপীঠ। ১৯৪৮ সালে হযরত মাওলানা মুতিউর রহমান চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমেই তিনি হাদীস পড়ানোর মাধ্যমে মাদ্‌রাসাটি শুরু করেন। পরবর্তীতে অনান্য শ্রেণি যুক্ত হয়।

আমি যখন ১৯৮৩ সালে এই মাদ্‌রাসায় পড়তে যাই তখন বর্তমান গেইট থেকে মাদ্‌রাসা মাঠের মধ্য দিয়ে যে রাস্তা সেটি পাকা ছিল না। পশ্চিম দিকের শ্রেণিকক্ষগুলো শুধু ইট গাথুনি ছিল। প্লাস্টার ছিলো না, ফ্লোরও পাকা ছিল না। কিছু দিনের মধ্যেই মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাদ্‌রাসার ভৌত অবকাটামোর অভুতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। এলাকার সব শ্রেণী পেশার মানুষ মাদ্‌রাসার উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে হুজুরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসলেন,মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ মাদ্‌রাসার সকল চাহিদা একে একে পূর্ণ করতে লাগলেন। মাদ্‌রাসার পূর্ব দিকে বর্তমান শিক্ষক মিলনায়তন ও কামিল জামাতের ক্লাস যে দ্বিতল বিল্ডিং এ হচ্ছে তা এসময় হুজুর নির্মান করেন। আমি মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর সকল চিঠি পত্র লিখতাম। কামিল জামাতের ক্লাসরুম নির্মানের আকাঙ্খা ব্যক্ত করে লন্ডন প্রবাসী দুইজন মানুষের নিকট হুজুর চিঠি দিয়েছিলেন। প্রথমজন হলেন জনাব হাজী শামসুদ্দিন আহমদ, দ্বিতীয়জন জনাব হাজী বশির উদ্দিন সাহেব। প্রতি উত্তরে উভয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে কাজ শুরু করার জন্য হুজুরকে আশ্বস্ত করেন। পরবর্তীতে হুজুরের সাথে সম্পর্কিত আরো অনেকের আর্থিক সহযোগিতায় মাদ্‌রাসার এ বিল্ডিংটি নির্মাণ হয়। এর কিছু পরে এলাকাবাসীর পরামর্শ ও সহযোগিতা এবং দেশী বিদেশী বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে ঈদগাহের পশ্চিম পার্শ্বে মাদ্‌রাসার মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন। সেই সাথে মাদ্‌রাসার পুকুরঘাট সম্প্রসারণ, মাদ্‌রাসার উত্তর পাশে জমি ক্রয়, এমপিওভুক্তকরণ, কামিল স্তরে উন্নীতকরণ এসবের রূপকার ছিলেন হুজুর। তিনি জীবনে যখন যে প্রতিষ্ঠানে ছিলেন সে সকল প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন ছিলো তাঁর মূল লক্ষ্য।

মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর কারামত

আমাদের দেখা মুহাদ্দিস ছাহেব এর অসংখ্য অগণিত কারামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জিন্দা কারামত হলো হুজুরের শাগরিদগণকে আল্লাহ কবুল করেছেন। কাজের মানুষ বানিয়েছেন। প্রত্যেক দোয়ায় আল্লাহ তালার কাছে বলতেন, আল্লাহ আমার কাছে পড়নে ওয়ালা কোন একজন মানুষকেও বেকার বানিওনা। প্রত্যেককে কাজের মানুষ করো। এদেরকে এরকম মকবুল বানাও যেনো কাল কিয়ামতের দিন আমার হাতকড়া লেগে গেলে এদের সুপারিশে আমাদেরকে ছেড়ে দাও। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর মুনাজাতের এই আওয়াজ আজও শত সহস্র মানুষের কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তাঁর

দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন। তাঁর সকল ছাত্রকে আল্লাহ কাজের যোগ্য করেছেন। তারা দেশ বিদেশে দ্বীন ইসলামের খেদমত আনজাম দিতেছেন।

একবার মাদার বাজার মাদ্‌রাসার মাহফিলে হুজুর তাশরীফ নিয়েছেন। পরদিন মাদ্‌রাসা সুপার মাওলানা আব্দুর রব সাহেব তার নিজ বাড়িতে হুজুরকে নিয়ে গেলেন। নতুন বাড়ি করেছেন। তিনি বাড়ির পাশে একটি জমি দেখিয়ে হুজুরের খিদমতে আরজ করলেন, এই জমির মালিক জমিটি আমাকে দিচ্ছেন না। এজন্য আমি পুকুর দিতে পারিনি। তখনই হুজুর ঐ জমি খণ্ডের উপর দিয়ে হাঁটলেন। কুরআন শরীফের একটি আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, এই তামাম ভূখণ্ডের মালিক আল্লাহ। তিনি যখন যাকে ইচ্ছা তার ওয়ারিছ বানান। কয়েক মাস পর শুক্রবার দিন সুবহানীঘাট মাদ্‌রাসা মসজিদে জুমুআর নামায পড়ে হুজুর বের হচ্ছেন, এমন সময় মাওলানা আদুর রব সাহেবের ছোট ভাই এক বোতল পানি হুজুরকে দিয়ে বলেন, হুজুর আপনি আমাদের বাড়ি হতে চলে আসার পর ঐ জমির মালিক জমি খণ্ড আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। আমরা পুকুর দিয়েছি। আজ ঐ পুকুরের পানি নিয়ে হুজুরের খেদমতে এসেছি। সুবহানাল্লাহ!

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহএর ছাত্রদের মধ্যে একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন রাখালগঞ্জ ফাযিল মাদ্‌রাসার অবসরপ্রাপ্ত অধক্ষ্য মাওলানা হবিবুর রহমান ছাহেব। তিনি বড় আশা নিয়ে মাদ্‌রাসার ফাযিল জামাতের পাঠ দানের অনুমতি হাসিল করে সবক অনুষ্ঠানে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহকে প্রধান অতিথি হিসেবে দাওয়াত দেন। নির্ধারিত তারিখে সবক অনুষ্ঠান শেষে অধ্যক্ষ সাহেব হুজুরের খেদমতে জানান, তাঁর হার্টের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ডাক্তারের পরামর্শে ঢাকা হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে বাইপাস অপারেশনের জন্য টাকা জমা দিয়ে তারিখ ঠিক করে এসেছেন। তিনি খুবই কাতর কণ্ঠে হুজুরের কাছে দোয়া চাইলেন। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ দোয়ার সময় বলেন, আল্লাহ তোমার বান্দা সারাজীবন তোমার হাবীবেরর এ দ্বীনি দারসগাহের খেদমত করেছেন। এর উসিলায় তোমার বান্দার হার্টের রোগ শিফা করে দাও। অধ্যক্ষ সাহেব পরবর্তীতে জানান, বির্ধারিত তারিখে তিনি বাইপাস অপারেশনের জন্য ঢাকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু ডাক্তারগণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলেছেন হার্টের রোগ ভালো হয়ে গেছে, অপারেশন লাগবে না।

হাদীস জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর সম্পর্কে বলতে গেলে বলা শেষ হবে না। লিখতে গেলে লিখা শেষ হবে না। হুজুর আমাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত স্বরূপ ছিলেন।

আল্লাহপাক যেন হুজুরের সকল খেদমত কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফিরাদাউসে আ'লা মাকাম দান করেন। আমিন।

লেখক: মুহাদ্দিস ছাহেবের সাবেক সেক্রেটারি; উপাধ্যক্ষ, চান্দগ্রাম আনওয়ারুল উলুম ফাযিল মাদ্‌রাসা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা মুহাঃ মনিরুল ইসলাম

মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ একটি নাম, একটি ইতিহাস। বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদদের অন্যতম একজন প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ ছিলেন আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। জীবনের প্রায় ৫ দশকের অধিককাল ধরে তিনি খেদমত করেছেন ইলমে হাদীসের। দেশে-বিদেশের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে দিয়েছেন হাদীস শরীফের সৌরভ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত ইলমী ব্যক্তিবর্গের সাথে মুলাকাতের সুবাদে তিনি অর্জন করেছেন হাদীস শরীফের অনেক আলি (উঁচু মানের) সনদ। সে হিসেবে তাঁর কাছ থেকে এই আলি সনদ গ্রহণের জন্য সবসময়ই তাঁর কাছে ভীড় জমাতেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তরের আলিম, ওলামা ও ইলম পিপাসু তলাবাগণ। আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ জীবনভর হাদীসের খেদমতের সুবাদে সবাই তাকে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর নামেই ডাকতেন।

মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ সিলেটের জকিগন্জ উপজেলার রারাই গ্রামে ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এলাকার প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন মরহুম মাওলানা মুমতায আলী রাহিমাহুল্লাহ। মাতা মরহুমা আমিনা খাতুন। বংশগত দিক থেকে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশেই আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহর জন্ম হয়। শিক্ষা জীবনের প্রথম দিকে তিনি কিছুদিন স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনার পর ভারতের বদরপুর সিনিয়র মাদ্‌রাসায় গিয়ে ভর্তি হন। সেখানে কিছুদিন পড়ালেখার পর চলে আসেন কানাইঘাট উপজেলার সড়কের বাজার আহমদিয়া মাদ্‌রাসায়। মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া এখানেই সমাপ্ত করেন। আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব ছোট বেলা থেকেই অত্যন্ত প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে সড়কের বাজার মাদ্‌রাসায় থাকাকালীন পার্শ্ববর্তী প্রাইমারি স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণির জেলাভিত্তিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তিনি মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ভর্তি হন সিলেটের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বিদ্যাপীঠ গাছবাড়ি জামেউল উলুম মাদ্‌রাসায়। পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় সারাদেশের মধ্যে দ্বাদশ স্থান অর্জন করেন। একই মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৫৭ সালে ফাজিল পরীক্ষায় সারাদেশের মধ্যে তিনি তৃতীয় স্থান অর্জন করেন এবং ১৯৫৯ সালে কামিল হাদীস বিভাগে কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় বোর্ডের সম্মিলিত সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১২তম স্থান অর্জন করেন। এভাবে শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। অত্যন্ত

সফলতার সাথে তিনি ছাত্র জীবনের সমাপ্তি ঘটান।

মুহাদ্দিস হবিবুর রহমান কামিল হাদীস পরীক্ষার অল্পকাল পরেই ইছামতি দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় সহকারী মাওলানা পদে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালের এপ্রিলে যোগদান করেন সিলেটের প্রাচীনতম ইসলামী বিদ্যাপীঠ ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদ্‌রাসায়। মাত্র অল্প কিছুদিন পরে নভেম্বর মাসে স্বীয় পীর ও আধ্যাত্মিক মুরব্বী আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী র. এর নির্দেশে ঐতিহ্যবাহী সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে নিযুক্ত হন। একাধারে প্রায় ১১ বছরের মত সময়কাল ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আপন দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে নিজকে যোগ্যদের কাতারে আসীন করে নেন। জানুয়ারী ১৯৭৪ সালে ইছামতি দারুল উলূম মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৬ সালে বিশেষ কারণে আবারও তিনি সৎপুর মাদ্‌রাসায় ফিরে যান এবং সেখানে অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে সেখান থেকে চলে এসে তিনি আরব আমিরাতে গমন করেন।

আরব আমিরাতে মসজিদে খতিবের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি উম্মুল কুওয়াইন শহরে বিচার বিভাগে যোগদান করে সেখানে প্রায় চার বছর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ সালে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ উক্ত কোর্টে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। দেশে ফিরে এসে আবারও ইছামতি মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

দীর্ঘ প্রায় চার দশক ধরে মাদ্‌রাসায় খেদমতের এ সময়ে তিনি যে প্রতিষ্ঠানেই গিয়েছেন, সেখানেই যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সুনামের সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এতেই তার যোগ্যতার প্রমাণ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ কর্মজীবনে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে খেদমতের পাশাপাশি দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। ইউরোপ-আমেরিকার বহু দেশে তিনি দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে বহুবার সফর করেছেন। ১৯৮১ সালে আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ এর নির্দেশে তিনি প্রথমবারের মত যুক্তরাজ্য সফর করেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র, সিরিয়া, মরক্কো, ভারত ও মিশরে সফর করেন। বিভিন্ন দেশ কেন্দ্রিক তাঁর এই সফরে কখনও তিনি নিজে পৃথিবী খ্যাত মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেছেন, আবার কোথাও কোথাও বিভিন্ন দেশের ওলামায়ে কেরামগণও তাঁর কাছ থেকে হাদীসের সনদ নিয়েছেন। এবং বিভিন্ন দেশে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ছুটে বেড়ানোর এই ফাঁকে ফাঁকে

সান্নিধ্য গ্রহণ করেছেন জিন্দা-মুর্দা অনেক আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তিবর্গের। আবার কোন কোন সফরে আহলে ইল্‌ম ব্যক্তিবর্গের সাথে বসেছেন ইলমী আলোচনায়, তাঁর সারগর্ভ আলোচনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে ইলমী মজলিসগুলো, যাতে উপস্থিত হতেন সেদেশের শীর্ষস্থানীয় বহু উলামায়ে কেরাম।

মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন বহুমূখী ব্যক্তিত্ব। এজন্যই আমরাঁ তাকে দারস-তাদরীস, লেখালেখি, ওয়াজ-নসীহতের পাশাপাশি কখনও কখনও দেখি মানবতার কল্যানে ছুটে বেড়াতে। অসহায় দুঃখীর পাশে দাঁড়াতে। এক্ষেত্রে তিনি আপন পীরের চরিত্রটা অনেকটাই নিজের মধ্যে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। আবার কখনও তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন রাজনীতির ময়দানে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির সিলেটের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নেজামে ইসলামের মনোনয়নে তিনি তখনকার সিলেট ৭ আসনে এমএনএ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সম্মানজনক ভোট পান। ১৯৯৬ সালে আঞ্জুমানে আল-ইসলাহ মনোনীতি ও সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ সমর্থিত প্রার্থী হিসেবেও তিনি জাতীয় নির্বাচনে সিলেট পাঁচ আসনে (জকিগন্‌জ-কানাইঘাট) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সত্যি কথা বলতে তিনি ছিলেন সালাফদের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। 'খানকায় পীর ও রণাঙ্গনের বীর' কথাটি যেন তাঁর সাথে পূর্ণভাবেই মিলে যায়। দ্বীনি খেদমতের সকল দিকই তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল।

মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ একদিকে যেমন ছিলেন তুখোড় মেধাবী একজন প্রখ্যাত আলেম। অপরদিকে তিনি ছিলেন একজন তেজস্বী কলম সৈনিকও বটে। ইলমী বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রয়েছে একাধিক রচনা। এ পর্যন্ত তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী থেকে প্রায় ১৮টি গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত কিতাবগুলোর মধ্যে 'আল কাউলুল মাকবুল ফী মিলাদির রাসূল', 'দোয়ায়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফজিলত', 'মাসআলায়ে উশর ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ', 'দুরূদ শরীফের ফযীলত ও ওযীফা', 'যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারাহ', 'আসহাবে বদর', 'হজ্জ ও যিয়ারত', 'হাদিয়াতুল লাবীব ফি নাবযাতিম মিন সীরাতিন নাবিয়্যিল হাবীব', 'যখীরাতুল আহাদীসিল আরবাইঈন ফী ফাদ্বায়িলি সাইয়্যিদিল মুরসালীন', 'কানযুল আহাদিসিল আরবাঈন ফি মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যীল আমীন', 'তুহফাতুল লাবীব বি আসানিদিল হাবীব', 'দালাইলুল খায়রাত' ইত্যাদি গ্রন্থগুলো অন্যতম।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ ইলমী বিভিন্ন বিষয়ে যেমনি রচনা করেছেন বিষয়ভিত্তিক কিতাব, অপরদিকে যুক্ত থেকেছেন একাধিক পত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনার দায়িত্বে। ১৯৯১ সালে জানুয়ারি মাসে তাঁর সম্পাদনায় সিলেট শহর থেকে

'মাসিক শাহ জালাল' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বল্প সময়ে পত্রিকা সিলেটে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ কর্মজীবনে যেমনিভাবে বহু প্রতিষ্ঠানে খেদমত করেছেন, বহু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সাথে যুক্ত থেকেছেন। তেমনি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বহু মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও এতিমখানা। আপন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশাল দৃষ্টিনন্দন মসজিদ, আলহাবিব পাঠাগার। থানাবাজার হাবিবিয়া হিফযুল কুরআন মাদ্‌রাসা তাঁরই অমরকৃর্তির অংশ।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ সংসার জীবনে চার পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের বাবা ছিলেন। ২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ মহান রবের একান্ত সান্নিধ্যে পাড়ি জমান। মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ হেসে হেসে মহান রবের দরবারে পাড়ি জমালেও শোক সাগরে ভাসিয়ে যান অসংখ্য ভক্তকুলকে। যেহেতু তিনি ছিলেন দেশ বরেণ্য প্রাচীন বহু ইলমী ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত, আল্লামা আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী র., আল্লামা মুহাম্মাদ হোসাইন সিলেটী র. সহ আরও বহু মুহাদ্দিসীনে কেরামের ইজাযতপ্রাপ্ত। সেই সুবাদে প্রায়ই বিভিন্ন উলামায়ে কেরাম তাঁর বাড়িতে হাজির হতেন তাঁর কাছ থেকে হাদীসের সনদ নেওয়ার জন্য। যে কারণে সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর অসংখ্য ছাত্র। তাঁর ইন্তেকালে সকলেই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। জানাযার সালাতে শরীক হবার জন্য ছুটে আসেন দেশ বিদেশের অসংখ্য উলামায়ে কেরাম। এক রাজকীয় বিদায়ের মাধ্যমে তাকে সমাহিত করা হয় আপন প্রতিষ্ঠিত আল হাবীব পাঠাগার ও মসজিদ কমপ্লেক্সের পাশে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কবরকে নূরে ভরপুর করে দিন। তাকে জান্নাতের মেহমানদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমাদেরকে তাঁর রূহানী দুআ ও ফায়েজ-তাওয়াজ্জুহ দ্বারা ধন্য করে দিন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

হুজুরের দেখমতে উপস্থিতি

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের পুত্র বিদগ্ধ আলেম মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল সাহেবের সাথে বেশ আগ থেকেই পরিচয়। অধমের রচিত 'মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ' গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থ মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল সাহেব লন্ডন থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। আমার ছোট বেলা থেকে একটা অনুভূতি কাজ করতো বিশেষ করে ঢাকা জামেয়া শরইয়্যিহ মালিবাগ মাদ্‌রাসাতে অধ্যয়নের সময় থেকেই সিলেটের মানুষের প্রতি কেন যেন একটা দুর্বলতা কাজ করে। কোনো সন্দেহ নাই যে এটা হযরত শাহ জালাল র. ও তাঁর সাথীদের কারণে এবং আমার তো এখনো সিলেটের অনেক মানুষ দেখলে মনে হয়, এঁরা হযরত শাহ জালাল র. এর সাথে আসা আল্লাহ ওয়ালাদের বংশধর। যাইহোক, প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল

সাহেব ও তাঁর সম্মানিত ওয়ালেদ সাহেব হুজুরের প্রতি আমার মনের শ্রদ্ধার অবস্থাটা এমনই ছিল। যদিও দেখা হয় আরো এক দেড় বছর পরে। আমি মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল ভাইয়ের কাছ থেকেই মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর সম্পর্কে আস্তে আস্তে জানতে থাকি। এরপর মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের রচিত গ্রন্থগুলোও দেখার সুযোগ হয়। সত্য বলতে কি আমি এখনো দালাইলুল খায়রাতের উপর হুজুরের কাজ করা গ্রন্থটি আমার পড়ার টেবিলের পাশেই রেখেদি। তো পরবর্তীতে মাওলানা আবদুল আউয়াল ভাই বাংলাদেশে আসলে হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হই এবং হুজুরের কাছ থেকে হাদীসের সনদ গ্রহণ করি। সিলসিলায়ে ফুরফুরা শরীফ ও মাগুরা দরবারের অন্যতম একটা দৃষ্টি ভঙ্গি হলো, আহলে হক্ব মাশরাবগুলোর মধ্যে দুরত্ব কমিয়ে আনা এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, মহব্বত ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করা। অধমও এ নীতিকে শ্রদ্ধার সাথে অনুসরণ করার চেষ্টা করি। সাথে সাথে বাতিলের সাথে কোনো রূপ কমপ্রমাইজ না করা। এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকেও এমনই পেয়েছি। বাতিলের প্রতি হুজুর কতোটা কঠোর ছিলেন, সে সম্পর্কে ছোট একটা ঘটনা উল্লেখ করে আমি এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করব। ঘটনাটা হুজুরের পুত্র মাওলানা আবদুল আউয়াল ভাইয়ের কাছ থেকেই শোনা।

হুজুরের নিজস্ব কুতুবখানাতে মাওলানা মওদুদি সাহেবের রচিত অনেক গ্রন্থ ছিল। মাওলানা আবদুল আউয়াল ভাই যেদিন ভূমিষ্ঠ হন হুজুর র. মাওলানা মওদুদি সাহেবের রচিত সব গ্রন্থগুলো নদীতে ফেলে দিয়ে আসেন। পরবর্তীতে আবদুল আউয়াল ভাই কামেল পাশ করার পর হুজুর রাহিমাহুল্লাহ আবদুল আউয়াল ভাইকে বলেন, তুমি জন্ম নেওয়ার দিন আমি মাওলানা মওদুদি সাহেবের রচিত সব কিতাব এজন্য নদীতে ফেলে দিয়েছিলাম। আমার ভয় ছিল তুমি বড় হওয়ার আগে আমি যদি মারা যাই আর তুমি বড় হয়ে আমার কুতুবখানাতে এ গ্রন্থগুলো দেখে যদি বিপথগামী ও বাতিলপন্থি হয়ে পড়ো এজন্য মাওলানা মওদুদি সাহেবের রচিত সব কিতাব নদীতে ফেলে দিয়েছিলাম। এখন তুমি আলেম হয়েছো হক্ব বাতিলের পার্থক্য করার যোগ্যতা তোমার হয়েছে এখন এ বাতিলপন্থিদের রচিত কিতাব আমার কুতুবখানাতে থাকলে কোনো অসুবিধা হবে না। তখন হুজুর রাহিমাহুল্লাহ পাকিস্তান থেকে মাওলানা মওদুদি সাহেবের রচিত কিতাবগুলো আবার ক্রয় করে আনেন। আমি নিজেও মাওলানা মাওদুদি সাহেবের রচিত কিতাবগুলো হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর কুতুবখানাতে দেখেছি।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের নিজ শায়েখগণের প্রতি ফানা হওয়াটাও অনুসরণীয়। বিশেষ করে ফুলতলী দরবারের প্রতি হুজুরের যে বিলিন হওয়া মনোভাব এটা কুরআন শরীফের ঐ আয়তটাকে স্মরণ করে দেয়। যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أصلها ثابت وفرعها في السماء এজন্য যাঁরা তার মূলকে ঠিক রাখতে পারে আল্লাহ তাআলা

তাঁদের শাখা-প্রশাখা দুনিয়াময় ছড়িয়ে দেয়। এ বিষয়টা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের পরবর্তী বংশধরগণ যত মূল্যায়ন করবে যুগের পর যুগ এর ফায়দা তাঁরা পেতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আহলে হক্ব ওলামায়ে কেরাম ও বুজর্গদের পথে চলার তৌফিক দান করুন।

লেখক: শায়খুল হাদীস, আনওয়ারুল উলুম সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া মাদ্‌রাসা, মাগুরা; বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ কিছু স্মৃতি এবং দারসে হাদীস প্রসঙ্গ

মাওলানা মো. কুতবুল আলম

ইলমে হাদীসের কিংবদন্তি মহাপুরুষ, অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও মনীষার অধিকারী, সর্বজন বরেণ্য বুযুর্গ, আলেমকুলের গৌরব (যুগের মুহাদ্দিস হিসেবে একনামে যিনি সুপরিচিত) উস্তাজুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিছিন শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহকে নিয়ে কিছু লেখার জন্য আদিষ্ট হয়ে এবং নিজের অনুসন্ধিৎসু মনোভিলাষ থেকে মনের প্রচণ্ড তাগিদে লেখতে বসে বারবার থমকে যেতে হয়েছে। এ মহামনীষীকে নিয়ে আমার মত অতি নগন্যের লেখতে অপরাগতা বাঁধার পাহাড় হয়েছে যেমন তেমনি হুজুরের প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ, তাঁর পাহাড়সম ব্যক্তিত্বের রুহানী চাহনি আমাকে আন্দোলিত করেছে। দোলায়িত মনে শেষ পর্যন্ত নিজেকে ধন্য করার ব্যর্থ প্রয়াসে কলম চালালাম।

মূলত বাল্যবয়সেই আরও অনেকের মত হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের খ্যাতি, গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়া। ছাত্রাবস্থায় কিশোর বয়সে ভালোমত বুঝতে না পারলেও মুহাদ্দিস ছাহেব যে আরও দশজনের মত একজন শুধু আলেম নন, শুধু একজন মুহাদ্দিস নন, একজন ওয়াইজ নন- এর উপরে অন্য কিছু-অন্য এক উচ্চতায় তিনি অধিষ্ঠিত- একথা কেউ বলে দিতে হয়নি। কিশোর মনেই তাঁর কথা বলার অনন্যতা, তাঁর চেহারার রূহানীয়ত এবং সর্বসাধারণের মাঝে তাঁর যে অতুলনীয় মান্যতা, সর্বোপরি তাঁর ইলম, আমল ও এখলাসের যে উচ্চতা তা আমাকে শুধু আকৃষ্ট করেনি; বিমোহিত করেছে, করেছে বিমুগ্ধ। তখন থেকেই তাঁকে চেনা, তাঁর সান্নিধ্যের অভিলাষ লালন করা, দূর থেকে ভালো লাগার তীব্র টান উপলব্ধি করা মাত্র।

১৯৯৫ সালে প্রখ্যাত ক্বারী হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ খাদিমানী রাহিমাহুল্লাহ এর কাছে খামিছ স্তর পড়তে থানাবাজার এল এফ দাখিল মাদ্‌রাসায় পবিত্র রামাদ্বানে দারুল কিরাতে ভর্তি হই। সে বছর ভাগ্যবশত হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বাড়িতে লজিং হয়। তখন আমি সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। আমি অনেকটা আহ্লাদিত হই। কিশোর মনের অজানা ব্যক্তিত্বের রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হয়! কিঞ্চিত হলেও সম্মুখ থেকে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে দেখার, সরাসরি তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার, তাঁকে উপলব্ধি করার সুযোগ হয়। একসাথে ইফতার-সেহরী খাওয়া, তাঁর আপত্যস্নেহের পরশে পুলকিত হবার, স্বাদ আস্বাদন করা ছিল আমার জীবনের এক পরম পাওয়া। প্রসঙ্গত তখন থেকে হুজুরের ছোট ছাহেবজাদা মাওলানা আব্দুল বাকী খালেদ ভাইয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া। একই বছর আমরা এক সাথে খামিছ স্তরে পড়েছি।

ছাত্রাবস্থায় কোন একসময় একটি ভালো স্বপ্ন দেখা হয়। শামছুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ ও শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুমাল্লাহ স্বপ্নের দেখায় এক সাথে ছিলেন। তখন থেকে এ দু'টি নাম, এ দু'জন মহান বুযুর্গের প্রতি আমার দুর্বলতা, তীব্র আকর্ষণ বেড়েছে দিন দিন।

সঙ্গত কারণে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ'র কাছে দারস গ্রহণের অভিপ্রায়ে কামিল স্তরে বাদেদেওরাইল ফুলতলী আলিয়া মাদাসায় ভর্তি হই। কিন্তু হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের কাছে সরাসরি হাদীসের দারস গ্রহণ করতে না পারার আফসোস থেকে যায়। পরবর্তীতে খুসুসী দারসে শরীক হবার সৌভাগ্য হয়েছে।

২০০৩ সালে কামিলে অধ্যয়নকালীন সময়ে আমি ও আমার একজন সহপাঠী হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ'র হাতে বাইআত হই এবং ২০০৮ সালে ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ'র ওফাতের পর স্বপ্নের আকর্ষণ কিনা জানি না বাধ্য হয়ে তাঁর সমীপে হাজির হওয়া এবং অনেক প্রচেষ্টার পর তাঁর হাতে বাইআত লাভের সুযোগ হয়। তাঁর দয়া উদারতা ও স্নেহের বদৌলতে হিযবুল বাহার, হিযবুল আজম ও দালাইলুল খায়রাত এর ইস্তেফাদা হাসিলের সৌভাগ্য হয়। তাঁর ইসলাহী নসিহা জীবনের আত্মশুদ্ধির নিয়ামক হয়ে থাকবে। তাঁকে যতটুকু আঁচ করতে পেরেছি মনে হয়, তিনি তাঁর অধ্যাত্মিকতা তাঁর ইলমের বৃহত্তর সীমার আড়ালে অন্তরিণ রাখতে চেয়েছেন।

তিনি প্রাতিষ্ঠানিক দারস থেকে অবসর গ্রহণের পর ইলমে হাদীসের খেদমতে নিজেকে আমৃত্যু নিয়োজিত রাখার অভিলাষ লালন করেন। সে মতে তাঁর আবেগ ও প্রচেষ্টা ছিল অকৃত্রিম ও অভাবনীয়। তিনি তাঁর বাড়িতে হাদীস শরীফের দারস চালু করেন। জকিগঞ্জ ফাজিল সিনিয়র মাদ্‌রাসার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ উস্তাজুল উলামা হযরত মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাফিজাহুল্লাহ'র নেতৃত্বে উলামায়ে কেরামের এক জামায়েত দারসে হাদীসে অংশ নিতেন। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর এর অনন্য ও অসাধারণ দারসে অংশ নেয়ার সুযোগে আমার মত অনেকেই ছিলেন পুলকিত, শিহরিত ও আপ্লুত। সাপ্তাহিক এই দারস ছিল নবীনদের জন্য পরম সৌভাগ্যের। নবীন-প্রবীন উলামায়ে কেরাম ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সাধারণ জনগণও এতে অংশ নিতেন। নতুন মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর দারস হতো মসজিদে। পুরো মসজিদ প্রায় ভরপুর হয়ে যেত।

আরবি ভাষার আরবীয় উচ্চারণ, ভাষার উপর অগাধ দক্ষতা, নাহু-ছরফ, বালাগাত-মানতিক, ফালসাফা, মাজহাব-মসলক সংক্রান্ত জটিল বিষয়ের তাহকীকে সমৃদ্ধ দারস ছিল নিয়মিত অংশগ্রহণকারীদের জন্য এক অমীয় সুধাপানের সুযোগ। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কেউ দারসে অনুপস্থিত হতে চাইতেন না। সাধারণত বিতর্কিত মাসয়ালাগুলো তিনি অপাত্রে বলতেন না কখনো। দারসে হাদীসের সুবাদে আলোচনায় বিভিন্ন প্রসঙ্গ যখন আসতো, তখন সহজেই মাসয়ালাগুলোর ভারসাম্যপূর্ণ ইলমী ও

যৌক্তিক পর্যালোচনা ও মীমাংসা আমরা পেয়ে যেতাম।

দারসের শুরুতে হুজুরের পছন্দ অনুযায়ী বর্তমান সময়ের বিশ্ববিখ্যাত মুফাক্কির শায়খুল ইসলাম ড. আল্লামা তাহির আল কাদরী'র অন্যান্য হাদীস সংকলন المعارج السنن থেকে দারস দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সমকালীন ও প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিকোণে এটি ছিল দারস গ্রহণকারীদের জন্য বেশি ফায়দাকর। কিতাব খানা ৮ খণ্ডে প্রকাশিত বৃহৎ একটি সংকলন। লন্ডন থেকে হুজুরের বড় ছাহেবজাদা লেখক, গবেষক ও কবি মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল সাহেব কিতাবের ব্যবস্থা করে পাঠান। আমরা কয়েকজন সেগুলো সংগ্রহ করি।

সপ্তাহে প্রতি মঙ্গলবার বাদ মাগরিব থেকে দারসের সময় নির্ধারণ করা হয়। এ দিনে হুজুর বাইরে কোন সফর করতেন না। অসুস্থতা সত্ত্বেও দারস চালিয়ে যেতেন। বিশেষ কোন অপারগতায় কোন সপ্তাহে দারস করতে না পারলে দারস গ্রহণকারীদের কাছে করুণ সুরে কৈফিয়ত দিতেন, বুঝা যেত কত যে মনোকষ্ট স্বীকার করছেন তিনি! আসলে তাঁর এই দারসে হাদীস ছিল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত ও নিসবতপূর্ণ এক অর্পূব মজলিস। দারসে কোন অপ্রাসঙ্গিকতা ছিল না। তাঁর স্বভাব সুলভ শান্ত শিষ্ট অঙ্গভঙ্গি, মিষ্ঠ ভাষা, দরদী হৃদয়, মায়াবী চাহনী আর ইলম ও ইখলাছপূর্ণ অর্পূব ভাণ্ডারের পসরা মেলে তিনি ইলমের মহাসাগরে সাতরিয়ে চলতেন, তখন পিনপতন নিরবতা। রাতের আধারে ঘেরা পল্লীর এক নিভৃত কোণে এক আশিকে রাসুলের অশ্রুসজল ও হৃদয় বিগলিত অমীয় উচ্চারণ মদীনার সবুজ মিনার পানে ছিল উৎসর্গীত। এর নান্দনিকতা, এর ছান্দসিক আবহ, আত্মিক নির্মলতা, নিরূপণ করা সম্ভব নয়; হাদীস শাস্ত্রের পৌনে শতাব্দীর এ মহীরুহের উপলব্ধি, অনুভূতি, আবেগ, ইখলাস ও মুহব্বতের শুধু এক চিলতে ঝলক দেখা হলো মাত্র। বুঝা হলো না, হলো না উপলব্ধিও- এ সাধ্য আমার নয়।

মনেপড়ে, এখনকার ইলমী দৈন্যতা, তালাবাদের অন্য মনস্কতা দেখে বলেছিলেন, পড়ার সময়ে একটি শব্দও তাহকীক করা ছাড়া বাদ পড়েনি। সত্যি এজন্য কোন শব্দই মনে হত তাঁর নিকট অজানা ছিল না। আমাদেরকে বারবার কিতাব পড়ার, চেষ্ঠা শুরু করার তাগাদা দিতেন। একদিন কিতাব পড়ার গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলেছেন, আমার বাড়ির লাইব্রেরি তোমাদের জন্য খোলা। যখনি আসবে লাইব্রেরি কক্ষের অনুমতি লাগবে না। কিতাব নিয়ে পড়তে বসে যাবে। মাঝে মধ্যে আমাদের নিয়ে লাইব্রেরি রুমে বসতেন। কিতাব পড়া, চর্চা করা যে তাঁর আজীবনের অভ্যাস! বারবার শুনেছি তিনি আলেমদের মাসআলা বলে দিতে চাইতেন না। বলতেন কিতাব দেখো, মাসআলা পড়ো। না বুঝলে বলো, মাসআলার কোন অংশ বুঝা মুশকিল..... এই এই সমস্যা, তখন বলে দিব। এটা ছিল আলেমদের ইলম চর্চায় মনোযোগী করার একটি হিকমত মাত্র।

একবার জনৈক আলেম আরবি ইবারত বুঝতে না পারার অক্ষমতা পেশ করলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি নসীহা করলেন, পড়া শুরু করো, বাদ দিবে না, চেষ্টা অব্যাহত রাখো, ক্রমে ক্রমে ঠিক হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে তিনি বৃটেনস্থ দু'জন পরিচিত আলেমের নাম উল্লেখ করে বলেন, এক সময় তাঁরাও এমন বলতেন, কিন্তু এখন কিতাব বের করে অনর্গল পড়ে যেতে পারেন। এ রকম উদ্দীপনা প্রায়ই দিতেন।

তিনি স্থান, কাল ও পাত্র বুঝে কথা বলা, সাড়া দেয়া ও মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে ছিলেন অনন্য গুণের অধিকারী। তাঁর সান্নিধ্যে এসে মুগ্ধ হননি, ভক্ত হননি এমন কাউকে পাওয়া মুশকিল। বড় বড় আলেমদের কাছে যেমন তিনি শিরতাজ, তেমনি নবীন আলেম ও তালাবারাও তাঁর কাছে যেতে পারতেন অনায়াসেই। বাঘা বাঘা রাজনীতিবিদ ও সাধারণ উচ্চ শিক্ষিতের কাছে তিনি শুধু একজন মুহাদ্দিস বা মাওলানা হিসেবে বিবেচ্য হতেন না তাঁর উচ্চ দৃষ্টি ভঙ্গি ও সমকালীনতায় তারা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। গ্রামের সাধারণ অশিক্ষিত লোকজনও তাদের পরম প্রিয় একজন হিসেবে প্রাণখুলে কথা বলতে পারত। এককথায় সবার জন্য তিনি নিজেকে উপযোগি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্য তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনার উর্ধ্বে।

আলেমদের মাঝে মাজহাব ও মসলকগত পার্থক্য খুবই স্বাভাবিক। তিনি নিজস্বতা ও স্বকীয়তার মাঝে নিজেকে পাকাপোক্ত রেখে এখতেলাফী মাসআলা গুলোর এত নিখুত সমাধান দিতেন- যে কেউ তা মেনে নিতে বাধ্য হত। একান্ত বিরুদ্ধবাদী কেউ হলেও স্বীকার করত মুহাদ্দিস ছাহেবের আলোচনা ইলম ও ইনসাফে পরিপূর্ণ। একবার ভারতের কোন এক সফরে মাহফিল শেষে বিভিন্ন ঘরানার কয়েকজন আলেম এসে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সাথে দেখা করেন এবং তাঁর বয়ান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন বলে জানান। তাঁরা আরও বলেন, তাঁর আলোচনা থেকে মনে হয়েছে ভিন্ন দু'টি মসলকের মাঝে দুরত্ব মূলত নেই বললেই চলে- এ কথা প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁর জবান থেকে শুনা।

তাঁর হিকমত ও দুরদর্শীতাপূর্ণ বয়ানে আমরা অনেক সমাধান খুঁজে নিতাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ বলা, ইল্লাল্লাহ জিকির, মীলাদ-কিয়াম, বাশরিয়াতুর রাসূল, শাফায়াত, তারাবীহ নামাজ ২০ রাকাত ইত্যাদি জটিল মাসয়ালাগুলোর ভারসাম্যপূর্ণ বয়ান সর্ব সাধারণের বুঝার মত অতি সহজে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করতেন তা অভূতপূর্ব বটে।

তিনি শেষ বয়সে বাড়িতে বা দেশের বাইরেও বিভিন্ন স্থানে হাদীহের দারস দিয়েছেন। বিশেষ করে দেশে-বিদেশে একাধিক মাহফিলে মুসালসাল হাদীসের সনদ প্রদান করেছেন। আমরা বাড়িতে দারস গ্রহণকারীগণ বাড়িতেই মুসালসাল হাদীছের সনদ লাভ করেছি। একবার বিয়ানীবাজারে মুসালসাল হাদীছের সনদ গ্রহণের জন্য আলেমদের বড় এক জামাত স্থানীয় হাফিজি মাদ্‌রাসায় মিলিত হন। মাথিউরা সিনিয়র মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল জনাব মাওলানা আব্দুল আলিম হুজুর আমাকে মাহফিলে শরীক হবার জন্য

বললে সুযোগ পেয়ে আমিও উপস্থিত হলাম। আমি খুব সংকোচিত ছিলাম যে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর দেখে কী ভাববেন, আমি তো আগে সনদ পেয়েগেছি! যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম-কদমবুসি করতে গেলাম। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। বাহ! এতদূর থেকে তুমি এসেছো!-খুশিতে বললেন। উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এভাবে- উনি আমার মেহমান, আমার যেখানে থাকার ব্যবস্থা, উনিও সেখানে থাকবেন-- হাসিমুখে আমাকে বললেন, আমার মন বলেছে (মাওলানা) কুতবুল আলম এখানে আসলে------। কী যে বড় দিল! কী যে উদার স্নেহ! তা কী ভোলা যায়!

আমি যে মাদ্‌রাসায় দায়িত্বরত সেই সোনাপুর মাজহারুল উলুম মাদ্‌রাসা প্রাচীন একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। বারবার আমাকে আলিম স্তর খোলার তাগিদ দিতেন। একবার কয়েকটি মাদ্‌রাসার নাম উল্লেখ করে বেশ কয়েকটি কামিল স্তরে উন্নীত হয়েছে বললেন। সোনাপুর মাদ্‌রাসায় আলিম স্তরের আকাঙ্ক্ষার কথাও বললেন। আলহামদুলিল্লাহ হুজুরের দোয়ার বরকতে ২০২০ সাল থেকে মাদ্‌রাসায় আলিম স্তর খোলা হয়েছে। তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়ে সবক প্রদান করে যে তাকলিফ স্বীকার করেছেন আমরা মুগ্ধ হয়েছি। আল্লাহ রাবুল আলামীন তাঁকে লায়েক জাযা দান করুন, তাঁর দরজা বুলন্দ করুন এবং ফয়েজ ও বরকত আমাদের উপর জারী রাখুন। আমিন।

লেখক: অধ্যক্ষ, সোনাপুর মাজহারুল উলুম আলিম মাদ্‌রাসা, বীরশ্রী, জকিগঞ্জ, সিলেট।

আগমন অবস্থান প্রস্থান

মোহাম্মদ খছরুজ্জামান

জকিগঞ্জ। সুরমা কুশিয়ারার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ দেশের এক প্রান্তিক জনপদ। এই মাটি জন্ম দিয়েছে বহু মহামনীষী। বুকে ধারণ করেছে সময়ে সময়ে যুগ জামানার অনেক সূর্যসন্তান, স্বযতনে স্বগৌরবে। শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই দীর্ঘ দাস্তানের উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল এক নক্ষত্র। মশহুর মারুফ মুহাদ্দিস ছাহেব অভিধায়। দেশে বিদেশে সর্বত্র। এই একই নামে সব পরিচয়। কার্যত আমার কলম রীতিশুদ্ধ অক্ষম তাঁর অনন্য উচ্চতা নিরূপণে। এমন ব্যক্তিসত্তার কথা বলছি, কলম ধরছি, যার পরিচয় পরিচিতি দেশের ভৌগলিক সীমারেখা তথা সীমান্ত প্রাচীরের বাহিরে। জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিমন্ডলে। মেধায় প্রজ্ঞায় বয়ানে কলমে ইলমে আমলে সমূহ কর্মতৎপরতায়। তিনি বিচিত্র বর্ণাঢ্য জীবনের কর্মের সার্থক স্বত্বাধিকারী। শিক্ষকতায় শুরু কর্মমুখর জীবনের। ৩ আগস্ট ১৯৫৯ সাল থেকে টানা সাড়ে ৬২ বছর বাদশাহী বেশে করেছেন ইলমে দ্বীনসমূহের শাখা প্রশাখায় নিরলস খিদমত। বিশেষতঃ ইলমে হাদীসের চর্চা, দারস এবং গবেষণা তাঁকে বানিয়েছে কালের প্রতিনিধি, হাদীস সাম্রাজ্যে অবিসংবাদিত সম্রাট। হাদীসে নববীর খিদমতে উদ্বোধনী দরসগাহ, দারুল হাদীস সৎপুর। যেখানে দীর্ঘকাল দারস দিয়েছেন হাদীস শরীফের। আমাদের মুহাদ্দিস ছাহেব কিভাবে সৎপুর আসলেন থাকলেন ফিরলেন? সেই অলৌকিক ইতিহাসের কথা-ই বলছি।

প্রথম আগমন

সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসা। বুনিয়াদ ১৯৪৮ সনের ২০ অক্টোবর বুধবার। প্রতিষ্ঠাতা হযরত গোলাম হোসাইন সৎপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। মুহতামিম ছাহেব নামে পরিচিত এই আশিকে রাসূলের খুলুসিয়াত আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাদ্‌রাসাটি খুব কম সময়ে দ্রুত এগিয়ে যায়। ফাযিল স্তরে উন্নীত হয় ১৯৬২ সনে। কিন্তু সৎপুরীর স্বপ্ন দারুল হাদীস। নিজের ইচ্ছা বার বার নজরে দিলেন ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর। তিনি বরাবর অবলম্বন করলেন স্বভাব সুলভ নিরবতা। একদা স্বপ্নযোগে ইশারা পেলেন মদীনাওয়ালার। এবার মিললো ইজাযত। সৎপুরে শুরু হলো কালা রাসূলুল্লাহর তকরার। তবে সংকট রয়ে গেলো একজন যোগ্য মুহাদ্দিসের। প্রতিষ্ঠাতা বিষয়টি আগে ভাগেই খিয়ালে দিয়েছিলেন হযরত ছাহেব কিবলাহর সময় ঘনিয়ে এলো। বাড়তে লাগলো জোরাজুরি পীড়াপীড়ি। এদিকে ছাহেব কিবলাহও থেমে নেই। তালাশে মগ্ন বিভোর, কাঙ্ক্ষিত মুহাদ্দিসের। একজন যোগ্য মুহাদ্দিস আবিস্কারের গল্প ছাহেব কিবলাহর

জবানেই শোনা যাক, "আমি একটু পেরেশানিতে পড়ে গেলাম কাকে দেওয়া যায় এখানে? এই পেরেশানির মধ্যে একদিন বাড়িতে থাকাবস্থায় কোন এক সময় আমার তন্দ্রাভাব চলে আসলো। দেখলাম, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ইশারায় দারসে হাদীস চালু করেছি, এখন সেখানে হাদীস পড়ানোর জন্য কাকে খিদমতে দেবো? সেটা নিয়ে পেরেশানিতে আছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুল মোবারক দিয়ে তোমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, উনাকে দিয়ে দাও। ভালো হবে। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি, তুমি আমার পাশে বসা। এজন্যই তোমাকে আমি সেখানে হাদীসের খিদমতে পাঠিয়েছি"। কে এই মুহাদ্দিস? যাকে পছন্দ করলেন স্বয়ং ছাহেবে হাদীস। তিনি আর কেউ নন, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান তিনি-ই। মুহাদ্দিস আগেও ছিলেন, এখনো আছেন। কিন্তু রাসূলের নির্বাচিত মুহাদ্দিস? এই মহান সৌভাগ্য, জোটেনি সকলের।

একটি কথা দাঁড়াতে পারে প্রশ্ন হয়ে। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ স্বপ্নের গোপনীয়তা কেন ভাঙলেন? এই রহস্য উদ্ঘাটনে, একটু পেছনে ফিরতে হয়। সৎপুর গমনের পূর্বে হযরত ছাহেব কিবলাহর নির্দেশনা ছিল, ইছামতিতে হাদীসের দারস দেয়ার। তিনি তা এড়িয়ে যান। সৎপুরে মুহাদ্দিস হিসেবে খিদমতে যাওয়ার নির্দেশ যখন আসে, তখনো তিনি দেখান অযোগ্যতার অজুহাত। কৌশলে পাশ কেটে যান। তিনি ছিলেন না, মোটেও অতি উৎসাহী হাদীসের উস্তায হতে। আপনাকে আবরিত রাখা বৈশিষ্ট্য বটে। আমিতো যোগ্য নই। দোদুল্যমান এই সময়ে সাক্ষাতের দিন ক্ষণ ঠিক। আসুন স্বয়ং মুহাদ্দিস ছাহেবের ভাষ্য শুনি- "আমি সৎপুরে হাদীস পড়ানোর জন্য যাওয়ার আগে, মুহতামিম ছাহেব আমাকে দেখতে চাইলেন। আমি সম্মতি দিলাম। স্থান বিশ্বনাথ উপজেলার কৌড়িয়া এলাকার একটি গ্রাম। যেখানে মিলাদ কিয়াম বিষয়ক একটি বহসে আমি যাওয়ার কথা ছিল। সৎপুরের মুহতামিম ছাহেব আসলেন। আমি আগ থেকে একটি কৌশল অবলম্বন করলাম। যেন আমাকে মুহাদ্দিসের মতো দেখা না যায়। আমার পাঞ্জাবীগুলোর সবচে পুরনো পাঞ্জাবী পরে গেলাম। যা ছোট হয়ে গেছে। পরার মতো নয়। যেন মুহতামিম ছাহেব আমাকে দেখে বুঝে নেন, যার পাঞ্জাবী সুন্নত মাফিক নয়, সে আবার কিসের মুহাদ্দিস"। ছাহেব কিবলাহর বার বার চাপ প্রয়োগ এবং তাকিদে তিনি সৎপুর গেলেন। জোরাজুরি করে কেন সৎপুর পাঠালেন? মুহাদ্দিস ছাহেবের অবগতি এবং পরবর্তী প্রস্তুতি নিতান্ত অপরিহার্য। বিধায় ছাহেব কিবলাহ সরালেন স্বপ্নের আবরণ। বহসের সমাপ্তি। বিজয় মিলাদ কিয়ামের। নিয়ামক শক্তি। একজন বাহরুল উলূম আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিসে রারাই। তিনি আসলেন দেখলেন বুঝলেন। দারুল হাদীসের বহু কাঙ্ক্ষিত মুহাদ্দিস। বহসের ফলাফল বলে দিল। তিনি যোগ্য এবং যথার্থ। এখানেও কিছু শর্তারোপ। মুহাদ্দিস ছাহেবের বয়ানের হুবহু উদ্ধৃতি- "সৎপুর

মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ছাহেবকে সামনাসামনি পেলাম। তাঁকে আমার এই প্রথম দেখা। আমি বললাম, ৩টি শর্তে আমি সৎপুর যেতে পারি। প্রথমতঃ মাদ্‌রাসার একটি রুমে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। দ্বিতীয়তঃ লজিংএ ছাত্র পড়িয়ে খেতে পারবো না। টিফিন মাদ্‌রাসায় এনে দেবেন। তৃতীয়তঃ যখন যে কিতাবের নাম বলবো তখন তা কিনে এনে দেবেন। হতে পারে তা দেশের বাহিরেও"। শর্তগুলো খুব দুর্লভ না। পাকিস্তান আমল। তখনকার সময়ের জন্য না সহজলভ্যও। বিশেষ করে বিদেশী কিতাব। বাজ্যতঃ দৃশ্যমান ব্যক্তি জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ। ভাসতে পারে বিবেক বিবেচনায়, আসতে পারে আলোচনায়। প্রসঙ্গ, আরাম আয়েশ। না, আদৌ না। নিজের আগমন বার্তা পৌঁছানো, উপস্থিতি জানান দেয়ার পূর্বেই সাফ করলেন। শর্তের মোড়কে আগাছা। কিতাব মুতালায়ার। কত কিতাবের পৃষ্ঠা তিনি উল্টিয়েছেন পাল্টিয়েছেন? চোখ দেমাগ অবলোকন করেছে কত কিতাব দলিল দস্তাবেজ। বলতে পারবো না পরিস্কার পরিসংখ্যান। তবে দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, অসংখ্য অগণিত। দলিল নির্ভর বয়ান, ইলমী আমলী মাহারতপূর্ণ দারস নিজস্ব তাসনিফাত, সৎপুর মাদ্‌রাসার ঐতিহ্যবাহী কুতুবখানা, ইছামতি মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি, ব্যক্তিগত লাইব্রেরি 'মাকতাবাতুল হাবিব' (প্রাতিষ্ঠানিক রূপ- ২০২০ খ্রি), কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অধিক অধ্যয়নের, নিভৃত জ্ঞান সাধনার। ইলম চর্চায় আহরণে বিতরণে আজ আমরা শতভাগ মুখোমুখি। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের, নিরব নিদানের। এই সংকট মোকাবেলায় আদর্শিক দৃষ্টান্ত। শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান।

অবস্থান

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান, রারাই জকিগঞ্জ সিলেট। আল্লামা আব্দুল জব্বার, গোটারগ্রাম জকিগঞ্জ সিলেট। মাওলানা মোতাহির আলী, বাল্লাহ জকিগঞ্জ সিলেট। মাওলানা ইজ্জত উল্লাহ, নোয়াপাড়া বিশ্বনাথ সিলেট। এই চার মুহাদ্দিস দিয়ে শুরু সৎপুরে হাদীসের দারস। ১৯৬৫ সালে মুহাদ্দিসে রারাই প্রধান মুহাদ্দিস ১৯৬৩ সালের ২৩ নভেম্বর থেকে প্রথম বছর দারস দিলেন। কামিল আউয়ালে, হাদীসের তিনটি কিতাব। আবু দাউদ তিরমিযী ইবনে মাজাহ। দ্বিতীয় বছরে এসে আগের দশা। তিনি বুখারী পড়াতে পারবেন না। শায়দা ছাহেবকে আনা হোক অথবা অন্য ব্যবস্থা। মুহতামিম ছাহেব বললেন, আপনাকে জোগাড় করতে আমি ছাহেব কিবলাহর সাথে অনেক বেয়াদবি করেছি। আমি এ বিষয়ে আর পারবো না। অবশেষে বিষয়টি ছাহেব কিবলাহর কান পর্যন্ত গড়ালো। তিনি কাশফের তরবিয়ত স্মরণ করিয়ে দিলেন, দিলেন নির্দেশও। পড়াও বুখারী শরীফ। আল্লামা আইনীর শরাহ ছাড়া আর কোন শরাহ নেই। কিতাব পড়াতে হলে, একই কিতাবের কয়েকটি শরাহ দেখতে হয় রাখতে হয়। এই সবক আমরা কি নিতে পারি? তিনি বুখারী শরীফের সবক দেবেন। প্রথম সবক। ব্যবস্থা

মখতসর মাহফিলের। ছাহেব কিবলাহ ছাড়াও দাওয়াত পেলেন দেওয়ান আব্দুর রহীম, শিকদার বাড়ির ছাহেব জনাব মোফাজ্জল আলী, বারগাত্তার ছাহেব হযরত শাতির আলী, কুলাউড়ার হাফিজ আফতাব খান ছাহেবসহ আরো অনেকে। দারসে বুখারীর সূচনা পর্ব, মুহাদ্দিস ছাহেবের ভাষায়ই শুনি- "ছাহেব কিবলাহ আমাকে কিতাব দিয়ে বললেন, নাও শুরু করো। আমি বুখারী শরীফের অন্য এক নুসখা হাতে নিলাম। বললেন, বিসমিল্লাহ করো। কিতাবখানা হাতে নিয়ে মুখে লাগালাম, বুকে লাগালাম, পড়ানো শুরু করলাম। এই আমার শুরু"। শর্ত মোতাবেক তিনি অবস্থান নিলেন। মুহতামিম ছাহেব আমলের একাডেমিক ভবনের দোতলায়। একদম দক্ষিণ কোণের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে। এই রুম কালক্রমে পরিণত হয় পোস্ট অফিসে। তাজিমের উত্তাপ অনুভব করেছি। সুদীর্ঘ চার দশক পরেও। অনেকে আঙ্গুল তোলে দেখিয়েছেন। এই সেই রুম। যেখানে রাত্রি যাপন করতেন। করতেন কিতাব মুতালায়া। এই মাদ্‌রাসার প্রথম শায়খুল হাদীস। প্রধান মুহাদ্দিস। বাহিরের সফরসূচি ছাড়া। তিনি রুম থেকে তেমন একটা বের হতেন না। মাদ্‌রাসার চাঁদার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন না। যেমনটা করতেন মুহতামিম ছাহেব। তবে আবদার আর আবদার। নতুন নতুন দুর্লভ কিতাবের। মোটা অংকের পে অর্ডার। দেশে বিদেশে। মুহতামিম ছাহেব সয়ে উঠলেন। এক পর্যায়ে বিব্রত হলেন। বলে ফেললেন "আচানক এক মুহাদ্দিস আনছি, চাঁদা করতে নেই। মাসে মাসে কিতাব আর কিতাব। কিতাবের পেছনে জান শেষ।" এবার খুশি করার পালা। হেকমতি পন্থাও জানা। কোন এক মঙ্গলবার। বাদ মাগরিব মুহতামিম ছাহেবের দাওয়াত। সৎপুর থেকে ২ কি.মি. পূর্বে মঙ্গলগিরি গ্রামে। মুহাদ্দিস ছাহেব বললেন, যাওয়ার সময় রুমে দেখা করে যাবেন। তিনি আসলেন। একখানা কিতাবের অংশ বিশেষ পড়ে শুনালেন। বিষয়, কোন কোন মানুষের দেহ মাটি গ্রাস করতে পারে না। দীর্ঘ ফিরিস্তির একটি- এশকে রাসূলের আগুনে দগ্ধ হৃদয়। মাটি গ্রাস করতে পারে না। আশিকে রাসূল মুহতামিম ছাহেবের হাল ধারণ করলো ভিন্ন রূপ। শোনা যাক মুহাদ্দিস ছাহেবের বর্ণনা- "তিনি অর্ধরাত কাটিয়ে দিলেন আমার রুমে। ডুবে থাকলেন শের আশয়ার আর নাতিয়ার অথৈ জলে। বেচইনি হালতে। মঙ্গলগিরি গমন ভুলে গেলেন। বিদায় বেলা, খুব জোরেস্বরে উৎসাহ উদ্দীপনায় বলে গেলেন, ও ভাই! এই ধরণের কিতাব, পৃথিবীর যে দেশেই হোক। বলবেন, কিনতে আনতে আমি প্রস্তুত।" সৎপুর মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি। ঐতিহ্যবাহী একটি কুতুবখানা। আরবী, উর্দু, ফার্সী ভাষার দুর্লভ কিতাবাদীর বিপুল সমাহার। সিংহভাগ সংগ্রহ মুহাদ্দিস ছাহেবের। প্রস্তাবে তাকিদে পছন্দে। মাহফিলে বয়ানে জনসম্মুখে। জীবদ্দশায় বার বার ইঙ্গিত করে গেছেন। এই কিতাব, অমুক কিতাব। সৎপুর মাদ্‌রাসার কুতুবখানায় আছে। পাকিস্তান আমল। সিলেট অঞ্চলে কামিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সৎপুর ভিন্ন দু'য়ের বেশি নয়। এই নিরিখে সৎপুরের উৎপাদন অনেকটা এগিয়ে, তুলানামূলক সমৃদ্ধ। দুর্লভ এই অর্জনের নেপথ্যে অনেকের

অংশগ্রহণ, উল্লেখের দাবি রাখে। আমাদের মুহাদ্দিস ছাহেব। নিজের সক্রিয় অংশগ্রহণ, উদ্যোগ পরিকল্পনা প্রচেষ্টা প্রবাদতুল্য। বিশেষ করে মুহাদ্দিস হিসেবে, কামিল জামাতের উস্তাযের মানে তিনি মুখ্য আকর্ষণ। যথার্থভাবে বলা যায়, তিনি এক পুরোধা পুরুষ, সৎপুরের সক্ষমতার।

দ্বিতীয় আগমন

১৯৭৫ সালের ১৯ মার্চ বুধবার। ইন্তেকাল মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ছাহেবের। স্বাভাবিক রীতিতে মাদ্‌রাসা চলে যায় এতিমের পর্যায়ে। নানা জটিলতা আর বিশৃংখলার মুখে পতিত হয়। মারাত্মক মতানৈক্য দানা বাঁধে অধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়ে। তখন সৎপুরের জন্য কোন বিকল্প ছিলো না। আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেবের। প্রশাসন এবং স্থানীয়দের উদ্যোগ প্রচেষ্টায়, তিনি আবার ফিরলেন সৎপুর। ১৯৭৬ সনের ১১ অক্টোবর। অধ্যক্ষ হিসেবে। হাল ধরলেন কান্ডারীর। মাত্র ৫ মাস ২২ দিনের তবিব। ঘুরে দাঁড়ালো দারুল হাদীস। স্বগৌরবে স্বমহিমায়।

প্রস্থান

ইছামতি মাদ্‌রাসার সংগত প্রয়োজনে, সৎপুরে প্রধান মুহাদ্দিসের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হলো। নিয়মতান্ত্রিক বিদায়। সৎপুর ধারণ করেছিলো তাঁকে। একজন নন্দিত শায়খুল হাদীস হিসেবে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের Green signal সৎপুরের অধ্যক্ষ পদ আবারও শূন্য করে দিলো। ১৯৭৭ সনের ২ এপ্রিল। যথারীতি বিদায়। বাংলাদেশে পড়ুয়া, নেহায়ত মফস্বলে, বাংলা ভাষাভাষী একজন আলিম, আরব আমিরাতের বিচার বিভাগে যোগদান করলেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে। আজীবন দেশ তাঁকে নিয়ে গর্ব করতে পারবে। তিনি বাংলাদেশের গর্ব। আমি তাঁকে শুধু দেখেছি মাত্র। চিনতে পারিনি। দেখা থেকে এই লেখা। যদি চিনতাম...!

তথ্যসূত্রঃ

(১) মুহতামিম ছাহেবের ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে মুহাদ্দিস ছাহেবের বয়ান- (১৯/০৩/১৯৯৭)।

(২) মুহাদ্দিস ছাহেবের সাক্ষাৎকার- আহমদ হাসান চৌধুরী।

(৩) নবী প্রেমিক সেই মনীষী- মোহাম্মদ আলী আছগর খান।

লেখকঃ উপাধ্যক্ষ, সিংগেরকাছ আলিম মাদ্‌রাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট।

حضرت محدث صاحب کا علمی اور روحانی مقام

حافظ مولانا سید مراد احمد المدني

حضرت علامہ حبیب الرحمٰن(المعروف محدث صاحب) ایک علمی و روحانی شخصیت تھے آپ کے علم و روحانیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے صرف اپنے ہی ملک میں نہیں بلکہ بیرونِ ملک کے مختلف اطراف و جوانب میں مساجد ،مدارس و مکاتب قائم کئے -

آ پ نے علومِ دینیہ کی اشاعت کے خاطر تدریسی خدمات انجام دینے کو آپنی زندگی کا نصب العین بنایا چنانچہ آپ بنگلہ دیش کے مشہور و معروف درسگاہ دار العلوم عیسیٰ متی میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ تدریسی فرائض انجام دیئے , علم وتقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود طبیعت کی سادگی، تواضع، مہمان نوازی مخلوقِ خدا کے ساتھ شفقت و مہربانی نے آپ کو سب کے دلوں میں بساکر آفاقی بلندی عطا کر دی تھی -

آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ معمولی لباس زیب تن فرماتے شب و روز علم کی تحصیل درس و تدریس تصنیف و تالیف اور اشاعت علم کے کاموں میں مشغول رہتے تھے- راستے چلتے بھی پڑھنے کا سلسلہ موقوف نہ کرتے تھے- عبادت ذکر الھی, اوراد و وظائف میں ہمہ تن مصروف رہتے تھے -

اپ نے پوری زندگی درس و تدریس میں گزاری اور ہزاروں علماء ،محدثین،فقیہ اور خطیب تیار کئے جو قوم و ملت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں -

حضرت محدث صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلک اہل سنت والجماعت کی صف اول کے ایک نامور رہنماء اور ممتاز علمی و روحانی شخصیت تھے -اللہ نے آپ کو ذہانت اور کمال استحضار علمی سے نوازا تھا ،علمی دسترس کی وجہ سے آپ علمی مکالمہ میں خصوصی ملکہ رکھے تھے -حضرت محدث صاحب کو تدریس و خطابت کا فن اپنے استاد و پیر و مرشد حضرت قبلہ علامہ محمد عبد الطیف چھودری پھولتلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تھا آپ نے لگبھگ ساٹھ سال تک اپنے استادِ گرامی کے جاری کردہ تمام خدمات جیسے دار القرأت ،درس قرآن، درس حدیث، لوگوں کو تزکیہ نفس کی تعلیم و تربیت،وعظ و نصیحت کو بلا اہتمام نبھایا- آپ

منفرد و اعلیٰ تدریسی مہارت کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ خطیب بھی تھے بیان کرنے کا انداز عام فہم پر مغز،مدلل مؤثر اور دلنشین ہوتا تھا ۔

خطابت میں آپ کو ایسا ملکہ حاصل تھا جو کم ہی علماء کے حصہ میں آیا ہے بیان کرنے کا ایسا اسلوب رکھتے تھے جو بھی سنے گویا خود کو ان حالات و واقعات سے گزارنا محسوس کرے۔محدث صاحب کے درس خطابت کی سب سے بڑی خوبی جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ موضوع کے متعلقہ پہلوؤں میں سے کسی پہلو کو تشنہ نہ چھوڑتھے تھے۔کئی اشکالات جو موقع بموقہ جنم لیتے تھے،ساتھ ساتھ حل ہوتے جاتے،چنانچہ محدث صاحب سے کسی نقطہ کی وضاحت یا اعتراض کا جواب لینے کی گنجائش باقی نہ رہتی تھی ۔ہر درس و خطاب میں ان کی عالمانہ شان موجود ہوا کرتی تھی ۔

ہمیں اس بات کا مکمل یقین ہے کہ آخرت میں حضرت محدث صاحب کا بہت اونچا مقام ہوگا حضرت امام احمد رحمہ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو معلوم کیا حضرت! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب مجھے پیش کیا گیا تو مولا نے میری مغفرت فرمادی اور فرمایا اے محمد بن حسن شیبانی!اگر ہمیں تیری مغفرت کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم تجھ سے علم دین کی اتنی خدمات نہ لیتے،اللہ رب العزت نے آپ سے جو علمی خدمات لیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں آپ یقیناً مغفرت شدہ ہیں اور مراتب عالیہ سے شرف ہیں،اخیر میں خدائے تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عالم میں آپ کو مزید مراتب عالیہ سے نوازے اور آپ کے روحانی فیض سے مخلوقِ خدا کو زیادہ سے زیادہ فیضیاب فرمائے اور آپ کی علم و عمل کی کچھ جھلکیاں ہمیں بھی عطا فرمائے ۔ آمین یارب العالمین

راقم الحروف

سید مراد احمد

স্মৃতির পাতায় শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

মাওলানা মোঃ মাহবুবুর রহমান চৌধুরী

ইতিহাস সাক্ষী নবী, রাসুল, সাহাবী তাবেয়ী, ওলী আউলিয়া- পীর মাশায়েখ ও সাধারণ মানুষ কেউই এই দুনিয়ায় চিরস্থায়ী থাকতে পারেন নি। এই চিরায়ত নিয়মের ধারাবাহিকতায় উপমহাদেশের হাদীস জগতের উজ্জল নক্ষত্র, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শরিয়ত তরিকতের সাগরে নিমজ্জিত জাহেরী - বাতেনি ইলমের আলোকরশ্মি পীরে তরিকত, অত্যন্ত লুকায়িত তরিকতের বাতি, বহু মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও বহু আদীব-মুফতির শীরতাজ উস্তায, সর্বজন বরেণ্য শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব (রঃ) ২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী সোমবার বাদ মাগরীব বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশকে প্রায় অন্ধকারে নিমজ্জিত করে এ ধরাদাম থেকে ইন্তেকাল করে তাঁর বন্ধু মাওলায়ে হাক্বীকীর ডাকে সাড়া দিয়েছেন; ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমি একজন নগণ্য ছাত্র হিসেবে এ মহান মহনীষী সম্বন্ধে লিখার মত আমার যোগ্যতা নেই। এত বড় মহান আলেমে দ্বীন আল্লাহর ওলীদের সামনে পড়লে আমার দেহ মন ভয়ে প্রকম্পিত হয়। কারণ যাদের আধ্যাত্মিক আলোকরশ্মি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার আরশ ও তাহতাছছারা (পাতাল পর্যন্ত) ছয়ের তথা পরিভ্রমণের ক্ষমতা রাখে। তাই আমি এক নগণ্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা'র ওলীগণের সামনে পড়তে ভয় পাই। উপমহাদেশের অন্যতম ওলী, আউলিয়াকুল শীরমনি, রইসুল কুররা, শামসুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিসিন, ওয়াল মুফাসসিরীন, কুদওয়াতুস সালিকীন জুবদাতুল আরেফিন, আয়নায়ে জামালে আহমদি, শামসুল উলামা আল্লামা ছাহেব কিবলাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলিফা হলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইহা থেকে বুঝা যায় উনি শরিয়ত তরিকতের কতইনা উঁচু মাকামের অধিকারী ছিলেন।

এতো মহান ব্যক্তি সম্পর্কে লিখতে গেলে ভাষা লোপ পায়, কলম শুকিয়ে যায়, কি লিখবো এক নাদান, নালায়েক আমি অদম। কে তিনি? এক কথায় বলা যায় তিনি সকল পাক পবিত্র বৈধ গুণের অধিকারী। সকল মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত, বিশ্বের ধর্মীয় জ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম, শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী- মিষ্টভাষী ওয়ায়েজ, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আলেম, দার্শনিক ও বহু ভাষাবিদ, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুফাসসির, যুগ বরেণ্য ও সর্বজন স্বীকৃত সম্মানিত এক সত্ত্বা।

তিনি সিলেট জেলার সৎপুর টাইটেল মাদ্‌রাসায় দীর্ঘ দিনের মুহাদ্দিস ছিলেন পরবর্তীতে

ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস ও প্রিন্সিপাল ছিলেন।

তিনি লন্ডন আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে হাদীসের বিশেষ শিক্ষা দান করেছেন। হযরত আল্লামা আব্দুল মন্নান চৌধুরী শিংগাইরকুড়ী ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। তাই হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব শিংগাইরকুড়ী ছাহেবকে তাঁর উসতাদ ও মুর্শিদের মত সম্মান করতেন, সম্পর্ক রাখতেন। বিশেষ করে আল্লামা শিংগাইরকুড়ী ছাহেবের ইন্তেকালের পর শেষ গোসল তিনি করিয়েছেন। তিনি ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত প্রতি বছর শিংগাইরকুড়ী ছাহেব বাড়ির মাহফিলে তাশরিফ আনতেন। তাঁর কারামত বা অলৌকিক ঘটনাবলি অনেক, যা সবারই জানা। তাই এসব বর্ণনা করা দরকারী মনে করি না। তিনি আশিকে রাসুল হিসেবে একনিষ্ঠভাবে সুন্নতের অনুসারী একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন।

আল্লাহপাক তাঁর দরজা বুলন্দ করুন, তাঁর রূহানী দুআ ও ফয়েজ আমাদের নসীব করুন।

লেখক: উপাধ্যক্ষ, ইকড়ছই আলিম মাদ্‌রাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগনজ; ছাহেবজাদায়ে শিংগাইরকুড়ী

সুলতানুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ কিছু স্মৃতি : কিছু কথা

মাওলানা মোঃ মাহবুবুর রহমান নু'মানী

সুলতানুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে আমার সুধারণা তৈরি হয়েছিল অনেক আগে, আমার শিশুকাল থেকেই। এর কারণ, আমার ওয়ালিদ মুহতারাম মরহূম মাওলানা গোলামুর রহমান ছাহেব ছিলেন তাঁর একান্ত ভক্ত। তিনি তাঁর কথা প্রায়ই আলাপ করতেন। একজন প্রাজ্ঞ আলিম হিসেবে, একজন দক্ষ মুহাদ্দিস হিসেবে, একজন মাহির উস্তায হিসেবে, এমনকি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে তাঁর পরিচিত জনদের মধ্যে তাঁর দৃষ্টিতে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগণ্য। আর এই কারণে আমার এক ভাইয়ের নামও তিনি রেখেছিলেন মোঃ হাবীবুর রহমান।

আমার ওয়ালিদ সাহেবের কাছ থেকে শুনেছি-

(১৯৬৩/৬৪ইং সালে) আমার ওয়ালিদ ছাহেব যখন সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় কামিল জামাতে পড়তেন- তখন আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব ছিলেন সৎপুর মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস, একজন নবীন শিক্ষক। ঐ সময় কামিল ক্লাসের মঞ্জুরীর জন্য মাদ্‌রাসা বোর্ডের পক্ষ থেকে ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস ওয়াজীহুল্লাহ ছাহেব একবার সৎপুর মাদ্‌রাসা পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিনি মাদ্‌রাসার লেখা-পড়ার মান যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন ক্লাসের পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষন করছিলেন- কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। হঠাৎ তিনি কামিল ক্লাসে ঢুকে পড়লেন। এ সময় মুহাদ্দিস হবিবুর রহমান ছাহেব ক্লাস নিচ্ছিলেন। সেদিন তিনি وفد عبد القيس এর হাদীস খানার উপর দারস দিচ্ছিলেন। মুহাদ্দিস ওয়াজীহুল্লাহ ছাহেব দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁর দারস শুনে সেখানেই সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, একজন ক্বাবিল (যোগ্য) মুহাদ্দিস এখানে আছেন- কামিল জামাত মঞ্জুর করা যায়।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহকে আমি প্রথম দেখেছিলাম ১৯৮৭ সালে সিলেট রেজিঃ মাঠে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতা করার সময়। তখন আমি ছিলাম দক্ষিণ ছাতকের সিংচাপইড় মাদ্‌রাসায় দাখিল সপ্তম শ্রেণির একজন ছাত্র। অনেকের সাথে আমিও সেদিন ঐ সভায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। (সম্ভবতঃ ঐ দিনটিই ছিল সিলেটে আমার প্রথম দিন)। কোন উপলক্ষে এবং কেনো ঐ সভার আয়োজন করা হয়েছিল তা আমার মোটেই খেয়াল নেই, তবে ঐ দিন বক্তারা ফুলতলী ছাহেব ক্বিবলা রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে যে সকল বক্তব্য দিয়েছিলেন- তা থেকে মনে হয় সেটি কোনো প্রতিবাদ সভা ছিল। ঐ দিন আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব যে সকল কথা বলেছিলেন- তা আমার

পুরোপুরি মনে নেই, অতটুকু বুঝার বয়সও তখন আমার ছিল না। তবে এতটুকু মনে পড়ছে যে, সেদিন তিনি তাঁর বক্তব্যের মাঝখানে প্রমাণ স্বরূপ একজন পঙ্গু ব্যক্তিকে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দুই-তিন মিনিট কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। লোকটি সেদিন কী বলেছিল- তাও আমার পুরোপুরি মনে নেই, তবে এতটুকু মনে পড়ছে যে, জগন্নাথপুর (সৈয়দপুর) যে দিন ছাহেব ক্বিবলার উপর হামলা করা হয়- ঐ দিন সেই লোকটি ছাহেব ক্বিবলাকে পানির বদলে পেশাব পান করতে দিয়েছিল। এই বে-আদবীর কী শাস্তি সে পেয়েছিল, পরে সে কীভাবে অনুশোচনা করেছিল এবং তার বিশেষ অঙ্গের কী অবস্থা হয়েছিল- ঐ কয়েক মিনিটের বক্তব্যে লোকটি তা তুলে ধরেছিল। লোকটির নাম কী ছিল- তা আমার নিশ্চিত মনে নেই (সম্ভবতঃ রিয়াজুল ইসলাম)। ঐ দিন আমার মনে হয়েছিল যে, সভায় উপস্থিত বক্তাদের মধ্যে মুহাদ্দিস ছাহেবের কথাগুলো ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি বোধগম্য। ঐদিন প্রথম সিলেট আগমন এবং সভায় অংশগ্রহণে আমার যে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি হয়েছিল তাতে মুহাদ্দিস ছাহেবকে দেখার আনন্দের অংশই ছিল বেশি।

আমাদের এলাকার এক আলিম ছাহেব (মাওলানা আব্দুল বাসিত দ্বিগলবন্দী রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন আমার ওয়ালিদ সাহেবের এক সহকর্মী। একবার তিনি এক প্রয়োজনে মুহাদ্দিস ছাহেবের সাথে দেখা করতে জকিগঞ্জে গিয়েছিলেন, সম্ভবতঃ সেদিন শুক্রবার ছিল। মুহাদ্দিস ছাহেব মসজিদে জুমার পূর্বে আলোচনা করছিলেন। তাঁর পয়েন্ট ভিত্তিক সারগর্ভ আলোচনায় তিনি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। নামাযের পর তাদের সাথে সাক্ষাত হলে মুহাদ্দিস ছাহেব তাৎক্ষনিক তাঁদেরকে যে মেহমানদারি করেছিলেন- তাতেও তাঁরা বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ সময় মুসল্লীদের আচরণ এবং মসজিদের পরিবেশে মুহাদ্দিস ছাহেবের প্রভাবের বিষয়টিও তাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এলাকার লোকজন কীভাবে তাঁকে মূল্যায়ন করেন এই সংক্ষিপ্ত সফরে তাও তাঁরা আঁচ করতে পেরেছিলেন। সফর শেষে এলাকায় গিয়ে মাওলানা ছাহেব আমার ওয়ালিদ সাহেবের সাথে তাঁর ঐ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনার সময় আমিও সামনে ছিলাম। ঐ বিষয়ে আলাপকালে তাঁরা দুজনেই আমাকে তাঁর মত বড় আলিম হওয়ার এবং ঐ রকম গুছিয়ে কথা বলা শিখার উৎসাহ দেন। ঐ দিন থেকে মুহাদ্দিস ছাহেবের আলোচনা শুনার প্রতি আমার বেশ আগ্রহ তৈরি হয়।

এরপর সম্ভবতঃ ১৯৮৯ সালে সর্বপ্রথম সৎপুর কামিল মাদ্‌রাসার এক বার্ষিক জলসায় তাঁর আলোচনা শুনার সুযোগ হয় আমার। সে দিন তিনি সূরা লুকমানের দুটি আয়াত তিলাওয়াত করে তাফসীর শুরু করেছিলেন। শ্রুতারা বেশ মনযোগ দিয়ে তাঁর আলোচনা শুনছিলেন। অনেকেই দেখলাম খাতা-কলম নিয়ে বসে প্রয়োজনীয় কথা নোট করছেন। আমিও বেশ মনযোগ দিয়ে কথা শুনছিলাম। তাঁর কথা বলার ধরণ এবং ব্যাখ্যা করার

স্টাইল দেখে আমিও সেদিন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করি। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পরও তাঁর তেলাওয়াতকৃত আয়াত দুটির ব্যাখ্যা সমাপ্ত হয় নি, ইতোমধ্যে সময় শেষ যায়। তিনি তখন আক্ষেপ করে বলেছিলেন- 'হায়, মাত্র দুটি আয়াত তিলাওয়াত করলাম- কিন্তু দার লইতে পারলাম না'। মুহাদ্দিস ছাহেবের এই শেষ বাক্যটিও তখন আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। পরে আরো দু-এক বার তাঁকে দেখার সুযোগ হলেও তাঁর সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়নি।

১৯৯৬ সালে আমাদের কামিল পরীক্ষায় জকিগন্জ সিনিয়র মাদ্‌রাসা কেন্দ্রে তিনিও ভাইভা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। পরীক্ষা শেষে মাগরিব পর্যন্ত বেশ কয়েকজন সহপাঠীর সাথে আমিও পরীক্ষা কেন্দ্রে ছিলাম। মাদ্‌রাসার মসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করার কিছুক্ষণ পর আমরা দেখলাম- মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর মাদ্‌রাসার আঙ্গিনায় উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছেন। আর তাঁর পেছনে প্রায় তিন/চার হাত দূরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ইছামতি আলিয়া মাদ্‌রাসা এবং বাদে দেওরাইল ফুলতলী আলিয়া মাদ্‌রাসার কামিল পরীক্ষার্থী একদল ছাত্র।

মুহাদ্দিস ছাহেবকে এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি সুযোগটা নিলাম, আমি একটু সামনে অগ্রসর হয়েই সালাম দিয়ে মুসাফাহার জন্য আমার দুই হাত বাড়িয়ে দিতেই তিনিও তাঁর দুই হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং মুসাফাহা করলেন। এ সময় আস্তে করে আমার পরিচয়টাও পেশ করলাম। বললাম- ছাতকের মাওলানা গোলামুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ আমার আব্বা, তিনি সৎপুর মাদ্‌রাসায় আপনার ছাত্র ছিলেন, তাঁর কথা কি আপনার মনে আছে? তিনি বললেন- হ্যাঁ, অবশ্যই মনে আছে- আমার বেশ মহব্বতের ছাত্র- তাহলে তো আমরা ঠিক জায়গা মতই মার্ক দিয়েছি। (ভাইভা পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে আমি পেয়েছিলাম ৯৫। আর ঐ বছর উক্ত কেন্দ্রে এটাই ছিল সর্বোচ্চ মার্ক)। এই কথা বলেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে মাদ্‌রাসার অফিস কক্ষের দিকে নিয়ে গেলেন।

হুজুরের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্ররাও পিছে পিছে চললেন। এই দৃশ্য দেখে আমাদের গাছবাড়ির যারা ছিলেন তারাও সেখানে জড়ো হলেন। তখন মুহাদ্দিস ছাহেবের জন্য অফিসের পার্শ্ববর্তী আরেকটি কক্ষে ১টি চেয়ার দেয়া হলো। তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে আমাদের পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। আমি তখন বললাম- আমাকে কিছু নসীহত করলে উপকৃত হতাম। তিনি বললেন- নসীহত হিসেবে এই হাদীসখানাই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দুআটি নিজে পাঠ করে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন-

اللهم اني اعوذ بك من علم لاينفع و من قلب لايخشع و من نفس لاتشبع و من دعاء لايسمع

অনুবাদ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এমন জ্ঞান থেকে যা উপকার করে

না, এমন হৃদয় থেকে যা বিনয়ী হয় না, এমন মন থেকে যা তুষ্ট হয় না এবং এমন দুআ থেকে যা কবুল হয় না।

এই হাদীসের প্রতি খেয়াল করে চলবেন, এটাই আমার নসীহত ।

আর আমার আরো একটি পরামর্শ হলো- পরীক্ষা তো শেষ হয়েছে, ফলাফল আল্লাহর মর্জি মত যা হবার হবে। পরীক্ষার পর যে কোনো এক মাদ্‌রাসায় ঢুকে পড়বেন; আস্তে আস্তে ঘ্রান ছড়াতে শুরু করবে। আর যা কিছুই পড়াবেন; আগে দেখে শুনে প্রস্তুতি নিয়ে পড়াবেন- এতে ছাত্রদের তো ফায়দা হবেই; নিজের ফায়দা হবে আরো বেশি । আমি তো সারা জীবন স্কলারশীপ পেয়েছি- তবুও আদনা কোনো কিতাবও না দেখে পড়াইনি। এমনকি বাগদাদী কায়দাও যদি হয়- তবুও পড়ানোর আগে একবার দেখে নেওয়া উচিত। আর যদি কেউ মনে করেন- কামিল পাশ করে আলিম হয়ে গেছেন- আর কুতুববীনী বাদ দেন; তাহলে জেহালত (অজ্ঞতা) শুরু হয়ে যাবে। এমন সময় খবর এলো যে, হুজুরের গাড়ি এসে পড়েছে। হুজুর তৎক্ষণাৎ কথা শেষ করে উঠে পড়লেন এবং ছাত্রদের ভিড়ের মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় বলছিলেন- 'ছাতকী হুজুর দুআত ইয়াদ রাখইন জানি'। ঐ দিনের ঘটনার দৃশ্য এবং তাঁর ঐ কথাগুলো আজো আমার স্মৃতিতে ভাসে।

ইন্তেকালের আগে হুজুরের অসুখ যখন বৃদ্ধি পায়- তখন দুই দিন তাঁকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। প্রথম দিন ছাতকের একটি কাফেলার সাথে সরাসরি হুজুরের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলাম যোহরের আগে। কাফেলার উদ্দেশ্য ছিল- বাদ যোহর ফুলতলী এসে ছাহেব ক্বিবলার কবরটাও যিয়ারত করে আসবেন। তাই সেদিন বেশীক্ষণ হুজুরের পাশে থাকার সুযোগ হয়নি।

সেদিন পরিচয় পর্ব শেষে শুধু হুজুরের অসুখ আর চিকিৎসার খবরাদি নিয়েই আমাদেরকে চলে আসতে হয়েছিল। চা-নাস্তার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর রোগ এবং চিকিৎসার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। আমার মামা (মাওলানা জুবায়ের আহমদ ছাহেব) আগে থেকে পাওয়া সংবাদের ভিত্তিতে হুজুরের জন্য কিছু হোমিও এবং হারবাল ঔষধও নিয়েছিলেন- ইতিমধ্যে এগুলো বুঝিয়ে দেয়ার কাজও সেরে নেন তিনি। হুজুর তখন আমাদেরকে নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত দুআ করেন। আমাদের কাফেলার কেউ কেউ তাঁকে সাধ্যমত কিছু হাদিয়্যাও প্রদান করেন। অতঃপর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা মসজিদে চলে আসি। হুজুর তখনো পায়ে হেঁটে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে পারতেন। আমরা তাঁর বাড়ির পাশের মসজিদেই জোহর নামায আদায় করলাম। তিনি সেদিন আমাদের সাথেই নামায আদায় করেছিলেন। নামায শেষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাদেরকে বিদায় দিচ্ছিলেন- তখন শেষ বারের মত মুসাফাহার জন্য হাত বাড়ানোর সময় তিনি আমার মাথায় হাত বুলাচ্ছিলেন আর বলছিলেন- ভাই রে! আমার জন্য দু'আ করিও- আমি খুব বেশি দু'আর মুহতাজ।

এর পর হুজুরের সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয় সিলেটে তাঁর এক জামাতার বাসায়। সে দিন তিনি আমাদেরকে একখানা হাদীসে মুসালসাল (মুসালসাল বিল আউয়ালিয়্যাত) এর সংক্ষিপ্ত দারসও দিয়েছিলেন। ঐ দিন আমার মনে কিছু প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছিল; কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কিছু জিজ্ঞাসা করা মুনাসিব মনে করি নি। ঐ দিনের পর তাঁকে আরেকবার দেখার সুযোগ আমার হয় নি; তিনি চলে যান স্বীয় মাওলার একান্ত সান্নিধ্যে।

পরিশেষে এই দু'আই করি, 'আয় আল্লাহ তায়ালা! তোমার এই বান্দার সমস্ত নেক আমল কবুল করে নাও, তাঁর ছোট বড় সমস্ত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও এবং তাঁকে তোমার জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে আসীন করো! আর ইলমে নববীর পবিত্র কাননে ফুল ফুটানোর কাজে তাঁর মত আমাদেরকেও কবুল করো! আমীন!!

লেখক: সহকারী অধ্যাপক (মুফতী ও মুহাদ্দিস), শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদ্‌রাসা, পাঠানটুলা, সিলেট।

ক্ষণজন্মা মনীষী
শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রাহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

মাওলানা মশতাক আহমদ

৩৬০ আউলিয়ার দেশ হিসেবে পরিচিত সিলেট জেলাধীন জকিগন্জ উপজেলার রারাই নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৩৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এলাকার এক সম্মানিত আলেমে দ্বীন মাওলানা মুমতাজ আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। প্রাথমিক শিক্ষা এলাকার প্রাইমারি স্কুলে অর্জন করে পরবর্তীতে তাঁর বড় ভাই মরহুম মাওলানা নজীবুর রাহমান সাহেবের সাথে বদরপুরে চলে যান। পরবর্তীতে তিনি সড়কের বাজার আহমদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এসময় তিনি জেলাভিত্তিক প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ২য় স্থান অর্জন করে বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

পরবর্তীতে সেখান থেকে পূর্ব সিলেটের মাদরে উলূম নামে খ্যাত গাছবাড়ী জামিউল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৫৫ সালে আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে দ্বাদশ স্থান, ১৯৫৭ সালে ফাযিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ৩য় স্থান ও ১৯৫৯ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বাদশ স্থান অর্জন করেন।

১৯৫৫ সালের আলিম পরীক্ষায় গাছবাড়ী মাদ্‌রাসা থেকে তিনিই প্রথম সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছে জ্ঞানার্জন করেন।

তাঁর হাদীসের উস্তাযগণ

১। কামিল শ্রেণিতে যথাক্রমে বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড হযরত মাওলানা সইদ আলী (র:) (মৃত্যু সন-১৯৬১ খ্রি.) চুরাবই, বিয়ানীবাজার।

২। বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড অধ্যয়ন করেন সিলেটের বুলবুল নামে খ্যাত শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা শফিকুল হক (র:) (মৃত্যু সন-২০০১ খ্রি.)।

৩। মুসলিম শরীফ অধ্যয়ন করেন গাছবাড়ী অঞ্চলের মুফতি সাব হুজুর নামে খ্যাত হযরত মাওলানা আব্দুল গনি (র:) শেওলা, বিয়ানীবাজার (মৃত্যু সন-১৯৮৭ খ্রি.)।

৪। সুনানে নাসাঈসহ অন্যান্য কিতাব অধ্যয়ন করেন মরহুম শায়খুল হাদীস ইদ্রিস আহমদ শিবনগরী (র:) এর কাছে (মৃত্যু সন-২০০৭ খ্রি.)।

হাদীসের সনদ

গাছবাড়ী জামিউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার উস্তাযগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত শায়খুল হাদীস

মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর হাদীসের সনদ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

গাছবাড়ি জামিউল উলুম মাদ্‌রাসার তৎকালীন হাদীসের উস্তায মাওলানা সাঈদ আলী, শায়খুল হাদীস শফিকুল হক বুলবল সাব, মুফতি আবদুল গণী রাহিমাহুমুল্লাহ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। তাঁরা শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কাছ থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেন। তিনি শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট হতে, তিনি কাসিম নানুতাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট হতে, তিনি শাহ আব্দুল গণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট হতে, তিনি শাহ ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট হতে, তিনি তাঁর নানা সিরাজুল হিন্দ শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট থেকে, তিনি তাঁর পিতা ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কাছ থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে সকল ধারার উলামায়ে কিরামের হাদীসের সনদের মূলে রয়েছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। বাংলাদেশে প্রচলিত কওমী মাদ্‌রাসা, আলিয়া মাদ্‌রাসা অথবা বেরলবী ধারার মাদ্‌রাসা কেন্দ্রীক হাদীসের যেসকল উস্তাযগণ রয়েছেন সবার হাদীসের সনদ গিয়ে একই মোহনায় মিলিত হয়েছে।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর দুই উস্তায শায়খুল হাদীস শফিকুল হক বুলবুল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও শায়খুল হাদীস ইদরীস আহমদ শিবনগরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপমহাদেশেদের বিখ্যাত শায়খুল হাদীস, বাহরুল উলূম নামে খ্যাত সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসার তৎকালীন প্রিন্সিপাল আবুল ফাত্তাহ মোহাম্মদ হোসাইন নিজপাটি, জৈন্তাপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কাছে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসায় বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করে তাঁর কাছ থেকে সনদপ্রাপ্ত হন। তিনি মাওলানা নাজির হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কাছে কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করে সনদ লাভ করেন। তিনি হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মুহাশশী সহীহ বুখারী) এর কাছ থেকে তিনি, শাহ ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কাছ থেকে, তিনি শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কাছ থেকে, তিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কাছ থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেন।

মুহাদ্দিস ছাব হুজুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেশে ও বিদেশে আরও অনেকের কাছ থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেন।

গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদ্‌রাসায় ১৯৫৩-৫৪ শিক্ষা বর্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান মাদরারাসা শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড,

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা এর অধীনে কামিল শ্রেণি চলমান রয়েছে।

১৯৫৪ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত কত যে মনীষী উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে কামিল উত্তীর্ণ হয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন তা বলা বা লেখা দুষ্কর। বর্তমান গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস ড. মাওলানা ইবরাহীম আলী (হাফি:) এর মতে, দীর্ঘ সময়ে উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে কামিল উত্তীর্ণ যে মনীষীগণের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থকবে তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে হলেন তিন জন। ১) শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২) শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা হাফিজ জিল্লুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ৩) শায়খুল হাদীস হাফিজ মাওলানা আব্দুর রহিম হাফিযাহুল্লাহ (সাবেক অধ্যক্ষ)। যিনি বর্তমানে দারুল উলূম নিউইয়র্ক, আমেরিকায় খেদমতে রয়েছেন। সিলেটের বেশিরভাগ মাদরাসায় গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদ্‌রাসা থেকে উত্তীর্ণ আসাতিযায়ে কিরামের সনদে হাদীসের সনদ প্রদান করা হচ্ছে।

তৎকালীন সময়ে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে কামিল শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিতে বোর্ডে স্ট্যান্ড থাকা সত্ত্বেও শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গাছবাড়ী মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার সুযোগ না পাওয়া অনেক বিস্ময়কর। শিক্ষক নিয়োগে উপমহাদেশের নিচু মন মানসিকতা, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি, এলাকা প্রীতি, মসলক প্রীতি ও নানা পারিপার্শিকতার কারণে মাদরে উলূমে খেদমতের সুযোগ পান নাই তিনি। উক্ত কারণে শায়খুল ইসলাম মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতার সুযোগ পাননি। এইসব কারণে সিলেটের মাদ্‌রাসা শিক্ষা আজ প্রায় অর্ধ মৃত। যাই হোক মুহাদ্দিস ছাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর স্পর্শে সিলেটের বিখ্যাত দুইটি মাদ্‌রাসা সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসা, বিশ্বনাথ এবং ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা জকিগন্জ, কামিল স্তর পূর্ণতা লাভ করেছে। আমার মতে এটাই আল্লাহর হেকমত ছিল। প্রবাদ হলো-

প্রজ্ঞাময়ের কোন কর্ম প্রজ্ঞামুক্ত নয়। তাঁর মাধ্যমে ১৯৬৩ সালে সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায় কামিল শ্রেণি খোলা হয়। পরবর্তীতে ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা তাঁর স্পর্শে কামিল শ্রেণি পূর্ণতা লাভ করে।

বর্তমানে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে উনার হাতে গড়া ছাত্ররা ইলমে হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত আছেন। তিনি ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তা'লা তাঁর সকল খেদমত কবুল করে তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক (আরবী), গাছবাড়ি জামিউল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা, কানাইঘাট, সিলেট।

শায়খুনা ও উস্তাযুনা হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা মোঃ ফারুক আহমদ

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন ওয়ালিদ মুহতারাম ১৯৮৩ সালে আমাকে ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। তখন হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহকে দেখেই ভক্তি ও শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়ি। হুজুরকে দেখে মন ভরে যায়। নূরনী চেহারাখানা এতো সুন্দর দেখাচ্ছিল, এতো সুন্দর চমকাচ্ছিল যা দেখলে যেকোন কঠিন হৃদয় গলে যেতো। মনে হতো মকবুল এবং আল্লাহ ওয়ালা কামিল একজন মহান বুজুর্গ।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর জীবনের সকল কার্যক্রম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ তথা সুন্নতে নববীর অনুসরণেই ছিল। হুজুরের দিকে তাকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুপম আদর্শের কথা স্মরণ হতো।

আমি মক্তব চাহারম বর্তমান ইবতেদায়ী ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র। হুজুরের দ্বিতীয় ছাহেবজাদা মাওলানা আব্দুর রব বিলাল আমার সহপাঠি হওয়াতে তদারকি ও সুদৃষ্টি কোন অংশে বিলাল ভাই থেকে আমার প্রতি কম ছিল না। বিলাল ভাইয়ের মতো সমাদর আমিও পেতাম। পরীক্ষায় কে বেশি নম্বর উঠাতে পারি এ নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো। হুজুর আমাদেরকে অনেক উৎসাহ উদ্দিপনা দিতেন।

১৯৮৩ থেকে ১৯৯৬ দীর্ঘ ১৪ বছর আমি ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় লেখা পড়া করি। সুদীর্ঘ এই ১৪ বছরের শিক্ষা জীবনে হুজুরকে দেখেছি ছাত্রদের শুধু লেখা পড়া নয় আদব-কায়দা, চাল- চলন, ব্যবহার, বিনয়-নম্রতা ইত্যাদি বিষয়ে কড়া নজরদারীর সাথে হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন। একজন শিক্ষার্থী হিসেবে হুজুরের কাছ থেকে যা পেয়েছি তা স্মৃতিতে রয়েছে অম্লান। স্মৃতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে আজও অবধি।

যদিও আমি নিচের শ্রেণিতে পড়তাম, কিন্তু তদারকিতে হুজুরের কোনো অবহেলা বা কমতি ছিলনা। হুজুর প্রতিদিন যোহরের সুন্নত নামায পড়তেন খুবই ধীর স্থীরভাবে, যা আমরা পেছনে থেকেও অবলোকন করতাম। কি মন কাড়া সে দৃশ্য। বড় হয়ে বুঝলাম হুজুরের নামাযে এই خشوع ও خضوع (একাগ্রতা) এর প্রভাব সকল তালাবাদের উপর পড়তো।

হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতি শনি ও রবিবারে কামিল জামাতে দারস দিতেন। ছাহেব কিবলাহ যখন পড়াতে বসতেন এ সময় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ একজন সাধারণ ছাত্রের চেয়ে আরো অধিক বিনয়ী হয়ে নিজেকে গুটিয়ে বসতেন। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির পেছন পেছন আদবের সাথে হাঁটতেন এবং মসজিদ পর্যন্ত যখন পৌঁছতেন তখন হুজুর কোন

ছাত্রকে সুযোগ না দিয়ে নিজেই ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জুতাদ্বয় জড়িয়ে ধরে নিরাপদ স্থানে রাখতেন এবং নামাযান্তে আবারো জুতা ছাহেব কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির পায়ের সামনে আদবের সাথে রাখতেন। আমরা এসব দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতাম। উস্তাযের প্রতি ছাত্রের তাজিম, ভক্তি ও বিনয় কোন পর্যায়ে হতে পারে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও স্পষ্ট শিক্ষা এখানে বিদ্যমান রয়েছে।

কামিল জামাতে আমরা তখন ৪০ জন শিক্ষার্থী ছিলাম। মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর কাছে বুখারী শরীফ ও তিরমীযী শরীফ পড়তাম। হুজুর যখন ক্লাসে আসতেন তখন সকল ছাত্র হুজুরের দারস শুনার জন্য কান খাড়া করে রাখতেন এবং সচেতন হয়ে যেতেন। মতন পড়ার জন্য আমরা কয়েকজন প্রস্তুত থাকতাম।

আমার মনে পড়ে, একদিন মতন পড়ার সময় حتي يستقين বাক্যে আমি يستقين শব্দটির শেষ বর্ণে যবর পড়েছিলাম। তিনি তখন জিজ্ঞেল করেছিলেন কেন শেষ বর্ণে যবর পড়লে? আমি বলে ছিলাম حتيএরপর ان আমিলটি مقدر থাকে। আর ان যেহেতু مضارع এর فعل কে নসব প্রদান করে, তাই আমি যবর পড়েছি। হুজুর তা শুনে ماشاالله বলে ছিলেন। হুজুরের দারসে হাদীসে তিনি প্রতিটি শব্দ ও تشريح বুঝাতেন প্রাঞ্জল এবং সহজ ভাষায়। মনে হত যেমন তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে শুনেছেন সরাসরি। শুরু থেকেই দারসে এক আলোকময় নিরব ও নির্মল পরিবেশ বিরাজ করতো। তা এত চমৎকার ছিল যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর আচার আচরণ স্মৃতির মধ্যে নাড়া দেয় বারবার। যে কোন মুহূর্তে দেখা হলে বলতেন ফারুকনি? ভালো আছো নি? সেই মধুর ব্যবহার নাম ধরে ডাকা আজ আর শুনতে পাই না। আমাকে হুজুরের এই নাম ধরে ডাকা ছিল আমার জন্য গৌরবের বিষয়।

কতো স্বপ্ন দেখেছিলাম হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে নিয়ে। একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম

فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه احدا-

এই আয়াত আমি হুজুরকে পাঠ করে শুনাচ্ছি।

২০১৩ সালে পবিত্র মক্কা মুকাররামা ও মদিনা মুনাওয়ারা যিয়ারত করার সুযোগ আমার হয়েছিল। পাঁচ দিন মদিনা শরীফে থাকার সুযোগটি আল্লাহ তায়ালা করে দিলেন। তখন ছিল রজব মাস। পবিত্র মে'রাজের রাত সেখানে কাটালাম। কত নিয়ামতরাজি দেখলাম। হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদের পাশে আমাদের হোটেল ছিল। তখন হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহকে প্রায় স্বপ্নে দেখতাম। মনে হতো তিনি আমাদের সাথেই আছেন, আমরা কী করতেছি, তিনি নজর রাখছেন। আমার তখন বুঝতে বাকী রইলো না মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহর মর্যাদা কত মহান। আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তিনি কতো গ্রহণযোগ্য।

আমার উস্তায মহোদয়গণের মধ্যে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ অন্যতম। যার সুহবত ও দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ আমাকে মাদ্‌রাসার খাদিম হিসেবে কবুল করেছেন।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর ইশারায় শিকড় থেকে ইলমে নাহু শিক্ষার সুযোগ হয়েছিল। হুজুরের আপন ভাতিজা হযরত মাওলানা মোঃ আব্দুল মান্নান (রারাইর হুজুর) এর কাছে। কেননা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর ছাহেবজাদা জনাব মাওলানা আব্দুর রব বিলাল আমার সহপাঠি ছিলেন। হুজুর তাকে যে নজরে দেখতেন আমাকেও সে নজরে দেখতেন। হুজুরের দোয়া থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হইনি। এটা আমার অন্তরের বিশ্বাস। উল্লেখ্য, জকিগন্‌জ উপজেলার সুলতানপুর ইউনিয়নের কাচারচক গ্রামে আমার বাড়ি। আমার গ্রামবাসী মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসেন, মহব্বত করেন। এ জন্য গ্রামবাসী সর্ব সম্মতভাবে, সকলের ঐক্যমতে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর নামানুসারে ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন কাচারচক হাবিবিয়া হিফজুল কুরআন মাদ্‌রাসা। এ মাদ্‌রাসা উদ্বোধন করেন হুজুর নিজেই। উদ্বোধনের পর থেকে মাদ্‌রাসার কার্যক্রম অত্যন্ত সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে আজ পর্যন্ত।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ গঙ্গাজল ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন কমিটির একজন তত্বাবধায়ক ছিলেন। ২০০২ সাল থেকে শুরু করে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রায় সকল মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকতেন। রবিউল আউয়াল মাস আসলে তিনি আমাদের মাহফিলের খোঁজ খবর নিতেন। হুজুর যখনই মাহফিলে আসতেন দলমত নির্বিশেষে সকলেই নিরবে মাহফিলে বসে উনার মূল্যবান নসীহত শুনতেন। এলাকার সকল লোক শুনতে থাকতো হুজুরের নসীহত। হুজুর এতো সুন্দর বয়ান পেশ করতেন যে, মানুষের আত্মার খোরাক হয়ে যেতো। এত চমৎকার উপস্থাপন ও আদব রক্ষা করে শব্দ চয়ন করে মনোমুগ্ধাকর উপস্থাপনা স্মৃতির মধ্যে নাড়া দিতো সকল শ্রোতার।

ان من البيان لسحرا

হাদীস শরীফের এই বাণীর বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে হুজুরের প্রতিটি বয়ান।

মহান আল্লাহ তায়ালা হুজুরকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমাদেরকে তাঁর রূহানী ফয়েয নসীব করুন। আমিন।

লেখক: আরবি প্রভাষক, জকিগন্‌জ ফাজিল সিনিয়র মাদ্‌রাসা, সিলেট।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ইলমে হাদীসের অনন্য সাধক

মাওলানা আব্দুল হান্নান তুরুকখলী

পাক-ভারত উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের খেদমত করে যারা ইতিহাসে স্মরণীর ও বরণীর হয়ে আছেন জৌনপুরী সিলসিলার প্রখ্যাত বুযুর্গ শামসুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অন্যতম খলিফা সিলেট জেলার জকিগন্জ উপজেলার রারাই নিবাসী বিশ্ব বরেণ্য শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান (১৯৩৪ - ২০২২খ্রিঃ) তাঁদের মধ্যে একজন। এই মহান মনীষীর ৮৮ বছরের পবিত্র জীবনকালের ৫৭ বছরই কাটিয়ে দিয়েছেন ইলমে হাদীসের খেদমতে। ইলমে হাদীসের খেদমতে তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমই তাঁকে ইতিহাসে চির অমর করে রেখেছে। হাদীসের খেদমতে তাঁর এই আত্মত্যাগ আমাদেরকে চিরদিন অনুপ্রেরণা দিতে থাকবে।

হাদীস শাস্ত্রের অনন্য দিকপাল শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ হাদীস শিক্ষা গ্রহণে যে কঠোর সাধনা করেছেন তাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষর রয়েছে। হাদীস শিক্ষার ব্যাপারে তিনি পূর্ববর্তী বিশ্বসেরা মুহাদ্দিসগণের রীতিনীতি অনুসরণ করেছেন। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইবনে মাজাহ রাহিমাহুমুল্লাহ সহ বিশ্বসেরা মুহাদ্দিসগণ হাদীস শিক্ষার ব্যাপারে যেসব নীতি গ্রহণ করেছেন এবং সেভাবে কঠোর সাধনা করছেন, ঠিক তেমনি কঠোর সাধনা করছেন শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ।

পূর্ববর্তী বিশ্বসেরা মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস কঠোর সাধনা করতেন। এমনকি এ ব্যাপারে তাঁরা জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। ইমাম মুসলিম (রঃ) এক হাদীসের মজলিসে একবার তাঁকে কোনো এক হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তৎক্ষণাত তিনি হাদীসখানা সম্পর্কে সুষ্ঠু জবাব দিতে পারলেন না। ঘরে পৌঁছে তিনি উক্ত হাদীস অন্বেষণে লিপ্ত হলেন। এ ব্যাপারে গভীর মনোযোগ দিলেন, ইত্যবসরে এক ডালা খেজুর খাওয়ার জন্য ইমাম মুসলিমের সম্মুখে পেশ করা হয়। তিনি একদিকে হাদীস খুঁজতে থাকেন এবং অন্যদিকে এক একটি করে খেজুর খেতে থাকেন। এ অবস্থায় সকাল হয়ে যায়, ডালার খেজুর শেষ হয়ে যায় এবং তিনি ওই হাদীসখানাও পেয়ে যান। হাদীস অন্বেষণে তিনি এত অধিক বিভোর ছিলেন যে তিনি বুঝতে পারেননি যে, এত অধিক খেজুর খেয়ে ফেলেছেন। ফলে বদহজমজনিত পেটের অসুখে তিনি ইন্তেকাল করেন। (তারিখে বাগদাদ- খতীর আল-বাগদাদী)।

শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন এতদাঞ্চলের আলেমগণের-মুহাদ্দিসগণের মধ্যমণি। তাঁর নিকট হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে উলামায়ে কেরামগণ বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করতেন। এ কারণে তিনি হাদীস অন্বেষণে এমন গভীর মনোযোগ দিতেন, যাতে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে যেত- এরপর তিনি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সঠিক জবাব দিতেন। সত্যিই তিনি ছিলেন পূর্ববর্তী বিশ্বসেরা মুহাদ্দিসগণের যোগ্য উত্তরসূরী। তিনি পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের রীতি অনুসারেই হাদীস অন্বেষণে কঠোর সাধনা করেছেন। তিনি ছিলেন ইলমে হাদীসের একজন মহান সাধক।

হাদীস জগতের উজ্জল নক্ষত্র, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ সমকালীন বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর কয়েকজন হাদীসের উস্তাদের মোবারক নাম হচ্ছে- শামসুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (১৯১৩-২০০৮ খ্রিঃ), শায়খুল হাদীস আল্লামা সাঈদ আলী (১৯০৭ - ১৯৬৪ খ্রিঃ), শায়খুল হাদীস আল্লামা শফিকুল হক (১৯২৭ - ২০০১ খ্রিঃ), শায়খুল হাদীস আল্লামা ইদ্রীস আহমদ (১৯২৪ - ২০০৭ খ্রিঃ), শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আব্দুল গণি (১৯২০-১৯৮৭ খ্রিঃ), শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল ওয়াহিদ (১৯০৮ - ১৯৮১ খ্রিঃ), শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ হুসাইন সিলেটী (১৮৯০ - ১৯৭২ খ্রিঃ), মুফতি সাইয়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী (১৯১১ - ১৯৭৪ খ্রিঃ), মুহাদ্দীসুল হিজায সাইয়্যিদ মুহাম্মদ বিন আলাওয়ী আল মালিকী আল মাক্কী (১৩৬৫ - ১৪২৫ হিজরি), সুলতানুল উলামা সাইয়্যিদ সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ শাতিরী শাফিয়ী ইয়ামনী (১৩৫৯ - ১৪৩৯ হিজরি)।

শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী। ছাত্র অবস্থায়ই তিনি ছিলেন অত্যন্ত তাকওয়ার অধিকারী। তাঁর এসব মহৎ গুণাবলীর দ্বারা তিনি তাঁর সকল উস্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। তাঁর উস্তাগণ রূহানী তাওয়াজ্জুহ' তাঁর প্রতি ঢেলে দেন, ইলমের ভাণ্ডার খুলে দেন তাঁর জন্য। এরই ফলে পরবর্তীতে তিনি হয়ে যান বাহরুল উলূম, বরেণ্য মুহাদ্দিস।

হাজার হাজার উলামায়ে কেরামের উস্তায শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর হাদীসের খেদমত শুরু করার একটি অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। এ অলৌকিক ঘটনাটি তাঁর নিজ কলমে বিবৃত হয়েছে এভাবে-

কামিল পরীক্ষার পর আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম। পরীক্ষার পর অনেক দিন বাড়িতে অবস্থানের পর কিছুটা সুস্থ হয়েছি। একদিন বিকেলে আমার একজন উস্তায হযরত মাওলানা শামসুল হুদা সাহেব এলেন। গাছবাড়িতে তাঁর কাছে হাদীস পড়েছি। বললেন, 'তুমি আমার মাদ্‌রাসায় (ইছমতি) চলো।' আমার বাবা তখনো জীবিত আছেন। তাঁর

অনুমতি চাইলে তিনি জবাবে বললেন, আমি কী বলবো, আপনারা যে কাজের উপযুক্ত করে গড়েছেন সে কাজে নিয়ে লাগান, আমি মাদ্‌রাসায় চলে গেলাম, পড়ানো শুরু হলো। এর মাঝেই সিদ্ধান্ত হলো, হাদীস শরীফ পড়ানো হবে। কারণ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা (মাওলানা মতিউর রহমান চৌধুরী) নাকি হাদীস পড়ানো দিয়ে শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরে হাদীস শরীফ পড়ানো বন্ধ হয়ে যায়। আমি তো ইতিপূর্বে হাদীস শরীফ পড়াইনি। এছাড়া পড়ার সময় হাদীস পড়াতে হবে এমন কথা মনে আসেনি কখনো। চলে গেলাম ছাহেব কিবলাহর কাছে। তিনি বললেন, আল্লাহর উপর ভরসা করে পড়াও, হাদীসও পড়াও। আরয করলাম, এখানে ছাত্র আসবে না হাদীস পড়তে। কারণ হাদীস ক্লাসের অনুমোদন নেই। বললেন, যার মুকদ্দরে আছে তোমার কাছ থেকে হাদীস পাবে সে তো আসবে। এ সময় বিলপারী সাহেব (হাফিজ মাওলানা নুরুল হক) গং কে ছাহেব কিবলাহ ইছামতিতে হাদীস পড়তে পাঠান। ছাহেব কিবলাহর ইজাযত অনুসারে পড়াতে শুরু করলাম। প্রথম দিকে নাসায়ী শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ ও তাফসীরে বায়দাভী এসব পড়াতাম। ১৯৬৩ সালের ১১ এপ্রিল ফুলবাড়ি মাদ্‌রাসায় যোগদান করি। সেখানে হাদীস জামাআ'ত নেই, ফাযিল পর্যন্ত পড়ালাম। এর সাত মাস পরে ছাহেব কিবলাহ জোর করে বললেন, সৎপুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় আমিই টাইটেল ক্লাস শুরু করিয়েছি। তুমি সেখানেই যাবে। একদিকে অনেক দূর এবং অপরিচিত জায়গায় যেতে আমার কিছুটা পিছুটান ছিল। এসময় একদিক বড় বেয়াদবি করেছি। আমি তখন কিসমত মাইজভাগ লজিংয়ে ছিলাম। রাস্তার কাছে গাড়ি থামিয়ে ছাহেব কিবলাহ এগিয়ে গিয়ে আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমার যা কিছু প্রয়োজন তা মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে না, আমিই দেবো। তুমি সেখানে চলে যাও। আর পড়ানোতে তোমার সহযোগী হিসেবে গোটারগ্রামী মুহাদ্দিস সাহেবকে (মরহুম শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল জব্বার) দিচ্ছি। তিনি তখন গঙ্গাজল মাদ্‌রাসায় কর্মরত। তাঁকে হুকুম করলেন এই শনিবার থেকেই চলে যাও। আর আমি গেলাম এর এক সপ্তাহ পর।

১৯৬৩ সালের ২৩ নভেম্বর যুহরের জামাতের কিছুক্ষণ পর মাদ্‌রাসায় গিয়ে পৌঁছি। ছাহেব কিবলাহ (সৎপুর যাওয়ার জন্য) খুব জোর দিলেন। অথচ আমি বড় বেআদবী করেছি, যেতে চাইনি। অল্পদিন পর মাদ্‌রাসা গরমের ছুটি হলে বাড়িতে এলাম। খাদিমানীকে বললাম, চলুন ছাহেব কিবলাহকে দেখে আসি। গরমের দিন, দুপুরে খাবারের পর বাইরের ঘরে ছাহেব কিবলাহ আরাম করছেন। আমরা খিদমত করছি। এ সময় আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাকে জোর করে সৎপুর দিলাম। আসলে আমি বড় পেরেশানিতে পড়েছিলাম। কারণ সেখানে কালিম ক্লাস আমিই শুরু করিয়েছি। মুহতামিম সাহেব ভাবুক মানুষ। তিনি কাউকে খোঁজ করবেন না। আমাকেই দিতে হবে মুহাদ্দিস। বড় পেরেশানির মধ্যে পড়ে গেলাম। কাকে দেব খুঁজে পাচ্ছি না। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। নিজে কামিল শুরু করিয়েছি, অথচ উস্তায যদি দিতে না পারি, একদিন

খুবই কাতর মনে বসে আছি। হঠাৎ করে আল্লাহপাক চোখের হিজাব সরিয়ে দিলেন। দেখি হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ রেখেছেন। আরয কলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! স্বপ্ন দেখে বড় সাধ করে হাদীসের ক্লাস খুলেছি, পড়ানোর জন্য কাকে দেব খুঁজে পাচ্ছি না। এ সময় আঙ্গুল মুবারক দিয়ে ইশারা করে দেখালেন। আমি পুরা ফিরব কেমনে, বেয়াদবি হবে। আস্তে করে চোখ ফিরিয়ে দেখি তুমি আমার পেছনে বসা। এ কারণেই তোমাকে এতো জোর করলাম। তাৎক্ষণিক আমি কদম শরীফ ধরে আরয করলাম, আমি তখন বুঝিনি, যেতে দেরি করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। এভাবেই শুরু হলো হাদীস শরীফ পড়ানো। (সূত্র- মাসিক পরওয়ানা : জানুয়ারি-২০২৩)।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান (রঃ) হাদীসের খেদমত করেন সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসা ও ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসায়। এসব মাদ্‌রাসায় হাজার হাজার হাদীস পিপাসু তাঁর নিকট থেকে ইলমে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। যার পূর্ণ তালিকা দিতে হলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখতে হবে। তিনি বিদেশে দাওয়াতি সফরে গিয়েও হাজার হাজার উলামায়ে কেরামকে হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন এবং সনদ প্রদান করেছেন।

১৯৮১ সালের পর প্রায় প্রতি বছরই তিনি যুক্তরাজ্য সফরে করেন। ২০০৯ সালে যুক্তরাজ্য সফর করলে বৃটেনে বসবাসরত তাঁর ছাত্রদের অনুরোধে তিনি সেখানে প্রায় নয় মাস অবস্থান করেন। সে সময় প্রতি শনিবার লন্ডনস্থ দারুল হাদীস লতিফিয়ায় শামাইলে তিরমিজী নামক বিখ্যাত হাদীসের কিতাব সম্পূর্ণ দারস দান করেন। নিয়মিত সে দারসে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুল সংখ্যক উলামা এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করতেন। দারস পূর্ণ হলে দুই শতাধিক আলমকে তিনি শামাইলে তিরমিজীর সনদ প্রদান করেন। ব্রিটেন সফরকালে তিনি বিভিন্ন শহরে রিয়াদুস সালিহীন এবং আল-আদাবুল মুফরাদ নামক হাদীসের কিতাব দারস প্রদান করেন।

২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি সিরিয়া সফর করেন। সে সফরে দামেশকের প্রখ্যাত হানাফী আলেম, আল ফিকহুল হানাফী ওয়া আদিল্লাতুহু সহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা শায়খ ড. আসাআদ মুহাম্মদ সাঈদ সাগিরজী তাঁর কাছ তেকে ইলমে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন। সনদ গ্রহণ উপলক্ষে শায়খ সাগিরজী দামেশকের খ্যাতনামা উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে ২৯ অক্টোবর এক নৈশভোজের আয়োজন করেন। ভারতের আসাম প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে সফরকালে উলামায়ে কেরামের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে হাদীস শরীফের দারস প্রদান করেন।

২০১৭ সালের ৪ ডিসেম্বর বাহরাইনের শায়খ ড. নাজী বিন রাশীদ শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর নিকট কিছু হাদীস পড়ে সনদ গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ খ্রিঃ জন্মগ্রহণকারী শায়খ ডঃ নাজী বিন রাশীদ আল আরাবী আল মালিকী বাহারাইনের একজন প্রখ্যাত আলেম। তিনি বাহরাইন ইউনিভার্সিটির আরবী ও

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক। এভাবে অসংখ্য-অগণিত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করে সনদ লাভ করেছেন।

বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহমাহুল্লাব পৃথিবীতে চির স্মরণীয় থাকবেন তাঁর অমর লেখনী দিয়ে। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী চিরদিন আমাদেরকে সঠিক পথে চলতে অনুপ্রেরণা দেবে। তাঁর লিখিত ও সংকলিত ১৭টি গ্রন্থ তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত প্রায় সবকটি গ্রন্থই হাদীস বিষয়ক বা হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেই এসব গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে-

(১) আল-কাউলুল মাকবুল ফী সীলাদির রাসূল, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৭। (২) দোয়ায়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফজিলত, প্রথম সংস্করণ- ১৩৯৪ হিজরি। (৩) মাসআলায়ে উশর : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০৬। (৪) দুরূদ শরীফের ফজলিত ও ওজীফা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৯। (৫) জিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা (ফজিলত ও নিয়ম), প্রকাশকাল-১৯৯৯। (৬) আসহাবে বদর, প্রকাশকাল- ১৯৯৮। (৭) ওজীফা, প্রকাশকাল- ১৯৯৮। (৮) হজ ও জিয়ারত (সংক্ষিপ্ত আহকাম ও নিয়ম), প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৯। (৯) হাদিয়াতুল লাবীব ফী নাবযাতিম মিন সীরাতিন নাবিয়্যিল হাবীব (সীরাতে হাবীবে খোদা), প্রকাশকাল- ২০১২। (১০) যাখীরাতু আহাদীসিল আরবাঈন ফী ফাদাইলি সাইয়্যিদিল মুরসালিন (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফজিলত বিষয়ক ৪০ হাদীস), প্রকাশকাল- ২০১১। (১১) কানযুল আহাদীসিল আরাবাঈন ফী মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যিল আমীন (আহলে বাইতের মানাদিক বিষয়ক ৪০ হাদীস), প্রকাশকাল- ২০১১। (১২) তুহফাতুল লাবীব বি আসানীদিল হাবীব (আরবী), প্রকাশকাল- ১৯৮৫। ইলমে কিরাত, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকাহ, ইলমে তাসাউফ ও ইলমে তাফসীরে তাঁর উস্তায ও শায়খগণ প্রদত্ত সনদ এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। (১৩) আততুহফাতুল লাতিফাহ ফী আহাদীসিল মুসালসালাতিল মুনীফাহ, প্রকাশকাল- ২০০৯। আরবী ভাষায় রচিত এ গ্রন্থে তাঁর শায়খগণ প্রদত্ত মুসালসাল হাদীস সমূহের সনদ বিধৃত হয়েছে। (১৪) দালাইলুল খাইরাত, ইমাম জাজুলী (রঃ) প্রণীত দুরূদ শরীফের এ কিতাবখানা তাহকীক এবং ওযীফা আকরে পড়ার বিন্যাস করেছেন তিনি। প্রকাশকাল- ২০১০। (১৫) আল-হিযবুল আযম, ইমাম মোল্লা আলী (রঃ) প্রণীত এ কিতাব তিনি তাহকীক করেছেন। প্রকাশকাল- ২০১৬। (১৬) দারসে হাদীস-১। এতে হাদীসের নিয়ত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশ মর্যাদা বিষয়ক একটি হাদীসের উপর প্রদত্ত দারস গ্রন্থিত হয়েছে। প্রকাশকাল- ২০১৮। (১৭) সালাতুত তারাবীহ, প্রকাশকাল- ২০১৯ (সময়ের সাক্ষী: মো. আবদুল আউয়াল হেলাল, প্রকাশকাল- ২০১৯)।

সুন্নাতে নববী অনুসরণে অনুপম দৃষ্টান্ত ছিলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার বাস্তব উদাহরণ ছিলেন। তাঁর চাল-চলন, উঠা-বসা, কথাবার্তা থেকেই পেয়েছেন পথহারা মানুষ সঠিক পথের সন্ধান। ইলমে হাদীসের প্রচার-প্রসারে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তাঁর তুলনা বিরল। তিনি যখন মজলিসে নবীজির হাদীস পাঠ করতেন তখন নবীর প্রেমে তাঁর অন্তর বিগলিত হয়ে যেত, হাদীসের প্রতিটি শব্দ উচ্চারণে তাঁর অন্তর কেঁপে উঠত। শুনে হাজিরানে মজলিস নবীর প্রেমে ব্যাকুল হয়ে যেতেন। হাদীসের দারস প্রদানকালে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোবারক নাম, সাহাবায়ে কেরামের মোবারক নাম অত্যন্ত আদবের সাথে উচ্চারণ করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ের কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এমন দৃষ্টান্ত খুবই কম পাওয়া যায়। একবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে হাদীস শিখতে হয়- শেখাতে হয়, কীভাবে হাদীসের খেদমত করতে হয়, প্রচার ও প্রসার করতে হয়। তিনি তাঁর ওফাতের পূর্ব পর্যন্তই ছিলেন ইলমে হাদীসের খেদমতে ব্যস্ত-মহাব্যস্ত। সত্যিই শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন ইলমে হাদীসের অনন্য সাধক।

লেখক: প্রবন্ধিক ও কলামিস্ট।

একজন ওলীর চেহারার প্রভাব

মাওলানা রুহুল আমীন সাদী

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর চেহারার দিকে একবার তাকালেই এক অন্যরকম শ্রদ্ধা ও ভালোলাগা কাজ করতো। আমি তাকিয়ে দেখতাম উনাকে, দূর থেকে।

কাছে যাওয়ার সুযোগ কম ছিল। কারণ আমি উনার সরাসরি ছাত্র ছিলাম না বা এমন কোনো কাজ ছিল না যার অজুহাতে কাছাকাছি যাওয়া যায়। তাই বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে দূর থেকে দেখতাম এবং বয়ান শুনতাম।

হজরতের বয়ানের মধ্যে রেফারেন্স এবং যুক্তি ও ভক্তির সমাহার ছিল আলহামদুলিল্লাহ। মানুষ তন্ময় হয়ে শুনতো। কিন্তু আমার মনে হত তাঁর নুরানি চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতে।

শায়খুল হাদীস হওয়ার কারণে অগনিত ছাত্র তৈরি করেছিলেন তিনি। এসব ছাত্ররা বিভিন্ন মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল, মুহাদ্দিস কিংবা আলোচক হিসেবে এখনো দ্বীনি কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

আমার জীবনে সরাসরি হজরতের সামনে বসে কথা বলেছিলাম ইছামতি মাদ্‌রাসায়। দশ বারো বছর আগে। সেখানে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক রাহিমাহুল্লাহ এর একটি রাজনৈতিক সফর উপলক্ষে গিয়েছিলাম।

শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক রাহিমাহুল্লাহকে একান্তে নিজের কক্ষে নিয়ে বসিয়ে কথা বলেছিলেন আমাদের অঞ্চলের রত্ন শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ।

দুজনই আজ দুনিয়ার জিন্দেগী শেষ করে আখেরাতের সফরে। আল্লাহ উনাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ প্রকৃতপক্ষেই আল্লামা ছিলেন। ইলমের সমুদ্র ছিলেন। উম্মাহর ঐক্যের জন্য চেষ্টা করেছেন আজীবন। আল্লাহ আমাদের এই অঞ্চলে আরও এরকম দরদী আলেম তৈরি হওয়ার সুযোগ দান করুন। মরহুমের দ্বীনি চেতনার পথে আমাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।।

লেখক : (সাইমুম সাদী) প্রাবন্ধিক ও জনপ্রিয় এক্টিভিস্ট।

স্মৃতিকথা
উস্তাযুল মুহাদ্দীসিন আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা মোঃ রেদ্বাউল করীম

ইলমে হাদীসের এক অনন্য খাদিম, সিলেটের কিংবদন্তি আলেম, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান (রহ)। তিনি উস্তাযুল আসাতিযা, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন, আমার প্রিয় উস্তায। শিক্ষা জীবনের কিছু সময় এ মহামনীষীর সান্নিধ্যে অতিবাহিত হয়েছে কামিল জামাতে অধ্যয়নের সুবাদে। দু'টি বৎসর খুব কাছ থেকেই হুজুরকে দেখার ও বুঝার সুযোগ হয়েছিল।

আমার মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন শুরু হয়েছিল ১৯৮৯ইং সালে। তখন থেকেই হুজুরের নামের সাথে পরিচিত। প্রথম দেখাও হয় হুজুরের সাথে একবার আমার ফুফাতো ভাই মাওলানা নজরুল ইসলাম মিটিপুরী সাহেবের বাসায়। সেসময় বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন হুজুরের কাছে দোয়ার জন্য।

১৯৯২ সালে ভর্তি হই সোবহানীঘাটস্থ হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় দাখিল নবম শ্রেণিতে। হুজুর মাদ্‌রাসার জলসায় আসতেন। দুর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। সকলের মুখে হুজুরের প্রশস্তি শুনতাম। তখনও হুজুর সকলের কাছে মুহাদ্দিস ছাব নামে পরিচিত ছিলেন। এ সময় জেনেছিলাম হুজুরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাসিক শাহজালাল নামে ম্যাগাজিন বের হয়। হোস্টেলে অবস্থানের কারণে মাঝে মাঝে বিকেলে মাসিক শাহজালাল অফিসে ঘুরতে যেতাম। অফিসটি ছিল বর্তমান ইবনে সিনা পয়েন্ট থেকে সামান্য উত্তরে, রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে।

হুজুরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা এবং জানার আকাংখা প্রবলভাবে তৈরি হয় এ সময়েই। মাওলানা আব্দুর রহমান বড়লেখী হুজুর ক্লাসে আমাদের সাংগঠনিক দৃঢ়তা আনয়নে ও মসলকী ইখতিলাফি বিষয়গুলো আলোচনা করতে গিয়ে প্রায়ই হুজুরের রেফারেন্সে কথা বলতেন। মুহাদ্দিস ছাব হুজুরের প্রশংসা করতেন। আমরা বিস্মিত হতাম, মুগ্ধ হতাম চমৎকার সমাধান পেয়ে।

১৯৯৮ সাল। ফুরিয়ে আসে সোবহানীঘাটে অধ্যয়নকাল। সোবহানীঘাট মাদ্‌রাসা তখন ছিল ফাযিল পর্যন্ত। ফাযিল পরীক্ষা সমাপনান্তে চিন্তিত হয়ে পড়ি কামিল অধ্যয়নের ব্যাপারে। একদিন বড়লেখী হুজুর কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কোথায় ভর্তি হওয়ার মনস্থ করেছো? জবাব দিলাম, এখনও সিদ্ধান্তে পৌছতে পারিনি। হুজুর বললেন, খুব ভেবে লাভ নেই। হাদীস বিভাগে পড়বে যখন তখন হাদীসের বটবৃক্ষের ছায়ায় যাও।

তিনি ইছামতি মাদ্‌রাসায় ভর্তির পরামর্শ দিলেন। বাবা ও সম্মতি দিলেন। ভর্তি হয়ে গেলাম ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায়। আল্লামা হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাব এ প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল। কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে হৃদয় পুলকিত হল।

ভর্তির পর নির্ধারিত সময়ে ক্লাস শুরু হল। হুজুর প্রতিদিন মাদ্‌রাসার প্রথম তিন পিরিয়ড একাধারে আমাদের ক্লাস নিতেন। দিন দুয়েক ক্লাস করার পর একদিন সকালে হুজুরের সাক্ষাতে গেলাম। হুজুর প্রতিদিন সকাল ৮/৯ টায় মাদ্‌রাসায় চলে আসতেন। হাদীসের কিতাব অধ্যয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, দারসের প্রস্তুতি নিতেন। দীর্ঘ সময়ে লক্ষ্য করেছি এ সময় হুজুর বেশি কথাবার্তা বলতেন না। কেউ সাক্ষাতে এলে বিরক্ত বোধ করতেন, আমরা অনুমান করতাম। সকালে মাদ্‌রাসায় আসার একমাত্র উদ্দেশ্যেই ছিল কিতাব মোতালাআ। কামিল জামাতের ক্লাস যখন শেষ হয়ে এসেছিল সেসময় একদিন নসিহত স্বরূপ বলেছিলেন, আপনারা একদিন হয়তো শিক্ষকতা পেশায় নিজেকে নিয়োজিত হবেন। প্রস্তুতি গ্রহণ না করে কখনো ক্লাসে যাবেন না। আমি শিক্ষাদানে দীর্ঘ সময় পার করেছি। আজ ও কিতাব মুতালাআ না করে একদিনও ক্লাসে যাইনি। কর্ম জীবনে বহু সময় অতিবাহিত করে ফেলেছি। আজও ভাবি হুজুরের নসিহতটি নিয়ে। আফসোসের পাল্লাই ভারী হয়।

আগেই বলেছি, কামিল জামাতে এ ব্যাচের আমরা সবাই প্রায় নিয়মিত ক্লাস করতাম। হুজুর বুখারী শরীফের দারস দিতেন। প্রথমদিকে হুজুর হাদীসের ইবারত পড়ে শুনাতেন, প্রয়োজনীয় শাব্দিক বিশ্লেষণ করতেন। এরপর তাত্ত্বিক আলোচনায় যেতেন। সবাই সমান আগ্রহে সানন্দে হুজুরের আলোচনা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতো। বিস্মিত হতাম এতো সুন্দর আলোচনা। নতুন নতুন তত্ত্বের সমাহার থাকতো সে আলোচনায়। দীর্ঘ সময়ের ক্লাস ফুরিয়ে গেলেও মনে হতো হাদীসের উপর হুজুরের আলোচনা এখনও শেষ হয়নি। এমনটি সকলেই অনুধাবন করতো, হুজুর চলে যাওয়ার পর কেউ না কেউ প্রতিদিন প্রকাশ করতো। সহপাঠীদের কিছু সংখ্যক খুব ছটফটে ও চঞ্চল প্রকৃতির ছিল। তারাও হুজুরের আলোচনা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতো। কিছুদিন পর আমাদের হাদীসের ইবারত পড়ার জন্য বললেন। একটা একটা করে আমরা হাদীস পড়লে হুজুর হাদীসখানা নিয়ে আলোচনা করতেন। শব্দের সঠিক ও সুস্পষ্ট উচ্চারণের প্রতি আমাদের নির্দেশনা দিতেন। তাড়াহুড়ো মোটেই পছন্দ করতেন না। ইবারত পড়া নিয়ে আমাদের প্রতিযোগিতা হতো। কে ইবারত পড়বে হুজুর নির্দিষ্ট করে বলতেন না। তবে একজন এক বা দু'টি হাদীস পড়ার পর দ্বিতীয়বার পড়তে চাইলে বলতেন আরেকজন পড়ো। হুজুরের এ হিকমত একদিকে যেমন প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি করেছিল অপরদিকে সকলকে স্বেচ্ছায় ভয়ভীতি ছাড়া ইবারত পড়তে অনুপ্রাণিত করছিল।

বলছিলাম হুজুরের সাথে প্রথম সাক্ষাতের কথা। আমাদের এলাকার এক ভাই সেসময়

নিয়ে গিয়েছিল হুজুরের অফিসে। তার নাম আব্দুর রহিম। বর্তমানে লন্ডন প্রবাসী। তখন সে ফাযিল জামাতে পড়তো। হুজুরের সামনে যেয়ে কদমবুসি করে যখন দাঁড়ালাম তখন সে আমার পরিচয় দিল। পরিচয় পর্বের এক পর্যায়ে বলল, মাওলানা নজরুল ইসলাম মিটিপুরী সাহেবের মামাতো ভাই। হুজুর বললেন, এই পরিচয়ে আর কি লাভ যদি না নিজের পরিচয় নিজে তৈরি করতে পারো। প্রথমে কিছুটা বিস্মিত হলাম। আজ উপলব্ধি করতে পারছি হুজুর সেদিন কি বুঝাতে চেয়েছিলেন। এরপর লেখাপড়ার খবর জানলেন, পারিবারিক কিছু বিষয়াদি জিজ্ঞাসা করলেন এবং নসিহত করলেন যেন নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হই, স্বার্থক করে তুলি শিক্ষার জন্য এতদূরের অবস্থানকে। মুগ্ধ হলাম হুজুরের আন্তরিকতাপূর্ণ নসিহতে। প্রথমদিকে যে ঘোর তৈরি হল তা কেটে গেল পরবর্তী আলোচনায়। কিছু সময় পর দোয়া নিয়ে চলে আসি ক্লাসে। এরপর মাঝেমধ্যে হুজুরের অফিসে যেতাম। যখনই যেতাম দেখতাম হুজুর কিতাব অধ্যয়নে মগ্ন। কাগজ দিয়ে চিহ্নিত করে কিতাব বন্ধ করে আমাদের সাথে কথা বলতেন। দাওয়াতি প্রোগ্রাম, পারিবারিক কার্যাদি সবকিছু সামলেই নিয়মিত মাদ্‌রাসায় সবার আগেই চলে আসতেন। কখনো হুজুরের চোখেমুখে ক্লান্তির কোন ছাপও পেরেশানী কিংবা মলিন মুখ কখনো দেখিনি।

ছাত্রদের প্রতি হুজুরের আন্তরিকতা ছিল অতুলনীয়। যারা হুজুরের সামনে গিয়েছে তাদের সঙ্গে তিনি হৃদ্যতার সাথে কথা বলতেন। পারিবারিক খোঁজখবর নিতেন, সার্বিক অবস্থা জানার চেষ্টা করতেন। কখনও রাগান্বিত বা বিরক্ত হতে দেখিনি। সদা মুখে মুচকি হাসির ঝিলিক লেগে থাকতো। হুজুরের কোমল ব্যবহারে মুগ্ধ হতো সাক্ষাতে আসা লোকজন।

২০০৬/৭ সাল। মাথিউরা মাদ্‌রাসায় চাকরি করছি। মাদ্‌রাসার বার্ষিক জলসায় প্রধান অতিথি হয়ে এলেন মুহাদ্দিস ছাব হুজুর। দেখা করলাম হুজুরের সাথে। বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেন, খোঁজ নিলেন পারিবারিক বিষয়াদির। জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি এখনও লেখাপড়া করো। হুজুর জানতেন আমি এম সি কলেজ থেকে প্রাইভেট ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়েছি। বললাম ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্স সম্পন্ন করছি ২০০৪ সালে। এখন আর লেখাপড়া করছি না। হুজুর বললেন, এলএলবিটা করে নাও, তখন জাগতিক বিধানের সাথে ইসলামী বিধানের পার্থক্যগুলো বুঝতে পারবে। কর্মজীবন আর পারিবারিক ব্যস্ততায় সময় সুযোগ হয়ে উঠেনি। চলে যায় কয়েকটি বৎসর।

২০১০ সালে চলে আসি সোবহানীঘাট মাদ্‌রাসায়। হুজুরের নির্দেশ হৃদয়ে গাঁথা ছিল। ভাল সুযোগ তৈরি হল। সিলেট ল কলেজে ভর্তি হলাম। এলএলবি সম্পন্ন করলাম ২০১৭ সালে। আজ আর মনে নেই হুজুরকে সে এলএলবি'র ফলাফল জানিয়েছিলাম কি না?

হুজুরের স্মরণশক্তি ছিল অতি প্রখর। ভীষণ অসুস্থ তিনি। মাউন্ট এডোরা হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। দেখতে গেলাম হুজুরকে। হুজুর কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। জিজ্ঞেস

করলেন, কামিল জামাতে কোন কিতাব পড়াই? বেশি বেশি কিতাব মুতালাআর নসিহত করলেন। আশ্চর্য হলাম- সবাই যখন হুজুরের রোগ যন্ত্রণা নিয়ে ভাবছে তখন হুজুরের মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। যারা দেখা করতে আসছে সবার সাথে সুস্থ অবস্থায় যেভাবে কথা বলতেন সেভাবেই কথা বলছেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করছেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করলাম হাসপাতালে। হুজুর বললেন, আমি সুস্থ, আমার কোন অসুবিধা নেই। শুধু আমার ব্যক্তিগত কাজগুলো যদি আমি নিজে করতে পারতাম তাহলে কোন সমস্যাই ছিল না.....। আমার কোন আফসোস নেই। যে হালে তিনি (আল্লাহ) রাজী সে অবস্থায় তো সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কষ্ট হয় এদের জন্য (যারা হুজুরের সাথে ছিলেন, ভাতিজা মাওলানা জুবায়ের ও একজন হাফিজ সাব) আমি তাদেরকে কষ্ট দিচ্ছি। হুজুর তাদের জন্য বারবার দোয়া করছিলেন।

পরবর্তীতে উপশহরস্থ হুজুরের জামাতা মাওলানা ইমাদ উদ্দীন সাহেবের বাসায় ও বাড়িতে হুজুরকে দেখতে গিয়েছিলাম। চরম কঠিন অবস্থায়ও হুজুর ছিলেন পূর্ণ ধৈর্যশীল ও শান্ত। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ কিরূপ হয় তা হুজুরের সান্নিধ্যে যেয়ে স্বচক্ষে দেখেছি।

আমি এক দুর্ভাগা। আপাদমস্তক এক শিক্ষক, অনুসরণীয়, অনুকরণীয় এক ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম, যিনি জীবনভর শিক্ষা দিয়েছেন হাদীসে নববী, ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধ্বনি ধ্বনিত হতো তাঁর জবান থেকে পরম মমতায়, কিন্তু অর্জন বলতে কিছু নেই আমার। সিরতে নবী, সুরতে নবি, আখলাকে নবির পরিপূর্ণরূপ প্রতিফলিত হয়েছিল হুজুরের জীবনে। রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করেন, জান্নাতের আ'লা মাক্বাম দান তাঁকে ধন্য করেন। আমরা যেন হতে পারি তাঁর রেখে যাওয়া ইলম ও আদর্শের যোগ্য উত্তরাধিকারী সে তাওফিক চাই মালিক ও মাওলার দরবারে। (আমীন)।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক (আরবি), হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট।

তিনি ছিলেন আমাদের রূপকথার এক জীবন্ত মহারাজা

সিরাজুল ইসলাম শাহীন

রূপকথার গল্প শৈশবের অনিবার্য অনুষঙ্গ। সাধারণত রাজা বাদশাহ ও ভুত পেত্নীর কল্প কাহিনী থাকে। কিন্তু আমরা বড় হয়েছি এক জীবন্ত মহারাজার জীবন গড়ার কাহিনী শুনে। তিনি আমাদের মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। কীভাবে পড়ালেখা করতে হয়, ভাল মানুষ হতে হয়, ইলম সাধনা করতে হয়, ভদ্র হতে হয়, বাধা-বিপত্তি মাড়িয়ে আপন গতিতে এগিয়ে যেতে হয় - এসবের আদর্শ হিসেবে মুরুব্বিরা তাঁকে তুলে ধরতেন আমাদের সামনে সব সময়।

পড়ার টেবিলে ঘুমে কাতর হতে দেখে দাদীর কথাটি টনিকের মত কাজ দিয়েছিল, 'ঘুম তাড়ানোর জন্য পানির বালতিতে পা ডুবিয়ে রাখতেন - - মা আমারে বলেছেন ক'দিন চেষ্টাও করেছি। দুষ্টুমি করলেই শুনতে হয়েছে তিনি কোনদিন এমন করেননি। অমনোযোগী হলে বলা হত পড়া লেখা এত সহজ না ---

জকিগন্জ সিলেট সড়কের এপারে আমাদের বাড়ি আর ওপারে রারাই গ্রাম। থানাবাজার থেকে হুজুরের বাড়ির রাস্তায় জনসমাগম দেখে বুঝে নিতাম তিনি বাড়ি আছেন। মাসলা -মাসায়েল ও নানাবিধ আলোচনা শেষে সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে যেতেন বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে প্রধান অতিথিসহ বক্তাদের লম্বা তালিকা থাকলেও আগ্রহের কেন্দ্রে থাকতেন তিনি। মুহাদ্দিস ছাহেবের বয়ানের সময় জেনে নিতেন অনেকে। পুরো সময় থাকত পিন পতন নীরবতা এবং উপস্থিতি হত সর্বোচ্চ। ইলমের গভীরতা ও ভারসাম্যপূর্ণ উপস্থাপনায় তাঁর আলোচনা হয়ে উঠত অনন্য। কারো কষ্ট পাওয়ার সুযোগ থাকত না।

সৌজন্যতা, শিষ্টাচার, উদারতায় উচ্চমাত্রার এক উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন তিনি। অসুস্থতার খবর পেয়ে বাড়িতে দেখা করতে গেলে আমীরে জামায়াত মাওলানার পিড়াপীড়িতে মোনাজাত করতে বাধ্য হন। আমি নগণ্য সোহবতের জন্য হাজির হলেই তাঁর তাজিম দেখে লজ্জায় কুঁকড়ে যেতাম। 'ইলম মানুষকে বিনয়ী করে 'এর বাস্তব নমুনা ছিলেন তিনি। সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করেও মেধাবীদের তাফহীমুল কুরআন পড়ার উপদেশ দিতেন। ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে সিলেট ৫ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সময় জামায়াত প্রার্থী মাওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরীর সাথে কানাইঘাটে সুরমা ঘাটে দেখা হলে মুসাফাহ করে বলেছিলেন, 'একান্ত বাধ্য হয়ে -মাফ করে দিবেন'। হুজুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিশেষ কারণে সে সময় জকিগন্জ উপজেলা ছাত্র শিবির সভাপতিকে সিলেট শহরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। পুরো নির্বাচনকালীন জকিগন্জ -কানাইঘাটে আসেননি। উলামাদের পারস্পরিক এমন শ্রদ্ধা-সম্মান এখন বড় প্রয়োজন।

তিনি শুনতেন বেশি বলতেন কম। কিন্তু সমসাময়িক বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখতেন। ট্রাইবুনাল ও ফাঁসীগুলো নিয়ে বলতে গেলে মন্তব্য করেছিলেন, 'উদ্দ্যেশ্যতো বিচার নয় অন্যটা'। ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামপন্থীদের ঐক্য নিয়ে বলেছিলেন, 'এটা হবে না'। কথা বলার সময় নূরানী চেহারার দিকে চেয়ে থাকতাম। ২০১৩ সালে লন্ডন আসার আগে তেমন সুযোগ হয়নি কাছে যাওয়ার। এখন তো আর সুযোগও নেই। আফসোস হয়, ইলমের এ দরিয়া থেকে যে কিছুই নিতে পারলাম না। সুযোগ ছিল কিন্ত হেলায় হারিয়ে ফেললাম।

যুগের ইমাম-মুজতাহিদগণের জীবনী জেনে আমরা পুলকিত হই, অথচ ঘরের কাছে অমূল্য রতনের মূল্যায়ন করি না। তিনি যে উচ্চ মানের আলেম ছিলেন তা সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি। কাছের লোকজন এবং যারা জানতেন সকলের দায় আছে এতে। সম্ভবত তাঁর নিজেরও থাকতে পারে।

মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের মাফ করে দিন। মুহাদ্দিস ছাহেব হজরতকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চতম মাকাম দান করুন। এ কঠিন সময়ে উম্মতের জন্য অগণিত নি'মাল বদল দান করুন। আমিন।

লেখক: যুক্তরাজ্য প্রবাসী, রাজনীতিবিদ।

অনুসরণীয় এক মহান মনীষী

মাওলানা আব্দুস সবুর

আলহামদুলিল্লাহ! ক্ষিয়মান এ বসুন্ধরায় যুগে যুগে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতির কল্যাণে আলোকবর্তিকা হিসেবে ক্ষণজন্মা অনেক মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছেন। তেমনি আল্লাহ তা'লা আমাদের মাঝে তাঁর এক বিশেষ নিয়ামত ও আলোর দিশারী মহান ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন। তিনি হলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ।

আমি অতিনগণ্য ও অধম এ মনীষীর স্মৃতিচারণে কিছু লিখার যোগ্যতা ও সাহস কোনটিই নেই। তবু হুজুরের রূহানী ফয়েজ পাওয়ার আশায় কলম ধরা।

উপমহাদেশে উলুমে নববীর যোগ্যতম উত্তরাধিকার শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন ঐতিহাসিক এক জীবনের অধিকারী। সেই ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত সফল ও আলোকিত ছিল। ছিল নানা মহিমায় উজ্জ্বল।

ক্ষণজন্মা মহান এ ব্যক্তিত্বের বাড়ির অবস্থান আমাদের বাড়ি থেকে তিন কিলোমিটারের মত দূরত্ব হবে। ১৯৯০ সালে জকিগন্জ ফাজিল সিনিয়র মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছিলাম। আমার শ্রদ্ধেয় মামা হাদ্রাবন্দ গ্রামের মরহুম ডা. আবদুল কাদির সাহেবের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করতাম। মাদ্রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল উপলক্ষে প্রথম মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের নামের সাথে পরিচিত হই। মাহফিলের দিন হুজুরকে প্রথম দেখি এবং বয়ান শুনি। তখন মাত্র পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। তাই হুজুরের বয়ান বুঝার মত বয়স ও বুঝশক্তি ছিল না। তবুও তাঁর বয়ানে অজানা এক আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। ১৯৯৪ সালে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরে বড় ছাহেবজাদা মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল ভাইর সাথে পরিচয় হয়। বয়সের অনেক ব্যবধান সত্বেও আমার প্রতি তাঁর সুনজর কেনো পড়েছিল তখন না বুঝলেও পরে বুঝতে পারি। আমার পরিবার, আমি নিজে এবং আমাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষ ভিন্ন মাসলাকের অনুসারী। মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল ভাই তখন ছাত্র সংগঠনের দায়িত্বশীল হিসেবে পরিকল্পিতভাবে আমাকে টার্গেট করেন। প্রায় দিন বিকালে তিনি দেখা করে প্রথমে কুশল বিনিময় করতেন। তারপর চমৎকার শিক্ষনীয় কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করতেন। এরই ধারাবাহিকতায় একদিন তিনি আমাকে জীবনে প্রথম বারের মত ফুলতলী ছাহেব বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেই ছোটকাল থেকে ফুলতলী মাসলাক সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের নেতিবাচক কথা শুনে শুনে বড় হয়েছি। আজ তিনি আমাকে সরাসরি সেই ফুলতলী ছাহেব বাড়িতে নিয়ে

এসেছেন, কেমন যেনো অস্বস্তি লাগছিল। মনে মনে কিছুটা বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলিনি। এক সময় তাঁর হাত ধরে সংগঠনের সাথে আন্তরিকভাবে জড়িত হয়ে যাই। ক্রমান্বয়ে রারাই মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বাড়িতেও যাওয়া আসা শুরু হলো। একদিন হেলাল ভাই মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাসলাক হিসেবে না হলেও হুজুর আমার বাবা এবং বড় ভাইকে (সুলতানপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ বুরহান উদ্দিন) চিনতেন। তাই পারিবারিক পরিচয়ে হুজুর আমাকে সহজেই চিনলেন। মূলতঃ প্রথম দিন দেখার পর থেকে হুজুরের মনোমুগ্ধকর সুন্দর চেহারা আমাকে অজানা এক আকর্ষণে আবদ্ধ করেছিল। ভাবতাম একজন মানুষের চেহারা এত নিষ্কলুষ সুন্দর হতে পারে? এমন মায়াবী চেহারা আগে কখনো দেখিনি। আমরা জানি যাদের চেহারার দিকে তাকালে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় তাঁরা আল্লাহর মহান ওলী। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব এমনি একজন মহান মানুষ ছিলেন।

বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদ্‌রাসায় কামিল ক্লাসে অধ্যয়নকালে মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী শাহান সাহেবের নেতৃত্বে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের দারসে অংশগ্রহণ করতে হুজুরের অনুমতি ক্রমে আমরা ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় যেতাম। হুজুরের দারসে অন্যরকম এক আকর্ষণ ছিল। হুব্বে রাসূলের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত একজন মহান মুহাদ্দিস হাদীসের দারস দানকালে প্রতিটি কথা এমন আকর্ষণীয় এবং সহজ সাবলীলভাবে বলতেন, মনযোগি হয়ে বসলে আমার মত নিম্ন মেধার একজন ছাত্রেরও তা বুঝতে সমস্যা হতো না।

দেশে বিদেশে যখন যেখানে হুজুর কোন ওয়াজ মাহফিলে যেতেন সর্বস্তরের মানুষ যেনো অপেক্ষমাণ থাকতো। কারণ সবাই জানতো হুজুরের প্রতিটি বয়ান থেকে জীবন ঘনিষ্ট নতুন কিছু শেখা যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ দয়ায় হুজুর ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো এমন প্রামান্য এবং সাবলীলভাবে আলোচনা করতেন যে, একেবার সাধারণ একজন মানুষও তা ভালোভাবে বুঝতে পারতো।

২০০২ সালে আমাদের গ্রামে তাফসীর মাহফিল করার পরিকল্পনা করি। ফুলতলী মাসলাকের কেউ এসে তাফসীর করবেন আমার গ্রামের বেশিরভার মানুষ কোনক্রমেই তা সমর্থন করবে না। ভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। তাই প্রথমে তাফসীর মাহফিলের জন্য একটি কমিটি করে কিছু কৌশল অবলম্বন করি। মাসলাক নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের কাছে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। সিদ্ধান্ত নিলাম হুজুরকে আনবো। গ্রামে ব্যাপক প্রচার করলাম রারাইর মুহাদ্দিস ছাহেব আমাদের মাহফিলে তাফসীর করবেন। এভাবে ধারাবাহিক দুই বছর হুজুরকে দিয়ে মাহফিল করলাম। গ্রামের মানুষের ব্যাপক আস্থা ও ভালোবাসা পেয়ে পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে আল্লামা মুফতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী এবং আল্লামা নজমুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী ছাহেবকে

আমাদের মাহফিলে আনতে সক্ষম হই। আলহামদুলিল্লাহ! ২০০৫ সালে শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আমাদের গ্রামের মাহফিলে আনা সম্ভব হয়। এমনকি ছাহেব কিবলাহকে আমাদের বাড়িতে আনার সৌভাগ্য লাভ করি, যা আমার স্বপ্ন ছিল।

সময় সুযোগ মত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সান্নিধ্যে যেতাম। ছোট বড় বিভিন্ন মানুষ হুজুরের কাছে আসতো। বহু মানুষ পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে হুজুরের দুআ ও পরামর্শ চাইতো। দেখতাম কঠিন কোন বিষয়ও হুজুর সহজ সমাধান বাতলে দিতেন। তখন মানুষের চেহারায় পেরেশানীর চিহ্ন থাকতো না। আসলে হুজুরকে আল্লাহ এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী করেছিলেন যে, যেকোন সমস্যায় তিনি এমন সময়োপযোগী ও যুক্তিপূর্ণ সমাধান দিতেন যে কেউ প্রশান্ত চিত্তে মেনে নিতো।

মানুষের সাথে হুজুরের আচার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ। ইলম ও সামাজিক মর্যাদার শিখরে থেকেও তিনি এত বিনয়ী কথাবার্তা ও আচরণ করতেন যা কল্পনাও করা যায় না। কিশোর যুবকদেরও তিনি আপনি বলে সম্বোধন করতেন। সময় সময় হুজুরের বিনয় দেখে অবাক হতাম।

আমরা যারা হুজুরকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি, তারা যদি তাঁর এই একটি দিক আত্বস্ত করে নিজেদের আচার ব্যবহার সুন্দর করে নিতে পারি তবে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। আসলে তিনি ছিলেন সর্বদিক দিয়ে অনুসরণীয় এক মহান মনীষী। কেউ যদি তাঁকে অনুসরণ করে নিজের জীবন গড়তে পারে তবে দুনিয়া আখিরাতে সফল হওয়া সম্ভব।

আল্লাহপাক হুজুরের দরজা বুলন্দ করুন। তাঁর রূহানী দুআ ও ফয়েয আমাদের জন্য জারি রাখুন।

লেখক: ভাইস চেয়ারম্যান, জকিগন্জ উপজেলা পরিষদ, সিলেট।

আমাদের 'মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর'

মোহাম্মদ মিফতাহুল ইসলাম তালহা

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় 'মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর'। হাদীস শরীফের দারস-তাদরীসে আরো বহু উলামায়ে কিরাম মশগুল থাকলেও, এমনকি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁরই ছাত্র কিংবা ছাত্রের ছাত্র পর্যায়ের অনেকেই হাদীস শরীফ অধ্যাপনায় প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও, 'মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর' বললে আমরা কেবল তাঁকেই চিনতাম। যে কোন মাহফিলে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের বয়ান ছিল সবচেয়ে আগ্রহের বিষয়, তাঁর সমীহ জাগানিয়া সৌম্য শান্ত ব্যক্তিত্ব, তাঁর দরদি আলোচনা আর ইলমী উচ্চ মাকাম, সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন অনন্য।

হুজুরের স্মৃতিচারণ করে কোন কিছু লিখতে হবে, এমন নির্দেশনা বহু আগে পেলেও বারবার লিখতে বসেও লেখা হয়ে উঠছিল না। এরকম একজন মহান ব্যক্তিত্বের এতো নিকটে অথচ এতো দূরে ছিলাম যে এখন তাঁর স্মরণে কোন কিছু লিখতে চাওয়াটাকে রীতিমত দুঃসাহস বলে মনে হচ্ছে। তাঁর মতো নিখাদ ইলমী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোন কিছু লেখার জন্য তাঁর সাথে যে রকম ইলমী সম্পর্ক থাকা জরুরি, দুর্ভাগ্যবশত আমার সে সুযোগ কখনোই হয়ে উঠেনি। আমি তাঁর ছাত্রদের নিকট পড়াশুনা করেছি, মাহফিল কিংবা ঘরোয়া মজলিসে তাঁর আলোচনা তন্ময় হয়ে শুনেছি আর অবাক হয়েছি তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধুর্য ও ইলমের গভীরতা দেখে, কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাঁর নিকট অধ্যয়নের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

যে কোন বিষয়ে হুজুরের আলোচনা শুনলে এমন সব চিন্তার খোরাক পাওয়া যেতো, যা ঐ বিষয়ে নিজের দীর্ঘ অধ্যয়নেও হয়তো সম্ভব হতো না। হুজুরের (সম্ভবত) সর্বশেষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী (সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), যা পরবর্তীতে মাসিক পরওয়ানায় প্রকাশিত হয়েছে। সৌভাগ্যবশত শ্রদ্ধেয় মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলীর নির্দেশে সে সময় আমারও উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকার প্রদানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি তাৎক্ষণিক বিভিন্ন বিষয়ে যেরকম জ্ঞানগর্ভ উত্তর দিচ্ছিলেন, তা ছিল বিস্ময়কর। উপমহাদেশের ইলমী চর্চা, বিশেষত ইলমে হাদীসের চর্চা সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে তিনি যেসকল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন, তা হয়তো আমাদের জন্য ইলমে হাদীস চর্চার ইতিহাসের দীর্ঘ পাঠ থেকেও উপলব্ধি করা কঠিন হতো।

শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ শুধু একজন হাদীসে নববীর শিক্ষকই ছিলেন না, যদিও এই পরিচয়ে তিনি সমাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। কিন্তু

এর বাইরেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যে কোন ফিকহী বিষয়ে অগণিত উলামায়ে কিরামের নিকট তিনি ছিলেন শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল। নিজেরা অভিজ্ঞ আলিম হওয়া সত্ত্বেও ফিকহী বিষয়ে কখনো কোন জটিলতার মুখোমুখি হলে তারা হুজুরের আশ্রয় নিতেন। হুজুরের কাছ থেকেই তাঁরা শেষ সমাধান পেতে চাইতেন।

ইলমে হাদীস, ইলমে কিরাত, ইলমে ফিকহের পাশাপাশি ইলমে তাসাওউফেও তিনি এমন অবস্থানে পৌঁছেছিলেন যে, তাঁর মুর্শিদ ও এ সকল বিষয়ের প্রধান উস্তায আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রাহ.) তাঁর অনেক সালিককে নিজে সময় দিতে না পারলে তাসওউফ চর্চার জন্য হুজুরের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিতেন।

আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে হাদীস, ফিকহ কিংবা তাসাওউফের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের যথাযথ অবস্থান উপলব্ধি করা অসম্ভব। কিন্তু তাঁর নিজের মুর্শিদসহ সামসময়িক উলামায়ে কিরাম এসকল ক্ষেত্রে তাঁকে যে মর্যাদার আসনে আসীন করেছিলেন, তা থেকে তাঁর অবস্থান আমরা কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারি।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেন এমন উলামায়ে কিরামের প্রতি তাঁর যেমন অনন্য উদারতা দেখেছি, তেমনি তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি বহু মত ও পথের উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষের অগাধ শ্রদ্ধার প্রকাশও দেখেছি। তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা ইন্তেকালের পর তাঁর প্রতি কেবল মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসাই দেখেছি, এর বিপরীত অভিজ্ঞতা হয়নি। এক কথায় বলা চলে, তিনি তাঁর কর্মময় জীবনে আক্ষরিক অর্থেই 'সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিমে দ্বীনের' আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের মহান ব্যক্তিত্বের বেশির ভাগ দিক সম্পর্কে আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হলেও একটি বিশেষ দিকের কথা উল্লেখ না করলে এই স্মৃতিচারণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যোগ্যতার বিচারে হুজুরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার উপযুক্ত নন, এমন মানুষকে তিনি যেরকম সম্মান প্রদর্শন করতেন, আমরা সাধারণত আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের প্রতিও অনেক সময় ততো সম্মান প্রদর্শন করতে পারি না। যে কোন মানুষ হুজুরের সামনে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করতেন। মানুষকে সম্মান প্রদর্শনের এমন নজির নিঃসন্দেহে বিরল।

শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে মূল্যায়ন দূরে থাক, স্মৃতিচারণ করার যোগ্যতাও আমার নেই, তবু তাঁর ফুয়ূযাত থেকে যেন বঞ্চিত না হই, এই প্রত্যাশায় কয়েকটি কথা লেখার দুঃসাহস করলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে তাঁর ফুয়ূযাত লাভে ধন্য করুন, এবং তাঁর রেখে যাওয়া উত্তরসূরীদের নিকট থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন, তাঁদের মাধ্যমে হুজুরের খিদমতকে অব্যাহত রাখুন, এই দুয়া করি। আমীন।

লেখক : অনুবাদক, বাংলাদেশ দূতাবাস, দোহা, কাতার।

অদেখা উস্তাযের স্মরণে

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

এক.

আজ থেকে পাঁচ কি ছয় বছর আগে, এমনই কোনো এক শীতের সন্ধ্যায় তাঁর নামটি প্রথমবারের মতো শুনি। ঢাবি গ্রন্থাগারের সামনে কয়েকজন বন্ধু গল্প করছি। কথা উঠেছিলো। বাংলা অঞ্চলে হাদীস শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে। কোনো একটা পর্যায়ে আমি বললাম, 'আমাদের কত নিভৃতচারী পূর্বসুরী আলিমের জীবন-কর্ম দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে!' আমাদের বন্ধু তালহা বললো, 'সমসাময়িক আলিমদের মধ্যেও অনেক নিভৃতচারী সাধক আছেন, যেমন, সিলেটের বর্ষীয়ান আলিম শায়খুল হাদীস মাওলানা হবিবুর রহমান। আমরা যাঁকে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর বলে জানি।'

সময়স্বল্পতা-হেতু বেশিক্ষণ আলোচনার সুযোগ হাতে না থাকলেও সেদিন আমরা বেশ আগ্রহ নিয়েই তালহার কাছে তাঁর ব্যাপারে কিছু প্রাথমিক তথ্য জেনে অভিভূত হই। তাঁর কথা বলার সময় আপাত-নিরাবেগ তালহার চোখেমুখে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ঝলক আমার দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। বন্ধুদের মধ্যে তালহার স্বভাব ও ব্যক্তিত্ব আমার এত বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, তার প্রিয় মানুষেরাও আমার প্রিয় হয়ে ওঠা শুরু করেন। অতএব, শায়খের ব্যাপারে একটু জেনেই তাঁর নামটি আমার মানসপটে একটা সশ্রদ্ধ প্রতিচ্ছবি হয়ে স্থায়ী আসন গাড়ে, আমাকে উদ্বুদ্ধ করে তাঁর ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে।

দুই.

হাদীসশাস্ত্রে শায়খের অগাধ পাণ্ডিত্য অবিদিত নয়। হাদীসের পঠন-পাঠনে কয়েক যুগ পরিব্যাপ্ত বর্ণাঢ্য কর্মজীবন তাঁর। এই সুদীর্ঘ সময়ে তাঁর কাঁধে ন্যস্ত ছিলো প্রধানত দুইটি বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ পাঠদানের দায়িত্ব: বুখারি ও তিরমিযি। 'মুনতাখাব' গ্রন্থের ভূমিকায় শায়খের জবানিতেই এ তথ্যটি আমরা পাই। এই সাধারণ তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ - হাদীস শিক্ষাদানে তাঁর অনন্যতা বোঝার ক্ষেত্রে।

উপমহাদেশের দরগাহগুলোতে প্রাচীনকাল থেকেই প্রসিদ্ধ ছয় হাদীসগ্রন্থের মধ্যে তিরমিযি পাঠদানকে সর্বাধিক 'চ্যালেঞ্জিং' ধরে নেওয়া হয়। গ্রন্থটির চরিত্র এমন যে, আলিমগণ বলে থাকেন, এ গ্রন্থের যথাযথ পঠন বা পাঠনে উলুমুল হাদীসের পাণ্ডিত্য যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি ফিকহ ও উসুলুল ফিকহেও অনুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞ ধীশক্তির প্রয়োজন হয় সমানতালে। শায়খ তাঁর কর্মজীবনের সূচনালগ্ন থেকেই তিরমিযি পাঠদানের দায়িত্ব পেয়েছেন, যা থেকে এ কথা অনুমান করা মোটেও কঠিন নয় যে, হাদীসশাস্ত্রে ঈর্ষণীয় দখল রাখার পাশাপাশি উলুমুশ শারীআহর অন্যান্য শাখাতেও তাঁর সাগ্রহ বিচরণ অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সেই পূর্ণতা পেতে শুরু করেছিলো। বলা বাহুল্য,

তিনি যে সময় হাদীস শিক্ষাদানের ভার কাঁধে নিয়েছেন, তখনকার ইলমি পরিবেশ আজকের মতো বিরান ছিলো না, বরং যথেষ্ট উর্বর ও ফলবতী ছিলো, যেখানে শাস্ত্রীয় শিক্ষাদানের সিংহাসনে যে কেউ সমাসীন হওয়ার কথা চিন্তায় আনার সুযোগ বা প্রেক্ষাপট ছিলো না। এ অবস্থানে পৌঁছাতে সত্যিকার অর্থেই মেধা, যোগ্যতা ও কারদানি'র বিকল্প ছিলো না।

বহুশাস্ত্রবিদ হিসেবে তিনি তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতার সফল সাক্ষর রেখেছেন প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও-দীর্ঘকাল বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে। অন্তর্জালে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাঁর বিভিন্ন আলোচনা শুনলে আপনি নিশ্চিতভাবেই এক ধরনের 'প্রাগম্যাটিজমে'র দেখা পাবেন। আমার অনুমান, এটা অংশত তাঁর বিচারিক অভিজ্ঞতারই অনিবার্য ফল।

শায়খের শিষ্যত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য আমার হয়নি। তাঁর সাথে সরাসরি সাক্ষাতে দুআ নেওয়ার ইচ্ছেটাও অধরা থেকে গেলো শেষ পর্যন্ত। তবে তাঁর ইলমি উত্তরসুরীদের কয়েকজনকে দেখে কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারি, শিক্ষক হিসেবে তিনি কেমন প্রীতিনিলয় ও প্রেরণাপ্রবর ছিলেন। 'বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলে পরিচয়।' এঁদের মধ্যে দুজন আলিমকে ব্যক্তিগতভাবে জানার সুযোগ হয়েছে, যাঁদের জ্ঞানের পরিধি ও তাকওয়ার গভীরতা অধমকে সবসময়ই অনুপ্রেরণা যোগায়। আমি যতবার তাঁদের সাথে কথা বলেছি কিংবা তাঁদের কথা শুনেছি, প্রায় প্রতিবারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রসঙ্গে তাঁদের উস্তায শায়খুল হাদীসের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে দেখে অবাক হয়েছি। এত শিক্ষকের ভীড়ে তাঁকে আলাদাভাবে মনে করার অর্থ হলো, শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে তিনি আলাদা আসন পেতে নিয়েছেন। আমি সঙ্গত কারণেই দুই শ্রদ্ধাভাজন আলিমের নাম নিচ্ছি না। তাঁদের যতদূর চিনেছি, সাক্ষাত প্রশংসায় তাঁরা বিব্রতই হবেন। নিঃসন্দেহে তাঁদের এই অন্তর্মুখীতা ও প্রচারবিমুখতা শায়খুল হাদীসের মতো আল্লাহভীরু উস্তাযের সান্নিধ্য থেকে উৎসারিত। তাঁদের একজন বাংলাদেশে অবস্থান করছেন, দ্বিতীয়জন যুক্তরাজ্যে। দ্বিতীয়জনের হাদীসের দারসে সুযোগ পেলেই আমি উপস্থিত থাকার চেষ্টা করি। ব্যবহারিক জীবনে হাদীসের শিক্ষা যেমন চমৎকারভাবে তুলে ধরেন, 'সাহিবুল হাদীস' তথা নবিজি'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ভালোবাসাকেও জাগিয়ে তুলেন সরল অথচ নিখাদ বাক্যভঙ্গিতে। এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি মাঝেমধ্যেই তাঁর প্রিয় উস্তায শায়খুল হাদীসের প্রসঙ্গ আনেন। আমার মোটেও বুঝতে অসুবিধা হয় না - শায়খ শুধু حبيب الرحمن হবিবুর রহমান' (আল্লাহপ্রেমী) ছিলেন না, ছিলেন حبيب حبيب الرحمن হবিবুর হাবিবির রহমান' (আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেমিক)। ব্যক্তিগত আগ্রহে তাঁর বিভিন্ন আলোচনা শুনে আমার এ ধারণাটি আরও শক্ত ভিত্তি পায়। এমন মানুষকে ভালো না বেসে পারা যায়? এমন

মানুষকে ভালো না বেসে উপায়ই বা কোথায়, যখন কবি আমাদের শিখিয়ে দেন ভালোবাসার শাশ্বত সূত্র - 'কি মুহাম্মাদ সে ওয়াফা তু নে / তু হাম তেরে হ্যায়' (তুমি মুহাম্মদের হয়ে যাও, আমি তোমার হয়ে যাবে।)

এই সম্মানিত আলিমের দারসে বসে যতবার রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসায় আমার চোখ ভিজেছে, ততবার সেই আলিম তো বটেই, তাঁর অনুপ্রেরণার প্রিয় উস্তায, শায়খুল হাদীস হবিবুর রহমানকেও আমার আত্মার আত্মীয় মনে হয়েছে, আমার আর্দ্র হৃদয়ে দুআ অনুরণিত হয়েছে উভয়ের নামে।

তিন.

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর অপরিমেয় ভালোবাসার একটি সাক্ষর 'যাখিরাতুল আহাদীস আল-আরবাঈন ফী ফাদাইলি সাইয়িদিল মুরসালিন' শীর্ষক সংকলন। শায়খের সুযোগ্য নাতি মাওলানা লাবিব আনওয়ার, অধমকে এই গ্রন্থটির সর্বশেষ সংস্করণ হাদিয়া দেন। একই বিষয়ে ইতোপূর্বে যে কয়টি সংকলন আমার নজরে এসেছে, সবখানেই একটি বিষয় চোখে পড়ার মতো - নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ও আবেগ থেকে অনেক সংকলকই হাদীসের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান থাকেননি। শায়খ এক্ষেত্রে বিরল ব্যতিক্রম। ভালোবাসায় আকুল হয়ে সীমালঙ্ঘন কিংবা ভালোবাসার খাতিরে নিজস্ব খেয়াল-খুশিকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ প্রেমাস্পদকেই আহত করা এই অনস্বীকার্য সত্যের প্রতি তিনি বরাবরই মনোযোগী ছিলেন।

শুধু তাই নয়, নিজের গবেষণার ফলাফল নিজেই পূণর্বিবেচনা করার মতো বিরল গুণটাও ধারণ করতেন এই ক্ষণজন্মা মণীষী। তার বড়ো উদাহরণ, আলোচ্য সংকলনটির প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত একটি হাদীস, যা তিনি, প্রাথমিকভাবে নির্ভরযোগ্য মনে করে সংস্থিত করেছিলেন, দ্বিতীয় সংস্করণে তা বাদ দিয়েছেন। গবেষণার প্রথম উপসংহার যে নির্ভরযোগ্য নয়, তারও সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছেন তিনি। ইলমি আমানতের প্রতি তাঁর এই সবিনয় অনুবর্তিতা, নিজের অবস্থানকে 'ভুল' বলতে পারার এই সহজ-সুন্দর মনোবৃত্তি আজকের যুগে বিরল হলেও সালাফ সালিহিনের যুগে একেবারে বিরল ছিলো না। অহমে পরিপূর্ণ একটা অস্থির সময়ে আমরা যখন সেইসব অনুসরণীয় চরিত্রের কথা প্রায় ভুলে যেতে বসি, আল্লাহ অনুগ্রহ করে কিছু ব্যতিক্রম নমুনা আমাদের সামনে হাজির করে দেন। শায়খ তেমন একটি নমুনা।

এই সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। দ্বিতীয় উপসংহারের সপক্ষে তিনি সামসময়িক অন্যান্য গবেষণাকর্মেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। জীবনের সন্ধ্যালগ্নেও তাঁর প্রজন্মের কোনো আলিম নিজের আগ্রহের বিষয়টিতে 'লেইটেস্ট' গবেষণাকর্মের সাথে 'আপডেইটেড' থাকবেন, এই দৃশ্যটি অন্তত আমার

কাছে অপরিচিতই ছিলো। তবে, আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে দেরি হয়নি, যখন আবিষ্কার করলাম, তিনি মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসানের মতো একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিমের সুযোগ্য শাগরেদ ও সুসংগত উত্তরসুরী। বন্ধু-স্বজন ও স্নেহভাজন জ্ঞানপিপাসুদের কাছে আমি প্রায়ই তাঁর উদাহরণ দিয়ে থাকি। মুফতি আমীমুল ইহসানের লেখায় একটি বিষয় স্পষ্ট - তাঁর সময়ে জ্ঞানচর্চায় প্রযুক্তির ব্যবহার অকল্পনীয় থাকা সত্ত্বেও, গ্রন্থাদি পরিবহণের অবাধ ও বেগবান সুযোগের অনুপস্থিতিতেও দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে উলুমুশ শারীআহ'র সর্বশেষ (তাঁর সময়কাল বিবেচনায়) গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর খোঁজ-খবর তিনি রাখতেন এবং প্রাচীন গ্রন্থাদির পাশাপাশি সেগুলোও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করতেন। এটি তাঁর সামসময়িক অন্যান্য বাংলাদেশী আলিমের লেখায় মোটাদাগে দৃষ্টিগোচর হয়নি। মুফতি সাহেবের সুযোগ্য শাগরেদ, আমাদের প্রিয় 'মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর', একই তাড়না ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করবেন, এটিই তো স্বাভাবিক। আল্লাহ উভয় মণীষীর দরোজা বুলন্দ করুন।

চার.

পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি, অন্তর্জালে প্রাপ্ত শায়খের কিছু দারস ও আলোচনা বিভিন্ন সময় মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেছি। এই আলোচনাগুলো তাঁর প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ম বিবেচনাবোধের নিদর্শন বহন করে। যেমন,

(ক) তিনি উদ্দীষ্ট শ্রোতামহলের মনস্তত্ব ও ধারণক্ষমতা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন। একই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য একাডেমিক পরিমণ্ডলে একরকম, জনসাধারণের মাহফিলে অন্যরকম। প্রথম শ্রেণির সাথে তাঁর কথোপকথনের স্টাইল নিতান্তই শাস্ত্রীয়। এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক - যা খুব বেশি বিস্ময়করও নয়। মূলত যেটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে - তাঁর মতো একাডেমিক ব্যক্তিত্ব সহজেই জনসাধারণের উপযোগী সরল উপস্থাপনায় সহজাত হয়ে যাওয়া। সাধারণ মুসলমানদের নসিহত করার সময় যেনবা তিনি তাঁর শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য পুরোপুরি একপাশেই রেখে দেন। নিতান্তই সাদামাটা শব্দচয়ন, জীবনমুখী উপদেশ আর হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ ও উপমা তাঁর বক্তব্যগুলোকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। আমাদের সমকালে জনপরিসরে কথা বলেন এমন আলিমদের জন্যে এটি নিঃসন্দেহে শিক্ষণীয়।

(খ) শায়খ যেহেতু তাযকিয়ায়ে নফসের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক-আনুষ্ঠানিক চর্চায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন, নানারকম ইসলাহি মজলিসে স্বাভাবিকভাবেই আমন্ত্রিত হতে দেখা গিয়েছে। এ মজলিসগুলোর একটি বড় অংশ জুড়ে ছিলো পূর্বতন কোনো আল্লাহভীরু আলিমের স্মৃতিচারণা অথবা ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত মাহফিল। আমাদের দেশে এ ধরনের মাহফিলে সেই মরহুম আলিমের গুণকীর্তন ও তাঁর নানা অলৌকিক অর্জনের

কথাই বেশি আলোচিত হয়। এ ধরনের আলোচনা নিঃসন্দেহে শিক্ষণীয়, তবে তার মাত্রাতিরিক্ত উদযাপন উপকারী নয়। শায়খ এই সূক্ষ্ম বিষয়টি ভালোভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। এমন মজলিসগুলোতে প্রদত্ত তাঁর আলোচনাগুলোতে একটি কমন প্যাটার্ন বরাবরবই লক্ষণীয়। যাঁর ইসালে সাওয়াব উপলক্ষে মাহফিলটির আয়োজন, তাঁর দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহ ভীরুতার কথা তিনি প্রথমে সংক্ষেপে উল্লেখ করেন। এরপর জোরালোভাবেই স্মরণ করিয়ে দেন তাঁদের সমস্ত চিন্তা ও তৎপরতার মূলসুর ছিলো আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবিবের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃশর্ত আনুগত্য ও সুগভীর প্রেম-ভালোবাসা মানুষের হৃদয়ে জাগরূক রাখা; কাজেই, তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে এই মূলসুর যদি আমাদের জীবনে ধারণ না করতে পারি, তাঁদের কথা স্মরণ করা বৃথা। বুযুর্গানে দ্বীনের শিক্ষা ভুলে গিয়ে বরং তাঁদের প্রতি ভালোবাসার নামে সমকালে যে বাড়াবাড়িগুলো আমাদের চোখে পড়ে, তার লাগাম টেনে ধরার জন্য শায়খ অন্তঃপ্রাণ ছিলেন এটি স্পষ্টতই বোঝা যায়।

'ইসলাহি' মজলিসে কথা বলার মতো আলিম আমাদের সময়ে অনেক আছেন, কিন্তু সময়ের ফেরে 'ইসলাহি' চর্চারও যে 'ইসলাহ' দরকার, তা আঞ্জাম দিতে আগ্রহী আলিম সম্ভবত কমই আছেন। এই শূন্যতা পূরণে শায়খুল হাদীস অনুপ্রেরণা ও দিশারী হয়ে থাকবেন আমাদের মাঝে।

লেখক: শিক্ষার্থী- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, লন্ডন স্কুল অফ আফ্রিকান এবং ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ (SOAS)-ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন; বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ সালফে সালেহীনের বাস্তব নমুনা যিনি

মাওলানা ইব্রাহিম আরিফ

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান (মুহাদ্দিস ছাহেব) রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন এই জামানার ইলমে নববীর অন্যতম পথিকৃৎ। সালফে সালেহীনের যুগের মুহাদ্দিসগণের উদাহরণ হিসেবে হুজুরকে পেশ করা যায়। যার চলাফেরা, আচার আচরণ, মুজাহাদা, মুশাহাদা সব ছিলো সালাফের নমুনায়। হুজুর কখনো কোনো মাস'আলায় বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি করতেন না। বর্তমান সময়ের অবক্ষয় এবং ইলমী খেয়ানতের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে যে মরনব্যাধি আবির্ভূত হয়েছে সেটি হল 'আসাবিয়াত' বা 'স্বজনপ্রীতি', এগুলো থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ন মুক্ত।

ভিন্ন মত পোষণ এবং 'আসাবিয়াত' বিবর্জিত তাহকিকী মানদন্ড আমাদের সালাফদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি। শায়খুল ইসলাম আল্লামা যাহিদ কাওসারী 'মুতা'আসসিব হানাফী' পরিচয়ে পরিচিত হলেও ইমাম আযমের সাথে তাঁরও বিরোধপূর্ণ আলোচনা সহসাই এমন ঐতিহ্যকে আমাদের সামনে প্রকাশিত করে। তিনি তাঁর মাকালাতে কাওসারী'তে যেভাবে ইমাম আযমের সাথে মতভিন্নতা প্রকাশ করেছেন ঠিক তেমনিভাবে যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এবং ঐতিহাসিক খতিব বাগদাদী এবং ইবন আবী শায়বা'র ইমাম আযমের উপর অভিযোগের কট্টর সমালোচনা করেছেন। এগুলো কাওসারীর تأنيب الخطيب এবং النكت الطريفة থেকে স্পষ্টতই দৃশ্যমান। শায়খ মুহাম্মাদ আওওয়ামা তাঁর অনবদ্য اثر الحديث الشريف গ্রন্থে সালাফদের পারস্পরিক মতভিন্নতা এবং আসাবিয়াত থেকে হেফাজত থাকার ইলমী দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন (পৃ- ১১৩-১১৯)। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর এই ঐতিহ্য লালন এবং বহনকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা দারুননাজাতে পড়াকালীন সময়ে এক বড় ভাই প্রচার করলেন যে, মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর নাকি বলছেন- اول ما خلق الله نوري হাদীসের সহিহ সনদ রয়েছে। এমনকি তিনি দাবি করলেন যে, এ কথা কেউ অস্বীকার করলে হুজুর নাকি তার সাথে বাহাস করতে রাজি আছেন!

হুজুর এমন কথা বলেছেন কিনা তা নিয়ে আমরা কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলাম। কারণ কথাগুলো হুজুরের তবিয়তের সাথেও যাচ্ছে না। আলহামদুলিল্লাহ! ঐ বছরই হুজুর গাজির পাড়া আলিম মাদ্‌রাসার মাহফিলে তাশরিফ আনেন। দুপুর ১২টার দিকে হুজুরের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ মিলে। বিছানায় আরাম করতে করতে হুজুর প্রাণ খুলে কিছু কথা

বললেন। হুজুরের খোশমেজাজ দেখে জিজ্ঞেস করলাম اول ما خلق الله نوري হাদীসটি সম্পর্কে। হুজুর তখন বললেন, এই হাদীসের কোনো গ্রহণযোগ্য সনদ নেই। জুযয়ে মাফকুদে যে সনদ পাওয়া গেছে তা সঠিক নয়। মিশরের প্রখ্যাত শায়খ সাঈদ মামদুহ (হাফি) ইত্তিজাহাতুল হাদিসিয়্যাতে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন এবং তাঁর পূর্ব ভুল থেকে রুজু করেছেন।

মনে তখন খুব শান্তি পেলাম। হুজুর শেষ বয়সে এসেও তাহকিকের সাথে কথা বলতেন। অথচ তরুণ আলিমরা পর্যন্ত বিনা তাহকিকে শোনা কথার উপর ভিত্তি করে কথা বলে ফেলেন। উপরের হাদীসটি সম্পর্কে হুজুরকে আমি অনলাইন দারসে হাদীসেও বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। পরবর্তীতে এই বিষয়টি আমি মাওলানা শিহাব উদ্দিন আলিপুরী হুজুরকে জানিয়েছিলাম। তিনিও হুজুরকে জুযয়ে মাফকুদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখনও হুজুর সেটাকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

ঐ বৈঠকে হুজুরকে পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর! অনেকে চার খলিফার নামে চারটি মাহফিলে মীলাদের ফযীললতের হাদীস বর্ণনা করেন, যা কিনা ইমাম ইবন হাজার হায়তামীর 'আন নিয়মাতুল কুরবা' কিতাবের মধ্যে এসেছে। এই হাদীসগুলো কি বর্ণনাযোগ্য ?

হুজুর তখন জোরালো আওয়াজে বললেন, "বিলকুল না। এই হাদীসগুলোর কোনো সনদ নেই। চার খলিফার নামে মিথ্যা বর্ণনা। এগুলো বর্ণনা করা মোটেও জায়িয নাই"। ইমাম হায়তামী রাহিমাহুল্লাহ এ ধরনের মিথ্যাচার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। উনার লেখা আসল 'নিয়ামাতুল কুবরা'তে এরকম জাহালিয়াত নেই, পরবর্তীতে অসৎ লোকেরা তাঁদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এরকম মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আরবের বিখ্যাত আলেম ড. আবু বকর বাযীব তাঁর مولد الشيخ ابن حجر الهيتمي بين الحقيقة والتزوير গ্রন্থে বিশ্লেষণধর্মী আলেচনায় জালিয়াতির বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

'আসাবিয়াত' বা 'দলকানা' অভ্যাসের বিপরীতে যেয়ে এবং মিলাদ কিয়ামের বৈধতার পক্ষে সময়ের একজন স্তম্ভ হয়েও কি সুচারুভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন, ইখতিলাফ, মতভিন্নতা থাকবে কিন্তু মিথ্যার কোন আশ্রয় ইলমী আলোচনায় জায়গা করে নিতে পারে না। ঐ মজলিসে হুজুর আমাকে নসিহত করেছিলেন যাতে কিতাব চর্চার অভ্যাস বাড়াই এবং কিতাবের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার তাগাদা দিয়ে ছিলেন।

হুজুরের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় হুজুর আমাকে একটা প্রশ্ন করেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, السلام عليكم এর যমীর সর্বদা مذكر হয় কেন? মহিলাদের ক্ষেত্রেও مذكر নেয়া হয় কেন?

আমি হুজুরের সামনে কোনো উত্তর দেয়ার সাহস করলাম না। বরং বললাম, হুজুর আপনি যদি বলে দিতেন! হুজুর প্রথমে বললেন, "মুতালা'আ করো, পাবে ইনশাআল্লাহ"। আমি আবার আরজ করায় বললেন, "এটা আরবদের ব্যবহার। তারা مونث এর জন্যও مذكر যমীর ব্যবহার করে থাকে। যেমন - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন هل عندكم شيء, অর্থাৎ, "তোমার কাছে কি কোনো খাবার আছে"? (সহীহ মুসলিম- ১১৫৪)। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর জন্য كم যমীর ব্যবহার করলেন। এরকম অনেক কায়দা আছে যেগুলো খেলাফে কিয়াস"। এরপর হুজুর বিদায় দিলেন। এরকম হুজুরের প্রতিটি মজলিসই ছিল ইলমি আলোচনায় পরিপূর্ণ। হুজুরের কাছে যতদিন যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি ততদিনই হুজুরের মুখ থেকে হয় প্রয়োজনীয় কথা বলতে শুনেছি নতুবা কোনো ইলমি বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুনেছি। হুজুর ইলম অর্জনে কতটুকু আগ্রহী ছিলেন তা কল্পনাতীত। ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত মুতালা'আ, দারস তাদরিসের সাথে যুক্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। মৃত্যুর বিছানায় শুয়েও তাঁর ধ্যান জ্ঞান ছিল হাদীসের প্রচার প্রসার। হয়তো এজন্যই শেষদিকে তাঁর বিছানার পাশে বসে দেশ বরেণ্য বহু তালেবে হাদীসের পিপাসা তিনি 'সাকী' হয়ে নিবারণ করেছেন। সময়ের চাকায় ভেসে আসে হাদীসের বিখ্যাত ইমাম হাফেজে হাদীস ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মা'য়ীন এর কণ্ঠস্বর। মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতর ইমামকে জিজ্ঞেস করা হলো ما تشتهي "আপনার ইচ্ছা কী"? জবাবে কাতর কণ্ঠে হাদীসের এই সাধক বলেছিলেন- بيت خالي وإسناد عالي "সম্পদ মুক্ত ঘর এবং খুব উচু সনদ"। উনারাই আমাদের সালাফ, আমাদের পূর্বসূরি।

আল্লাহ পাক আমাদের হুজুরকে তাঁর রহমতের চাদরে সর্বদা ঢেকে রাখুন। আমিন।

লেখক: ইমাম ও খতিব, জালালপুর বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, সিলেট।

একজন শায়খুল হাদীসের স্মৃতিচারণে কিছু কথা

অধ্যক্ষ মাওলানা আজিজ আহমদ

একটি নাম একটি ইতিহাস, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। হুজুর সম্পর্কে স্মৃতিচারণমুলক কিছু লিখার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। আমি মোটেই এই মহান ব্যক্তির শানে লেখার যোগ্যতা রাখি না। এরপরও হুজুরের রুহানী ফয়েজ হাসিল করার জন্য আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে দু'একটি স্মৃতিচারণমূলক কথা লিখার ইচ্ছা করলাম।

ছাত্র জীবনে আমার শ্রদ্ধাভাজন হুজুরগণের কাছ থেকে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সুখ্যাতি শুনে হুজুরের সুহবত হাসিলের আগ্রহ প্রকাশ করতাম। ফাজিল পাস করার পর হুজুরের সুহবতের জন্য ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসায় হাদীস শরিফসহ অন্যান্য কিতাবাদি পড়ার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মহোদয়ের নির্দেশ ছিল যেনো সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায় পড়ি। একারণে সেসময় আর ইছামতি মাদ্‌রারাসায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ হয়নি। সৎপুর দারুল হাদীস হতে কামিল পাস করার পর শিক্ষকতায় নিয়োজিত হই। শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে ইছামতি আলিয়া মাদ্‌রাসায় গিয়ে মাসে একদিন হুজুরের বুখারী শরিফের দারসে অংশগ্রহণ করতাম। বুখারী শরিফ দারস দেয়ার সময় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর পঠিত হাদীসটি হাদীসের অন্য যেসব কিতাবে উল্লেখ আছে তাও বর্ণনা করতেন। তৎসঙ্গে উক্ত হাদীস সংশ্লিষ্ট ফিকহ ও আকাঈদের মাসয়ালা বর্ণনা করতঃ বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়েও আলোচনা করতেন। আমার উস্তাযগণের অনেকেই ছিলেন হুজুরের সুনামধন্য সাগরিদ। তন্মধ্যে গোয়াহরি হুজুর (মাওলানা ইরশাদ হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন অন্যতম। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর সৎপুর মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনাকালীন সময়ে গোয়াহরি হুজুর তিনির খেদমত আনজাম দিতেন। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর মাদ্‌রাসার দু'তলার একটি রুমে থাকতেন। গোয়াহরি হুজুর শীতের মৌসুমে ফজরের পূর্বে উদয়পুর থেকে মাদ্‌রাসায় এসে হুজুরের অজুর জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করে দিতেন। এমনকি হুজুরের সকাল বেলা চায়ের ব্যবস্থাও করতেন। আরোও মনে পড়ে বিশ্বনাথ উপজেলাস্থ কামিগঞ্জ নিবাসী মরহুম আব্দুর রহমান (র)'র কথা, ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি কোন এক রাতে ভুরকি হাবিবিয়া হাফিজিয়া মাদ্‌রাসায় গজল মিটিংয়ের শেষ দিকে হঠাৎ বলেন, আহ! যদি ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় হুজুরের দারসে বুখারিতে অংশ নিতে পারতাম তবে ইহাই জীবনের চরম সাফল্য হতো। কিছুদিন পর হুজুর আমাকে বললেন, এতদূর আসা যাওয়া তোমার কস্ট হচ্ছে; রাখালগঞ্জ মাদ্‌রাসায় মাসে একদিন বুখারী শরীফের দারস হয়। তুমি সেখানে আসবে।

তখন থেকে নিয়মিত সেখানে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে দারসে হাদীসে অংশগ্রহণ করতাম। পরবর্তীতে এক সময় বিয়ানিবাজার উপজেলাস্থ ভাটাবাজার হাফিজিয়া মাদ্‌রাসায় হাদীসে মুসালসালাতের দারস এবং সনদও প্রদান করেন। সেখানেও অংশগ্রহণ করি। এক সময় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর সিলেট শহরের জিন্দাবাজারস্থ রসুলগঞ্জ রেস্ট হাউসে পঞ্চম তলায় মাসে একদিন তাফসিরুল কুরআন ও বুখারী শরিফের দারস দিতেন। সেখানেও নিয়মিত অংশগ্রহণ করি। কোন কোন সময় তাফসির ও দারস শেষে হুজুর সেখানে রাতযাপন করতেন। তখন কথা প্রসঙ্গে হুজুরের জীবনের কিছু ঘটনাবলিও বলতেন। পরিশেষে হুজুরের বাড়ির মসজিদে সপ্তাহে একদিন হাদীস শরিফের দারস প্রদান করতেন। নিয়মিত না হলেও সেই সাপ্তাহিক দারসেও উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করতাম। মুহাদ্দিস ছাব হুজুর ছিলেন হাদীস জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহের মধ্য হতে এক অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র। উপমহাদেশের মুহাদ্দিসগণের মধ্য হতে ছিলেন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। সমস্ত জীবনই তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখা পছন্দ করতেন। তাঁর ইলমের পরিমাপ করা অত্যন্ত দূরূহ। তিনি আরব আমিরাতে হানাফী মাযহাবের বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বীয় পীর ও মুর্শিদের নির্দেশে ইলমে দ্বীন তথা হাদীস শরিফের খেদমত করার জন্য বিচারকের দায়িত্ব ছেড়ে বাংলাদেশে চলে আসেন। দীর্ঘ ৬১ বছরের বেশি সময় হাদীস শরীফের দারস ও তাদরীসে নিয়োজিত থেকেছেন। এমনকি হাজার হাজার ছাত্রকে বুখারী শরিফের সনদ প্রদান করেন। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর বিভিন্ন স্থানে মুসালসালাত হাদীসেরও দারস ও সনদ দিয়েছেন। দারস ও সনদ প্রদান শেষে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলতেন, আল্লাহ যদি কবুল করেন ইহাই নাজাতের উসিলা হবে। হুজুরের ছাত্রত্ব লাভের জন্য হুজুরের সমপর্যায়ের লোকজনও তাঁর কাছে বুখারী শরীফ দারস নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করতেন। হুজুর তাতে আপত্তি করলে স্বীয় পীর ও মুর্শিদ ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কাছে তাঁরা আর্জি পেশ করতেন। অতঃপর মুর্শিদের নির্দেশক্রমে তাদেরকে বুখারি শরিফের দারসে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতেন। তাদের মধ্যে অনেকেই হুজুরের ইন্তেকালের পূর্বে এ জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। মেহমানদারি হুজুরের একটা মহৎ গুণ ছিল। তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে কুশল বিনিময় করতেন। খাবারের সময় হলে খাবার খাওয়াতেন। অন্যতায় কিছু টাকা পয়সা হাদিয়া হিসেবে দান করতেন। আরো কত কথা, কত স্মৃতি রয়েছে, যা গুছিয়ে লেখা সম্ভব নয়। পরিশেষে দোয়া করি হুজুরের কবরে যেন আল্লাহ তা'লা রহমত নাযিল করেন। আর তাঁর মকবুল খিদমাতসমূহকে কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখেন।

লেখক : অধ্যক্ষ, হাউসা আলিম মাদ্‌রাসা, সদর, সিলেট।

তিনি একজন মুহসিন বান্দা ছিলেন

মুফতি মাওলানা ইহসান আহমাদ

তখন আমি মৌলবীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন গিয়াস নগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসার নবম-দশম শ্রেণির ছাত্র। আমাদের তিনজন প্রবাদ প্রতীম উস্তায হযরত মাওলানা নজরুল ইসলাম মিঠুপুরী (বড় হুজুর), হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রামপাশার হুজুর) ও হযরত মাওলানা আবদুর রহীম (গাজীপুরী হুজুর) এর কাছে প্রায়ই হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে শুনতাম। তিনি ছিলেন তাঁদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় উস্তায। তাই আমাদের উস্তাযগণ প্রায়শই বিভিন্ন বিষয়ে উনার কথা ও কাজের উদাহরণ টেনে আমাদের নসীহত করতেন। এই সুবাদে মনের গভীরে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা স্থান পেয়েছিল। প্রতি বছর মাদ্‌রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে বড় হুজুর যেকোন উপায়েই হোক হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবকে দাওয়াত দিয়ে আনতেন। মূলতঃ আমাদের বড় হুজুর হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব এর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্রগণের একজন। এ কারণে বড় হুজুর দাওয়াত দিলে তিনি বিশেষ কোন অসুবিধা না হলে ফিরিয়ে দিতেন না। তাই বছরান্তে একবার তাঁর নূরানী চেহারা দেখা এবং টুকটাক খিদমাত করার সুযোগ পেতাম। তিনি আমাদের উস্তাযগণের উস্তায, তাই আমরা তাঁকে 'দাদা ছাব' বলে সম্বোধন করতাম। আসলে দেশে থাকাকালীন একান্তভাবে উনার সুহবত লাভের সুযোগ হয়নি।

২০০০ সালে বৃটেন পাড়ি জমাই। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ দিন থেকে প্রতি বছর কিছু দিনের জন্য বৃটেন সফরে আসেন। এদেশের বিভিন্ন শহরে তাঁর অনেক ছাত্র স্থায়ী বসবাস করে বিভিন্ন দ্বীনী খিদমাতের সাথে জড়িত রয়েছেন। তাই তিনি সফরে এলে এদেশের উল্লেখযোগ্য প্রতিটি শহরেই প্রোগ্রাম থাকে, তাঁকে যেতে হয়। কিন্তু সফরকালীন সময়ে উনার মূল অবস্থান হয় পূর্ব লন্ডন এলাকায়। যেহেতু আমিও একই এলাকার বাসিন্দা তাই সময় সুযোগে প্রায় নিয়মিত তাঁর খিদমাতে হাজির হতাম।

২০০৮ সালের শেষ দিকের কথা, তখন আমি ইউস্টন মসজিদে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ বৃটেন সফরে এলেন। কিছু দিনের মধ্যেই আল হাবীব ফাউন্ডেশন ও খাইরাত ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে শামসুল উলামা হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত দারুল হাদীস লতিফিয়া মাদ্‌রাসায় শুরু হলো সাপ্তাহিক দারসে হাদীস। সাপ্তাহের প্রতি শনিবার বাদ মাগরিব থেকে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ শামাঈলে তিরমিযী নামক বিখ্যাত হাদীসের কিতাব ধারাবাহিক দারস দিতেন। ঐতিহাসিক সে দারসে নিয়মিত

শরীক হই। এমনকি দারসের দিন প্রায়ই বাসা থেকে মাদ্‌রাসা পর্যন্ত নেয়া আনার দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করি। এই সুবাদে দেশে থাকতে উনার কাছে হাদীস পড়া ও একান্ত সান্নিধ্য লাভের সুযোগ বঞ্চিত হলেও এখানে সে মহৎ সুযোগ লাভে ধন্য হই। শামাঈলে তিরমিযী কিতাবের দারস পূর্ণ হলে তিনি দারসে অংশগ্রহণকারী আড়াই শতাধিক উলামাকে সনদ প্রদান করেন। এরপরই শুরু হয় রিয়াদুস সালিহীন নামক বিখ্যাত হাদীসের কিতাবের ধারাবাহিক দারস। নিয়মিত সাপ্তাহিক দারসে হাদীসে বিভিন্ন ধারার উলামা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতেন। রিয়াদুস সাহিলিহীন কিতাব প্রায় অর্ধেক দারস শেষে তিনি দেশে ফেরত যান। মূলতঃ সেবারই তিনি সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ব্রিটেনে অবস্থান করেছিলেন। এই দীর্ঘ অবস্থানের কারণে উনার একান্ত সান্নিধ্য লাভের সুযোগ লাভ করি। তিনি এই অধমকে কতটুকু যে স্নেহ করতেন তা ভাষায় ব্যক্ত করতে আমি অপারগ। তবে এতটুকু বলতে পারি, বাল্য বয়সে আমি দাদা হারিয়েছি। তাই দাদার স্নেহ মমতা পাইনি। কিন্তু যুগ শ্রেষ্ঠ মনীষী হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ স্নেহ মমতা, শিক্ষা ও শাসনের মাধ্যমে আমার দাদার অপূর্ণতা সম্পূর্ণ দূর করে দিয়ে গেছেন।

২০২০ সালের ৬ মার্চ হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব বৃটেন সফরে আসেন। মাস দেড়েকের মধ্যে দেশে ফেরত যাবেন এরকম পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়লে সব উলট পালট হয়ে যায়। লকডাউন ঘোষিত হলে সবাই গৃহবন্দী অবস্থায় থাকতে হয়। সেই সফরে তিনি অবস্থান করেন পূর্ব লন্ডনের ওয়াপিং এলাকায় অবস্থিত তাঁর এক ভাতিজীর বাসায়। লকডাউনের কড়াকড়ি উপেক্ষা করেও মাঝে মধ্যে তাঁর খিদমতে হাজির হতাম। তিনি আমাদের সাহস যেগাতেন, বিভিন্ন দুআ - আমল শিখিয়ে দিতেন। লকডাউনের কড়াকড়ি কিছুটা স্তিমিত হলে সেই ঘরেই তিনি সহীহ বুখারী শরীফের দারস শুরু করেন। প্রতিদিন বিকাল সাতটা থেকে শুরু করে দেড় দুই ঘণ্টা দারস চলতো। জুম লিংকের মাধ্যমে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে সত্তর আশিজন আলিম নিয়মিত দারসে অংশ নিতেন। তবে সরাসরি আমরা মাত্র চারজন বসতাম। লকডাউন শিথিল হয়ে লন্ডন সিলেট ফ্লাইট চালু হলে তিনি দেশে ফেরত যান। দেশে যাওয়ার দুইদিন পূর্ব পর্যন্ত দারস চালু রাখেন। কে জানতো সেই সফরই ব্রিটেনে তাঁর শেষ সফর হবে।

বেশ কয়েক বছর বৃটেন সফরকালীন উনাকে খুব কাছে থেকে দেখার অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, তিনি ছিলেন সুন্নাতে নববীর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নতের অনুসরণ করতেন। আশপাশে যারা থাকতো সবাইকে সুন্নত পালনে তাকিদ দিতেন, উৎসাহিত করতেন। এমনকি প্রতিটি কাজের সুন্নত তরীকা এবং দুআসমূহ শিখিয়ে দিতেন। আলিম উলামা তাঁর কাছে আসলে বিভিন্ন ইলমী বিষয় নিয়ে

আলোচনা করতেন। সবাইকে কিতাব পড়ার তাকিদ দিতেন। বলতেন, সুযোগ পেলেই ঘরোয়া বৈঠক হলেও প্রয়োজনীয় আলাপচারিতায় জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে একটি হলেও হাদীস নিয়ে আলোচনা করবেন। এতে সাধারণ মানুষের মাঝে সুন্নত পালনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন সময় তাঁর সাথে একই রুমে রাত যাপনের সৌভাগ্য হয়েছে। প্রতি রাতেই দেখেছি শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে হাজত ও অজু করে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। ধীর স্থিরভাবে দীর্ঘ কিরাত ও দীর্ঘ রুকু সিজদা সহকারে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। এরপর দীর্ঘ সময় নিয়ে মুনাজাত করতেন। মুনাজাতে দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরতে স্বচক্ষে দেখেছি।

কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় মুহসিন বান্দাগণের যেসমস্ত গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাঝে এসব গুণাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিদ্যমান ছিল। তিনি মুসতাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন। আমি মন খুলে তাঁর কাছে জীবনের সব দুঃখ বেদনার কথা বলতাম। আমার জন্য তিনি যখন যে দুআ করেছেন তা কবুল হয়েছে। এর সুফল আমি পেয়েছি।

এমন সোনার মানুষ এ জীবনে আর পাবো না। আল্লাহপাক তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান বানিয়ে রাখুন। তাঁর রূহানী দুআ ও জাওয়াজ্জুহ আমাদের উপর জারি রাখুন। আমীন ॥

লেখক: প্রতিষ্ঠাতা, মনসবিয়া ইহসানিয়া হাফিযিয়া মাদ্‌রাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার; চেয়ারম্যান, আল ইহসান ফাউন্ডেশন।

এনর ফাউগড়ী বড় টাইট অইছে

মাওলানা নিয়াজ উদ্দিন আল আযহারী

বিসমিল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ, ওয়ালা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়ামান ওয়ালাহ।

ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী ও মুহাদ্দিস ছাব হুজুর রাহিমাহুমাল্লাহকে আমার জীবনে প্রথম দেখেছি ইছাপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক জলসায় যখন আমি সেখানে হাফেজি পড়ছি। পরবর্তীতে আমি চলে আসি মুহাদ্দিস ছাব হুজুরের হাতেগড়া প্রতিষ্ঠান থানাবাজার হাবিবিয়া হিফজুল কুরআন মাদরাসায়। তখন নতুন ভবনের কাজ চলছিল। একদিন আমরা সবাই পুকুর থেকে উঠানো নতুন মাটি এখান থেকে ওখানে নিয়ে লেভেলিং করছিলাম। সেসময় হুজুর আসলেন মাদরাসার কাজ দেখতে। আমি তখন নিচু হয়ে মাটির একটি দলা উঠাচ্ছিলাম। আমার পিঠে হাত রেখে ভর দিয়ে একটু উঁচুতে উঠতে উঠতে বললেন, "আমি তোমার উপর ভর দিচ্ছি; তুমি যারিও (সহ্য করিও)"। তাঁর সেই মুবারক স্পর্শ আমার মনকে এত শিহরিত করে দিয়েছিল যে, এখনো মনে হয় যেন তাঁর হাতের ছোঁয়া আমার পিঠে লেগে আছে। মাদ্রাসায় আসার সময় প্রায়ই দেখতাম তাঁর গাড়ি দ্রুতবেগে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। আগে থেকে খেয়াল করলে রেডি হতাম সালাম দেওয়ার জন্য, কিন্তু তিনি এর আগে হাত তুলে আমাদেরকে সালাম দিয়ে দিতেন।

আমাদের হিফযের সনদ (পাগড়ী) পরানোর কথা ছিল ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহর হাতে। অসুস্থতার কারণে ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ আসতে পারেননি। এজন্য মুহাদ্দিস ছাব হুজুরই আমাদেরকে পাগড়ি পরালেন। আমরা ছিলাম থানাবাজার হাফেজি মাদ্রাসার প্রথম ব্যাচের ছাত্র। আমার পাগড়ি এত টাইট হল যে, তিনি বললেন, "এ্যাহ, এনর ফাউগড়ী ইকটা বড় টাইট অইছে"। তখনই আমার মনে মনে বিশ্বাস হলো যে, ইনশাআল্লাহ কোনদিন তাঁর স্নেহধন্য হবো। সেদিন আমরা একটি ক্যামেরা ভাড়া করে এনেছিলাম ছবি তোলার জন্য। আমার পালা আসতেই তিনি বললেন, "ছবি উঠাচ্ছো কেন? ছবি উঠিয়ে কি হবে? দরকার হলে মনের ক্যামেরায় ছবি তুলে রাখো"। এরপর থেকে তাঁর সামনে আমি আর কোনদিন ছবি উঠানোর সাহস পাইনি। একদিন এক মাহফিলে তাঁর সামনে বসে চুপে চুপে একটা ছবি উঠাতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তাও দেখে ফেললেন। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনার মধ্যে ঠিক আগের কথাটাই বললেন। এরপর আর কখনো তাঁর সাথে ছবি উঠানো হয় নি। এখন মনে হয়, আহা, কেন হুজুরের সাথে একটা ছবি উঠিয়ে রাখলাম না। হিফযের পর দাখিল পর্যন্ত তিনি দেশের বাইরে থাকায় আর তেমন একটা দেখা পাইনি।

আমি তখন দারুন্নাজাতে আলিমে পড়ি। দীর্ঘদিন পর তিনি লন্ডন থেকে দেশে ফিরেছেন। সাহস করে একদিন বাড়িতে দেখা করতে চলে গেলাম। দাদার পরিচয় দিতেই ভালোভাবে চিনলেন। দারুন্নাজাতের সকল প্রকাশনা তাঁর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতাম। এজন্য তিনি বলতেন, "নিয়াজের সাথে আমার বড় খাতির"। কিতাবের প্রতি ছিল তাঁর শিশুসুলভ আগ্রহ। অন্য কোন কিছু হাদিয়া নিয়ে গেলে বলতেন, " টাকা খরচ করে এসব এনো না। আমার জন্য বরং কিতাব নিয়ে এসো"। এরপর থেকে প্রায়ই সুযোগ পেলে যখন তখন দেখা করতে চলে যেতাম মনের মধ্যে জমে থাকা হাজারো প্রশ্ন নিয়ে। মনে মনে ভয়ে থাকতাম বিরক্ত হচ্ছেন কিনা। তাই জিজ্ঞেস করতাম, "হুজুর, অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করছি কি না"। বলতেন, "না, মনে মনে তোমার অপেক্ষা করছিলাম"।

আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁর পরামর্শে নিয়েছি এবং আল্লাহ তায়ালা তাতে কল্যান দিয়েছেন। আলিমের পরিক্ষার পর তাঁর পরামর্শেই ভার্সিটিতে না গিয়ে দারুন্নাজাতে থেকে গিয়েছিলাম। সেসময় ইবনে তাইমিয়া ও নজদি আকিদার ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। ইবনে তাইমিয়ার ব্যাপারে এলোপাতাড়ি প্রশ্ন করতাম। তিনি বলতেন, "তিনি অনেক বড় আলিম ছিলেন। তবে উলামায়ে কেরাম তাঁর অনেক মাসয়ালা রদ করেছেন এবং পরিত্যাগ করেছেন"। তাঁর তাজসিমি ও তাশবিহি আকিদার ব্যাপারে বলতেন, "আমার বুঝে আসে না যে, তাঁর মত এত বড় আলিম কীভাবে এরকম বেবুঝি আকিদা পোষণ করতেন! কেউ কি তাঁকে উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন করে মাথা গরম করিয়ে এমন বলিয়েছিল কি না"। আমি বললাম, "হুজুর, এ ব্যাপারে আপনি কোন সূত্র পেয়েছেন কি না? তাঁর লেখ-লেখি তো এমন প্রমাণ করে না"। তিনি বললেন, "কি জানি, খুঁজে দেখ পাওয়া যায় কি না"। আবার তিনি ইবনে তাইমিয়ার ইলমি কাজের প্রশংসাও করতেন।

শায়খ আলবানীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তার সুনানের কিতাবগুলোকে সহিহ ও দইফ দুই ভাগে ভাগ করাকে খুবই অপছন্দ করতেন। বলতেন, "এ কাজের কারণে হাদীসের কিতাবের মানক্ষুণ্ন হয়েছে"। কখনো কখনো তার স্ববিরোধী মতামতগুলো পর্যালোচনা করতেন।

মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, "তিনি জগতের সব কিছুতেই খালি শিরকের গন্ধ পেতেন। এ জন্য শরিয়তে বৈধ অনেক বিষয়কে নাজাইয ও হারাম ফতোয়া দিয়েছেন"।

নজদি আকিদা বিষয়ে আমি তাঁকে একটু বাড়াবাড়ি রকমের প্রশ্ন করতাম। হাদীসে রহমতের আলোচনা আসলেই আমি প্রশ্ন করতাম يرحمكم من في السماء, এর মানে কী? একবার প্রশ্ন না করে চুপ হয়ে বসে থাকলাম। হঠাৎ ঠোঁট নাড়াতেই বললেন, "আপনি

প্রশ্ন করছেন না কেন? আমি তো অপেক্ষায় আছি আপনি এই প্রশ্ন করবেন। এসব বিষয় নিয়ে এত পেরেশান হওয়ার দরকার নাই। এমনিতেই বুঝে আসবে। কাউকে জাহান্নামের অতলে অথবা জান্নাতের উচ্চ দরজায় পৌঁছানোর দরকার নাই। নইলে কাউকে নাগাল পাবে না। তালিবুল ইলমের কাজ হল সবার কাছ থেকে ইলিম নেওয়া।"

কারো সাথে দ্বিমত পোষণ করলে পূর্ণ সম্মানের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেন। রূঢ় শব্দ ব্যবহার করে কারো সমালোচনা করতে কখনো শুনিনি। কারো মতামত পর্যালোচনার সাথে সাথে তার ভালো-মন্দ দুই দিক উল্লেখ করতেন। এটাই ছিল তাঁর মানহাজ। পূর্ণ শ্রদ্ধাসহ অন্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করার এই নীতি আযহারের উলামায়ে কেরামের মধ্যেও দেখেছি। এজন্য তিনি সকল দলমতের লোকের কাছে শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে কয়েকটা প্রশ্ন করে দেখে নিতেন যে, আপনি এ ব্যাপারে না জেনে প্রশ্ন করছেন নাকি বুঝে-শুনেই কথা বলছেন। অনেক সময় সরাসরি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলে দিতেন অমুক কিতাবে আছে, যাতে আপনি নিজে মুতালায়া করে সামাধান বের করতে পারেন। কখনো উপর্যোপরি প্রশ্ন করে প্রশ্নকারীর মুখ থেকে জবাব বের করে নিতেন।

রুকুতে গোড়ালি মিলানোর হুকুম সম্পর্কে একদিন জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সম্পর্কে তুমি কি জানো? বললাম, "হুজুর, তরিকুল ইসলামে লেখা আছে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এছাড়া আমাদের একজন উস্তাদের মুখ থেকেও এমনটা শুনলাম"। বললেন, "তরিকুল ইসলামে কোন কিতাব থেকে এনেছেন"? বললাম, "তা তো জানি না"। বললেন, "শামী থেকে। আমার যতটুকু জানা এই মাসালায় আব্দুল হাই লখনবী রহঃ ছাহেবের সেয়ায়াহ (سعاية) কিতাবে তাহকিক আছে। কিতাবটা আমার কাছে নাই। ঢাকায় পাওয়া যায় নাকি"? বললাম, জী হুজুর, পাওয়া যায়। "তাহলে আমার জন্য কিতাবটা পারলে আনিও"। আমি একদিন বাড়িতে আসার সময় নিয়ে এলাম। খুব খুশি হলেন। একবার রমজান মাসে বললেন, "মাসয়ালাটা যদি বের করে দিতে"। আমি অনেক খুঁজেও পেলাম না। তিনি অপেক্ষা করতে করতে ঘরে চলে গেলেন। হঠাৎ মনে হল দারুন্নাজাতের মাওলানা আবু বকর ভাইয়ের সাথে এ বিষয়ে একদিন আলোচনা হয়েছিল। তাকে ফোন দিতেই তিনি পৃষ্ঠা নাম্বারসহ বলে দিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে মাসয়ালাটাও আমার চোখে পড়ে গেল। আমি কিতাবটা সেদিন সাথে করে নিয়ে গেলাম। ভাবলাম একটা সুযোগ পেয়েছি, কাজে লাগাই। ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তেই ফোন দিলাম। জিজ্ঞেস করলেন কি খবর? বললাম, "হুজুর মাসয়ালা পেয়েছি। আমি কিতাব সাথে নিয়ে এসেছি, কালকে নিয়ে আসবো"। শুনে খুশি হলেন এবং দোয়া করলেন। আমি জানতাম যে, তিনি এই খবর পেলে দোয়া করবেন সেজন্য এই সময়ে কল দিয়েছি। পরদিন সকালে গিয়ে দেখি তিনি মাকতাবায় বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বললেন, "কই তোমার মাসয়ালা? আগে জলদি আমাকে পড়ে শুনাও"। আমি

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে শুনালাম। জায়গায় জায়গায় আমাকে প্রশ্নও করলেন যাতে ঠিকমতো মুতালায়া করলাম কিনা বা বুঝলাম কিনা। অনেক খুশি হলেন। সে কদিন কিতাবটাও টেবিলে রেখে দিলেন। উলামায়ে কেরাম এলে তাদের সাথে এই বিষয় নিয়ে কথা বললেন।

ইমাম আব্দুল হাই লাখনভি রহঃ তাঁর سعاية কিতাবের ২য় খণ্ডের ১৮০-১৮২ পৃষ্ঠায় আয়িম্মায়ে কেরামদের মতামত উল্লেখ করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর তাহকিক অনুযায়ি, অনেক মুতাআখখিরিন ইমাম তাঁদের কিতাবে এই মাসয়ালা উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশই আল-মুজতবা কিতাব থেকে নকল করেছেন কিন্তু কেউ এর পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন কিতাব থেকে প্রমাণ উল্লেখ করেন নি। তিনি বলেন, শায়খ আবুল হাসান সিন্দি রহঃ বলেন, "মাশায়িখিনে কেরামের অনেকে মনে করেন যে, এটা সাহিবুল মুজতাবা সাহাবায়ে কেরামদের কাতারে ফাঁকা পূরণ করার জন্য অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলানো ও গোড়ালি মিলানো থেকে 'ওহাম' (ধারণা) বশত বলেছেন। অথচ এখানে নিজে নিজের গোড়ালি মিলানোর কথা বলা হয়নি বরং একে অন্যের গোড়ালি মিলানোর কথা বলা হয়েছে"। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে সামাধান হচ্ছে, إلصاق الكعبين দিয়ে যদি নিজের এক গোড়ালির সাথে অন্য গোড়ালি মিলানো বুঝায়- যেমনটা দুররুল মুখতার, বাহরুর রায়িক, নাহরুল ফায়িক ইত্যাদি কিতাবের ইবারত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়- তাহলে সটিক মত হচ্ছে, তা সুন্নত নয়। কারণ, প্রথমত এর পক্ষে কোন প্রমাণ নাই, দ্বিতীয়ত মুহাক্কিকীনে কেরামের মতানুযায়ী উত্তম হচ্ছে, নামাযি ব্যক্তি তার দুই পায়ের মাঝখানে চার আঙুল পরিমাণ ফাঁকা রাখবে, রুকুর সময় তা মিলিয়ে দেওয়ার কথা তাঁরা কেউ বলেননি। রুকুর সময় গোড়ালি মিলাতে গেলে কোন একটি পা নাড়াতে হবে। আর বিনা কারণে নামাযে কোন অঙ্গ নাড়ানো বৈধ নয়। এজন্য অনেকে তাশাহুদে শাহাদাত আঙুলি নাড়াতেও নিষেধ করেন। যারা রুকুতে রফয়ে ইয়াদাইন করতেও নিষেধ করেন তাঁদের কাছে এটাও একটি কারণ। আর যদি এর ধারা এইটা বুঝায় যে, দুই পায়ের গোড়ালি একটা আরেকটার বরাবর (সমান) করা তাহলে তা সটিক। আল্লামা সিন্দিও এরকম বলেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য মূল কিতাব দেখে নেয়া যেতে পারে।

একবার আমাকে একটি কবিতার একাংশ উল্লেখ করে বললেন, "এই কবিতাটা ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির "তাযকিরাহ" কিতাবে আছে। যদি বের করে দিতে পারো তাহলে তোমার জন্য দোয়া করবো"। তাজকিরা কিতাবের অন্তত তিনটা নুসখা মাকতাবায় আছে। দারুল হাদীসেরটা নিয়ে লাল রংয়ে লেখা কবিতাটা খুব সহজে বের করে দিলাম। খুশি হয়ে অনেক দোয়া করলেন। গম্ভীর সুরে আবেগ নিয়ে বারবার আবৃত্তি করলেন,

يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل
ويرى مناط عروقها في لحومها والمخ في تلك العظام النحل
آجالها محتومه أرزاقها مقسومة بعطا و إن لم تسأل
فلقد سألتك بالنبي محمد الهاشمي المدثر المزمل
امن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول

কয়েকটা শব্দের অর্থ তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম। কয়দিন পর আমি এটার কাব্যে ভাবানুবাদ করে ভয়ে ভয়ে বললাম, "হুজুর, শে'রটার অনুবাদ করেছিলাম। একটু যদি দেখতেন হলো কিনা"। বললেন, "তুমি পড়ে শুনাও"। শুনালাম,

"তিমির রাতে দেখো যে জন মাছির ডানার গোপন কাঁপন
জীর্ণ হাড়ের মজ্জা তারই পিশিত মাঝে শিরার নাচন।
বিভাজিত রিজিক তাহার না চাহিতে পায় সে হেথায়,
মরণ বায়ু আসবে যবে পালিয়ে যাবে কোন সে কোথায়।
কামলিওয়ালা চাদর ওয়ালা যিনি মোদের দয়াল নবী
তার অসিলায় ভিক্ষা মাগি, হাসেম-কুলের মহান রবি।
কৃপা করো দয়াল প্রভু পাপ-অনুতাপ জাগিয়ে মনে,
মুছে দিয়ে ঘোর কালিমা ঘটেছে যা পূর্ব দিনে"।

আবুল আলা ইবনে সুলাইমান আল মাগরিবির এই কবিতা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, "পড়ালেখার মাঝে মাঝে যে তুমি বড় কবিও তাতো জানতাম না। بارك الله في شعرك

তাঁর খাদেম মাওলানা সাবেল ভাই, সালিক ভাই ও আমাকে মাকতাবায় বুখারীর প্রথম থেকে কিতাবুল ইলমের বেশ কিছু অংশ পড়িয়েছেন। সারা জীবন বুখারী পড়িয়েও মুতালায়া ছাড়া কখনো আমাদেরকে পড়াননি। দীর্ঘসময় মুতালায়া করতেন খবর পেতাম। তবুও বলতেন, "আগের মত মুতালায়া করতে পারি না, মনে রাখতে পারি না"। অথচ তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল আমাদের থেকে হাজারগুণ বেশি। ইবারত পড়ার সময় ভুল শুধরিয়ে দিতেন। নাহু সরফের কাওয়াইদ বলতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এমন নিয়ামত দিয়েছিলেন যে, বিশাল একটা বিষয়কে অল্পকথায় গুছিয়ে নিয়ে আসতে পারতেন। পরে কিতাবের হাশিয়া পড়লে দেখা যেত সবই তিনি বলে দিয়েছেন। তারাজিমুল আবওয়াব, ফিকহুল হাদীস, তায়ারুদ ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করতেন। কোন বিষয়ে নিজস্ব চিন্তা থাকলে তাও বলতেন। সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করতেন। একই নামের একাধিক রাবী থাকলে দুজনকে পার্থক্য করার জন্য তাঁদের পরিচয়সহ এমন কিছু চমকপ্রদ ঘটনা বলতেন যাতে দুজনকে আলাদা করে

চিনা যেত এবং তাঁদের কাহিনী মনে গেঁথে যেত। শব্দের বিভিন্ন প্রায়োগিক অর্থের আলোচনা করতেন। বলতেন امرأ , এমন একটা আজিব শব্দ যার মাহাল্লে এরাবের সাথে সাথে আগের হরফেরও মুয়াফিক হরকত পরিবর্তন হয়। যেমন امرِؤٌ، امرَأً، امرأ , এই তথ্য আমি প্রথমে তাঁর কাছেই শুনেছি। পরে অবশ্য মাবাদিউল আরাবিয়ার হাশিয়ায় اسم শব্দটিও পেয়েছি।

এর কদিন আগে আমাদেরকে রিয়াদুস সালেহীনের বেশ কিছু অংশ পড়িয়েছিলেন।

একবার রমজানে আমি আর মাসউদ ভাই জোর দিয়ে বললাম আমাদেরকে তিরমিজি শরীফ পড়াতে হবে। তিনি বললেন, "আমার এই শরীর নিয়ে মুতালায়া করতে পারি না। অন্য কোন কিতাব পড়ো"। পরের দিন এসে দেখি টেবিলে তিরমিজি শরীফ রাখা। শুনলাম, দীর্ঘ রাত পর্যন্ত মুতালায়া হয়েছে। আসার পর বললেন, "বললে না তিরমিজি পড়বে? কই, বের কর"। তিন-চারদিন এভাবে পড়ানোর পর বললেন, "আমি মুতালায়া করতে পারি না। এ কিতাব পারবোনা। অন্য কিতাব ধরো যাতে মুতালায়া লাগে না"। আমরা দুজন একে অন্যের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে বললাম, আপনার মন থেকে যা পারেন আলোচনা করেন। তিনি অনেকটা ধমকের স্বরে বললেন, "বুঝোনা কেন মুতালায়া ছাড়া পড়াতে পারবো না"। আমরা বাধ্য হয়ে ইমাম বুখারি রহঃ এর 'আদাবুল মুফরাদ' কিতাব ধরলাম। পুরো রমজানে কিতাবের অর্ধেকের বেশি পড়া হয়েছিল। অসুস্থ শরীর নিয়ে আমাদের সাথে কখনো তিনিও ইবারত পড়তেন। ঝিমুনি এসে গেলে বলতাম, মেহমানখানায় গিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন। এরপর আমরা লেগে যেতাম কিতাব মলাটের কাজে। পরে দেখেছিলাম কিতাবের শেষ হওয়া জায়গায় উর্দুতে তারিখসহ লিখে রেখেছেন।

একটা বিষয় আমাদের কাছে পরীক্ষিত ছিল যে, ইলমি আলোচনায় তার অসুস্থতা দূর হয়ে যেতো। মাঝে মাঝে লাঠিতে ভর দিয়ে এত নুয়ে নুয়ে আসতেন যে আমরা তাঁকে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ার কথা বলতাম। তিনি বলতেন, "না, এতো কষ্ট করে আসছো আর আমি ঘরে চলে যাই কেমনে? দেখি, একটু সময় বসি"। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শুরু করলে দেখতাম তিনি পুরোই সুস্থ। পরে যখন ঘরে যেতেন তখন সুন্দর সুস্থ-সবল মানুষের মত হেঁটে যেতে পারতেন। এই ঘটনা আমরা বার বার দেখেছি।

যোহরের সময় হলে আমাদেরকে ডেকে সাথে নিয়ে মসজিদে যেতেন। সে বছর রমজানের শেষের দিকে বন্যায় পুরো বাড়িতে পানি উঠে গেল। রাস্তায় তখন হাঁটু পানি। প্রচণ্ড স্রোত। এই অবস্থায়ও তিনি আমাদের হাতে ধরে ধরে মসজিদে যোহরের নামাজে গিয়েছিলেন।

হাদীসে এসেছে ঈমানের ৭০টি শাখা রয়েছে তার মধ্যে সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা إماطة الأذى عن الطريق وذلك أضعف الإيمان , এই হাদীসের وذلك أضعف الإيمان এই কথাটা আমার বুঝে আসতো না। আমি ভাবতাম, রাস্তা থেকে

কষ্টদায়ক বস্তু সরানো কীভাবে সবচেয়ে দুর্বল ঈমান হয়। একজন মানুষের ঈমান কত শক্ত হলে সে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরাতে পারে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে বললেন, "ও..., দইফ শব্দের একটি অর্থ শিখেছো দুর্বল। এইটাই ঝামেলা করছে। এটা হচ্ছে ঈমানের একটি ছোট কাজ"। অর্থাৎ, প্রতিটি নেক কাজ হচ্ছে ঈমানী কাজ। যেমন নামাজ, রোজা ইত্যাদি। আর এগুলো থেকে খুবই ছোট ও সহজ একটি কাজ হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো।

একবার আমি তাঁর সামনে বসে লিখছিলাম। তিনি বললেন, "আমরা পরীক্ষার সময় আসলে উস্তাযদের কাছে গিয়ে হাতে ফুঁ দেওয়াতাম। ব্যথা হয়ে যাওয়ার কারণে। তাঁরা আমাদেরকে কলম কীভাবে ধরতে হয় শিখিয়ে দিতেন"। আমি সাধারণত মধ্যমা আঙ্গুলের উপর কলমের আগা রেখে বুড়ো ও শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে কলম চেপে লেখতাম। তিনি সেটা দেখে আমাকে বললেন, "এভাবে না, মধ্যমা ও বুড়ো আঙ্গুলের ডগা দিয়ে কলম ধরো আর উপরে শাহাদাত আঙ্গুল রেখে দাও, চাপ দিওনা"। আমি প্রথমে না বুঝায় নিজে কলম ধরে দেখালেন "এভাবে"। আমি আগে বুঝতাম না যে লিখলে হাতে ব্যথা হয় কেন। এরপর থেকে এভাবে লেখার কারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখলেও হাতে ব্যথা হয় না। তখন বুঝলাম, শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে চাপ দেওয়ার কারণে একটু সময় লিখলেই কনুই পর্যন্ত পুরো হাত অবশ হয়ে যেত।

উর্দু শেখার জন্য আমাকে খুব তাকিদ দিতেন। আমি উর্দু না জানায় আফসোস করে বলতেন, "কি মনি-মুক্তা থেকে মাহরুম আছো জানো না। উর্দু শেখো"। আনোয়ারুল বারী বের করে দিয়ে বলতেন, "এই কিতাব এক এক করে সব খণ্ড পড়ে ফেলো। যে শব্দ না পারো আমাকে বলো"। তাঁর সামনে বসে কয়েক পৃষ্ঠা পড়েছিলাম মাত্র। মাঝে মধ্যে কোন শব্দ জিজ্ঞেস করলে অর্থ বলে দিতেন।

নিজেকে লুকানোর একটা সহজাত প্রবৃত্তি ছিল মুহাদ্দিস ছাব হুজুর রাহিমাহুল্লাহর। তিনি ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহর খলিফা ছিলেন। অথচ তাঁর কোন কথা বা কাজে এগুলো কখনো প্রকাশ পেত না। একবার কোন কথা প্রসঙ্গে আমাকে প্রায় ধমকের স্বরে বলেছিলেন, "আমি কি কখনো বলেছি যে আমি পীর"? অবশ্য অনেককেই দেখেছি বিভিন্ন সময়ে তাঁর কাছ থেকে তরিকতের তালিম নিতে। সিররি কোন বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করার সাহস আমার কখনো জাগেনি। একদিন বলেছিলেন, "শরীয়তের বিষয়ে প্রশ্ন না করা আর তরিকতের বিষয়ে (অতিরিক্ত) প্রশ্ন করা মাহরুম হওয়ার কারণ"।

আমরা ছোট থাকতে মানুষের মুখে শুনতাম, ছোটবেলা নাকি ছাহেব কিবলাহ রহ. র ব্যাপারে মুহাদ্দিস ছাব হুজুরের ভালো মনোভাব ছিল না। আমি একদিন এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "না না, মন ভালাই ছিল। বরং যেভাবে মন ভালাই থাকার কথা তার থেকেও বেশি ছিল। বরং, বলতে পারো, তরিকা-তাসাউফ এগুলোকে

এক সময় জরুর মনে করতাম না। তাহলে এই মানসিকতা কীভাবে দূর হলো তাও শুনে রাখো"। এই বলে তিনি এক স্বপ্নের কথা বললেন। যে স্বপ্নে তিনি কিতাব দিয়ে বাঘ তাড়াচ্ছেন দেখছিলেন এবং পরবর্তীতে কামিল প্রথম বর্ষে থাকতে শেখঘাট মসজিদে ছাহেব কিবলাহ রহ.'র নিকটে বায়াত গ্রহণ করার বিষয়ে বিস্তারিত বললেন। এই ঘটনা 'আল হাবিব' নামে নিউ জার্সির শাহজালাল লতিফিয়া সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত স্মারকে তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকারে মুহতারাম আহমদ হাসান চৌধুরী শাহান ছাব হুজুর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তাঁর সামনে দীর্ঘ সময় বসার তৌফিক আল্লাহ দিয়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ। কখনো তাঁকে দেখিনি কারো প্রতি বিদ্রুপ করতে বা বদ ধারণা করতে। একদিন আমি কারো নেতিবাচক কিছু দিক তুলে ধরলাম (আল্লাহ তাকে ও আমাকে ক্ষমা করুন)। কিন্তু তিনি তার পক্ষে সম্ভাব্য কিছু ওযর পেশ করলেন যা আমি ভাবিওনি। তাৎক্ষণিক আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হলাম। কারো ছোটখাটো কোন কাজকে তিনি তুচ্ছ করে দেখতেন না বরং পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করতেন। অনেককে দেখতাম মাঝে মাঝে (আমাদের বিবেচনায়) হাস্যকর প্রশ্ন করত। তিনি তাতে বিরক্ত না হয়ে ধৈর্য ধরে উত্তর দিতেন। অনেককে দেখতাম শুধু শুধু সময় ক্ষেপণ করছে। এদিকে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। ইঙ্গিতে বললেও টের পাচ্ছে না। তখনও সে না উঠা পর্যন্ত তিনি ধৈর্য ধরে বসে থাকতেন। আমি তাঁর ধৈর্য দেখে অবাক হতাম।

আশপাশের কারো কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকতো সবসময়। তিনি চেয়ার, সোফায় বসা বা খাটে শুয়ে থাকলে আমি নিচে বসার চেষ্টা করতাম। তিনি বলতেন, "ঠান্ডা লাগবে, উপরে বসো"। বলতাম, "ঠান্ডায় সমস্যা নাই হুজুর, আরাম লাগে আরো"। তিনি বলতেন, "না, উপরে বসো তাহলে আমিও তোমাকে দেখতে পাবো।" এমন কোন দিন নাই যে, তাঁর জন্য কোন কিতাব নিয়ে গেছি আর তিনি বলেননি যে, "এগুলো কতো টাকা দিয়ে কিনেছো"। বলেই তিনি টাকা বের করে দিয়ে দিতে চাইতেন। একদিন মিশকাত শরীফ ও আরো কিছু কিতাব কিনে নিয়ে গেছি। বললাম, "হুজুর, এগুলো হাদিয়া"। তিনি বললেন, "টাকা পয়সা কামাও তারপর হাদিয়া দিও। এখন টাকা নাও"। বললাম, "না দিলে খুশি হবো"। তিনি বললেন, "আমি দিলে খুশি হবো আর তুমি না দিলে খুশি হবে। এখন বলো, কার খুশি থাকবে"? অগত্যা টাকা নিতে হলো।

আমার মিশরে যাওয়ার পিছনে তাঁর অনেক দোয়া, দিকনির্দেশনা ও উৎসাহ ছিলো। প্রথম যখন মিশর যাই তখন অনেক নসিহত ও দোয়া করে দিলেন। বললেন, "দালাইলুল খাইরাত সাথে নাও তাহলে আমার কথা মনে পড়বে"। কাছে নিয়ে দোয়া করে বললেন اللهم يا خفي اللطف أدركه من لطفك الخفي, এরপর বললেন, "যাও, আল্লাহর হাতে আমানত রাখলাম"। প্রথম যখন তাঁর বুকের নিচ অংশ অবশ হয়ে গেল তখন আমি

কয়দিনের জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিলাম। মাসউদ ভাইয়ের কাছ থেকে শুনে তড়িঘড়ি করে আমাকে ভিডিও কল দিয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন, "তোমাকে আমার সন্তানের মতো মনে করে বলছি, একটু ইমাম বুসিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ওখানে যাও। গিয়ে তাঁর পাশে বসে বুরদা শরীফ পড়ে আমার জন্য দোয়া করো। আমার বিশ্বাস, তুমি ওখানে থাকতে থাকতে আমি ভালো হয়ে যাবো। আমি রুকু সিজদা করতে পারি না। আমার তো মনে হয়, আল্লাহ তায়ালাই তোমাকে আমার জন্যই ওখানে পাঠিয়েছেন"। এরপর যখনই তার কথা মনে পড়েছে এবং সুযোগ পেয়েছি ইমাম বুসিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজারে যিয়ারতে গেছি এবং মন ভরে দোয়া করেছি। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা- তিনি আর সুস্থ হয়ে উঠলেন না। এর কিছুদিন পরে আমি দেশে আসলাম। ইকামা শেষ হয়ে যাওয়াতে নতুন ভিসা পেতে বেশ জটিলতায় পড়ে গেলাম। তখন তিনি আমার থেকেও বেশি পেরেশান হয়ে পড়লেন। প্রতিনিয়ত খবর নিতেন ভিসা পেলাম কিনা। অবশেষে জানুয়ারির ১০ তারিখে ভিসা পেলাম, ১৫ তারিখে পরীক্ষা আর ১৩ তারিখে ফ্লাইট। যাওয়ার আগে সাক্ষাৎ করতে আসলাম। আমি জানতাম, এই হচ্ছে আমাদের ইহজগতের শেষ দেখা। তিনিও জানতেন। তবে তাঁর মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখলাম না। শুধু বললেন, "আরেকটু কাছে এসে বসো"। আমার বুকে হাত রেখে দোয়া করলেন এবং বললেন, "আল্লাহর হাওলা"। কোনমতে টলোমলোভাবে বের হয়ে পূবের ঘরে এসে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। মনে হল বুকের খাঁচা ভেঙ্গে যাচ্ছে। ক্ষণিক পরে যখন আমি সামনের দিকে হাঁটছিলাম তখন মনে হলো, আমি আমার পৃথিবীকে পিছনে রেখে দিকভ্রান্তের মতো এলোপাথাড়িভাবে হাঁটছি।

দিন দিন তাঁর শরীর আরো খারাপ হচ্ছিলো। প্রতিনিয়ত খবর পাচ্ছিলাম। ৭ ফেব্রুয়ারি কায়রোর সকালে চলে গেলাম সাইয়েদা নাফিসা রা. এর যিয়ারতে। মন ভরে দোয়া করলাম। বের হয়েছি মাত্র, তখনই হুজুরের ভাতিজা প্রিয় মাহফুজের ফোন। এরপর সেই সংবাদ, যা অবশ্যম্ভাবি অথচ আমরা তা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালাই চূড়ান্ত। আমাদেরকে তা মানতেই হবে। কেননা, আমরা তাঁরই জন্য এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী।

তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু রেখে গেছেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের বাস্তব নমুনা। আল্লাহ তাঁকে, তাঁর বাবা-মা, পিতৃপুরুষ, আসাতিযা, মাশায়েখ ও বংশধরদের মাফ করে দিন। আমাদেরকে তাঁর রূহানি সন্তান হিসেবে কবুল করুন এবং তাঁর দেখানো পথে অটল থাকার তৌফিক দিন। আমিন।

লেখক: শিক্ষার্থী, ইসলামী ধর্মতত্ত্ব অনুষদ (আকিদা ফালসাফা), আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর।

Shaykh-ul-Hadith Allama Habibur Rahman (R.): An Eminent Hadith Scholar's Departure

Hafiz Wahi Ahmad Chowdhury

Late Shaykh-ul-Hadith Allama Muhammad Habibur Rahman (May Allah Bless him) known as "Muhaddith Saheb Huzur" was one of the greatest Hadith scholars of recent times. He had devoted his life to studying Hadith and its sciences. He had parallel expertise in Tafsir (Quranic exegesis) and Islamic history as well. He spent his entire life seeking knowledge, teaching and preaching of Islam. He served as a 'Judge' in the United Arab Emirate. He was a very reliable and well- recognized person to all sectarian people in society. His fame even spread out to the Arabian Hadith scholars and Ulamas from other parts of the world.

Shaykh-ul-Hadith Allama Habibur Rahman was born in 1934 at Rarai village in Zakiganj Upazila of Sylhet district, Bangladesh. His father was the late Maulana Mumtaz Ali (Rahmatullahi Alaihi) and his mother was the late Amina Khatun. He was the third among his seven brothers and a sister. All of his brothers were highly Islamic educated and served in different madrasas.

At his young age he was admitted to the local primary school. After studying for some time in the local primary school, he was admitted to Badarpur Senior Madrasa in present-day India. He studied in Isapur Hafizia Madrasa for a while, but his health condition did not favor him to continue his Hifzul-Quran study there. Then he was admitted to the Shoroker Bazar Ahmadiya Madrasa under the supervision of his elder brother late Maulana Najibur Rahman (Rahimahullah). He studied up to the secondary level in this madrasa. When he was a student at the Shoroker Bayar Ahmadiya Madrasa, with the encouragement of his teachers, he participated in the district-based primary scholarship examination from the neighborhood primary school and got the scholarship by securing the second position in the merit list.

Thereafter, he was admitted to Gachbari Jamiul Ulum Kamil Madrasa, one of the oldest and very famous Islamic Institutions of Sylhet, Bangladesh. In 1955, he passed the Alim examination under the East Pakistan Madrasah Education Board, securing the 12th position in the combined merit list. From the same madrasa, in 1957, he passed the Fayil examination by securing the third position in the combined merit list of the Madrasa Board. In 1959, in the Kamil examination of the Hadith department, he secured the 12th position in the Madrasa Education board's combined merit list. It is to be noted that he is the first student in the history of Gachbari Aliya Madrasa to get a place in the board's merit list.

On August 3,1959, he joined Ichamati Darul Uloom Senior Madrasa as a lecturer. On April 10, 1963, he joined as a lecturer at Fulbari Aziriya Fayil Madrasa, the oldest Islamic educational Institution in Sylhet. On 23 November, 1963, on the instructions of his peer and murshid Hayrat Fultali Shaheb Qibla (Rahmatullahi Alaihi), he joined Shatpur Darul Hadith Kamil Madrasah as the head of Hadith Department (Chief Muhaddis). He taught there till January 14, 1974. On January 15, he returned to Isamati Darul Uloom Kamil Madrasa and took the post of principal there. In the meantime, there was a serious problem with the principal of Shatpur Darul Hadith Madrasa. On October 11, 1976, at the request of the district administration and local dignitaries, he re- joined Shatpur Darul Hadith Madrasa as the principal. As a result of his sincere efforts, the stability of the madrasa was restored in a short time and then he intended to go to the United Arab Emirate. So, he left the madrasa on April 2,1977.

In the same year, a few days after leaving Shatpur Darul Hadith Madrasa, he went to the United Arab Emirates. Over there, at first, he served as an Imam and Khatib in a mosque in the city of Umm Al Quwain. In a short span of time, he participated in competitive examinations and successfully passed and joined the judiciary division of that country. He served as a judge at the Umm Al Quwain District Court until his return to the country in 1981. He also performed the duties of khatib in the aforementioned mosque. It is to be noted that during his career in the U.A.E., he used to give free education to desert Bedouins on public holidays. In particular, the elderly Bedouins were taught to recite the holy Quran correctly.

On September 14,1982, he again joined the Ichamati Kamil Madrasa as the principal. After performing his duties with great reputation and efficiency, he retired systematically on December 31,1999. As a result of his sincere efforts and perseverance, the Ichamati Kamil Madrasa became one of the best Islamic education centers in East Sylhet. With his single effort, the infrastructural development of the madrasa was carried out. His contribution in securing government grants and recognition of Alim, Fayil and Kamil classes is undeniable. The madrasa building and the huge mosque stand witness to his silent pursuits.

He was a disciple of Shamsul Ulama Allama Abdul Latif Chowdhury Fultali (R.A.)'. He also studied Hadith and “Qirat” under his spiritual guide (murshid), one of the greatest sages of the century, Raisul Qurra wal Mufassireen, Ustad-Ul-Ulama Wa- Muhaditheen, Murshid e Barhaq, Mujaddide Zaman, Qutbe ‘Alam, Shamsul Ulama, Allama Muhammad Abdul Latif Choudhury (Saheb Qibla Fultali) (May Allah illuminate his grave). His Ijaya goes through the great Imam Allama Anwar Shah Kashmiri (RA). Allama Muhaddis Saheb (R.) was also one of the senior spiritual Khulafa of Saheb Qibla Fultali (RA). He was ordered by him to teach Sahih al-Bukhari at the age of 28.

He was the teacher of thousands of Ulama, Imams, teachers. Despite this he had himself studied under some of the leading scholars of his time, among them: Shaykh-ul-Hadith Maulana Shafeeq-ul-Haq Bulbul Sab, Shaykh-ul-Hadith Muhammad Abdul Ghani, Maulana Idrees Ahmad Shibnagari, Shaykh-ul-Hadith Maulana Abdul Wahid, Sayyid Mufti Amimul Ihsan Mujaddidi Barkati, Shaykh Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Makki, Bahr-ul-Uloom Maulana Muhammad Hussain Sylheti, Maulana Muhammad Sa'eed al-Jarabuwi and Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri (Riwayatul akaabir anil Asaaghir). All the Asaanids he received from them, with the exception of Shaykh Muhammad ibn Alawi (RA), go through the great Imam of Hind, Shah Waliullah of Delhi (RA). He has also given Ijaya to the likes of Sayyid Yusuf Hasim Refai (the leader of the Shadhili tariqa of this time).

In 2005, he met Shaykh As'ad as-Saghirjee of Damascus, the author of Fiqh al-Hanafi wa- Adillatuhu, in London and took Ijaya from him. In 2008, Shaykh-ul-Hadith Saheb visited Syria where he met many of the Ulama of Shaam. He was invited by Saghirjee Saheb for dinner, when Saghirjee Saheb urged to grant him Ijaya. Shaykh-ul-Hadith Saheb humbly refused, but Shaykh Saghirjee insisted telling him he will not return his shoes if he does not give him Ijaya.

He also traveled to different countries of the world for religious purposes. Remarkably, he visited the United States of America, England, Egypt, Syria, Pakistan, India and the other parts of the world. In those travels, he met with the prominent Islamic Scholars of his time and had academic conversations about hadith literature and thereafter either he got Ijaya from them or other scholars got the Ijaya of hadith from him. Furthermore, he had performed hajj, umrah, and Ziyarat Al- Madinatul- Munawwarah many times. In his retirement life, he stayed in England for a long time. During this time, he used to give lessons on “Jame Tirmizi " & “Riyadus-Salihin” in different madrasah and masajid.

In addition to teaching and da'wah activities, he once actively participated in politics. In the pre-independence period, he was a notable leader of the Neyam-e-Islam Party in Sylhet. In the National Assembly elections held in December 1970, on the nomination of Neyam-e-Islam, he contested for the post of MNA in the then Sylhet-7 constituency (Zakiganj, Bianibayar and Kanaighat) and got respectable votes. Later, he served as the President of Bangladesh Anjumane Al-Islah for a long time. In 1996, as a candidate nominated by Al-Islah and supported by the Shammilita Sangram Parishad, he contested the national election from Sylhet-5 (Zakiganj-Kanaighat) and got 3rd place with respectable votes.

On top of that, he was the founder and patron of many masjid, madrasa, orphanage, organizations and library. He was the long time president of Bangladesh Anjumane Madaris -e Arabia, Executive member of Bangladesh

Madrasa Education Board. His remarkable work of his life was founding of "Habibiya Library " in his home village. In this library, there was a collection of a couple of thousands books in various languages on various topics. He himself was a live library. Also, in his collection there were some rare old books. Therefore, In his lifetime, Ulamas across the country used to come to him to get references from Islamic books about various controversial subject matters.

Beside all the above mentioned of his qualities he was also a good author. He was the editor of monthly "Shahjalal". The magayine was very popular in the 90's in the Sylhet division. So far, dozens of articles and 18 of his written books have been published. Some of among them are notable:

1. Al-Qawlul-Maqbool fi Miladir-Rasul (sallallahu alaihi wa sallam)
2. As`hab al-Badr
3. Wayifa of Durood Shareef
4. Fada'il of Durud Shareef
5. Du'a Masnoona
6. Mas'alah of Ushr
7. Muntakhab-us- Sunani Wal - Asaar, etc.

After his retirement, he served as the chief patron of Ichamati Kamil Madrasa and president of the governing body. For more than half a century, this great man, who had been engaged in the service of Ilm-e-Hadith, had been presenting sermons/lectures in various Islamic meetings at home country and abroad in order to spread the teachings of Quran-Hadith to the mass people.

The last few years of life, he started giving lessons on Hadith from his own established "Habibiya Jame Masjid" near his home. Dozens of students used to join in the weekly Hadith class. The lesson was also used to broadcast through social media. As a result, hundreds of adult students used to join in his hadith lessons from all over the world. During the pandemic in 2020, he got stuck in London for a few months. At that time, he gave lessons on Sahih Al-Bukhari on and off line. Dozens of students used to listen to his Hadith lessons from Middle East, England and America everyday. In the last days of his life ulama and students from different parts of the country came in groups to his residence to get "Izajah" of hadith -e Musalsal.

After serving the ummah and performing a huge activity for shake of religion over half a Century Sheikh Ul Hadith Allama Habibur Rahman breathed his last at his home in Rarai village of Zakiganj at 6:00 pm on Monday, February 07, 2022. He was 86 years old at the time of his death. After his death the nation lost such a great Hadith scholar who was not only a scholar or preacher. He was an

arbitrator among different Islamic sectarian groups. He was respected, well recognized and considered as a patron for all Islamic groups in his home district of Sylhet. His preaching method was to present differences in a very respectful manner and with authentic evidence so that people who have different opinions, they never get hurt. In personal life he was so humble and used to live a very ordinary life. This kind of quality among Islamic preachers is very rare now. Therefore, he gained popularity and a wide –range of reputation from the multi-sectarian community. May Allah Bless him and make his grave illuminated. (Amin)

Shaykh al-Hadith Allamah Habibur Rahman – A Servant of Hadith

Maulana Maruf Ahmed

The bearers of knowledge, according to an authentic hadith, are the inheritors of the Prophets. The scholars of Hadith, as custodians of the words of the Prophet صلى الله عليه وسلم, are also the inheritors of the Sahabah, for through their meticulous work, they transmit the sacred sayings of the Prophet صلى الله عليه وسلم to the broader masses. It is with profound wisdom and admiration that Imam al-Shafi'i (rahimahullah) remarked, "When I see a person of hadith, it is as though I am looking at one of the Sahabah!"

Shaykh al-Hadith Allamah Habibur Rahman was not simply a person of Hadith, he was a devoted servant of this noble science. While Bangladesh boasted numerous scholars of hadith, the title 'Muhaddis Saheb, ' by which he was affectionately known, became synonymous with his esteemed persona.

He graced this world in 1934 in the tranquil village of Rarai, nestled in the embrace of Zakigonj, Sylhet, Bangladesh. He hailed from a family steeped in Islamic scholarship, with his father, the late Maulana Mumtaz Ali (rahimahullah), renowned in his own right.

His educational journey started in a humble local primary school, but his thirst for knowledge soon led him to his brother Maulana Nojibur Rahman (rahimahullah), prompting a transfer to the prestigious Badarpur Senior Madrasah in India. Further steps in his educational voyage brought him to the Ahmadiah Madrasah in Shorokher Bazar, Kanaighat, Sylhet.

During his tenure at Ahmadiah Madrasah, his teachers recognised his exceptional abilities. His educational journey continued, eventually leading him to the venerable Gasbari Jamiul Ulum Madrasah in Sylhet, one of the oldest Islamic institutions in the region.

In 1955, he achieved distinction by passing his Alim Examinations with flying colours, securing the 12th place in the Merit List of the East Pakistan Madrasah Examinations Board. His dedication and brilliance continued to shine, as he accomplished his Fazil Examinations in 1957, clinching the 3rd position on the Merit List. His journey culminated in 1959 when he earned his Kamil Examinations in the Hadith specialisation, once again securing the 12th place in the Merit List. His achievement marked a milestone as he became the first student from Gasbari Jamiul Ulum Madrasah to receive such honours.

His professional life began on August 3, 1959, at Isamati Darul Ulum Senior Madrasah. Later, on April 10, 1963, he joined Fulbari Aziriyah Madrasah, the oldest Islamic institution in Sylhet. A pivotal moment in his career arrived on

November 23, 1963, when, upon the guidance of his Murshid, Hadrat Allamah Abdul Latif Chowdhury Saheb Qibla Fultali (rahimahullah), he assumed the role of Shaykh al-Hadith at Shatpur Darul Hadith Madrasah. He dedicated over a decade to teaching Hadith until January 14, 1974.

In 1977, he embarked on a journey to the United Arab Emirates (UAE), where he initially served as an Imam and Khateeb in Umm Al Quwain. Subsequently, he joined the judicial services of the UAE, serving as a Justice in the Umm Al Quwain Court until his return to Bangladesh in 1981. During this time, he continued to selflessly teach Qur'an recitation to the villagers, especially the elders, without any remuneration.

The year 1982 marked his return to Bangladesh, where he assumed the role of Principal at Isamati Darul Ulum Madrasah. He served with unwavering dedication until his well-deserved retirement on December 31, 1999. Under his guidance, Isamati Darul Ulum Madrasah underwent significant transformations, both in infrastructure and accreditation for Alim, Fazil, and Kamil programs. His contributions remain a testament to his devotion and determination to elevate this noble institution.

Even after retirement, he continued to be a guiding light, serving as the chief patron and Chairman of the Governing Board for Isamati Darul Ulum Madrasah. For more than half a century, he poured his heart and soul into teaching and propagating the Qur'an and Sunnah, traveling far and wide to spread the message and teachings of Islam.

His international travels for Dawah were numerous and impactful:

United Kingdom: His journey to the United Kingdom in 1981 marked the beginning of a series of visits in response to his Murshid's guidance. He travelled extensively across the UK, followed by a pilgrimage to Hajj with his Murshid, before returning to his duties in the UAE. In 2009, he embarked on his lengthiest stay in the UK, spanning nearly nine months, upon the request of his numerous students. During this extended visit, he diligently taught the renowned Hadith collection 'Shama'il al-Tirmidhi' at Darul Hadis Latifiah in London. Over 200 ulama received the Sanad (chain of transmission) of Shama'il al-Tirmidhi upon its completion. Additionally, he imparted his knowledge and wisdom by teaching Riyad-As-Saliheen and Al-Adab Al Mufrad in various towns.

USA: In 1995, at the invitation of his devoted students, he travelled to the United States of America. There, he tirelessly propagated Islamic teachings, inspiring the Muslim community to establish mosques and madrasahs across various states and cities.

Syria: His visit to Syria in 2008 was marked by meetings with the Ulama of

Damascus and engaging discussions. During this visit, renowned Hanafi jurist Shaykh Dr. As'ad Muhammad Sayyid Sagharji (rahimahullah) requested him to grant ijazah of Hadith. The scholarly gathering was graced by prominent Ulama of Damascus, including Shaykh Dr. Ajjaj Al Khateeb, Shaykh Hisham Buhani, and Shaykh Abdur Rahman Hammami, who participated in enlightening discussions on Islamic scholarship. Shaykh Hammami accompanied him on visits to numerous historic places in and around Damascus.

Morocco: In April 2010, he journeyed to Morocco, where he made ziyarah of the graves of notable luminaries such as Imam Jazuli (rahimahullah), Imam Qadi Iyad (rahimahullah), and Imam Suhaili (rahimahullah) in Marrakesh, aptly known as the 'Madinatul Awlia' - The City of the Saints.

India: He made multiple trips to the Assam Province of India, where he attended various programs and propagated the message of Islam. He also delivered enlightening Hadith sessions for Ulama.

Egypt: In October 2018, he travelled to Egypt, visiting the graves of the esteemed Companion of the Prophet صلى الله عليه وسلم, Uqba Ibn Amir (radiyallahu anhu), and the renowned scholar Imam Ibn Hajar Asqalani (rahimahullah). During this visit, he also had the privilege of delivering lessons on Hadith at the famed Al-Azhar Mosque.

Through the illumination of his teachings and the footprint of his travels, the unwavering commitment of Shaykh al-Hadith Allamah Habibur Rahman to the sacred science of Hadith shines brightly.

With heavy hearts, the world mouredn the passing of Muhaddis Saheb on the 7th of February 2022. His departure has left behind a profound void in the hearts of thousands of students who were fortunate to be guided by his wisdom and grace. In his absence, they stand as if orphans, yearning for the guiding light of his knowledge and the warmth of his mentorship.

Learning from the teachings of a Hadith master

Maulana Foysal Ahmed

My journey alongside Muhaddis Saab Huzur (Habibur Rahman Saheb) Rahmatullahi Aliyhe began when I was a 14-year-old student at the Darul Qirat Majidiah in Canon Street. From the very first moment, it was evident that he possessed an unwavering love for the Sunnah of the beloved Prophet, as he walked and conducted every action according to the sunnah.

On a particular day, Muhaddis Saab Huzur was delivering a dars on Sahih Bukhari, and it was during this session that a profound connection was established. His mastery of hadith and the ability to explain them with utmost clarity left me in awe. I felt compelled to approach him, and he graciously made dua (supplication) for me, a moment that remains etched in my memory.

The true depths of my relationship with Muhaddis Saab Huzur Rahmatullahi Aliyhe were unveiled when I reached the age of 22. My teacher, Hafiz Abdul Shahid, the Imam at Poplar Central Mosque, was compelled to travel to Bangladesh and entrusted me with the responsibility of serving as the temporary imam at the mosque. He also instructed me to pick up Muhaddis Saab Huzur Rahmatullahi Aliyhe for Jummah prayers, recognizing the immense value of his knowledge and Suhbah. It was during this period that I developed an exceptionally close bond with Muhaddis Saab Huzur Rahmatullahi Aliyhe, cherishing every moment spent with him.

I remember a visit to his home when I assisted him in preparing for an event. I had the privilege of helping him with his coat, but in the process, I began from the left side. With a gentle correction, Muhaddis Saab Huzur Rahmatullahi Aliyhe redirected me to start from the right, emphasizing his meticulous adherence to even the smallest Sunnah practices.

As time passed, a unique bond evolved between us, leading me to visit him weekly whenever he was in London. The simple words, "Foysal afne aysoni" (Foysal, are you here?), spoken by Muhaddis Saab Huzur Rahmatullahi Aliyhe upon my arrival, never failed to evoke a sense of humility and gratitude. Even as a sinner, I was recognized by this great Muhaddis.

In 2008, I had the extraordinary privilege of accompanying Huzur on a journey to Manchester, where he was imparting knowledge on Minhajus Sawi. This experience was a profound source of learning. I distinctly recall a breakfast where Muhaddis Saab Huzur Rahmatullahi Aliyhe advised me to open a packet of biscuits, and, in my haste, I omitted to recite "bismillah" before doing so. His meticulous attention to the Sunnah was highlighted once again. His emphasis on starting every action with "bismillah" left a lasting lesson, and I resolved never

to overlook this practice again.

Alhamdulillah, I had the honor of studying hadith under the guidance of Muhaddis Saab Huzur, delving into subjects such as Shamail Muhammadiyyah, and Bukhari and many other books.

His dars on Ashamail Muhammadiyyah were nothing short of amazing. Each hadith he elucidated brought tears to our eyes, as it felt as if the Prophet himself stood before us. On one occasion, I vividly remember picking up Muhaddis Saab Huzur Rahmatullahi Aliyhe who confessed to not feeling well that day. In truth, he had a fever the night before, yet he insisted on coming because he desired his last words in this world to be "Qala Rasullullah SAW." This profound love for the Prophet was palpable in every word he spoke.

As years passed, I embarked on a journey to study abroad in Egypt, and my visits to Muhaddis Saab Huzur Rahmatullahi Aliyhe became less frequent. However, upon my return, my first act was to visit him. He inquired about my journey and, in his characteristic manner, asked about the books I had brought. Muhaddis Saab Huzur Rahmatullahi Aliyhe had a profound love for reading, and he always encouraged me to read as well.

I distinctly recall presenting him with a book, "Al Baahir" by Imam Suyuti Rahmatullahi Aliyhe. I handed him the book and left the room briefly to attend to something. When I returned, I found Muhaddis Saab Huzur Rahmatullahi Aliyhe with the book on his bed, deep in contemplation. He informed me of a hadith mentioned in the book, clarifying its authenticity. He noted that while it may be slightly weak, it was acceptable to act upon for the blessings it carried. He then shared the in hadith, the Prophet Sallahu aalihye wa sallam saw the souls of his ummah. At that moment, Muhaddis Saab Huzur Rahmatullahi Aliyhe mentioned that the Prophet had possibly seen him, and tears welled up in his eyes. His profound love for the Prophet was beyond compare.

Muhaddis Saab Huzur Rahmatullahi Aliyhe held a special place in my life, and as I pen these words, the ache of not being able to see him or partake in his suhbah is deeply felt. I beseech Allah SWT to elevate his status and grant us the opportunity to reunite with him in the Hereafter. His unwavering faith and commitment to the Sunnah continue to inspire me, a legacy that will forever endure.

Writer: Student of the late Muhaddis Saab Huzur (may Allah have mercy upon him), serves as a lecturer at Darul Hadith Latifiah, London

যাকে কখনো ভুলা যাবে না

মাওলানা শিহাব উদ্দিন আহমদ

সমকালীন বিশ্বে যারা এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মোহ লোভ লালসা ত্যাগ করে ও দুনিয়াবী সকল স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে হাদীসে নববীর একনিষ্ঠ চর্চা ও খেদমত করে এক বিরল ব্যক্তিত্ব রূপে সর্ব মহলে সমাদৃত, শ্রদ্ধায় স্মরণীয়, হৃদয় গভীরে বরণীয় হয়ে আছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম এক মহান ব্যক্তিত্ব হলেন, ঐতিহ্যবাহী সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপাল ও প্রধান মুহাদ্দিস, ইছামতি কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল (অব.) উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন, ওয়ালমুফাসসিরীন, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা হবিবুর রহমান (মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর (র.)। তিনি উলামা-মাশায়েখ ও সর্বসাধারণের কাছে 'মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর' নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদালাপি, বিনয়ী, অমায়িক ও নিরহংকার। তাঁর কর্মমূখর বর্ণাঢ্য জীবন ছিল বহু মাত্রিক ও সৃজনশীল। সমকালীন সমাজ ও জাতীয় জীবনে তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যতিক্রমধর্মী বিস্ময়কর প্রতিভা যিনি ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, সাহিত্য সমাজ চিন্তা নৈতিকতাবোধ জীবন ঐতিহ্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও ইসলামী জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে ছিলেন এক পরিপূর্ণ মহীরূহ ও অনুপম জীবনাদর্শের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর (র.) হাজারো হাজারো মুহাদ্দিস আলিম উলামা মুরিদান ভক্ত অনুরক্তদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে মাওলায়ে হাকীকীর সান্নিধ্য চলে গেছেন। কিন্তু আজও মনশ্চক্ষে বার বার ভেসে উঠছে সেই পাগড়ি পরিহিত সৌম্য দর্শন হাস্যোজ্জল অবয়বখানা। কিছুতেই যেন ভুলতে পারছিনা, ভুলে থাকা যায় না।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সুযোগ্য ছাহেবজাদা লন্ডনস্থ' দারুল হাদীস লতিফিয়ার সিনিয়র টিচার, কবি মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল সাহেব জানালেন হুজুরকে নিয়ে একটি স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাই হুজুরের ফয়েজ লাভের উদ্দেশ্য যৎ সামান্য লেখার প্রয়াস। প্রজাপতির পাখার ন্যায় বর্ণাঢ্য এই কর্মচঞ্চল বেগবান মহান জীবনের বিশদ বর্ণনা প্রদান আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। তিনির সাথে ছিল আমাদের পারিবারিকভাবে সুনিবিড় সম্পর্ক। আর এই মহান ওলীর সাথে আমাদের সুসম্পর্কের সূত্রপাত হয়, ভূরকী হাবিবিয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওয়ালিদ মুহতারাম আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ আব্দুল মতিন (র.) এর মাধ্যমে।

আত্বার পরিশুদ্ধি ও আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভে ইলমে তাসাওউফের অতীব দরকার।

আর তা অর্জন করতে হলে কামিল মুর্শিদের প্রয়োজন। তাই আমার ওয়ালিদ মুহতারাম সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসায় অধ্যয়ন কালেই মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর (র.) এর দস্ত মুবারকে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে তিনি ছিলেন উক্ত মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস পদে অধ্যাপনারত। আমার ওয়ালিদ মুহতারাম ১৯৭৬ সালে কামিল পরীক্ষা পাশ করার পর একটি হিফযুল কুরআন মাদরাসা প্রতিষ্ঠার চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনা করেন। তাঁর এ অনুভূতি ও হৃদয়ে লালিত সকল আকুতির কথা ব্যক্ত করতে একদিন হাজির হন, স্বীয় পীর ও মুর্শিদ মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর (র.) এর খেদমতে। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কথা বিস্তারিত বর্ণনা করে ইজাজত ও দোয়া প্রার্থনা করলে হুজুর আনন্দ চিত্তে ইজাজত দিয়ে বিশেষ দোয়া করেন। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে ভূরকী বাজারের উত্তর-পূর্বকাণে আমাদের নিজস্ব জায়গায় হুজুরের ভিত্তিপ্রস্তরের মাধ্যমে একটি কাঁচা টিনসেড মাদরাসা ঘর তৈরী করা হয়। আমার ওয়ালিদ মুহতারাম স্বীয় মুর্শিদের মুবারক নামের অংশ বিশেষ সংযুক্ত করে 'ভূরকী হাবিবিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা' নামকরণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে হিফযুল কুরআন মাদরাসা আরম্ভ করেন। মহান রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানী ও হুজুরের খাছ দোয়ার কল্যাণে মাদরাসার সুনাম অতি অল্প সময়ে দেশের প্রত্যন্ত অ লে ছড়িয়ে পড়ে। এবং পর্যায়ক্রমে মাদরাসাটি দাখিল পর্যন্ত এমপিও ভুক্ত হয় ও অবকাঠামোর দিক দিয়ে অনেক উন্নত হয়। আজকে এই মাদরাসাটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ আকিদা ও ইলমে দ্বীনের সূতিকাগার হিসেবে মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে। আমার জানামতে হুজুরের অনুমতি ও দোয়া ব্যতিরেকে মাদরাসায় একটি ইটও লাগেনি। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সুবাদে বার্ষিক মাহফিলসহ মাদরাসা কেন্দ্রিক অন্যান্য অনুষ্ঠানে বছরে একাধিকবার তাশরীফ আনতেন। তা অব্যাহত ছিল তিনির ইন্তেকাল পর্যন্ত। আর এ জন্যই জন্মলগ্ন থেকে তাঁর সান্নিধ্যের পরশে ধন্য হয়েছি এবং পরম স্নেহ মমতায় বেড়ে উঠেছি। সবচেয়ে বেশি তিনির সন্নিধ্য ও মমতা পেয়েছেন আমার মরহুম বড় ভাই আলহাজ্ব হাফিজ ক্বারী বদর উদ্দিন আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) যিনি হঠাৎ করেই ২০০৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, রোজ শুক্রবার ইন্তেকাল করেন। হুজুর তখন বিদেশ সফরে ছিলেন। দেশে এসেই কবর জিয়ারতে আসেন, অনেক শোকাহত ও মর্মাহত হন। তাঁর সম্পর্কে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন ও বর্ণনা করেন। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর হুজুর কয়েক বছর (দুবাই) প্রবাসে ছিলেন। সেখান থেকেও প্রতিনিয়ত পত্রের মাধ্যমে মাদরাসার খোঁজ খবর নিতেন ও আমার ওয়ালিদ মুহতারামও পত্রের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ছিলেন একেই সাথে আমাদের মাদরাসা ও পরিবারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক। আমাদের জন্য মূল্যবান সময় দিতে ও দোয়া করতে কোন দিনই কার্পণ্য করেননি। আমরা হুজুরের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে চির আবদ্ধ।

আমি প্রবাসে (আমেরিকা) আসার আগে একদিন আমরা পরিবারের সবাই মিলে হুজুরের

নিজ বাড়িতে যাই। তিনি আমাদের উত্তম মেহমানদারী করেন। খোশ গল্পের এক পর্যায়ে আমি স্থায়ীভাবে প্রবাসে যাওয়ার সব কিছু রেডি বলে হুজুরকে অবগত করি। এ খবর আগে থেকেই জানতেন। কারণ আমাদের পারিবারিক যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হুজুরের অনুমতি ও দোয়া নেওয়া এক প্রকার বাধ্যবাধকতা ছিল। হুজুর জবাব দিলেন আমারতো ইচ্ছা ছিল তুমি দেশে থাকার, কারণ তোমার অনেক প্রয়োজন আছে। যাই হোক তোমার এ সফর যদি মাদরাসার জন্য কল্যাণকর হয় তবে আমার ইজাজত ও দোয়া থাকবে। আমি প্রবাসে আসার পর প্রায়ই ফোনে কথা হতো। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ, দোয়া নিতাম ও দেশে আসলে সাক্ষাৎ করতাম। আমি প্রবাসে আসার কিছু দিন পরই আমার ওয়ালিদ মুহতারাম প্রবাসে (আমেরিকা) চলে আসেন। এখান থেকেই সর্বদা মাদরাসার খোঁজ খবর রাখতেন ও পরিচালনা করতেন। বার্ষিক মাহফিলের সময় হুজুরের সাথে তারিখ সাব্যস্থ করে দেশে এসে মাহফিল শেষ করে আবার চলে আসতেন। বরাবরের মতই ২০১৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তিনির সাথে তারিখ নির্ধারণ করেন, মাহফিলের কয়েক দিন পূর্বে আমার ওয়ালিদ মুহতারাম দেশে এসে মাহফিল বাস্তবায়নে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। যথারীতি মাহফিলের দিন মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর তাশরীফ আনেন। অতীতে অন্যান্য মাহফিলের দিন আমার ওয়ালিদ মুহতারাম মেহমানদারীতে খুবই কর্মচ ল থাকতেন। কিন্ত এদিন অত্যন্ত শান্তশিষ্ট মনে নিরবে নিভৃত্বে আগত মেহমানদের মেহমানদারী করেন। বাদ এশা হুজুর মাহফিলে বয়ান পেশ করেন। বয়ানের পর মাদরাসার বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর তাঁর প্রাণ প্রিয় মুর্শিদের খেদমতে তাওবা করার আবদার করলে হুজুর উপস্থিত সবাইকে তাওবা করান। রাত ১২টার পর তিনি অসুস্থতাবোধ করলে মাদরাসা সংলগ্ন বাড়িতে চলে আসেন। সারা রাতই অসুস্থ ছিলেন। পরদিন ভোরে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরকে বিদায় দিতে এসে বলেন, হুজুর আমার বুকে ব্যথা করছে, হুজুর গাড়িতে বসে বুকে হাত দিয়ে ফু দেন ও দোয়া করেন। এর কিছুক্ষণ পরই প্রায় ৯টার দিকে আমার ওয়ালিদ মুহতারাম ইন্তেকাল করেন। এ সংবাদ পেয়ে হুজুর আবার বিকালে চলে আসেন ভুরকীতে। উপস্থিত হলেন আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী, মাওলানা আহমদ হাসানচৌধুরী ও হাফিজ মাওলানা মারজান আহমদ চৌধুরী ফুলতলীসহ মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র, হুফফাজুল কুরআনসহ অসংখ্য উলামা মাশায়েখ। আগের দিন বাদ এশা প্রিয় মুর্শিদের হাতে তাওবা ও পরের দিন বাদ এশা প্রিয় মুর্শিদের ইমামতিতে জানাযা নামাজের মাধ্যমে সমাপ্ত হলো এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সফর। আমার ওয়ালিদ মুহতারামের তাঁর প্রিয় মুর্শিদের প্রতি যে, কি পরিমাণ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল তা কোন ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রিয় মুর্শিদের সান্নিধ্যে লাভে জীবনের শেষ পরিসমাপ্তি হলো এটাই আমাদের জন্য পরম শান্তি ও সৌভাগ্যের বলে মনে করি।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর এক দিকে যেমন ছিলেন, খানেকায়, মাঠে-ময়দানে,

একজন মিষ্টভাষী সু-প্রিয় জননন্দিত ওয়াইজ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ আকিদা ভিত্তিক দলিল ও তথ্যবহুল আলোচনায় অনেক কঠিন ও এখতেলাফী বিষয় এমন

প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করতেন যে কোন মানুষের বোধগম্য হতো খুব সহজেই। বেশির ভাগ সময় থাকতো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান মান ও আজমতের গুরুত্ব, ছোট ছোট মাছনুন দোয়া ও দরুদ শরীফের ফজিলত সমম্পর্কে। মসলকের দিক দিয়ে বিরোধী আলিমগণও তাঁর বয়ান শুনতো তন্ময় হয়ে। অপরদিকে তিনি ছিলেন রাজপথে একজন আপোসহীন ব্যক্তিত্ব ও দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী।

তাঁর জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে হাদীসে নববীর খেদমতের নির্ভেজাল নিদর্শন। তাঁর বহুমুখী উত্তম গুলাবলীর অন্যতম ছিল একজন আদর্শ রাসুল প্রেমিক, রাসূলের প্রেমের ফল্গুধারায় সিক্ত ছিল তাঁর দেহমন। ১৯৬৩ সালে সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসায় এক অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান। আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.) স্মারক গ্রন্থে' প্রকাশিত তিনির লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে হুবহু তুলে ধরছি- গরমের দিন, দুপুরের খাবারের পর বাইরের ঘরে ছাহেব কিবলাহ আরাম করছেন। আমরা খেদমত করছি। এ সময় আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাকে জোর করে সৎপুর দিলাম। আসলে আমি বড় পেরেশানীতে পড়েছিলাম। কারণ সেখানে কামিল ক্লাস আমিই শুরু করিয়েছি। মুহতামিম ছাহেব ভাবুক মানুষ। তিনি কাউকে খোঁজ করবেন না। আমাকেই দিতে হবে মুহাদ্দিস। বড় পেরেশানির মধ্যে পড়ে গেলাম। কাকে দেব খুঁজে পাচ্ছি না। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। নিজে কামিল শুরু করিয়েছি; অথচ উস্তায যদি দিতে না পারি। এক দিন খুবই কাতর মনে বসে আছি। হঠাৎ করে আল্লাহপাক চোখের হিজাব সরিয়ে দিলেন। দেখি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ রেখেছেন। আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! স্বপ্ন দেখে বড় সাধ করে হাদীসের ক্লাস খুলেছি, পড়ানোর জন্য কাকে দেব খুঁজে পাচ্ছি না। এ সময় আঙুল মুবারক দিয়ে ইশারা করে দেখালেন। আমি পুরা ফিরব কেমনে, বেয়াদবী হবে। আস্তে করে চোখ ফিরিয়ে দেখি তুমি আমার পেছনে বসা। এ কারণেই তোমাকে এত জোর করলাম। তাৎক্ষনিক আমি কদম শরীফে ধরে আরয করলাম, আমি তখন বুঝিনি, যেতে দেরি করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। এভাবেই শুরু হলো হাদীস শরীফ পড়ানো।

আল্লামা মূফতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী (দা.বা.) মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, সাধারণ কোন মুহাদ্দিস নয়, মদীনাওয়ালার সনদ প্রাপ্ত মুহাদ্দিস। তিনি যে কত বড় মাপের মুহাদ্দিস ও বুযুর্গ ছিলেন তা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত। স্বদেশ তথা বহির্বিশ্বের বড় বড় উলামা মাশায়েখ তাঁর নিকট থেকে হাদীস

শরীফের সনদ গ্রহণ করেছেন। আমরা দেখেছি অন্তিম কালেও দেশের বড় বড় শহর ও প্রত্যন্ত অ ল থেকে উলামাগন দলে দলে এসে সনদ গ্রহণ করেছেন।

তিনি ছিলেন এক প্রথিতযষা জ্ঞান তাপস, সারাটা জীবন যেমন কিতাব মুতায়ালা করেছেন তেমনি অনেক কিতাবাদি সংগ্রহ করেছেন। বহু দুষ্প্রাপ্য কিতাবসহ প্রায় ১০হাজারের অধিক কিতাব সম্বলিত একটি গ্রন্থাগার নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এক খতমে বুখারী শরীফের মাহফিলে প্রসঙ্গত কারণে হুজুর বললেন, একটি দরুদ শরীফ পেয়েছেন যেটি রাতে ঘুমানোর সময় পাঠ করলে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লামের দীদার নসীব হয়। এই দরুদ শরীফটি যে কিতাবে রয়েছে তা সুদুর বৈরুত থেকে বহু কষ্ট করে সংগ্রহ করেছেন। এই দরুদ শরীফ তিনির লিখিত দরুদের ওযীফা পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। হুজুরের ইন্তেকাল পর্যন্ত ইলমে হাদীসের খেদমত করে গেছেন।

বর্তমান ও অনাগত উত্তরসুরীদের জন্য রেখে গেছেন এক অনুকরণীয়, অনুসরণীয়, অনুশীলনীয় জীবনাদর্শ। আমি আশাবাদী এ জমিনে নেক খেদমত গুলোর বদৌলতে লাখো মুমিনের হৃদয়ে চির জাগরুক হয়ে থাকবেন যুগ যুগ ধরে। আমি তাঁর দারজা বুলন্দীর প্রার্থনা করছি।

লেখক: মুহতামিম, ভূরকী হাবিবিয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট।

আমাদের মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর

হাফিয মাওলানা মুহাম্মাদ ফখরুল ইসলাম

অনেক ভাবনা ও ভয়ভীতির পর কলম হাতে নিলাম। বারবার ভাবছিলাম যার ব্যাপারে লিখবো তিনি কত বড় মনীষী, আর আমিই বা কতটুকু চিনি উনাকে। উনাকে চেনার কতটুকু যোগ্যতা আমার আছে? কিন্তু এই স্মরণিকা সম্পাদক মাননীয় বড়ভাই এর কথা রক্ষা করা আমার জন্য আদব, তাছাড়া হুজুরের রূহানী তাওয়াজ্জুহের আকাঙ্খা আমাকে শেষ পর্যন্ত কিছু লিখতে বাধ্য করলো।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেব রাহিমাহুল্লাহ অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ইলমে হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তাছাড়া ইলমে কিরাত, তাফসিরুল কোরআন, তাসাউফ, বিচার বিভাগ পরিচালনা ও রাজনীতি ইত্যাদি মানব জীবনের সব কল্যাণকর কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। আলোকিত জীবনের অধিকারী এই মনীষীর দ্বীনি খিদমাত এর পরিধি সুবিশাল যা লিখা আমার পক্ষে অসম্ভব।

ছাত্র জীবনে আমি যেভাবে হুজুরকে দেখেছি

ইসলামী সুন্নি ছাত্র কাফেলা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার সাথে জড়িত থাকার সুবাদে মাঝে-মধ্যে হুজুরের সান্নিধ্য লাভে আমরা ধন্য হতাম। বিভিন্ন সম্মেলন, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে হুজুরকে একজন মহান শিক্ষক হিসেবে আমরা পেয়েছিলাম। ২০২০ সালে আমাদের আমেরিকার মিশিগান স্টেটের আল মিসবাহ ইন্সটিটিউট এর আলিম কোর্সের ১ম ব্যাচের সবক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল জুম এর মাধ্যমে হুজুরের উস্তাজ মুহতারাম সায়্যিদ আমীমুল ইহসান বারাকাতি রাহিমাহুল্লাহ লিখিত *ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার* কিতাব থেকে দারসে হাদীস গ্রহণ করার সুযোগ হয়। এই সবক অনুষ্ঠানে হুজুর সবার আগে হাজির হয়ে আমাদেরকে অবাক করেছিলেন। হুজুরের আদেশ-উপদেশ আজো আমাদেরকে নেককাজে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ হুজুরকে নেক জাযা দান করুন।

ওয়ায মাহফিলে হুজুরের বয়ান

বিভিন্ন ওয়ায মাহফিলে হুজুরের বয়ান যেন এক বিশাল ইলমের ক্লাস। সরল সহজ ভাষায় ইলমি তরবিয়তমূলক ওয়াজ সর্বসাধারণের জন্য যেন ইলমের ভাণ্ডার। এমনকি ইউরোপ আমেরিকায় জন্ম নেয়া আমাদের সন্তানরাও হুজুরের বয়ান বুঝতে সক্ষম হতো। এত গুছানো কম কথায় বুঝানো আলিমের আজ বড় অভাব।

হুজুরের লেখনী

মাসিক শাহজালাল থেকে হুজুরের লেখনী পড়ার শুরু। এরপর বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও

হুজুরের লিখিত কিতাবাদি দেশে থাকতে পড়তাম ও সংগ্রহে রাখতাম। আজ আমাদের মাদ্‌রাসার করিডোরে বুকস্টল, যেখানে হুজুরের কিতাবগুলো সাক্ষী হয়ে আছে। যেমন বয়ান তেমন লিখনী। সহজ ও সরল ভাষার সমাহার ও সর্বজন সমাদৃত। জ্ঞান ভাণ্ডারে ভরপুর। আল্লাহর নেক বান্দারা দুনিয়াতেও সম্মানী এবং আখেরাতেও আরও বেশি সম্মানী। একখানা হাদীস মনে পড়লো, মানুষ মারা গেলে আর কোন আমল করার সুযোগ নেই কিন্তু তিনটি উপায়ে মানুষের কাছে নেকি পৌঁছাবে। এর একটি হচ্ছে ইলম রেখে যাওয়া। হুজুরকে আল্লাহ জাযায়ে খায়ের এনায়েত করুন।

আদব-আখলাক

ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ এর সামনে হুজুরকে যেভাবে আদব প্রদর্শন করতে দেখতাম আর কাউকে তেমনিভাবে দেখতাম না। ছাহেবজাদাগণ এমনকি ছাহেব কিবলাহর নাতিগণকেও সম্মান করতেন।

স্বল্পভাষী ও সদালাপী ছিলেন হুজুর। দেশে বিদেশে অনেক আলেম উলামাদের সাথে হুজুরের সম্মানের সুসম্পর্ক ছিল।

পরিশেষে এ কথাই বলতে হয়, হুজুর ছিলেন আমাদের জন্য আল্লাহর এক নিয়ামত। কোন না কোন ভাবে আমরা সবাই হুজুরের দ্বারা লাভবান হয়েছি। হুজুর আছেন এবং থাকবেন আমাদের মাঝে। আমরা হুজুরের রেখে যাওয়া আদর্শকে ধরে রাখতে পারি সেই তাওফিক চাই মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে। হুজুরের রুহানী দোয়ার মোহতাজ।

লেখক: প্রিন্সিপাল, আল মিসবাহ ইন্সটিটিউট, মিসিগান, আমেরিকা।

نبذة من حياة شيخ الحديث العلامة حبيب الرحمان صاحب المشهور بمحدث صاحب (رحمه الله تعالي)

مولانا شاه جهان محمود

تمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

مَن مِن العلماء العارفين لا يعرف محدث صاحب رحمه الله؟ وهو الذي ملأ ذكره في داخل البلاد وشاع علمه في الخارج بفضله وعلو مكانته في العلم والفهم والدروس والتدريس. كان محدث صاحب رحمه الله استاذ الاساتذة، خادم ا لحديث النبوي الشريف وأحد من العلماء المشهورين المتفوقين البارزين في بنغلاديش.

نشأة الشيخ

ولد رحمه الله في قرية راراي في منطقة زكي غنج في محافظةسلهت في عام 1352ه (1934م).

نشأ منذ صغر سنه زاهدًا في الدنيا، مقبلًا على الآخرة، طموحًا إلى معرفة الشريعة وفروع العلم. وكان رحمه الله في صغر سنه طالبا زكيا و باحثا في العلم اللغة وعلم النحو وعلم الحديث.

طلب العلم

بدأ رحمه الله طلب العلم صغيرا في مدرسة إبتدية الحكومية في راريئ زكي غنج ثم ذهب الي بدر فور سينيور مدرسة في الهند مع أخيه الكبير مولانا نجيب الرحمان رحمه الله ثم رجع الي بنغلاديش وألتحق في مدرسة أحمدية شوروكير بزار وحصل شهادة ثانوية من هذه المدرسة. اثناء دراسة في هذه المدرسة شارك في الامتحان التمهيدي وتفوق وحصل للمنحة الحكومية لكنّه لم يجد ما يروي طموحه وظمأه من العلم لذلك سافر الي غاس باري من سلهت للدراسة العلوية ، وتخرج من جامع العلوم غاس باري مدرسة في عام 1959م. علما هو حصل الدرجة الاولى وامتاز من المتوفقين من مرحلة العالم الي مرحلة الكامل تحت إدارة المجلس التعليمي لمدارس الاسلامي بباكستان الشرقي.

قد ثابر رحمه الله وتعب على نفسه وعاند في العلم ، وقضى اكثر من عمره في طلب العلم، حتى برع في جميع العلوم وأصبح علماء عصره في شتى العلوم.

قارئ كتب الاسلامي

كان رحمه الله يقرئ الكتب العلمية الدينية لا يوجد احد مثله في منطقته وفي عهده. ومضي اكثر من حياته في القرائة والمطالعة والمناقشة، واشتغل في بحث حل مسائل الخلافية. وله أشد شوقا في القراءة حتي ينتهي بعض من الكتب الصغيرة في يوم واحد.

وهو اشتري كثير من الكتب: كتب الحديث والتفسير والفقه وكتب في مختلف الفنون حتي جعل مكتبة في قريته راري المسمي مكتبة الحبيب.

شيوخه

كان له كثير من المشايخ الذين أخذ منهم العلم الديني. من شيوخه الذين تأثر به وهو الشيخ عبد اللطيف صاحب قبلة فولتلي رحمه الله الذي سار على نهجه.

وأخذ عنه علم الحديث وعلم القرائة وعلم التصوف حتي حصل الخلافة من شيخه رحمه الله. ومن شيوخه المشهورين مولانا محمد نجيب الرحمان رحمه الله، مولانا مفتي السيد عميم الاحسان مجددي البركاتي رحمه الله. شيخ الحديث سعيد علي، شيخ الحديث شفيق الحق، شيخ الحديث إدريس احمد، شيخ الحديث مفتي عبد الغني، شيخ الحديث عبد الواحد، بحر العلوم محمد حسين سيلهيتي رحمهم الله جميعا.

إنه قد أخذ إجازة في علم الحديث من الشيخ محمدبن العلوي المالكي المكي شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادري، الشيخ آسعد محمد سعيدالساغرجي سوري، وقد أخذ الشيخ آسعد محمدسعيد الساغرجي سند الحديث منه أيضا. وقد أجازه سلطان العلماء السيد سالم بن عبد الله الشاطري الشافعي اليمني في الحديث وغيرهم من العلماء البارزين في عهده رحمه الله.

وقد تتلمذ عليه عدد كبير من العلماء والمحدثين من داخل البلاد وخارجه من العالم.

أخلاقه وتواضعه

وكان رحمه الله جميل الصفات، شريف الأخلاق، كامل الأدب والمروءة، كثير التواضع، دائم البشر، شديد الاقتفاء لكلام الشرع وأحكامه، معظمًا لأهل العلم، مُكرِّمًا لأرباب الدين والسنة، محبًا لاتباعه، كريم النفس على أجمل طريقة، لم يكن في زمنه متواضعا مثله في بنغلاديش. قد ميز الشيخ رحمه الله عن علماء عصره بأخلاقه وأدبه وتواضعه وواسع علمه، وهو كان اشد متواضعا لكبار سنه وصغاره لاساتذته وتلاميذه. قد تطبق رحمه الله حديث النبي صلي الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله في حياته. كان يحب الفقراء، ويلاطف الصغار، ويتواضع لكل الناس، وربما يقف ساعات طوال مع الناس ليقضي لهم حاجاتهم

.دون تمامل

الشيخ والتصوف

بعد أن تأسس أساس علميًا، اتجه إلى أرباب القلوب وأكابر أهل الحقيقة شيخ عبد اللطيف -صاحب قبلة فولتلي رحمه الله تعالى -صاحب علم التصوف الحق

فأخذ عنه علم التصوف الحق. ففوض شيخه لتدريس والوعظ والنصيحة والارشاد ولخدمة الناس. لذالك اشتغل رحمه الله بالوعظ والإرشاد والتدريس، ونشر العلم، ونصر السنة النبوية والعقيدة الصحيحة، ففاق من علماء عصره، وظهر له صيت بالزهد، وكان له سمت وصمت، وكان يزوره الناس كثير، كان يدرس بالعلم المتين، والإيمان العميق، العقيدة وفي بيته وفي سفرهÓعيسى متيÒ الصحيحة من حب النبي صلي الله عليه وسلم في مدرسته .في خارج البلاد وداخله إلى أن توفي رحمه الله

دروس والتدريس

قد تبحر رحمه الله فى علوم الحديث، حيث كان الطلاب يقرأون عليه في مدرسته وخارجه دروسًا في الحديث, خاصة دروسا في صحيح البخاري الشريف وأدب المفرد ورياض .الصالحين شمائل ترمزي وغيره

إن تدريسه وشرحه لاحاديث النبوية وتطبيقاته في الاحاديث المعارضة كان وصل أعلي .درجته. لايوجد في بلادنا أحد مثله في شرح الحديث في زمننا هذا

وظائف

بدأ وظيفته الاولى مدرسا في جامعة عيسى متي الاسلامية مدرسة بعدما تخرج من جامعة غاس باري بزار في عام 1959م ثم صار محدثا في جامعة دار الحديث ساتبور في عام 1963م قد احتاج عيسى متي مدرسة هذا المدرس الجليل مرة ثانية لذلك رجع رحمه لله الي هذه المدرسة وصار مديرا في عام 1974م. قد سافر رحمه الله الي الامارات العربية المتحدة في العام 1977م وصار مستشار في الفقه الحنفي في محكمة الشرعية في مدينة أم القوين في الامارات العربية المتحدة في العام ....1981-1977م وكان إماما وخطيبا في احد من المسجد اثناء هذه الوقت في مدينة أم القوين. قد رجع رحمه الله الي بنغلاديش في عام 1971م وصار مديرا مرة ثانية في جامعة عيسى متي الاسلامية مدرسة الي ان تقاعد في عام 1999م

مهارته في العلوم شتي

وكان ماهرا في التفسير، أن تفسيره للقران وشرحه وتطبيقاته في الايات المعارضة كان وصل اعلي مكانته فنال اعتراف العلماء بفضله عليهم. وكان متفوقا في الفقه أيضا ويفتي على

مذهب الحنفي وهذا يدل على تمكن الشيخ في الفقه. وتبحر في العلوم الحديث وفنونه في زمنه وأيضا قد صار مبرزا في علم اللغة العربية.

مؤلفاته

قد كتب كتبا عديدة مفيدة للاسلام والمسلمين. قد طبع اكثر من 18 كتبا في المختلف الفنون الاسلامي منهم

1. القول المقبول في ميلاد الرسول،
2. مسنون أدعاء وفضائل 33 ايات،
3. مسائل العشر في ملاحظة البنغلاديش،
4. فضائل الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم والوظيفة،
5. زيارة مدينة المنورة،
6. أصحاب بدر،
7. وظيفة،
8. حج وزيارة،
9. هدية اللبيب في نبذة من سيرة النبي الحبيب،
10. ذخيرة الأحاديث الأربعين في فضائل سيد المرسلين،
11. كنز الأحاديث الأربعين في مناقب أهل بيت النبي الأمين،
12. تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب،
13. التحفة اللطيفة في الاحاديث المسلسلة المنيفة،
14. (دلائل الخيرات،(تحقيق
15. (الحزب الاعظم،(تحقيق
16. (درس الحديث (المسلسل 1،
17. القول الراجح في صلاة التراويح،
18. منتخب السنن والاثار.

سفره رحمه الله الي بلاد المختلفة

إنه قد سافر رحمه الله الي الهند، المملكة العربية السعودية، المغرب، مصر، وسورية، الولاية

المتحدة الامريكة و بريطانية. ومضي اكثر من وقته السفر في بريطانية، وجعل دروس الحديث والتفسير والوعظ والنصيحة في مختلف المساجد والمدارس ببريطانية خاصة في في دار الحديث اللطيفية لندن، ومدينة بيرمينغهام، ليستار، براد فرد، ولدهم وغيره. عندما يأتي الي مدينة ولدهام مضي اكثر من وقته في بيتي احيانا لسبب الديني. سأله السائل يومًا سبب لعيش في بيتي قال رحمه الله يوجد في بيته الكتب الديني وأنا أريد ان أسكن في مكان الذي أطالع وأناقش فيه لكي لا أضيع وقتي في سفري.

عبادته وزهده

كنت مع الشيخ في مكة المكرمة وفي مدينة المنورة في سفر عمرته وحجه فوجدته رحمه الله اكبر مجاهدة في العبادات، واشتغل اكثر وقته في الصلاة والتلاوة والتهجد والتسبيح والتذكير والدعاء والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم، ومطالعة الكتب ومناقشاتها وتذكيرها وتدبيرها.

قناعة الشيخ على قضاء الله وقدره

قد زرته رحمه الله في أخر حياته في بيته في شهر يناير2022م قال لي عند الوداع هل تزورني مرة ثانية قبل ذهابك الي بريطانية؟ قلت إنشاء الله، كما قلته

قد ذهبت الي بيته مرة ثانية في مرض موته رحمه الله وتكلمت معه قليلا وسألت حاله قال الحمد الله على حالي وقال لي ادعو لي يا مولنا لا أدري أي مساء يناديني الله سبحانه تعالي. وهذا كان أخر كلامي مع الشيخ. قد توفي رحمه الله مساء أول يوم الاثنين في شهر فبراير سنة 2022م. قد شارك اكثر من مئة الاف من المسلمين في جنازته. ودفن رحمه الله بجنب المسجد الذي بني رحمه الله قريبا من بيته.

اللهم اغفر شيخنا وأرفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، اللهم نور له في قبره واخلفه في أهله، اللهم لا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره، وألحقه بنبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة الاعلى.

الختام

قد وصل رحم الله إلى أعلى درجات العلم في زمنه،

وصار أستاذا العلماء والمحدثين والمفسرين والفقهاء وارتقى أعلى درجات التزكية أطالع وأناقش فيه لكي لا أضيع وقتي في سفري.

الكاتب : إمام المسجد المركزي ولدهام

অনন্যসাধারণ অধ্যক্ষ
আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

মো. নিয়াজ উদ্দীন

সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার কালীগঞ্জ এলাকায় ইছামতি আলিয়া মাদরাসা অবস্থিত। আমি ১৯৯২ সালে অল্পদিন ওই প্রতিষ্ঠানে বাংলা বিষয়ের খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। সেই অল্পদিনের আনকোরা শিক্ষকতায় আমি একজন অনন্যসাধারণ অধ্যক্ষ আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেবকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

প্রসঙ্গ কথায় আসি। ইরাক-কুয়েতের উপসাগরীয় যুদ্ধ আমার শিক্ষাজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তৎকালীন স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামলে দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়র শিক্ষার্থীরা সেশনজটের কবলে পড়ে। আমি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত, আমাদের ১৯৮৮ সালের মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালে। আর রেজাল্ট বের হয় ১৯৯২ সালে (এগারো মাস পরে)। সেশনজট আর উপসাগরীয় যুদ্ধের বিরূপ প্রভাবে আর্থিক চাপে পড়ে আমাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার তখন বিপর্যস্ত। শৈশবে বাবাকে হারাই। আমার মাস্টার্স পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করেন তৎকালে কুয়েত প্রবাসি আমার অগ্রজ সহোদর। ১৯৯০ সালের ইরাক-কুয়েত উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে অনেক কষ্টে জর্ডান হয়ে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করলে আমাদের পরিবার চরম অর্থকষ্টে নিপতিত হয়।

'কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কীসে...।' নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে মাস্টার্স পরীক্ষার রেজাল্টের আগের সময়ের বেকারত্ব আর পরিবারের আর্থিক যন্ত্রণা আমাকে জর্জরিত করছিল। তখন জকিগঞ্জ উপজেলার ইছামতি আলিয়া মাদরাসার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ে। বাংলা বিষয়ের প্রভাষক নিয়োগ। মাস্টার্স পরীক্ষার এপিয়ার্ড সার্টিফিকেট দিয়ে আমি আবেদন করি। যৌক্তিক কারণে আমাকে ইন্টারভিউ লেটার পাঠানো হয়নি।

সেই সময়ে ইছামতি আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নরত ওহিদুজ্জামান চৌধুরী খসরু আমাদের দুবাগ ইউনিয়নের সন্তান। আমার প্রতিবেশী গ্রামের। (বর্তমানে তিনি বড়লখার চান্দগ্রাম আনোয়ারুল উলুম ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসার উপাধ্যক্ষ।) খসরু ইছামতি আলিয়া মাদরাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেবের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। দুবাগবাজারের এক হাটবারে খসরুর সাথে সাক্ষাৎ হলো। জানতে পারলাম, যোগ্য শিক্ষক না পাওয়াতে ইছামতি মাদরাসায় বাংলা বিষয়ে কোনো

শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তাঁর সাথে পরামর্শ করে পরদিন আমি ও আমার বন্ধু প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবেন্দ্রকে নিয়ে ইছামতি আলিয়া মাদরাসায় যাই। কিন্তু ওইদিন অধ্যক্ষ আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি মাদরাসার কাজে ক্যাম্পাসের বাইরে ছিলেন। তৎকালীন উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের পরামর্শের প্রেক্ষিতে মাদরাসার গভর্নিং বডির তৎকালীন সহ সভাপতি জনাব ডা. শামসুদ্দিন সাহেবের সাথে কালীগঞ্জ বাজারস্থ তাঁর ফার্মেসিতে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে ইছামতি মাদরাসায় যোগদানের পরামর্শ দেন। যোগদানের পর তাঁর বাড়িতে আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

শিক্ষকতা জীবনে একেবারে নতুন হওয়ার কারণে ফাযিল শ্রেণিতে পাঠদানে আমাকে হিমশিম খেতে হয়েছে। মনে পড়ে কোনো শিক্ষক ছুটিতে থাকলে তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণিতে কখনও বা নবম, দশম শ্রেণিতেও আমাকে প্রক্সি দিতে হয়েছে। এই সব ক্লাসের ছাত্ররা আমাকে অনুরোধ করতো আমি যেনো মাঝে মাঝে তাদের ক্লাসে যাই।

আমার যোগদানের মাত্র এক সপ্তাহ পরেই কোরবানির ঈদ। ঈদ উপলক্ষ্যে মাদরাসার শিক্ষক -কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হচ্ছে। এ সময় পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মাদরাসার হিসাবরক্ষককে বললেন, 'নিয়াজ সাহেবের হাতে পাঁচ শতো টাকা দিয়ে দিবেন। তাঁর চাকরি এক সপ্তাহের হলেও তিনি তো বাড়িতে যাবেন লজিং থেকে। খালিহাতে কী করে যাবেন?' (১৯৯২ সালে পাঁচশত টাকার মূল্যমান অনেক বেশি ছিল)। তাঁর এই দূরদর্শী মানবিক গুণ আমাকে বিমোহিত করেছে। যখন যেখানে সুযোগ হয় প্রসঙ্গক্রমে আমি তাঁর এই মহৎ গুণের কথা উল্লেখ করতে কখনও কার্পণ্যবোধ করিনি, এখনও তাঁকে স্মরণ করি পরম শ্রদ্ধাভরে।

প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর কৌশলী, কুশলী নির্দেশনা আমাকে মোহিত করেছে। একদিন মাদরাসার স্টাফ মিটিং। এ মিটিং এ তিনি অত্যন্ত চমৎকার করে বলেছেন, 'শুনেছি, আমাদের ২/১ জন শিক্ষক মাদরাসায় যথাসময়ে আসতে পারছেন না। আমি কারো নাম উল্লেখ করছি না। আপনারা আপনাদের বিবিকে (ওয়াইফকে) বলবেন তিনি যেনো ১৫/২০ মিনিট আগে আপনার ভাত বেড়ে দেন। তাহলে আর দেরি হবে না।' অন্য কোনো অধ্যক্ষ হলে যে ক্ষেত্রে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতেন, সেখানে অধ্যক্ষ আল্লামা মো. হবিবুর রহমান চমৎকার করে শিক্ষকদের দেরি না করার কৌশল বাতলে দিয়ে কুশলীভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এই গুণ বর্তমানে বিরল।

অধ্যক্ষ আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেব প্রায়ই মাদরাসায় রাত্রিযাপন করতেন। জকিগঞ্জ উপজেলার মধ্যে শিক্ষায়, প্রজ্ঞায় হয়রত ফুলতলী সাহেবের পরেই অধ্যক্ষ আল্লামা মো. হবিবুর রহমানের অবস্থান ছিল। কামিল শ্রেণিতে হাদীস পড়ানোর জন্যে তাঁকে অন্যান্য মাদরাসায়ও যেতে হতো। তিনি ক্যাম্পাসে অবস্থান করছেন, এমন

সংবাদ মুখে মুখে প্রচারিত হলে মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক -কর্মচারীরা তটস্থ থাকতেন। যথাসময়ে সবাই মাদরাসায় আসতেন, পাঠগ্রহণে এবং পাঠদানে মনোযোগের ব্যত্যয় ঘটতো না।

খণ্ডকালীন শিক্ষকতার অল্পদিনের মধ্যে আমার মাস্টার্সের রেজাল্ট বের হলো। আমার পারিবারিক অভিভাবক আমার অগ্রজ সহোদরের প্রবল ইচ্ছা, তিনি আমাকে ইংল্যান্ড পাঠাবেন সাংবাদিকতার সূত্র ধরে অথবা বিকল্প কোনো পন্থায়। তাঁর নির্দেশনা মানতে গিয়ে মাস্টার্সের রেজাল্টের পরপরই ইছামতি আলিয়া মাদরাসা থেকে চলে আসার মানসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি অধ্যক্ষ আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মহোদয়ের কক্ষে প্রবেশ করি। তিনি আমাকে দেখে বললেন, 'নিয়াজ সাহেব, আপনাকে কেমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে। 'আমি আমার বক্তব্য প্রকাশের আগেই তিনি আমার চেহারা থেকে আমাকে স্টাডি করে ফেলেন। তাঁর এমন দার্শনিকসুলভ প্রজ্ঞা তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দেয়।

কলেজে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে আমি শিক্ষকতা জীবনের শেষপ্রান্তে চলে এসেছি, কিন্তু অধ্যক্ষ আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সাহেবের দূরদর্শীতা, প্রশাসনিক কলাকৌশল, তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞা এখনও আমার মানসপটে চিরভাস্বর।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, বড়লেখা সরকারী কলেজ, মৌলবীবাজার।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর কিছু স্মৃতিচারণ

মাওলানা মোঃ মাহবুবুল আলম

"তোমার স্মৃতি কখনো ভুলে তো যাবো না
তোমার মতন গুণী খুঁজেও পাবো না।
ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে তোমার'ই স্মৃতি
সান্নিধ্যে গিয়ে পেয়েছি প্রেম আর প্রীতি।"

হাদীস জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, হাজার হাজার মুহাদ্দিসের উস্তায, উপমহাদেশের বিখ্যাত হাদীস বিশারদ, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাবেক বিচারপতি, ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ, আমি নগণ্য নালায়েকের উস্তায মোহতারাম, আল্লামা হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ইং সোমবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটের সময় নিজ বাড়িতেই ক্ষণস্থায়ী এ বসুধা হতে চিরতরে বিদায় নেন। তিনি কত উঁচু পর্যায়ের একজন মুহাদ্দিস ছিলেন সেটা বর্ণনা করা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের সাধ্যের বাইরে। আমি যতটুকু দেখেছি, একবার যারা তাঁর মাজলিসে গিয়েছেন, বারবার না গিয়ে পারেন নি। শ্রেণিকক্ষে বলেন আর ওয়াজের মাহফিলে বলেন, তাঁর মতো এতো গুছিয়ে এবং সুন্দর করে কোন বিষয়কে উপস্থাপন করতে আমি আর কাউকে দেখিনি। হুজুর আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতে। কিন্তু সেই স্নেহ-ভালোবাসার মূল্যায়ন আমি করতে পারিনি। মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের স্মৃতিচারণমূলক কিছু কথা লিখতে হবে। কিন্তু কি লিখবো ভেবে ভেবে কিছু পাচ্ছি না। তবুও বিচ্ছিন্ন দু'চারটি কথা লেখার ক্ষুদ্র প্রায়াস চালাবো। ইন শা আল্লাহ।

মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর বড়লেখা উপজেলায় বিভিন্ন প্রোগ্রামে আসতেন। আমাদের চান্দগ্রামে বিভিন্ন সময় ওয়াজ মাহফিল এবং মাসিক তাফসির মাহফিলসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামে বেশিই আগমন ঘটত। সেই সময় হুজুরের সান্নিধ্যে ততটুকু যেতে না পারলেও পরিচিতি ছিল। ২০০২ সালে চান্দগ্রাম এ. ইউ. ফাজিল ডিগ্রি মাদরাসা হতে ফাজিল উত্তীর্ণ হবার পর আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম ফুলতলি কামিল মাদরাসায় কামিল জামাতে হাদীস বিভাগে ভর্তি হবো। বাধ সাধলেন আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা মাওলানা মোঃ মাহমুদুর রহমান সাহেব। তিনি বললেন- মুহাদ্দিস সাহেব আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর চান্দগ্রামে তাফসির মাহফিলে আসছেন। উনার সাথে কথা বলে দেখি কি বলেন। সেই সময় চান্দগ্রাম জামে মসজিদে মাসে ২/১ দিন সন্ধ্যার পর হুজুরের নিয়মিত তাফসির মহফিল হতো। নির্ধারিত দিনে হুজুর আসলে আব্বা কথা বলে সিদ্ধান্ত নিলেন ইছামতি মাদরাসায় কামিলে ভর্তি হবো। আমার বন্ধুরা একটু আপত্তি করলো

(অবশ্য হুজুরের সামনে নয়)। পরে সকলে একমত হয়ে ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদরাসায় ২০০৩-২০০৪ সেশনে হাদীস বিভাগে ভর্তি হই। সেই থেকে বেশি করে হুজুরের সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গেলো।

প্রতিদিন আমরা হুজুরের ক্লাস করার জন্য উন্মুখ থাকতাম। হুজুর বুখারী শরীফ পড়াতেন। আমার জানা মতে, ১৯৯৯ সালে হুজুর নিয়মতান্ত্রিক অধ্যক্ষ পদ হতে অবসর গ্রহণ করলেও, সেই সময় শুধুমাত্র নবীর হাদীসের মহব্বতে প্রতিদিন মাদরাসায় উপস্থিত হয়ে হাদীস শিক্ষা দিতেন। একান্ত কোন সমস্যা না হলে হুজুর শ্রেণিতে অনুপস্থিত থাকতেন না। প্রোগ্রাম থাকলে পাঠদান শেষ করে তারপর যেতেন। মাদরাসায় হুজুরের অফিসে বিশ্রাম করারও সুবিধা ছিল। হুজুর মাদরাসায় এসে সেখানে বিশ্রাম নিতেন। হুজুর মাদরাসায় উপস্থিত হবার পরই আমরা হুজুরের সাক্ষাৎ করতাম, তারপর শ্রেণিকক্ষে যেতাম; এটা নিত্যদিনের কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

ইছামতি মাদরাসার ছাত্রাবাসে থেকে লেখাপড়া করছিলাম। একদিন হুজুর সিলেটের দিকে কোথাও প্রোগ্রামে যাবেন; সেদিন আমিও বাড়িতে যাবো। হুজুরের কাছে অনুমতি নিতে গেলে বললেন, আমার সাথে চারখাই পর্যন্ত যেতে পারবে। সেদিন হুজুরের সাথে কিছুটা পথ সফরসঙ্গী হলাম। হুজুরের গাড়িতে যাত্রাপথে একসময় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মাহবুব! গাড়িতে যাতায়াতকালে এই ফ্রি সময় কি করে কাটাও? আমি বললাম, কিছু করি না। তখন হুজুর আমাকে বললেন, গাড়িতে যাতায়াতের সময় এমনি বসে না থেকে দরূদ শরীফ পড়বে। হুজুরের বলে দেয়া এই আমলটি আমি আজও পালনের চেষ্টা করি।

কামিল জামাতে পড়াকালীন সময়ে হুজুর একবার হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা মদিনা সফরে গিয়েছিলেন। ফিরে যেদিন মাদরাসায় প্রথম আসলেন; আমরা কয়েকজন যে কক্ষে থাকতাম সেটা থেকে বের হয়ে হুজুরের দিকে এগিয়ে গেলাম। মাদরাসার বারান্দায় হুজুরকে কদমবুচি করে দাঁড়াতেই তিনি দুই হাতে আমার মুখমণ্ডলের দুই পাশ (যে স্থানে দাড়ি উঠে) বুলিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য যে, কামিল পড়াকালীন সময়েও আমার মুখের শুধু থুথুনিতে কয়েকগুচ্ছ দাড়ি ছিল। সারা মুখে ছিল না। আলহামদুলিল্লাহ হুজুরের হাত বুলানোর পর থেকে আমার সারা চোয়ালে আস্তে আস্তে দাড়ি উঠেছে। নির্বাচনী পরীক্ষার পর যেদিন ফলাফল বের হলো, আমি ফার্স্টক্লাস পেলাম। হুজুর বললেন, মাহবুব! ফাইনালেও ফার্স্টক্লাস চাই। আলহামদুলিল্লাহ, আমি ফাইনালেও ফার্স্টক্লাস পেয়েছিলাম।

২০০৪ সালে কামিল উত্তীর্ণের পর পাগড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানের সময় হুজুর লন্ডন ছিলেন। হুজুরের হাতে পাগড়ি পরতে পারিনি। মনে কিছুটা আফসোস ছিল। পরবর্তীতে সেই আশা পূর্ণ হয়। ২০০৬ সালে আল্লামা ফুলতলি সাহেব কিবলাহ (রহ.) হাদীস শরীফের

সনদ ও পাগড়ি বিতরণ করেন। হাদীসের সনদ ও পাগড়ি প্রাপ্তদের মধ্যে আমার মতো নগণ্য নালায়েকদের সাথে উপরের সারিতে মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের মতো বুজুর্গানেকেরামরাও ছিলেন। পাগড়ি ও সনদ সবার হাতে হাতে তালিকানুযায়ী দেয়া হয়। আমি তা সংগ্রহ করে খুঁজে খুঁজে মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরকে বের করলাম। প্যান্ডেলের এক পাশে দেখলাম সেখানে বসে আছেন। আমি হুজুরকে পাগড়ি পরিয়ে দেয়ার অনুরোধ করলে, তিনি বললেন, আমার হাতে ব্যথা। পরাতে কষ্ট হবে। আমি হুজুরের সামনে তাশাহুদের সুরতে বসে রইলাম। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে হুজুর পাগড়ি পরিয়ে দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। পরিয়ে দিতে দিতে বললেন, তুমি তো পথ দেখিয়ে দিয়েছো। আরো অনেকে আসবে। সত্যিই আমাকে পরিয়ে দিতে দেখে আরো ২/৩ জন আসলেন। সেদিন হুজুরকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমাকে যেন ক্ষমা করা হয়, এই কামনা রব্বে করিমের দরবারে।

২০০৭ সালে হযরত শাহজালাল দারুসসুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট হতে ফিকহ বিভাগে কামিল উত্তীর্ণ হলে পাগড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর অতিথি ছিলেন। বাদ এশা বয়ান শেষ করে পাগড়ি বিতরণের সময় আমাকে পাগড়ি পরিয়ে দেয়ার সময় মুচকি হেসে বলেছিলেন, আর কত পাগড়ি পরবে? হুজুরের সেদিনের কথাটি প্রায় সময় মনে পড়ে। আজ সেই কথাটা লিখতে গিয়ে দু'চোখে জল এসে গেল। হুজুরের আবাস যেন জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে হয় এবং হুজুরের প্রতি সামান্য হলেও যে মহব্বত হৃদয়ের গহীনে লালিত আছে তা যেন পরকালে হুজুরের সাথে জান্নাতে গমনের মাধ্যম হয়, এই কামনা রব্বে করিমের দরবারে। পরিশেষে হুজুরকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা দিয়েই ইতি টানছি। কবিতাটি হলো:

উপমহাদেশে, ছিলে সেরা বেশে, শায়েখে হাদীস তুমি
জন্ম তোমার, জানি তবেকার, এই ভারতের ভূমি।
জকিগন্জের, রারাই গ্রামের, তুমি ফুটন্ত ফুল
তোমার মতন, নেই কোনজন, ভিতরে আলেম কুল।

স্নেহ মায়া কতো, দিয়ে গেছো শতো, ভুলতে পারি না কিছু
কাছে ডেকে নিতে, উপদেশ দিতে, হয়ে যায় নি তা মিছু।
সুখী হত মন, শুনে সারাক্ষণ, তোমার মুখের বাণী
নিয়েছি শিক্ষা, দিয়েছে দীক্ষা, নবীর হাদীস জানি।

সহজ ভাষায়, বুঝাতে যে হায়, না আসলে কিছু বুঝে
তোমার মতন, কাউকে এমন, পাই না তো আর খুঁজে।

তব মাহফিলে, খবর শুনিলে, ব্যাকুলে যেতাম চলে
হেরিয়া তোমায়, মায়াবী কথায়, হৃদয়টা যেতো গলে।

চলে গেলে তুমি, ছেড়ে এই ভূমি, প্রভু দেয়া কাল শেষে
আসবে না আর, ধরার মাঝার, কভু অতিথির বেশে।
এই ভব নীড়ে, আলেমের ভীড়ে, তুমি সেরা এক ছিলে
তব ওয়াজেতে, তব নসিহতে, প্রভাব ফেলতো দিলে।

জানি জনতার, প্রিয় যে সবার, উঁচু ছিল তব স্থান
তব ব্যবহারে, টানতো সবারে, মোহিত করতো প্রাণ।
ওহে প্রিয়জন, কোথায় এখন, মনে পড়ে তব কথা
চোখে আসে জল, করে ছলছল, হৃদয়ে বিরহ ব্যথা।

ছাত্র জনতা, জানি তব কথা, ভুলবে না কোন দিন
তব অবদান, ছিল অফুরান, শোধিবে কেমনে ঋণ।
যুগ যুগ ধরে, তব কথা স্মরে, মহিমা প্রচার হবে
জ্ঞানীদের বাগে, অধিক সোহাগে, তুমি অমলিন রবে।

লেখক: প্রভাষক (আরবি), চান্দগ্রাম এ. ইউ. ফাজিল ডিগ্রি মাদরাসা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

কিছু স্মৃতি কিছু কথা

নূর হোসেন তালুকদার

আসসালামু আলাইকুম, মাহফিলে বয়ানের প্রারম্ভেই এভাবে যিনি উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে সালাম দিতেন, সেই সাথে স্মরণ করিয়ে দিতেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমর বাণী: "আসসালামু ক্বাবলাল কালাম" তিনি আমাদের 'মুহাদ্দিস ছাহেব' শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ইছামতি দারুলউলুম কামিল মাদ্‌রাসা, জকিগন্‌জ, সিলেট। আমার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতির অ্যালবামে সযত্নে সংরক্ষিত ওয়াজ মাহফিলের উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল শিক্ষণীয় স্মৃতি।

এরও একটা ভূমিকা (Background) আছে। আছে সচেতন করার প্রয়াস। ইসলামী তাহযিব তমদ্দুনের প্রচার প্রসার, সর্বোপরি সুন্নাতে রাসূলের আদর্শে জীবন ও সমাজ গঠনের সক্রিয় প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ-প্রথম পাঠ এক আহলে ইলম, প্রথিতযশা শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমানের,যিনি বৃহত্তর সিলেটবাসীর নিকট একডাকে পরিচিত ছিলেন 'মুহাদ্দিস ছাহেব' নামে।

Background টা এরকম : বক্তৃতার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সচরাচর যে চিত্র দৃশ্যমান, জাগতিক ও ধর্মীয় সমাবেশে প্রায় অভিন্ন। কেমন? বক্তা প্রথমে সভাপতি ও অন্যান্যদের সম্বোধন করে কিছু কথা বলে ভূমিকা পর্ব সারেন। আর এ পর্বের শেষে সবাইকে 'সালাম' জানান। এখানেও আছে রকমফের! কেউ পুরো সালাম উচ্চারণ করেন আবার কেউ কেউ সালাম না দিয়েই বলে থাকেন: 'আপনারা আমার সালাম গ্রহণ করুন!'

তো কথা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে বলেছেন : "আসসালামু ক্বাবলাল কালাম" আগে সালাম, পরে কালাম। অতএব সালাম হবে কথার আগে। অর্থাৎ, সালামের মাধ্যমেই কথা শুরু হবে। সমাজে প্রচলিত এ উল্টো স্রোতকে সঠিক ধারায় প্রবাহিত করতে আমাদের সময়ে আমাদের সমাজে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা হবিবুর রহমান (মুহাদ্দিস ছাহেব হুযুর)।

তিনি ছিলেন এক সত্যিকার আল্লামা- বিদ্বান ব্যক্তি, জ্ঞানী গুণী মানুষ ; সুন্নতের পাবন্দ অর্থাৎ ইলম ও আমলের সার্থক সমন্বিত পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ফলভারে নত এক মহীরুহ, বিনয় ও তাওয়াযু'র এক মূর্ত প্রতীক। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী কিন্তু অহংকার তাঁর কাছ ঘেঁষতে পারেনি কভু।

একজন দাঈ ইলাল্লাহ, যাঁর কথার ভান্ডার অফুরন্ত কিন্তু প্রকাশ সীমিত। তাঁর জানা ছিলো কখন বলতে হবে, কোথায় থামতে হবে। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্য ছিলো এক অনন্য

বৈশিষ্ট্য, ভাব ও বিষয় উচ্চ মার্গের অথচ উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও বর্ণনার সহজতায় বোধগম্য ছিলো সকলের। কুরআন-হাদীসের আলোকে বিষয়ভিত্তক বক্তব্যের জন্য শ্রোতাদের পছন্দের শীর্ষে ছিলেন তিনি।

অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বজ্রকণ্ঠ হলেও উচ্চবাচ্য ছিলোনা তাঁর বয়ানে কখনও, ছিলোনা আত্মপ্রচার-অহমিকা-বাহাদুরীর ছিঁটেফোঁটাও! তাই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিলো আহলে ইলিমের সর্বঘরানার কাছে-সর্বসাধারণের কাছেও।

দলমত নির্বিশেষে আলিম হিসেবে, ব্যক্তিত্ব হিসেবে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা লাভ সবার ভাগ্যে জোটে না। যাদের ব্যাপারে স্বপক্ষ -বিপক্ষ একমত, এমন বিরল গ্রহণযোগ্যদের মধ্যে তিনি একজন। সিলেটে আলিয়া ও ক্বওমী মাদ্‌রাসা এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে যেখানে দেয়াল সদৃশ মতপার্থক্য দৃশ্যমান, সেখানে বড় বড় ক্বওমী মাদ্‌রাসার ওয়াজ মাহফিলে তাঁর আমন্ত্রণ, উপস্থিতি ও বয়ান রাখা ছিলো সবিশেষ লক্ষণীয়।

আলিমদের জন্য ইলিম চর্চা অর্থাৎ কিতাব মুতালায়া করার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি নিজে কিতাব চর্চা করেছেন আজীবন। সমানতালে উৎসাহ দিয়েছেন অন্যদেরও। উনি সাধারণের সব ধরণের সওয়ালের জওয়াব দিতেন বটে। তবে আলিমদের কেউ সাধারণ প্রশ্ন করলে, প্রথমেই উত্তর না দিয়ে কিতাব চাওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করতেন অথবা এমন ভাব করতেন যাতে তারা নিজেরাই কিতাব দেখে সমাধান খুঁজে বের করতে উদ্যোগী হন। এ বিষয়ে ছাত্রস্থানীয়দের প্রতি তাগিদ একটু বেশিই ছিলো বটে, আর ছাত্রদের মধ্যে অনেক খ্যাতিমানকেও তাঁর ধমক হজম করতে হয়েছে।

মাদ্‌রাসা পরিচালনা-দারস প্রদান, নিয়মিত ধারাবাহিক তাফসির পেশ করা,ওয়াজ মাহফিল-খানকাহ্ সহ দেশ-বিদেশে দাওয়াতি সফর সব মিলিয়ে প্রচুর ব্যস্ততা, তদুপরি অসুস্থতা ; ফুরসত বলতে যা বুঝায় তেমন কিছুই নেই। ১৯৯৬/৯৭ সালের কোনো একদিন সুযোগ পেয়ে, অবসরে আমাদের জন্য কিছু লিখে রাখার আব্দার করে ছিলাম। তিনি কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করে আমাকে তাঁর মেহমান হয়ে, সাথী হয়ে অবসরটুকু বের করে দেয়ার জন্য বলায় আমি অপ্রতিভ হয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিবিধ বিষয়ে বেশক'টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। যা আমাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি ও শ্লাঘার বিষয় বটে!

'পরের দুঃখ করিলে চিন্তন,আপনার দুঃখ রহে কতক্ষণ?' এর এক বাস্তব নমুনা ছিলেন তিনি। একবার লালারগাঁও হাবিবিয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা থেকে সৎপুর (মরহুম হাফিজ মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেবের বাড়িতে) যাচ্ছেন। সিএনজি-ট্যাক্সিতে আমি তাঁর পাশে বসা। রেললাইন পেরিয়েই আমাদের সামনের গাড়িটা আটকে গেছে, আমরাও এগুতে পারছিনা। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর তখন সামনের গাড়িটার দুর্দশা নিয়ে আফসোস করেই যাচ্ছেন! নিজের গাড়িও যে একই সিরিয়ালে সেদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ

ছিল না তাঁর। অন্যের দুঃখ-কষ্ট-পেরেশানিকে গুরুতর মনে করায় নিজের কোনো পেরেশানিই ছিলোনা তাঁর। এই তো মহামানবের গুণ!

মেহমানদারী ছিলো তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। ১৪১৮ হিজরিতে 'ছাদিছ' পড়ার সময় এক ফাঁকে একদিন তাঁর বাড়িতে (রারাই) গিয়েছিলাম। ইফতার করে আসার জন্য খুব জোর করেছেন, তখন ছাহেব বাড়ির রুটিনের ওজর দেখিয়ে রেহাই পেয়েছিলাম। একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থায়ও তাঁকে দেখতে গেছেন যারা,তাদের আপ্যায়নের জন্য অর্ধস্ফুট স্বর ও ইশারায় নির্দেশ দিয়েছেন খাদিমকে। অন্তিম অসুস্থতায় এমন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও বর্ণনাকারী আমাদের পরিচিত মুখ, কবি-সাহিত্যিক জনাব মাওলানা মোহাম্মদ খছরুজ্জামান।

উস্তায বা মুর্শিদের আদব কেমন হতে পারে অথবা মুর্শিদের প্রতি মুরিদের কিরূপ তাযিম বা সম্মান প্রদর্শন করা উচিত? এ বিষয়ে কিতাব পড়ে বা উপদেশ শ্রবণে যা অর্জন হবে, তারচে' শতগুণ বেশি ফলপ্রসূ ছিলো আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেবের জীবনাচরণ। ছাহেব কিবলাহ ফুলতলীর (র) প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা দেখাতেন বা দেখিয়েছেন তা এ যুগে বিরল! শুধু কি তাই? ছাহেব কিবলার সন্তানাদি বিশেষত বড় ও মেঝো ছাহেবজাদার সাথে তিনি যে সম্ভ্রমের আচরণ করতেন, তা নেহায়েত বিনয়ের প্রদর্শনী নয়; খুলুসিয়ত ও লিল্লাহিয়তের এক উজ্জ্বল নিদর্শন বটে!

আকিদা ও আমলে ছড়িয়ে পড়া বিভ্রান্তি দূরীকরণে তাঁর ছিলো অনবদ্য প্রচেষ্টা ও কৌশল। কাউকে আহত না করেই মোলায়েম ভাষায় সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান ছিলো তাঁর হিকমত!

হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সাহাবায়ে কেরামর সমালোচনাকে যারা বৈধ মনে করেন, তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর সরল মন্তব্য ছিলো, আপনারা যদি হাদীস সবল না দুর্বল, এই চিন্তায় পেরেশান হয়ে পড়েন, তাহলে সব ধরণের সন্দেহের ঊর্ধ্বে যে কিতাব, আল্লাহর কালাম আপনাদের পেরেশানি দূর করার জন্য যথেষ্ট -"আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।" (সুরা: বাইয়্যিনাত:আয়াত: ৮) আল্লাহ সুবহানাহু তা'লা যেখানে তাঁদের উপর রাজি,খুশি, বা সন্তুষ্ট, সেখানে আপনার /আপনাদের নারাজি, অখুশি বা অসন্তোষের কি কারণ থাকতে পারে?

আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়া আহমদ রেজা খাঁ বেরলভি'র ভ্রান্ত-শিরকি আকিদার বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকার জন্য (কোনো রাখঢাক ছাড়াই) তিনি "হাযির-নাযির" প্রসঙ্গে সরাসরি নিষেধ করতেন। অতএব চটকদার শ্লোগান ও মনগড়া আকিদা থেকে সাবধান!

'হাততালি' দিয়ে উৎসাহিত করার রীতি শরীয়ত সম্মত কিনা? আপন মনে উত্থিত প্রশ্নের

জবাব পেলেন কুরআন থেকেই। এটাতো কাফির-মুশরিকদের রীতি (Culture)! মক্কার মুশরিকরা বাইতুল্লায় ইবাদত মনে করে যা করতো। (দ্রঃ সূরাঃ আনফাল,আয়াত:৩৫)।

শেষ ভালো যার, সব ভালো তাঁর

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা তাঁকে 'খাতেমা বিল খাইর' নসীব করেছেন। আজীবন হাদীসে নববীর দারস প্রদান করেও তৃষ্ণা নিবারিত হয়নি তাঁর। অন্তিম সময়ে শয্যাশায়ী অবস্থায়ও 'মুসালসাল হাদীসের' খুসুসী দারস প্রদান করেছেন (আগ্রহীদের সনদও দিয়েছেন।)

আমাদের ইয়াকিন,আল্লামা হবিবুর রহমান -'রাহমানের প্রিয়পাত্র' হয়েই ঘুমিয়ে আছেন মসজিদের পাশে। দয়াময় রাব্বে কারীম তাঁকে কবুল করুন, তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দিন এবং তাঁর কবরে রহমত বর্ষণ করুন।

লেখক: প্রধান শিক্ষক, মৌলভীগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,বিশ্বনাথ, সিলেট।

যত বেশি সনদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তত বেশি মজবুত সম্পর্ক

মাওলানা এম. জুয়েল আহমাদ লতিফী

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ তাঁর যুগের মানুষের কাছে "মুহাদ্দিস ছাব হুজুর" হিসেবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ২০১২ সালে বন্ধু নিয়াজ উদ্দিনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ঐ সময় বন্ধু নিয়াজ উদ্দিন আমাদের কয়েকজনকে "মুহাদ্দিস ছাব হুজুরের" সাথে দেখা করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতে সবুজ পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় এক নূরানী চেহারা দেখেছিলাম যা এখনো চোখ বন্ধ করলে চোখের সামনে ভেসে উঠে। আমি তখন আলিম জামাতের ছাত্র। নিতান্তই ছোট মানুষ। তারপরও তিনি আমাদের সাথে আগে হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করলেন যা আমাদের সিলেটের আলিমরা সাধারণত কম করে থাকেন। ছোট বা ছাত্র বয়সি কারো সাথে সহজে মুসাফাহা করতে চান না। এরপর ইলমে দ্বীন অর্জনের গুরুত্ব ও আমাদেরকে এই ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রতি অনেক উৎসাহ দিয়েছিলেন। এই সাক্ষাতের পর আর সরাসরি সাক্ষাৎ হয়নি, যা আমার জন্য খুবই আফসোসের। এটাই ছিল মুহাদ্দিস ছাব হুজুরের সাথে আমার প্রথম ও শেষ সরাসরি সাক্ষাৎ। এর বেশ কিছুদিন পর একদিন "ইসমতে আম্বিয়া" সম্পৃক্ত একটি মাসয়ালা বুঝার জন্য বন্ধু নিয়াজের কাছ থেকে হুজুরের ফোন নম্বর সংগ্রহ করে হুজুরের কাছে ফোন দেই। অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, আমি এতো ছোট হওয়া সত্ত্বে তিনি আমাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আমার প্রশ্ন শুনলেন এবং আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এটা ছিল হুজুরের সাথে আমার প্রথম ও শেষ ফোনালাপ। শেষ বয়সে অনলাইনে হুজুর বিভিন্ন দারস দিতেন, প্রায়ই সেগুলো দূর থেকে অনলাইনে শরীক হতাম। আমি একটি নিয়ত করেছিলাম যে, সিলেটে এসে হুজুরের কাছে ইলমে হাদীসের দারস গ্রহণ করব। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো সিলেটে আসার আগে হুজুর আল্লাহর যিম্মায় চলে গেলেন। ২০২১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর যে দারস দিয়েছিলেন সেটাতে অনলাইনে শরীক হয়েছিলাম। আর এটাই যে হুজুরের কাছ থেকে আমার শেষ অনলাইন দারস গ্রহণ তখনও বুঝতে পারিনি। যাইহোক, হুজুরের সাথে আমার অতিসংক্ষিপ্ত স্মৃতি তুলে ধরার পর লেখাটির মূল বিষয়টি নিয়ে কিছু লিখতে চাই।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ইলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে সনদকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। তাঁর ভাতিজা মাওলানা জুবায়ের আহমদের কাছ থেকে শুনেছি, তিনি হুজুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপনার তো বিভিন্ন বিষয়ে সনদ আছেই, তারপরও কোনো শায়েখের সাথে সাক্ষাৎ হলে আপনি সনদ নেওয়ার চেষ্টা করেন কেন?

হুজুর উত্তর দিয়েছিলেন, যত বেশি সনদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তত মজবুত সম্পর্ক। অর্থাৎ, সনদ যদি বেশি হয় তাহলে প্রত্যেকটি সনদের মূলে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছেন। এভাবে একেকটি সনদ যেন নতুন রশির মতো করে প্রিয় নবীর সাথে সম্পর্ককে আরো মজবুত করছে। আর বাস্তবতাও তো হলো সনদ একদিকে যেমন ইলমে দ্বীনের সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ বহন করে অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পবিত্র যোগসূত্র ও পূণ্যময় নৈকট্য হাসিলের একটি নূরানী- রূহানী সেতুবন্ধনও বটে। আর এ কারণেই বিশেষ করে হাদীস বিশুদ্ধ সনদে কিতাব আকারে লিখার পরও যুগ যুগ ধরে উলামায়ে কেরাম হাদীসের বিভিন্ন কিতাব দারস দেওয়ার ক্ষেত্রে

به قال أي بالسند المتصل منا إلى الإمام

এর মাধ্যমে নিজেদের সনদ যোগ করে দেন। যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এই বরকতময় ও রূহানী সম্পর্ক বজায় থাকে।

ইলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। গৃহের ক্ষেত্রে ভিত্তির এবং দেহের ক্ষেত্রে আত্মার যতটুকু গুরুত্ব অনুরূপ ইলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে সনদের ততটুকু গুরুত্ব। ফলে, যুগে যুগে উলামায়ে কেরাম ইলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে সনদকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যেমন-

০১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রাহিমাহুল্লাহ চমৎকার উক্তি করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ (صحيح مسلم، المقدمة، ج١ ص/٤١)

অর্থাৎ, এই জ্ঞান হলো দ্বীন (ধর্মের অংশ)। কাজেই তোমরা কার নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করছো তা দেখে নেবে। (সহিহ মুসলিম, মুকাদ্দিমা, খণ্ড-১, পৃ-১৪)

০২. ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন,

مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل (شرح مسند أبي حنيفة ، ص/٦

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সনদ ব্যতীত হাদীস সন্ধান ও গ্রহণ করে সে রাতের অন্ধকারে কাঠ আহরণকারীর মত। (সে ঐ ব্যক্তির মত যে কাঠের বোঝা বহন করেছে যার মাঝে লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত সাপ তাকে দংশন করে অথচ সে টের পায় না)। (শারহু মূসনাদি আবি হানিফা, পৃ.৬)

০৩. প্রখ্যাত তাবে' তাবেয়ী ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ (صحيح مسلم، المقدمة، ج١ ص/٥١)

অর্থাৎ, হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দ্বীনের একটি অংশ। যদি হাদীস প্রমাণের জন্য সনদের প্রয়োজনীয়তা না থাকত তাহলে যার যেমন ইচ্ছা বলতে পারত। অর্থাৎ মনগড়া বিষয়ে হাদীস রচনা করত। (সহিহ মুসলিম, মুকাদ্দিমা, খণ্ড-১, পৃ-১৫) ইমাম ইবনুল মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন,

مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ أَمْرَ دِينِهِ بِلَا إِسْنَادٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَرْتَقِي السَّطْحَ بِلَا سُلَّمٍ (شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ج١ ص٢٤)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইসনাদ ছাড়া দ্বীনি বিষয়াদী অন্বেষণ করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সিঁড়ি ছাড়া ছাদে উঠতে চায়। (শারাফু আসহাবিল হাদীস, খণ্ড-১, পৃ-৪২)

০৪. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম সুফিয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন,

الإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ، فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ (شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ج١ ص٢٤)

অর্থাৎ, সনদ হলো মুমিনের হাতিয়ার যদি তাদের নিকট হাতিয়ারই না থাকে তাহলে কী দ্বারা সে যুদ্ধ করবে? (শারাফু আসহাবিল হাদীস, খণ্ড-১, পৃ-৪২)

(বর্ণনাকারীগণ যখন মিথ্যা বলা আরম্ভ করল তখন আমরা তাদের প্রতিরোধে রাবীদের ইতিহাসকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলাম।)

০৫. ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তো তাঁর সহিহ মুসলিমের মুকাদ্দিমায় একটি শিরোনামই দিয়েছেন,

بَابُ فِي أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ

অর্থাৎ, ইসনাদ/সনদ দ্বীনের একটি অংশ।

অতঃপর তিনি এই শিরোনামের অধীনে প্রথমেই লিখেন,

وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة (صحيح مسلم، المقدمة، (a/١٠/٤١

অর্থাৎ, হাদীস বর্ণনা হবে বিশ্বস্ত রাবীগণ থেকে। রাবীদের সমালোচনা শুধু জায়িযই নয় বরং ওয়াজিব। আর এ সমালোচনা হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (সহিহ মুসলিম, মুকাদ্দিমা, পৃ.১৪)

সনদের এই গুরুত্বের কারণে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ নিজে সনদকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। এমনকি তিনি নিজের সকল সনদের উপর একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটির নাম تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب উক্ত কিতাবটিতে তিনি তাঁর বিভিন্ন সনদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। যা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করছি।

ইলমে হাদীসের সনদ

ইলমে হাদীসের বিভিন্ন কিতাবের সনদ তিনি যে যে উস্তাযদের কাছ থেকে লাভ করেছেন সংক্ষেপে শুধু তাঁদের নামগুলোই উল্লেখ করছি। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের কিতাবের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উস্তাযদের নাম উল্লেখ করা হলো।

০১। শামসুল উলামা আল্লামা আবদুল লতিফ ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ

০২। শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ (গাছবাড়ি আলিয়া মাদ্‌রাসার সাবেক শায়খুল হাদীস)।

০৩। শায়খুল হাদীস মাওলানা শফিকুল হক রাহিমাহুল্লাহ (গাছবাড়ি আলিয়া মাদ্‌রাসার সাবেক শায়খুল হাদীস)।

০৪। বাহরুল উলূম আল্লামা মুহাম্মাদ হোসাইন সিলেটী রাহিমাহুল্লাহ

০৫। শায়খুল হাদীস মাওলানা মাওলানা ঈদ্রিস আহমদ রাহিমাহুল্লাহ

০৬। শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ, সিলেট আলিয়ার সাবেক মুহাদ্দিস)।

০৭। শায়খুল হাদীস মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দিদী আল-বারাকাতী রাহিমাহুল্লাহ

০৮। শায়খুল হাদীস সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ি আল-মালিকী আল-মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ

০৯। শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহের আল-কাদেরী পাকিস্তানী (মা. জি. আ.)।

১০। ফকীহুশ শাম শায়খুল হাদীস ড. আসআদ আস-সাগিরজি আল-হানাফী আদ-দিমাশকী রাহিমাহুল্লাহ

১১। সুলতানুল উলামা সায়্যিদ সালিম বিন আবদুল্লাহ শাতিরী আশ শাফিঈ আল ইয়ামানী রাহিমাহুল্লাহ

১২। শায়খ ড. সায়্যিদ আজ্জাজ আল খতীব দিমাশকী রাহিমাহুল্লাহ

ইলমে ফিকহের সনদ

ফিকহের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তবে তিনি চার মাযহাবের ইমামের সাথে তাঁর নিসবত সনদের মাধ্যমে রেখে গিয়েছেন। অর্থাৎ, ইলমে ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর উস্তায সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী আল মালিকী, শায়খ ড. মুহাম্মাদ তাহের আল-কাদেরী পাকিস্তানী হানাফী (মা. জি. আ.) এবং শায়খ সায়্যিদ সালিম বিন আবদুল্লাহ শাতিরী শাফিঈ এর কাছ থেকে ফিকহের চার ইমামেরই সনদ লাভ করেছেন।

ইলমে তাফসিরের সনদ

মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মক্কা শরীফের উস্তায মুহাদ্দিসুল হিজায সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ি আল-মালিকী আল-মাক্কী ও ইয়ামানের উস্তায সুলতানুল উলামা সায়্যিদ সালিম বিন আবদুল্লাহ শাতিরী শাফিঈ এর কাছ থেকে একাধারে তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে তাবারী ও তাফসীরে ইবনু কাসীর এর সনদ লাভ করেছেন।

ইলমে কিরাতের সনদ

মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ইলমে ক্বিরাতের সনদ লাভ করেন তাঁর পীর ও মুর্শিদ শামসুল উলামা আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ এর কাছ থেকে। ফুলতলীল ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর ইলমে ক্বিরাতের তিনটি সনদই প্রসিদ্ধ।

অন্যান্য সনদ

উল্লিখিত সনদগুলো ছাড়াও মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সনদের কিতাবের মধ্যে আরো কিছু সনদের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন - ইমাম কাজী আয়ায রাহিমাহল্লাহ এর "কিতাবুশ শিফার" সনদ লাভ করেছেন সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ, সায়্যিদ সালিম বিন আবদুল্লাহ শাতিরী শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ এবং শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহের আল-কাদেরী পাকিস্তানী (মা. জি. আ.)-এর কাছ থেকে।

'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন' সহ ইমাম গাজালী রাহিমাহুল্লাহ এর সকল কিতাব ও ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ এর 'রিয়াদুস সালিহীন'-সহ তাঁর সকল কিতাব এবং ইমাম সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ এর 'জামে' সগীর"-সহ তাঁর সকল কিতাবের সনদ লাভ করেছেন মক্কা শরীফের উস্তায মুহাদ্দিসুল হিজায সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ি আল-মালিকী আল-মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ ও সুলতানুল উলামা সায়্যিদ সালিম বিন আবদুল্লাহ শাতিরী আশ শাফিঈ আল ইয়ামানী রাহিমাহুল্লাহ এর কাছ থেকে।

ইমাম জাযুলী রাহিমাহুল্লাহ এর "দালায়িলুল খাইরাত" কিতাবের সনদ প্রথমতঃ তিনি তাঁর পীর ও মুর্শিদ শামসুল উলামা আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ এর নিকট থেকে এবং পরবর্তীতে সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী আল মালিকী ও সায়্যিদ সালিম বিন আবদুল্লাহ শাফিঈ রাহিমাহুমাল্লাহ নিকট থেকে লাভ করেছেন।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, যুগে যুগে উলামায়ে কেরামগণ যেমনিভাবে ইলমে দ্বীন বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে সনদের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন ঠিক তেমনিভাবে আমাদের মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরও ইলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে সনদকে অগ্রাধিকার দিতেন। তাই তাঁর ছাত্র হিসেবে ইলমে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে আমাদেরও খেয়াল রাখা উচিত কার কাছ থেকে আমরা এ জ্ঞান অর্জন করছি? আল্লাহ আমাদেরকে ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন কিতাব দারস দেয়া ও নেয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের শায়েখদের সনদ যোগ করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পবিত্র যোগসূত্র স্থাপন করে বরকতময় ও রূহানী সম্পর্ক বজায় রেখে ইলমে দ্বীন অর্জনের তৌফিক দান করুন। আমীন।

লেখক: আরবি প্রভাষক, হযরত শাহ জালাল দারুস সুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, সুবহানীঘাট-সিলেট।

ইলমে নববীর প্রকৃত ওয়ারিশ আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা মাহবুবুর রহীম

নাহমাদুহু ওয়ানুসল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মো. হবিবুর রহমান (মুহাদ্দিস ছাহেব) রাহিমাহুল্লাহ ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমে নববীর দিগন্তে এক মহা নিয়ামত হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ শায়খুল হাদীস, দাঈ ইলাল্লাহ ও হাদীস শাস্ত্রের রক্ষক ছিলেন। সলফে সালেহীনের গুণাবলী ধারণ করে কর্মজীবনে তিনি অকল্পনীয় দ্বীনি খিদমাত আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁকে একজন খাঁটি আশিকে রাসূল, হক্কানিয়াতের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, বাতিলের মূলে কুঠারাঘাতকারী এক মুহাক্কিক আলিম হিসেবে একবাক্যে সবাই জানতেন এবং মানতেন।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইলমের প্রকৃত ওয়ারিশ ছিলেন। যদিও তাঁর কর্মব্যাপ্তি ছিল নানা অঙ্গনে। সেগুলো থেকে ইলমে হাদীসের খিদমতের ফলাফল ছিল দিগন্তজোড়া। দেখা যায়, তাঁর অনেক ছাত্র এমনকি ছাত্রেরও ছাত্র পরবর্তীতে যুগের প্রখ্যাত শায়খুল হাদীস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তিনি ছিলেন আলিমে রব্বানী। খোদাপ্রদত্ত ইলমে লাদুনীর অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। তাঁর নসিহত ও কথাবার্তায় জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করা যেত। তাঁর নসিহত শুনলে অন্তরে ইশকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরি হতো, হৃদয়কে রাসূল প্রেমে উদ্বেলিত করতো এবং ঈমান মজবুত হতো। এর বিশেষ কারণ, তিনি স্বয়ং সর্বাবস্থায় ছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের পুরোপুরি পাবন্দ। তাঁকে প্রচলিত মসলক ও সিলসিলার বলয় থেকে ঊর্ধ্বে রেখে স্বতন্ত্র সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে স্থান দিয়েছিলেন সর্বস্তরের আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ এবং সর্ব মত ও পথের জনসাধারণ। তিনি কোনো ফতোয়া দিলে বা বয়ানে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলে সর্বস্তরের মানুষ ও আলিমে দ্বীন তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নিতেন। এই গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা অর্জন ছিল তাঁর অন্যতম বিশেষত্ব।

হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন রাহবারে মিল্লাত, হানাফি মাযহাব ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিশান বরদার। বিশেষ লক্ষণীয় যে, ইলম চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ইসলামে বিভেদ সৃষ্টিকারী অতি উৎসাহীগণের কর্মপন্থা-কর্মপদ্ধতিকে তিনি সর্বদা এড়িয়ে চলতে পছন্দ করতেন। আমলে সালেহ তথা মুসতাহাব এবং মুসতাহসান বাস্তবায়নে উদ্ভূত বিবাদ-বিশৃঙ্খলাকে সচেতনভাবে পাশ কাটিয়ে চলতেন। তিনি আজীবন মুজাদ্দিদে যামানের ভূমিকা পালন করে গেছেন। শরীয়তের নামে

সর্বপ্রকারের বাড়াবাড়িকে প্রত্যাখ্যান করতে অভ্যস্ত ছিলেন। অপরদিকে হানাফি মাযহাবে সাব্যস্ত প্রতিটি বিষয়ের তর্জ-তরিকার নিখুঁত অনুসরণ, অনুকরণ, প্রচার ও সংরক্ষণে ছিলেন শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও আধুনিকতার নামে শরীয়তের বিধিবিধানের সামান্যতম সংযোজন বিয়োজনকারীদের মূলোৎপাটন করতে তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ। আবার আলিমের ভেশ-ভুষা ও পদবি ধারণ করে ইসলামে চতুর্মুখী ফিৎনা ছড়িয়ে সহীহ আকিদাকে কলুষিত ও ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র রুখতে তিনি ছিলেন সুন্নীয়তের সাহসী সিপাহসালার।

দ্বীন ইসলামের একনিষ্ঠ খাদিম, হাদীস শাস্ত্রের জ্যোতিষ্কতুল্য দার্শনিক, আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর অনেক হক্ব রয়েছে আমাদের উপর। এর সিকিভাগও আদায় করা সম্ভব হয়নি এবং হওয়ারও নয়। তাঁকে নিয়ে এ অধমের রয়েছে অনেক মূল্যবান স্মৃতি। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এর কিছুই আজ লেখা সম্ভব হলো না। স্বতন্ত্র কোনো লেখায় এ মহান মনীষার জীবন-কর্ম এবং স্মৃতিচারণমূলক কিছু কথা সাধ্যমতো লেখবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক তাঁর মহান ওলির যাবতীয় খিদমত কবুল করুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তরক্কির সাথে দায়িম ও কামিয় রাখুন। আমাদেরকে তাঁর রূহানি ফয়েজ দান করুন, আ-মীন।

লেখক: সহকারী শিক্ষক, মানিককোনা দারুল কেরাত সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

বিনয়ী এক মহিরুহ

শাহ সুহেল আহমদ

আমার মতো অনেকেই সরাসরি ক্লাসরুমের ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু কেমন করে জানি স্বমহিমায় তিনি আমাদের সকলকে তাঁর ছাত্র করে নিয়েছিলেন। তাঁর মতো এমন নির্মোহ, নিরহংকার ও বিদ্বান মানুষের আবির্ভাব উপমহাদেশে হয়তো আর কখনও ঘটবে না।

বলছি উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, হাদীস বিশারদ আল্লামা হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর কথা। তাঁর বেশ কয়েকটি মাহফিলে বসার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই জামানার আলেমদের থেকে ভিন্ন ধাঁচের বয়ান ছিল তাঁর। মাহফিলে মনোযোগ দিলে নিশ্চিত নতুন কিছু একটা পাওয়া যেত। ছাব এমনভাবে বয়ান করতেন, মনে হতো যেন ক্লাসরুমে বসে আছি।

ছাবের কাছাকাছি যাওয়ার সৌভাগ্য খুব বেশি হয়নি। মাত্র একদিনই দীর্ঘসময় তাঁর সান্নিধ্যে কেটেছিল। আজ আর দিন-তারিখ মনে নেই। তবে সেদিন ছাবের দেয়া নসিহতগুলো আজও জীবনের পাথেয় হিসেবে রয়ে গেছে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা বিষয় নিয়ে তখন মনে এক অশান্তির দানা বাঁধছিল। মনে হলো, সরাসরি মুহাদ্দিস ছাবের সাথে দেখা করলে হয়তো সুন্দর কোনো পথ বেরিয়ে আসতে পারে।

সেক্রেটারি মহোদয়ের নামটা আজ আর মনে নেই। ফোন দিয়ে একজন সাংবাদিক হিসেবে ছাবের সাথে সাক্ষাৎ করতে অনুমতি চাইলাম। তিনি মুহাদ্দিস ছাবকে বিষয়টি জানানোর পর সাথে সাথেই ছাব অনুমতি দিয়ে দিলেন। দু'চারদিন পর দুপুরে সিলেট নগরীর একটা বাসার এড্রেস দিয়ে বললেন, "আপনি দুপুর ১১টার দিকে চলে আসবেন।" আমি তাই করলাম। বয়সে তরুণ সেক্রেটারি মহোদয় আগে থেকেই বাসার নিচে অপেক্ষায় ছিলেন। বাসায় পৌঁছার পর জানলাম, ছাব বাইরে থেকে এসেছেন। এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিছু সময় অপেক্ষা করতে হল। তবে খুব বেশি নয়।

ছোট্ট রুমের দরজার বামদিকে বিছানায় বেশ প্রসন্ন চেহারা নিয়ে ছাব বসে আছেন। নিবিষ্ট মনে কিতাবে চোখ বুলাচ্ছিলেন। পাশে বয়োবৃদ্ধ বাসার মালিক বসা।

এতো কাছ থেকে ছাবকে কোনোদিন দেখিনি। বিছানার উপর জানালা দিয়ে তখন মৃদু সূর্যের আলো এসে পড়েছে। যেন এক স্বর্গীয় সৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে আছে ঘরের চারপাশ। সালাম দিয়ে পরিচয় দিলাম।

সৌজন্যপর্ব শেষে জানতে চাইলেন কেন এসেছি। মনে সাহস এনে বললাম, 'ছাব, আমি একান্তই আপনার সাথে কথা বলতে চাই।' পাশে বসা বয়োবৃদ্ধ বাসার মালিক সাথে সাথেই চলে গেলেন। যথাযথ সম্মান আর আদব রক্ষা করে বিষয় উপস্থাপন করলাম। ছাব বেশ সময় নিয়ে ঠান্ডা গলায় কথা বলা শুরু করলেন। তাঁর কথা বলার ধরন হৃদয় ছুঁয়ে গেল। কথার মধ্যে মধুঝরা বাণী, স্বচ্ছ স্পষ্ট বাক্য, শান্তি মাধুর্য-মধুর ধ্বনিতে ছাব কথা বলে গেলেন পুরোটা সময়।

মনে হলো, মানুষের চিত্তকে প্রভাবিত করার জন্য মাধুর্যমণ্ডিত কথা বলার ধারা রপ্ত ও চর্চা করা 'দায়ি'দের জন্য অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান জটিল সমীকরণের বিশ্বে সুন্দর ও মাধুর্যমণ্ডিত কথা দ্বারাই কেবল মানুষের হৃদয় জয় করা যেতে পারে।

সেদিনের আলোচনা এতো দীর্ঘ হলো যে, দুপুর পেরিয়ে বিকেল হতো চলল। এর মধ্যে বাসার মালিক দীর্ঘ সময় পর পর অন্তত ৩/৪ বার এসে দরজায় নক করলেন। একাধিকবার দুপুরের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ছাবের দরবারে হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে আমাদের আলোচনা গড়াল দেশ, জাতি, উম্মাহের নানা দিকে। একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হয়েও কীভাবে জীবন-জগত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাঁর কাছাকাছি না গেলে হয়তো কোনোদিনই জানা হতো না। একটা অশান্ত হৃদয় প্রশান্ত হয়ে যাওয়ার অনন্য এক নজির নিয়ে সেদিন ছাব থেকে বিদায় নিলাম।

মুহাদ্দিস ছাব রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন সকলের প্রিয়, শ্রদ্ধাভাজন ও ভরসার আশ্রয়স্থল। তিনি ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। সময়মতো সঠিক ভূমিকা রাখতে কখনো দ্বিধা করেননি। তাঁর চিন্তা, চেতনা, মূল্যবোধকে দলমত নির্বিশেষে সবাই আজও সম্মান করে। সকল পরিবেশে তিনি নির্দ্বিধায় সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর দৃঢ়তা ছিল হিমালয়ের মতো অবিচল। যা সবাইকে সাহস যুগিয়েছে। তিনি দুঃসময়ে এ উম্মাহর বিবেকে পরিণত হয়ে সবার আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

সত্যভাষণে কোনো দ্বিধা ছিল না মুহাদ্দিস ছাবের। তিনি ছিলেন আমাদের আলোর বাতিঘর। বিভিন্ন সময়ে, সংকটকালে মানুষ তাঁর কাছে গিয়ে আলোর সন্ধান পেত। তাঁর মতামত ও দিক নির্দেশনা দিশাহীন জাতি, সমাজ বা ব্যক্তিকে সঠিক পথ দেখাতো। তিনি ছিলেন আমাদের ধ্রুবতারা।

লেখক: সভাপতি, প্যারিস-বাংলা প্রেসক্লাব ফ্রান্স।

An Inspiration to Millions

Abu Saeed Ali Haidar Jubair

A society needs knowledge, wisdom, research, and proper guidance to survive, sustain, and move forward to a brighter future for setting good examples for the upcoming generations. Society feels proud of its people who dedicate their lives and efforts to making it better.

In Islam, knowledge and guidance have been compared to rain. It says in an authentic hadith, after rain showers on the earth, there could be three true and real consequences;

1. The land could be fertile and absorb rain, and bring forth grass and plants.

   This type of land resembles a person whose heart is full of enthusiasm to be blessed with the knowledge of the Quran and Sunnah, the one who is pleasant in discovering rulings and mysteries from these origins and conducts research after research relating to many human issues for true guidance. Islamic Jurists who worked on jurisprudence in Islam are among them.

2. Or the land could be solid that contains water, and people benefit from that containment.

   This type of land resembles the person whose heart preserves the sacred knowledge of the Quran and Sunnah as they are without any addition, subtraction, distortion, or misinterpretation, the person who has the knowledge of Islam without having a deeper understanding. The narrators of Hadith are among them.

3. Or the land could be sandy and can neither absorb nor retain water, the land where people do not benefit.

   This type of land resembles the person whose heart is not interested in learning the sacred knowledge of Islam from the Quran and the Sunnah and does not accept guidance from these authentic sources.

Basically, these are the three types of human beings in terms of da'wah Islamiyyah. The first two types of them are the ones who exemplify their intense dedication to Islam and spiritual upliftment, and the third type exemplifies the unfortunate and non-beneficial existence of human beings.

In Islam, we have a great number of unprecedented and world-renowned Islamic scholars and spiritual callers towards Allah in different generations who dedicated their lives to learning Islam and teaching it to enlighten themselves and the Muslim communities. We did not meet the great predecessors in Islam

who passed away before we were born but they kept their great works for our benefit. Fortunately, in our lifetime, we witnessed a real example of their dedication in the life of Shaikhul Hadith Allamah Habibur Rahman, the one who had successfully scheduled his whole life for learning and teaching Islam. He was a great teacher of Islam indeed, who spread the da'wah of Islam all over the world. He had many students who are living in many countries around the world, serving the communities, carrying his noble spirit as Muhaddiths, Mufassirs, Faqihs, Adeebs, Khateebs, and teachers. May Allah elevate his rank and bless him with Jannatul Firdaws. To the best of my knowledge, he was a respected one who had a wonderful and amazing character that inspired millions of people, and still, he is inspiring us to have such good characteristics. Such a man of noble personality is an inspiration to millions of people.

In his great lifetime, we experienced his strong voice on behalf of the Islamic creed (Aqidah), worship (Ibadah), and mannerism. During the crisis, when the Muslims were about to be misguided by some evils, we saw his convincing voice that acted like a shower of rain during a drought in order to restore the right faith and strengthen it, on the contrary, it acted like a rumble of thunder on the misguided opponents. We surprisingly witnessed his choosing words of respect and wisdom while discussing the issues. That is a bright example, not only for us but also for our upcoming generations.

In his great lifetime, we saw him scheduling many gatherings for benefiting the Muslim communities, nationally and internationally, by teaching them the Qur'an and the Hadith. His blessed majlis of knowledge reminded us of what Sa'd bin Abdillah (May Allah be pleased with him) stated. He said,

"Whosoever intends to see the gatherings of the prophets, he should see the gatherings of Ulama." [Miftahu Daris Sa'adah:1/174]

His extraordinary way of explaining the Quran and the Sunnah amazed millions of audiences which caused, as a result, a river of tears around the world when he died. His terrific dedication to learning Islam reminded us of what Ibn Mas'ud (May Allah be pleased with him) stated. He said,

"A person does not become knowledgeable by birth, rather in that case, he needs to go through the learning process. [Jami'u Bayanil Ilmi Wal Fadlih:1/421]

In his great lifetime, we witnessed his mesmerizing truthfulness, sincerity, and Taqwa in serving the Muslim Ummah which he preserved significantly until the last moment of his great life. His actions for the sake of Allah reminded us of the verse of the Quran:

"Indeed, Allah only accepts from the righteous who fear Him. [Al-Maidah:27]

In his lifetime, we experienced his depth of sacred knowledge, his paramount intention of benefiting people, his respectful communication with the

communities, and his providing proper guidelines during distress and calamity. We were astonished by his politeness, being respectful and courteous towards other people, and proper judgment in any religious issues.

He is no longer with us physically, but he will be remaining in the thoughts of billions of the Muslim population spiritually for the tremendous work he had done for the Ummah.

Writer: Ustadh, Al- Misbaah Institute, Michigan, U.S.A.

হৃদয়ের মণিকোঠায় অম্লান যে স্মৃতি

মো. মাহবুবুর রহমান ফরহাদ

প্রারম্ভিকা

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ স্মৃতিস্মারক প্রকাশ হচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এবং মালিকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ! যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা দ্বীনি ইলমের মশালকে উড্ডীন রাখার জন্য তাঁর কিছু প্রিয় বান্দাহকে নির্বাচিত করেন। শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান (মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ) সেসকল নির্বাচিত বান্দাদের একজন ছিলেন। তিনি আমৃত্যু হাদীসে নববীর খিদমাত করে গেছেন। তাঁর সম্পর্কে লেখার যোগ্যতা আমি রাখি না, তারপরও আবেগ থেকে লেখার অবতারণা।

যেভাবে চিনেছি তাঁকে

ছোটবেলা বেলা থেকে আমরা যাদের গল্প শুনে বড় হয়েছি, শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর পরে যাদের গল্প ও ওয়াজ বেশি শুনা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ অন্যতম। বহু আগের কথা, বয়স আর কতো হবে? ক্লাস সিক্স বা সেভেনে পড়ি। আমার বাবা প্রায়ই বৃহস্পতিবারে বিয়ানীবাজার যেতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারি তিনি মুহাদ্দিস ছাহেবের তাফসীরে অংশগ্রহণ করতে যান। তখন মুহাদ্দিস ছাহেব প্রতি মাসের প্রথম ও শেষ বৃহস্পতিবার বিয়ানীবাজার এক মসজিদে নিয়মিত তাফসীর পেশ করতেন। তখন তাঁর নামই জানতাম না। তিনি 'মুহাদ্দিস ছাহেব' নামেই খ্যাত ছিলেন। মুহাদ্দিস ছাহেব বললে সবাই বিশেষত আল্লামা ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অনুসারীরা তাঁকেই চিনতেন। একদিন বাবাকে প্রশ্ন করেই বসলাম, উনার নাম কি মুহাদ্দিস ছাহেব? বাবা উত্তরে মুহাদ্দিস ছাহেবের পুরো নাম বললেন। অবুঝের আবার প্রশ্ন? আর কি কোনো মুহাদ্দিস নাই? বাবা বললেন, আছেন। তাহলে উনাকেই কেন মুহাদ্দিস ছাহেব বলেন? অন্য কারো নাম তো এভাবে শোনা যায় না। বাবা বলেছিলেন, সবাইকে তো ফুলতলী ছাহেব 'মুহাদ্দিস ছাহেব' বলে সম্বোধন করেন না। আল্লাহ'র ওলী যখন তাঁকে 'মুহাদ্দিস ছাহেব' বলা শুরু করলেন, তখন থেকে ঐ নামেই তিনি মানুষের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

একদা ছাহেব বাড়িতে হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী'র হাদীসের দারস চলছে। দুআয় বড় ছাহেব খুব খাসভাবে মুহাদ্দিস ছাহেবের সুস্থতার জন্য দুআ করলেন। তখন জানতে পারলাম তিনি অসুস্থ! ফজর নামায পড়ে

ছাহেব বাড়িতে নাস্তা সেরে আমরা কয়েকজন মুহাদ্দিস ছাহেবকে দেখার জন্য তাঁর বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি, চোখে কি একটা অসুবিধা হয়েছে এবং এমনভাবে ফুলে গেছে যে, তিনি এক চোখ খুলতেই পারছেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এমতাবস্থায়ও তিনি সীরাতের কিতাব পড়ছেন। চিন্তা করতে পারেন? আমরা যেখানে সুস্থ অবস্থাতেই পড়তে উদ্যমী থাকি না সেখানে তিনি এতো অসুস্থ অবস্থাতেও সীরাত ও হাদীসের কিতাব পড়ায় মশগুল। তারপরও তিনি বলছেন, এখন আর কিতাব পড়তে পারি না। মুহাদ্দিস ছাহেবকে দেখে তখন নিজের গাফিলতির বিষয় আফসোস হচ্ছিল আর মনে মনে ভাবছিলাম, তিনি শায়খুল হাদীস হবেন না তো কে হবেন?

আমি তখন বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার সিলেট মহানগরীর সভাপতির দায়িত্বে ছিলাম। মুহাদ্দিস ছাহেব তালামীযে ইসলামিয়ার পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হলেন এবং বললেন, সীরাতের কিতাব বেশি করে পড়বেন। নবীজির জীবনের বিভিন্ন দিক জানতে পারবেন। সীরাতে মুস্তফা পড়ার জন্য বিশেষভাবে বলেছিলেন। সেইদিন এমন ভাবে কথা বলেছেন যেন, আমি তাঁর পরম আত্মীয়, চিরচেনা। আল্লাহ'র ওলীরা আসলে এমনই হয়ে থাকেন।

মুহাদ্দিস ছাহেবের নবীপ্রেম ও মুরশিদপ্রেম

জীবনে অনেকবার মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর বয়ান শুনেছি। তিনি এমন সাবলীল ভাষায় নবীপ্রেমের বর্ণনা করতেন যে, তা সকলের মনকে খুব সহজে প্রভাবিত করতো। বয়ানে সীরাত থেকে নবীপ্রেমিকদের আপন প্রেমাস্পদের প্রতি ভালোবাসার ঘটনা বর্ণনার পাশাপাশি নিজের পীর ও মুরশিদ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নবীপ্রেমের বিভিন্ন ঘটনাও বর্ণনা করতেন। আমাদের গ্রামের এক মাহফিলে তিনি স্বীয় পীর ও মুরশিদ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সৈয়দপুরের রক্তদানের ঘটনা বয়ান করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে বলেই ফেললেন, ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর রক্তদান যার জন্য ছিল তাঁর কাছ থেকে এর জাযাও তিনি পেয়েছেন। অত্যন্ত জোরালো কণ্ঠে বললেন, ফুলতলী ছাহেবের এই রক্ত বৃথা যায়নি এবং 'আর ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি না' বলে থেমে গেলেন।

প্রতিবছর তালামীযে ইসলামিয়ার দুই দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ হয় ফুলতলী ছাহেব বাড়িতে। এক প্রশিক্ষণে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বিনয়ী স্বভাবের ধারাবাহিকতায় বললেন, আমরা আপনাদের মতো ছাহেব কিবলাহকে অনুসরণ করতে পারিনি। কিন্তু আমরা ছাহেব কিবলাহ'র ছায়ায় কখনো পা দেইনি! মুরশিদের প্রতি এক অনুরাগীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পরিমাণ কতটুকু হলে এমন সূক্ষ্ম বিষয়ও খেয়াল রাখতে পারেন তা বুঝতে কারো খুব কষ্ট হওয়ার কথা নয়। বহুবার দেখেছি ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কোনো নাতিও মজলিসে উপস্থিত থাকলে তিনি

দুআ করতে চাইতেন না। বলতেন, আমার মুরশিদের পরিবারের কেউ থাকা অবস্থায় আমি দুআ করতে পারবো না। যদিও তাঁরা তাঁকে দিয়েই দুআ করাতেন। অথচ ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর শুধু নাতিগণ নয়, ছাহেবজাদাগণও হুযুরকে কেমন ইহতিরাম করতেন ও ভালোবাসতেন, তা যারা দেখেছেন শুধু তারাই বলতে পারবেন। মুরশিদের প্রতি মুরিদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কেমন হওয়া প্রয়োজন, হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর জীবনে ছিলো এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

তালামীযে ইসলামিয়া আত্মার আত্মীয়

মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর কাছে যখনই আমরা তালামীযের পরিচয় নিয়ে যেতাম, খুব স্নেহের সাথে আপন করে নিতেন। তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় তদীয় জামাতা মাওলানা ইমাদ উদ্দিন সাহেবের সিলেটের বাসায় কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্থ থেকে উলামায়ে কিরাম ও ছাত্ররা আসতেন হাদীসের সনদ নিতে। একদিন তালামীযে ইসলামিয়ার সকল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও দারসে গেলে তিনি খুব আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, "আপনাদের জন্য ছাহেব কিবলাহ দুআ করেছেন এবং বলেছেন কবরে দুআ করার সুযোগ হলে আপনাদের জন্য দুআ করবেন। আপনারা বড় ভাগ্যবান। " এরপর তাঁর স্বভাবসূলভ বিনয়ের ভাষা ছিল, আমার বড় খুশ নসীব আপনাদের সকলকে একসাথে পেলাম"। মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর কাছে যাওয়া এবং তাঁর মতো দ্বীনের নকীবকে পাওয়া আমাদের জন্য মাওলার পক্ষ থেকে খাস দয়াসমূহের অন্যতম। তাঁর মুবারক স্নেহের পরশে আমরা ধন্য হয়েছিলাম এবং তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদের উপস্থিত সবাইকে দারস প্রদান করে সনদ প্রদান করেছিলেন।

তালামীযে ইসলামিয়ার কোনো প্রকাশনা তাঁর হাতে তুলে দিলে বড় খুশি হতেন এবং খাসভাবে এই কাফেলার জন্য দুআ করতেন। আল্লামা ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নাতি মাওলানা মাহমুদ হাসান চৌধুরী রায়হান ছাহেবের হাতে কিছুদিন আগে আমরা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্মারক 'সুবহে সাদিক' তুলে দিলে তিনি তা হাতে নিয়ে তাতে চুমো দিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, একবার আমি মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর হাতে তালামীযে ইসলামিয়ার মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্মারক 'সুবহে সাদিক' তুলে দিলাম। তিনি বড় খুশি হয়ে হাতে নিয়ে তাতে চুমো দিলেন। আমিও তাঁর দেয়া সেই শিক্ষার উপর আমল করলাম।

তালামীযের প্রশিক্ষণে একদিন

একবার ফুলতলী ছাহেব বাড়িতে তালামীযে ইসলামিয়ার বিশেষ প্রশিক্ষণে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কর্মজীবন বিস্তারিত আলোচনা করা ভারি মুশকিল। ছাহেব কিবলাহ একাই এক মিশন ছিলেন, যে মিশনে তালিম তরবিয়ত সবকিছু ছিল। তালিমের মাঝে কিরাত পড়ানো

ছিল। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ একসময় সিলেট শহরের শেখঘাট মসজিদে ইতিকাফ করতেন। সেখানে কিরাত পড়ার জন্য অনেক লোক সমাগম হতো। আল্লামা মনজলালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও সেখানে কিরাত পড়েছেন। পরবর্তীতে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ যখন সিদ্ধান্ত নিলেন রামাদানে আর বাহিরে যাবেন না সেবছর নিজ বাড়িতে কুরআন শিক্ষাদান শুরু করলেন। দিনের বেলা পড়াতেন, তারাবীর পরেও পড়াতেন। আবার ছাত্রদের জন্য তিনি নিজেই রান্না করতেন। একদিন রান্না করতে গিয়ে হাতের কিছু জায়গা পুড়ে গেলো। আমরা ঔষধ লাগাতে গেলে বললেন, কোনো চিকিৎসা করতে যেওনা। কুরআন পড়নেওয়ালাদের খাবার বানাতে গিয়ে আমার হাত পুড়েছে। এই চিহ্ন থাক, আমি এই চিহ্ন নিয়ে মরতে চাই। মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি বড় ভাগ্যবান যে, ফুলতলী ছাহেব (র.) যে বছর বাড়িতে কিরাত শিক্ষার খুসুসী জামাআত শুরু করলেন সেই বছর খুসুসী জামাআতে বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী, মাইজম ছাহেব ফুলতলী ও দেওয়ান আব্দুল বাছির (র.) সহ আমরা ছিলাম। নির্দিষ্ট কোনো সময় ছিল না, ছাহেব কিবলাহ যখন ডাক দিতেন তখন আমরা পড়তে যেতাম। একদিনে ৬-৭ বার ছাহেব কিবলাহ পড়াতেন ও আমাদের সবক নিতেন এবং এক রামাদানে খতম শেষ হয়। সেবছর ফুলতলী ছাহেব নির্দেশ দিলেন, কারো বাড়ি থেকে শুধু মৃত্যু সংবাদ আসলে ছুটি নতুবা খুসুসী জামাআত থেকে কোনো ছুটি নেই। তখন এই জামাআতে ছাত্র ছিলেন ১৭/১৮ জন। মুহাদ্দিস ছাহেব (র.) প্রশিক্ষণার্থীদের তরবিয়তের জন্য বললেন, এই রামাদানের ১১ দিন আগে আমার শাদী হয়েছিল এবং ছাহেব কিবলাহই আকদ পড়িয়েছেন। কিন্তু আমি কোনো ছুটি নেইনি। কারণ হুকুম ছিল, মৃত্যু সংবাদ ব্যতিত কোনো ছুটি নেই। আল্লাহ আমাকে এই বুঝ দিয়ে দিলেন যে, এটা আমার প্রথম পরীক্ষা! মুহাদ্দিস ছাহেব বলেন, হঠাৎ একদিন এক আজিব স্বপ্ন দেখে আমিতো পেরেশান। ছাহেব কিবলাহ'র কাছে গেলে বলার আগেই তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কিছু বলতে চাচ্ছো? তখন আমি আমার স্বপ্ন বললাম। ছাহেব কিবলাহ আমায় তাঁর উস্তায গণীপুরী ছাহেব এর কাছে যাওয়ার কথা নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তোমার এই স্বপ্ন বলার জায়গা আর কোথায়ও দেখছি না। আর দেখা করে বাড়িতে চলে যাবে এবং পরেরদিন ক্লাসে এসে উপস্থিত হবে। আমি রমাদান মাসে এই একরাতই বাড়িতে থাকলাম। খুসুসী দারস শেষে নিজ হাতে আমাদেরকে সনদ দিলেন। শুধু কিরাত নয়; ইছামতি ও সৎপুর মাদ্‌রাসায় এবং ছাহেব বাড়িতে ফুলতলী ছাহেব (র.) এর হাদীসের দারসেও আমি পড়েছি। আমাদের খুশ নসীব, ছাহেব কিবলাহ'র কাছ থেকে ইলমে কিরাত, ইলমে হাদীস, ইলমে তরীকতের সনদ গ্রহণ করেছি। আমাদের সনদ ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মাধ্যমে মুত্তাসিল সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

প্রশিক্ষণে যখন আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সংগ্রামী

জীবন নিয়ে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ আলোচনা করছিলেন তখন আমরা লক্ষ্য করলাম তাঁর চেহারা এমনকি কথা বলার ধরণ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে গেল। যেন আল্লামা ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সংগ্রামী চেতনা মুহাদ্দিস ছাহেব এর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। শতশত প্রশিক্ষণার্থী সমস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলেন এবং স্লোগানমুখর হয়ে গেলো খানকা ঘর। পরে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ বললেন, এই নিশান আপনাদেরকেই বহন করতে হবে। প্রথমে ব্যক্তি জীবনে নিজেকে সংশোধন করতে হবে, এই দাওয়াহ অন্য ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এই কথাগুলি স্মরণ হলে এখনো মনে হয় আমি সেই প্রশিক্ষণে বসে আছি আর তাঁর নূরানী চেহারার দিকে থাকিয়ে আছি এবং তিনি আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। সেদিনের সেই প্রশিক্ষণ হৃদয়ের মণিকোঠায় অম্লান হয়ে থাকবে।

মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর ভাষায় আল্লামা ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'এক মিশন' হলে তিনি তো সেই মিশনের এক সুদৃঢ় স্তম্ভ। তাঁর দিকে তাকালে মনে হতো, সিরাজাম মুনীরা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরানী পরশ যেন তাঁর চেহারায় লেগে আছে এবং সেই নূরানী পরশ উজ্জ্বল আভারূপে চেহারার মধ্যে চকচক করছে।

শেষকথা

হযরত আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর মতো মনীষী আর আসবেন না। তাঁর রেখে যাওয়া শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের প্রেরণার উৎস। তিনি যে শিক্ষা ও আদর্শ রেখে গেছেন তা আপন জীবনে বাস্তবায়ন তাঁর রূহানি ফয়েয হাসিলের মাধ্যম হবে বলে আশা রাখি। আল্লাহ তা'লা হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর মাকাম আরো বুলন্দ করুন এবং তাঁর রূহানী ফয়েয লাভে আমাদের ধন্য করুন।

লেখক: কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া।

জ্ঞান আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র বিদায় নিলেন

ইকবাল হোসেন

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ কয়েক গ্রন্থিতে আমি অধমের সাথে যুক্ত হয়ে ক্ষণকালের অস্থায়ী এই জীবনকে ধন্য করেছেন। আজকে তিনি নেই, কিন্তু আরবী একটা প্রবাদের সহজ বাংলা অনুবাদ হলো - 'উম্মাহর আলেমগণ কখনো মৃত্যুবরণ করেন না"। বাস্তবিকই আমাদের জীবনের প্রতিটি অনুভুতিতে তাঁর উপস্থিতি সর্বদা বিরাজমান আছে। এখনো ধুমায়িত চায়ের কাপের আড্ডায় পবিত্রতার আবহ নেমে আসে যখন কেউ উচ্চারণ করে 'রারাই'র মুহাদ্দিস ছাহেবকে বলতে শুনেছি' বা তাঁর পবিত্রতা, উচ্চ শান সূচক কোন আলোচনা শুরু করে। কালের হিসেবে তাঁর প্রয়াণের দু'বছর পরেও তিনি ইতিহাসে মিশে যান নি বরং জীবন্ত হয়ে উঠছেন দিন থেকে দিন।

আমার মরহুম আব্বা হবিবপুর কেশবপুর ফাযিল মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা মুহিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তায এবং পরম শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন মুহাদ্দিস ছাহেব। 'নানা' সম্বোধনের মাধ্যমেই আমরা প্রাপ্য 'আদর' এবং 'দোয়া' পূর্ণভাবেই আদায় করে নিয়েছি বলে আমার বিশ্বাস। পাহাড়সম জ্ঞানের অধিকারী যার শৃংখে কখনোই আরোহন করা যাবে না, সূর্যের ন্যায় দীপ্ত ব্যক্তিত্বের আলোকরশ্মি, যার দিকে চোখ তুলে থাকানো যাবে না, সমুদ্রের মত গভীর মন যাতে অবগাহন করা প্রায় অসম্ভব, এমন চিন্তাভাবনার দরুন তাঁকে কাছে পেয়েও কখনো জানা হয় নি। আমরা তাঁর কথা কইতাম ঠিকই কিন্তু তাঁর কণ্ঠে সুর মিলিয়ে গাইতে পারতাম না, যখন মনের দিক থেকে তাঁকে জানার কিছুটা প্রস্তুতি নিতে শুরু করি ঠিক তখনই মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁকে অভিবাদন জানাতে শুরু করে দেন।

সকালে প্রাঃতভ্রমণে বের হওয়ার সময় তিনি খোশগল্পে আমাদেরকে বিভিন্ন 'কিসসা' শুনাতেন। এরমধ্যে ছিল তাঁর দামেশক সফরের বিভিন্ন স্মৃতিচারণমূলক গল্প। কীভাবে দামেশকের ঐতিহাসিক উমাইয়া মসজিদ বানানো হয়েছিল, যেখানে জড়িয়ে আছে উম্মাহর বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জানা অজানা সোনালী ইতিহাস। পূবাল হাওয়ায় সিক্ত হয়ে একবার গুন গুনিয়ে গাইলেন একটি উর্দু কাসীদা।

'আয় বাদে সাবাহ উনকে রওযা কি হাওয়া লে আ,
ছরকার কি নাগরি ছে ওহ খাকে শিফা লে আ।'

গাইতে গাইতে বললেন, ফুলতলী ছাহেবের নিকট এই কাসীদা প্রায়ই তিনি পাঠ করতেন। বড় ছাহেব পাশ থেকে শুনতেন এবং আকুল হয়ে কান্নাকাটি করতেন। আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আহা! কেউ যদি এই কাসীদা গেয়ে শুনাতে

পারতো? সত্যিকার অর্থেই আমাদের মধ্যে এমন কেউই ছিলনা যে গাইতে পারে। তখন ইউটিউবের আশ্রয় নিয়ে তাঁকে পূর্ণ সংগীতটি শুনিয়ে ছিলাম। বহুদিন পর প্রিয় কাসিদা শুনে সেদিন আপনমনে হারিয়ে গিয়েছিলেন। আরেকদিন তাঁকে শুনিয়েছিলাম আলা হযরত বেরেলী'র 'লাম ইয়াতী নাযীরোকা ফি নাযারি' কাসীদা। শুনেই বলেছিলেন, আলা হযরতের এই সমস্ত না'ত ছিল ইশকে টইটুম্বুর এবং বড়ই হৃদয়গ্রাহী। এরপর থেকেই অসুস্থতার সময়টায় তাঁকে শুনিয়ে যেতাম রাসুলে পাকের শানে লিখিত বিভিন্ন কালাম। বরাবরের মত তাঁর চোখের কোণে অশ্রু অথবা চেহারার উজ্জ্বল্য ঠিকরে পড়ত।

তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিল বাদ মাগরিব সূরা ওয়াকিয়া, তেত্রিশ আয়াত, দরুদে তাজ ইত্যাদির পাঠ করা। অসুস্থতা বাড়লে নিজের অক্ষমতার কারণে অপরকে দিয়ে তেলাওয়াত করাতেন। শুক্রবারে সূরা কাহফ তেলাওয়াত, মাগরিবের আগে বুরদা শরীফ আবৃত্তি ইত্যাদি তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস ছিলো এবং সবাইকে এসব আমলের তাগাদাও দিতেন।

প্রবল অসুস্থতার মধ্যে খেদমতে থাকার সুবাদে 'নানা ছাহেব'কে আমি বহু কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাই। বহু সাক্ষাৎ প্রার্থীকে রুঢ় মেজাজ প্রদর্শন করে সরিয়ে দেয়া তখন আমার রুটিনে পরিণত হয়েছিল। কেউ কেউ এসেই দিব্যি ডাক্তারে পরিণত হয়ে নানাকে বিভিন্ন উপদেশ দেওয়া শুরু করতেন, আবার কেউ মাতবরি শুরু করে দিতেন। এসকল অপ্রীতিকর কার্যকলাপ থেকে নানাকে হেফাজত রাখতেই আমাকে কট্টরভাষী হতে হয়েছে। আজ অকুণ্ঠ চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করছি তাঁদের প্রতি, যারা নানার প্রতি অকৃত্রিম মুহাব্বাতের কারণেই এসেছিলেন এক নজর দেখতে, কিন্তু অধমের বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে বিফল মনোরথে।

পূর্বেই ব্যক্ত করেছি, অধম কখনো তাঁর সামনে পড়ালেখা বা ইলমী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম না। অজানা এক ভয় মনকে সংকুচিত করে রাখতো। তবে নানা'র জবান থেকে শুনতেই থাকতাম ইলমী গল্প। একবার আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত একজন ছাত্র সাক্ষাত করতে এলেন। নানা সেই ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী পড়ানো হয়? উত্তরে ঐ ছাত্র ভাই তাঁর সাবজেক্টগুলোর ফিরিস্তি দেয়া শুরু করেন। উনি বলেন, আমাদের রয়েছে ইসলামী ফিলোসফি, ইলমে নফস বা সাইকোলজি, ইসলামী সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদি। এগুলো শুনে নানা ছাহেব বললেন, এই ছোটখাট 'মোল্লা' ইলমে নাফস কিছুটা হলেও পড়েছি। দুবাই চাকুরিরত থাকতে ইলমে নাফস পড়ার সুযোগ হয়। এই শাস্ত্র পড়ার কারণে মনোবিদ্যায় এতটা পারঙ্গম ছিলাম যে, ছাত্রদের সামনে দাঁড়ালেই বুঝে ফেলতাম তাদের কী চাহিদা বা কী মানসিকতা ইত্যাদি। ইসলামী ফিলোসফি আমাদের দেশে সাধারণতঃ চর্চা হয় না, তবে আমি ছাত্রজীবনে মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) পড়ার সময়

ফিলোসফি কিছুটা পড়েছি। ফিলোসফি বা দর্শন পাঠকারী কখনোই অনুদার থাকতে পারে না, অথবা আমিই সঠিক বা শ্রেষ্ঠ এমনটা দাবী করতেও পারবে কিনা সন্দেহ আছে। ইসলামি সামাজ বিজ্ঞান বিষয়ে ইমাম মাওয়ার্দী'র বই পড়বেন, যেহেন পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পাশ থেকে এক নিবিষ্টে শুনেই যাচ্ছিলাম তাঁদের মধ্যকার কথোপকথন। শুনতে শুনতে আক্ষরিক অর্থেই বিস্ময় আমাকে গ্রাস করেছিলো। সেদিনই যতসামান্য অনুধাবন করেছিলাম, জ্ঞান রাজ্যের প্রত্যেক শাখায় নানা ছাহেবের কী অবাধ বিচরণ ছিলো। এটা দাবি করতে আমি কখোনই লজ্জাবোধ করব না, বরং দ্ব্যর্থ কণ্ঠে সকল রথী মহারথীকে এই সংবাদ আমি অনন্তকাল পর্যন্ত দিতেই থাকব, আমার নানা জ্ঞান আকাশের সুরাইয়া তারকায় পৌঁছেছিলেন।

লেখক : কামিল তাফসীর ফল প্রার্থী, সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা।

হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সান্নিধ্যে

হাফিয মাওলানা মোহাম্মদ শামছুদ্দীন সাবেল

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلوٰة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، وعلى اٰله واصحابه اجمعين، امابعد-

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা যুগে যুগে যে মহান ওলী আল্লাহ এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর, আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

আল্লাহপাকের দরবারে লাখো কোটি শুকর যে, তিনি তাঁর হাবীবে পাকের উসিলায় আমি অধমকে এই মাকবুল ওলীর সুহবতে থেকে নামে মাত্র হলেও কিছু দিন খিদমাত করার সুযোগ দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

একই গ্রামে পার্শ্ববর্তী বাড়ি হওয়ায় সেই বাল্যকাল থেকেই হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ'র সাথে পরিচয়। তিনি আমার আব্বার মহান উস্তায এবং গ্রামের সম্পর্কে চাচা। এই সুবাদে আমরা তাঁকে দাদা ছাব বলেই ডাকতাম। ২০০৫ সালে উনার প্রতিষ্ঠিত থানাবাজার হাবিবিয়া হিফযুল কুরআন মাদ্‌রাসা থেকে হিফয সম্পন্ন করে দাওরা শুনানোর পর ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হই।

২০০৭ অথবা ২০০৮ সালের কোন একদিন হযরত মাওলানা মাশুক আহমদ মামদরচকী হুজুরকে নিয়ে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর লাইব্রেরি রুমে বসে আলাপ করছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম। দাদা ছাহেব বললেন, সাবেল যাও দাদীর কাছ থেকে চা নিয়ে এসো। হাফিয হলে তো তুমি হয়েছো, দাদীর কাছে এখনও সাবেল রয়ে গেছো। এভাবেই তিনি আমাকে নাতির মত স্নেহ করতেন।

২০১২ সালে প্রথম বার হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর সফর সঙ্গী হয়ে কয়েকটি মাহফিলে যাওয়ার সুযোগ হয়। পরবর্তীতে একটি স্বপ্ন দেখে উনাকে বললে তিনি আমার আব্বা আম্মার অনুমতি নিয়ে উনার খিদমাতে থাকার জন্য বললেন। একদিন রাতের বেলা আমার আম্মা দাদা ছাবকে দেখতে গেলেন। তিনি আমার আম্মাকে বলেন, মাগো! আমি তোমার ছেলেকে নিয়ে নিয়েছি। আম্মা বিনীতভাবে বলেন, আব্বা! এ তো আপনার নাতি। সে আপনার খিদমতেই থাকবে। এরপর থেকে দাদা ছাহেবের খিদমতে সার্বক্ষণিক থাকার (সেক্রেটারি) সুযোগ লাভ করি।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর অভ্যাস ছিল বাড়ি থেকে সফরে বের হলে গাড়িতে বসেই তাসবীহ হাতে নিতেন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা বলতেন না, তাসবীহ নিয়েই মশগুল থাকতেন। বেশিরভাগ সময় তিনি দুরূদ শরীফ পাঠ করতেন। গাড়িতে আমি এবং অন্য কেউ থাকলে সবাইকে তাগিদ দিয়ে বলতেন, অযথা সময় নষ্ট না করে দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। একদিন বাড়ি থেকে রওয়ানা দিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর ইন্না লিল্লাহ ইন্না লিল্লাহ বলতে লাগলেন। আমি একটু অবাক হয়ে ভাবছি কারো মৃত্যু সংবাদ তো শুনলাম না। তবে কেনো তিনি বারবার ইন্না লিল্লাহ বলছেন? আদবের সাথে জানার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। বললেন, আমি ভুল বশতঃ তাসবীহ বাড়িতে রেখে এসেছি। মনে হচ্ছিলো তাসবীহ ভুলে যাওয়ার কারণে তিনি খুবই ব্যথিত হয়েছেন। পরে দাদীকে ফোন দিয়ে তাসবীহখানা যত্ন করে রাখতে বলে দিলেন।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ সব সময় অজু সহকারে থাকতেন। বাড়ি থেকে অজু সহ বের হতেন, দীর্ঘ সফর শেষেও তাঁর অজু অটুট থাকতো। অন্যদেরকেও তিনি অজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করতে নির্দেশ দিতেন। বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর সময় তিনি অজু সহকারে ঘুমাতেন। অন্যদেরকেও অজু সহকারে ঘুমাতে উৎসাহিত করতেন। অজু সহ ঘুমালে কী উপকার হয় বলতেন। বিশেষভাবে বলতেন, যদি এই ঘুম জীবনের শেষ ঘুম হয় তবে অন্ততঃ অজু নিয়ে যেতে পারবে।

মিসওয়াক করা তাঁর খুবই পছন্দনীয় একটি দায়েমী আমল ছিল। অন্যদেরকেও মিসওয়াক ব্যবহারে জোর তাগিদ দিতেন। এমনকি তিনি শেষ বয়সে বিছানায় শায়িত অবস্থায় তাঁর মিসওয়াকটি ভিজিয়ে চিবিয়ে নরম করে দিতে আমাকে হুকুম করলেন। আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। কীভাবে আমি তাঁর মিসওয়াক চিবিয়ে দেবো। বিষয়টি নিয়ে উনার ছোট ছাহেবজাদা মাওলানা আবদুল বাকী খালেদ চাচার সাথে কথা বললাম। তিনি বললেন, আব্বা যখন হুকুম করেছেন তুমি চিবিয়ে দিতে পারো। এটি ছিল সুন্নাতে রাসূল মিসওয়াকের প্রতি তাঁর ভালোবাসার নমুনা।

আউয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় করা ছিল উনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়া মাত্র তিনি নামায আদায়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন। সফরে গাড়িতে থাকা অবস্থায় নামাযের সময় ঘনিয়ে এলে আগে থেকে আমাদেরকে বলতেন, অমুক স্থানের মসজিদে নামায আদায় করে নেবো। চরম অসুস্থ অবস্থায়ও নামাযের সময় হয়ে এলে নামায আদায়ের জন্য ছটফট শুরু করতেন।

আমি খিদমতে থাকা অবস্থায় উনার দুইজন ড্রাইভারের সময় আমি পেয়েছি। ফয়েজ ভাই ও মুসলিম উদ্দিন ভাই। কখনো তিনি আমাকে এবং তাদের কাউকে মনে কষ্ট আসতে পারে এমন কোন কথা বলেননি। সফরে কারো বাড়িতে রাত্রিযাপন করলে তিনি আমার এবং ড্রাইভারের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে মেজবানকে বলে দিতেন।

ইন্তেকালের পূর্বে কোন কোন সময় কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি আমাকে বলতেন, ভাইরে! আমি মারা যাওয়ার পর কি হযরত ছাহেব কিবলাকে পাবো? যদি না পাই তবে বরযখের লম্বা জীবন একা একা কীভাবে থাকবো? আমি বলতাম, দাদা! আপনি তাঁকে পাবেন ইনশাআল্লাহ। তখন বলতেন, ছাহেব কিবলাহ তো মদীনা শরীফে আছেন, আমি উনাকে কীভাবে পাবো।

আমি যে কয় বছর উনার খিদমতে ছিলাম কাছে থেকে দেখেছি, তিনি কোন একটি কাজও সুন্নতের খেলাফ করতেন না। তিনি জীবনের দীর্ঘ সময় হাদীস শরীফের দারস তাদরীসে যেমন ব্যয় করেছেন ঠিক তেমনি ব্যক্তি জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে সুন্নতের অনুসরণ করে গেছেন।

আল্লাহপাক যেনো তাঁর প্রিয় হাবীবের হাদীস শরীফের এ মহান খাদিমকে জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দা করে রাখেন। তাঁর রূহানী দুআ এবং ফয়েজ আমাদের উপর জারি রাখেন। আমীন।

লেখক: শায়খুল ছাহেবের শেষ জীবনের খাদিম (সেক্রেটারি)।

একজন কিংবদন্তির সান্নিধ্যে

কামারুম মুনির তানজীব

একজন আল্লাহওয়ালার সাহচর্য যেকোন মানুষের জীবনকে নিমিষে বদলে দিতে পারে। আল্লাহওয়ালাগণের সাহচর্যের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রখ্যাত ফকীহ ও সুফি শায়খ আবু মাদীন তিলমিসানী (৫০৯-৫৯৪ হি.) রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا

هم السلاطين والسادات والأمرا

অর্থাৎ, জীবনের তাৎপর্য নিহিত আছে আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্যে।

তাঁরা হলেন এ পৃথিবীর মুকুটহীন সম্রাট।

স্বভাবগত আড়ষ্টতার কারণে সোহবতের তাৎপর্য জানা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত মানুষদের কাছে খুব বেশি যাওয়া হতো না। তবে কিছু ব্যক্তির রূহানী প্রভাব, চারিত্রিক প্রভাব, জ্ঞানগত প্রভাব এতো বেশি যে, আমার মতো মুখচোরা মানুষসহ যে কারো জন্যই তাদের সাক্ষাৎ লাভ অত্যন্ত লোভনীয়। শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যার সোহবত লাভ ছিল সবার জন্যই সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি ছিলেন স্বভাবে, ইলমে, বিনয়ে, যুহদে সালাফদের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। আমার সহপাঠী মাসউদ আহমদ হুজুরের আত্মীয় হবার দরুণ দারুন্নাজাতে অনার্স ১ম বর্ষে অধ্যয়নকালীন অবস্থায় হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ এর আশা ব্যক্ত করলাম। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হবার সুবাদে তিনিও খুশি মনে সায় দিলেন। ২০১৬ সালে কুরবানি ঈদের পরে হুজুর একদিন সময় দিলেন। আমরা দুই বন্ধু নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হলাম। আশ্চর্যের বিষয় হলো হুজুর আমাদেরকে রিসিভ করতে আগেই উপস্থিত! যেন বড় কোনো অতিথি এসেছেন! সালাম পরিচয় শেষে হুজুর বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। সর্বপ্রথম যে বিষয়টায় ধাক্কা খেলাম তা হলো সম্বোধন! হুজুর আমি অধমকে আপনি বলে সম্বোধন করছেন। বিশ বছরের তরুণের জন্য আশ্চর্যজনক বৈকি! তখন মনে পড়ল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস-

من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। সে নিজেকে নিজে ছোট মনে করে কিন্তু মানুষের চোখে খুবই মহান ও সম্মানিত হয়।

হুজুর ছিলেন বিনয়ের বাস্তব নমুনা। অতিথি আপ্যায়নের পর বিভিন্ন ইলমী বিষয়ে

আলোকপাত করতে লাগলেন। যা আমাদের সামনে অনেক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে লাগলা। এক পর্যায়ে হুজুর আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জন্য সূর্য প্রত্যাবর্তনের হাদীস নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। হাফেয ইবনে তাইমিয়া এটাকে বাতিল বলেছেন, আর বিপরীতে ইমাম তাহাবী এই হাদীস সাব্যস্ত করেছেন তা বললেন। আমি অধম তখন বললাম. হুজুর শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মোল্লা আলী ক্বারীর المصنوع في معرفة الحديث الموضوع কিতাবের টীকায় এ হাদীসের পক্ষের এবং বিপক্ষের উলামায়ে কেরামদের নাম উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে হুজুর সহপাঠী মাসউদ আহমদকে আলমারি থেকে কিতাব বের করার নির্দেশ দিলেন। কিতাব বের করে পরিপূর্ণ টীকা পড়ে আমাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। যা আমার তরুণ মনে খুব প্রভাব ফেলেছিল। যেখানে আমরা জাহেল হওয়া সত্ত্বেও কৃত্রিমতার চাদর দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে রেখে জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত থাকি, সেখানে হুজুরের মতো বিশ্ববিখ্যাত আলিমের এ ধরণের সুলুক ছিল আমি অধমের জন্য বিরাট শিক্ষা। একজন বক্তার বর্ণিত হাদীস নিয়ে হুজুরকে জিজ্ঞাসা করলাম। হুজুর বললেন, 'হাদীসটি শুনছেন কোথায়? বললাম, "হুজুর দারুননাজাতের পাশে এক মসজিদে'। বললেন, "তাহলে তো দারুননাজতে জিজ্ঞেস করাই উচিত ছিল'। আমরা উত্তর দিলাম- 'হুজুর, আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই'। হুজুর বললেন, "আমার মুতালাআয় এমন কোন হাদীস জানা নেই'। হুজুরের ইহতিয়াত (সচেতনতা) ছিল লক্ষণীয়। সরাসরি বলে দেননি যে বাতিল, বললেন 'আমার মুতাআলায় নেই'। এরকম বহু আলোচনা এবং পর্যালোচনা শুনে হুজুরের নিকট থেকে সেইদিনের জন্য বিদায় নেই।

হুজুরের সোহবত এমন নিয়ামত যাতে পিপাসা আরো বৃদ্ধি পেত। এছাড়াও হুজুরের কাছ থেকে মুসালসাল হাদীসের সনদ নেয়ার ইচ্ছা আমার অনেক দিনের। তাই পরবর্তীতে বড় ভাই মাওলানা নিয়াজ উদ্দিন এর মাধ্যমে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করি। যথারীতি হুজুরের বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে দেখি হুজুর আগেই উপস্থিত। আমরা একটু বিলম্ব করলেও হুজুর নিজের দেয়া সময় অনুযায়ী উপস্থিত। তারপর হুজুর মুসালসাল হাদীস নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে দারস আরম্ভ করলেন। প্রত্যেক হাদীস পাঠের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জরুরি বিষয় তথা লুগাত ও সনদ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء এখানে جواب امر এর ইবারত নিয়ে আলোচনা করলেন। একটি হাদীসের সনদের দুর্বলতা নিয়ে বিশ্লেষণ করে আমাদেরকে মুসালসালের সনদ দিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল। ভাগ্য ছিল আমাদের সুপ্রসন্ন। হুজুর আমাদেরকে বুখারী শরীফের সনদ দিয়ে দিলেন। হুজুর আমাদেরকে পড়তে আদেশ দিলেন, আমাদের পড়া শেষ হবার পরে হুজুর বরকত স্বরূপ নিজে আমাদেরকে কিছু হাদীস পড়ে শুনালেন। যা এ জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মৃতি।

শেষ ইলমি মজলিসে হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ হয় হুজুরের মেয়ের বাসা সিলেটে। হুজুর সেখানে আবারও সকলের সাথে মুসালসাল হাদীসের ইজাযাত দিলেন। কিছু বিষয় নিয়ে আমার মনে তখন খটকা কাজ করছিল। বিশেষ করে মুশাজরাতুস সাহাবা (সাহাবায়ে কেরামগণের পারস্পারিক দ্বন্দ্ব) নিয়ে পড়াশোনা করার কারণে আমার অন্তরে অনেক বিষয় নিয়ে দ্বিধা তৈরি হয়েছিল। দারস শেষ করেই হুজুর কিছু উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। বললেন, 'সাহাবায়ে কেরামের বিষয়ে আপনারা সাবধান থাকবেন'। আমি মোটামুটি হতভম্ব হয়ে গেলাম। তারপর হুজুরকে প্রশ্ন করলাম, "হুজুর কিছু বর্ণনা পড়লে আমার মনে এসব বিষয় নিয়ে কিছু খারাপ ধারণা তৈরি হয়'। হুজুর বললেন, 'শুনেন, সুপ্রিম কোর্ট থেকে যাদের রায় ঘোষণা করা হয়েছে তাদের ব্যাপারে আর পঞ্চায়েত বসানোর কোন প্রয়োজন নেই'। যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সাহাবায়ে কেরামের জন্য সন্তুষ্টির ঘোষণা দেয়া হয়েছে এর পরে আমাদের জন্য আর নতুন রায় কায়েম করা ঠিক না'। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে দুটি ঘটনা বলে সোহবতের তাৎপর্য বর্ণনা করলেন। উপদেশ দিলেন সবসময় যেন আলিমদের সোহবতে থাকি। ইন্তেকালের আগে অসুস্থ অবস্থায় যখন শেষ বার বাড়িতে দেখতে গেলাম, দেখলাম হুজুর বিছানায় শুয়ে আছেন। কথা বলতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। তারপরও আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, "আপনাদের কষ্ট হচ্ছে, একটু বিশ্রাম নিন'। চরম অসুস্থ অবস্থায়ও আমাদের সুবিধার কথা চিন্তা করছেন। বিনয়, সময়ানুবর্তিতা, ইলমের প্রতি আগ্রহ, ব্যবহার সবকিছু মিলিয়ে তিনি ছিলেন আমাদের যুগে সালাফের উজ্জ্বল নমুনা। আমাদের প্রজন্মের সৌভাগ্য যে, তাঁর মত একজনকে আমরা পেয়েছিলাম।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে হুজুরের কর্মমুখর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের জীবন আলোকিত করার তৌফিক দান করুন। আমিন

লেখক : শিক্ষার্থী-ধর্মতত্ত্ব অনুষদ, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর।

In Honore – Allamah Habibur Rahman

(رَحِمَهُ ٱللَّهُ)

Musleh Uddin

My lifelong journey with the Quran began at the hands of my teachers' teacher, Muhaddis Sab. It was a cold winter's weekend in the year 1997 and I, no older than six or seven, nervously but eagerly awaited his arrival in our small flat in East London. I had been deemed by my father to be sufficiently competent in the recitation of Juzz 'Amma and was now ready to graduate my sabaq to the entirety of the Holy Quran. I struggled in my youthful age to understand why my father insisted that a special guest of the stature of Muhaddis Sab was needed for this moment since I had been taught in-house up to this point. With the benefit of hindsight, I could not be more grateful or blessed that this deeply personal and seminal moment was under his guided hand. He arrived, he sat, he ate, and he did all the things a guest does at one's house, but he honoured us with this presence more-so than we did with our hosting of his company. Above all else, as he gave me my sabaq, he imparted wisdom on the importance of a lifelong journey with the Quran which was beyond my comprehension at that age, but the barakah I received from his teaching of Surah Al-Fatiha which flowed through to the opening verses of Surah Al-Baqarah are blessings I benefit from to this day. There is no way of explaining such barakah, still less am I able to prove it, but that is rendered irrelevant by the unflinching affinity which, Alhamdulillah, I have managed to retain with the Quran to this day. That is, in no small part, down to his inspiration.

I travelled with him many times whenever he was in London as my father used to often drive him to various places. I will never forget Ramadan in 2002 when he was in London for that most blessed month and would frequent our masjid for taraweeh salah. What an honour it was to stand with him for the night prayer in the most blessed of months, night after night.

Muhaddis Sab, quite rightly, is known for his khidmah in teaching Hadith. But he had a deep love and sense of duty for the Quran in equal measure and was well-known for the affection that he used to show to the huffaz of the Quran for no reason other than the sake of Allah and their association with the book of Allah. His tafsir of the Quran was, without hyperbole, unrivalled in the Bengali language as was his ability to bring together his searing intellect, his penetrating knowledge of the Arabic language, his mastery of usool, Hadith and Quran, all in a beautifully elegant and articulate prose which was accessible to the laity in Bengali. His khidmah of the Quran is far too great to enumerate or even begin to describe here in any detail. But suffice to say that among his greatest qualities, was his ability to inspire people, to spark within them a love for the

Deen, the Sunnah and the Quran, something which he did to countless people across the world, especially in the sub-continent. He touched me in my Quran, planted a seed of love for it and reliance upon it, a debt which I have incurred and can never repay.

This many years later, I now understand the importance of why my father wanted his presence on that cold winter's night in 1997. Some things are best left unsaid, and others are not capable of being said. His influence on me is of the latter. His loss is truly monumental, and I miss his presence more than I can say. May Allah elevate his rank in the hereafter and reunite us with him in the best of circumstances in the hereafter.

As for us orphans who he has left behind in this world, in his passing, the world has lost some of its enchantment.

Musleh Uddin is a lawyer by profession, hifz teacher, and khateeb of Poplar Central Mosque in London. Above all, he is a long-standing student of Shaykhul Hadith Allamah Habibur Rahman (may Allah be pleased with him).

আমার দেখা দাদা ছাহেব কিবলাহ

মাওলানা এ টি এম শাকের

আমাদের মরহুম আব্বাজানের মুর্শিদ তিনি। একারণেই আমরা সকল ভাই বোন তাঁকে দাদা ছাহেব বলেই সম্বোধন করতাম। বলছিলাম উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, উস্তাযুল আসাতিযা, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কথা। আল্লাহপাকের দরবারে হাজার শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে এই মহান আলিমে রাব্বানী ওলীয়ে কামিলের কিছু খেদমত করার সুযোগ দিয়েছিলেন। আমি প্রায় দেড় বছর উনার খেদমতে কাটিয়েছিলাম। বিশেষ করে আমাদের বাড়িতে উনার আসা যাওয়া বেশি ছিল বিধায় দীর্ঘদিন উনার সোহবতে ছিলাম। আমাদের পরিবারের সাথে উনার আন্তরিকতা ছিল খুব বেশি। আমি অধম যতদিন দাদা ছাহেবের সোহবতে ছিলাম আমার মনে হয় না যে এমন কোনো মুহূর্ত আছে যেখানে দাদা ছাহেবের কথা থেকে ইলমি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো কথাবার্তা হতো। দাদা ছাহেব আমাকে বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেন। ২০০৯ সালের কোন একদিন আমাদের বাড়িতে দাদা ছাহেবকে ঘিরে বেশ কয়েকজন আলিম বসা। আমি কাছে গিয়ে বললাম, দাদা ছাব আপনার গরম পানি রেডি। তিনি মুচকি হেসে বললেন, ও ভাইয়্য পানির হরফে ইল্লত বাদ দিলে ওটা দরকার আমার। তখন আমি হুট করে কোনো উত্তর দিতে পারিনি। আমার দিকে তাকিয়ে কিছু আলিম হাসছেন দেখে খুব রাগ হল। আমি বললাম, দাদা ছাহেব যা বলেছেন আমি সেটা বুঝেছি। আমি তখন পান সাথেই নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি দাদা ছাহেব এর হাতে পান তুলে দিলাম। উনি বললেন, জাযাকাল্লাহ ভাইয়া। কিছু আলেম বারবার বলছিলেন, হুজুরে তোমাকে কী বলেছিলেন এর উত্তর দিলে না। আমি বলেছিলাম যিনি প্রশ্ন করেছিলেন উত্তর তাঁর হাতেই চলে গেছে। আপনারা হয়তো সেই প্রশ্নটিই বুঝেননি।

ওলি আল্লাহগণের কারামত যে সত্য এর প্রমাণ আল্লাহ পাক আমাকে দাদা ছাহেবের থেকে দেখার সুযোগ দান করেছেন। একদিন দাদা ছাহেব আমাদের বাড়িতে অবস্থানরত ছিলেন। একজন দাখিল পরীক্ষার্থী ছাত্র উনার কাছে এসেছিলেন দোয়া নেয়ার জন্য। এই ছাত্র দুইবার দাখিল পরীক্ষা দিয়েও উত্তীর্ণ হতে পারেননি। সেই ছাত্র ভাই দাদা ছাহেবের কাছে দোয়া চেয়ে বলেন, হুজুর ইংরেজি সাবজেক্ট নিয়ে খুব দুঃশ্চিন্তায় আছি। দাদা ছাহেব বললেন, দোয়া করবো। প্রায় দুই ঘণ্টা পর দাদা ছাহেব আমাদের বাড়ি থেকে আমার বড় ফুফুর বাড়িতে গেলেন। আছর নামাযের পরে আমরা সবাই দাদা ছাহেবের পাশে বসা রয়েছি। কোন প্রসঙ্গ ছাড়াই হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করেন,একজন ছাত্র ভাই দোয়া চাইছলা যে এইন আছইন নি ইকানো? ভাগ্যক্রমে সেই ছাত্র ভাইও সেখানে হাজির

ছিলেন। তো দাদা ছাহেব বলে উঠলেন, আপনার ইংরেজি নিয়া তো কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু বাকি সাবজেক্টগুলার কিতা খবর? ছাত্র ভাই বললেন, ছাব বাকি সাবজেক্ট এ আমার আর চিন্তা নায় শুধু ইংরেজিটাই বেশি ভয় আমার। দাদা ছাহেব বললেন, যাও ইংরেজিতে পাশ করিলিবায়। পরীক্ষার ফলাফল বের হলে দেখা যায় সেই ছাত্র ভাই ইংরেজি পাশ করেছেন ঠিকই তবে ইতিহাস বিষয়ে ফেল করেছেন। তখন দাদা ছাহেবের বলা সেদিনের কথাগুলো মনে পড়ে গেল।

দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল যেন আমাদের প্রিয় রাহবারকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উঁচু মাকাম দান করেন।

দীর্ঘদিন দাদা ছাহেবের সাথে আমার চলাফেরা ছিলো, অনেক সময় আমার আচার, ব্যবহারে, কথায় -বার্তায় দাদা ছাহেবকে হয়তো অনেক কষ্ট দিয়েছি, আল্লাহ পাক রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল যেন আমার দেয়া সেই কষ্টগুলোকে ক্ষমা করে দেন এবং তাঁর অলির রূহানী ফয়েজ দ্বারা আমাকে ফয়যিয়াব দান করেন। আমীন।

লেখক: প্রভাষক (আরবি), হবিবপুর কেশবপুর ফাযিল মাদ্‌রাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগন্‌জ।

স্মৃতিতে উজ্জ্বল মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর

আলী ফজল মোহাম্মদ কাওছার

এই মহামানবের কথা লিখতে চাইলে লিখা সম্ভব হয় না, এই রত্নের কথা কতটুকু বা লিখতে পারবো, এর যোগ্যতা কিংবা জানার পরিধি আছে কতটুকু আমি অধমের। নই আমি কোন আলেম পরিবারের সন্তান। কিন্তু ছোট বেলা থেকে দেখতাম বাবা-চাচাদের ফুলতলী ছাহেবের প্রতি টান। কওমি অধ্যুষিত আমাদের এলাকায় যখন মিলাদ ক্বিয়ামের পক্ষে কথা বলা লোকদের বড়ই অভাব, গুটি কয়েক পরিবার/বাড়ি ছিল মিলাদ ক্বিয়ামের পক্ষে কিংবা মিলাদ ক্বিয়ামের সুর শোনা যেত যে সব বাড়ি থেকে তার মধ্যে অন্যতম আমাদের বাড়ি/পরিবার। এই সুত্রে মুহাদ্দিস ছাহেব নামটির সাথে পরিচিত (মুহাদ্দিস ছাহেব বলতে একমাত্র উনাকে আমরা চিনতাম)। ছোট বেলা থেকে জানতাম উনি বড় মাপের আলেম। তাই আশপাশে কোন জায়গায় তিনি আসলে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতাম, তাঁর নসিহত খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। কাছে যাওয়ার সুযোগ বেশি হয়নি। কয়েক বছর থেকে মাঝে মধ্যে দেখা করার সুযোগ হত। হুজুরের কথা বলার ধরণ আমার খুব ভালো লাগতো, খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বলতেন, যাতে শ্রোতার বুঝতে কিংবা শুনতে অসুবিধা না হয়। বয়স প্রায় ৮৯ বছর (হুজুরের মুখ থেকে শোনা)। মাঝে মধ্যে অসুস্থ হতেন আবার সুস্থ হয়ে যেতেন। কিন্তু মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব থেকে খুব বেশি অসুস্থ ছিলেন, মনে বড় পীড়া দিত; হায়াত ও সুস্থ জীবনের জন্য দোয়া চাইতাম। তিনি সিলেটে মেয়ের বাসায় থাকাকালীন সময় ৩দিন দেখতে গিয়েছিলাম (সিলেট আল-কোরআন মেমোরাইজিং সেন্টারের প্রিন্সিপাল মাওলানা ইমরান উদ্দিন চৌধুরীর সাথ)। দেখে কষ্ট লাগতো, মনে বড় ভয় জেগেছিল, আল্লাহ! তোমার এই মকবুল বান্দার এত পরীক্ষা আমার মতো আসামীর কি হবে?

একদিন আমার লেখা গ্রন্থ 'সিলেটি পীর আউলিয়ার জীবনী' দিয়েছিলাম হুজুরের হাতে। বইটি পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। অসুস্থ শরীর নিয়েও বলেছিলেন আমি বইটি পড়ব। বলেছিলেন, সিলেট নিয়া লেখা আমার খুব ভালো লাগে, মনোযোগ দিয়ে পড়ি। আপনি বেশি বেশি সিলেট নিয়ে লিখবেন।

একজন বিনয়ী, অমায়িক মানুষের প্রকৃত উদাহরণ ছিলেন আমাদের মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর। একজন বয়োজৈষ্ঠ্য আলিম, অসংখ্য আলেম উলামার ওস্তাদ, একজন বুযুর্গ, চাইলে তো মুরিদের সংখ্যা লাখের কোঠায় নিয়ে যেতে পারতেন, বাড়ির নাম হতে পারতো রারাই ছাহেব বাড়ি। কিন্তু মুর্শিদ আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ এর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ভালোবাসা থেকে তিনি বিরত থাকেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে

১৫ই জানুয়ারি মুর্শিদ ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী এর ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে অসুস্থতাজনিত কারণে অনুপস্থিত থাকার কারণে যে চাপাকান্না রেকর্ড করা বক্তব্যে শুনলাম মনটা হাহাকার করে উঠলো। মুর্শিদ ও মুর্শিদ বাড়ির প্রতি যে অকৃত্রিম ভালোবাসা বক্তব্যের মাধ্যমে ফুটে উঠলো যা সত্যি বিরল। একজন আলিম, শায়খুল হাদীস, ফকীহ, একজন সুলেখক বহুগুণে গুণান্বিত একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন যা আমার মতো মানুষের লিখে বুঝানো সম্ভব নয়। শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ (সাবেক অধ্যক্ষ ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসা, খলিফায়ে ফুলতলী) চলে গেলেন এই পৃথিবী ছেড়ে, কিন্তু রেখে গেছেন অসংখ্য খেদমত যা কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে। ২০২২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি সিলেটের জকিগঞ্জের রারাই গ্রামের নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন তিনি। ৮ই ফেব্রুয়ারি থানাবাজার সংলগ্ন উত্তর মাঠে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে বড় ছাহেবজাদা মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল সাহেবের ইমামতিতে জানাযার নামায সম্পন্ন হয়ে বাড়ির পাশে নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত আল-হাবীব মসজিদ প্রাঙ্গণে চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছেন। তিনি চলে গেছেন কিন্তু থাকবেন অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসার আসন জুড়ে, আমাদের স্মৃতিতে থাকবেন চির ভাস্কর হয়ে। আল্লাহ পাক তাঁর দরজা বুলন্দ করুন, আমাদেরকে রুহানি ফয়েদ্ব নসীব করুন।

লেখক: চাকুরীজীবি, সিলেট।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর জানাযা

সাকিবুল ইসলাম

সকাল আটটা বাজে। চারদিক শান্ত নীরব। শীতের সূর্য ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করে চলছে। কুয়াশা পুরোপুরি কাটে নাই। আমরা বাসে করে যাচ্ছি শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর জানাযায়। সিলেটের মানুষ যাঁকে মুহাদ্দিস ছাব হিসেবে একনামে চিনে। তিনি আর নেই। গত কাল সন্ধ্যায় আকাশ যখন অরুণ রঙে রঙিন হয়েছিল, পাখিদের নীড়ে ফেরা যখন শেষ হয়ে গিয়েছিল; তিনিও তখন নীড়ে ফিরলেন। হায়! তিনি বাস্তবিকই নীড়ে ফিরলেন। যেই মাশুকের প্রেমে জীবন পার করেছেন, যাঁর সান্নিধ্য পেতে আর্তনাদ করেছেন রাতের পর রাত, সেই মাশুক তাঁকে ডেকেছেন। শেষ রজনীর হিমেল হাওয়া যেই আনন্দ লোকের স্বপ্ন জাগাতো, সেই শান্তিকুঞ্জে যাওয়ার ডাক এসেছে। তিনি সাড়া দিয়েছেন। পেছনে রেখে গেছেন বর্ণাঢ্য জীবন, অজস্র মানুষের উপকার করার ইতিহাস। রেখে গেছেন হাদীসে নববীর খালিস খেদমতের অপূর্ব দাস্তান। মাদ্‌রাসা পড়ে আছে, তিনি আর দরস দিবেন না। মিম্বর পড়ে থাকবে, তিনি আর খুতবা পড়বেন না। আর কোনদিন বয়ান করবেন না খতমে বুখারির মাহফিলে। স্মৃতি রয়ে যাবে, হৃদয় কেঁদে যাঁবে; তাঁর স্মরণে নীরবে-নিভৃতে।

আমাদের বাস এগিয়ে চলেছে। রাস্তার দুধারে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। ধান কাটা হয়ে গেছে। চারদিকে শুধু শুণ্যতা আর শুণ্যতা। বাতাস যেন উদাস হয়ে গেছে। আমার অন্তরের গহিনে বাজছে বাশের বাঁশি। বাঁশির সুর বড় করুন, বড় ব্যথা জাগানিয়া। রুমির ভাষায়, বাঁশি রক্তমাখা পথের বর্ণনা দিয়ে যায়। বাঁশি মজনু ও লায়লার প্রেমের কাহিনী শুনায়। মনে আজ কত কথাই না আসছে। বাবার সাথে সম্পর্কের সূত্রে মুহাদ্দিস সাহেবের কাছে কতবার গিয়েছি। আমার নানীও নাকি তাঁর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখতেন। আমরাও তাঁকে নানা বলে ডাকতাম, বড় স্নেহ করতেন আমাদের। তাঁর সুবিশাল ব্যক্তিত্ব বুঝার সামর্থ্য আমার ছিল না। তবুও সুযোগ পেলে কাছে যেতাম। এতটুকু বুঝতাম তিনি আল্লাহর এক ওলি। মওলায়ে হাকিকির সঙ্গে উনার সম্পর্ক গভীর। উনি ছাহেব ক্বিবলাহ ফুলতলী রাহিমাহুমুল্লাহ এর অন্যতম খলিফা।

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম এক হাদীস বিশারদ। তাঁর মুখ থেকে যেন নূর ঝরতো। আমার মন বলতো, তিনি আল্লাহর কাছে বলে আমার ডুবুডুবু তরী কিনারে ভিড়াতে সক্ষম। তাই বারবার দোয়া চাইতাম, তিনি মুচকি হাসতেন; মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। সেই স্পর্শ আজও যেন মাথায় লেগে আছে। একবার শিশুসুলভ বায়না নিয়ে তাঁকে বললাম,

আমাকে নবীজির সাথে মিলিয়ে দিন। তিনি বললেন ধৈর্য ধরো। সব হবে। এত মায়াভরা চাহনি কোনদিন দেখিনি। তিনি আমাকে বারবার পাড়াশুনায় একনিষ্ঠ থাকার কথা বলতেন। দয়াময়, তুমি সেই মহান বুযুর্গের কথা মানার তাওফিক দাও। তাঁর ফয়েজে আলোকিত করো আমার অন্ধকার হৃদয়। শেষ বার যখন দেখা হয় তিনি তখন খুবই অসুস্থ ছিলেন। উপশহরস্থ মাওলানা এমাদ সাহেবের বাসায় আমার এক হাফিজ বড় ভাই মোঃ ছালিকুর রহমানকে নিয়ে গিয়ে ছিলাম। মুহাদ্দিস সাহেব তখন বিছানায় শায়িত। ছালিক ভাইকে বললেন, ও, ছালিক নাকি? আমার দিকে তাকালেন আর বললেন, তুমি কি আমার দরবেশ? আমি সেই নূরানি মুখ পানে চেয়ে থাকলাম। তারপর তিনি ধীরে ধীরে বললেন, দরবেশ! দরবেশ! দরবেশ! নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আমরা বিদায় নিয়ে চলে গেলাম। আমি আল্লাহর এক গোনাগার বান্দা, দরবেশির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তবুও সেই বিদায়ী কথাগুলো আজও কানে বাজে। মাওলা তোমার মকবুল ওলির ওসিলায় পার করে নাও। এ রকম কত স্মৃতি মনের মধ্যে এলো। এক সময় রারাই মুহাদ্দিস সাহেবের বাড়িতে পৌঁছলাম। আল্লাহর ওলিকে শেষ দেখা দেখতে অজস্র মানুষে ঢল নেমেছে। লাইনে দাঁড়িয়ে আমিও দেখলাম ঐ নূরানি মূখ তখনো আলোকিত, হাস্যোজ্জ্বল। বাড়ির অনতিদূরে থানাবাজারের পশ্চিমের মাঠে জানাজা হলো। লাখো মানুষের উপস্থিতিতে মহা পুরুষের এই মহাপ্রস্থান বড় মর্মসস্পর্শী, বড় বেদনার। জানাযা শেষে বাড়ি ফিরতে বাসে উঠলাম। ভেতরটা কেমন খা খা করে উঠলো। বাস এগিয়ে চললো। এক সময় চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেলো। আমি স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলাম এক আলোকবর্তিকার। যে আলো অনির্বাণ। যুগে যুগে তা অশান্ত হৃদয়ে প্রশান্তির প্রলেপ লাগিয়ে যায়।

লেখক: শিক্ষার্থী, ২য় বর্ষ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

কিতাব প্রেমিক আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর

অধ্যক্ষ মাওলানা ছমির উদ্দিন

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক বেনজীর মুহাদ্দিস ছিলেন। একটা সময় পর্যন্ত এতদাঞ্চলে মুহাদ্দিস ছাহেব বললে কেবল তাঁকেই বুঝাতো।

১৯৭৬ সালে আমি সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায় ফাযিল জামাতে ভর্তি হই। মুহতামিম ছাহেবের ইন্তিকাল পরবর্তীতে বিখ্যাত এ প্রতিষ্ঠানটি তখন নানা সমস্যায় মারাত্মকভাবে জর্জরিত। এ অবস্থায় মাদ্‌রাসাটির হাল ধরতে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা থেকে প্রিন্সিপাল হয়ে এখানে আসেন। সে সময় যখন যে ক্লাশ ফাঁকা থাকতো মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর নিজ ইচ্ছায় পাঠদানের জন্য সে ক্লাশে চলে যেতেন। এই সুবাদে হুজুরের কাছে পড়ার সুযোগ পেয়ে যাই। হুজুরের পাঠদান পদ্ধতি এতো নিখুঁত ও প্রাঞ্জল ছিলো যে, যেদিন যে বিষয়ই পড়েছি তা বাড়িতে গিয়ে পড়ার আর প্রয়োজন হতো না। হুজুরের পাঠদানে এমন আকর্ষণ ছিলো যে, ক্লাশে কোন ছাত্র অমনযোগী হওয়ার সুযোগ ছিলো না। মাদ্‌রাসায় যতক্ষণ হুজুরকে দেখেছি হয়তো কোন ক্লাশে পাঠদানে ব্যস্ত আর না হয় কোন কিতাব মুতাআলা করছেন। এমন কিতাব প্রেমিক মানুষ এ জীবনে আর দেখা হয় নি।

সৌভাগ্য বশত: একবার হজ্জের সফরে হুজুরের সঙ্গী হওয়ার সুযোগ হয়। হজ্জের সফরে চরম ব্যস্ততার মাঝেও হুজুরকে কিতাব মুতাআলা করতে দেখেছি। মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীতে নামায আদায় শেষে মাঝে মধ্যে তিনি কিতাব সংগ্রহের জন্য মাকতাবা খুঁজে নিতেন। যখনই সুযোগ হতো সংগৃহীত কিতাব নিয়ে মুতাআলায় বসে যেতেন। কিতাব মুতাআর প্রতি হুজুরের এই আকর্ষণ এবং নিবিষ্টতার কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে উপমহাদেশের এক কিংবদন্তি আলিমে দ্বীন আবদুল হাই লখনৌবী রাহমাতুল্লাহির কথা। তাঁর জীবনী সংক্রান্ত এক লেখায় পড়েছি, একবার তিনি কিতাব মুতাআলারত অবস্থায় খাদিমের কাছে পানি চাইলেন। খাদিম পানি আনতে ঘরের ভেতর গেলে তাঁর অসুস্থ পিতা প্রখ্যাত আলিম আবদুল হালিম লখনৌবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞেস করলেন, কেনো এসেছো? উত্তরে খাদিম জানালো আপনার পুত্র কিতাব মুতাআলারত অবস্থায় পানি চেয়েছেন। শুনে তিনি চমকে উঠলেন। কিতাব মুতাআলারত অবস্থায় আমার ছেলে পানি পান করতে চায়? তিনি খাদিমের হাতে একটি পেয়ালা তুলে দিয়ে বললেন, এটি আমার ছেলের সামনে রেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। পেয়ালা হাতে নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া কি হয় আমাকে জানাবে। খাদিম ফিরে এসে জানালো আবদুল হাই লখনৌবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিতাব থেকে চোখ না তুলেই পেয়ালা হাতে নিয়ে পান

করেছেন, কিছুই বলেন নি। খাদিমের কথা শুনে আবদুল হালিম লখনৌবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুশি হয়ে বললেন,আলহামদুলিল্লাহ ! আশা করি আমার বংশে আরো কিছুদিন ইলমের জ্যোতি থাকবে। কেননা আমি পেয়ালাতে পানির বদলে তেল দিয়েছিলাম। আমার ছেলে কিতাবে মগ্ন থাকায় পানির বদলে তেল পান করেছে অথচ তা বুঝতে পারেনি।

মূলত: আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরও যখন কিতাব নিয়ে বসতেন তখন মনে হতো তিনি কিতাবের মধ্যেই ডুবে আছেন। কিতাবের প্রতি এমন নিমগ্নতা এত ব্যাকুলতা বর্তমান সময়ে নেই বললেই চলে। সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসার সমৃদ্ধ কুবুতখানা হুজুরের কিতাব প্রেমের নজির হয়ে রয়েছে। এমন একজন মানুষের ছাত্র হতে পেরে আমরা গর্বিত।

আমাদের হুজুর কেবল একজন দক্ষ উস্তায ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন উস্তাযুল আসাতিযা,ফখরুল মুহাদ্দিসীন,রঈসুল আরিফীন একজন প্রখ্যাত সুফি সাধক। তিনি ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান, কুতবুল ওয়াক্ত শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর প্রথম সারির একজন খলিফা। বর্তমান যুগের মুক্তাদা আলিমগণের উস্তায ও রাহবার ছিলেন আমাদের হুজুর।

হাজার হাজার যোগ্য আলিম ছাত্র রেখে মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর ২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। আল্লাহপাক হুজুরের সারা জীবনের ইলমি খিদমাত কবুল করুন। তাঁর রেখে যাওয়া ইলমি ধারা কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখুন। হুজুরের দরজা বুলন্দ করে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান করে রাখুন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ইকড়ছই সিনিয়র মাদ্‌রাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগনজ ।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সুহবতে কিছু সময়

মাওলানা মোঃ মাহমুদুল হাসান

হযরত বদরপুরী ছাহেব র. তরীকার বুযুর্গানে কিরামের ওসীলা নিয়ে ফার্সী-উর্দু শব্দের মিশ্রণে কাব্যিক ভাষায় মুনাজাত করতেন। এ মুনাজাতগুলোই পরবর্তীতে মুনাজাতে ইয়াকূবী নামে প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারি অধ্যাপক আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ র. এর নাতি হযরত মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী শাহান ছাহেব মুনাজাতে ইয়াকূবীর বঙ্গানুবাদ করেছেন। তার নির্দেশে আমি মুনাজাতে ইয়াকূবী নিয়ে মুহাদ্দিস ছাব হুজুরের কাছে যাই। মুনাজাতে ইয়াকূবী পড়ার সময় উর্দু (اور) শব্দকে আমি 'আওর' বলে উচ্চারণ করি। হুজুর বললেন, বাক্যে পড়ার সময় এই শব্দকে 'ওর' পড়তে হয়। আমি ঠিক করে 'ওর' পড়ি। একটু পর আবার আওর পড়ি। হুজুর বললেন, না আপনার ঠিক হয় নাই। এইটা আওর না, ওর। আমি আবার ঠিক করে পড়তে লাগলাম। এক দুই পৃষ্ঠা পড়ার পর আবার আমার মুখ দিয়ে চলে আসলো আওর। এবার হুজুর একটু উচু কিন্তু মায়াবি গলায় বললেন, 'আপনে এবো পড়রা নি আওর, ই কলে নায়। আপনে কওকা ওর' (আপনি এখনো আওর পড়ছেন! এভাবে নয়। আপনি পড়ুন ওর)। খুব লজ্জা পেলাম। তবে আলহামদুলিল্লাহ, এরপর থেকে আর ভুল হয়নি।

আমি উর্দুতে পারদর্শী নই। থেমে থেমে পড়তে পারার যোগ্যতা আছে। কিন্তু আমার মতো প্রাথমিক স্তরের ছাত্রকেও হুজুর দীর্ঘ সময় দিয়েছেন। পুরো মুনাজাতে ইয়াকূবী শুনিয়েছি। একবারও বিরক্ত হন নি।

হুজুরের বড় একটি গুণ ছিল কোন কিছু জানতে চাইলে কখনো রাগ করতেন না। যে কোন হালতেই হুজুরকে প্রশ্ন করা যেত। একদিন হুজুর আমাদের এলাকায় ওয়াজ মাহফিলে গেছেন। মাহফিল শেষে গাড়িতে উঠলেন। আমিও হুজুরের গাড়িতে উঠলাম। মিনিট দুই এক পরই হুজুরের কাছে জানতে চাইলাম, আযানের দুআয় যে আমরা পড়ি 'ওয়ারযুকনা শাফাআতাহু ইয়াউমাল কিয়ামাহ' এই বাক্য পড়ার পক্ষে কোন হাদীস আছে কি না। হুজুর আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, সরাসরি এই বাক্যে পাইনি, তবে তাবারানীর কিতাবে এক বর্ণনায় এই মা'নার একটা হাদীস আছে। তবারানীর বাক্য হলো 'ওয়াজআলনা ফি শাফাআতিহি ইয়াউমাল কিয়ামাহ'।

আলহামদুলিল্লাহ, হুজুরের যবানে এই বাক্য শুনার পর আমি ইন্টারনেটের সাহায্য নিলাম। মাশাআল্লাহ, দেখলাম তাবারানী সহ আরো কিছু কিতাবে বাক্যটি আছে। তবে সনদে কিছুটা দূর্বলতা আছে। আমি তো হুজুরের ছাত্র হওয়ারও যোগ্যতা রাখি না।

আমার উস্তাযগণের যবান থেকে শুনেছি, হুজুরকে হাদীসের খুটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন করলেও সহজ-সাবলীল ভাষায় মুহূর্তের মধ্যে জবাব দিতেন। মনে হতো বিষয়গুলো তার নখদর্পনে। আমি একটু কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু হুজুর এতো মায়াবি কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমার ভয় একেবারেই কেটে যায়। মনে হয়েছে প্রশ্ন করায় হুজুর খুবই খুশি হয়েছেন।

আরেক দিনের স্মৃতি, হুজুর ফুলতলী ছাহেব বাড়িতে গেছেন। ছাহেব কিবলাহ র. এর মাযার যিয়ারতের পর দারুল কিরাতের অফিসে চেয়ারে বসে চা পান করছেন। মোক্ষম সুযোগ মনে করে আমি কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম 'তাসাওউরে শায়খ' সম্পর্কে। এ বিষয়ে কোন হাদীস আছে কি না। ছোট মুখে এসব জিজ্ঞেস করা বেয়াদবী, তারপরও আবেগ বশত প্রশ্ন করে নিয়েছি হুজুর হযরত ছাহেব কিবলাহ র. এর মাযারের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, হুবহু হাদীসে পাবেন না। তবে একটা হাদীসের মাফহুম এই মাসআলার কাছাকাছি। ইমাম তিরমিযীর শামায়েলে হযরত হাসান রা. একটা হাদীস রেওয়ায়ত করেছেন। তিনি তার মামাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূরত বয়ান করার জন্য বলেন। আর এই বয়ান শুনার কারণ বলেছিলেন যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্মৃতির মধ্যে রাখতে পারেন।

এরপর হুজুর এই হাদীসের আলোকে অনেক নুকতা পেশ করেছেন। তখন খুব সহজে বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলাম কিন্তু আমার দূর্বলতার কারণে পুরোপুরি মনে রাখতে পারিনি।

হযরত শাহান ছাহেব একদিন নির্দেশ দিয়ে বললেন, হুজুরের সাথে আলাপ হয়েছে। আমি যেন সকাল ৯টার মধ্যে হুজুরের বাড়িতে যাই। নিজের অলসতা আর গাফলতির কারণে হুজুরের বাড়িতে যেতে আমার ১১টার কাছাকাছি হয়ে যায়। বাড়িতে গিয়ে দেখি হুজুরের বাংলা ঘরে ছোট একজন বসা, মনে হচ্ছে কারো অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ফুলতলী থেকে (ফুলতলী মাদ্‌রাসা) এসেছেন? আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে আমাকে বাংলা ঘরে বসিয়ে ভিতরে গেলেন। একটু পর হুজুর বের হয়ে আসলেন। সালাম-কদমবুসি করলাম। হুজুর বললেন, আমি সকাল থেকে অপেক্ষা করছি। অনেক্ষণ অপেক্ষা করে এই ছেলেকে বসিয়ে রাখছি আর বলেছি ফুলতলী থেকে ছাত্র কেউ আসলে আমাকে জানাতে।

আমি খুব লজ্জিত হলাম, বেয়াদবির জন্য ক্ষমা চাইলাম। আশ্চর্য হয়ে সবক নিলাম। মানুষকে কীভাবে গুরুত্ব দিতে হয়। আমি তো হুজুরের ছাত্রের ছাত্রের ছাত্র। কিন্তু বয়স বা অবস্থান কোন কিছুর দিকে না তাকিয়ে হুজুর আমার জন্য যথাসময় থেকে অপেক্ষা করছেন। মানুষ বসিয়ে রেখেছেন। হুজুর মানুষকে খুব গুরুত্ব দিতেন।

হুজুরের সাথে যে দিনই সাক্ষাৎ হয়েছে কোন না কোন নতুন বিষয় শিখেছি। অনেক আগে আমার কিছু উস্তায মহোদয়ের সাথে হুজুরের সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। আমরা সবাই বাংলা ঘরে বসে আছি। একটু পর হুজুর আসলেন, চেয়ারে বসলেন। ঘরে পর্যাপ্ত চেয়ার আছে কিন্তু আদবের জন্য বাকী সবাই দাঁড়িয়ে আছেন। হুজুর তখন মুচকী হাসি দিয়ে বললেন, আপনারা যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এই দাঁড়ানোটাকেই হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। (তোমরা অনারবীদের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না)। বসার জায়গা আছে, তাই দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। সবাই বসে পড়ুন।

আরেকদিন জরুরী একটি কাজে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত হুজুরের বাড়িতে ছিলাম। যোহরের নামাযের পর হুজুর বললেন, আসুন! কিছু ডাল-ভাত খেয়ে নিন। হুজুর নিজে দস্তরখান বিছাতে লাগলেন। আমি এগিয়ে আসতেই হুজুর হাত দিয়ে ইশারা দিয়ে বললেন, আপনি আপনার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি মেজবান হিসাবে একটু মেহমানদারী করি।

এরপর হুজুরের সাথে খাবার খেতে বসলাম। সুবহানাল্লাহ, হুজুরের সে দিনের ব্যবহারে খুব বেশি লজ্জিত হয়েছি। হুজুর একটু পর পর নিজ হাতে ভাত-তরকারি আমার প্লেটে তুলে দিচ্ছন। ফাকে ফাকে মজার মজার কথা বলছেন। হুজুরের রসাত্মক কথায় এমন ভালো লাগছিল যে, এত বড় মহিরুহের সামনে বসে খাবার খেতেও ইতস্তত বোধ করিনি।

লেখকঃ যুক্তরাজ্য প্রবাসী, সাবেক আরবী প্রভাষক, মহাখালী হোসাইনিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান স্মরণে

ফজলুর রহমান ফজলু

মরিতে চাই না আমি সুন্দর এ ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

মৃত্যুর অমোঘ বিধানে কবির এ আপ্তবাক্যের কোন মূল্য নেই। কারণ জন্মিলেই মরিতে হবে এটা প্রকৃতির বিধান। মৃত্যুকে বাস্তব সত্য জেনেও মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু এ বাঁচাটা দৈহিক ভাবে সম্ভব না হলেও কর্মগুণে চিরদিন বেঁচে থাকা সম্ভব। কবিতার ভাষায়:

দুনিয়াতে কিছু মানুষ এমনতো হয়
কর্মগুণে এ ভুবনে বেঁচে তারা রয়।

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি গোটা জীবন ভর ইসলামের খেদমতসহ মানবতার কল্যাণে কাজ করে গেছেন। রেখে গেছেন শত শত দ্বীনের চেরাগ আর অগণিত ভক্ত সহ পরিবার পরিজন। আমি বাল্যকাল থেকে উনার ওয়াজ নসিহত শুনে এসেছি। ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্য এবং সর্ববিধ কল্যাণকামিতা ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়। তিনি তাঁর চরিত্র মাধুর্য ও গভীর প্রজ্ঞা পাণ্ডিত্য দ্বারা দল মতের উর্ধে নিজেকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিতে পরিণত করতে সমর্থ হন। সকল দলের আলেমরা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত পথে জীবন অতিবাহিত করেছেন। একজন বিজ্ঞ আলেম সম্পর্কে আলোচনা করা আর মায়ের সাথে মামার বাড়ির গল্প বলা সমান কথা। আমি এককথায় উনার পরিচয় দিচ্ছি উনি আপাদমস্তক একজন বিজ্ঞ আলেম ও ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁকে হারানোর অপুরণীয় ক্ষতি পুরণ হবার নয়। কবিয়াল বিজয় সরকারের বিচ্ছেদ কথায় বলি :

আমি আর কি ফিরে পাবো রে তারে
যারে হারায়েছি এই জীবনে।

মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব সত্যিকার একজন গুণী মানুষ। সত্যবাদিতা, স্পষ্টতা, পরোপকারিতা, বদান্যতা, আতিথিয়তা সর্বোপরি নবীপ্রেম, খোদাভীরুতা, কল্যাণকামিতা তথা নিজ প্রতিভা গুণে তিনি এক কালজয়ী মানব। তিনি নিতান্ত সাধাসিধে জীবন যাপন করতেন। অহংকার তাঁর চরিত্রে ছিল না। বিলাসী জীবন ছিল তার কাছে অনর্থক। তাঁর মৃত্যুতে সবাই মর্মাহত।

পরিশেষে মরণ দিনের স্মরণ ক্ষণে উনার পুণ্যস্মৃতি চারণ করে বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করছি।

লেখক: সাধারণ, সম্পাদক জকিগন্জ সাহিত্য সংসদ (জসাস)।

সাক্ষাৎকার

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর সাক্ষাৎকার

মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী

[উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, সমকালীন বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলিমে দ্বীন, হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম খলীফা, ইছামতি দারুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ। 'মুহাদ্দিস ছাহেব' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। সুদীর্ঘকাল পবিত্র হাদীসের খিদমতে কাটিয়েছেন। গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২, সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও গত ৩ আগস্ট, ২০২১ এ বরেণ্য আলিমে দ্বীন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন একান্তে, মূল্যবান সাক্ষাৎকার দিয়ে আমাদের উপকৃত করেছেন। ইলমে হাদীসের একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে তাঁর জীবনের বহু দিক ও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে। মূল্যবান এ সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর সুযোগ্য নাতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হযরত মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী। মাসিক পরওয়ানায় এ সাক্ষাৎকারটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ এ সাক্ষাৎকারটি পুণঃমূদ্রণ করা হলো। -সম্পাদক]

আহমদ হাসান চৌধুরী: হুযূর, আপনার ছাত্রজীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছিল।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর : আমি ছোটবেলা প্রথমে ইছাপুর হাফিযিয়া মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া করেছি। এরপর সড়কের বাজার আলিম মাদ্‌রাসায় আলিম প্রথম বর্ষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করে চলে গেলাম গাছবাড়ি জামিউল উলূম কামিল মাদ্‌রাসায়। গাছবাড়ি থেকে আমি আলিম পরীক্ষা দেই। তখন সারা বাংলাদেশে মেধা তালিকায় দশম স্থান লাভ করেছিলাম। একই মাদ্‌রাসা থেকে পরে ফাযিল পরীক্ষা দিয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করি। ১৯৫৯ সালে এ মাদ্‌রাসা থেকেই কামিল পরীক্ষা দেই। তখন মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করি। সকলের মতো আমারও পড়ার রুটিন ছিল। খুব বেশি রাত জেগেছি, কিতাব পড়েছি, উস্তাযদের কাছ থেকে কিতাবের নাম জেনেছি। এখন পড়াতো দূরের কথা, অনেক কিতাবের নামও হয়তো সকলে জানেনা। আমি উস্তাযদের কাছ থেকে কিতাবের নাম জেনেছি, কিতাব নিয়ে পড়েছি। কর্মজীবনে যখন বুখারী শরীফের দারস দেই তখন হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ'র নিকট থেকে ফাতহুল বারী এবং সোহরাবপুরী হুযূরের কাছ থেকে আইনী নিয়ে পড়েছিলাম। সোহরাবপুরী হুযূরের নাম ছিল মাওলানা শাহিদ আলী। তিনি ছিলেন গাছবাড়ির ছাত্র। দেওবন্দ থেকে এসে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত খিদমতে ছিলেন।

আহমদ হাসান চৌধুরী: আপনার আব্বা সম্পর্কে জানতে চাই।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর: আমার বাবার শিশুকালে তাঁর মা-বাবা মারা যান। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই। বাবাকে ছোটকালে পড়ার জন্য পাঠালেন ভারতের কোনো এক জায়গায়। পাশের বাড়ির একজন মুরুব্বী মহিলা ছিলেন, গ্রামের সম্পর্কে যাকে আমরা ফুফু ডাকতাম, তিনি বাবাকে ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। বড় হয়ে বাবা পড়তে গেলেন মুরাদাবাদ। পড়ালেখা শেষে তিনি বাইআত গ্রহণ করেন হাফিয মাওলানা আব্দুর রহমান মুরাদাবাদী রাহিমাহুল্লাহ এর কাছে। একথা প্রথমে কেউ জানতাম না। আমাদের ভাই কেউও জানতেন না। একদিন এক কিতাব পড়ছিলাম, বাবা ডাক দিলেন, কিতাব নিয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলেন, কিতাবের নাম কি? বললাম, অমুক কিতাব, এখানে সূরা মুলকের তাফসীর পড়ছি। তখন বললেন, এ কিতাব আমার মুরশিদের লেখা। এ কিতাব হিফাযতে রেখো এবং পড়ো। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মুরশিদ আছেন নাকি? বললেন, এই কিতাবের মুসান্নিফ-ই আমার মুরশিদ। ইনি গণিপুরী ছাহেবেরও মুরশিদ ছিলেন। তিনি গাছবাড়ির মাওলানা ইয়াকুব (গাছবাড়ির সাবেক মুহতামিম) ছাহেবেরও মুরশিদ ছিলেন। তাঁর সিলসিলা মুজাদ্দিদিয়া।

আহমদ হাসান চৌধুরী : তাহলে গণিপুরী ছাহেবের তরীকার সিলসিলা ঐদিকে?

মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর: জি হ্যাঁ! মাওলানা মুরাদাবাদীর একমাত্র খলীফা হলেন আব্দুন নূর গড়কাপনী ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ। যার মাধ্যমে দারুল কিরাতের সূচনা হয়েছিল। একথা আমাকে বলেছিলেন গণিপুরী ছাহেব। গাছবাড়ির মুহতামিম ছাহেব জলছাতে আসলে বাবা তাঁর সাথে অনেক সময় গল্প করতেন। তারা ছিলেন এক পীর ছাহেবের মুরিদ। আব্দুন নূর গড়কাপনী রাহিমাহুল্লাহ 'নূর আলী ছাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। আমি তাঁকে একদিন অথবা দুদিন দেখেছি ফুলতলীর জলছায়। তাঁকে দেখলে সাহাবীদের কথা স্মরণ হতো। পাতলা চুল, কয়েকটা দাড়ি এবং চুলে মেহেদি দেওয়া। আমাদের এদিকে বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে দাওয়াত করা হতো। কিন্তু আমার এক-দুইবার ছাড়া আর কখনো দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ইছাপুর একদিন অনেক আলিম সাহেবের সাথে তাঁকেও দাওয়াত করা হয়। ছাহেব কিবলাহও গিয়েছিলেন সেখানে। বাড়ির নাম ছিল ন'ভাইর বাড়ি। তারা এক সমান নয় ভাই ছিলেন। খাবার শেষে ছাহেব কিবলাহ বাড়ির বাহিরে যাচ্ছিলেন, পেছনে ছিলেন গড়কাপনী ছাহেব। তিনি ছাহেব কিবলাহকে প্রশ্ন করলেন, ছাহেবের কি খাওয়া হয়েছে? ছাহেব কিবলাহ বললেন, খাওয়া-দাওয়া শেষ, এখন কিছু হাঁটাচলা করাটা জরুরি। রাতের খাবারের পর চল্লিশ কদম না হাঁটলে শরীরের অনেক ক্ষতি হতে পারে। চোখ, কান বা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গের। এই প্রথম আমি শুনলাম এ কথা। পরে কিতাব পড়ে এ বিষয়ে বিশ্বাস জন্মালো যে রাতের খাবার পরে কিছু সময় না হাঁটলে শরীরের ক্ষতি হতে পারে, তাই খাবার পরে কিছুক্ষণ হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

বদরপুরী ছাহেবকেও আমি দেখেছি। তাঁর বাড়িতে দুইবার গিয়েছিও। একবার আমি আর আরেকজন ছাত্র, যার নাম মুহিবুর রহমান, বাড়ি সড়কের বাজারের সামান্য পশ্চিমে বাড়িতে গিয়ে পাইনি। রাত্রে আমরা অবস্থান করি। মেহমানদের সাথে খাবার খেয়েছি। খাবার এসেছিল ছোট একটি পাত্রে। আমার সঙ্গী বললেন, এত কম খাবার এসেছে, ১৪/১৫ জন মানুষের হবে কি? চুপিচুপি বললাম, দেখেন না কী হয়? শেষ পর্যন্ত দেখলাম কিছু খাবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সকলের খাওয়া শেষ হওয়ার পরও কিছু বাকি রয়ে গেছে। সকালে বদরপুরী ছাহেব বাড়িতে তাশরীফ আনলেন। মুসাফাহার জন্য হাত দিলেন, এত নরম এবং ঠান্ডা হাত আমার জীবনে আমি আর কখনো দেখিনি। রাত্রে খুব বেশি হয়তো কান্নাকাটি করতেন, দুটি দাগ দেখেছিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি করো? বললাম, ছাব! পড়ালেখা করি। বললেন, ভালো করে পড়ালেখা করো, বড় আলিম হও। এই দেখলাম একদিন। আরেকবার দিনে গিয়েছিলাম দেখা করতে। বদরপুরী ছাহেবের বড় একটি গুণ ছিল যে, সকল মতাদর্শের আলিম তাঁকে সম্মান করতেন। অনেক মতের আলিম-উলামা তাঁর মুরীদ ছিলেন।

আহমদ হাসান চৌধুরী : হুযূরের আব্বা কোথায় খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন?

মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূরঃ ছোটবেলা দেখতাম বাবা বিভিন্ন মসজিদে ইমামতি করতেন। গোমরাতে এক মাদ্‌রাসায় অনেকদিন শিক্ষকতা করেছেন। গোমরায় তাঁর কিছু শাগরিদ পেয়েছিলাম। একজন ছিলেন মাওলানা শফিক এর বাবা। নামটা মনে নেই। আরো কয়েকজন ছিলেন যারা সকলেই বাবার কাছে পড়ালেখা করেছেন, আমাকে খুব আদর করতেন। গোমরা ঠিক কালিগঞ্জ বাজারের নদীর ওই পারে ভারতে অবস্থিত। আমার বাবা মুরাদাবাদ থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেছিলেন।

আহমদ হাসান চৌধুরীঃ ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে আপনার জানাশোনা বা সম্পর্কের সূচনা কীভাবে হয়েছিল?

মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূরঃ সূচনা বলতে ছাহেব কিবলাহকে আমি ছোটকাল থেকেই বড় একজন বুযুর্গ হিসেবে জানতাম এবং মানতামও। ছোটকালে আমার একটি মারাত্মক অসুখ হয়েছিল। আমি ইছাপুর হাফিযিয়া মাদ্‌রাসায় পড়ালেখায় ছিলাম। তখন শরাফত আলী নামে একজন মজযুব পীর ছাহেব ইছাপুর মাদ্‌রাসার পাশে শাহজির বাজারে তাশরীফ আনলেন। সকলে তাঁকে খুব মানতো। সব চায়ের দোকানে এসে তিনি শিরনী করার আদেশ দিলেন। দোকানি সকলেই পানি গরম করছিলেন। গুড়, চাল-ডাল দিচ্ছিলেন। শিরনী আর্ধেক পাকানো হয়ে যাওয়ার পর তিনি বের হয়ে গেলেন, কোথায় জানি যাবেন। তখন ছোট বাচ্চারা বলছিল, ঠাকুরজি আমাকে কিছু দিয়ে যান। আমি তখন আমার বিশেষ কোনো প্রয়োজনে বাজারে গিয়েছিলাম। আমিও ছোট বাচ্ছাদের সাথে বললাম, ঠাকুরজি! আমাকেও কিছু দিয়ে যান। রাস্তার পাশে ভাটিগাছ ছিল, যে

রাস্তা বাজার থেকে খাদিমান সড়কে গিয়ে মিলিত হয়েছে। ভাটিগাছের একটি পাতা কেটে আমাকে দিয়ে বললেন নে নে! আর কাউকে কিছু দিলেন না, চলে গেলেন। আমি এর কিছুদিন পর বাড়িতে আসি। ছোট বাচ্চারা ভিন্ন কিছু ঘটলে তো মায়ের সাথেই প্রথম গল্প করে। আমি আমার মায়ের সাথে একদিন গল্প করছিলাম। মাকে বলছিলাম যে, আমি একদিন বাজারে গিয়েছিলাম টুপি সেলাই এর জন্য সুঁই সুতা আনতে। শরাফত আলী পীর ছাহেবকে দেখে আমি বলেছিলাম কিছু দেওয়ার জন্য। তিনি আমাকে ভাটিগাছের পাতার একটা টুকরো দিয়েছেন। মা এ বিষয়টি বাবাকে বললেন। বাবা বললেন, তাকে বলো তার কাছে যদি এই পাতা থাকে তাহলে সে যেন খেয়ে নেয়। আমি পাতা বের করে দেখি শুকিয়ে গেছে। বাবা বলেছেন তাই এটা খেয়ে নিলাম, পুরনো হওয়ার কারণে তখন পাতাটি কিছুটা তিতে লেগেছিল। এরপরেই দেখলাম আমার মধ্যে ভিন্নরকম পরিবর্তন চলে আসলো। আমার ব্রেইনের মধ্যে একটু গণ্ডগোল শুরু হলো। অনেকটা পাগলের মতো হয়ে গেলাম। পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেল। লজিং থেকে বাড়িতে খবর গেল, ছেলেকে এসে নিয়ে যান। তার শরীর ভালো নয়, অজ্ঞান হয়ে যায়। আমাকে বাড়িতে আনার পর শুনলাম বাবা গিয়েছেন একজন হুযূরের কাছে তাবীয আনতে। সেই হুযূর ছিলেন আল্লামা ফুলতলী ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ। বাবার আগ থেকেই ফুলতলী ছাহেবের প্রতি আলাদা একটা বিশ্বাস এবং দূরসম্পর্কের আত্মীয়তার কারণে জানাশোনা ছিল। তিনি ছাহেব কিবলাহর খিদমতে আমার অবস্থার কথা বললেন। ছাহেব কিবলাহ তাবীয দিয়ে বললেন, তাকে গিয়ে বলবেন এটা আমি দিয়েছি। বাবা বললেন, সে তো ছোট, আপনাকে তো চেনে না। ছাহেব কিবলাহ বললেন, বলবেন আমি দিয়েছি। আর এক বছর তাকে কোথাও পড়তে দিবেন না। বাড়িতে রেখে দিবেন। বাবা বড়িতে এসে আমাকে তাবীয পরিয়ে দিলেন। বাবার সামনে কিছু বলাও যায়না ভয় করে, তো পরে নিলাম। বাবা বললেন, এটা ফুলতলী ছাহেব দিয়েছেন। বলেছেন, তাঁর কথা বলে তোমাকে দেওয়ার জন্য, এটা যত্নে রাখবে, ফেলে দিবে না। এই এক বছর তোমাকে পড়ালেখা করতে হবে না। তাবীয দেওয়ার পরে ধীরে ধীরে ভালো হয়ে গেলাম। এক বছর পর আবার পড়ালেখা শুরু করলাম। তখন থেকে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ'র প্রতি আমার অন্যরকম ভালোলাগা কাজ করতো।

ছোটবেলায় যখন সড়কের বাজার পড়েছি তখন ছাহেব কিবলাহ থেকে খুব দূরে ছিলাম। একদিন আমাদের পূর্বের বাড়িতে তিনি তাশরীফ আনলেন। আমাকে বললেন, চলো আমার সাথে দুমুঠো খেয়ে নাও। আর ধীরে ধীরে আমার কাছে ভিড়ো। তখন ছাহেব কী বলতে চেয়েছেন সেটা বুঝিনি। সড়কের বাজার আলিম প্রথম বর্ষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করে চলে গেলাম গাছবাড়ি জামিউল উলুম-এ। গাছবাড়ি থেকে আমি আলিম পরীক্ষা দেই, তখন সারা বাংলাদেশে ১০ নম্বর হয়েছিলাম। একই মাদ্‌রাসা থেকে পরে ফাযিল পরীক্ষা দিয়ে তিন নম্বরে বোর্ড স্ট্যান্ড করি। এ সময় আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। ঐ সময় ইলমে

তরীকত বা তাসাওউফ সম্পর্কে আমার তেমন খারাপ ধারণা ছিল না, তবে আমি মনে করতাম ইলমে হাদীস, ইলমে কিরাত পড়ার পর এটা (তাসাওউফ) নিষ্প্রয়োজন। ইলমে হাদীস পড়লাম, কিরাত পড়লাম এরপর তরীকত আরেকজন পড়াবেন! সবকিছুইতো এগুলোর (কুরআন, হাদীস) মধ্যে আছে। ঠিক ঐ সময়ই স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, আমি একটি কিতাব অধ্যয়ন করছি। তখন একটা বিশাল বাঘ আমার দিকে ধেয়ে আসছে। আমি কিছুটা ধমক দিলে বাঘ সরে যায়। কিছুক্ষণ পর বাঘটি আবার আমার দিকে তেড়ে আসে। এরকম কয়েকবার করার পর আমার রাগ ক্রমশ বেড়েই চলে, আমি এবার কিতাবটি ছুড়ে মারি বাঘের দিকে। বাঘটি পালিয়ে যায়। এদিকে আমি ভয় পেয়ে যাই। এ সময় আমি গাছবাড়ির শিক্ষক হরমুজুল্লাহ সাহেবকে গিয়ে স্বপ্নের কথা বলি। তিনি পুরোটা শোনার পর মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, তুমি মনে হয় আমাদের তরীকতকে ভালোবাসো না। আমি বললাম, ঠিক তা নয়। আমি তরীকত বা তাসাওউফকে খারাপ মনে করি না, আবার খুব একটা প্রয়োজনীয় বলেও মনে করি না। তিনি বললেন, তোমার এই মনোভাব থাকবে না। তুমি একটি কিতাব অধ্যয়ন করবে বা করছো সেটি একজন আল্লাহওয়ালার লিখিত। সেটাতে তাঁর আছর আছে। আমার মনে হয় তুমি খুব বেশিদূর যাবে না, অচিরেই আমাদের তাসাওউফের পথে চলে আসবে।

তখন আমি যে কিতাবটি পড়ছিলাম সেটির নাম হল 'ইবরিজ। ' খাযা আব্দুল আযীয দাব্বাগ রাহিমাহুল্লাহ লিখিত। তিনি প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, তবে তাসাওউফপন্থি ছিলেন। অনেক মুহাদ্দিস তাঁর মুরীদ ছিলেন। তাঁর ছোট ছোট উপদেশ একজন মুহাদ্দিস সাহেব লিখে রাখতেন। তাঁর সিলসিলা এখনো আছে। লন্ডনে উনার অনুসারী কিছু মানুষের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। এই কিতাব যতই পড়ি ততই যেন আমার মাঝে এর আছর পড়তে থাকে। এ সময় আমি প্রচুর হাদীস পড়ি, কিন্তু মনে হতো কিছুই বুঝি না। তখন মনে হতে লাগলো ডাক্তারি বই পড়ে যেমন ডাক্তার হওয়া যায়না, কোনো উস্তায বা শিক্ষকের দ্বারস্থ হতে হয়, আমাকেও একজন ওস্তাদ ধরতে হবে। এ চিন্তা মাথায় আসার পরে বারবার মন যায় ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর দিকে। ফুলতলী ছাহেব এসময় রামাদানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন সিলেটের শেখঘাট মসজিদে। আমি খাদিমানী রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে পরামর্শ করে আমাকেও ইতিকাফে সাথে নেওয়ার জন্য বললাম। নির্দিষ্ট সময়ে চলে গেলাম সেখানে। মাওলানা আব্দুল লতিফ খাদিমানী, মাওলানা আব্দুল মুকিত মঞ্জলালী এবং আমি ছিলাম উত্তর বারান্দায়। দক্ষিণ বারান্দায় ছাহেব কিবলাহ, মাওলানা শাতির আলী (বারগাত্তার ছাহেব) ও মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব (আউশকান্দির ছাহেব)। ইতিকাফের প্রথমদিন চলে গেলাম ছাহেব কিবলাহ'র খিদমতে। ছাহেব কিবলাহকে বললাম, আমি আপনার কাছে বাইআত হতে এসেছি। ছাহেব কিবলাহ আমাকে বললেন, তুমি কি এ বিষয়ে কোনো ইস্তিখারা করেছো? উত্তর দিলাম, জ্বি না। তখন তিনি আমাকে দিয়ে সংক্ষিপ্ত

একটি ইস্তিখারা করালেন। নিয়মটা ছিল- সূরা আলাম নাশরাহ একবার, দুরুদ শরীফ তিনবার, ইয়া আলিমু আল্লিমনী, ইয়া খাবিরু আখবিরনী, ইয়া বাসিরু আবসিরনী কয়েকবার পড়ে শুয়ে পড়া। অনুরূপ করে শুয়ে পড়লাম। পরে স্বপ্নও দেখলাম। ছাহেব কিবলাহ সাধারণত ইতিকাফরত অবস্থায় ফজরের নামাযের পর হালকা আরাম করতেন। পরেরদিন ছাহেব কিবলাহর আরাম করা শেষ হলে আমি উযূ করে তাঁর খিদমতে হাযির হলাম। আমার যতটুকু মনে পড়ে, আমি উযূ ছাড়া কখনো ছাহেব কিবলাহর খিদমতে যাইনি। এমনকি আগে ফুলতলী থেকে আটগ্রাম পর্যন্ত প্রায়ই গাড়ি পাওয়া যেতো না। আমি অনেক সময় ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে হেঁটে আটগ্রাম পর্যন্ত চলে আসতাম, জানামতে কখনো তাঁর ছায়াতে আমি পা দেইনি। আমি এবং দেওয়ান আব্দুর রব ছাহেব প্রায় সময়ই ছাহেব কিবলাহ'র সঙ্গে থাকতাম। আমার মতো তিনিও ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর ছায়ায় পা দিতেন না। এটা আমার ব্যক্তিগত আমল। আমি এখনো যে স্থানে ঘুমাই ঘুমানোর সময় যত সময় জাগ্রত থাকি ফুলতলীর দিকে পাশ ফিরে ঘুমাই। আমার এমন আরও কিছু ব্যক্তিগত আমলের মধ্যে একটি হলো, আমি ছাহেব কিবলাহ'র ইন্তেকালের পর ঐদিকে পা দিয়ে কখনও বসিনি। আগে যে স্থানে বসতাম মাঝে মাঝে দেয়ালে হেলান দিলে পা কোন দিকে চলে যেতো খেয়াল থাকতো না। কিন্তু ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ ইন্তেকালের পর আমি এ অভ্যাস ত্যাগ করেছি। আমি সবসময় খেয়াল রেখেছি ভুলেও যেনো পা ঐদিকে না যায়। একদিন ফুলতলীর মাইজম সাহেবের পূর্বের ঘরে শুয়েছিলাম। ওই ঘরে দক্ষিণ দিকে বালিশ আর উত্তর দিকে পা দেওয়ার ব্যবস্থা। আমি উত্তর দিকে মাথা দিলাম আর পা দিলাম দক্ষিণ দিকে। মাইজম সাহেব এসে বললেন, আমরা তো উত্তরে পা আর দক্ষিণে মাথা দেই। এতে সুবিধা হয়। বললাম, ছাব, এদিকে তো ছাহেব কিবলাহর মাযার শরীফ, এজন্য আমার পা দক্ষিণে দিলাম। তিনি বললেন, এই তাহলে রহস্য! আপনি এতো খোঁজ রাখেন। এজন্যই তো বলি কেউ আপনার সাথে পেরে ওঠে না কেন?

তো পরের দিন ছাহেব কিবলাহ'র কাছে যাওয়ার পরে বললেন উযূ করে এসেছো? আমি বললাম জ্বি! তখন আমাকে বাইআত করালেন। স্বাভাবিকত ছাহেব কিবলাহ আমাকে ইস্তিখারায় কি দেখলাম তা জিজ্ঞেস করার কথা। আমি ভেবেছিলাম তিনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন ইস্তেখারায় কী দেখলে? কিন্তু তা জিজ্ঞেস করেননি। তখন আমি অনুধাবন করলাম, ইস্তিখারার পরও যেহেতু আমি ছাহেব কিবলাহর কাছে এসেছি সেহেতু ছাহেব কিবলাহ বুঝেছেন আমি ভালো কিছু দেখেই এসেছি। অথবা ছাহেব কিবলাহ আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন। যখন আমি খাদিমানী ছাহেব এর সাথে ছাহেব কিবলাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করি তখন আমি কামিল প্রথম বর্ষে অধ্যয়ন শুরু করেছি মাত্র। এই থেকে ছাহেব কিবলাহ'র সাথে আমার সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠতা শুরু।

আহমদ হাসান চৌধুরী: আপনি জীবনের সুদীর্ঘ সময় হাদীসের খিদমতে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই খিদমতে শরীক হওয়ার পেছনে বিশেষ কোনো কারণ আছে কি?

মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর: পীর ও মুরশিদ হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ সৎপুর কামিল মাদ্‌রাসায় দারুল হাদীস অর্থাৎ কামিল ক্লাস চালু করে আমাকে সেখানে দারস প্রদানের জন্য বললেন। এর আগে ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসায় আমাকে বলেছিলেন হাদীসের দারস দিতে। যদিও তখন ইছামতি মাদ্‌রাসায় কামিল মঞ্জুরি ছিল না। তিনি আমাকে বলেন, 'আমি মানুষকে বলি তোমার কাছে হাদীস পড়ার জন্য, তুমি পড়াও না কেন? তখন ইছামতিতে শুধু মুহতামিম ছাহেব এবং মাওলানা মতিউর রহমান ছাহেব হাদীসের দারস দিতেন। আমি ছাহেব কিবলাহ'র নির্দেশে হাদীস পড়ানো শুরু করি। এরপর সৎপুর কামিল ক্লাস চালু হলে আমি এখানে চলি আসি। যখন সৎপুর মাদ্‌রাসায় যাই তখন প্রথম বছর কামিল প্রথম বর্ষে আমি আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ পড়ালাম। বছর শেষে আমি মুহতামিম ছাহেবকে (মাওলানা গোলাম হোসাইন সৎপুরী র.) বিশেষ অনুরোধ করলাম যে, আমি বুখারী শরীফ পড়ানোর যোগ্য নই। আমি এই কিতাব পড়াবো না। বেয়াদবি হয়ে যাবে। আপনি যেমন করে পারেন সায়দা সাহেবকে আনেন। আমি আপনার সাথে যাবো তাঁকে অনুরোধ করবো অথবা আর কাউকে ব্যবস্থা করেন। তিনি বললেন, আপনাকে জোগাড় করতে আমি ছাহেব কিবলাহ'র সাথে অনেক জোরাজুরি করেছি। বেয়াদবি করেছি। আমি এ বিষয়ে আর পারবো না। আপনি যদি পারেন ছাহেব কিবলাহ'র সাথে কথা বলে দেখেন অন্য কাউকে আনতে পারেন কি না। যাকেই আনবেন আমি মেনে নেব। আমি তার দেখভাল করবো। মুহতামিম ছাহেব ফুলতলী ছাহেব কিবলাহকে এক সময় বলেই ফেললেন যে তিনি তো বুখারী পড়াতে চান না, অন্য কাউকে আনার জন্য বলছেন। ছাহেব কিবলাহ বললেন, পড়াতে চান না? বলবেন আমার সাথে দেখা করতে। ছাহেব কিবলাহ'র সাথে সাক্ষাত করলে আমাকে বললেন, তুমি নাকি বুখারী শরীফ পড়াতে চাও না? আমি বললাম, কীভাবে পড়াবো? একমাত্র আল্লামা আইনী রাহিমাহুল্লাহ এর শরাহ আছে, আর কিছু নেই। তবে মুহতামিম ছাহেব বলেছেন আমি যে কিতাব চাইবো, কেনার জন্য তিনি টাকা দেবেন। ছাহেব কিবলাহ বললেন, তাহলে কিনছো না কেন? আমি বললাম ছাব! আমি কখনো চিন্তা করিনি বুখারী পড়াবো! তিনি বললেন, তোমাকে তরীকতের সবক দেওয়ার সময় এক লতীফার ঐ সবকের কথা বলেছিলাম মনে আছে? যার নাম আখফা। আখফা লতীফার একটা আওয়াজ আছে, কান লাগিয়ে শুনলে অথবা পানির নিচে ডুব দিলে 'মি....ন' করে একটি আওয়াজ হয়। এমনি কান বন্ধ করলে তো বাতাসের শব্দ শোনা যায়। খেয়াল করো, আল্লাহর আরশে আজিমের মাঝখানে নিচের দিকে কালো নুকতাহ আছে। সবুজ রঙের নুকতাহ। এর নাম নুকতাতুল ইলিম। তোমার বুখারী শরীফ পড়ানোর জন্য যা দরকার পড়বে, কাশফ করলে এখান থেকে দিলে আসবে আর দিল

থেকে তুমি বুঝতে পারবে। পড়াও বুখারী শরীফ।

তখন ঢাকা থেকে অনেকগুলো কিতাব সংগ্রহ করলাম। দেওয়ান আব্দুর রউফ, শিকদার বাড়ির ছাহেব জনাব মোফাজ্জল আলী, বারগাত্তার ছাহেব ও কুলাউড়ার হাফিয আফতাব খান সাহেবকে দাওয়াত করে আনলাম। বুখারী শরীফের দারস শুরু হবে সৎপুর মাদ্‌রাসায়। নতুন কেনা কিতাব দিলাম ছাহেব কিবলাহ'র সামনে। তিনি উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললেন, বুখারী শরীফ পড়ানোর জন্য কোনো মানুষ পাচ্ছি না। এক ইশারা পেয়ে এখানে দারুল হাদীস চালু করেছি, এবং উনাকে এক ইশারা অনুযায়ী এখানে খিদমতে রেখেছি। আমি কি আর বলবো! আপনারা কি বলেন উনাকে দিয়ে বুখারীর দারস শুরু করি? সকলেই একসাথে বলে উঠলেন, 'ছাব যেটা বলেছেন সেটাই হোক' আলহামদুলিল্লাহ। আমাকে কিতাব দিয়ে বললেন, নাও শুরু করো। আমি বুখারী শরীফের অন্য এক নুসখা হাতে নিলাম। বললেন, বিসমিল্লাহ করো। কিতাবখানা হাতে নিয়ে মুখে লাগালাম, বুকে লাগালাম, পড়ানো শুরু করলাম। এই আমার শুরু।

আহমদ হাসান চৌধুরীঃ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ যে ইশারা পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে জানতে চাই।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূরঃ আমি ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর নির্দেশে হাদীসের খিদমত শুরু করেছিলাম। এ বিষয়ে তিনি যে ইশারা পেয়েছেন তা হাদীসের খিদমতে সম্পৃক্ত হওয়ার অনেক পরে আমি জানতে পারি। সৎপুর যাওয়ার পর গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হলে আমি বাড়িতে আসি। আমি ও খাদিমানী ছাহেব হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর সাক্ষাতে ছাহেব বাড়িতে যাই। ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় বাড়ির গেইটের কাজ তদারকিতে ছিলেন। গেইট তখন এতো উন্নত ছিল না। বাঁশ দিয়ে মেরামত করা হচ্ছিল। তিনি সাহায্যও করছিলেন। আমার এবং খাদিমানী ছাহেব এর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। রাস্তায় যেতে যেতে তাঁর সাথে আমার তর্ক হয়। তিনি আমাকে 'মুহাদ্দিস ছাহেব' বলে ডাকলে আমি তাঁকে বললাম আর একবার যদি আপনি এরকম করেন তাহলে আমি জবাব দেবো না। আমাকে কেউ এ নামে ডাকে না, আপনি আরেকটি উপাধি বের করবেন না।

যাই হোক, আমরা ছাহেব কিবলাহ'র খিদমতে হাযির হলাম, কদমবুসি করলাম। তিনি তাঁর খাদিম আলতাফ মিয়াকে ডাক দিলেন "আলতাফ! ঘরে জানিয়ে দাও রারাইর মুহাদ্দিস ছাহেব এসেছেন, চা পানি ব্যবস্থা করার জন্য। " তখন খাদিমানী ছাহেব আমাকে হালকা খোঁচা দিয়ে বললেন, দেখেছেন 'মুহাদ্দিস ছাহেব' ডাক কিন্তু কবূল হয়ে গেছে। নাস্তার পরে ছাহেব কিবলাহ টঙ্গীতে তাশরীফ আনলেন। তখন আমি, খাদিমানী ছাহেব ও আরো কয়েকজন ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'শোনো, আমি সৎপুর দারুল হাদীস খুললাম, তোমাকে সেখানে খিদমতে দিলাম এর কারণ আছে। আমি

হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইশারা পেয়েছিলাম, ইশারা কি সেটাও পরে আমাকে বলেছেন। ছাহেব কিবলাহ বলেছেন, দারুল হাদীস খোলার পর মুহতামিম সাহেব আমাকে অনুরোধ করলেন একজন মুহাদ্দিস যেন আমি নির্ধারণ করে দেই। কিন্তু আমি কাকে দেই, একজন তো আছেন। আমি একটু পেরেশানিতে পড়ে গেলাম কাকে দেওয়া যায় এখানে? এই পেরেশানির মধ্যে একদিন বাড়িতে থাকাবস্থায় কোনো একসময় আমার তন্দ্রাভাব চলে আসলো, দেখলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। আমি আরয করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ইশারায় আমি দারসে হাদীস চালু করেছি, এখন সেখানে হাদীস পড়ানোর জন্য কাকে খিদমতে দেবো সেটা নিয়ে পেরেশানিতে আছি, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুল মুবারক দিয়ে তোমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওনাকে দিয়ে দাও। ভালো হবে। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি তুমি আমার পাশে বসা। এজন্যই তোমাকে আমি সেখানে হাদীসের খিদমতে পাঠিয়েছি।

সৎপুরে দারুল হাদীস চালুর বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে ইশারা আছে সেটাও আমাকে একদিন ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন। ছাহেব কিবলাহ একদিন স্বপ্নে দেখলেন, তিনি এবং বায়মপুরী ছাহেব একদিন ট্রেনে করে পশ্চিমে কোথাও যাচ্ছিলেন বা আসছিলেন সৎপুরের পাশ দিয়ে। হঠাৎ তারা এক এক্সিডেন্টের শিকার হন। দুজনই ট্রেন থেকে সিটকে পড়ে যান। বায়মপুরী অন্য কম্পার্টমেন্টে। একটু আহতাবস্থায় হালকা বেহুঁশের হালতে তখন দেখলেন কেউ একজন ছাহেব কিবলাহকে টেনে তুলছেন। একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখেন স্বয়ং সরকারে দু-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কোলে করে নিয়ে সৎপুরের পাশে একটি মসজিদে বসালেন আর বললেন, এখানে কাজও হবে, আরাম পাবে। এর আগে এ মাদ্‌রাসায় ফাযিল জামাত ছিল। মুহতামিম ছাহেব বারবার অনুরোধ করছিলেন কামিল খোলার জন্য। এ স্বপ্ন দেখে আমি সাথে সাথে উদ্যোগ নিলাম। সত্যিই এখানে মাদ্‌রাসা হওয়ায় অনেক ফায়দা হয়েছে। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ যেদিন আমাকে সৎপুর পাঠিয়েছিলেন সেদিন আমাকে এ স্বপ্নের কথা বলেছিলেন। তখন আমার সাথে ছিলেন খাদিমানী ছাহেব। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁকে আজকে সাথে নিয়ে এ ঘটনা বলতাম। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে জান্নাতের বাসিন্দা করুন। ছাহেব কিবলাহ এ ঘটনা বলার পর আমরা দুজন আনন্দে খুব কেঁদেছি।

আমার বিষয়ে ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ যে স্বপ্ন দেখেছেন সে বিষয়ে একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ছাব, সত্যিই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা বলেছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ, এজন্যই তো তোমাকে আমি সেখানে পাঠালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুল মুবারক দিয়ে ইশারা করে বললেন, উনাকে

দিয়ে হবে। তখন আমি তাকিয়ে দেখি আমার ঠিক বামপাশে তুমি বসে আছো।

এর পরের বছর ছাহেব কিবলাহ হজ্জে গেলেন, সাথে ছিলেন বড় ছাহেব (হযরত মাওলানা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী) ও দেওয়ান আব্দুল বছির ছাহেব। আমি ঢাকা পর্যন্ত গিয়ে বিমানে তুলে বিদায় দিলাম। তখন আমি খুব কাঁদলাম আর বললাম, যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইশারায় আপনি আমাকে এই খিদমতে পাঠিয়েছেন, আমার খুব আশা যদি শরঈ কোনো ইজাযত পেতাম তাহলে খুব খুশি হতাম। হজ্জ থেকে ফেরার পর ছাহেব কিবলাহ আমাকে ডেকে বললেন, তোমার জন্য মদীনা শরীফ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিজ হাতে লাগানো খেজুর গাছ থেকে খেজুর এনেছি। এ বাগানটি সালমান ফারসী (রা.) এর নিজের অথবা তাঁর এক দাসের ছিল, আর গাছটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে লাগিয়েছিলেন। বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তাতে খেজুর ধরেছিল। আমি তোমার জন্য সরাসরি ইজাযত এনেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার এ খিদমতে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আহমদ হাসান চৌধুরী: হাদীসের দারস দেওয়ার সময় আপনি কি নিজস্ব কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করতেন বা কীভাবে এ বিষয়টা শুরু করতেন?

মুহাদ্দিস ছাহেব: আমি প্রথমে 'মতন' পড়তাম অথবা কোনো ছাত্রকে দিয়ে পড়িয়ে নিতাম। ছাত্রদের পড়ার সময় ভুল-শুদ্ধ খেয়াল রাখতাম, ভুল হলে কায়দা বলে দিতাম। মারুফ, মানসুব, মাজরুরসহ নাহু সম্পর্কিত কায়দাগুলো বলে দিতাম। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতাম। বিশেষ করে রিওয়ায়াত/দিরায়াত অথবা রাবী সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কিছু জানা থাকলে সেটা বলতাম।

আহমদ হাসান চৌধুরী: এক্ষেত্রে আপনি কোন শরাহগ্রন্থগুলোর বেশি সাহায্য নিতেন?

মুহাদ্দিস ছাহেব: আমি সাহায্য নিতাম ইমাম ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ লিখিত 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থের, সাথে থাকতো ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রাহিমাহুল্লাহ এর 'উমদাতুল কারী'। আমার পড়ালেখার সময় গাছবাড়িতে যখন পড়তাম সোহরাবপুরী হুযূর রাহিমাহুল্লাহ এর কাছ থেকে নিতাম ফাতহুল বারী, আর ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ যখন বদরপুর হাদীস পড়াতেন তখন তাঁর কাছে ছিল উমদাতুল কারী। এ দুইখানা কিতাব বেশি মুতালাআ করতাম। লামআতুত দিরায়া পড়তাম। আর মুওয়াত্তা আমাদের এখানে পড়া হয় না। আমি এটির ব্যাখ্যা পড়েছি। আমাদের বোর্ডের সিলেবাসে ছিল শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ এর লিখিত 'মুওয়াত্তা' এর শরাহ 'আওজাযুল মাসালিক'। এটি অনেক বড় একটি কিতাব। তিরমিযী শরীফ এর শরাহ 'মাআরিফুস সুনান' মুতালাআ করতাম। সব ধরনের হাদীসের কিতাব পড়ানোর জন্য এটি অনেক উপকারী। বুখারীর শরাহ হিসেবে উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী'র পাশাপাশি ইমাম কাস্তালানী রাহিমাহুল্লাহ এর 'ইরশাদুস সারী'ও খুব উপকারী একটি

কিতাব। যিনি নতুন পড়বেন তার জন্য অনেক ভালো। শব্দে শব্দে অর্থ আলাদা করে দেওয়া আছে। এসকল কিতাব ছাড়াও আরো অনেক কিতাব মুতালাআ করেছি।

এখানে একটি কথা বলতে চাই সৎপুর যাওয়ার সময় আমাকে কোন পদে নেওয়া হচ্ছে, কী পড়াতে হবে তা জানতে চাইনি, বেতন কত সেটাও জানতে চাইনি। আমার যতটুকু স্মরণ আছে আমি কোথাও এ কথাটি কাউকে জিজ্ঞাসা করিনি। বাবাও আমাকে নিষেধ করছেন 'কোথাও বেতন চাইবে না।' মুহতামীম ছাহেবের সাথে একটি শর্ত ছিল, আমি বাড়িতে গিয়ে খাবো না, আমাকে মাদ্‌রাসায় খাবার পাঠিয়ে দিবেন। অবশ্য, প্রথম কয়েকদিন আমি তাঁর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করেছি। আরেকটি শর্ত ছিল আমি যে কিতাব চাইবো তা আনিয়ে দিতে হবে। আমি প্রায়ই শুনতাম তিনি ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহকে বলতেন, এক মুহাদ্দিস ছাহেব আমাকে দিয়েছেন, কদিন পর পর পাঁচ হাজার টাকার কিতাব, দুই হাজার টাকার কিতাব কিনতে হয়। হাসতেন আর এসব কথা বলতেন। বলতেন, আমি শর্ত দিয়ে এনেছি যে কিতাব তিনি চাইবেন সেটা কিনে দেবো, এখন না দিয়ে থাকি কীভাবে? মুহতামীম ছাহেব টাকা দিতেন আর আমি করাচি বা আরব থেকে কিতাব আনাতাম।

আহমদ হাসান চৌধুরী: উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের চর্চা সম্পর্কে জানতে চাই। এখানে বুখারী শরীফ এত প্রসিদ্ধ কেন?

মুহাদ্দিস ছাহেব: আমাদের এ উপমহাদেশ হাদীসের খিদমাতে অনেক পিছিয়েছিল। হাদীসের চর্চা এখানে খুব কম ছিল। আমাদের এ দেশে প্রথমদিকে হাদীসের কিতাব ছিল মিশকাত শরীফ। এর চেয়ে উপরের স্তরের কোনো কিতাব ছিল না। এ কিতাব পড়লেই বড় আলিম ধরে নেওয়া হতো। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে হাদীসের অন্যান্য কিতাবের চর্চাও বাড়তে থাকে। তখন মা'কুলাত, মানতিক আর ফালসাফাহ'র যুগ ছিল। উপমহাদেশে এর চর্চাও খুব বেশি ছিল। এরপর হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ মক্কা শরীফ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে তাশরীফ আনলেন। তাঁর মাধ্যমে ইলমে হাদীস উপমহাদেশে ব্যাপকতা লাভ করে। তিনি আব্দুল ওয়াহাব মুত্তাকী রাহিমাহুল্লাহ এর কাছে হাদীস শরীফ পড়েছিলেন, যিনি ছিলেন কানযুল উম্মাল এর লেখক আলী মুত্তাকী এর উস্তায।

সেসময়ে বুখারী শরীফ যে একেবারে পড়া হতো না তেমন নয়। তবে এর বেশি প্রচার ছিল না। হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছিলেন। ফার্সিতে লিখেছিলেন 'আশআতুল লুমআত', আরেকটি সংক্ষিপ্ত আকারে লিখেছিলেন আরবীতে, নাম ছিল শুধু 'আল লুমআত।' তাঁর ছাহেবজাদা হযরত নুরুল হক দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ 'তাইসীরুল কারী' নামে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছিলেন। আমরা যে বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করি এর হাশিয়া লিখেছেন

মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী রাহিমাহুল্লাহ। এর আসমাউর রিজাল আনা হয়েছে 'তাইসীরুল কারী' থেকে।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ এদেশে মাওলানা মুহাম্মদ আফযাল রাহিমাহুল্লাহ এর কাছে হাদীস শরীফের পুর্ণাঙ্গ দারস গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বাবা শাহ আব্দুর রহীম দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ এর কাছেও পড়েছিলেন। এরপর দুই অথবা তিন বছর তিনি শিক্ষকতা করেন দিল্লীতে তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসায়ে রাহিমিয়াতে। অতঃপর তিনি চলে যান মক্কা শরীফে। মক্কা ও মদীনা শরীফে তাঁর অন্যতম উস্তায হলেন আবূ তাহির আল মাদানী রাহিমাহুল্লাহ, আমাদের সনদে যার নাম পাওয়া যায়। এরপর থেকে এ অঞ্চলে বুখারীর অধ্যয়ন বাড়লো। দিল্লীতে এর চর্চা বৃদ্ধির ফলে গোটা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ এর পর তাঁর ছাহেবজাদা হযরত আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ বুখারী শরীফের দারস দিতেন। এরপর মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ, তারপর মাওলানা শাহ আব্দুল গনী মুজাদ্দিদী নকশবন্দী রাহিমাহুল্লাহ বুখারী শরীফের দারস দিতেন। এ সময় ব্রিটিশদের অত্যাচার বাড়ার ফলে দিল্লী মাদ্‌রাসার ছাত্ররা ব্রিটিশবিরোধী হয়ে পড়েন। ব্রিটিশদের অত্যাচারের আশংকায় মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ও মাওলানা আব্দুল গনী মক্কায় হিজরত করেন। মাওলানা আব্দুল গনী সাহেব পরবর্তীতে মদীনা শরীফে স্থায়ী হন। এরপর আর দিল্লী মাদ্‌রাসায় পড়া হয়নি। ভারত হওয়ার পর সেখানে আবার পড়া শুরু হয়েছিল শুনেছি। কিন্তু তা আর পূর্বের রূপ ফিরে পায়নি। ইতোমধ্যে দেওবন্দ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মাদ্‌রাসাকে মাদ্‌রাসায়ে রহিমিয়া'র পরের সংস্করণ বলা হয়। দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসিম নানুতুবী রাহিমাহুল্লাহ মাওলানা আব্দুল গনী মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ এর ছাত্র ছিলেন।

আহমদ হাসান চৌধুরী: হাদীস অধ্যয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে উসূলে হাদীসের ক্ষেত্রে কোন কিতাবকে আপনি উপকারী মনে করেন?

মুহাদ্দিস ছাহেব: আমাদের সিলেবাসে সাধারণতঃ পড়া হয় হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ এর মুকাদ্দিমাতুত শাইখ যা মিশকাত শরীফের ভারতীয় সংস্করণের প্রথমভাগে সংযোজিত হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথমদিকে মূলত উসূলে হাদীস বিষয়ক কোনো কিতাব ছিল না। পারস্য থেকে আগত আলিম ছাহেবগণ শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী উলামায়ে কিরামের উসূলে হাদীস বিষয়ক কিতাব এ দেশে এনেছিলেন। ইমাম ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ এর 'নুখবাতুল ফিকর' উসূলে হাদীসের অন্যতম কিতাব। তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী।

সায়্যিদ শরীফ জুরজানী রাহিমাহুল্লাহ এর লিখিত কিতাব আল মুখতাসার এর শরাহ

লিখেছেন আব্দুল হাই লখনৌভী রাহিমাহুল্লাহ 'যাফরুল আমানী' নামে। উসূলে হাদীসের ক্ষেত্রে কিতাবখানা অনেক উপকারী। এটি হানাফী মাযহাব এর মূলনীতি অনুযায়ী লেখা হয়েছে।

আহমদ হাসান চৌধুরী: মিশকাত শরীফের শরাহ এর ক্ষেত্রে আপনি কোন কিতাবকে উত্তম মনে করেন?

মুহাদ্দিস ছাহেব: মিশকাত শরীফের শরাহ হিসেবে আল্লামা মুল্লা আলী কারী রাহিমাহুল্লাহ এর মিরকাত অনেক ভালো। ফিকহী মাসআলাসমৃদ্ধ এবং আরবী হওয়ায় আমাদের জন্য উপকারী। হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ এর 'আশআতুল লুমআত' ফারসী ছাপা হয়েছিল।

আহমদ হাসান চৌধুরী: হানাফী মাযহাবের দুনিয়াজুড়ে বিস্তৃতির কারণ কী মনে করেন?

মুহাদ্দিস ছাহেব: হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধির কারণ বললে অনেক কিছুই বলা যায়। যেমন, ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ এর পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের অনেক বাদশাহ ছিলেন হানাফী। তাদের মাধ্যমে হানাফী মাযহাব রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ এর বড় বড় বহু ছাত্র কাযী বা বিচারক হয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ট শাগরিদ ইমাম আবূ ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ বাদশা হারুনুর রশিদ এর আমলে কাযিউল কুওযাত তথা প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইমাম যুফার রাহিমাহুল্লাহও কাযী ছিলেন। তিনি হানাফী মাযহাব মানতেন। তাদের মাধ্যমে হানাফী মাযহাব বিস্তার লাভ করে। সর্বোপরি আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা হানাফী মাযহাবের বিস্তৃতির প্রধান কারণ।

এখানে আরেকটি বিষয় বলতে চাই, আমি এক সময় চিন্তা করলাম, ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ কেন রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন? শেষে যে বিষয় পেলাম তাহলো, তিনি নিজে রাজনীতি থেকে দূরে থেকে ইসলামের বৃহৎ খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার পাশাপাশি সমাজ গড়ার উপযোগী অনেক আলিম গড়ে তুলেছিলেন, যারা কাযী হয়ে দেশকে ইসলামী রাজনীতির আলোকে পরিচালনা করতে অনেক ভূমিকা রেখেছিলেন।

আহমদ হাসান চৌধুরী: ইলমে তাসাওউফ অর্জন করতে মুরশিদের প্রয়োজন কতটুকু?

মুহাদ্দিস ছাহেব: বিষয়টি আমি আগে বলেছি। আমার দৃষ্টিতে বলতে গেলে আমি বলবো, একজন মানুষ যেমন ডাক্তারি কিতাব পড়ে ডাক্তার হতে পারে না, কোন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া লাগে, ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়, শরীরের কোথায় কী আছে দেখিয়ে দিতে হয়, তেমনিভাবে ইসলামী শরীআতে একজন বুযুর্গের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া নিজে নিজে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। তাসাওউফ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হতে হলে তাসাউফপন্থী মানুষের কাছে বসে দীক্ষা নিতে হয়। আমি প্রথমে

এসব বুঝতাম না। পূর্বে উল্লেখ করেছি একজন বুযুর্গের লেখা 'আল ইবরীজ' কিতাব পড়ার মাধ্যমে আমার দিলে এসবের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। আমি আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর নিকট গেলাম। ছাহেব কিবলাহ কখনো বলেননি আমার কাছে আসো, বাইআত হও। অনেক মানুষ এসেছে, তাঁর কাছে বাইআত হয়েছে, কাউকে বলেননি ইস্তিখারার কথা। আমি যেতেই বললেন ইস্তিখারা করো। এরপর বাইআত করালেন।

আহমদ হাসান চৌধুরী: ইলমে তাসাওউফ সম্পর্কে জানার জন্য কোন কোন কিতাব পড়া যায়?

মুহাদ্দিস ছাহেব: তাসাওউফের তেমন উল্লেখযোগ্য কিতাব আমাদের কাছে নাই। কারণ, পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামের অনেকের লেখা কিতাবের ছাপা পাওয়া যায় না। এখন শুনছি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব নতুন করে ছাপা হচ্ছে। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর 'আনওয়ারুছ ছালিকীন' তাসাওউফের একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। এ কিতাব পড়লে অনেক কিছু শিখা যাবে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ এর আল কাউলুল জামিল, হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহ এর লেখা রফীকুস সালিকীন এগুলো পড়তে পারেন। তাসাওউফপন্থী বুযুর্গানে কিরামের কিতাবের বাইরে আলাদা আলাদা কিছু তা'লীমও আছে।

আহমদ হাসান চৌধুরী : তাফসীর অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমাদের মানহাজ কী হওয়া উচিত? প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য কোন কিতাব আর উচ্চপর্যায়ের জন্য কোন কিতাব অধ্যয়ন করা ভালো মনে করেন?

মুহাদ্দিস ছাহেব : প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য যে তাফসীরে জালালাইন পড়া হয় এটা অনেক ভালো। ফিকহী মাসআলা-মাসাঈল এতে যথেষ্ট নেই। এক্ষেত্রে তাফসীরে মাযহারী পড়া যেতে পারে। আর সহজ-সরল বিবেচনায় মাআরিফুল কুরআন ভালো। গবেষণার জন্য আরো উঁচু পর্যায়ের কিতাব, যেমন- তাফসীরে ইবন কাসীর, তাফসীরে তাবারী, রুহুল মাআনী, আল বাহরুল মুহীত, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহিমাহুল্লাহ এর মাফাতিহুল গাইব ইত্যাদি দেখা প্রয়োজন। তাফসীরে ইবন কাসীরকে সংক্ষিপ্তাকারে সংকলন করেছেন আল্লামা সাবুনী রাহিমাহুল্লাহ, এটাও অনেক ভালো। এটিতে তিনি অনেক ইসরাঈলী বর্ণনা ছেড়ে সংকলন করেছেন। কিছু ইসরাঈলী বর্ণনা থাকলেও সেগুলোতে বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। মুখতাসার করতে গিয়ে লা-মাযহাবীরা অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছে। এদের কার্যক্রম বড় সাংঘাতিক। একবার মদীনা শরীফে ফজরের নামায পড়ে বের হয়েছি কিছু একটা কিনব বলে। তখন একটি বই দেখলাম যেখানে ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ এর সহীহ বুখারী'র শরাহ 'ফাতহুল বারী' থেকে ভুল চিহ্নিত করে আলাদা কিতাব তারা লিখেছে। যিনি লিখেছেন তিনি আবার বিন বায এর

শাগরিদ। বিন বাযের বরাতেও কয়েকটা লিখেছেন। তাদের দৃষ্টিতে যে দুটি বিষয় মারাত্মক তাহলো তাবাররুক ও তাওয়াসসুল। অথচ ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ এ দুটি বিষয়কে খুব গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। শুনেছি তারা নাকি এ দুটি বিষয় বাদ দিয়ে ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ এর ফাতহুল বারী ছেপেছে।

আহমদ হাসান চৌধুরী : উসূলুল ফিকহ এর ক্ষেত্রে কোন কিতাবগুলো প্রাধান্য দিলে আমাদের জন্য ভালো হবে?

মুহাদ্দিস ছাহেব : উসূলুল ফিকহ এর ক্ষেত্রে উসূলুশ শাশী, মুসাল্লামুস সুবূত, আত তালবীহ আলাত তাওদীহ' ইত্যাদি কিতাব দেখা যেতে পারে। ফিকহের বিস্তর আলোচনা দলীলসহ জানতে হলে হিদায়া পড়তে হবে।

আহমদ হাসান চৌধুরী : আকীদার ক্ষেত্রে কোন কিতাবগুলো পড়া প্রয়োজন?

মুহাদ্দিস ছাহেব : ইলমুল কালামের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর পড়াশুনা ও কাজ করা প্রয়োজন। আল ফিকহুল আকবার, শরহে ফিকহুল আকবার, আকীদাতুত তাহাবী খুব ভালো। সব মতের আলিমগণ আকীদাতুত তাহাবী এর শরাহ লিখেছেন। আল ফিকহুল আকবার এর ব্যাখ্যা খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব যেটি লিখেছেন, আমার মনে হয়েছে তিনি এর আকীদা পরিবর্তন করার জন্যই সম্ভবত এ বিষয়ে কাজ করেছেন। বিষয়গুলোকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছেন। এটা আসলে শরাহ নয়; আকীদার মধ্যে ভেজাল সৃষ্টির জন্যই এ কাজ তিনি করেছেন।

আকীদার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের প্রধান দুটি দল হলো আশআরী ও মাতুরিদী। এ দু'দলের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। বড় কোনো পার্থক্য নেই। হানাফীরা মাতুরিদী। ইমাম মাতুরিদী হানাফী ছিলেন। সময়ের প্রয়োজনে তিনি আকীদার বিষয়ে অধিক চর্চা করেছেন বিধায় তিনি এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আর বাকি তিন মাযহাবের বেশিরভাগই আশআরী। ওহাবী-লামাযহাবীরা আশআরী-মাতুরিদী এ দুজনের কাউকে মানে না। তারা নিজেদের 'আসারী' দাবী করে।

আহমদ হাসান চৌধুরী : তরীকা চর্চার উদ্দেশ্য এককথায় কী হবে?

মুহাদ্দিস ছাহেব : তরীকা চর্চার আসল উদ্দেশ্য হলো ইসলাহে কলব, ইসলাহে আখলাক। এ বিষয়গুলো একজনের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ না নিলে সংশোধন হওয়ার সুযোগ নেই। বর্তমান সময়ের অনেক পীর সাহেবের কাছে এ প্রশিক্ষণগুলো অনুপস্থিত। সবকের পাশাপাশি যে বিস্তর তরবিয়ত এর প্রয়োজন সেটা তাঁরা খেয়াল করেন না। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ফুলতলী সিলসিলায় এ প্রশিক্ষণ (যেমন: হিযবুল বাহারের চিল্লা, চিশতিয়া তরীকার খিলওয়াত) জারী আছে।

আহমদ হাসান চৌধুরী : ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে তরুণ আলিমদের কী কী বিষয় খেয়াল

করা জরুরি?

মুহাদ্দিস ছাহেব : বর্তমান সময়ে একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি হলো শুধু হাদীস দেখে ফাতওয়া দেওয়া। ইন্টারনেট থেকে হাদীস দেখেই ফাতওয়া দিলে হবে না, বরং ফিকহের কিতাব থেকে ফাতওয়া দেওয়া জরুরি। সাথে দলীল হিসেবে হাদীস বলতে পারেন। নিজের থেকে বানিয়ে কিছু না বলে ফিকহের কিতাব থেকে ফাতওয়া দেওয়া উত্তম। আমরা তো মুজতাহিদ নই যে, মাসআলা বের করব। অনেক বিষয় আছে যেগুলো কুরআন এবং হাদীসে সরাসরি বর্ণিত। যেগুলো সরাসরি বর্ণিত নয় বা বিভিন্নমুখী হাদীস বিদ্যমান সেগুলো সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের আলোকে মুজতাহিদগণ ফাতওয়া দিয়েছেন। যিনি মুজতাহিদ নন তার দ্বারা এটি সম্ভব নয়। তাই শুধু হাদীস দেখে ফাতওয়া দিলে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। বর্তমান সময়ে সালাফী-লা মাযহাবীরা এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

আহমদ হাসান চৌধুরী : আপনি তো অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন, বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও ইসলামী নিদর্শন সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা জানতে চাই?

মুহাদ্দিস ছাহেব : আলহামদুলিল্লাহ, হারামাইন শরীফাইনের যিয়ারত ছাড়াও সিরিয়া, মরক্কো, মিশরসহ বিভিন্ন দেশে সফরের সুযোগ হয়েছে। সিরিয়া ভ্রমণ তেমন একটা দীর্ঘ হয়নি। সিরিয়ায় দামেশকের বাবুস সাগীর এর পাশে হযরত বিলাল (রা.)সহ অনেক সাহাবায়ে কিরাম শুয়ে আছেন। তাদের যিয়ারত করেছি। বিলাল (রা.) এর মাযারের উপরের একটি গিলাফ আমাকে হাদিয়া দিয়েছেন মাওলানা আবুল খায়ের, যেটি আমার ঘরে আছে। এর পাশেই এক ঘরে শুহাদায়ে কারবালার মাযার যিয়ারত করেছি। সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ূবী এর কবর যিয়ারত করেছি। তাঁর আগে সুলতান ছিলেন আবদুল হামিদ, হামিদী বাজারে তাঁর মাযার যিয়ারত করেছি। কনস্ট্রাকশনের কাজ চলমান তাই পাশে যেতে পারিনি, দূর থেকে যিয়ারত করেছি। ইমাম মিযযী[২] রাহিমাহুল্লাহ এর কবরও যিয়ারত করেছি। তাঁর জীবিত আওলাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথা হয়েছে। মিযযী বংশের একজন আলিমের সাথে দেখা হয়েছে। তার লিখিত উসুলে হাদীস সম্পর্কিত একটি কিতাবও আমাকে হাদিয়া দিয়েছেন।

মরক্কোতে গিয়েছি। সেখানে মাশায়িখে সাবআর যিয়ারতে গিয়েছি। দালাইলুল খাইরাত এর মুসান্নিফ ইমাম জাযুলী রাহিমাহুল্লাহ এর কবর যিয়ারত করেছি এবং সেখানে বসে দালাইলুল খাইরাত খতম করেছি। কাযী ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ এর কবর যিয়ারত করেছি। সকলের মাযার আবার শহরের ভিতরে নয়। শহরের বাইরে অনেকেই চলে গিয়েছিলেন। আরো অনেকের কবর যিয়ারত করেছি। ইমাম শাযুলী রাহিমাহুল্লাহ এর কবরও যিয়ারত করেছি।

মিশরে গিয়েছিলাম, সেখানে দুই দিন ছিলাম। ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ এর কবর

যিয়ারত করেছি। মাযারের কাজ চলমান তাই একটু দূর থেকে যিয়ারত করতে হয়েছে। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী হানাফী রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ এর কবরও যিয়ারত করার সৌভাগ্য হয়েছে। ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ এর মাজারের পাশে বসে হাদীসের দারস দিয়েছি। সফরে কয়েকজন আলিম সাহেব সাথে ছিলেন, যার মধ্যে দারুল হাদীস লতিফিয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী সাহেবও ছিলেন। তাদের পীড়াপীড়িতে বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস ও শেষ হাদীস দারস দিয়েছিলাম। দেখলাম আমাদের আশপাশে মাযারের দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরাও দারসে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহসহ আরও কয়েকজনের যিয়ারত করেছি।

ইস্কান্দারিয়াতে গিয়ে কাসীদায়ে বুরদা'র মুসান্নিফ ইমাম বূসীরী রাহিমাহুল্লাহ ও তার মুরশিদের কবর যিয়ারত করেছি। দুজনের মাযার কাছাকাছি। আমরা সকলে মিলে ইমাম বূসীরীর মাযারের পাশে বসে কাসীদায়ে বুরদা শরীফ খতমও করেছি। কায়রো থেকে বাসে এ জায়গায় যেতে ৩ ঘণ্টা লেগে যায়। আলিম সাহেবগণের উচিত কাসীদায়ে বুরদা শরীফ অধ্যয়নের অভ্যাস করা। কেউ কেউ এ কাসিদার শের বা স্তবকগুলোর উপর আপত্তি এনেছেন, হক্কানী অলিমগণ এর জবাবও দিয়েছেন। হাদীসের কিতাবের মধ্যে বুখারী শরীফ, দুরূদের কিতাবের মধ্যে দালাইলুল খাইরাত, আর না'তের মধ্যে কাসীদায়ে বুরদার মকবুলিয়াত সবার ঊর্ধ্বে। ইমাম বূসীরী রাহিমাহুল্লাহ এর মাযারের পাশে দেখলাম বাচ্চারা 'শাইখ, বুরদা!' 'শাইখ, বুরদা!' বলে কিতাবগুলো বিক্রি করছে আর অনেকেই মুহাব্বাত করে তা কিনছেন। এ কিতাবের মাকবুলিয়াত মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত তুলনাতীত।

আহমদ হাসান চৌধুরী : কাযী আয়ায রাহিমাহুল্লাহ এর শিফা কিতাব সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।

মুহাদ্দিস ছাহেব : এটি অনেক মূল্যবান একটি কিতাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীরাত বিষয়ক এ কিতাবখানা ভিন্ন ধরনের। কাযী আয়ায রাহিমাহুল্লাহ এর শিফা আর আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ এর মাদারিজুন নুবুওয়াহ এগুলো ভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সীরাত বিষয়ক কিতাব। এগুলোকে অনেকটা বরকতী কিতাবও বলা যায়। মাদারিজুন নুবুওয়াহ সকলেই পড়া দরকার।

শিফা কিতাব একসময় আলিম সাহেবগণ খতম করে বিশেষ দুআ করতেন। কোন বিশেষ রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য এ কিতাবখানা খতম করা হতো। আমি সৎপুর থাকাবস্থায় একবার অসুস্থ হলে মাওলানা ইরশাদ হুসাইন গুয়াহুরী রাহিমাহুল্লাহ এ কিতাবখানা খতম করে আলিম সাহেবগণকে নিয়ে আমার রোগমুক্তির জন্য দুআ করেছিলেন।

পুরো কিতাব রাত-দিন পড়ে খতম করে আমাকে সামনে নিয়ে দুআ করেছিলেন। ইদানিং এই কিতাবখানা অনেকে খুলেও দেখেন না। এটি অনেক বরকতপূর্ণ কিতাব। আল্লাহর কাছে মকবূল কিতাব।

আহমদ হাসান চৌধুরী : শাইখ ইবন তাইমিয়া সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।

মুহাদ্দিস ছাহেব : ইবন তাইমিয়া অনেক বড় আলিম হলেও জমহুরের সাথে তার মতের মিল নেই। তিনি হাম্বলী দাবি করতেন। কিন্তু হাম্বলী মাযহাবের সাথেও আসলে তার মিল নেই। তিনি নিজস্ব একটি মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। বেশিরভাগ উলামায়ে কিরাম তাকে মন্দ বলার প্রধান কারণ হলো, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরকে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়টা তার প্রতি মানুষের নেতিবাচক ধারণা জন্ম দিয়েছে। তার আরেকটি ভুল হলো তিনি চার মাযহাবের বিপরীতে গিয়ে তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করেছেন। ইবন তাইমিয়ার একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ইবনুল কায়্যিম। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ওস্তাদ ইবন তাইমিয়া এর মতকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন। আরেকজন হলেন ইবন আবদুল হাদী। তিনি ইবনুল কায়্যিম এর মতো এতো প্রসিদ্ধ নন, তবে খুব সূক্ষ্মভাবে ইবন তাইমিয়ার পক্ষপাতিত্ব করেছেন। আল্লামা ইবন কাসীরও ইবন তাইমিয়ার ছাত্র। তবে তিনি তার এতো পক্ষপাতিত্ব করেননি।

আহমদ হাসান চৌধুরী : ফুলতলী ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর জীবনের রুটিন আপনার দেখা মতে কেমন ছিল?

মুহাদ্দিস ছাহেব : ফুলতলী ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাতেন। দারস-তাদরীস, তা'লীম-তারবিয়াত ও ওয়ায-নসীহতে তাঁর দিন অতিবাহিত হতো। ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে চিল্লা-মুরাকাবা-মুশাহাদা করতেন। কয়েকটি চিল্লায় আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি তাহাজ্জুদের পাবন্দ ছিলেন। কুরআন শরীফের দারস প্রদানের প্রতি খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন। কাউকে কুরআন শিক্ষা দিতে পারলে অনেক খুশি হতেন। সামনে এক-দুজন হলেও কুরআন শরীফ পড়াতেন।

একদিন ছাহেব কিবলাহ নজিপুর তাশরীফ নিয়েছেন। সেখানে কোনো মাহফিল ছিল না। একটি হাফিযিয়া মাদ্‌রাসা আছে সেখানে। মাদ্‌রাসার হাফিয সাহেব ছাহেব কিবলাহকে অনুরোধ করেন দুটি সূরা মশক দানের জন্য। ছাহেব কিবলাহ সূরা ফাতিহা ও সূরা আদদোহা মশক দেন। সফরে থাকাবস্থায় খুব বেশি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। রামাদান শরীফে কয়েকবার পবিত্র কুরআন শরীফ খতম করতেন। মাঝেমধ্যে সফরে ছাহেব কিবলাহর সাথে থাকাবস্থায় ছাহেব কিবলাহকে তিলাওয়াত শোনাতাম। তিনি কখনো না করেননি; বরং বলতেন কোথায় সমস্যা হয় বলো, কুরআন শরীফ নিয়ে আসো। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন নিবিষ্টচিত্তে। এ সময় অন্য কিছুকে গুরুত্ব দিতেন না। এক ধ্যান, এক মন– শুধু তিলাওয়াতের দিকে। তাঁর জীবনের শেষ রামাদান

মাসে তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমিও কিছুটা অসুস্থ ছিলাম। ঈদের জামাআত আমি থানা বাজার পড়ে ভাই-ভাতিজাদের বললাম, 'চলো, ছাহেব কিবলাহকে কদমবুসি করে আসি।' আলহামদুলিল্লাহ, কোনো ঈদে ছাহেব কিবলাহকে কদমবুসি করা আমার বাদ পড়েনি। চলে গেলাম ফুলতলীতে। ছাহেব কিবলাহ আমাকে দেখে বললেন, আমি আজ জামাআত আদায়ের পর কয়েক সূরা মশক দিয়েছি। আজকের দিনে আমার সফল গল্প এটি।

কিরাত শিক্ষায় ছাহেব কিবলাহ'র যে ত্যাগ তা ঈর্ষণীয়। ছাহেব কিবলাহ বদরপুর থাকাবস্থায় প্রায় সময় ইমামতী করতেন। একদিন তাঁর মুরশিদ বদরপুরী ছাহেব বললেন তোমার কিরাতে কিছু ভুল আছে, সংশোধন করতে হবে। বদরপুরী ছাহেবই তাকে মক্কা থেকে আগত আব্দুর রউফ করমপুরী রাহিমাহুল্লাহ এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এখানে তিনি কিরাত শিখলেন। ছাহেব কিবলাহ মাঝে মাঝে (আব্দুর রউফ করমপুরী রাহিমাহুল্লাহ এর বাড়ির) রাখাল বালককে চকলেট দিয়ে তাদের কাছ থেকে হরফের উচ্চারণ আয়ত্ত্বের চেষ্টা করতেন (করমপুরী রাহিমাহুল্লাহ এর বাড়িতে অবস্থানের সুবাদে তার আরবী হরফের উচ্চারণ সহীহ ছিল)। এরপর ছাহেব কিবলাহ গেলেন মক্কায়। আহমদ হিজাযী রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে কিরাত শিক্ষা দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন ছাহেব কিবলাহ কিছু তিলাওয়াত শুনাতে চাইলেন। তিলাওয়াত শুনে আহমদ হিজাযী রাহিমাহুল্লাহ বললেন হ্যাঁ, তোমাকে শেখানো যায়। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ খুব পরিশ্রম করেছেন কুরআনের জন্য। আমরা এর ফল লাভ করেছি। হযরত ছাহেব কিবলাহকে আল্লাহ তাআলা সত্যিই তাসাওউফের পাশাপাশি কিরাতের জন্যও কবূল করেছিলেন।

আহমদ হাসান চৌধুরী : মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খান সাহেব ফুলতলী ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে প্রশংসা করতে গিয়ে দুটি গুণের কথা বিশেষভাবে বলেছেন সেগুলো হলো- ফুলতলী ছাহেবকে আল্লাহ কুরআনের জন্য কবূল করেছেন এবং তিনি খুব কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। হুজুরের কাছে ফুলতলী ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর কোন গুণ বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল?

মুহাদ্দিস ছাহেব : হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ এর কিরাত ও পরিশ্রমের বিষয় তো আগেই উল্লেখ করলাম। এছাড়া তাঁর বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি সবসময় মানুষের মঙ্গল কামনা করতেন। সংশ্লিষ্টদের জন্য কীভাবে কিছু করবেন, কীভাবে তারা স্বচ্ছল হবে এই ধ্যান তাঁর সবসময়ই ছিল। গরীবদের কীভাবে সাবলম্বী করা যায়; কীভাবে কিছু মূলধন দিয়ে ব্যবসায় লাগিয়ে দেওয়া যায় ছাহেব কিবলাহ'র এই ধ্যান থাকতো। তাঁর এই একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, মানুষের উপকার করার জন্য সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। কীভাবে ছাত্রদের পড়ালেখার উন্নতি হবে এই চিন্তাও করতেন।

এমনও দেখেছি যে, নিজ হাতে শিশুদেরকে 'আলিফ', 'বা' এসব লেখাতেন, পড়াতেন।

ছাহেব কিবলাহ যখন গাছবাড়িতে পড়াতেন তখন অনেক সময় ছাহেব কিবলাহ'র নৌকায় করে বাড়িতে আসতাম। তখন তো গাড়ি ছিল না। নৌকায় মসলা তৈরির পাটাসহ অনেক কিছু তুলতাম। আর মনে মনে বলতাম ছাহেব বাড়ির মহিলারা কি দুইদিন পরে পরে পাটা ভাঙ্গেন নাকি? শেষে দেখলাম এগুলো তিনি কিনতেন অন্যকে সাহায্য করার জন্য। আমাদেরকে বলতেন, ঐ মহিলাকে এটি দিয়ে আসো, সেই মহিলাকে এটি দিয়ে আসো।

আহমদ হাসান চৌধুরী : আমাদের তরুণ আলিমদের প্রতি যদি কোনো দিকনির্দেশনা দিতেন, বিশেষ করে কীভাবে আমল-আখলাক ও অধ্যয়নকে সুসংগঠিত করা যায়?

মুহাদ্দিস ছাহেব : তালীমের সাথে তারবিয়াত একান্তই জরুরী। অন্যান্য শিক্ষায় তা'লীমের সাথে তারবিয়তের সম্পর্ক না থাকলেও ইসলামী শিক্ষায় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা অনেকটা নির্ভর করে মাদ্‌রাসার যিনি পরিচালক তার ওপর এবং উস্তাযগণের আন্তরিকতার উপর। শিক্ষকদের কাছ থেকেই ছাত্ররা তা'লীম-তারবিয়াত অর্জন করার কথা। এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আলিমের জীবনে ইলমের সাথে সাথে আমলের গুরুত্ব থাকা চাই।

আহমদ হাসান চৌধুরী : ওয়াইযদের বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী?

মুহাদ্দিস ছাহেব : প্রথম কথা হলো ওয়াইযদের বেশি বেশি করে কিতাব অধ্যয়ন জরুরী। আহকাম, আদাব ও আমালিয়াত সম্পর্কিত আয়াত, হাদীস বেশি বেশি করে পড়বেন। সিহাহ-সিত্তাহ ছাড়াও হাদীসের বিভিন্ন কিতাব যেমন- রিয়াদুস সালিহীন, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আদাবুল মুফরাদ ইত্যাদির পাশাপাশি সীরাতের নির্ভরযোগ্য কিতাব অধ্যয়ন করবেন। তাহলেই প্রকৃত ওয়ায হবে। যখন বলবেন নির্ভরযোগ্য কথা বলবেন। শুধু সুর কিংবা জোড়াতালি দিয়ে ওয়ায কোনো কাজের বিষয় নয়। আলহামদুলিল্লাহ, কিছু এলাকায় দেখলাম সুর ছাড়াও বিজ্ঞ আলিমদের নাম প্রস্তাব করে তাদের দাওয়াত করা হয়। এরকম আগ্রহ দিন দিন বাড়ুক। প্রকৃত আলিমদের ওয়াজ শুনলে মানুষ উপকৃত হবে।

Footnotes:

১. আত তালদ্বীহ আলাত তাওদ্বীহ (সাদ উদ্দীন মাসউদ ইবনে উমর আত তাফতাজানী, [৭১২/১৩১২-৭৯৩/১৩৯০]

২. তিনি হচ্ছেন জামালুদ্দীন আবূ হাজ্জায ইউসুফ আল মিযযী। [৬৫৪ হিজরী]

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতাওয়া

শায়খুল হাদীস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ
প্রদত্ত একটি ফাতাওয়া

[শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ সাধারণত: কোন বিষয়ে ফাতাওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকতেন। কোন বিষয়ে কেউ লিখিত ফাতাওয়া চাইলে অন্যান্য উলামায়ে কিরামের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তবে কোন কোন সময় শরয়ী কোন বিষয় নিয়ে সমাজে বড় ধরনের বিশৃংঙ্খলার সম্ভাবনা দেখা দিলে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের চাহিদার প্রেক্ষিতে তিনি লিখিত ফাতাওয়া প্রদান করতেন।

এরকম একটি ফাতাওয়া প্রেক্ষাপট হলো জকিগনজ উপজেলাধীন কালিগনজ বাজার জামে মসজিদ স্থানান্তর করে পূণর্নিমাণ করা হলে মসজিদের কিবলাহ সঠিক হয়নি মর্মে কথা উঠে। এ নিয়ে এলাকার দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তৎকালীন ইউনিয়ন চেয়ারম্যানসহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে বিষয়টির শরয়ী সমাধানের জন্য হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের নিকট ফাতাওয়া চাওয়া হয়। তিনি এ বিষয়ে যে লিখিত ফাতাওয়া দিয়েছিলেন। এই ফাতাওয়ার ভিত্তিতে বিষয়টি শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়। গুরুত্বপূর্ণ সেই ফাতাওয়া নিম্নে গ্রন্থিত হলো। উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর স্বহস্ত লিখিত ফাতাওয়ার স্ক্যান কপি সংযুক্ত করা হলো। -সম্পাদক]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জকিগনজ উপজেলাধীন ৯ নং মানিকপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের ১৭/০২/২০০৪ ইং তারিখের মাসিক সভার কার্যবিবরণীয় ১নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কালিগনজ বাজার বায়তুননূর জামে মসজিদ কমিটি, মসজিদ নির্মাণ কমিটি ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে জনাব কবির আহমদ ইউপি সদস্যের সভাপতিত্বে ০৩/০৩/২০০৪ ইং তারিখের সাধারণ সভায় জনাব হেলাল আহমদ চৌধুরী চেয়ারম্যান ৯ নং মানিকপুর ইউপি, জনাব কবির আহমদ ইউপি সদস্য ও জনাব শাহজাহান চৌধুরীকে নিয়ে তিন সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মুতাবেক উক্ত কমিটি একজন দক্ষ প্রকৌশলী দ্বারা কালিগনজ বাজার বায়তুন নূর জামে মসজিদের কিবলাহ সঠিক না অঠিক তা নির্ণয় করিয়ে একটি প্রতিবেদন আমি মো. হবিবুর রহমান , অধ্যক্ষ ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসা এর হাতে তুলে দেন।

জনাব প্রকৌশলী সাহেব তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন, কালিগনজ বাজার বায়তুন নূর জামে মসজিদের উধংঃ ডবংঃ খরহব প্রকৃত কাবার দিক থেকে ১৮ ডিগ্রী ডানে আছে। অর্থাৎ, প্রকৃত কাবার দিক ১৮ ডিগ্রী বামে হবে।

প্রতিবেদনটি হাতে তুলে দিয়ে কমিটি উক্ত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাকে অনুরোধ জানান যে, প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে এ ব্যাপারে যেনো একটি লিখিত সিদ্ধান্ত পেশ করি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হানাফী ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবাদিতে উল্লেখ করা এ সম্পর্কিত ফয়সালার সারসংক্ষেপ নিম্নে পেশ করা হলো।

ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবাদিতে কিবলার দিক নির্ণয় এবং তার সীমা পরিসীমা সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোর সারসংক্ষেপ হলো এই যে, নামাযরত ব্যক্তির চেহারা বা মুখমণ্ডলের কোন একটি অতি নগণ্য অংশও যদি (তা মুখমণ্ডলের সম্মুখ ভাগেরই হউক অথবা তার ডান বা বাম পার্শ্বেরই হউক) পবিত্র কা'বা গৃহের কোন একটি সামান্য অংশমুখী থাকে তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে। আর প্রকৌশল বিদ্যার পরিভাষায় নামাযরত ব্যক্তি পবিত্র কা'বার দিক থেকে ৪৫ ডিগ্রী ডান অথবা বাম দিকে ফিরে যদি নামায আদায় করে তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে। তবে এর চাইতে বেশি ডান দিকে বা বাম দিকে ফিরে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হবেনা।

তিরমিযী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা ও তার আশেপাশের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করে গেছেন ما بين المشرق والمغرب قبلة অর্থাৎ, পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যভাগ পুরোটাই কিবলা। যেহেতু মদীনা শরীফ কা'বা ঘরের উত্তর দিকে অবস্থিত তাই মদীনাবাসীগণের কিবলাহ হয় দক্ষিণ দিকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যখানের পুরো দক্ষিণ দিককেই তাঁদের কিবলাহ বলে ঘোষণা করে গেছেন; যা প্রকৌশল শাস্ত্রের হিসাবে গোটা ভূমণ্ডলের এক চতুর্থাংশ বা ৯০ ডিগ্রী। উপরোক্ত হাদীস শরীফের উপর ভিত্তি করেই ফিকহের ইমামগণ লিখে গেছেন যে, কা'বা গৃহের ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রী এবং বাম দিকে ৪৫ ডিগ্রী এই মোট ৯০ ডিগ্রীই কিবলা। উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে আমাদের বাংলা বা ভারতীয় কিবলাহ হবে পুরোটা পশ্চিম দিক, তথা পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত ও দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যভাগ। অর্থাৎ, গোটা পশ্চিম দিকের ৯০ ডিগ্রী কিবলাহ ব্যাপারে হানাফী ইমামগণের উপরোক্ত উক্তিটি অধিক প্রশস্ততাপূর্ণ।

উপরোক্ত উক্তি সম্পর্কীয় ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবদির আরবী ইবারাত নিম্নে প্রদত্ত হলো।

রাদ্দুল মুহতার (শামী) ১ম খণ্ডের ২৮৮ পৃষ্ঠায় আছে-

فَعُلِمَ أَنَّ الِانْحِرَافَ الْيَسِيرَ لَا يَضُرُّ، وَهُوَ الَّذِي يَبْقَى
مَعَهُ الْوَجْهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ جَوَانِبِهِ مُسَامِتًا لِعَيْنِ الْكَعْبَةِ أَوْ لِهَوَائِهَا، بِأَنْ يَخْرُجَ الْخَطُّ مِنْ الْوَجْهِ أَوْ مِنْ بَعْضِ جَوَانِبِهِ وَيَمُرَّ عَلَى الْكَعْبَةِ أَوْ هَوَائِهَا مُسْتَقِيمًا، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْخَطُّ الْخَارِجُ

عَلَى اسْتِقَامَةٍ خَارِجًا مِنْ جَبْهَةِ الْمُصَلِّي بَلْ مِنْهَا أَوْ مِنْ جَوَانِبِهَا

মুফতি শফি রাহিমাহুল্লাহ তদীয় কিতাব জাওয়াহিরুল ফিকহ এর ২৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, আল ফাতাওয়া আল খাইরিয়্যাহ ১ম খণ্ড ৭ নং পৃষ্ঠায় আছ -

وعن أبي حنيفة المشرق قبلة أهل المغرب والمغرب قبلة أهل المشرق والجنوب قبلة أهل الشمال والشمال قبلة أهل الجنوب وعليه فالإنحراف القليل لايضر اه (جواهر الفقه نقلا عن الفتاوى الخيرية 1/255)

আল বাহরুর রাইক কিতাবের ১ম খণ্ডের ৩০১ পৃষ্ঠায় আছে -

فلو فرض مثلا خط خطا من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة ولهذا وضع العلماء قبله بلد وبلدين وبلاد على سمت واحد (البحر الرائق 1/ 300)

অনুরূপ উক্তি রাদ্দুল মুহতার (শামী), ফাতহুল কাদীর, শরহে মুনইয়া এবং যাদুল ফকীর কিতাব থেকেও উদ্ধৃত করা হয়েছে।

মুফতি শফী ছাহেব তাঁর জাওয়াহিরুল ফিকহ কিতাবের ২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, আল ফাতাওয়া আল খাইরিয়্যাহ ১ম খণ্ডের ১০৯ পৃষ্ঠায় আছে -

إذا كان الإنحراف عن مقتضى الأدلة اكثر من خمس وأربعين درجة يمنة أو يسرة يكون ذلك الإنحراف خارجا عن جهة الربع الذي فيه مكة المشرفة من غير إشكال (إلى) فهل هذه المحاريب التي إنحرافها كثير فاحش يجب الإنحراف فيها يسرة إلى جهة مقتضى الأدلة والحالة ما ذكرنا ام لا - وإذا قلتم يجب فهل إذا عاندى شخص وصلى في هذه المحاريب بعد اثبات ما ذكرنا تكون صلاته فاسدة الخ (اجاب) حيث زالت بالإنحراف المذكور المقابلة بالكلية بحيث لم يبق شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة عدم الاستقبال المشروط لصحة الصلاة بالاجماع وإذاعدم الشرط عدم المشروط (جواهر الفقه نقلا عن الفتاوى الخيرية 1/256-257)

কিবলার ব্যাপারে ফিকহের কিতাবাদিতে অপর একটি অধিক সাবধানতাপূর্ণ উক্তিও রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, কা'বার প্রকৃত দিক থেকে ডান দিকে ২৪ ডিগ্রী এবং বাম দিকে ২৪ ডিগ্রী এই মোট ৪৮ ডিগ্রী হচ্ছে কিবলা। এই ৪৮ ডিগ্রীর যেকোন বিন্দুর

দিকে মুখ করে নামায আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে। কা'বার ডান দিকে বা বাম দিকে ২৪ ডিগ্রীর বাইরের কোন বিন্দুর দিকে মুখ করে নামায পড়লে তা শুদ্ধ হবে না।

গ্রীষ্মের সবচেয়ে বড় দিন (২২ জুন) এর সূর্যাস্তের স্থল এবং শীতের সবচেয়ে ছোট দিন (২২ ডিসেম্বর) এর সূর্যাস্তের স্থল এই উভয় অন্তস্থলের মধ্যভাগের পুরোটাই হলো কিবলা। যা ভূগোল শাস্ত্রের হিসাব মতো ৪৮ ডিগ্রী হয়।

এই দ্বিতীয় উক্তি সম্পর্কীয় ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবাদির আরবী ইবারাত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

রাদ্দুল মুহতার (শামী) ১ম খণ্ডের ২৮৮ পৃষ্ঠায় আছে-

ففي القهستاني ولا بأس بالانحراف انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة وقال في شرح زاد الفقير وفي بعض الكتب المعتمدة في استقبال القبلة إلى الجهة أقاويل كثيرة وأقربها إلى الصواب قولان الأول أن ينظر من مغرب الصيف في أوطل أيامه ومغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع الثلثين في الجانب الأيمن والثلث في الأيسر والقبلة عند ذلك ولو لم يفعل هكذا وصلى فيما بين المغربين يجوز وإذا وقع خارجا منها لا يجوز بالاتفاق ا هـ

মুফতি মুহাম্মাদ শফী রাহিমাহুল্লাহ জাওয়াহিরুল ফিকহ কিতাবের ২৪৩ পৃষ্ঠায় শরহে জুনাইমি এর উদ্ধৃতি পেশ করে লিখেন -

ومقدار الغربين علي مقدار الهندسة ثمان و أربعون درجة لمافي شرح الجغين ان نهاية --- دائرة البروج عن عدول النهار مقدارها كج له أي ثلث و عشرون جزءا و خمس وثلثون دقيقة علي ما وجد بارصاد الماحون (ثم قال بعد ذكر الاقوال المختلفة فيه) لكن اكثر ما وجدوه لم يزد علي أربعة و عشرين جزءا (شرح جنميني باب رابع ص66) فعلي هذا القول يكون الانحراف الجائز في كل جانب من اليمن و اليسار اربع و عشرون درجة و مجموع الجهة ثمان و أربعون درجة و علي القول الأول القدر الجائز خمس واربعون درجة في كل جانب و مجموع الجهة تسعون درجة و هو ربع الدائرة واختار الشامي و غيره القول الثاني لما فيه من الاحتياط

মাননীয় প্রকৌশলী মহোদয়ের প্রতিবেদনে লিখা হয়েছে যে, কালিগনজ বাজার বায়তুননূর জামে মসজিদের (কিবলার) দিকটি প্রকৃত কা'বার দিক থেকে ১৮ ডিগ্রী ডানে রয়েছে। আমরা উপরোল্লিখিত বিশুদ্ধ দুইটি উক্তির মধ্য থেকে প্রশস্ততা সম্বলিত

উক্তি অর্থাৎ প্রকৃত কা'বার দিক থেকে ৪৫ ডিগ্রী ডানে অথবা বামে ফিরে নামায পড়লেও নামায শুদ্ধ হবে, এই উক্তিটির দিকে না গিয়েও যদি অধিক সাবধানতা সম্বলিত উক্তি অর্থাৎ কা'বার দিক থেকে ২৪ ডিগ্রী ডানে বা বামে ফিরে নামায পড়লেও তা শুদ্ধ হবে। এর চেয়ে অধিক ডানে অথবা বামে ফিরে নামায পড়লে শুদ্ধ হবে না; এই উক্তিটিই যদি গ্রহন করি তাহলেও দেখা যায় কালিগনজ বাজার বায়তুননূর জামে মসজিদের প্রকৌশলী নির্ণিত কা'বার দিক থেকে ১৮ ডিগ্রী ডানের দিকটি কিতাবে নির্ণিত ২৪ ডিগ্রি থেকে অধিক নয় বরং কম।

তাই হানাফী ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবাদির আলোকে এ কথা একেবারেই স্পষ্ট এবং পরিস্কার যে, কালিগনজ বাজার বায়তুননূর জামে মসজিদটি যে মূখী আছে সে দিকে মুখ করে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হবে।

والله تعالى اعلم

লিখক

মো. হবিবুর রহমান

০৭/১০/২০০৪

শায়খুল হাদীস ছাহেব প্রণীত
কয়েকটি গ্রন্থ পর্যালোচনা

শায়খুল হাদীসের বয়ানে বাংলাদেশে ফসলের জাকাত

অধ্যাপক ফরীদ আহমদ রেজা

উশর বা ফসলের জাকাত একটি ফরজ ইবাদত হলেও সে ফরজের ব্যাপারে বাংলাদেশের খুব অল্পসংখ্যক মুসলমানই অবহিত বা সচেতন আছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, 'তিনি-ই (আল্লাহ) নানা প্রকার লতাগুল্ম ও বাগান সৃষ্টি করেছেন; খেজুর বীথি সৃষ্টি করেছেন; শস্য উৎপাদন করেছেন, তা থেকে নানা প্রকার খাদ্য সংগৃহিত হয়; যাইতুন ও ডালিম বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, এদের ফলে মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও স্বাদ ভিন্ন; এগুলোর ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং এগুলোর ফসল কাটার সময় আল্লাহর হক আদায় করো আর সীমা অতিক্রম করো না; কারণ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না;' (৬:১৪১)

ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, ইমাম মালিক, কাতাদাহ ও দাহহাকসহ বেশির ভাগ ইসলামী চিন্তাবিদের মতে, এ আয়াতে আল্লাহর হক বলতে ফসলের জাকাত বা উশরকে বুঝানো হয়েছে।

কালামে পাকের অন্যত্র বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ! যে অর্থ তোমরা উপার্জন করেছো এবং যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করে দিয়েছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো; (২:২৬৭)

সহিহ বুখারিতে আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, 'যেসব জমিকে বৃষ্টি এবং নদীর পানি সিক্ত করে, কিংবা স্বভাবতই সিক্ত থাকে সে জমি থেকে (উৎপাদিত ফসলের) উশর (এক দশমাংশ) আদায় করতে হবে। আর যেসব জমি সেচের দ্বারা সিক্ত করা হয় তা থেকে উশর এর অর্ধেক আদায় করতে হবে' এর অর্থ হচ্ছে, যে ক্ষেতের ফসল প্রাকৃতিক পানি দ্বারা ফলানো হয় সে ফসলের ১০ ভাগের এক ভাগ, আর যে জমির ফসল ফলাতে গিয়ে মানুষকে সেচ প্রক্রিয়ার সহায়তা নিতে হয় সে জমির ফসলের ২০ ভাগের এক ভাগ জাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে।

ভুলে থাকা এ ফরজ কাজের ব্যাপারে দেশের মুসলমানদের সচেতন ও সতর্ক করার জন্য আমাদের যে দুয়েকজন আলেম সোচ্চার তাদের মধ্যে শায়খুল হাদীস হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অন্যতম। তাঁর বই পাঠ করে এবং নাসিহা অনুসরণ করে যারা এ ফরজ ইবাদত পালনে এগিয়ে এসেছেন তাদের সকলের এ কাজের সওয়াবে, মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহিস সালামের হাদীস অনুযায়ী, ইনশাআল্লাহ মরহুম শায়খুল হাদীসও শরিক থাকবেন, কিন্তু এ কারণে উশরের ফরজ আদায়কারীর সওয়াবে কোন প্রকার

কমতি হবে না। যে কোনো ভালো কাজের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার এ ফযিলতের ব্যাপারে আমরা অনেক সময় গাফলতি করি।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে, আলহামদু লিল্লাহ, অনেক উলামায়ে কেরাম মানুষকে আল্লাহর পথে চলার জন্য আমাদের ওয়াজ-নাসিহা করে যাচ্ছেন। তাঁদের কেউ কেউ কুরআন এবং হাদীসের আলোকে বাংলা ভাষায় বই-পুস্তকও আমাদের উপহার দিচ্ছেন। এর মধ্যে মৌলিক গবেষণাধর্মী বই যেমন আছে তেমনি আছে অনেক আরবী-উর্দু বইয়ের অনুবাদ। যে সকল উলামা এ ভাবে নিষ্ঠার সাথে ১৮ কোটি জনশক্তি সম্পন্ন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় এবং রুহানী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ। দোয়া করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের খেদমতকে কবুল করুন, তাদের যোগ্যতা বাড়িয়ে দিন এবং সুস্বাস্থ্যসহ তাদের হায়াত বৃদ্ধি করে দিন। তবে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ লেখালেখির ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে আছেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কিছু স্বনামধন্য আলেম আছেন অস্বাভাবিক রকম ব্যতিক্রম এবং তাদের মধ্যে শায়খুল হাদীস হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অন্যতম। তিনি শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত থাকার সাথে সাথে বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রেখে গেছেন যা কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুপস্থিতে ইনশাআল্লাহ দায়ী ইলাল্লাহর ভূমিকা পালন করে যাবে এবং এর বিনিময় তিনি অব্যাহত ভাবে পেতে থাকবেন।

এ পর্যন্ত শায়খুল হাদীস হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহ আলাইহির হাদীস, সীরাত, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে ১৮ খানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা, আরবী ও উর্দু ভাষায় প্রকাশিত তাঁর বইগুলোর নাম হচ্ছে আল কাউলুল মাকবুল ফী মিলাদির রাসূল, মাসআলায়ে উশর ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, দোয়ায়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফজিলত, দুরূদ শরীফের ফযীলত ও ওযীফা, যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা (ফযীলত ও নিয়ম), আসহাবে বদর, ওযীফা (কুরআন-হাদীসের দোয়া), হজ্জ ও যিয়ারত, হাদিয়াতুল লবীব ফী নাবযাতিম মিন সীরাতিন নাবিয়্যিল হাবীব, যাখীরাতুল আহাদিসিল আরবাঈন ফী ফাদায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, কানযুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যিল আমীন, তুহফাতুল লাবীব বিআসানিদিল হাবীব, আত-তুহফাতুল লাতীফাহ ফী আহাদীসিল মুনীফাহ, দালাইলুল খাইরাত, আল হিযবুল আযম, দারসে হাদীস -১, সালাতুত তারাবীহ এবং মুনতাখাবুস সুনান ওয়াল আছার।

শিক্ষকতা অবশ্যই একটি মহান পেশা এবং অন্যতম ফলপ্রসূ ইলমের খেদমত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম নিজে বলেছেন বুয়ি'ছতু মুয়া'ল্লিমান' আমাকে উস্তায হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। যারা অহি থেকে প্রাপ্ত ইলম শিক্ষা করেন তাঁদের অনেকেই উৎসাহের সাথে সে ইলম অন্যদের শিক্ষা দেয়া এবং প্রচার করাকে জীবনের মিশন

হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁরা বছরের পর বছর কুরআন-হাদীস শিক্ষা দেয়া এবং ওয়াজ-নসিহার মাধ্যমে মানুষের কাছে কুরআন-হাদীসের বানী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব মাথায় তুলে নেন। আমাদের বর্তমান সময়ের উলামায়ে কেরামের যারা এ রকম কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখে জীবন কাটিয়েছেন তাদের মধ্যে শায়খুল হাদীস হবিবুর রহমান অন্যতম।

শায়খুল হাদীস হবিবুর রহমান (রাহিমাহুল্লাহ) শিক্ষকতা শুরু করেন ১৯৫৯ সালে জকিগন্জের (সিলেট) ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসায় এবং তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৯৯ সালে। তাঁর দীর্ঘ ৪০ বছরের শিক্ষকতার জীবন ছিল আমাদের জন্য আল্লাহর এক নেয়ামত। ইছামতি মাদ্‌রাসা ছাড়া তিনি ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদ্‌রাসা এবং সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায়ও শিক্ষকতা করেন। সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় তিনি ১৯৭৪ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে এবং ১৯৭৬ ১৯৭৭ সালে একই মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন। আবার ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি ইছামতি কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসেবেও কর্মরত ছিলেন।

১৯৭৭ সালে শায়খুল হাদীস হবিবুর রহমান বাংলাদেশের বাইরে চলে যান এবং সেখানে এক ব্যতিক্রমধর্মী দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের উম্মুল কুওয়াইন শহরের একটি মসজিদে খতিব এবং উম্মুল কুওয়াইন আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বলাবাহুল্য যারা কুরআন-হাদীসের শিক্ষক তাদের শরিয়াহ আইনের ব্যাপারে দক্ষতা অপরিহার্য। তবে শরিয়াহ আদালতের একজন বিচারকের জন্য কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের পাশাপাশি প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং সংশ্লিষ্ট সমাজ-জীবন সম্পর্কে ভালো ভাবে ওয়াকিবহাল থাকা জরুরী। শায়খুল হাদীসের এ সকল গুণ ছিল বলেই তিনি আরব আমিরাতের শরিয়াহ আদালতে দক্ষতার সাথে বিচারকার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন।

মুহতারাম শায়খুল হাদীস হবিবুর রহমান সাহেবের লিখিত অনেকগুলো বইয়ের মধ্য থেকে শুধু 'মাসআলায়ে উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শিরোনামে লিখিত মূল্যবান গ্রন্থটি নিয়ে আমি কিছুটা আলোচনার চেষ্টা করবো। এ মূল্যবান গ্রন্থখানা দেখার পূর্বে এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় মাত্র ২টি বই আমার নজরে পড়েছে, এগুলো হচ্ছে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের উসর বা ফসলের জাকাত এবং সাইয়েদ মুহাম্মদ ইকরামুল হকের 'উশর; ফসলের জাকাত প্রদান ফরজ'। উশর নিয়ে বাংলা ভাষায় আরো অনেকের বই থাকতে পারে, কিন্তু তা আমার নজরে পড়েনি। অবশ্য ড. ইউসুফ কারদাওয়ীর আরবী থেকে অনুদিত 'ইসলামের যাকাত বিধান' এবং মুফতি শফীর 'ভূমি ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক উর্দু বইয়ে গুরুত্ব দিয়ে উশর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুফতি শফী সাহেবের এ বইয়ের বাংলা অনুবাদ পরবর্তীতে ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে।

বাঙালি মুসলমানগণ এটা জানেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নামাজের সাথে সাথে রোজা, হজ্জ এবং জাকাতও ফরজ করেছেন। মুসলমানরা সাধারণতঃ জাকাত আদায় করেন রমজান মাসে। তখন জাকাত নিয়ে প্রায়ই আলোচনা শোনা যায়। কিন্তু উশর বা ফসলের জাকাতও যে একটা ফরজ ইবাদত, সে বিষয়ে খুব একটা আলোচনা শোনা যায় না।

আমাদের দেশের কওমী মাদ্‌রাসাগুলো পরিচালিত হয় জনসাধারণের দান-সাদাকার মাধ্যমে। মাদ্‌রাসাগুলোর পক্ষ থেকে সব সময় মাদ্‌রাসার গরীব-ফাণ্ডে জাকাতের টাকা প্রদানের জন্য আবেদন করা হয়। একই ভাবে কুরবানীর সময় মাদ্‌রাসার পক্ষ থেকে শিক্ষক ও ছাত্ররা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কুরবানীকৃত গরু বা ছাগলের চামড়া সংগ্রহ করেন। তারা চাইলে এ ভাবে ফসলের জাকাতও সংগ্রহ করতে পারতেন। কোন অদৃশ্য কারণে তারা ফসলের জাকাতের ব্যাপারে কথা বলেন না তা আমাদের বোধগম্য নয়।

শায়খুল হাদীস হবিবুর রহমান মরহুম 'মাসআলায়ে উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' পুস্তকের ভূমিকায় বইটি লেখার পেছনের ইতিহাস পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের ভূমি উশরী না খারাজী এ প্রশ্নটি ছাত্রজীবন থেকেই আমায় ভাবিত করতো। সাধারণ মুসলমান তো বটেই, উলামায়ে কিরামকেও এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত দেখে অবাক হতাম। ব্যক্তিগত ভাবে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন ভাবে। কর্মজীবনে যখন সৎপুর দারুল হাদীসে ছিলাম তখন পকিস্তানের মুফতি মৃহাম্মাদ শফী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে বিষয়টি জানতে চেয়ে চিঠি লিখি। উত্তরে তিনি জানান, বিষয়টি এখনো তার গবেষণাধীন রয়েছে।'

'কয়েক বছর পর দ্বিতীয়বার চিঠি লিখলে তিনি জানান, গবেষণা শেষ হয়েছে এবং এ বিষয়ে গবেষণালব্ধ কিতাব اسلام کا نظام اراضي ছাপার কাজ চলছে। কিতাবখানা সংগ্রহ করে পড়লে এ প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে। পরবর্তীতে সুযোগ মতো কিতাবখানা সংগ্রহ করি।' 'আলহামদুলিল্লাহ! মুফতি সাহেব তাঁর কিতাবে উপমহাদেশের ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করে অত্যন্ত প্রামাণ্যভাবে এ মাসয়ালার সমাধান দিয়েছেন। ১৯৮৬ সালে এ কিতাবের বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।' [পূর্বকথাঃ মাসআলায়ে উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ: শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ]

সেখানে তিনি আরো বলেছেন, অনেক দিন থেকে তিনি সুযোগ পেলেই উলামায়ে কেরামের সামনে ফসলের জাকাতের বিষয়টি উত্থাপন করে এ ব্যাপারে সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার অনুরোধ করে আসছেন। তিনি দুঃখ করে বলেছেন, এ ব্যাপারে বাংলাদেশে কিছু বিচ্ছিন্ন প্রকাশনা থাকলেও উশরের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে সম্মিলিত মতামত দেয়ার কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। অথচ, যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন, ফতোয়ায়ে আলমগীরীর ভাষ্য মতে, ভূমি থেকে

উৎপাদিত ফসলের উশর বা খারাজ আদায় না করে তা ভোগ করা হালাল হবে না। কি সাংঘাতিক কথা! বাংলাদেশের মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ যে দেশে হাজার হাজার উলামা বাস করেন; সে দেশের মানুষ ফসলের জাকাত আদায় করে না বা এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়, এ কথা ভাবতেই অবাক লাগে। কিন্তু কথাটা একশ ভাগ সত্য।

আমাদের দেশটা কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি থেকে আমরা বহু রকমের ফসল পাই এবং নানা রকম জিনিস উৎপন্ন করি। আমরা মাছ, ডাল, নানা রকম রবিশস্য ও ফল-ফসল রফতানী করি। কৃষিজাত দ্রব্যের বহুরকম ফার্ম আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য ধান আমাদের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। উৎপাদিত এ সকল পণ্যের জাকাত আদায় না করে আমরা বছরের পর বছর এগুলো বিক্রি করছি অথবা ভোগ করছি। এর মানে হচ্ছে উৎপাদিত ফসলের জাকাত আদায় না করে আমরা সেগুলো ভোগ করছি, সেগুলো দিয়ে ব্যবসা করছি এবং দান-খয়রাতও করছি। আমাদের দেশের সকল বিত্তশালী ব্যক্তি সোনা-রূপা বা সম্পদের জাকাত আদায় করেন কি না সে পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন। কিন্তু সকল মুসলমানই জানেন, সোনা-রূপা এবং সম্পদের পরিমান নেসাবের অনুপাত মত হলে সেগুলোর জাকাত আদায় করতে হবে। দুঃখের বিষয় ফসলের জাকাত নিয়ে আমাদের সমাজে তেমন আলোচনা না হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে খুব কম ওয়াকিবহাল রয়েছেন।

মুহতারাম শায়খুল হাদীস আলোচ্য পুস্তকে কুরআন, হাদীস, বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদের অভিমত এবং ফিকাহর কিতাবের রেফারেন্স দিয়ে বলেছেন, 'বাংলাদেশে মুসলমানদের মালিকানাধীন অধিকাংশ ভূমি উশরী। তাই এ ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের উশর আদায় করা ফরজ।'

আরেকটি কথা এখানে উল্লেখ করা জরুরী। মরহুম শায়খুল হাদীস তাঁর ছাত্রজীবন থেকে ফসলের জাকাত নিয়ে চিন্তাভাবনা করলেও প্রাত্যহিক নানা ব্যস্ততার কারণে 'মাসয়ালায়ে উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' বইটি লেখার জন্য তাঁকে শেষ জীবন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ২০০৫ সালে তিনি যখন বিলাত আসেন তখন তাঁর বড় ছেলে বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, শিক্ষাবিদ এবং বহুগ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল তাঁকে ফসলের জাকাতের উপর বইটি সমাপ্ত করার অনুরোধ করেন। বিলাত সফরেও শায়খুল হাদীস অত্যন্ত ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন। এ সময় একদিন লন্ডন থেকে বার্মিংহাম যাওয়ার পথে তাঁর বড় ছেলে মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলালকে সাথে নিয়ে যান। যাওয়ার পথে পুরো সময়ব্যাপী তিনি ছেলেকে প্রস্তাবিত বইয়ের উপর মৌখিক নোট প্রদান করেন। বার্মিংহাম যাওয়ার পর মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল একটি বাড়িতে কয়েক দিন অবস্থান করে তাঁর সম্মানিত পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত নোট অনুসরণ করে সম্পূর্ণ বইটি তৈরি করেন। পরে তিনি পুরো বই শায়খুল হাদীসকে পড়ে শোনান। সেটা

শুনে শায়খুল হাদীস সেখানে কিছু সংযোজন ও বিয়োজন করে পূর্ণ বইয়ের অনুমোদন প্রদান করেন। মাশাআল্লাহ, যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান! আল্লাহ সকলের খেদমতকে কবুল করুন। বইটি যারা পেয়েছেন তারা দেখেছেন সেখানে লেখা আছে, 'মাসয়ালায়ে উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ, অনুলেখন মো. আবদুল আউয়াল হেলাল। বইয়ের ভূমিকায় এ কথাও উল্লেখ আছে, 'দেশ থেকে বিভিন্ন কিতাবের ফটোকপি পাঠিয়ে লেখার কাজে সহযোগিতা করে আমার ছোট ছেলে মো. আবদুল বাকী খালিদ। দোয়া করি উভয়ের এই চেষ্টা যেন আল্লাহ কবুল করেন।' দু ছেলের জন্য পিতার এ দোয়াকে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করবেন।

গ্রন্থের শুরুতে গ্রন্থকার মরহুম শায়খুল হাদীস উলামায়ে কেরামের খেদমতে একটি আরজ পেশ করেছেন। আমার সম্মানিত আলেম সমাজের মধ্যে যাদের কাছে বইখানা পৌঁছবে তারা দয়া করে কমপক্ষে শায়খুল হাদীসের এ আরজ অংশটি পাঠ করবেন। সেখানে তিনি বলেছেন, 'নির্ভরযোগ্য ফিকহের কিতাবাদীতে বর্ণিত উশর ও খিরাজের বিধানের আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মাসয়ালার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এ বইয়ে। উশর ও খিরাজের বিধান সংক্রান্ত যে মূলনীতি কিতাবাদীতে উল্লেখ রয়েছে এরই উপর ভিত্তি করে আমার নিজস্ব গবেষণা প্রসূত রায় এই বইয়ে বাণীবদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ভূমির বিধান সংক্রান্ত আলোচনায় উলামায়ে কিরামকে আরো বেশি গবেষণা চালানোর অনুরোধ জানাচ্ছি। এ বিষয়ে আমার রায়ই চূড়ান্ত এমন দাবি করছি না। তবে বিষয়টি যেহেতু ফরজ ইবাদত কেন্দ্রিক তাই সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনতে আহ্বান করছি।'

উলামায়ে কেরামের প্রতি শায়খুল হাদীসের এ আবেদনের ব্যাপারে আমরাও ঐকমত্য প্রকাশ করছি। আমাদের আলেমদের মধ্যে বহু বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও তাঁরা নামাজ-রোজা বা হজ্জ-জাকাতের মত ফরজ ইবাদতের ব্যাপারে ভিন্নমতকে একটু এড়িয়ে চলেন। ফসলের জাকাত যেহেতু একটি ফরজ ইবাদত, তাই এ ব্যাপারে সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে কথা বলা দরকার। আলেম সমাজের সবাই আওয়াজ তুললে সাধারণ মুসলমানরা অবশ্যই ভুলে থাকা এ ফরজ পালনের ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন।

আনন্দের বিষয় যে শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ'র 'মাসআলায়ে উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' বইটি অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় লিখিত হয়েছে। যে কোনো সাধারণ মানুষ বইটি পাঠ করে এর সার কথা বুঝতে পারবেন।

মাত্র ২৪ পৃষ্ঠার এ বইয়ে ফসলের জাকাত সম্পর্কে মূল ও প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে। উশর, খারাজ ইত্যাদি পরিভাষার ব্যাখ্যা, কুরআন-হাদীসের আলোকে ফসলের জাকাত প্রদানের নিয়ম ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত বোধগম্য ভাষায় আলোচনা করা

হয়েছে। কিছু কুরআন এবং হাদীসের আরবী রেফরেন্স ছাড়া ফিকহের কিতাবের আরবী এবারত সেখানে দেয়া হয়নি, তবে ফিকহার কিতাবের নাম রয়েছে। আলেমে সমাজের যারা ফসলের জাকাতের ব্যাপারে আরো জানতে চান তারা ফিকাহের কিতাব থেকে তা খুঁজে বের করতে পারবেন।

আমার মতে এ মূল্যবান বইখানা প্রকাশ করে বিনামূল্যে তা বাংলাদেশের বিভিন্ন মসজিদে এবং গ্রামে-গঞ্জে বিতরণ করা দরকার। সমাজের দ্বীনদার এবং বিত্তশালী মহল এ কাজে এগিয়ে আসবেন বলে আমি আশা করছি। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ শায়খুল হাদীস হবিবুর রহমানের সকল খেদমত কবুল করুন, তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে রাখুন। আমরা যারা ইসলামী কাজে শরিক আছি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে মাফ করুন এবং সবাই মিলে আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ করবার তওফিক দিন।

লেখক : কবি ও শিক্ষাবিদ; প্রধান সম্পাদক, সাপ্তাহিক সুরমা, লন্ডন।

الإسهامات العلمية
للشيخ المحدث العلامة محمد حبيب الرحمن الماتريدي الحنفي الصوفي البنغلاديشي
(1934/1352 - 2022/1443)
في ضوء كتابه
منتخب السنن والآثار

الشيخ الدكتور سيف الإسلام الأزهري

الحمد لله رب العالمين. بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، الذين رفعوا منار الهداية، وحملوا راية السنة، وأعلوا شأن الرواية، وأحاطوا أحاديث نبيهم بسياج من الصيانة والرعاية؛ فنفوا عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

وبعد، فإن الله جلت حكمته، أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه: {يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [المائدة: 16] ، ثم وكل سبحانه إلى رسوله الأمين تبيان هذا الكتاب فقال سبحانه: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] ، والرسول صلى الله عليه وسلم في بيانه للقرآن الكريم لا ينطق عن الهوى: {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4] لذلك أوجب الله علينا طاعته، وحذرنا معصيته، فقال تبارك وتعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، وقال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، فالقرآن والسنة هما أساس الدين، والنور الهادي إلى الصراط المستقيم.

ولما كان للسنة النبوية هذه المكانة العظمى، عرف السلف الصالح للسنة قدرها ومكانتها، فرعوها حق رعايتها، وحفظوها في الصدور، وأودعوها سويداء القلوب، ودونوها في المصنفات والكتب، وحكموها في شئونهم، وكانوا بها مستمسكين، وعلى نهجها سائرين، وما زال العلماء في كل عصر يعنون بالسنة عناية تامة علما وعملا، حتى جاءت عصور ضعف فيها المسلمون، فخلف من بعد

هؤلاء الأعلام خلف تهاونوا بشأنها، وتقاعدوا عن حفظها، فاستعجم عليهم فهمها، واستغلق لديهم الوقوف على أسانيدها ومتونها، وكان من أثر ذلك أن رأينا أرباب الأديان المبدلة، والعقائد الزائفة، والأهواء المتبعة، يطعنون في سنة نبينا، ويغضون من شأن الأحاديث النبوية، فمن قائل: لا يعتمد عليها الآن لانقطاع أسانيدها، ومن قائل: إن السنة ليست دينا عاما دائما، ومن قائل: إن الأغلبية العظمى من الأحاديث ليست إلا من وضع الوضاعين، واختلاق الكذابين، ومن طاعن في صحابة رسول الله وهم الحلقة الأولى في سلسلة الإسناد، الذي يصلنا بصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، ومن مشوه للحقائق التاريخية الثابتة فتراه يخلط الحق بالباطل، ويحمل البريء تبعة المذنب، ويغلب الشر على الخير، ومن متلمس للهفوات يضخم من شأنها، فيرفعها إلى درجة العظائم، لينال من هذه الملة المطهرة، والسنة النبوية المشرفة، إلى غير ذلك من أنواع المكايد والطعون التي يبثها أعداء الإسلام.

والأمة الإسلامية بحمد الله تعالى تعتني بالسنة غاية الاعتناء، تنهل من موردها العذب الزلال، وتحتكم إليها بعد كتاب الله تعالى ومعه، وقد قيض الله تعالى لها العلماء الأخيار الأبرار، لم يدخروا وسعا في حفظها، سندا ومتنا، رواية ودراية، يفتشون عن حفاظها ورواتها، ويدققون في مصادرها ودواوينها فبين شارح وموضح إلى مختصر ومنقح إلى باحث عن السند ومرجح حفظا في الصدور ضبطا في الجوامع والسطور.

وهذا العصر الذي نعيشه لا يقل علمائه نشاطا وهمة عن القرون الثلاثة الفاضلة، في الذود عن حياضها، والدفاع عن ساحتها ودخلت الوسائل الحديثة في الجمع والترتيب والتصنيف والتبويب، فهونت كثيرا الأمور الصعاب، وسهلت الخدمة لكل من له حب للسنة شغوف بالوقوف على الأعتاب، للوصول إلى رحمة رب الأرباب وكيف لا يكون ذلك من علو الهمة والبركة الباقية في الأمة.

وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه.

فانظر إلى هذا الوسام الشريف الذي وضعه سيدنا الأكمل صلى الله عليه وسلم على صدر سيدنا أبي هريرة وهو (لما رأيت من حرصك على الحديث) وحبك له وحفظك وعنايتك به، ومدارستك له.

وقد استمر هذا الحب مع أبي هريرة رضي الله عنه حتى بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فكا ن له مجلس في المسجد النبوي الشريف يقرأ فيه على الزائرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث النبوي الشريف. فيعودون إلى أقطارهم ينشرون السنة المطهرة ويروونها وهذا السفر العظيم والديوان المبارك الشامل لبعض أبواب السنة المسمى (منتخب السنن والآثار) للشيخ الأستاذ محمد حبيب الرحمن الماتريدي الحنفي الصوفي البنغلاديشي المحدث المفتي خادم علوم السنة والأثار المحب لسيد الأبرار سيدنا محمد النبي الخاتم، صاحب اللواء المحمود والحوض المورود والمقام المحمود صلى الله عليه وسلم.

وهذا المنتخب الحديثي العظيم الذي اشتمل على المدخل في علوم الحديث، وتراجم المحدثين، وأبواب السنة، من العقائد والأخلاق، والرقائق والآداب، والعبادات، والفتن والفرائض والأحكام والجهاد، وغيرها نافع في بابه، وزاد المستدل لكثير من المسائل التي أثيرت حوله الجدل، وإن عميت أبصار المثيرين الجدلَ عن رؤية تلك الأدلة من السنة المشرفة المذكورة في الكتاب الذي نتجول في ميدانه ونأكل من مأدبته ونناقش حوله. ولو قدر للمؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن يكمل الكتاب لكان مزيدا في الفائدة ومفيدا في الغاية وريا للعاطش، وموردا للباحث ومشربا لطلبة الحديث ومنهلا للوارد عليه إلا أن المنية أعيته، والتلبية لدعوة ربه منعته، والقضاء الأزلي أدركه، وقد أحس بذلك حيث ذكر في مقدمة كتابه: "كنت أتمنى ولم أوفق إلا كتابي الأربعين في خدمة السنة النبوية لانشغالي ببعض المسؤوليات، ولا يمكنني الآن أن أخدمها في نطاق واسع وأنا في أواخر أيامي من حياتي في هذه الدنيا، وقبيل نهايتها جمعت بعض الأحاديث والآثار في موضوعات مختلفة في كتاب سميته (منتخب السنن والآثار)". وقد سلك مؤلفه حفظه الله وجزاه عن الإسلام خير الجزاء طريقة المحدثين فروى الحديث في بابه المختص به وتحت كتابه الجامع للأبواب وأشار إلى درجة الحديث صحة وضعفا وكلام العلماء عليه وذلك ليهون على القاري الأمر ويكفيه مؤنة البحث عن درجة الحديث وهذه طريقة علماء الحديث الأفذاذ وذكر في كل باب ما ورد من كتب السنة من الشواهد والمتابعات من كتب السنة والمصنفات وعلق عليه تعليقا حسنا عرف فيه بالحديث صحة وضعفا بذكر كلام أهل الشأن وأقوالهم من كتب خدام سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم.

وهذا السفر العظيم (منتخب السنن والأثار) للشيخ حبيب الرحمن يقدم للقاري ثروة هائلة من المصادر الحديثية ودواوين الإسلام. فبين يدي القاري في الباب أحاديث إضافة إلى الكتب الستة والموطأ، روايات عديدة للطبراني ومسند الإمام أحمد والدارقطني في سننه والدارمي والبيهقي في سننه

وابن الجارود وابن حزم، وابن خزيمة والحاكم والطحاوي، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومحمد بن .الحسن في الأثار وغيرها. فأغنى القاري عن البحث عن الحديث في مصادره

والحق يقال إن الشيخ حبيب الرحمن غاص في أعماق المصادر وخرج لنا بهذه الدرر والنفائس. وقدم للأمة عملا نافعا مخدوما، ناصعا، لا يملك قارئه إلا أن يدعو له بالجزاء الأسمى والمثوبة الكاملة .من الله عز وجل، فهو عز وجل المحسن على الدوام، والمجازي أهل الإحسان بالإحسان

المحدث العلامة في سطور

:طلوع نجم في سماء بنغلاديش

ولد الشيخ حبيب الرحمن عام 1934 م في قرية رارئي من ذكيغنج، سيلهت. كان والده المرحوم مولانا ممتاز علي، عالم شهير في منطقته، ووالدته المرحومة أمينة خاتون. وهو الثالث بين سبعة إخوة .وأخت واحدة

الحياة التعليمية

مرحلة العالم (الثانوية). 1955م. الدرجة الأولى. الثاني عشر في قائمة الجدارة لمجلس التعليم لمدارس .بنغلاديش

الفاضل (ليسانس). 1957م. الدرجة الأولى. الثالث في قائمة الجدارة لمجلس التعليم لمدارس .بنغلاديش

الكامل (ماجستير في الحديث الشريف). 1959م. الدرجة الأولى. الثاني عشر في قائمة الجدارة .لمجلس التعليم لمدارس بنغلاديش

:في حقل التدريس والتعليم والو\ظائف

م – 9/4/1963م: المعلم المساعد، مدرسة دار العلوم الكامل عيسى متي ، ذكيغنج،3/8/1959 .سيلهت

.م- 22/11/1963م: المعلم المساعد، المدرسة العزيزية فولبري، غوفالغونج، سيلهت10/4/1963

م- 13/1/1974م: أستاذ الحديث، مدرسة دار الحديث الكامل ساتبور ، بشّونت،23/11/1963 سيلهت.

م- 10/10/1976م: المدير لمدرسة دار العلوم الكامل عيسى متي، ذكيغونج، سيلهت15/1/1974.

م- 2/4/1977م: المدير لمدرسة دار الحديث الكامل ساتبور ، بشّونت، سيلهت11/10/1976.

م- 8/1982م: خطابة الجمعة في أم القيوين، الإمارة العربية المتحدة6/1977.

م- 8/1982م: قاضي محكمة أم القيوين الاتحادية6/1977.

م- 31/12/1999م: المدير لمدرسة دار العلوم الكامل عيسى متي، ذكيغنج، سيلهت14/9/1982.

المشاركة في الانتخابات:

عضو الجمعية الوطنية) في دوائر سيلهت 7 (ذكيغنج وبياني) MNA م: مرشح لمنصب12/1970 بازار وكانَيْغات.) في انتخابات الجمعية الوطنية الباكستانية.

م: تم الترشيح كعضو في انتخابات البرلمان الوطني البنغلاديشي من طرف بنغلاديش أنجومان1996 (الإصلاح ودعمها من قبل مجلس النضال المشترك في مقعد سيلهت 5 (ذكيغنج-كانَيْغات.

السياحة:

المملكة العربية السعودية، ١٠

الإمارة العربية المتحدة،٢٠

جمهورية مصر العربية، ٣٠

المغرب، ٤٠

سوريا، ٥٠

المملكة المتحدة، ٦٠

الولايات المتحدة، ٧٠

الهند. ٨٠

في مجال التصنيفات:

الإصدارات في المجلات: كان محررا للمجلة الشهرية شاه جلال بسيلهت، بنغلاديش من 1/1991 م-1993م.

الكتب المطبوعة: طبعت تسعة عشر كتابا في شتات العلوم والفنون من السنة الشريفة، والسير، والفقه وغيرها باللغة العربية، والأردية، والبنغالية.

غروب نجم في سماء بنغلاديش:

انتقل رحمه الله تعالى إلى ربه 7/2/2022م الموافق 6/7/1443هـ في بيته بعد صلاة المغرب، ودفن بجوار مسجده "الحبيب" بعد أن صلي عليه بمشاركة زهاء مائة ألف من المحبين أو يزيدون. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأمدنا بأمداده، ونفعنا بعلومه. آمين.

الكتاب (المنتخب من السنن والآثار) في عجالة سريعة

فيه مقدمة: اشتمل على

الباعث لجمع السنن المنتخبة في الكتاب،

وعلوم الحديث، وسلط الضوء على بعض المسائل المهمة، منها: "حكم العمل بالحديث الضعيف" -

وتراجم عدد من المحدثين المشهورين،-

ومصادر علوم الحديث.-

وثلاثة كتب:

كتاب الإيمان

وفيه خمسة وستون حديثا (65)، وبه بدأ سرد الحديث، ويشتمل هذا الكتاب على أبواب مهمة، وهي:

باب أركان الإسلام والإيمان، وذكر فيه ثلاثة أحاديث (3).

باب علامات الإيمان، وذكر تحته فصولا.

الفصل الأول: حب الله ورسوله من الإيمان، وذكر فيه ثلاثة أحاديث (3).

الفصل الثاني: حب الصحابة من الإيمان، وذكر فيه ستة أحاديث (6).

.(الفصل الثالث: حب أهل البيت من الإيمان، وذكر فيه ستة أحاديث (6

.(الفصل الرابع: حب أهل أخيه المؤمن، وذكر فيه حديثا (1

.(الفصل الخامس: قضاء حوائج المسلمين، وذكر فيه حديثا (1

.(الفصل السادس: حلاوة الإيمان، وذكر فيه حديثا (1

.(الفصل السابع: الحياء من الإيمان، وذكر فيه حديثين (2

.(الفصل الثامن: الجهاد من الإيمان، وذكر فيه حديثا (1

.باب أركان الإحسان، وذكر فيه فصولا

.(الفصل الأول: في إخلاص النية، وذكر فيه حديثا (1

.(الفصل الثاني: في التوبة، وذكر فيه خمسة أحاديث (5

الفصل الثالث: في التقوى، وذكر فيه الآيات القرآنية، ولم يتعرض لذكر الحديث فيه، وإن كان .الباب مليء بالأحاديث

.(الفصل الرابع: في صفاء القلب، وذكر فيه ستة أحاديث (6

.(الفصل الخامس: في الزهد في الدنيا، وذكر فيه ثلاثة أحاديث (3

.(الفصل السادس: في حسن المعاملة مع الخالق والمخلوق، وذكر فيه ثلاثة أحاديث (3

.(الفصل السابع: في الفناء لله وفي الله، وذكر فيه حديثا (1

.باب الشفاعة، وتحته فصول

.(الفصل الأول: أعطيت الشفاعة، وذكر فيه حديثا (1

.(الفصل الثاني: سؤاله الشفاعة في الدنيا، وذكر فيه حديثين (2

.(الفصل الثالث: الشفاعة لأهل المحشر أجمع، وذكر فيه ثلاثة أحاديث (3

.(الفصل الرابع: شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وذكر فيه ثلاثة أحاديث (3

.باب الإسراء والمعراج، وفيه فصول

الفصل الأول: الإسراء والمعراج بجسده وروحه يقظة لا مناما، وذكر فيه القرآن، ولم يتعرض لذكر .السنة فيه

.(الفصل الثاني: الإسراء فمن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذكر فيه حديثا (1

.(الفصل الثالث: في إمامة الأنبياء، وذكر فيه حديثين (2

.(الفصل الرابع: دنا فتدلى، وذكر فيه ثلاثة أحاديث (3

.(الفصل الخامس: رؤية الرب، وذكر فيه سبعة أحاديث (7

:كتاب الصلاة: وفيه مائة وخمسة عشر حديثا (115)، ويشتمل هذا الكتاب على أبواب مهمة، وهي

.(باب فضل الوضوء، وذكر فيه ستة أحاديث (6

.(باب في مواقيت الصلاة، وذكر فيه حديثا (1

.(باب فضل الآذان، وذكر فيه تسعة أحاديث (9

:باب فضل الصلوات الخمس، وذكر فيه فصولا

.(الفصل الأول: فضل الصلوات الخمس مجموعة، وذكر فيه ثلاثة أحاديث (3

.(الفصل الثاني: فضل صلاة الصبح والعصر، وذكر فيه خمسة أحاديث (5

.(الفصل الثالث: فضل صلاة الجمعة، وذكر فيه أربعة أحاديث (4

.(باب فضل صلاة العيدين، وذكر فيه حديثين (2

.(باب التكبير في صلاة العيدين، وذكر فيه ستة أحاديث (6

.(باب التكبير في طريق المصلي، وذكر فيه حديثين (2

:باب السنن الراتبة، وذكر فيه حديثا (1). وفيه فصول

.(الفصل الأول: فضل ركعتي سنة الصبح، وذكر فيه حديثا (1

~~.(الفصل الثاني: سنة الظهر، وذكر فيه أربعة أحاديث (4~~

.(الفصل الثالث: سنة العصر، وذكر فيه حديثين (2

.(الفصل الرابع: سنة المغرب، وذكر فيه حديثا (1

.(الفصل الخامس: سنة العشاء، وذكر فيه حديثا (1

.(الفصل السادس: سنة الجمعة، وذكر فيه خمسة أحاديث (5

.(باب فضل صلاة التراويح، وذكر فيه حديثين (2

:باب التراويح عشرون ركعة. وفيه فصل

.(فصل: صلى رسول الله ﷺ عشرين ركعة، وذكر فيه ثلاثة أحاديث (3

:باب الصحابة صلوا عشرون ركعة. وفيه فصل

.(الفصل الأول: التراويح في زمن عمر ، وذكر فيه خمسة أحاديث (5

.(الفصل الثاني: التراويح في زمن علي بن أبي طالب ، وذكر فيه حديثين (2

.(الفصل الثالث: التراويح في زمن التابعين ، وذكر فيه حديثين (2

.(الفصل الرابع: التراويح في جماعة سنة، وذكر فيه أربعة أحاديث (4

:باب صلاة الوتر. وفيه فصول

.(الفصل الأول: في وقت الوتر، وذكر فيه ثلاثة أحاديث (3

.(الفصل الثاني: الوتر ثلاث ركعات، وذكر فيه حديثا (1

.(الفصل الثالث: لا يسلم إلا في آخر الوتر، وذكر ثلاثة أحاديث (3

.(الفصل الرابع: الوتر كما يصليها الأحناف تماما، وذكر فيه حديثين (2

.(الفصل الخامس: في القنوت، وذكر فيه حديثين (2

:باب النوافل. وفيه فصول

.(الفصل الأول: فضل صلاة التهجد، وذكر فيه أربعة أحاديث (4

.(الفصل الثاني: فضل صلاة الضحى، وذكر فيه حديثين (2

.(الفصل الثالث: فضل صلاة الأوابين، وذكر فيه حديثا (1

.(الفصل الرابع: صلاة الحاجة، وذكر فيه حديثين (2

.(الفصل الخامس: صلاة الاستخارة، وذكر فيه حديثا (1

.(الفصل السادس: في صلاة التسبيح، وذكر فيه حديثين (2

.(باب وضع اليدين في الصلاة، وذكر فيه أربعة أحاديث (4

.(باب القراءة خلف الإمام، وذكر فيه خمسة أحاديث (5

.(باب رفع اليدين في الصلاة، وذكر فيه سبعة أحاديث (7

:باب الإسرار بالتأمين سنة، وذكر فيه ثلاثة أحاديث (3). وفيه فصول

.(الفصل الأول: دليل الجهر بالتأمين للإمام، وذكر فيه حديثا (1

.(الفصل الثاني: دليل الإسرار بالتأمين للإمام، وذكر فيه حديثا (1

كتاب الفتن: فيه ثلاثة وعشرون حديثا (23)، وبه اختتم الكتاب. ويشتمل هذا الكتاب على :أبواب مهمة، وهي

.(باب علامات الساعة، وذكر فيه سبعة عشر حديثا (17

.(باب علامات الخوارج، وذكر فيه ثلاثة أحاديث (3

.(باب التحذير عن الدعاة على أبواب جهنم، وذكر فيه ثلاثة أحاديث (3

هذا - وما أديت حقي، وأنا غريم، وعلى عاتقي حمل ثقيل الذي حباني به من علومه النافعة شيخي وسيدي وسندي وأستاذي الشيخ العلامة الفهامة الأصولي الفقيه المحدث الجليل المربي حبيب الرحمن، دام فيضه، وقدس سره العزيز- ما كتبته في العجالة السريعة لكثرة المشاغل وبالاختصار الشديد لضيق المحامل، ومن الله تعالى القبول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العال القدر العظيم الجاه، وآله وسلم تسليما كثيرا

الكاتب : مدير، مركز ميزان السلام للبحوث والدراسات، شيتاغونغ

.انظر: محمد محمد أبو زهو، الحديث والمحدثون، (بيروت: دار الفكر العربي، ط2، 1378هـ)، ص6-5

جزى الله ابن المؤلف الشيخ الفاضل العلامة البارع الباحث محمد عبد الأول هلال الماتريدي الحنفي الصوفي .حيث زودنا بالمعلومات المهمة عن أبيه المترجم له

আসহাবে বদর গ্রন্থটি বিশ্বমানের একটি বদরকোষ

মামুন সুলতান

মানুষ ক্ষণস্থায়ী জীব। মৃত্যু মানুষের অপরিহার্য ভালোবাসা। মানুষ পৃথিবীতে আসে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পাসপোর্ট হাতে। পাসপোর্টের মেয়াদ শেষে ভিসা ক্যানসেল করে প্রাণহীন হতে হয়। জীবনের অন্য একটি জীবনে পদার্পন করেন। আসা-যাওয়ার এই খেলায় মানুষ পৃথিবীতে অবস্থান কালে নিজের কৃতকর্মের জন্য চিরস্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকেন। সৃজনশীল কর্মে উদ্যমী মানুষই আত্মার অমৃত সুধা পান করে বিশ্বকে জয় করেন। ধুমকেতুর উজ্জ্বল আভায় জ্বলতে থাকেন ইতিহাসের স্বর্ণখাতায়। জীবৎকালীন বাদামি কষ্টে মুখরিত চিরচাঞ্চল্য জীবন মৃত্যুর পর হয়ে যান সোনালি সূর্য। সেই সূর্যের কিরণফোটায় গড়ে ওঠে সমাজের বিদগ্ধজন। একজনের জ্ঞাননিসৃত গবেষণা শতজনের এষণা অণ্বেষায় আলোশক্তির বিম্বিত পরাশক্তিতে বলবান। জ্ঞানের রাজ্যে হয়ে ওঠে মহাসাম্রাজ্য। মহারাজ্য সৃষ্টির নেপথ্যে যিনি থাকেন তিনি একজন প্রাজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব। সেই সব প্রাজ্ঞ-প্রাণময় পুরুষদের একজন কর্মবীর সিপাহসালার শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান।

আজকের প্রবন্ধটি সাজাতে গিয়ে আমাকে অনেক ভাবতে হয়েছে। লেখকপুত্র মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল আমাকে গুরুদায়িত্ব দিয়ে আমার জ্ঞানের রাজ্যকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে দিয়েছেন। ইতিহাস নির্ভর জ্ঞান-সংকটে পড়ে সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার অবস্থা আমার। দায়িত্ব মারফতে যে নির্দেশ আমার ওপর বর্তেছে তার ভার বহন করা আমার পক্ষে কি সম্ভব? হাদীস-কোরআনের অকাট্য প্রমাণ আমার সাধ্যের বাইরে। আল্লামা যে ওজনের গবেষক সেখানে আমি তুলাদণ্ডমাত্র। জ্ঞানরাজ্যের প্রাথমিক স্তরে জ্ঞানার্জনের একজন ছাত্র হিসেবেও নিজেকে মনে করার কারণ নেই। সেই খানে আশ্চর্য-সুন্দর এক মহীরূহ তুলে দিলে তা হবে আমার সক্ষমতার বাইরে। তবুও তরীভাসাতে মনোযোগ দিয়েছি আল্লামা মো. হবিবুর রহমানের লেখা "আসহাবে বদর" গ্রন্থটি পাঠকর্মে। আলোচনা বা সমালোচনা নয় বরং একটি পাঠপ্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করা করবো।

২৪০ পৃষ্ঠার বাংলা ও আরবি ভাষায় প্রণীত গ্রন্থটি বাংলা ভার্সন নিয়ে আলোকপাত করবো। উল্লেখ্য যে, আল্লামা মো. হবিবুর রহমান আরবি ভাষারও একজন দক্ষ পণ্ডিত। বাংলাভাষা চর্চার পাশাপাশি তিনি আরবি ভাষাকে নিজের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। একজন বিদগ্ধ আলেম হিসেবে তিনি দেশে বিদেশে আশ্চর্য রকম জনপ্রিয়। আরববিশ্বের অনেক বুজুর্গ আলেম আল্লামার সাথে দেখা করে জীবনের শ্রেষ্ঠ সাক্ষাত বলে ধন্য হয়েছেন। দেশেও রয়েছে তাঁর হাজার হাজার আলেমশিষ্য। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার

মর্যাদা অনেকের মুখে শুনেছি। সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপসের লেখা "আসহাবে বদর" গ্রন্থটি পাঠ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

"আসহাবে বদর" গ্রন্থটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালের মে মাসে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০২২ সালের আগস্ট মাসে। তৃতীয় সংস্করণ সম্পর্কে প্রকাশের মন্তব্য হলো "দেড় যুগেরও অধিক কাল পর আসহাবে বদর নামক গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থের পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০১৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। বছর দুয়ের মধ্যে মুদ্রিত সমুদয় কপি শেষ হয়ে যায়। ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিগত কয়েক বছর পুণঃপ্রকাশের উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়নি। কিছুটা বিলম্বে হলেও গ্রন্থখানি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করছি।" (মোঃ আব্দুল বাকী খালেদ, পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, আল হাবীব ফাউন্ডেশন।)

এ–গ্রন্থ সম্পর্কে লেখক আল্লামা মো. হবিবুর রহমানের বক্তব্য হলো "আলহামদুলিল্লাহ। বন্ধু বান্ধব ও শুভ্যানুধ্যায়ীদের উৎসাহে ইসলামের প্রথম ও প্রধান যুদ্ধ বদর এর প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরাম এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও আরবী অক্ষরের ক্রমধারা অনুযায়ী তাঁদের মুবারক নামের আরবী তালিকা সম্বলিত আসহাবে বদর নামক এ পুস্তকখানা রচনা সম্পন্ন করতে পেরে রাহমান রাহীমের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।" লেখকের বক্তব্যে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু একেবারে পরিষ্কার। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের তালিকা প্রণয়ন ও তাঁদের পরিচয় বর্ণনা করা এতো সহজ ছিল না। গ্রন্থটির নির্ঘণ্ট দেখলেই অনুমান করা যায়, এ গ্রন্থটি লিখতে লেখকের কত গ্রন্থের ভেতরে দিনরাত সময় দিতে হয়েছে। একজন নিষ্ঠাবান গবেষক ছাড়া এরকম কর্ম উদ্ধার করা আদৌ সম্ভব কিনা প্রশ্ন থেকেই যায়। ধর্মদরদী, নবিদরদী, সাহাবাদরদী, ইসলামদরদী না হলে কেউ এরকম কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজে হাত দেয় না। আল্লাম মো. হবিবুর রহমান সেই নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

জানার ও বোঝার সুবিধার্থে 'আসহাবে বদর' গ্রন্থের বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় উল্লেখ করছি। বদর প্রান্তর, বদরের নামকরণ, বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, যুদ্ধের বর্ণনা, যুদ্ধের প্রারম্ভিকা, মল্লযুদ্ধ, যুদ্ধে ফিরিশতাগণের অবতরণ, আসহাবে বদরের সংখ্যা, যুদ্ধের ফলাফল, বদরযুদ্ধে নিহত কাফির নেতৃবৃন্দ, যুদ্ধে বন্দিদের মধ্যে পরবর্তীতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন, আসহাবে বদর এর ফযীলত, বদরী সাহাবীগণের উসিলা নিয়ে দু'আ করা, বদর যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট কতিপয় মু'জিযা, বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিত, বদর যুদ্ধের শহীদগণ, অন্যান্য সময়ে শহীদ বদরী সাহাবীগণ, যে সকল সাহাবী নিজ পুত্র সন্তানসহ বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, যে সকল সাহাবী নিজ ভাইসহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, আরবী বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী বদরী সাহাবীগণের তালিকা, পরিশিষ্ট:

কয়েকটি ঐতিহাসিক ছবি, তথ্যসূত্র।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মাদ্‌রাসার ছাত্র। আজীবন তিনি দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। কোরআন হাদীসের বাণী ছাত্রসহ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বয়ান পেশ করার পাশাপাশি লেখক হিসেবে বাংলা ও আরবি ভাষা চর্চায় তিনি ছিলেন নিবেদিত। তাঁর লেখনি শক্তি ছিল প্রখর। হাদীসের অগাধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ আল্লামা হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। কথায় আছে, যিনি যত বেশি অধ্যয়ন করেন তিনি ততবেশি জ্ঞানী। সেই জ্ঞাননির্ভর বিদ্যা লেখায় উদ্বুদ্ধ করে। সেই আনন্দে তিনি কলম চালিয়েছেন। বাংলা ভাষা করেছেন ইসলামের আলোকে সমৃদ্ধ। তাঁর ক্ষুরধার লেখনিশক্তি বাংলা সাহিত্যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তাঁর উজ্জ্বল সৃজনীশক্তি বাংলা ভাষার ইসলামি পণ্ডিতদের জন্য বিরাট অনুপ্রেরণায় সিক্ত হবে। তাঁর ভাষা সহজ সাবলীল। সহজ কথা যায় না বলা সহজে, সেই বলতে না পারা সহজিয়া ঢংকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। মাদ্‌রাসায় পড়ুয়া আলেম সমাজ যেখানে সাধুভাষার চর্চা করেন আল্লামা সেইখানে চলিত ভাষার স্বাভাবিকতাকে অবলম্বন করে সাহিত্য চর্চা করেছেন। ফলে তিনি যুগের দাবিটিও মেটাতে সক্ষম হয়েছেন।

'আসহাবে বদর' গ্রন্থটিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠাধ্যায়ে বিভক্ত করে পাঠকদের অধ্যয়ন-অভ্যাসকে একঘেয়েমি থেকে মুক্ত করেছেন। এ গ্রন্থটি পাঠক আনন্দ পাঠ হিসেবে গ্রহণ করবে বলে প্রতীয়মান হয়। হাদীস-কোরআনের তথ্যসূত্র ব্যবহার করে তাঁর ইতিহাস চর্চাকে বিশ্বাসযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। যৌক্তিক তথ্যসূত্র ব্যবহার করে ইতিহাসকে প্রমাণিত সত্যে রূপ দিয়েছেন। বদর যুদ্ধের ৩১৩ জন সাহাবিদের তালিকা যত সহজে আমরা হাতে পেয়েছি আল্লামার জন্য তা সংগ্রহ করা তত সহজ ছিল না। প্রতীয়মান হয় যে, দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে বিন্দু বিন্দু করে তিনি তথ্যের সমুদ্র সংযোগ করেছেন। বিরাট কর্মযজ্ঞের ভীষণ পরিশ্রমের আশ্চর্য সংকলন এ-গ্রন্থ।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে 'বদর'র যুদ্ধ একটি স্বর্ণখচিত ইতিহাস। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ধর্মীয় যুদ্ধ। অস্তিত্বের লড়াইয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। যুদ্ধের ফলাফলে অল্প সংখ্যক মুসলিম বাহিনী নিয়ে অংশগ্রহণ করে জয় লাভ করেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনী। মাত্র তিনশ তেরো জন সাহাবী নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রচলিত সংখ্যা বদরী সাহাবি ৩১৩ জন আসহাবের সংখ্যা নিয়েও তিনি গবেষণা করেছেন। আসহাবে বদরের সংখ্যা নিয়ে আল্লামার গবেষণা হলো "আসহাবে বদরের সংখ্যা সম্পর্কে হাদীস শরীফে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। যেমন- ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ও ৩১৯। বস্তুত উক্ত রিওয়াতগুলোর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই বরং সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার পর কিছু দূর গিয়ে সঙ্গী সাথী মোট কত জন গণনার নির্দেশ দিলেন। তখন প্রথমবারের গণনানুযায়ী সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১৪ জন। হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার গণনার নির্দেশ দিলে গণনায় থাকাবস্থায় একটু দূরে হালকা পাতলা উটের উপর আরোহী আর একজন আগন্তুকের প্রতি গণনাকারীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে তাঁকে নিয়ে সংখ্যা ৩১৫ হলো। শেষ আগন্তুক এবং হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গণনা করলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১৫ জন। আর ঐ শেষ ব্যক্তি এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গণনা না করলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১৩ জন।" এভাবে লেখক আল্লামা মো. হবিবুর রহমান প্রতিটি তথ্যের বিপরীতে তথ্যগত ঐতিহাসিক সত্যকে অনুসন্ধান করে সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। অন্যদিকে তিনি তথ্যটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করে সঠিক ইতিহাসকে গ্রহণ করেছেন। অকাট্য গ্রন্থ হিসেবে "আসহাবে বদর" গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা শতভাগ নিশ্চিত করেছেন।

'বদর যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট কতিপয় মু'জিযা' অধ্যায়ে লেখক আশ্চর্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বদর যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে আল্লাহপাক অনেক আশ্চর্য ঘটনার অবতারণা করেছেন। অলৌকিক অনেক ঘটনা বদর যুদ্ধে দৃশ্যমান হয়েছে। বদর যুদ্ধে কাফিরদের কে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেরদিন আঙ্গুলের ইশারায় তাদের মৃত্যুর স্থানের প্রতি প্রকাশ্য-ঈঙ্গিত করেছেন। যুদ্ধশেষে দেখা গেলো সেই সে স্থানেই তাদের লাশ পাওয়া গেছে। বালুকণার যুদ্ধকৌশল একটি অতীব আশ্চর্যের উদ্রেক করে। যুদ্ধ শুরুর আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। অন্যদিকে মাঠের অপর প্রান্তে কাফিরযোদ্ধাদের দল। তখন রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমুষ্ঠি বালুকণা নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন। এক হাজার কাফির সেনার প্রত্যেকের চোখে সেই বালুকণা নিক্ষিপ্ত হলো। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তারা দিশেহারা হলো। সহসাই তারা যুদ্ধের খেই হারিয়ে ফেলে। লেখক বলেন "বালু বা ধুলা মুষ্ঠিবদ্ধ করে ছুঁড়ে মারলে তা দূরে যায় না। এটাই চিরাচরিত নিয়ম। কিন্তু নবীজির ছুঁড়ে মারা বালু পুরো মাঠ অতিক্রম করে এক হাজার কাফিরের চোখে ঢুকলো।" এ-রকম আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনাগুলো আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

যুদ্ধরত অবস্থায় সাহাবিসেনা হযরত উকাশা বিন মিহসান (রা.)'র তলোয়ার ভেঙ্গে গেলে তিনি রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে উপস্থিত হয়ে জানালেন। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে খেজুরের একটা শুকনো ঢাল ছিল তা দিয়ে বললেন, এটা নিয়ে যুদ্ধ করো। তিনি খেজুরের ঢাল হাতে নিতেই হয়ে গেলো

শানদেওয়া ধারালো তলোয়ার। তিনি সেই তলোয়ার (ঢাল) দিয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তা হলো "বদরের দিন উশাকা বিন মিহসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর আপন তলোয়ার ভেঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত তা দিয়েই যুদ্ধ করছিলেন। (তলোয়ার ভেঙ্গে গেলে) তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এলেন, নবীজি তাঁকে শুকনো একটি খেজুরের শাখা (ডাল) দিয়ে বললেন- হে উশাকা! এটা নিয়েই যুদ্ধ করো। যখন উকাশা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে খেজুর শাখাটি নিলেন তা তাঁর হাতে এসে অতি দীর্ঘ শানদার, উজ্জ্বল ও মজবুত তলোয়ার হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিজয়দান পর্যন্ত তিনি সে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। সে তলোয়ারখানা আয়ূন বা সাহায্য নামে খ্যাত।"

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লামার বিশ্লেষণ হচ্ছে এটি প্রথম সামরিক বিজয়। এ-যুদ্ধ ইসলাম ও পৌত্তলিকতার চরম পরীক্ষা। ঈমানের কঠিন পরাকাষ্ঠা দেখানো এবং চরম পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন মুসলমানরা। বদর যুদ্ধে মুসলিমসেনারা পার্থিব যাবতীয় সুখ বিসর্জন দিয়ে শহিদ হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে সবাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ-যুদ্ধে নব্য মুসলিমদের মাঝে এক বিরাট আত্মবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। এটি ছিল মুসলিম শিবিরের জন্য প্রথম যুদ্ধ। ফলে এ যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে বিশ্ববিজয়ের একটা শুভ সূচনা করা হয়। নবযুগের সূচনা করেছে এ যুদ্ধ। বদর সেনানায়ক মহাবীর মহানবী হযরত মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তিস্থাপন করা হয়েছে। কুরাইশদের মনে এক মহাভয় সৃষ্টি করতে এ যুদ্ধ বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। বদরবিজয় সর্বযুগে মুসলিম জাতিকে প্রেরণা দিয়েছে, বর্তমানেও দিচ্ছে, ভবিষ্যতেও দেবে।

বদর সাহাবীদের পাশাপাশি বদরযুদ্ধে কুরাইশদের যেসব নেতাদের প্রাণনাশ হয়েছে তাদের একটা তালিকাও লেখক বর্ণনা করেছেন। কুরাইশনেতৃত্বে যারা ছিলেন সেই শক্তিশালি বলবান নেতারা এ যুদ্ধে নিহত হয়। তাদের মাঝে আল্লামার উল্লেখ করা নিহত ৭০ জন কাফিরদের প্রণিধানযোগ্য নিহত ব্যক্তিরা হলো, আমর বিন হিশাম (আবু জাহল), উতবা বিন রাবিআ, শাইবা বিন রাবিআ, উমাইয়্যা বিন খালফ, ওলীদ বিন উতবা এবং আবু জাহলের ভাই আ'স বিন হিশাম। বদর যুদ্ধে ৭০ জন কুরাইশ নিহত এবং ৭০ জন বন্দি হয়। বন্দিকুরাইশদের মধ্যে ১৬ জন পরবর্তী সময়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ দেখে ইসলামের ছায়াসুধা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণের পর পৃথিবী বিখ্যাত সাহাবী হতে পেরেছেন। জ্ঞানে-গুণে-গৌরবে প্রসিদ্ধ সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পেরেছেন। মহানবির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শে রঙিন হয়ে সোনার মানুষ হয়েছিলেন। তাঁদের একটা তালিকা লেখক উল্লেখ করেছেন। ধারাবাহিক সেই

স্বর্ণখচিত নামগুলোকে সন্নিবেশ করা কি এত-ই সহজ ছিল? মোটেই না। ব্যাপক অধ্যবসায় আর কঠোর ধ্যানমগ্নতা এবং গবেষণায় তিনি তা সম্ভব করতে পেরেছিলেন।

"আসহাবে বদর" গ্রন্থটি বদরযুদ্ধের একটি বিশ্বকোষ। বদরের আদ্যপ্রান্ত সত্য-ইতিহাস লেখক উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন। বদরকোষ বা বদর বিশ্বকোষ বলে আখ্যায়িত করা যায়। বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বদর সেনাদের আদিগন্ত ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেছেন। বদরীসাহাবীদের সুচিন্তিত তালিকা ও তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত, ইসলামে তাঁদের অবদান সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। বদরীসাহাবিদের জন্ম-মৃত্যু জীবনেতিহাস ধারাবাহিক বর্ণনা করেছেন। কোথাও কোনও খুঁত আছে কিনা তা বের করা আমার জ্ঞানসীমার বাইরে। লেখক মো. হবিবুর রহমানের জ্ঞানসীমা অতিক্রম করে কিংবা তাঁর জ্ঞানসীমা পর্যন্ত ছোঁয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই তাঁর আলোচিত বিষয়কে পুণঃল্লেখ করা ছাড়া কোনও গতি নেই। এ-গ্রন্থে ৩৩৬ জন সাহাবীর জীবনেতিহাস সনিষ্ঠ ভাবধারায় সবিস্তারে পেশ করা হয়েছে। যাঁরা বদরযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত যেমন আছে তেমনভাবে জীবিত সাহাবীদের বৃত্তান্ত-জীবন আলোকপাত হয়েছে। জীবিত সাহাবিরা আর কোন কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তারও বর্ণনা দিতে কার্পণ্য করেননি। সাহাবিদের নাম, উপনাম, উপাধী, বংশলতিকা, গোত্র এবং ইসলামে তাঁদের অবদান কতটুকু ইত্যাদিও উল্লেখ করেছেন। মুহাজির সাহাবী ৯১ জন এবং আনসার সাহাবীদের আলাদা আলাদা পরিচয় দিয়েছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন হলো "পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণকালে তাঁর বয়স ছিল ৩৮ বছর। হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অনন্য সাধারণ মর্যাদার অধিকারী মহান ব্যক্তিত্ব। নবী ও রাসূলগণের পরে মানবকূলে তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। আশারায়ে মুবাশশারাহ বা বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি। তাঁরই প্রচেষ্টায় হযরত জুবায়ির ইবনুল আওয়াম (ওফাত ৩৬ হিজরী), হযরত তালহা (ওফাত ৩৬ হিজরী) হযরত উছমান (ওফাত ৩৫ হিজরী) ও হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (ওফাত ৩৩ হিজরী) রাদিয়াল্লাহু আনহুম এ চারজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যাঁরা আশারায়ে মুবাশ্শারার মধ্যে গণ্য। তিনিই নিজ সম্পদ দ্বারা হযরত বিলাল বিন রাবাহ (ওফাত ২০ হিজরী) এবং হযরত আ'মির বিন ফুহাইরা (ওফাত ৪ হিজরী) রাদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমূখ সাতজন সাহাবীকে কাফিরদের দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত করেছিলেন। হিজরতকালে তিনিই ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র সঙ্গী। এ সফরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা তিনিই করেছিলেন। হজ্জ ফরয হওয়ার পর ৯ম হিজরীতে নবীজি প্রথম সাহাবীগণকে হজ্জে প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হজ্জযাত্রী কাফেলার আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু। হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াবী জীবনের শেষ প্রান্তে অসুস্থকালীন সময়ে তাঁর নির্দেশে হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু সতেরো ওয়াকত নামাযের ইমামতি করেছিলেন।" ছোট একটা অনুচ্ছেদে লেখক একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনকে লিপিবদ্ধ করে একজন আদর্শ লেখকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লেখক। বদরী সাহাবীদের জীবনী লিখতে গিয়ে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁর নজর এড়াতে পারেনি। সেসময় মাত্র ১৯ জন পড়া জানা লোক ছিলেন। তাঁর মাঝে হযরত উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু। এই যে একটা সমাজে মাত্র ১৯ জন শিক্ষিত লোক ছিল এরকম সংখ্যাতত্ত্বে চিহ্নিত করা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক পড়াশোনা অনেক গবেষণা করার ফলে এরকমভাবে একটা সমাজের শিক্ষাশুমারি প্রকাশ করা যায়। আল্লামা এক্ষেত্রে অনন্য অধ্যবসায়ী ছিলেন তার-ই কিঞ্চিত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উমারের (রা.) ইসলাম গ্রহণের যে কাহিনী সমাজে প্রচলিত আছে সে কাহিনী বর্ণনা করেননি। উমারের (রা.) ইসলাম গ্রহণ ইসলাম ধর্মের জন্য কতটুকু অপরিহার্য ছিল তার উল্লেখ তিনি করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুক এই দোয়া করতেন। উমারের (রা.) ইসলাম গ্রহণে ইসলামের যে লাভ হয়েছে তার বর্ণনা করে লেখক বলেন, "তাঁর পূর্বে ৪০ জন পুরুষ ও ১১ জন মহিলা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তখন পর্যন্ত ইসলাম প্রচার ও তালিমে দ্বীনের কাজ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৫৫ হিজরী) গৃহে গোপনে আঞ্জাম দিতেন। হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের পর থেকে গোপনীয়তার প্রয়োজন থাকেনি। কেননা ইতোপূর্বে হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমর বিন হিশাম (আবূ জাহল) কিংবা উমার বিন খাত্তাবকে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়ে ইসলাম প্রচারে সাহায্য করো। আল্লাহপাক তাঁর হাবীবের এ দু'আ হযরত উমারের বেলায় কবুল করলেন।"

দিন তারিখ সন উল্লেখ করা ইতিহাস বর্ণনার একটি মূখ্যকর্ম। লেখক বিজ্ঞতার সাথে দিন তারিখ ও সালের উল্লেখ করে ঘটনার অবতারণা করেছেন। ইতিহাসের এই সূক্ষ্ম বিষয় তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করেছেন। "আসহাবে বদর" গ্রন্থটি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের কেবল জীবনবৃত্তান্ত-ই বর্ণনা করেননি; তখনকার সময়ের সমাজবাস্তবাতও তুলে ধরেছেন। বলা যায়, বদরীসাহাবীদের কথা বলতে বলতে তাঁদের আশপাশ-চারপাশ, স্থানীয় ও দূরদেশীয় সমাজব্যবস্থা সুন্দরভাবে প্রতিযুক্ত করেছেন। সাহাবীদের ব্যক্তিগত জীবনাচার, চিন্তাচেতনা, জ্ঞানগ্রাহ্য শিক্ষাব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক চেতনাবোধ নিয়েও লেখক কাজ করেছেন। হাদীসচর্চাকারী সাহাবীদের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। কোন সাহাবী কতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন তারও সংখ্যা

উল্লেখ করেছেন। খুঁটিনাটি বিষয়গুলো লেখক চমৎকারভাবে তাঁর লেখায় আনতে সক্ষম হয়েছেন।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত আবু বাকর (রা.)'র প্রায় পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত থেকে হযরত আবু মুলায়িল (রা.) পর্যন্ত ৩৩৬ জন সাহাবীর বর্ণনা লেখক অত্যন্ত যত্ন ও মনোযোগ দিয়ে সম্পন্ন করেছেন। এখানেই "আসহাবে বদর" গ্রন্থটি পরিসমাপ্তি করতে পারতেন। কিন্তু লেখক তাঁর গবেষণাকে আরেকধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। লেখকের মানস কেবল একটি গ্রন্থ লেখা নয় বরং তিনি চেয়েছিলেন ইতিহাসচর্চাকারী মানুষের জ্ঞানপিপাসায় পরিতৃপ্ত করতে। লিপিবদ্ধ করলেন বদরযুদ্ধজয়ী সাহাবী যাঁরা বদরসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেছেন তাঁদের তালিকা। বদরযুদ্ধে ১৪ জন সাহাবী শহিদ হন। এদের মাঝে ৬ জন মুহাজির আর ৮ জন আনসার সাহাবী। তাঁদের তালিকা হলো হযরত সাফওয়ান বিন বাইদা (রা.), হযরত আকিল বিন বুকায়ির, হযরত উবাইদাহ বিন হারিছ আল মুত্তালিবী, হযরত উমায়ির বিন আবী ওয়াক্কাস আয যুহরী, হযরত মাহজা বিন সালিহ, হযরত যুশশিমালাইন, হযরত হারিছা বিন সুরাকা, হযরত সা'দ বিন খাওলী, হযরত সা'দ বিন খাইসুমা, হযরত উমাইয়ির বিন হুমাম, হযরত আউফ বিন আ'ফরা, হযরত মুবাশশির বিন আবদুল মুনযির, হযরত মুআউয়িজ বিন আ'ফরা, হযরত ইয়াযীদ বিন হারিছ রাদিয়াল্লাহু আনহুম। এভাবে উহুদ যুদ্ধে ৩৭ জন, বিরে মাউনা যুদ্ধে ১১ জন, খন্দক যুদ্ধে ২ জন, যি কিরদ যুদ্ধে ১ জন, খাইবার যুদ্ধে ৪ জন, মুতা যুদ্ধে ৬ জন, হুনাইন যুদ্ধে ১ জন, ইয়ামামা যুদ্ধে ২৬ জন, জসরে আবু উবায়িদ যুদ্ধে ৪ জন, ইয়ারমুক যুদ্ধে ২ জন, তাউনে আ'মওয়াস যুদ্ধে ২ জন, উষ্ট্রের যুদ্ধে ৩ জন, সিফফিন যুদ্ধে ২ জন বদরী সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এই তথ্যগুলো সত্য। কিন্তু তথ্য সংগ্রহ করা ছিল কঠিন। সেই কঠিন-সুন্দরকে তিনি সৌন্দর্যে রূপ দিয়েছেন আপন প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান একজন ধর্মবিদ দার্শনিক। ইসলামের মহান সৌন্দর্য, লাবণ্যময় জ্ঞান, অসাধারণ মধুরতা নিয়ে আজীবন নিষ্ঠাচারে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর অপরাপর গ্রন্থগুলো "আসহাবে বদর" গ্রন্থের মতো সমান তাৎপর্যে এবং তাত্ত্বিক তীর্যকতায় উৎকীর্ণ হয়েছে। ইতিহাসবেত্তা, হাদীস বিশাররদ, কোরআন বিশেষজ্ঞ আল্লামা ইহজগত ত্যাগ করেছেন। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনার পাশাপাশি আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। এই কামনা করছি। তাঁর গ্রন্থগুলো ব্যাপকভাবে পাঠকের কাছে ছড়িয়ে পড়ুক।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ রচিত হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক কতিপয় গ্রন্থ: একটি পর্যালোচনা

আব্দুল্লাহ যোবায়ের

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে ইলমে হাদীস চর্চা ও শিক্ষাদানে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে হাদীস অধ্যয়ন নয়তো হাদীস শিক্ষাদানে। ১৯৬৩ সালের ১৩ জানুয়ারি তিনি সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসায় হেড মুহাদ্দিস হিসেবে নিযুক্ত হন। সেই থেকে ২০২২ সালে ইন্তেকাল পর্যন্ত হাদীস শিক্ষাদানই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

আলিয়া মাদ্‌রাসার পাঠ্যক্রমে দাখিল-আলিমের ক্লাসগুলোতে মিশকাতুল মাসাবিহ পড়ানো হতো। সিহাহ সিত্তার গ্রন্থগুলো আসে কামিল শ্রেণিতে। সেখানেও সিলেবাসের সীমাবদ্ধতা থাকে। এছাড়া বোর্ড পরীক্ষা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্লাস শেষ করা ইত্যাদি নিয়ম-কানুনের কারণে সিহাহ সিত্তার পুরোটা একাধারে পড়ানো সম্ভব হয় না। কওমি মাদ্‌রাসাতেও দাওরার বছর বেশিরভাগ হাদীসগ্রন্থ পড়ানো হয়। এজন্য শায়খুল হাদীসদের নির্দিষ্ট ক্লাসগুলো ছাড়া অন্যান্য সময়ে হাদীস পড়ানোর সুযোগ অনেক অপ্রতুল। কিন্তু আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ হাদীস শিক্ষাদানকে সর্বজনীন করতে পেরেছিলেন। বড় বড় হাদীস গ্রন্থের শিক্ষাদান তিনি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এজন্য চাকুরিরত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ছাড়াও দেশ-বিদেশের অসংখ্য শিক্ষার্থী তাঁর কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান নিতে পেরেছে। পূর্বযুগের মুহাদ্দিসদের মতো তাঁর বাড়িটিই একটি হাদীসের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের বাইরেও অতিথি শিক্ষক হিসেবে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি হাদীসের দারস দিয়েছেন।

যখন প্রাতিষ্ঠানিক চাকরি থেকে অবসরে গিয়েছেন, তখনও বিভিন্ন মাহফিল, ইলমি জলসা ও মসজিদ কেন্দ্রিক হাদীসের দারস দান চালু রেখেছেন। আল হাবীব মসজিদসহ বিভিন্ন মসজিদে তিনি আমৃত্যু হাদীসের দারস দিয়ে গিয়েছেন।

এর বাইরেও ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা চিন্তা করে তিনি আরবি, বাংলা ও উর্দু ভাষায় ১৮টি গ্রন্থ লিখেছেন। সেগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো সরাসরি ইলমে হাদীস সম্পর্কিত:

১. দু'আয়ে মাছনুনা ও ৩৩ আয়াতের ফযিলত

এ গ্রন্থটি দু'আ সম্বলিত হাদীসসমূহের একটি সংকলন। গ্রন্থটির ১৬তম সংস্করণ ২০২২ সালে আল হাবীব ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কলেবর ৭৯ পৃষ্ঠা।

হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহ আমল করার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি পাঠকের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। গ্রন্থটির শেষে ফজিলতপূর্ণ কয়েকটি দরুদ শরিফ অর্থসহ সংযুক্ত করা হয়েছে।

২. যাখিরাতুল আহাদিসিল আরবাঈন ফি ফাদাইলি সায়্যিদিল মুরসালিন

ذخيرة الأحاديث الأربعين في فضائل سيد المرسلين

আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ২০১০ সালে লন্ডনে এ গ্রন্থটি সংলন করেন। গ্রন্থটিতে মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সম্বলিত চল্লিশটি হাদীস বাংলা অর্থসহ সংকলিত হয়েছে। ২০১১ সালে গ্রন্থটি আল হাবীব ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ ২০২২ সালে গ্রন্থটি পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে।

৩. কানযুল আহাদিসিল আরবাঈন ফি মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যিল আমিন

كنز الأحاديث الأربعين في مناقب أهل بيت النبي الأمين

আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ২০১০ সালে লন্ডনে দাওয়াতি সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এ গ্রন্থটি সংকলন সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটিতে আহলুল বায়তের মর্যাদা সম্বলিত চল্লিশটি হাদীস বাংলা অর্থসহ সংকলিত হয়েছে। ২০১১ সালে গ্রন্থটি আল হাবীব ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়।

৪. তুহফাতুল লাবিব বি আসানিদিল হাবিব

تحفةاللبيببأسانيد الحبيب

এ গ্রন্থটি আরবি ভাষায় রচিত। এটি সর্বপ্রথম ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এতে আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহর ইলমে কিরাত, ইলমে হাদীস, ইলমে তাসাউফ, ইলমে ফিকহ ও ইলমে তাফসিরে দেশ-বিদেশের বিপুল সংখ্যক শায়খ থেকে প্রাপ্ত সনদগুলো একত্রিত করা হয়েছে। বাংলাদেশি কোনো আলিমের এমন সনদ বিষয়ক বই আর দ্বিতীয়টি আছে কি না আমার জানা নেই।

৫. আত তুহফাতুল লাতিফাহ বি আহাদিসিল মুসালসালাতিল মুনিফাহ

التحفة اللطيفة في مسلسلة الأحاديث المنيفة

আরবি ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ২০০৯ সালে লন্ডনের রেডবোর্ন হাউজ থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ তাঁর শায়খগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত মুসালসাল হাদীসের সনদগুলো একত্রিত করেছেন। এ গ্রন্থে প্রথমেই মুসলসাল হাদীসের পরিচয় ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এরপর চারটি মুসালসাল হাদীস এবং মুসালসাল হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ হাদীসের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কিছু আদব তুলে ধরা হয়েছে।

৬. দারসে হাদীস-১

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ আল হাবীব মসজিদে জীবনের শেষ কয়েকটি বছর হাদীসের দারস দিয়েছিলেন। তাঁর দারসগুলো ভিডিও করে

সংরক্ষণ করা হয়েছিল। সেখান থেকেই নিয়্যতের হাদীস এবং রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নসবনামা নিয়ে একটি হাদীসের দারস এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৭৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

৭. **মুনতাখাবুস সুনানি ওয়াল আসার** (منتخب السنن والآثار)

এটি একটি অনবদ্য হাদীস সংকলন। এটি তাঁর ইন্তেকালের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। এতে মোট ২০৩ টি হাদীস স্থান পেয়েছে। যথা:

কিতাবের নাম	বাব সংখ্যা	হাদীস সংখ্যা
কিতাবুল ঈমান	০৫	৬৫
কিতাবুস সালাত	১৭	১১৫
কিতাবুল ফিতান	০৩	২৩

এই গ্রন্থটিতে উল্লিখিত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে। মূলতঃ এই হাদীস সংকলনটি বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে একটি হাতিয়ার বিশেষ। তিনি বেছে বেছে এমন সব হাদীস সংকলন করেছেন, যা আমাদেরকে ফিরাকে বাতেলার অনুসারীদের বিভিন্ন বানোয়াট প্রোপাগান্ডা থেকে রক্ষাকবচ হতে পারে।

ঈমান একজন মুমিনের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ঈমান সবার আগে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দেখা যায় বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিসগণ কিতাবুল ঈমান দিয়ে তাঁদের গ্রন্থগুলো শুরু করেছেন। অবশ্য যারা কিতাবুত তাহারাত দিয়ে শুরু করেছেন, তারা ফিকহি দৃষ্টিকোণে রচনা করেছেন বলেই করেছেন। আল মুনতাখাব গ্রন্থের কিতাবুল ঈমানে উল্লিখিত ৬৫টি হাদীসের প্রতিটি হাদীস এমন বিষয়ে, যাতে বর্তমান পৃথিবীর সাধারণ মানুষের ঈমান হুমকির সম্মুখীন। যেমন প্রথমেই কয়েকটি অধ্যায়ে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম, তাঁর আহলে বায়ত ও তাঁর সাহাবিগণের ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান যুগে এই শিক্ষা হাদীস থেকে পাওয়া অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বাতিল ফিরকার কিছু লোক মানুষকে প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়- আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা জরুরী কিছু নয়। কুরআন-হাদীসে এ বিষয়ে কিছু নেই। তাদের অনেকেই সাহাবিদের ভালোবাসা দূরের কথা, তাঁদের সমালোচনা করে। আরেক দল আহলুল বায়তকে ভালোবাসাকে শিয়াদের আলামত বলে প্রচার করে। কিতাবুল ঈমানে বর্ণিত হাদীসগুলো এসব বিভ্রান্তি দূর করার জন্য যথেষ্ট।

কিতাবুল ঈমানের পরের পরিচ্ছেদগুলোও যেসব বিষয়ে মানুষ সংশয়গ্রস্থ হয়ে ঈমানহারা হতে পারে, সেসব বিষয়ে হাদীস সংকলন করা হয়েছে। যেমন: জিহাদে গমন, ফানা ফিল্লাহর মর্মার্থ, যুহদ ও ইহসানের মর্মার্থ, শাফায়াত প্রার্থনা, শবে মিরাজ ও আল্লাহকে দর্শন ইত্যাদি।

কিতাবুত সালাত গ্রন্থে হাদীস সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১১৫ টি। আমাদের দেশে আহলে হাদীস নামধারী মাযহাববিদ্বেষীরা হানাফি মাযহাবের উপর বহু আগে থেকেই খড়্গহস্ত। তারা জনসমাজে হানাফিদের নামায সুন্নাহসম্মত নয় বলে যে অপপ্রচার চালিয়েছেন, তার ফলাফল আমরা আমাদের চারপাশেই দেখতে পাচ্ছি। হাদীস তাহকিকের নামে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাদের মিথ্যাচারের ভয়াবহতা সচেতন যে কাউকে উদ্বিগ্ন করবে। এমনকি 'জাল হাদীসের কবলে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত' নামে বই পর্যন্ত লেখা হয়েছে। আল মুনতাখাব গ্রন্থ সংকলনের সময় লেখক এ বিষয়গুলো নজরে রেখেছেন। এজন্য দেখা যায়, নামাযের ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের অনুসারীরা আক্রান্ত হতে পারে, এমন সকল বিষয়ের হাদীস তিনি সংকলন করেছেন। যেমন নামাজের ওয়াক্ত, ঈদের নামাজের তাকবির, ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পাঠ, আমিন জোরে বলা, নামাযে হাত রাখার স্থান, রফউল ইয়াদাইন, তিন রাকাত বিতর, সালাতুল আওয়াবিন, এক সালামে বিতর শেষ করা, কুনুত পাঠ, তারাবিহর নামাজ বিশ রাকাত হওয়া ইত্যাদি।

এখন আখেরি যামানা। কিয়ামতের ছোট আলামতগুলো সবই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। তাই এ বিষয়ে সচেতনতা জরুরী। এজন্য কিতাবুল ফিতানে কিয়ামতের আলামত নিয়ে মোট ১৭টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে খারেজিদের সম্পর্কে সতর্ক করে গিয়েছেন। খারেজি মানসিকতার উত্থান এখন আরও বেশি করে হচ্ছে। আবার কেউ কেউ ইসলামের নামে মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকছে। এসব বিষয় নিয়ে আরও ৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এভাবেই গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবন আলাভি আল হাদ্দাদ রিসালাতুল মুয়াওয়ানাহ গ্রন্থে বলেছিলেন, 'প্রত্যেক যুগের আলিমদেরকে দিয়ে আল্লাহ সমসাময়িক লোকদের উপযোগী বক্তব্য দেওয়ান।' এদিক থেকে চিন্তা করলে এই সংকলনটি সমসাময়িক মানুষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী একটি সংকলন।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলো ছাড়াও আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহর হাদীস শাস্ত্র বিষয়ক আরও কিছু গ্রন্থ প্রকাশিতব্য। যেমন দারসে হাদীস-২, দারসে শামাইলে তিরমিযি, দারসে রিয়াদুস সালিহিন-১ ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ গ্রন্থগুলো দিয়ে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক: লেকচারার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

আত তুহফাতুল লাতীফাহ ফী আহাদীসিল মুসালসালাতিল মুনীফাহ একটি পর্যালোচনা

মাসুক আহমেদ

বাংলাদেশী আলেমদের মধ্যে যারা বিশ্ববরেণ্য হতে পেরেছেন তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। 'মুহাদ্দিস ছাহেব' নামে খ্যাত শাইখুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর কর্মপরিধি ও সুখ্যাতি ছিল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। তিনি যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সেই সাথে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে হাদীসের দারস প্রদান করেন। তাঁর হাদীসের শিক্ষকদের মধ্যে শামসুল উলামা আল্লামা সাহিব কিবলা ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ, আল্লামা মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বারাকাতী রাহিমাহুল্লাহ, আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাভি আল মালিকি মক্কী রাহিমাহুল্লাহ, আল্লামা হাবীব সালিম আশ শাতেরী ইয়ামনী রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ রয়েছেন। অন্যদিকে মদীনা মুনাওয়ারার শায়খ হাবীব আসিম বিন আদি, কুয়েতের সায়্যিদ ইউসুফ হাশিম আর রিফাঈ রাহিমাহুল্লাহ, বাহরাইনের ড. নাজি বিন রাশিদ, সিরিয়ার ড. আসআদ সাঈদ সাগিরজি রাহিমাহুল্লাহ এর মতো সমকালীন বহু প্রতিথযশা আলেমে দ্বীন তাঁর কাছ থেকে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেছেন। একজন বাংলাদেশী হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজ কর্মগুণে সমাদৃত হয়ে তিনি দেশের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন।

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ লিখিত ১৮টি গ্রন্থের মধ্যে বেশিরভাগই আরবী ভাষায় প্রণীত এবং হাদীসবিষয়ক। তার মধ্যে অন্যতম আত তুহফাতুল লাতীফাহ ফী আহাদীসিল মুসালসালাতিল মুনীফাহ (মুসালসাল হাদীসের শ্রেষ্ঠ উপহার)। এই প্রবন্ধে গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করবো।

আরবী ভাষায় লেখা এই বইটি প্রথম প্রকাশ হয় ২০০৯ সালে। বইটিতে মুসালসাল হাদীসের পরিচয়, গুরুত্ব, বর্ণনার পদ্ধতি এবং হাদীসের শিক্ষক ও ছাত্রদের কিছু আদব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহ তিনি তাঁর শায়খগণের থেকে যেসকল মুসালসাল হাদীস শুনেছেন এবং ইজাযাত পেয়েছেন এমন চারটি মুসালসাল হাদীস পূর্ণ সনদসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

মুসালসাল হাদীস হাদীস শাস্ত্রের একটি পরিভাষা। মুসালসাল হাদীস (الحديث المسلسل) এর সংজ্ঞা হলো, যে হাদীসের সনদে সকল রাবী তথা বর্ণনাকারীগণ হাদীসটির সনদ (বর্ণনাকরীগণের ধারা) বা মতনে (মূল ভাষ্য) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ কোন কাইফিয়াতকে (অথবা সাহাবি বা তাবেয়ী বা তাঁর শায়খ থেকে) অভিন্ন শব্দে কিংবা অভিন্ন অবস্থায় বর্ণনা করেন। "অভিন্ন শব্দ বা অবস্থাটিই মূলত মুসালসাল বা

পরম্পরাযুক্ত। অর্থাৎ, সকল বর্ণনাকারী এই ক্ষেত্রে পরম্পরা বা ক্রমধারা অক্ষুণ্ন রেখেছেন। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ এর ভাষ্যে মুসালসাল হাদীস হলো: "যে হাদীসের সনদের রাবীগণ কোনও অবস্থা বা রাবীগণের বিশেষ অবস্থা কিংবা বর্ণনার বিশেষ প্রেক্ষাপট ও পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে বজায় রাখেন তাকে মুসালসাল হাদীস বলে।"

মুসালসাল হাদীসের গুরুত্ব

মুসালসাল হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুবহু অনুকরণের ব্যাপারটি থাকে যা মুসালসাল হাদীসকে আরোও গুরুত্ববহ করে তুলে। শ্রোতা খুজেঁ পায় প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর সাথে সংশ্লিষ্ট অবস্থার তাজা ঘ্রাণ। এতে উম্মতের হৃদয়ে বয়ে আনে ইমানের প্রাণ।

আত তুহফাতুল লাতীফাহ ফী আহাদীসিল মুসালসালাতিল মুনীফাহ কিতাবে বর্ণিত হাদীসগুলো নিম্নরূপ-

১। **আল হাদীসুল মুসালসাল বিল আউয়ালিয়্যাত** (প্রারম্ভিকতার হিসেবে মুসালসাল হাদীস)

অর্থাৎ, উক্ত সনদের সকল রাবী (বর্ণনাকারী) হাদীসটি বর্ণনার সময়ে 'আমি আমার উস্তায থেকে এই হাদীসটিই প্রথম শুনেছি' বাক্যটি বলেছেন বা তাদের প্রত্যেকেই নিজ শায়খ থেকে সর্বপ্রথম এই হাদীসটিই শুনেছেন বলে অবহিত করেছেন। ঠিক তেমনি নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনার সময় আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন- "আমি মুসালসাল বিল আউয়ালিয়্যাত হাদীসটি বর্ণনা করছি আমার সম্মানিত শায়খ আল্লামা মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান আল মুজাদ্দেদী আল বারকাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে আর এই হাদীসটিই তাঁর থেকে শ্রবণকৃত আমার প্রথম হাদীস। তিনিও একই ধারায় বর্ণনা করেছেন মুহাদ্দিসুল হিজায শায়খ মুহাম্মাদ বিন উমার হামদুন আল মাদানি থেকে ..." এই ক্রমধারা সর্বশেষ আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছায়। হাদীসটির আরেকটি সনদ তিনি বর্ণনা করেন যা তিনি শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাভি আল মালিকি আল মাক্কী র. এর থেকে শ্রবণ করে এযাযত লাভ করেন এবং এই ক্রমধারাও সর্বশেষ আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছায়। রহমত বিষয়ক হাদীস বিধায় একে মুসালসাল বিল রাহমাতও বলা হয়। হাদীসটি নিম্নরূপ-

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

অর্থাৎ, আর রাহমান (দয়াময় আল্লাহ) অনুগ্রহশীলদের প্রতিই অনুগ্রহ করেন; তোমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি রহমদিল হও, ঊর্ধ্বলোকে যিনি আছেন (আল্লাহ তায়ালা) তিনিও তোমাদেরকে দয়া করবেন।

২। **আল হাদীসুল মুসালসাল বিল মুহাববাহ**

নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ননার সময় আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন- আমি মুসালসাল বিল মুহাব্বাহ হাদীসটি বর্ণনা করছি আমার সম্মানিত শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাভি আল মালিকি আল মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ থেকে।

.....এভাবে এই ক্রমধারা সর্বশেষ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছায়।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

يَامُعَاذ اِنِّي اُحِبُّكَ فَقُل اَللّٰهُمَّ اَعِنِّي عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থাৎ, হে মুয়ায! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালোবাসি। সুতরাং তুমি বলবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে ও আপনার যথার্থ ইবাদাত পালনে সাহায্য করুন।

অপর বর্ণনায় আছে -

يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ وَ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَن تَقُولَ اَللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থাৎ, হে মুয়ায! আল্লাহর কসম নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে মুহাব্বাত করি এবং তোমাকে ওসিয়ত করছি হে মুয়ায, প্রত্যেক নামাযের পর এই দুয়াটি বলা ছাড়বে না।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّي عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

(আলোচ্য হাদীস মুসালসাল হওয়ার প্রক্রিয়াটি হলো, প্রত্যেক শায়েখই উক্ত হাদীস বর্ণনা করার সময়ে উপস্থিত শ্রোতাকে বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মুহাব্বাত করি।

৩। **আল হাদীসুল মুসালসাল বিযযিয়াফাতি আলাল আসওয়াদাইন-আততা মারি ওয়াল মায়ি** (খেজুর ও পানির দ্বারা আপ্যায়নের মাধ্যমে মুসালসাল হাদীস)

নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনার সময় আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

"আমি মুসালসাল বিষযিয়াফাতি আলাল আসওয়াদাইন-আততা মারি ওয়াল মায়ি হাদীসটি বর্ণনা করছি আমার সম্মানিত শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাভি আল মালিকি আল মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ থেকে....." এভাবে এই ক্রমধারাও সর্বশেষ সায়্যিদুনা আলি বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছায়।

সায়্যিদুনা আলি বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

أضافني رسول الله صلى الله وسلم على التمر والماء

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দু'টি কালো বস্তু তথা খেজুর ও পানি দ্বারা আপ্যায়ন করেছেন। (উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার সময়ে প্রত্যেক শায়খ/বর্ণনাকারী হাদীসের শ্রোতাকে খেজুর ও পানি খাইয়েছেন।)

৪। **আল হাদীসুল মুসালসাল বিল মুসাফাহ**

নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনার সময় আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন- "আমি মুসালসাল বিল মুসাফাহা হাদীসটি বর্ণনা করছি আমার সম্মানিত শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাভি আল মালিকি আল মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ থেকে... " (হাদীসটি বর্ণনা করা পর তিনি আমাদের সাথে মুসাফা করেছেন।)

তাবিঈ আবু হুরমুয রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

دخلنا على انس بن مالك رضي الله عنه نعوده، فصاحفنا وقال : صاحفت بكفي هذه كف رسول الله وسلم

অর্থাৎ, একদা আমরা হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর গৃহে প্রবেশ করলাম, অসুস্থতার কারণে তাঁকে দেখার উদ্দেশ্যে। তখন তিনি আমাদের সাথে মুসাফাহা করলেন এবং বললেন, আমি আমার এই হাতের তালু দিয়েই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতের তালুর সাথে মুসাফাহা করেছি।

শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাবি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর আততালিউল সাইদ আল মুনতাখাবু মিনাল মুসালসালাতি ওয়াল আসানীদ গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

হযরত আবু আব্দুল্লাহ আল মা'মার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَافَحَنِي أَوْ صَافَحَ مَنْ صَافَحَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার সাথে মুসাফাহা করলো অথবা আমার সাথে যে মুসাফাহ করেছে তার সাথে (কিয়ামাত পর্যন্ত উক্ত পরম্পরার সাথে) মুসাফাহা করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

উক্ত চারটি হাদীসের পূর্ণ সনদ শায়খুল হাদীস সাহেবের আলোচ্য বইটিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর বাইরেও বইটিতে তিনি আরো চারটি মুসালসাল হাদীস সনদ সহ আলোচনা করেছেন যা তিনি শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাভি আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ এর কাছ থেকে বর্ণনা করার অজাযাত পেয়েছেন।

বইটিতে হাদীসের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কতিপয় আদব সম্পর্কে নসীহত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ-

হাদীস শিক্ষার্থী ও পাঠকারীর আদব

১। শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক হলো, হাদীস অন্বেষণের ক্ষেত্রে নিয়তকে আল্লাহর জন্য খাঁটি ও বিশুদ্ধ করা এবং এর দ্বারা পার্থিব লক্ষ্যার্জনের ব্যাপারে বিরত থাকা।

২। হাদীস শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন এবং আত্মসংশোধন ও মাখলুককে সঠিক পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে সায়্যিদুল মুরসালিনের সুন্নাতের অনুসরণ।

৩। প্রথমে আবশ্যকীয় বিদ্যা তথা সরফ, নাহু, লুগাত ইত্যাদি শাস্ত্র শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে নেয়া, যাতে হাদীস পাঠের ক্ষেত্রে ত্রুটি থেকে বাঁচা যায়।

৪। ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা, শিষ্টাচার ও ফাজায়েলে আমল সম্পৃক্ত যে হাদীসসমূহ পাঠ করবেন তা যথাস্থানে আমল করা। এটাই হাদীসের উপযুক্ততা ও এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার উপায়।

৫। আল্লাহ সম্পর্কে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এবং দ্বীনের যাবতীয় জরুরী বিষয় ও আকিদার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেভাবে বর্ণনা এসেছে সেভাবে সাহাবী, তাবেয়ী, ইমাম ও সালফে সালেহীনের অনুসৃত ধারায় আক্বিদা পোষণ করা।

৬। সাহাবিদের শানমানের অনুপযুক্ত সমালোচনা করবেন না এবং সাহাবিদের প্রতি ও মুহাদ্দিস, আয়িম্মায়ে দ্বীনের প্রতি মন্দ ধারণাও পোষণ করবেন না। কেননা তারাই আমাদের ও সমগ্র মানুষের নিকট হাদীস ও ইলমের বাহক তাদের সমালোচনা ও তাদের ক্ষেত্রে বিরূপ ধারণা ইলম থেকে বঞ্চিত এবং আমল নষ্ট হওয়ার কারণ।

৭। পাপ ও মন্দ চরিত্রকে পরিহার করবেন। নিশ্চয়ই তা বিস্মৃতি ও বঞ্চিত থাকার কার্যকারণ।

৮। উত্তম হলো, যখন হাদীস পাঠ করা ও হাদীস পাঠদানের মজলিসে উপস্থিত হওয়ার নিয়ত করবেন তখন অযু, মিসওয়াক ও সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং হৃদয়ে হাদীসের সম্মানকে ধারণ করে প্রশান্তি ও স্থিরতার সাথে মজলিসে বসা।

৯। হাদীস পাঠের মাঝে যতবার রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামোল্লেখ হবে ততবার 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' পাঠ করবেন। অনুরূপভাবে ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের নামের ক্ষেত্রে রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলবেন। তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুরূদ লেখার ক্ষেত্রেও ইঙ্গিতবাচক শব্দ ব্যবহার না করে পূর্ণভাবে লিখবেন।

১০। নিজ শায়খকে এহতেরাম করবেন। এটা ইলম ও তার মাধ্যমে উপকারিতা অর্জনের কারণেই। এবং নিজ বিষয়াদিতে বিশেষত ইলম ও আমলজনিত বিষয়ে তার পরমার্শ চাইবেন এবং তার জন্য দোয়া করবেন।

হাদীসের শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট আদব

১। উস্তাদের উপর আবশ্যক হলো নিয়তকে বিশুদ্ধ ও খালেস করা। অন্তরকে পার্থিব মোহ থেকে পবিত্র করা। তার সবচেয়ে বড় ইচ্ছা হবে হাদীসের প্রসার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীর প্রচার।

২। তার জন্য সমীচিন হলো, হাদীস পাঠদানে মজলিসে উপস্থিত হওয়ার সময় অযু, মিসওয়াক ও সুগন্ধির মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা। এবং গাম্ভীর্য ও প্রশান্তির সাথে মজলিসে বসবেন। আর এসবই করবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের সম্মাননায়। যেমনটি করতেন ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ।

৩। উপস্থিতি সকলের প্রতি স্নেহের সাথে মনযোগ দেবেন এবং তাদের জন্য সমীচীন বিষয়ের প্রতি তাদের অবহিত করবেন এবং তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে এমনসব ব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

৪। আল্লাহ তায়ালার হামদ ও এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ পাঠের মাধ্যমে মজলিস শুরু ও সমাপ্ত করবেন।

শেষকথা

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন মুখলিস ও আমলদার একজন আলেম। ব্যক্তিগত জীবনে তাসাওফ চর্চায় তিনি ছিলেন অগ্রপথিক। বিনয়ের গুণে গুণান্বিত ইনসানে কামেল। তাঁর ইশকে রসূলের বিশেষ দরদ উপলব্ধি করা যায় দালায়েলুল খাইরাত, প্রিয় নবীজী ফাজায়েল সম্পর্কিত চল্লিশ হাদীস, আহলে বায়াত, নবীজীর সিরাত ও মিলাদ বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে। ইন্তেকালের কিছুদিন আগেও দ্বীনের একজন দায়িত্বশীল দাঈ হিসেবে তিনি যেভাবে দারসে হাদীসের মাধ্যমে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা বর্তমানে সময়ে বিরল এক উদাহরণ। তিনি তাঁর ইন্তেকালের আগে অসুস্থ অবস্থায়ও মুসালসাল হাদীসের বিশেষ কয়েকটি দারসের আয়োজন করেন এবং

অত্যন্ত রুগ্ন অবস্থায় হুইল চেয়ারে বসে হাদীসের দারস প্রদান করেন। উক্ত দারস শেষে তিনি দারস গ্রহণকারীদের সাথে মুসাফাহ করেন এবং জমজমের পানি ও খেজুর দ্বারা সবাইকে আপ্যায়ন করেন। সবাইকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুহাব্বাত করেন উল্লেখ করে মুসালসাল হাদীসের ইজাযাত ও সনদ প্রদান করেন। উক্ত দারস রুহানিয়াত ও ইশকে রাসূলের কাইফিয়তের এক অনন্য আধ্যাত্মিক আবহ তৈরি করে। এই মুবারক দারসে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে এই নগন্য নিজের জীবনকে ধন্য মনে করে মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে শুকরিয়া জানাই।

হাদীসে নববী শরীফের এক অনন্য নক্ষত্র মুহতারাম মুহাদ্দিস আল্লামা মো.হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু রেখে গেছেন যোগসূত্রতার সোনার শিকলের এক অপার্থিব বন্ধন। এই বাঁধন 'উরওয়াতুল উসকা'। কিমিয়া সদৃশ স্বল্প সান্নিধ্যে তাঁকে পেয়েছি হৃদয়ের অতি আপন হিসেবে। আল্লাহতায়ালা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ'লিহী ওয়াসাল্লামের একনিষ্ঠ আশিক, দ্বীনের খাস খাদেম, হাদীস শাস্ত্রের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, সুন্দর ও মহান জীবনের অধিকারী 'মুহাদ্দিস ছাহেব' হুযুর এর রূহানী মাকামকে বহু বহু গুণে বাড়িয়ে দিক। তাঁর রূহানী দোয়া, তায়াজ্জুহ, ফয়েজ, মুহাব্বাত ও যিয়ারত আমাদের নসীব হোক।

লেখক : পরিচালক, সেন্টার ফর সুফি স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ, ঢাকা।

صفوة من كتابي صلاة التراويح و مسائل العشر والخراج
لشيخ الحديث العلامة حبيب الرحمن رحمه الله

أبو سادات محمد أفهم الأزهري

الحمد لله خالق السموات والأرض والصلاة والسلام على النبي المختار خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى الأئمة الأجلاء ورثة الأنبياء، والأنبياء لا يؤرثون مالا ولا درهما سوى العلم.

أما بعد لقد كنت أشتاق أن أكتب بحثا عن الحبيب الفاضل -رحمه الله- ولكن المؤهل المطلوب في كتابة بحث عنه لم يكن عندي. ولما أمرت من قبل نجله الشيخ عبد الأول هلال أن أكتب بحثا يشمل ملخصا من مؤلفاته -رحمه الله- بدأت أتجرأ، ليسهل على ناطق عربي إدراك سير شيخنا حبيب الرحمن -رحمه الله- في علم الدين. وبعد عنيتُ كثيرا في تلخيص المعلومات من كتابي "صلاة التراويح" و"مسائل العشر والخراج في مجال بنغلاديش" للشيخ. وهذان الكتابان قد اعتنى بهما وعلق عليهما ولده الأكبر الشيخ عبد الأول هلال وطبعا من "مؤسسة الحبيب". وهذا العمل لم يكن سهلا بالنسبة لي أن أجمع وألخص علمه في صفحات فقط.

جمعتُ من كتابيه معلومة بسيطة بما يدرك فهمي والسائل من حضراتكم نظرة التسامح ومن الله أن يجعل هذا الإنجاز في ميزان حسناتي وأن لا يخذلني في الدارين وأن يحشرني مع زمرة أولياءه.

"كتاب "صلاة التراويح

بدأ المؤلف مقدمة الكتاب حامدا لله ومصليا على النبي ﷺ و قال إن رمضان شهر عظيم ولها فضائل كثيرة - ذكر فيها الآيات القرانية والأحاديث النبوية دلت على فضائلها وعلو شأنها بين سائر الأشهر-قال الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}.

ومن حيث ذكر أن النبي ﷺ كان يتكاثر من النوافل في هذا الشهر المبارك.

ثم أشار إلى الخلاف بين العلماء في عدد ركعات صلاة التراويح كما أن هذا الخلاف قد تم الاتفاق بين الأمة على عشرين ولا داعي لأحد أن يتكلم عن هذه من جديد ولا ينبغي لأحد

أن يفرق بين الأمة الإسلامية ببناء المساجد الجديدة من حيث يصلى فيها ثماني ركعات ويدعو الناس إلى ترك المساجد التي يصلى فيها العشرين. وهذا أكثر ما يحدث في بلادنا بين المسلمين جدالا في هذا الوقت.

لاحظ المؤلف -رحمه الله- ضرورة ماسة لتوضيح محل خلاف المسألة والرأي الراجح فيها، فلذا قد بذل جهدا كبيرا لتوصيل رسالة هذه إلى الدعاة الإسلامية ليرجعوا إلى قول سديد حول المسألة ويتقرروا على القول الراجح.

فقد حث رسول الله ﷺ أصحابه على صلاة قيام الليل بحيث قال ﷺ «إنَّ اللَّهَ تباركَ وتعالى فرضَ صيامَ رمضانَ عليكم وسننتُ لكم قيامَهُ فمن صامَهُ وقامَهُ إيمانًا واحتسابًا خرجَ من ذنوبِهِ كيومِ ولدتْهُ أمُّه»

ودفع المؤلف عن الوهم الذي شاع بين الناس أن الخليفة الثانية عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أول من سن صلاة التراويح مع الجماعة ولم يصل النبي ﷺ جماعة من قبل حيث ذكر حديثا صحيحا مرويا من عائشة -رضي الله عنها- ما يدل على أنه ﷺ صلى التراويح مع الصحابة جماعة، ما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما : أن النبي ﷺ خرج .. ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته

وهذا واضح أنه ﷺ صلى التراويح مرتين أو ثلاث مرات في حياته مع الجماعة. أما في العدد لم يصل إلينا حديث صحيح من رسول الله ﷺ. فالخلاف هنا في العدد المسنون لا في الجماعة.

وذكر المؤلف الأحاديث الصحيحة والحسن تدل على أن عدد ركعات صلاة التراويح "عشرون". وذكر عن السائب بن يزيد -رضي الله عنه- كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَلَكِنْ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمِائَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ حَتَّى كَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ . ومع ذلك خالف بعض العلماء السلف وذهبوا إلى أن العدد ثمانية. ولكن لم يقل أحد منهم أن العشرين بدعة.

ولا خلاف بين المؤرخين أن الصحابة كانوا يصلون التراويح في رمضان في عهد الخليفة أبي بكر-رضي الله عنه- منفردين أو جماعة متفرقة في مسجد الرسول ﷺ. ولما ولي عمر -رضي الله عنه- الخلافة مضى للمسلمين عام كما كانوا في عهد سيدنا أبي بكر -رضي الله عنه- وقال اللإمام الترميذي -رحمه الله- وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي ﷺ عشرين ركعة .

وقال الحافظ بن تيمية -رحمه الله- ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في

رمضان ويوتر بثلاث فروى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه قام بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر .

وقد واظب الخلفاء الراشدون والمسلمون من زمن عمر على العشرين. وعمل الصحابة حجة ومصدر للتشريع كما قال ﷺ أوصِيكمْ بِتقوَى اللهِ، والسَّمعِ والطَّاعةِ وإنْ تأمَّرَ عليكم عبدٌ حَبَشِيٌّ، وإنَّه مَنْ يَعِشْ منكم فَسَيرَى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ، عَضُّوا عليها بالنَّواجذِ .

ذكر المؤلف في الكتاب أقوال علماء المذاهب الأربعة في عدد ركعات التراويح.

قال شيخ الإسلام السرخسي الحنفي : فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا .

قال ابن رشد المالكي: اختار مالك في أحد قوليه بعشرين ركعة سوى الوتر .

قال محي السنة الإمام النووي: مذهبنا أنها عشرون ركعة .

قال ابن القدامة المقدسي: والمختار عند أحمد بن حنبل فيها عشرون ركعة .

ومن الأدلة التي استدل بها قائلوا "الثمانية" ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة -رضي الله عنها- كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ في رمضان فقالت ما كانَ رسول الله ﷺ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولَا في غيرِهِ علَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أرْبَعًا، فلا تَسَألْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أرْبَعًا، فلا تَسَألْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، أتَنَامُ قَبْلَ أنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: يا عَائِشَةُ، إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ولَا يَنَامُ قَلْبِي ."

وناقش المؤلف: هذا الحديث صحيح. ولكن يعتري هناك سؤال أن الركعات الثماني المتبقية من الصلاة بدون الوتر هل هي تراويح أم تهجد ؟ وألفاظ الحديث تدل بوضوح على أن الحديث يتعلق بصلاة التهجد. ومن المعلوم أن صلاة التراويح تخص لرمضان فقط. وما قالت عائشة -رضي الله عنها- في جواب أبي سلمة رضي الله عنه كان النبي ﷺ يصلي الوتر مع ثماني ركعات في رمضان وغيره، ويفهم منها أنها تتحدث عن صلاة تصلى في رمضان وفي غيرها. فهذا الحديث يدل على صلاة التهجد لأن التهجد يصلى في رمضان وفي غيرها من الشهور أيضا. فلا ينبغي لأحد تأويل حديث صحيح بما لا يراد به أصلا.

ومنها: عن جابر بن عبد الله قال : صلَّى بِنَا رسول الله ﷺ في شهر رمضان ثَمَان رَكَعَات وأَوتَرَ

قال الإمام الطبراني : لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد.

"وفي سنده عيسى بن جارية، قال عنه الإمام يحيى بن معين والإمام أبو داود "إنه ضعيف

والإمام ابن العادي ذكر بعض الأحاديث المروية عن عيسى بن جارية وعلق عليها قائلا "كلها غير محفوظ". فلا يصلح الاحتجاج به.

"كتاب "مسائل العشر والخراج في مجال بنغلاديش

وضح لنا المؤلف الكريم أنه بعد اطلاعه لكتب الفقهاء الكرام في مسألة العشر والخراج بيَّن رأيَه عن مجال بنغلاديش وأنه -رحمه الله- لم يعتمد على رأيه فقط بل دعا العلماء إلى البحث والجمع عن هذه المسألة حتى يصل إلى قول يعتمد عليه. وقد عَرض هذا الكتاب للعلماء ليشجعهم في البحث عن المسألة وللعوام ليعلمهم المسألة حتى يعملوا بها في حياتهم .

أكد المؤلف أن العشر فرض مثل زكاة الذهب والفضة. قال الله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}

قال عبد الله بن عباس وجابر بن زيد رضي الله عنهما في تفسير كلمة "حقه" والمراد هنا الزكاة، وزكاة الثمار العشر. وما جاء في الحديث النبوي: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ فرَض فيما سقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعيونُ أو ما كان عَثَريًّا العُشْرَ وفيما سُقي بالنَّضْحِ نصفَ العُشْر .

ذكر الخلاف بين فقهاء الحنفية في نصاب العشر، ذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أنه لا نصاب للعشر مدللا من الآية الكريمة : وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

حيث سيقت الآية مطلقا فيعمل بها مطلقا بلا قيد.

وذهب الصاحبان اللإمام أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- إلى أن نصاب العشر خمسة أوساق. ويعمل بهذا الرأي به في المذهب الحنفي.

ورأيُ المؤلف أنّ المصلحة أن نعمل برأي أبي حنيفة -رحمه الله- وبه يستفيد الأغلب من شعبنا -إن شاء الله-.

تكلم المؤلف أنه ينبغي علينا أن نخرج العشر بعد أداء الريع، لأن الريع لا علاقة له بالشريعة.

وبعد ذلك أن الأرض قسمان في الشريعة الإسلامية: الأرض العُشرية والأرض الخراجية. وعند الأحناف العُشرية : إذا أَسلم أهل بلد أو منطقة طوعا أصبحت أرضهم عشرية. وبعد فتح المسلمين لبلد ما، إذا وزعت الأرض التي تحتلها الدولة الإسلامية على المسلمين أصبحت تلك الأرض عشرية. والملاحظة هنا الأرض العشرية تبقى عشريةً ولو تملَّك أحد ورثةً. أما الأرض الخراجية عندهم: إذا وزعت الأرض عند غير المسلمين بعد فتح المسلمين أراضيهم، تكون خراجية وكذلك لو صالح غير المسلمين بدون القتال تكون أرضهم خراجية. وإذا اشترى غير مسلم أرضا عشرية من مسلم تصبح خراجية. ولو اشترى المسلم أرضا خراجية من غير المسلمين تظل خراجية.

أن المؤلف الكريم قد بذل جهدا كبيرا وعناية مهمة في البحث عن تاريخ أراضي بنغلاديش ليوضح لنا جوابا عن سؤال مهم وهو هل هي عشرية أم خراجية؟ وهذه المسألة مسألة مختلف فيها بين العلماء. يرى البعض أنه لا يمكن أن نحكم عليها عشرية أو خراجية ويرى الآخرون أن الأراضي المملوكة للمسلمين في هذه المنطقة لا يمكن أن تسمى خراجية بدون ثبوت. ومنشأ الخلاف فيه غموض تاريخ نظام الأرض في هذه المنطقة.

وذكر الشيخ -رحمه الله- أن كثيرا من أراضي بنغلاديش لا يعرف ملكيتها الأصلية. يورثها المسلمون جيالا فجيلا. فلا نعرف من كان أهلها قبلهم. فرأى الفقهاء في هذا الحال احتياطا : أن الأراضي المجهول ملكيتها القديمة تكون عشرية. فالحاصل: أن أراضي بنغلاديش تظل عشرية حتى يوجد ثبوت قطعي يشير إلى أنها خراجية. ولأجل ذلك ينبغي للمسمي بنغلاديش أداء العشر مطلقا. وكان المؤلف يؤدي العشر من الثمار التي تزرع من أراضيه. إذا كان المسلمون في كل قرية في بنغلاديش، خاصة أئمة المساجد يسلطون الضوء بصدق على أهمية جمع العشر وتشجيعهم، فمن ناحية سيكون هناك ترتيب لمراقبة تعليمات هامة من الشريعة.

পরিবার পরিজনের স্মৃতিকথা

আমার ভাইছাব

মাওলানা শুয়াইবুর রহমান

উস্তাযুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিসীন, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান (মুহাদ্দিস ছাহেব) রাহিমাহুল্লাহ আমার পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই। বাবা মরহুম মাওলানা মুমতায আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ঔরসে আমরা সাত ভাই এক বোন। মুহাদ্দিস ছাহেব ছিলেন তৃতীয়, আর আমি সর্বকনিষ্ঠ। সেই বাল্যকাল থেকে তাঁকে আমি "ভাইছাব" ডাকতাম। তিনি আমাকে "শুয়াই" বলে ডাকতেন। বাল্যকালে বাবাকে হারাই। বাবা হারানোর পর থেকে অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আমার বড়ভাইগণ। তাঁদের মধ্যে আমার "ভাইছাব" পরম মায়া মমতার চাদরে জীবনের শেষ পর্যন্ত আমাকে আগলে রেখেছিলেন।

শিক্ষা জীবনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ক্লাসে উনার কাছে পড়ার সুযোগ ছিলো না। তবে আমি উনার কাছে শরহে বেকায়া,নুরুল আনোয়ার ও মিশকাতুল মাসাবীহ পড়েছি। ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় কামিল জামাতে উনার কাছে সহীহ বুখারী শরীফ পড়েছি। শিক্ষা জীবন শেষ করে যখন কর্ম জীবন শুরু করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার সকল কাজ ছিল তাঁর অনুপ্রেরণার ফসল। তিনি আমার মনের ভেতর দ্বীনি শিক্ষা প্রচার প্রসারের মন্ত্র একে দেন। তাঁর নির্দেশনায় আমি দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করি। প্রথমত: আমাদের বিভিন্ন মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডে অনুমোদন ও মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করা। তখনকার সময়ে নানা আইনী জটিলতা ও প্রতিষ্ঠানসমুহের নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে কাজটি সহজ ছিলো না। দ্বিতীয়ত: বেকার যুবকদেরকে মাদ্‌রাসা শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করে তাদেরকে দ্বীনমুখী করা। ভাইছাবের দুআয় আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করি। আমার দ্বারা যতটুকু কাজ হয়েছে এসবের পেছনে উনার অবদান সবচেয়ে বেশি।

আল্লাহর রহমতে আমরা সাত ভাই এর মধ্যে চারজন ছিলাম বিভিন্ন মাদ্‌রাসা প্রধান। বড় ভাই মাওলানা নজিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেননি। তবে তিনি সারা জীবন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের মত বিখ্যাত আলিম এবং হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ছাহেবজাদাগণ রয়েছেন। তিনি সড়কের বাজার আহমদিয়া মাদ্‌রাসা ও বাদদেওরাইল ফুলতলী মাদ্‌রাসায় দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। মুহাদ্দিস ছাহেব ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন, মাওলানা খলিলুর রহমান মাথিউরা ফাযিল মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল, মাওলানা শফিকুর রহমান থানাবাজার মাদ্‌রাসার সুপার এবং আমি অধম দুবাগ বাজার হাফিযিয়া

আলিম মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল ছিলাম। আমাদের পরিবার ছিল মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের এক মিলন মেলা। আলহামদুলিল্লাহ। মাদ্‌রাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে কখনো কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আটকে গেলে সময় সুযোগে আমরা চার ভাই একত্রে বসে আলাপ করলে সহজে সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতাম। ভাইছাবের নির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন মাদ্‌রাসার সরকারী মঞ্জুরী আদায়ে কাজ করি। আল্লাহর অশেষ রহমতে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডে গ্রান্ট করাতে সক্ষম হই।

এখানে একটি ছোট ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। থানাবাজার লতিফিয়া ফুরকানিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা গ্রান্ট করানোর প্রক্রিয়া শুরু করলে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে পরিদর্শক হিসেবে এক ভদ্রমহিলার আসেন। মঞ্জুরী পেতে হলে পরিদর্শনকালে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ শিক্ষার্থী দেখাতে হতো। থানাবাজার মাদ্‌রাসায় তখন পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকায় আমি আমার আত্মীয়স্বজনদের উপযুক্ত সকল ছেলে মেয়েকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি। তাদেরকে থানাবাজার মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থী দেখিয়ে গ্রান্ট করাই। কাজটি প্রায় অসম্ভব ছিলো। এটাতে সফল হওয়ার পর নিজে যতটা খুশি হয়েছিলাম তারচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন আমার ভাইছাব (মুহাদ্দিস ছাহেব)। আমার ভাইছাব আমার উস্তায ও মুর্শিদ ছিলেন। তাই নিজের কোন কাজ দ্বারা তাঁকে খুশি করতে পারাকে জীবনের বড় সফলতা মনে করতাম। ভাইছাব ছোটবেলা থেকে মেধাবী ছাত্র ও পড়ালেখায় খুবই মনযোগী ছিলেন। তাই তিনি মা বাবা এবং উস্তাযগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমার মায়ের মুখ থেকে শোনা, বাবা ইন্তেকালের সময়ে ভাইছাব বাড়িতে ছিলেন না। তিনি হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে ঢাকা সফরে ছিলেন। সে সময় ফুলতলী ছাহেব কিবলা ঢাকা সফরে গেলে ভাইছাবকে সাথে নিতেন। বাবার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক খবর পাঠালে তিনি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এদিকে বাবা শয্যাশায়ী অবস্থায় উনাকে বারবার খুঁজছিলেন। শেষ পর্যন্ত বাবা সবাইকে আদেশ করলেন তাঁকে যেনো তাঁর প্রিয়পুত্রের রুমে নেয়া হয়। ভাইছাবের রুমে নিয়ে তাঁর বিছানায় রাখা হলো বাবাকে। তখন নাকি তিনি বলেছিলেন, আমার প্রিয় পুত্র এসে দেখবে তার বাবা শেষ সময় পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করেছিলো। সেদিন ভাইছাবের বিছানায় বাবা ইন্তেকাল করেছিলেন। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় বাবার কাছে তাঁর এই গুণধর পুত্রের আলাদা স্থান ছিলো।

ভাইছাব স্বভাবতই অত্যন্ত বিনয়ী ও দয়াবান ছিলেন। জীবনে অনেক মানুষকে তাঁর সাথে শত্রুতা করতে দেখেছি। কিন্তু তিনি কখনো কারো প্রতি অভিশাপ দিতেন না। কারো শত্রুতার বদলা নেয়ার চিন্তাও করতেন না। যুবক বয়সে আমি কোন কোন সময় তাঁকে বলতাম, কারো সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। তবে যে আপনার শত্রু সে আমারও শত্রু। তিনি সর্বদা একটি কথাই বলতেন, শুধু দোয়া কর আল্লাহ যেন তাকে

হেদায়েত দান করেন। হয়তো সে না বুঝে এমনটা করছে। সত্যি সত্যি তাঁর ব্যবহারে অভিভূত হয়ে অনেক দুষ্টু মানুষ অনুগত হয়ে তাঁর হাতে বাইআত হতে দেখেছি।

জীবনের শেষ সময়ে তিনি কয়েক মাস শয্যাশায়ী হয়ে বিছানায় ছিলেন। তাঁর অবস্থা দেখে খুবই কষ্ট পেতাম। কিন্তু আমার নিজের অসুস্থতার কারণে শেষ সময়ে ভাইছাবের খেদমতে শরিক হতে পারিনি। একা একা হাঁটা চলা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাই ছেলে মেয়েদের সাহায্যে যখনই তাঁকে দেখতে যেতাম তিনি মায়া ভরা কণ্ঠে বলতেন, "শুয়াই ভালানি, আও আমার ধারো বও।" তাঁর গত হওয়ার দুই বছর হতে চলল, মায়াভরা কণ্ঠে এমন ডাক আর কেউ দেয় না। যখনই যেতাম আমাকে নিজের বিছানায় পাশে বসাতেন। তিনি যা খেতেন অর্ধেকটুকু খেয়ে আমার জন্য রেখে দিতেন। আজ আমাদের বংশ অভিভাবকহীন। অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ার পর প্রথম দিন কান্না জড়িত কণ্ঠে আমাকে বলেছিলেন, "শুয়াই, তোমার যত বেমার আছে সব আমারে দিলাও, আর তুমি কয়টা দিন আমার ছেলে ভাতিজা ওখলরে নিয়া বাছিয়া থাকো। ইতার মাথার উপরে আর ছায়া নাই, ইতার যাইবার জাগা নাই।" এই কথাগুলো বারবার আমাকে ভাবায়। ভাইছাব গত হওয়ার পর থেকে দুই বছরের অধিক সময় আল্লাহ আমাকে হায়াত দিয়েছেন, কিন্তু আমি অভিভাবকত্বের কোন হক আদায় করতে পারছি না। কারণ আমিও শয্যাশায়ী হয়ে বিছানায়। এই কঠিন সময়ে তাঁকে পাশে পেলে আমার মন শান্ত থাকতো।

আল্লাহর ফয়সালার উপর খুশি থাকতেই হবে। ২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আমার চোখের সামনে তিনি নিজ মুখে উচ্চস্বরে আল্লাহ আল্লাহ জপতে জপতে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান। প্রথমে বাবা মা তারপর চোখের সামনে এক এক করে ছয় ভাই ও একমাত্র বোনের বিদায়, সর্বোপরি ছয় মাস আগে নিজ সহধর্মিণীকে হারিয়ে আমি দিশেহারা। আমার অসহায় সময় কাটছে বিছানায়। নিজে থেকে উঠে বসার সক্ষমতা নেই। এমনকি নিজ হাতে খাওয়া দাওয়ার সক্ষমতাটুকুও নেই। ভাইছাবের ব্যবহৃত হাসপাতাল বেড, তাঁর ব্যবহৃত চেয়ার আজ আমার নিত্য দিনের সঙ্গী। আমি এগুলোর মধ্যে তাঁর শরীরের ঘ্রাণ খুঁজে পাই।

রাব্বুল আলামিন তাঁকে শান্তিতে রাখুন। জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মাকাম দান করুন। হাদীসে মুসালসাল বিল মুহাব্বাত পড়ানোর সময় তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি তোমাকে মুহাব্বাত করি। দয়াময় এই কথাটুকু কবুল করুন। হাশরের দিনে ভাইছাবের সঙ্গী করে আরশের ছায়ায় স্থান দিন।

শ্রুতিলেখন: মাহফুজ আহমদ মিনহাজ
লেখক: মুহাদ্দিস ছাহেবের ছোট ভাই; সাবেক অধ্যক্ষ দুবাগ বাজার হাফিযিয়া আলীম মাদ্‌রাসা, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

একজন মহাপুরুষের মহাপ্রয়ান

অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সালাম আল মাদানী

আল্লাহ তা'লা ঘোষণা করেছেন-

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থাৎ, যিনি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তিনি যাচাই করে নিতে পারেন কর্মক্ষেত্রে কে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (সূরা মূলক, আয়াত ২)।

সুতরাং মহাকালের অতি ক্ষুদ্র সময়ে কে উত্তম আর কে অধম তা যাচাইয়ের মাপকাঠি হলো কর্মক্ষেত্র তথা আমল। সেই যাচাই বাছাইয়ের মূল অধিকর্তা হলেন তিনিই যিনি সৃষ্টিকর্তা, এ পাল্লা কেবল তাঁরই হাতে। তাই শেষ ফয়সালা বিচার দিবসে তিনিই করবেন।

তবে একজন মানুষের কর্মক্ষেত্র যেহেতু সর্বতোভাবে লোক চক্ষুর অন্তরালে নয়, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজনের কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করার সুযোগ অন্য মানুষের রয়েছে।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ যেহেতু আমার উস্তায, মুরব্বি ও শ্বশুর ছিলেন, সেই ১৯৭০ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫২ বছর দেশে বিদেশে তাঁর একান্ত সাহচর্য পেয়েছি, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ হয়েছে। সেই সাহচর্য ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে স্মৃতিচারণমূলক কিছু কথা নিম্নে তুলে ধরছি।

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের কোন একদিন মাত্র এগারো বছরের একমাত্র পুত্র আব্দুস সালামকে মাওলানা আনজব আলী রাহিমাহুল্লাহ পশ্চিম সিলেটে তৎকালীন সময়ে একমাত্র কামিল মাদ্‌রাসা সৎপুর দারুল হাদীস এ নিয়ে এসে দাখিল প্রথম বর্ষে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আব্বাজান ছিলেন সৎপুর মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা গোলাম হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ'র আত্মীয় এবং ভারতের বিখ্যাত রামপুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে হযরত ফুলতলী ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ'র দুই বছর সিনিয়র। সেই হিসেবে তখনকার উলামা মহলে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি, গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মান ছিল। সেদিন তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে মাদ্‌রাসায় ভর্তি করিয়ে সকল শিক্ষক মহোদয়গণের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাদ্‌রাসার নিকটস্থ আতর আলী চাচার দুকান থেকে চা, বিস্কুট ও লাল রঙের খাজা আনিয়ে সবাইকে আপ্যায়ন করালেন। এই সুবাদে প্রথম দিন থেকেই আমি শিক্ষক মহোদয়গণের কাছে পরিচিত ও স্নেহভাজন ছাত্র ছিলাম।

সেদিন মাদ্‌রাসা থেকে বিদায়কালে আব্বাজান দু'তলার সিঁড়ি বেয়ে ছোট্ট একটি রুমের

দিকে এগিয়ে গেলেন। বাড়ির পথে না গিয়ে এদিকে কেনো যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করায় জানালেন, এই মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ'র সাথে আলাদাভাবে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। ছোট রুম, ক্লাস বিরতির ফাঁকে শায়খুল হাদীস ছাহেব আরাম করছেন। তবে তাঁর বুকের উপর একটি কিতাব নিয়ে চোখ বুলাচ্ছেন দেখলাম। আব্বাজান সালাম জানাতেই তিনি উঠে বসলেন। আব্বাজানকে নিকটস্থ চেয়ারে এবং আমাকে তাঁর কাছে খাটের উপর বসালেন। যদিও কিছুক্ষণ আগে কমন রুমে সকলের সাথে তাঁকে দেখেছি, কিন্তু এখন একান্তে দেখে সম্পূর্ণ মনযোগ তাঁর দিকেই নিবদ্ধ হলো। আব্বাজান আমার জন্য তাঁর কাছে বিশেষ দু'আ চাইলেন, যেনো তাঁর মত আলিম হতে পারি। বিদায়ের প্রাক্কালে মুহাদ্দিস ছাহেব সম্ভবতঃ আমাকে কিছু হাদিয়া দেয়ার মানসে পকেটে হাত ঢুকাচ্ছেন দেখে আব্বাজান আমাকে বিস্মিত ও কিছুটা লজ্জিত করেই বলে বসলেন, দয়া করে কোন টাকা পয়সা নয় আমার ছেলেকে আপনার ব্যবহৃত একটি টুপি হাদিয়া দিয়ে দিন। মুহাদ্দিস ছাহেব মুচকি হেসে বললেন, ও! আপনার মতলব বুঝেছি; কিন্তু এতটুকুন বেটার মাথায় আমার টুপি কি লাগবে? সাথে সাথে সুন্দর কাজ করা একটি কিস্তি টুপি আমার হাতে তুলে দিলেন। সেদিন থেকেই আমি তাঁর গুণমুগ্ধ ও আদরণীয় হয়ে যাই।

আমি ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ফাযিল পর্যন্ত একাধারে সৎপুর মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করি। প্রথম দিকে নিম্ন শ্রেণিতে থাকায় সরাসরি তাঁর কাছে ক্লাস নেয়ার সুযোগ ছিল না। তবে মাঝেমধ্যে নির্ধারিত শিক্ষকের অনুপস্থিতে সিনিয়র শিক্ষকগণের শুভাগমন ঘটতো আমাদের ক্লাসসমূহে। এরই ধারাবাহিকতায় শায়খুল আল্লামা মো. হবিবুর রহমান, মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল জব্বার গোটারগ্রামী ও মুহাদ্দিস আল্লামা ফজলুল করীম চাঁদপুরী রাহিমাহুমুলাহ'র মতো বরেণ্য আলিমগণের ছাত্রত্ব লাভের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

এরই মধ্যে তিনি চলে গেলেন ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায়। ১৯৭৬ সালের ১১ অক্টোবর তিনি আবার সৎপুর মাদ্‌রাসায় প্রিন্সিপাল পদে যোগদান করে ১৯৭৭ সালের ২ এপ্রিল পর্যন্ত ছিলেন। এরপর সংযুক্ত আরব আমিরাত চলে যান।

১৯৮০ সালে আমি মাদ্‌রাসা ই আলিয়া ঢাকা থেকে হাদীস বিভাগে কামিল উত্তীর্ণ হয়ে তাফসীর বিভাগে ভর্তি হই। এক বছর অধ্যয়নের পর ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্কলারশীপ পেয়ে মদীনা মুনাওয়ারা ইউনিভার্সিটিতে চলে যাই।

এদিকে মরহুম আব্বাজান একমাত্র পুত্রের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আলিম পরিবার দেখে পুত্রবধু খোঁজার দায়িত্ব দিয়েছেন সেজো জামাতা মাওলানা আবদুর রাজ্জাক উদয়পুরীকে। তিনি তাঁর উস্তায ও মামা আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেবের একান্ত প্রিয়ভাজন মুরব্বি ছাত্র, সৎপুর মাদ্‌রাসার কামিল জামাতে প্রথম ব্যাচে উত্তীর্ণ চারজনের একজন, বুরাইয়া কামিল মাদ্‌রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা ইরশাদ হোসাইন

গোয়াহরী রাহিমাহুল্লাহ'র শরণাপন্ন হলেন। গোয়াহরী হুজুর হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের মেয়ে উপযুক্ত হয়েছেন মর্মে ইঙ্গিত করে বিষয়টি নিয়ে হযরত ফুলতলী ছাহেবের শরণাপন্ন হতে বলে দিলেন। যথারীতি হযরত ফুলতলী ছাহেবের খিদমতে প্রস্তাব পেশ করা হলো।

সেসময় ছুটি কাটাতে আমি বাড়িতে অবস্থান করছি। মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে যাওয়ার মাত্র কিছু দিন বাকী। তখন ভরা বর্ষা মওসুম। একদা বুরাইয়া এলাকায় কোন এক প্রোগ্রাম শেষে হযরত ফুলতলী ছাহেব হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব ও গোয়াহরী হুজুরকে সাথে নিয়ে নৌকাযুগে আমাদের বাড়িতে আগমন করলেন। তখন হযরত ফুলতলী ছাহেব সিলেট শহরের রেলস্টেশন জামে মসজিদে জুমুআর নামায পড়াতেন। তিনি আব্বাজানকে পরাপর্শ দিলেন যেনো পরবর্তী শুক্রবার কয়েকজন মুরব্বি সাথে নিয়ে রেলস্টেশন মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করেন।

কথামত আব্বাজান কয়েকজন মুরব্বিসহ আমাকে সাথে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। নামায শেষে হযরত ফুলতলী ছাহেব আমাদের নিয়ে ফুলতলীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। মুরব্বিগণকে নিয়ে আব্বাজান অন্য গাড়ি করে গেলেন। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা আমাকে নিজের সাথে উনার সাদা রঙের কারে করে নিয়ে গেলেন। ফুলতলীতে পৌঁছে বাদশাহী খানা পিনা হলো। আছর নামাযের পর ছাহেববাড়ি মসজিদে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব এবং উনার ঘনিষ্ট স্বজনদের উপস্থিতিতে আকদ সম্পন্ন হলো। সেদিন রারাইয়ে রাত্রি যাপন করে বাড়ি ফিরে দুই তিনদিন পর মদীনা মুনাওয়ারায় চলে গেলাম।

এখন হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব আমার সম্মানিত শ্বশুর মহোদয় ও পারিবারিকভাবে ঘনিষ্ঠ স্বজন। ১৯৮৪ থেকে ২০২২ সুদীর্ঘ ৩৮ বছর, কালের হিসেবে বেশ দীর্ঘ সময়ই বলা চলে।

১৯৭০ থেকে ২০২২ সাল অবদি দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দিরও অধিককাল ব্যাপী তাঁর সাথে পরিচয় ও আত্মীয়তার সুবাদে বৃহৎ পরিসরে স্মৃতিচারণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ের বিদগ্ধজনের স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়নধর্মী লেখা এই স্মারকে স্থান পাবে বলে আশা করছি। তাই আমার লেখার পরিসর দীর্ঘ না করে তাঁর সম্পর্কে আমার বিশেষ উপলব্ধির মাত্র কয়েকটি বিষয় নিম্নে পেশ করছি।

- ❑ তিনি ছিলেন সত্যিকার একজন আলিমে দ্বীন তথা ইলমে ওয়াহীর ধারক ও বাহক। তাঁকে বাহরুল উলুম বললেও অত্যুক্তি হবে না। সালফে সালিহীন এর যাবতীয় গুণাবলী তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল।
- ❑ শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। মাদ্‌রাসার পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র হয়েও শিক্ষকবৃন্দের অনুপ্রেরণায় প্রাইমারি স্কুল থেকে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ

করে সিলেট বিভাগে দ্বিতীয় গ্রেডে প্রাইমারি বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে গাছবাড়ি জামিউল উলুম মাদ্‌রাসায় তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর ছাত্র। আলিম, ফাযিল ও কামিল ফাইনাল পরীক্ষার প্রতিটিতে বোর্ডে স্ট্যান্ড করা সেরা ছাত্র।

- ❑ শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন চূড়ান্ত ছাত্র বান্ধব ও অতুলনীয়। কঠিন এবং জঠিল বিষয়ও তিনি দারসে এমন প্রাঞ্জল ও সহজ ভাষায় উপস্থাপন করতেন, ছাত্রদের যেনো একেবারে গিলিয়ে দিতেন।

- ❑ আদাব, আখলাক, মুআমালাত ও মুআশারাত ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে তিনি সুন্নাতে নববী পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণে সজাগ- সচেতন ছিলেন।

- ❑ তিনি ছিলেন অজাত শত্রু, নির্বিরোধী, স্বল্প ও মিষ্টভাষী, খুশমেজাজী, মুতাবাসসিম ও নিম্নস্বরের অধিকারী। প্রচণ্ড রাগের কোন কারণ ঘটলেও খুব সহজে রাগ সংবরণ করে নিতে পারঙ্গম ছিলেন।

- ❑ আমার দৃষ্টিতে তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ হলো তিনি আমৃত্যু একজন নিভৃতচারী জ্ঞান সাধক ছিলেন। আমার এগারো বছর বয়সে প্রথম তাঁর সাথে পরিচয়ের দিন সৎপুর দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার দু'তলার সেই ছোট্ট রুমে বুকের উপর কিতাব রেখে মুতালাআ করতে দেখেছিলাম। ঠিক এর বায়ান্ন বছর পর আমার তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকালের দুই দিন আগেও নিজ বাড়িতে মৃত্যু শয্যায়ও বুকের উপর কিতাব রেখে তাঁকে মুতালাআ করতে দেখেছি। ইলম হাসিলের এই দুর্বার আকর্ষণ দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়।

- ❑ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা কিতাব সংখ্যার দিক থেকে যেমন বিপুল, ঠিক তেমনি বিষয় বৈচিত্রেও অনন্য। ইসলামী উলুমের গুরুত্বপূর্ণ সর্ব বিষয়ে কিছু না কিছু কিতাব এই সংগ্রহশালায় মওজুদ আছে। ইন্তেকালের পূর্বে এই বিশাল কিতাবের ভাণ্ডার তিনি বাড়ির পাশে নিজের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ সংলগ্ন দ্বিতল বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায় সুবিন্যস্ত গ্রন্থাগার রূপে রেখে গেছেন। যা مكتبة الحبيب। বা আল হাবীব গ্রন্থাগার নামে আগ্রহী পাঠক গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

- ❑ আমি দুই তিনবার হজ্জের সফরে উনার সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। একবার সফরে আমার পত্নী রুকিয়া (উনার বড় মেয়ে) এবং শ্যালক মাওলানা আবদুল বাতিন ফয়সল, উনার খাদিম হাফিয নাঈম উদ্দিনসহ অনেকেই ছিলেন। সফরকালীন সময়েও নিজ সন্তান এবং সফর সঙ্গীদের সাচ্ছন্দের প্রতি নিয়মিত নজর রাখতে তাঁকে দেখেছি। একবারের সফরে তিনি আমাদের নিয়ে মুহাদ্দিসুল হারামাঈন শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ'র মক্কা শরীফের রুসাইফায় অবস্থিত বাড়িতে গিয়েছিলেন। ইন্দোনেশিয়া, মালোয়েশিয়া

প্রভৃতি দেশের বিপুল সংখ্যক জ্ঞান পিপাসু উলামা সেখানে ভীড় করেছেন। নিজ বাড়ির সুবিশাল বৈঠকখানায় বসে শায়খ হাদীসের দারস প্রদান করেন। আমরাও দারসে অংশগ্রহণ করি। আমাদেরকে সেদিন শায়খ ইজাযাত ও সনদ প্রদান করেন।

- ❑ পশ্চিম সিলেটের কোথাও কোন প্রোগ্রামে গেলে আমাদের বাসায় তিনি যাত্রা বিরতি করতেন। কখনও রাত্রিযাপনও করতেন। আমাদের বাসায় এলে সব সময় দামী ফল ফলাদি ও মিষ্টি নিয়ে আসতেন। নাতি নাতনিদের সাথে স্বাচ্ছন্দে প্রাণখুলা সময় কাটাতেন। সবার লেখাপড়ার খুঁজ খবর নিয়ে উৎসাহ যোগাতেন।

- ❑ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চরম বিনয়ী ও উদার ছিলেন। ভিন্ন মত, ভিন্ন মাসলাক-মাশরাবের উলামা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান ও বিনয় প্রদর্শনে কখনও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। ভিন্ন মতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর বিনয়ী ব্যবহারের অসংখ্য নজির এবং উদাহরণ চাইলে পেশ করা যায়। একটি মাত্র পেশ করছি, তখন তিনি অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে অবস্থান করছেন। আমীরে জামাত ডা. শফিকুর রাহমান, সাবেক এমপি মাওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, বিএনপি চেয়ার পারসনের উপদেষ্টা ড. এনামুল হক চৌধুরী, এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের প্রমুখ তাঁকে দেখতে বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন। চিকিৎসার খুঁজ খবর, বিভিন্ন বিষয়ে স্মৃতিচারণ শেষে মেহমানগণকে আপ্যায়ন করা হলো। বিদায় বেলা আমীরে জামাত মুনাজাতের অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, দুআ আপনারা কেউ করুন, আমি হাজতমন্দ। আমীরে জামাত বিনয়ের সাথে বললেন, আপনি আলিমে দ্বীন, লাখো ছাত্রের উস্তায এবং অসুস্থ। তাই আপনি দু'আয় হাত তুলুন। তখন তিনি বলেন,আপনারা মুসাফির, একজন রুগ্ন মানুষকে দেখতে এসেছেন, হাদীস শরীফের ভাষ্য মতে যে ব্যক্তি রুগ্ন কোন মুসলিমকে দেখতে যায় তাঁর জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা দুআ করেন। তাই আপনি হাত তুলুন। সেদিন তাঁর বিনয়ের কাছে হার মেনে আমীরে জামাতকে মুনাজাত করতে হয়েছিল। সুবহানাল্লাহ! অন্যের প্রতি বিনয় ও শ্রদ্ধা প্রকাশের কি অপরূপ দৃশ্য। অথচ আমাদের মধ্যে এধরণের উদারতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও বিনয়ী আচরণের মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে।

এক কথায় তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ও অনুকরণীয় জ্ঞান সাধক, আদর্শ পিতা, অভিবাবক এবং শিক্ষক। আদর্শ দাঈ ইলাল্লাহ। একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সুবক্তা ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় বিশটি গ্রন্থের লেখক। তাঁর শূন্যতা কখনো পুরণ হবার নয়। রাব্বে কারীম যেনো তাঁকে তাঁর মাকবুল বান্দাদের সঙ্গী করে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মাকাম দান করেন। আমীন॥

লেখক: শায়খুল হাদীস ছাহেব বড় জামাতা। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গোবিন্দ নগর ফাযিল মাদ্‌রাসা, ছাতক, সুনামগনজ।

স্মৃতিতে চিরঞ্জীব আমার অভিভাবক
শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন

শৈশব থেকে অদ্যাবধি যাকে আইডল মেনে অনুসরণ, অনুকরণ করে থাকি। তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে আমি তাঁর অভাব অনুভব করি।

তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় তিনি আমার শিক্ষক, সেই হিসেবে তাঁর আদর্শ চরিত্র, মাধুর্যময় কথামালা, শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং হৃদয়ের উষ্ণতা, শুধু আমাকেই নয় সবাইকে দারুনভাবে মুগ্ধ করতো। তিনি আমাকে অন্য দশজন ছাত্র থেকে বেশি স্নেহ করতেন বলে বিশ্বাস ছিল। সেই সুবাদে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সংস্পর্শে আমার আসার সৌভাগ্য হয়।

সেই স্নেহস্পর্শের সূত্র ধরেই তাঁর সাথে আমার নতুন সম্পর্কের সূচনা হয়। আমি তাঁর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। আমার পরিবার তথা ভাই, বাবা, সবাই তাঁর খুবই ভক্ত ছিলেন। আমার পিতার সাথে আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর গভীর হৃদ্যতা ছিল। সেই সুবাদেও তিনি আমাকে পুত্রবৎ মমতায় আগলে রাখতেন। তাঁর অর্থনৈতিক যেকোনও বিষয়ে তিনি আমাকে শামিল রাখতে পছন্দ করতেন। এমনকি অনেকক্ষেত্রে আমার উপরই ন্যস্ত হতো তাঁর কাংখিত সকল পরিকল্পনা। আমার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া তাঁর পরিকল্পনা প্রদর্শনে তিনি খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। যা ছিল আমার জন্য অব্যক্ত আনন্দ ও তৃপ্তির। তাঁর সাথে আমার পবিত্র হজ্বব্রত পালন করারও দূর্লভ সুযোগ হয়েছিল।

আমার পিতার ইন্তেকালের পর অভিভাবক বলতে আমি শুধু তাঁকেই জানতাম এবং তিনিও আমৃত্যু আমাকে পিতার অভাব উপলব্ধিই করতে দেননি। তাঁর মতো নির্লোভ নিরহংকার ব্যক্তি আমি এযাবৎ দেখিনি। তিনি বিস্ময়কর পারঙ্গমতায় তাঁর কৃতিত্ব, গরিমা ও বিশ্বজনীনতাকে প্রচ্ছন্ন করে স্বীয় আকাশসম উচ্চতাকে বুকপকেটে পুরে নিয়ে চলতেন নিভৃতে অবলীলায় স্বাচ্ছন্দে।

এতোবড় বিশ্বনন্দিত আলেমে দ্বীন হওয়া সত্ত্বেও, কীভাবে যে নিজেকে এতটা গোপন রাখতেন তা ভাবতেও আবাক লাগে। তাঁর তাকওয়া ও মুর্শিদভক্তি ছিল কিংবদন্তির মতো। ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ পিতা, আদর্শ অভিভাবক, আত্মীয়তার সম্পর্করক্ষাকারী, প্রতিবেশির প্রতি উদারতার মূর্তপ্রতীক ও একজন আদর্শ

মুবাল্লিগে দ্বীন। এককথায় তিনি ছিলেন অনুকরণীয় আদর্শের রোল মডেল।

পৃথিবীর আনাচে-কানাচে তিনি দ্বীনের দাওয়াতে বেড়িয়েছেন। শতশত বিপথগামী তাঁর সান্নিধ্যে এসে ধর্মপ্রাণ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ জ্ঞান সাধক। আমৃত্যু জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণই ছিল তাঁর মহান ব্রত। দেশ বিদেশের অসংখ্য ইসলামিক স্কলারদের সাথে তাঁর পরিচিতি ও দহরম-মহরম ছিল কল্পনাতীত গভীরতায়। তাঁরা সকলেও অনুপম উষ্ণতায় ব্যক্তি আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহকে ভালোবাসতেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, পাণ্ডিত্য, আদব-আখলাক ও ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই একজন ইনসানে কামেল ও নায়েবে নবী।

আমি আমার ব্যক্তিজীবনের সকল বিষয়ে যেমন তাঁকে পাশে পেয়েছিলাম, তদ্রূপ তিনিও আমাকে সেভাবেই পেয়েছেন। কেননা আমিও ষোলআনা উজাড় করে চেষ্টা করেছি ছায়ার মত তাঁর পাশে থেকে স্নেহ ঋণের বোঝা কমানার জন্য। কিন্তু না, অনন্ত দোয়া ও পরম মমতা দিয়ে তিনি আমাকে ঋণী করেই রেখে গেছেন। যা কখনোই শোধযোগ্য নয়। তাঁর মুবারক জীবনের অন্তিম সময়েও আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁকে কাছে থেকে সেবা করার। এটাকেই আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন ও পরম তৃপ্তি বলেই মনে করি। এই স্মৃতি ও তৃপ্তিই যেন হয় চিরপ্রেরণা, বাঁচার অবলম্বন ও পরপারের পরম পাথেয়।

প্রায় চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে যে মহান ব্যক্তিত্ব বটবৃক্ষের মতো মাথার উপরে ছায়া দিয়ে আসছিলেন, মাত্র ৫/৬ মাসের তীব্র শারীরিক অবনতির ফলে আল্লাহর দেয়া সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আমাদেরকে এতিম করে অনন্তে পাড়ি জমালেন। হ্যাঁ, এতো দীর্ঘ সময়ের স্মৃতি, এতোবড় একজন মনীষীর জীবন নিয়ে আমার মতো ক্ষুদ্রজন লিখে বুঝানো বা ব্যাখা করা অসম্ভব। তিনি চলে গেলেও রয়ে গেছেন আমাদের হৃদয়ে চিরভাস্বর হয়ে। তাঁর রচিত বিভিন্ন কিতাবাদি, উপদেশমালা ও নসিহত, সর্বোপরি তাঁর রেখে যাওয়া অনুকরণীয় জীবনাচারের পরম দীক্ষায়।

চোখের পলকে হৃদয়ের যে যায়গাটা খালি হয়েছিল তাঁর বিদায়ে, তা আজও শূণ্যই থেকে গেছে। এ অপুরণীয় শূণ্যতা, বিদায় ব্যথা বুকে চেপে বাকিটা পথ যেন তাঁর দেয়া আদেশ, উপদেশ, আমল, আখলাক মেনে চলতে পারি এটাই শুধু চাওয়া মহান আল্লাহর কাছে। মহান রাব্বে কারীম যেন তাঁকে জান্নাতের আ'লা মাকামে অধিষ্ঠিত করেন। এই প্রার্থনা করি। আমিন!

লেখক: মুহাদ্দিস ছাহেবে দ্বিতীয় জামাতা। বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী।

مرشدنا وأستاذنا

بقلم

الحاج مولانا ابو الكلام ازاد

حامدا ومصليا

اخواننا في الاسلام! انا المذنب العاصي الخاطئ الضعيف. ما اقول في شان احد من ورثة النبي عليه السلام، ان مرشدنا واستاذنا هو اخو امي الشيخ حبيب الرحمن.كريم الوالدين كان ابوه عالما وفقيها وله خاتم الافتاء حضرة العلامة ممتاز علي نور الله مرقده .وامه كانت عبيدة جيدا

وشيخنا شيخ الحديث هو علامة الزمان، ومن حياتنا وجدته مدة طويلة ولقيته مرارا كثيرا كلما لقيته وجدته منور الوجه، وفي فمه التكلم من العلم . وما سمعت منه الضحكة في حياتي . ومن حياتنا ما وجدته الا رايته من وجهه التبسم وفي التلفظ الترنم

لقيته يوما فاوصاني وقال انت تعلم من العلوم في كل يوم علما لا علم لك من قبل. وله ملكة في كل فن من العلوم التفسير والحديث والفقه والنحو والصرف والمنطق وغير ذلك.وتكلمته في علوم مختلفة وعلمت منه وحصلت منه فائدة كثيرة. وكان عادة الشيخ المكرم انه اذا لقيته يسالني من العلم فان وجدته اجبته.وان لم اجد فحينئذ يقول شيخ المكرم المعظم ادخل دار الكتب واطلب هذه المسالة والجواب

فادخل دار كتبه واطلب ليلة طويلة وله حصل لي فائدة مختلفة.فاذا اصبحت فحينئذ يطلبني من المسالة فبفضل الله تعالى اجبته

وفي يوم دخلت في بيته وهو يسالني كم طلبة في صفك؟ اجبته عشرون ستره

موضع طالبا) سبحان الله غضب الشيخ غضبا شديدا حتى احمرت عيناه وقال "بقوا على مقولة السلف فانهم يقولون طلبة من يطلب العلم" حتى يكلمني وقتا طويلا ودل بقول الله سبحانه وتعالى لا تقول راعنا وقولوا انظرنا . وذكر المسءلة ان الالفاظ التي اختارها الشرع فعلينا الا نقول غير هذه وان كان معناهما واحدا ، كما ان الذبح والقتل معناهما واحدا لكن

.لا ينبغي للمؤمن ان يقول اقتل البقرة بل يقولون اذبح البقرة

وفي يوم ايضا لقيته في سلهت وهو مريض شديد فلما حضرت لخدمته وسلمته جلس الشيخ المكرم وقال ما زال خصلتي اليوم واشار الى الكتب يمينا ويثارا واوصاني بمكتوبات الشيخ الاسلام

عجبت على مطالعتة الكتاب وهذه الوقعة رات الطائفة التي معي . ولكن منعتن الخدام عن التكلم .وهذا اخر ايام ولم اجد بعد ذلك حتى ذهب الشيخ الاستاذ المكرم والمعظم عن الدنيا .انا لله وانا اليه راجعون .نور الله مرقده واجعل قبره روضة من رياض الجنة

مهتمیم - تنظیم العلوم محمدیة شاه رومیٰ مدرسه سلهت

লেখক: মুহাদ্দিস ছাহেবের ভাগ্না, মুহতামিম, তানযিমুল উলুম মোহাম্মদিয়া শাহ রুমি মাদ্‌রাসা, সিলেট।

অশ্রু ঝরা স্মৃতি
আব্বা আম্মার বিদায়

রোকিয়া বেগম

কেবল মানুষই নয় বরং প্রতিটি সৃষ্ট জীবের জন্য বাবা মা মহান মালিকের পক্ষ থেকে এক অতুলনীয় নিয়ামত। যার কোন তুলনা হয় না, হতে পারে না।

বাবা মা এর স্মৃতিচারণে সন্তান হিসেবে কোন কথা বলা বা লেখা শুরু করাটাই দুরূহ। কারণ এই দুজন মানুষ থেকেই তো আমাদের জীবন শুরু। তাই তাদের ব্যাপারে বলে কিংবা লিখে সব কথা প্রকাশ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ স্তরের একজন অতুলনীয় আলিমে দ্বীন। ছিলেন ইলমে ওহীর ধারক এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। দেশ বিদেশে দ্বীনের বহুমূখি খিদমাতে ছড়িয়ে আছেন উনার অগনিত ছাত্র। তাঁর রেখে যাওয়া দ্বীনের বহুমূখি খিদমাত যুগ যুগান্তরে জ্বলজ্বল করে টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের আব্বা একজন উত্তম বাবা, উত্তম অভিভাবক ও উত্তম মেজবান ছিলেন। যেদিন বাড়িতে বেশি মেহমান আসতেন আব্বা মেহমানদের বিদায় দিয়ে এসে আমাদের জিজ্ঞেস করতেন, বেশি মানুষের মেহমানদারী করতে তোমাদের কি বেশি কষ্ট হয়েছে। আমরা হাসিমুখে জবাব দিতাম আব্বা! মেহমান না আসলে তো আমাদের ভালোই লাগে না। তখন আব্বা অত্যন্ত স্নেহভরে বলতেন- মাগো, বলা তো যায় না কখন আল্লাহর কোন ওলী খাবার খেয়ে যাবে আর তোমাদের তিন সিড়ি (তিন প্রজন্ম) নিহাল করে দিয়ে যাবে।

আমরা তিন বোনের দুইজন সিলেট শহরে থাকায় আব্বা আম্মা দুজনকেই আমরা বেশি বেশি পেয়েছি। বিশেষ করে পশ্চিম সিলেটে কোন মাহফিলে গেলে আব্বা আমাদের বাসায় আসতেন। কোন কোন সময় রাত্রি যাপনও করতেন। সকালের নাস্তায় আব্বার পছন্দের খাবার ছিল চালের গুঁড়ার রুটি আর গরুর পায়া, লবণ মসলার পিঠা আর ছুলা ভাজা। যখনই জানতাম আব্বা আসবেন, আগেই নিজে রান্না করে এসব প্রস্তুত রাখতাম। নিজের মেয়েদের রান্না আব্বার খুবই পছন্দ ছিল।

২০২১ সালের মাঝামাঝি আব্বার কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। ডা. আলমগীর চৌধুরীকে দেখানো হলো। তিনি দেখে অনেকগুলো টেস্ট করাতে পরামর্শ দিলেন। তন্মধ্যে বায়োপ্সিও ছিল। আব্বা নিজে এবং আমরা কেউই বায়োপ্সি করাতে রাজি হলাম না। কতিপয় ডাক্তারও বললেন, এই বয়সে উনাকে কষ্ট না দেয়াই ভালো। বায়োপ্সির

কথা শুনেই মনের মধ্যে ভয় ঢুকে গিয়েছিল। তবে কি আব্বার মারাত্মক কোন অসুখ দেখা দিয়েছে, আমারা তাঁকে কি হারাতে চলেছি? এর পর ঢাকা সিলেট মিলিয়ে আব্বাকে অনেক ডাক্তার দেখানো হলো। কিন্তু কিছুতেই সুস্থতার কোন লক্ষণ নেই। অসুস্থতার মধ্যে আব্বা তিনদিন আমার বাসায় অবস্থান করে ছালমার বাসায় চলে গেলেন। সেখানে যাওয়ার পর ক্রমান্বয়ে অবস্থার অবনতি হলো। তখন অসুস্থ আম্মাকে আমার বাসায় নিয়ে আসলাম। অনেক দিন অসুস্থ অবস্থায় দুইজন দুই বাসায় থাকলেন। ইতিমধ্যে প্রথমে হেলাল এবং পরে বেলাল দেশে চলে আসলো। এরপর আব্বাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। এরই মধ্যে তাঁর দুই পা অবশ হয়ে গেলো। আম্মাকে আমার এখানেই আরো কিছুদিন রাখলাম। তিনি আগে থেকেই বেশ অসুস্থ ছিলেন। এর মধ্যে হেলাল ও বেলাল লন্ডন ফিরে গেলো। তবে অল্প কিছু দিনের মধ্যে হেলাল আবার ফিরে আসলো। এরপর আম্মাকেও বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। ক'দিন পর একদিন রাত এগারোটার দিকে ছালমা ফোন দিয়ে বললো, জেনেছি আব্বার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেছে। আমি বললাম, চল আমরা দু'বোন চলে যাই। এরই মাঝে বাড়ি থেকে ফোন আসলো কিছুটা আরাম হয়েছে। তাই আমরা রাতে না গিয়ে সকালেই গেলাম। কিছু পরে শায়মাও আসলো। তিন মেয়েকে একসাথে কাছে পেয়ে অসুস্থ অবস্থায়ও আব্বা কি যে খুশি। যে আসছে তাকেই বলছেন, আজ আমার খুশির দিন, আমার তিন মেয়ে আজ একত্রিত হয়েছে। শায়মা সারাদিন থেকে বিকালে চলে গেলো, আমরা দু'জন থাকলাম। এরই মাঝে আব্বার খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম, ক্ষুধায় ছটফট করেন কিন্তু কিছু খেতে পারেন না। হঠাৎ আমার মনে হলো ব্রকলি এবং রুজট পাতার বড়া করে আব্বাকে দিয়ে দেখি খেতে পারেন কি না। কিছু বড়া তৈরী করে দিলাম, আব্বা খুব তৃপ্তি সহকারে খেলেন। তিন চারদিন কেবল এগুলোই খেলেন। একদিন সকালে কাছে বসে বললাম, আব্বা আমি কিছু প্রয়োজনে একবার বাসায় যেতে হবে। শুনেই বললেন, তুমি চলে গেলে ব্রকলি আর রুজট পাতার বড়া কে আমাকে করে খাওয়াবে? বললাম ছালমা তো আছে, আর আমিও চলে আসবো। কিন্তু সেসময় আব্বা আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না। কিছু সময় পর আবার গিয়ে বললাম, প্রয়োজনের কারণে আমাকে যেতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসবো। আব্বা হাতে থাকা তাসবীহ বিছানায় রেখে আমার হাত ধরলেন। যাওয়ার অনুমতি দিয়ে তিনবার বললেন, আল্লাহ তুমি শান্তিতে রাখো। একদিন বাসায় থেকে আবার ফিরে গেলাম আব্বার কাছে। এরই মধ্যে আম্মার শারীরিক অবস্থা বেশ অবনতি হলো। এমনিতে তিনি দুই তিন বছর থেকে কথা বলতে পারেন না। এর মাঝে খাওয়া দাওয়া একবারে বন্ধ হয়ে গেলো। আব্বাকে বুঝিয়ে বলে নাক দিয়ে খাওয়ার নল লাগানোর জন্য সিলেট নিয়ে গেলাম। ডাক্তারগণ অবস্থা দেখে বললেন, এই অবস্থায় নল লাগানো যাবে না। একরাতেই আম্মার অবস্থার বেশ অবনতি হলো। সকালে আমরা তাঁকে নিয়ে বাড়িতে চলে গেলাম।

আব্বা আম্মার মাঝে কোন কারণে মনোমালিন্য হতে আমরা কোনদিন দেখিনি। আম্মা সারাজীবন খালিস নিয়তে আব্বার সেবা যত্ন করেছেন। আম্মার মত স্বামীর প্রতি এত ভক্তি শ্রদ্ধাশীল কোন মহিলা আমি অন্ততঃ আজ পর্যন্ত দেখিনি। সেই ছোটকাল থেকে আম্মাকে ইশারা ইঙ্গিতেও আব্বার প্রতি কোন অনুযোগ করতে শুনিনি, দেখিনি। আম্মা সব সময় দোয়া করতেন, আব্বার হাতেই যেনো তাঁর মৃত্যু হয়। আল্লাহপাক তাঁর সেই দোয়া যে কবুল করে নিয়েছেন, তা তো আমাদের অজানা ছিল।

সিলেট থেকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে নামাযে যেভাবে বুকের উপর হাত বাঁধা হয় ঠিক সেভাবে বুকের উপর হাত রেখে অপলক উপরের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকলেন। এক রুমে মারাত্মক অসুস্থ আব্বা আর এক রুমে আম্মা শুয়ে আছেন। দু'জনকেই অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। আম্মার মুখে একটু পর পর ড্রপার দিয়ে পবিত্র জমজমের পানি দেয়া হচ্ছে। আম্মা কথা বলতে না পারলেও তাঁর প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে স্পষ্ট আল্লাহু আল্লাহু শব্দ শুনা যাচ্ছিলো। এভাবে সপ্তাহ খানেক থাকার পর ৩১ জানুয়ারি ২০২২ রবিবার সকাল থেকেই বুঝা যাচ্ছে আম্মার অবস্থা নাজুক। আম্মাকে এই অবস্থায় রেখে বেশ কিছু সময় ধরে ছালমা এবং আমি কেউই আব্বার কাছে যাইনি। হঠাৎ মাহফুজ এসে বললো আব্বা আমাদের খুঁজছেন। তখন আমরা আব্বার কাছে গিয়ে আম্মার অবস্থা জানাই। আব্বা আমাদেরকে বসতে না দিয়ে বললেন, তোমরা একজন উনার পাশে বসে সুরা ইয়াসিন পাঠ কর। অন্যজন খুব নিম্ন সুরে আল্লাহু আল্লাহু বলতে থাকো। আব্বার কথা মতো আমরা আম্মার পাশে বসে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করতে থাকলাম। সন্ধ্যা ছয়টা দশ মিনিটে আম্মা আমাদের ছেড়ে মহান মাবুদের জিম্মায় চলে গেলেন।

আম্মার বিদায়ের রাতে বেলাল লন্ডন থেকে চলে এলো। আমরা বাড়ির মহিলারা মিলে আম্মাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে সারা রাত পাশে বসে থাকলাম। আব্বার অবস্থা এত কাহিল যে, কোন মতে উঠে এসে পাশের রুমে আম্মাকে দেখবেন সে অবস্থা নেই। এমনকি তাঁকে তুলে হুইল চেয়ারে বসানোর মত সুযোগও নেই। পরদিন বাদ যোহর আম্মার দেহ খানা ঘর থেকে চিরদিনের জন্য বের করে নেয়ার সময় আব্বার রুমে নিয়ে তাঁর পাশে রাখা হলো। এ সময় আব্বা অনেক কষ্টে কাঁপা কাঁপা দুটি হাত তুলে দোয়া করতে গিয়ে বললেন, আল্লাহ আমি তোমার বান্দির উপর সম্পূর্ণ রাজি অবস্থায় তাকে তোমার রাহমাতের হাওয়ালা করে দিলাম। তুমিও তার উপর রাজি হয়ে যাও। দোয়া শেষ হলে আম্মাকে আমরা শেষ বিদায় দিলাম। তাঁর দেহখানা জানাযা ও দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। নিঃসন্দেহে আমাদের আমাদের আম্মা একজন সৌভাগ্যবতী মহিলা ছিলেন। শেষ বিদায়ের সময় স্বামীর এমন দোয়া ক'জনের নসীব হয়।

অসুস্থ অবস্থায় আব্বা সব সময় আমাদেরকে বলতেন, আমাদের বিদায়ের সময় ঘনিয়ে

এলে যখন দেখবে আর কথা বলতে পারছি না তখন পাশে বসে কেবল আল্লাহু আল্লাহু বলতে থাকবে। আর যখন আমার লাশ ঘরে থেকে বের করা হবে তখন সুর করে কাঁদবে না, হুঁশ হারা হবে না। জায়নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে। সিজদায় গিয়ে আমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে। এই সময়টা মুর্দার জন্য বড় কঠিন সময়। সেই কঠিন সময়ে দোয়া দিয়ে তোমরা আমাদের সাহায্য করবে।

আব্বার শেখানো মতে আম্মাকে ঘর থেকে বিদায় দিয়ে এক চাচাতো বোনকে আব্বার পাশে বসিয়ে আব্বার রুমেই মহান মাবুদের দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। আমার দুই বোন, মেয়ে বুশরা, বোনের মেয়ে পান্না তারা কে কোথায় কি করছে কিছুই জানি না।

আম্মার বিদায়ের পর থেকে আব্বার কথা ও খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো। এর মধ্যে হেলাল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলো। তাকে নিয়ে সিলেট ডাক্তারের কাছে গেলাম। বিকালে ফিরে এলাম বাড়িতে। আব্বার বড় জামাতা আমাদের সাথে আসলেন। আব্বার কথাবার্তা একেবারে বন্ধ। বাড়ির ভাই ভাতিজা সবাই মিলে সাধ্যমত তাঁর সেবা করছেন। আব্বা যদিও চোখ বন্ধ অবস্থায় আছেন কিন্তু তাঁর হুঁশ পুরোপুরি ঠিক ছিল। বিদায়ের ঘন্টা দুয়েক আগেও আমি ও আব্বা! ডাক দিই। চোখ না খুললেও তিনি হু বলে জবাব দেন। তখনও বুঝতে পারিনি আম্মার মত আব্বাও কিছু সময়ের মধ্যে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। আমার ডাকে আব্বা যখন সাড়া দেন তখন আমি বলি, আব্বা আমরা কী করবো? খুবই নিম্ন সুরে বললেন, আল্লাহু আল্লাহু। আমরা সব ভাই বোন, আব্বার তিন জামাতা সবার চোখের সামনেই একজন মুখলিস দাঈ ইলাল্লাহ, আল্লাহ প্রেমিক, রাসূল প্রেমিক যেভাবে বিদায় হওয়ার কথা ঠিক সেভাবেই আমাদের আব্বা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সোমবার সন্ধ্যা সাতটা দশ মিনিটে নিজ মুখে কালিমা পড়ে পড়ে মহান মাবুদের জিম্মায় চলে গেলেন।

মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে আমরা আম্মা আব্বাকে হারিয়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। প্রায় দুই বছর হতে চলেছে, অথচ আব্বার আম্মার বিদায়কালীন চেহারা চোখ থেকে সরাতে পারি না।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

লেখিকা: মুহাদ্দিস ছাহেবের বড় মেয়ে।

একজন আদর্শ বাবা

রাহিমা খাতুন হুছনা

সেই ছোটকাল থেকেই উনাকে মুহাদ্দিস ছাহেব বলে চিনতাম। ফুলতলী ছাহেব, মুহাদ্দিস ছাহেব আর বারগাত্তার অন্ধ হাফিজ ছাহেব প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমার দাদা সাহেবের সাথে উনাদের খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো। তখন এত বুঝতাম না, মনে করতাম উনারা আমার দাদা সাহেবের সাথে দেখা করতে আসতেন। একটু বড় হওয়ার পর বুঝতে পারি মুহাদ্দিস ছাহেব আমার চাচা মরহুম মাওলানা কমর উদ্দিন আহমদ নজিপুরী সাহেবের উস্তায ছিলেন। সেই সুবাদে উনারা যখনই আশেপাশের এলাকায় কোন ওয়াজ মাহফিলে আসতেন তখন আমাদের বাড়িতে উনাদের বিশ্রাম আর খাওয়ার আয়োজন হতো। ছোট বড় সবাই তখন ব্যস্ত হয়ে পড়তেন যাতে আপ্যায়নে কোন ত্রুটি না হয়।

আমার দাদা সাহেবের ইন্তেকালের পর ১৯৮৯ সালে আমার আব্বা আমাদেরকে লন্ডন নিয়ে আসেন। লন্ডন আসার পর অনেকবার মুহাদ্দিস ছাহেব লন্ডন সফরকালে আমাদের ঘরে এসেছেন। সালাম কালাম খাওয়া দাওয়ার পর বিদায়ের আগে আব্বা উনার কাছে দুআ চাইতেন, আমরা পরিবারের সবাই একত্রিত হয়ে দুআয় শামিল হতাম। বয়স বাড়ার সাথে সাথে উনার কাজ কর্ম, তাঁর প্রতি মানুষের সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কারন বুঝতে শিখি। সেগুলো নিয়ে কিছু বলার জ্ঞান বা যোগ্যতা আমার নেই। তবে ক্ষণিক সময়ের জন্য হলেও একজন আদর্শ বাবা হিসেবে আমি উনাকে খুব কাছ থেকেই দেখেছি। সম্ভবত ২০০০ সালের মাঝামাঝি লন্ডন সফরকালে উনি শুধু আমাকেই দেখতে আমাদের ঘরে আসেন। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমরা সপরিবারে দেশে যাওয়ার কিছুদিন পর মুহাদ্দিস ছাহেব উনার সকল ভাই ও একমাত্র ভগ্নিপতিসহ আমাকে দেখে উনার বড় ছেলের সাথে আমার বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে যান। বিয়ের পর থেকেই উনাকে আব্বা বলেই ডাকতাম। বিয়ের পর যে কয়দিন দেশে ছিলাম বাইরে থেকে এসেই আব্বা প্রথমে আমার খোঁজ খবর নিতেন। রান্না ঘরে আমাকে কোন কাজ করতে দেখলে বারণ করতেন। আমি তেমন একটা আব্বার কাছাকাছি যেতাম না। নিজের অজান্তে যদি কোন অসংলগ্ন কথা বা আচরণ করে ফেলি সেই ভয় মনের মধ্যে কাজ করতো। আমার শ্বাশুড়ী হয়তো সেটি টের পেয়েছিলেন। আব্বাকে অবসর দেখলেই তিনি আমাকে বলতেন, তুমি তোমার শ্বশুরের কাছে গিয়ে বসো। তিনি খুশি হবেন।

আব্বা খুব হিসেব করে খেতেন। তবে উনার জন্য কেউ কিছু রান্না করে নিয়ে এলে খুব খুশি হতেন। সেটা উনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলেও একটু হলেও খেতেন। প্রতি

বছরই তিনি কিছু দিনের জন্য বৃটেন সফরে আসতেন। সফরকালে তিনি খুবই ব্যস্ত সময় কাটাতেন। দেশজুড়ে বিভিন্ন শহরে প্রোগ্রাম থাকতো। তবে মূল অবস্থান হতো লন্ডন শহরে। আমাদের বিয়ের পর কোন কোন সফরে তিনি আমাদের ঘরে অবস্থান করেছেন। এছাড়া পূর্ব লন্ডনের ওয়াটনি মার্কেট এলাকায় উনার এক খাস মুরীদের ঘরে বেশিরভাগ সময় অবস্থান করতেন। শেষ দুইবারের সফরে ওয়াপিং এলাকায় উনার এক ভাতিজির ঘরে থেকেছেন। অন্য শহরে সফর শেষে লন্ডন ফিরে আসলে বাচ্চাদের নিয়ে উনার সান্নিধ্যে যেতাম। মাঝে মধ্যে উনার জন্য টুকটাক নাস্তা বানিয়ে নিয়ে যেতাম, তিনি খুব খুশি হতেন। সুযোগ পেলেই সবার কাছে আমার প্রশংসা করতেন। কিন্তু উনার প্রশংসার ষোল আনার এক আনাও কর্তব্য পালন করতে পারিনি, এটা ভেবে এখন শুধু আফসোস হয়।

২০০৭ সালের শেষের দিকে আমরা বড় দুই মেয়েকে নিয়ে দেশে যাই। তখন একটানা সাত মাস দেশে ছিলাম। সেসময় আমি উনাকে কারো সাথে উচ্চ স্বরে বা ধমক দিয়ে কথা বলতে দেখিনি। তিনি যে রাগ করতেন না তা নয়, তবে খুব কাছের মানুষ ছাড়া কেউ সেটা বোঝতে পারতেন না। স্বাস্থ্যগত কারণে আমাদের ছোট ভাই খালেদ বেশ রাত করে ঘুমাতেন, তাই ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠতে সমস্যা হতো। প্রায়ই ফজরের সময় আমি শুনতে পেতাম আব্বা উনার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সাড়া না পেতেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিন্দু পরিমাণ বিরক্তি ছাড়া খালেদ খালেদ বলে ডাকতেই থাকতেন। এই বয়সে ভোর রাতে একজন মানুষের ধৈর্য শক্তি দেখে আমি অবাক হতাম। সকাল বিকাল খাওয়ার সময় হলে কে খেয়েছে না খেয়েছে খবর নিতেন। উনার মেয়েরা নাইওর আসলে মেয়েদের নিয়ে একসাথে বসে খেতে পছন্দ করতেন। সবাই একত্রিত হলে মাঝে মধ্যে মজার মজার শিক্ষনীয় গল্পও করতেন।

আমার শ্বাশুড়ী খুব নিভৃতচারী ও শান্ত প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। নিভৃতে একনিষ্ঠভাবে তিনি স্বামীর প্রতি সব দায়িত্ব পালন করতেন। আব্বার খাওয়ার সময় হলে কাজের লোকদের না বলে নিজ হাতে সব প্রস্তুত করে নিজেই পরিবেশন করতেন। আব্বাও ঠিক তেমনি আম্মার প্রতি খুব যত্নশীল ছিলেন। সবসময় আম্মার খাওয়া দাওয়া, ঔষধ পত্রের খোঁজ খবর নিতেন। এমনকি দেশ বিদেশ সফরকালেও ফোন করে আম্মার সুবিধা অসুবিধার খবর নিতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী।

আব্বা বাড়িতে থাকলে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য সব সময় মানুষ আসা যাওয়া করতেন। বেশিরভাগ মানুষ চা নাস্তা করেই চলে যেতেন। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসলে আব্বা আম্মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন, কিছু মেহমান আছেন, খাওয়াতে পারবে? আম্মা হাসিমুখে মেহমানদারীর আয়োজনে লেগে যেতেন।

আমার দেখা মত আব্বা কারো উপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতেন না। চারজন যোগ্য

ছেলে থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আম্মার ভরণ পোষণ, ওষুধপাতি, ডাক্তার হাসপাতালের খরচ নিজে বহন করেছেন। আমার নানী শ্বাশুড়ীর কাছে শুনেছি, আব্বার বিয়ের কয়েক বছর পরও উনারা যখন কোন সন্তানাদি পাননি তখন উনার পরিবারের কেউ কেউ দ্বিতীয় বিয়ের চিন্তা করছিলেন। আব্বার কানে সেটি যাওয়ার পর তিনি নাকি বলেছিলেন, একজনের দায়িত্ব পালন করতে পারছি না, তোমরা কেনো আরেকজনকে আমার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছো। অসুস্থ হওয়ার পর যখন বুঝতে পেরেছেন উনার সময় আর বেশি বাকি নেই তখন থেকে আম্মাকে নিয়েই উনার পেরেশানি ছিলো। সবসময় শুধু বলতেন, উনাকে আমি কার কাছে রেখে যাবো। আল্লাহর কি লীলা, উনাকে কারো কাছে রেখে যেতে হয়নি। আব্বার ইন্তেকালের মাত্র এক সাপ্তাহ আগেই আল্লাহ উনাকে ডেকে নিয়েছেন।

২০১৯ সালের প্রথম দিকে আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডাক্তার বললেন, বড় ধরণের অপারেশন লাগবে। আব্বা তখন উমরা সফরে মক্কা শরীফ ছিলেন। অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে উনার সাথে আমার ফোনে কথা হয়। সাধারণতঃ দুআর সময় ছাড়া আমি কখনো উনাকে কাঁদতে দেখিনি বা শুনিনি। টেলিফোনে সেদিন উনার কান্না জড়িত কণ্ঠ এখনো মনে হলে আমার চোখে পানি আসে। আব্বা বলেছিলেন, মাগো! তোমাকে আল্লাহর হাওয়ালা করলাম। আল্লাহ যেনো তোমার বাচ্চা কাচ্চার উসিলায় তোমাকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেন। পরে জেনেছি, আমার অপারেশনের পূর্ব রাতে তিনি সারা রাত হারাম শরীফে বসে আমার জন্য দুআ করেছেন। গত বছর আব্বার প্রথম বার্ষিক ঈসালে সাওয়াব মাহফিল উপলক্ষে দেশে যাই। বাড়ির মুরব্বীদের কাছ থেকে জানতে পারি আমার অসুস্থতার খবর পেয়ে আব্বা দুই তিন বাড়ির সবাইকে ডেকে ডেকে আমার জন্য দুআ চেয়েছেন। আব্বা অসুস্থ থাকাকালীন হাজার ইচ্ছা থাকার পরও উনাকে দেখতে দেশে যেতে পারিনি। মাঝে মধ্যে ভিডিও কলে কথা বলতাম। অসুস্থতার প্রথম দিকে আব্বা বলেছিলেন, মাগো! একা উঠে বসতে বা দাঁড়াতে পারি না। দুআ করো। আমি বলেছিলাম, আব্বা চিন্তা করবেন না। আমরা সবাই দুআ করছি, আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু আব্বা আর সুস্থ হননি। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের জন্য দুআ করে গেছেন। আল্লাহ যেনো তাঁর দুআ কবুল করেন আর আমাদেরকে উনার জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

লেখিকা: মুহাদ্দিস ছাহেবের বড় পুত্রবধু।

আব্বার স্মৃতি

মো. আবদুর রব বিলাল

আব্বা তখন আরব আমিরাতে বিচার বিভাগে কর্মরত। বছরে ২/৩ মাসের জন্য দেশে আসতেন। এ সময়টায় আমরা আব্বাকে কাছে পেতাম। আমি তখন অনেক ছোট, ইলাবাজ সরকারি প্রাইমারি স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ি। ভাই দ্বিতীয় শ্রেণিতে আর আপা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়েন। আব্বা তখন নিয়মিত আমাদের পড়ালেখার খোঁজ-খবর নিতেন। ছুটিতে দেশে আসলে আব্বা অনেক ব্যস্ত থাকতেন। হয়তো কোন মাহফিল, জলসায় মেহমান হিসেবে অংশগ্রহণ, আর বাড়িতে থাকলে মেহমানদের আনাগোনা লেগে থাকতো। রাতের খাবার আমরা একসাথে খেতাম। ঐ সময় আব্বাকে একান্ত কাছে থেকে দেখার ও কথাবার্তা শোনার সুযোগ হতো। তিনি আমাদেরকে লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ার, নিয়মিত জামাতে সালাত আদায়ের তাগিদ দিতেন। নিয়মিত কিছু মাসনুন দোয়া পড়ার উপদেশ দিতেন।

১৯৮৩ সাল, আমি ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হই। আব্বা তখন ইছামতি মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মরত। এরও ১/২ বছর আগে আব্বা আরব আমিরাতের প্রেস্টিজিয়াস চাকরি ছেড়ে দিয়ে একেবারে দেশে চলে এসে আবারো ইছামতি মাদ্‌রাসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আসার কারণ ছিলো উনার উস্তায ও মুরশিদ আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নির্দেশ। উস্তায ও মুরশিদের প্রতি এ ধরণের নিঃশর্ত আনুগত্য এ যুগে খুবই বিরল।

আমি তখন ইছামতি মাদ্‌রাসা বোর্ডিং এ থাকি। আব্বার রুম আর আমাদের রুমের মাঝে এক রুম দূরত্ব ছিলো। মাঝে মাঝে শেষ রাতে ঘুম ভাঙলে আব্বার রুমের পাশ দিয়ে যেতাম। জানালার ফাঁক দিয়ে রুমের ভেতর কিছুটা দেখা যেত। দেখতাম আব্বা হয়তো তাহাজ্জুদ পড়ছেন অথবা কিতাব অধ্যয়ন করছেন।

১৯৮৬ সাল, আমি তখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। তখন সপ্তম শ্রেণিতে আঞ্জুমানে মাদারিসে আরাবিয়ার অন্তর্ভূক্ত মাদ্‌রাসাগুলোর বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। বৃত্তি পরীক্ষার আগে আব্বা আমাকে পড়ালেখার জন্য সার্বক্ষণিক উৎসাহ প্রদান করতেন। আমার লেখাপড়ার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান করতেন আমাদের চাচাতো ভাই মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব (অবসরপ্রাপ্ত ভাইস প্রিন্সিপাল, হাবিবপুর ফাজিল মাদ্‌রাসা, জগন্নাথপুর)। তখন তিনি ইছামতি মাদ্‌রাসার শিক্ষক। আমার একান্ত শিক্ষক ও গাইড ছিলেন তিনি। উল্লেখ্য যে, উনার আব্বা আমাদের বড় চাচা মাওলানা নজীবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন আব্বার একান্ত শিক্ষক ও গাইড। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী আলেম। ১৯৪০ সালে

আসাম প্রাদেশিক মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধিন আলিম পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। সপ্তম শ্রেণির মাদারিসে আরাবিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় আমি ১ম স্থান অধিকার করি। তখন আব্বা সম্ভবত আমার চেয়ে বেশি খুশী হয়েছিলেন।

১৯৮৭ সালে অষ্টম শ্রেণিতে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বৃত্তি পাই। এ সবের পেছনে মূল কারণ ছিলো আব্বার সার্বক্ষণিক উৎসাহ প্রদান। অনেক সময় আব্বা আমাদেরকে তাঁর ছাত্র জীবনের গল্প বলতেন। তিনি বলতেন, ছাত্র জীবনে তিনি ৪/৫ ঘণ্টা ঘুম ব্যতীত বাকি সময় পড়ালেখায় ব্যয় করতেন। আমি যখন ৭ম/৮ম শ্রেণির ছাত্র তখন থেকে আব্বা আমাকে বিভিন্ন কিতাবের নাম ও পৃষ্ঠা নাম্বার বলে তাঁর সামনে এনে দেয়ার জন্য বলতেন। আমার মনে তখন প্রশ্ন জাগতো, আব্বা আমাকে না বলে নিজে কিতাব খুলে তো পড়তে পারেন। অনেক পরে বুঝতে পারি আব্বার আমাকে দিয়ে এসব করানোর উদ্দেশ্য ছিলো কিতাবের সাথে আমার সম্পর্ক জুড়ে দেয়া। আজ খুব আফসোস হয়, যদি সেই ধারা অব্যাহত রাখতে পারতাম আর আব্বার সংস্পর্শে সার্বক্ষণিক থাকতে পারতাম তাহলে কতোই না ভালো হতো।

আব্বার পড়ালেখার পরিধি ছিলো অনেক ব্যাপক। ১৯৮৮ সালে ব্রিটেন থেকে সালমান রুশদির স্যাটানিক ভার্সেস প্রকাশিত হয়। যাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আহলে বাইত আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে অনেক আপত্তিকর কথাবার্তা ছিলো। আব্বা তখন লন্ডন সফররত। তিনি সেখান থেকেই স্যাটানিক ভার্সেসের কপি সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে আসেন, পড়েন। তারপর আপত্তিকর জায়গাগুলো নিজ বক্তব্যে খণ্ডানোর চেষ্টা করেন। সারা মুসলিম জাহান তখন স্যাটানিক ভার্সেস ও সালমান রুশদির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ। বাংলাদেশেও অনেক প্রতিবাদ সমাবেশ হয়। তিনি ব্যতীত বাংলাদেশের আর কোন আলেম নিজে স্যাটানিক ভার্সেস পড়ে বক্তব্য দিয়েছেন কিনা তা আমার জানা নেই।

১৯৯০ সাল, আলিমে পড়ি। আমাদের সময় আলিম ক্লাসে ২০০ মার্কের অতিরিক্ত সাবজেক্ট নেওয়া যেতো। আমার সহপাঠীরা সবাই বিভিন্ন বিষয় অতিরিক্ত সাবজেক্ট হিসেবে নেন। আব্বা আমাকে পরামর্শ দিলেন উর্দু সাহিত্য অতিরিক্ত সাবজেক্ট হিসেবে নিতে। তিনি বললেন, বিগত দুই শতাব্দীতে কুর'আন হাদীস তথা ইসলামী সাহিত্যে উর্দু ভাষায় যতোটুকু কাজ হয়েছে তা অন্য কোন ভাষা এমনকি আরবি ভাষায়ও হয় নাই। তাই ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য উর্দু ভাষায় জ্ঞানার্জন অত্যন্ত সহায়ক। আব্বার কথামতো অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে উর্দুই নিয়ে নিলাম। এ বিষয়ে একমাত্র ছাত্র আমি, তাই আমার জন্য আলাদা কোন শিক্ষকের ক্লাস নেওয়া সম্ভব ছিলো না। তাই আব্বার সহায়তা নিয়ে একাই পড়তে থাকলাম।

আমাদের সময় ফাজিলে ৩ শত মার্কের ঐচ্ছিক বিষয় নেওয়ার নিয়ম ছিলো। এবারো

আমার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো। সবাই নিলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর আমি নিলাম আরবী সাহিত্য। এবারও এই সাবজেক্টের একমাত্র ছাত্র আমি, তাই আমার জন্য আলাদা কোন ক্লাস ছিলো না, কোন নোটবুক বা সাজেশনও ছিলো না। আমি আব্বার কাছেই পড়তাম। এ সময় আমার আরো দুজন সম্মানিত উস্তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। দুজনই আজ চলে গেছেন ওপারে মালিকের সান্নিধ্যে। তাঁরা হলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা শামসুল হুদা ছিরামপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও শায়খুল হাদীস আল্লামা ছালিক আহমদ ভুরকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

কামিলে পড়ার সময় আব্বার ক্লাসে নিয়মিত বসার সুযোগ হয়। ঐ সময় আব্বা সহীহ বুখারী ও সুনানে তিরমিযী পড়াতেন। আমরা সবাই একাগ্রচিত্তে ক্লাসে বসতাম ও মনোযোগ সহকারে দারস শুনতাম। প্রত্যেকটি হাদীসের ব্যাখায় তিনি বর্তমান সময়ের সাথে হাদীসের প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করতেন। যা সচরাচর অন্য কারো কাছে শোনা যেত না।

আব্বা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অনেক পত্র পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। আরবীতেও দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিনের গ্রাহক-পাঠক ছিলেন। ভারতের লাখনৌ দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত আরবী ম্যাগাজিন আররাইদ এর নিয়মিত পাঠক ছিলেন। পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রকাশিত তরজুমানুল কুরআনের পাঠক ছিলেন।

Internet শব্দের সাথে আমার প্রথম পরিচয় এই আরবী ম্যাগাজিন আররাইদ এর মাধ্যমে। এ শব্দের অর্থ তখন বুঝিনি। বুঝার কথাও না, কেননা আমি বলছিলাম ১৯৯২ সালের কথা, আর এর ৪ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে Internet এর সূচনা হয়। আব্বাকে এ শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলে বললেন, আমিও ঠিকমতো বুঝিনি, তবে যতোটুকু বুঝি তা হলো এটি এমন একটি প্রযুক্তি যা দুনিয়াকে অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসবে।

১৯৯৫ সালে আমি কামিল ও ১৯৯৭ সালে মাস্টার্স উত্তীর্ণ হই। এরপর ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতায় যোগদান করি। শিক্ষকতার সূচনালগ্নে আব্বা আমাকে এ মহান পেশার গুরুত্ব ও করণীয় সম্পর্কে দীর্ঘ নসিহত করেন। বিশেষত পাঠদানের পূর্বে নিজে ভালোমতো অধ্যয়ন করে ক্লাসে যাওয়ার কথা বলেন। আব্বাকেও সারাজীবন দেখেছি দারস দেওয়ার পূর্বে গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে ক্লাসে যেতেন।

বিনয়, নম্রতা, উদারতা, ভিন্ন মতের মানুষের সাথে সুন্দর আচরণে আব্বার সাথে তুলনা করা যায় এমন মানুষ খুবই বিরল। জীবনে কাউকে আদেশ নির্দেশের সুরে কিছু বলতে শুনিনি, এমনকি আমাদেরকেও কিছু করতে বললে সরাসরি নির্দেশের সুরে বলতেন না।

কাউকে সংশোধনের উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু বললে সেটাও অত্যন্ত সুন্দর ও মার্জিত ভাষায় গুছিয়ে বলতেন। খুতবায়ে ইয়াকুবিয়া প্রকাশের সময় আব্বাকে প্রুফ দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আব্বা আমাকে প্রুফ দেখার কাজে সময় দেয়ার আদেশ করেন। তখন ছিলো রামাদ্বান মাস, ইফতারের পরে আব্বা আমার সারাদিনের কাজের হিসেব নিতেন। মদীনা শরীফের পূর্বনাম يـثرب এর স্থলে আমি يثريـب লিখি। আব্বা আমাকে বললেন, তোমার কাছ থেকে এ ধরনের ভুল আমি আশা করিনি।

২০০১ সালে হজ্জের সফরে আব্বার সাথে ছিলাম। মুজদালিফায় রাত্রিযাপন শেষে ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠে দেখি সবার চোখে মুখে বালি। কারণ এ রাত্রে প্রচণ্ড বাতাস বইছিলো। ঐ রাতের পর থেকে আব্বাকে আর রিডিং গ্লাস ব্যবহার করতে হয়নি। আব্বা বলতেন, মুজদালিফার বালু চোখে ঢুকার বরকতে আমার চোখ ভালো হয়ে গিয়েছে।

ইলমে ওহীর মহান এক খাদিম যিনি তার জীবনের সারাটা সময় ব্যয় করেছেন কুর'আন হাদীসের জ্ঞান মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেয়ার কাজে। হাজারো শিক্ষার্থী যার কাছ থেকে ইলমে দ্বীন শিখে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে দ্বীনের খিদমাতে রত আছেন, তিনি আজ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছেন মহান মা'বুদের সান্নিধ্যে। মহান রবের কাছে প্রার্থনা। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

লেখক: মুহাদ্দিস ছাহেবের দ্বিতীয় পুত্র, যুক্তরাজ্য প্রবাসী।

এই শূন্যতা থেকেই যাবে

ছালমা খাতুন

কালের চক্রে সময় গড়িয়ে দু'বছর চলে গেছে। অথচ মনে হচ্ছে এই তো সেদিন, মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে আমরা আম্মা আব্বাকে হারিয়েছি। সব সন্তানের জন্য মা বাবা আল্লাহপাকের সেরা নিয়ামত। কোন সন্তানের পক্ষে মা বাবার ঋণ শোধ করা যেমন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি মা বাবার সব স্মৃতি বলে বা লিখে প্রকাশ করাও অসম্ভব।

আমাদের বাবা একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম এবং কামিল ওলী ছিলেন। সেই ছোটকাল থেকে দেখে এসেছি তিনি বছরের প্রায় বেশিরভাগ সময় দেশ বিদেশে সফরে কাটিয়েছেন। কিন্তু সেই সফর দুনিয়ার স্বার্থে নয়। বরং ইসলামের সুমহান শিক্ষা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে তিনি ছুটে চলেছেন দেশ দেশান্তরে।

আব্বার অভ্যাস ছিলো শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি কিতাব পড়তেন। কিতাব সংরক্ষণের জন্য পৃথক রুম থাকলেও তাঁর বেডরুমে অন্য আসবাবপত্রের চেয়ে বেশি কিতাব থাকতো। ফজরের নামাযের পর তিলাওয়াত ও ওযীফা পাঠ শেষ করেই তিনি কিতাব নিয়ে বসতেন। রাতে শোয়ার আগেও দীর্ঘ সময় কিতাব নিয়েই থাকতেন। জীবনের শেষ সময়ে শয্যাশায়ী অবস্থায়ও তিনি কিতাব পড়েছেন।

২০১৭ সালে আব্বার পিত্তথলিতে পাথর ধরা পড়ে। ডাক্তারের পরামর্শে সার্জারি করতে হয়। সময় ছিলো রমযান মাস। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাড়িতে না গিয়ে কিছুদিন আমাদের বাসায় অবস্থান করেন। অপারেশনের পর থেকে মনে হতো তিনি আতংকিত হয়ে পড়েছেন। কোন কিছু খেতে চাইতেন না। খাবার সামনে নিয়ে গেলে বলতেন, এই যে খাবার দিয়েছো খেলে যদি সেলাই ছিঁড়ে যায়! অনেক দিন ভাত না খেয়ে কেবল স্যুপ এবং নরম খাবার খেয়েছেন। ১৯ রমযান আব্বা বাড়িতে যান, আমিও সাথে যাই। ২৬ রমযান আমি বাসায় ফিরে আসি। এ সময় পর্যন্ত তিনি একদিনও ভাত খাননি। রমযানের পর ডাক্তার দেখানোর জন্য সিলেট এসে আমাদের বাসায় উঠেন। আমি চালের গুঁড়ার রুটি এবং গোস্ত রান্না করে খেতে দেই। রুটি গোস্ত সব সময়ই আব্বার পছন্দের খাবার ছিলো। দেখে খুশি হয়ে বসলেন। আমি কিছু ভাতও প্লেটে দিলাম। অল্প কিছু খেয়ে বললেন, একমাস যাবত আমার ভাত খাওয়া বন্ধ ছিলো। আজ তো খেতে পারলাম। মনে হলো আব্বা খুব খুশি হয়েছেন। আনন্দের সাথে বলতে লাগলেন, ডাক্তার সাবকে বলবো আমি পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। আজ আমার মেয়ের বাসায় এসে নতুন করে ভাত খাওয়া শিখেছি।

২০২১ সালের আগস্টের মাসের প্রথম দিকে আব্বার শরীরে কিছু অসুস্থতা দেখা দেয়।

ডাক্তার দেখাতে ১২ আগস্ট আমাদের বাসায় আসেন। আমাদের এখানে এক সপ্তাহ থাকার কথা ছিলো। কিন্তু তিনদিন পর আমাদের বড় বোনের বাসায় গেলেন। আপার বাসায় যাওয়ার পর থেকে আব্বা দুই হাঁটুতে বেশ দুর্বলতা অনুভব করতে থাকেন। সে রাতটি ছিলো পবিত্র আশুরা রজনী। রাত তিনটার দিকে আব্বা তাঁর স্বভাবসুলভ তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে উঠেন। ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য বিছানা থেকে দাঁড়াতেই সজোরে পড়ে যান। উনার পড়ে যাওয়ার শব্দে আপা দুলাভাইও ছুটে আসেন। পরদিন অনেক কষ্টে গাড়িতে করে আব্বাকে নিয়ে আসা হয় ওয়েসিস হসপিটালে। চেকআপ শেষে আমাদের বাসায় আনা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে শারীরিক অবস্থা অবনতি হতে থাকে। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তিনি দাঁড়ানোর সক্ষমতা হারান। তখন থেকেই হুইলচেয়ারে করে এক রুমে থেকে অন্য রুমে, কোন সময় বারান্দায় নেয়া হতো।

আব্বা আমাদের সকলকে অনেক আগেই দালাইলুল খাইরাত ও হিযবুল আযম পড়ার ইজাযাত দিয়ে ছিলেন। আমরা নিয়মিত পড়ছি কি না তিনি সব সময় খোঁজ খবর নিতেন। আমাদের বাচ্চাদের লেখাপড়ার খোঁজ খবর রাখতেন, সময় সুযোগে তাদেরকে লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহিত করতেন। আমাদেরকেও সময় সময় বিভিন্ন আমল বলে দিতেন।

চরম অসুস্থ অবস্থায় আমাদের বাসায় অবস্থানকালে আব্বা প্রায় প্রতিদিন কিছু মানুষকে হাদীস শরীফের দারস দিতেন। বিশেষ করে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা উলামা ও ছাত্রদের মুসালসাল হাদীসের দারস ও সনদ প্রদান করতেন। এমনিতে কথা বলতে তাঁর কষ্ট হতো, কিন্তু দারসে বসলে মনে হতো যেনো পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতেন।

১২ অক্টোবর এম্বুলেন্সে করে আব্বাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। এটিই ছিলো আমাদের বাসায় আব্বার শেষ আসা। মাত্র কয়েক মাসের অসুস্থতায় আব্বার শরীর একেবারে কাহিল হয়ে পড়ে। এদিকে আম্মা আগে থেকেই বেশ অসুস্থ। ক্রমান্বয়ে দুজনের অবস্থা অবনতি হতে থাকে। ৩১ জানুয়ারি ২০২২ সন্ধ্যার সময় আম্মা চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে যান। মাত্র এক সপ্তাহর মাথায় ৭ ফেব্রুয়ারি আব্বাও চলে যান না ফেরার দেশে। আব্বা আম্মাকে হারিয়ে মনের মধ্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় এই শূন্যতা আজীবন থেকেই যাবে।

আব্বা আম্মা সারা জীবন আমাদের জন্য যে দুআ করে গেছেন সেই মকবুল দুআর বরকতে যেনো আমাদের ইহ পরকাল মঙ্গলময় হয়।

লেখিকা: মুহাদ্দিস ছাহেবের মেজো মেয়ে।

আমার আব্বা আমার স্মৃতি

মো. আব্দুল বাকী খালেদ

মহান আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া উম্মতে মোহাম্মদী বানানোর সাথে সাথে একজন যুগ শ্রেষ্ঠ মদীনাওয়ালার মনোনীত মুহাদ্দিস ছাহেবের ঔরসে জন্ম দান করেছেন, আল্লাহুম্মা লাকাল হামদ। আমাদের আব্বা শুধু মকবুল মুহাদ্দিস নন একজন বিখ্যাত মুফাসসির ও সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য মুফতি ছিলেন। সর্বোপারি একজন ইনসানে কামিল বা সর্বগুণে গুণান্বিত পরিপূর্ণ একজন মানুষ ছিলেন। সারাটা জীবন ইলমে দীনের খেদমতের পাশাপাশি মানবতার খেদমত করে গেছেন। আব্বার পরিচয় ও পরিচিতি আমরা সন্তানেরা দেয়ার দরকার নেই। বলতে গেলে দুনিয়ার মানুষ আব্বাকে আমাদের চেয়ে বেশি জানেন ও চিনেন। আব্বার জীবদশায় যেকোনো শ্রেণির যেকোনো পেশার মানুষ যে আব্বার কাছে এসেছেন তিনি চিনতে ও জানতে পেরেছেন আব্বা কত উচু মাপের কত বড় মনের মানুষ ছিলেন। আব্বার স্মারকে স্মৃতিচারণ একটা লেখা লিখতে শিরোতাজ বড় ভাই সাহেব (যার হাতে আমার লেখালেখির হাতে খড়ি) বারবার হুকুম করে আসছেন। টুকটাক লেখালেখির অভ্যাস থাকলেও লিখতে পারি না, কলম হাতে উঠে না, কলম চলে না, কলম চালাতে পারি না। লিখতে বসলেই আব্বা-আম্মাকে এক সপ্তাহের ব্যবধানে হারানোর শোক বুকের জমিনে নতুন করে ঝড় তুলে, চোখ থেকে ঝরতে থাকে অঝোর ধারায় বিষাদ অশ্রু। শেষতক বড় ভাইয়ের হুকুম তামিল সর্বোপরি আব্বার মুবারক জীবনী স্মারকে নিজের অংশগ্রহণের জন্য কিছু স্মৃতি লিখেতে বসি।

এক

আমরা ছোট বেলা থেকে আব্বাকে কোনো সময় কোনো কাজ ছাড়া বসে থাকতে দেখিনি। মেহমানরা মুলাকাত প্রার্থী না থাকলে আব্বার নিয়মিত কাজ ছিলো দুটি ১. তাসবিহ হাতে নিয়ে বসে থাকা ২. অনবরত কিতাব পড়তে থাকা। ব্যক্তি জীবনের কোনো কাজ না থাকলে হয়তো তাসবীহ হাতে নয়তো কিতাব হাতে বসে থাকা ছাড়া এমনি এমনি বসে থাকতে দেখিনি। এমনকি শেষ অসুস্থতার সময় যখন শুয়ে হাতে দিয়ে কিতাব রাখতে পারতেন না তখন পাশে খেদমতের জন্য বসে থাকা আমাদের কাউকে দিয়ে কিতাব ধরিয়ে রাখতেন আর তিনি পড়তে থাকতেন। এক পর্যায়ে যখন পড়তে সক্ষমতা হারালেন তখন অন্য কাউকে পাশে বসিয়ে পড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকতেন। বিভিন্ন রোগের নানা যন্ত্রণার কারণে তা সম্ভব না হলে বিশ্বের বিভিন্ন বুযুর্গদের বয়ান মোবাইলে বাজিয়ে শুনতেন। শেষ সময়ে খেদমতে যারাই থাকতেন তারা সকলেই সাক্ষী যে, ইলমী বয়ান চলাকালে মনোযোগসহ অত্যন্ত নীরবে শুনতে থাকতেন যে, রোগের কারণে কোনো কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হতো না। এমনকি কখনো শারিরীক যন্ত্রণা

বেড়ে গেলে আমরা ঐ সকল বুযুর্গদের বয়ান বাজানো শুরু করতাম তখন তিনি এমন মনোযোগ দিয়ে নীরবে শুনতে থাকতেন যে বুঝা যেতো তার যন্ত্রণা কমে গেছে। ইলমের প্রতি এমন আগ্রহ এমন টাই তাঁর উসতাযুল উলামা লকবের যথার্থতা প্রমাণ করে।

দুই

চার ভাইয়ের মধ্যে একা আমি বাড়িতে আব্বা আম্মার খেদমতের নিয়তে অবস্থান করি। এই হিসেবে অযোগ্য আমি আব্বার কিতাবগুলো দেখাশুনা ও পরির্চযার সৌভাগ্য লাভ করি। বিশেষ করে লাইব্রেরি রুম থেকে প্রয়োজনীয় কিতাব আব্বার কাছে এনে দিতাম কিতাবে আব্বার প্রয়োজনীয় বিষয় মাসআলা তাঁর নির্দেশনা মত বের করে দিতাম। কিতাবে কোনো বিষয় বের করে দেওয়ার পর খুব খুশী হতেন, কিতাব পড়ার প্রতি উৎসাহিত করতেন। অনেক সময় শুনানোর জন্য টাকা হাদিয়া দিয়ে খুশি প্রকাশ করতেন। বই কিতাব পড়তে দেখলে, বই কিতাব আমার কাছে রাখা দেখলে যে কতটা খুশী হতেন তার পরবর্তী আলোচনায় বুঝা যেত। অনেক আলিমে দ্বীন এমন আছেন যাদের ইলম অর্জনের উৎসাহ প্রদানের সাথে সাথে তার লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ দান করতেন। ইলিম চর্চাকারীদের জন্য সব সময় তার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। অনেক ঝামেলার মাঝেও কেউ কোনো কিতাব বা ইলমী কোনো বিষয় নিয়ে হাজির হলে অন্য ঝামেলা তাড়াতাড়ি শেষ করে ইলমী বিষয় নিয়ে মগ্ন হয়ে যেতেন। আব্বাকে কেউ কোনো কিতাব হাদিয়া দিলে যতটা খুশি হতেন অন্য কোনো কিছু হাদিয়া দিলে এতোটা খুশি হতেন না। কেউ কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে সমাধান না দিয়ে ঐ বিষয়ক কিতাবের নাম বলে দিতেন। সাথে বলতেন আমি বলে দিলে তো শুধু ঐ বিষয়টা জানা হবে আর যদি কিতাবে পড়ো তবে এর সাথে আরো অনেক বিষয় জানা হয়ে যাবে। উলামায়ে কেরামের সাথে যে কোনো বিষয়ে আলোচনা শেষে কিতাব পড়ার উৎসাহ ও তাগিদ দিতেন। আর এসব বিষয় প্রমাণ করে যে তিনি ইলমে ওহীর জিম্মাদারী যথাযথভাবে আদায় করে গেছেন।

তিন

দৈনন্দিন জীবনের পাঠ্য মাছনুন দোয়াগুলো বাড়িতে থাকলে আমাদের সামনে জোরে পাঠ করতেন। মাঝে মাঝে বলতেন বাবারা এসব দোয়া আওয়াজ করে পড়া লাগে না। আমি আওয়াজ করে পড়ি এ জন্য যে, তোমরা বেখেয়ালে মাছনুন পড়া বিরত না থাকো, আমার পড়া শুনলে তোমাদের পড়ার কথা খেয়ালে আসবে এবং তোমরাও পড়বে আর এক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে । আর যে দোয়া তোমাদের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে সে দোয়া শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে যাবে। এখানে দুটি বিষয় পরিস্কার বুঝা যায়-

১। হাদীসে বর্ণির্ত দোয়াগুলো কিতাবে পড়ার সাথে সাথে নিজের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমল করতেন।

২। অন্যকে কোনো কিছু শিক্ষা দেয়ার অনুপম হিকমত বা প্রজ্ঞা, যা সাধারণত দেখা যায় না।

চার

আব্বা ছিলেন একজন দায়িত্ববান পিতা, সুযোগ্য অভিভাবক। আব্বা কামিল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের আগে থেকে ইলমে দীনের খেদমতে নিয়োজিত হওয়ায় নিয়মিত বাড়ী থাকার সুযোগ হতো না। অবশ্য ১৯৯৬ সালে ব্যক্তিগত গাড়ি কিনার পর থেকে বাড়ি থেকে মাদ্‌রাসায় যেতেন। তিনি যদিও নিয়মিত বাড়িতে থাকতে পারেননি তবু যে কয়দিন থাকতেন আমাদের খাওয়া-দাওয়া, লেখাপড়াসহ সার্বিক বিষয়ে নিজ নিজ দুর্বলতা বের করে এমন হিকমতের সাথে কম সময়ে তরবিয়ত দিতেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদব-আখলাকের শিক্ষা দিতেন যার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক উপস্থিত না থাকার শুন্যতা পূরণ হয়ে যেত। কালামুল্লাহ শরীফের ফরমান-মানুষকে আল্লাহর পথে হেকমতের মাধ্যমে ডাকো এর সমকালীন বাস্তব নমুনা বলে প্রমাণিত হয়। জীবনে সৌভাগ্যক্রমে যারাই তার সোহবত পেয়েছেন তাঁরাই এসবার সাক্ষী। আব্বা আমাদের সবাইকে একসাথে নিয়ে খাবার খেতেন এবং খাবারের আদব শিক্ষা দিতেন। বাড়ীর পাশে মসজিদ নির্মাণের আগে আমাদের সবাইকে নিয়ে বাংলাঘরে জামাতে নামাজ আদায় করতেন। গরমকালে রাত ছোট থাকায় আমাদের ঘুম ভাঙ্গতে দেরি হলে রুমে গিয়ে বারবার নক করতেন আর বলতেন, বাবা উঠো, নামাজের ওয়াক্ত চলে যাবে। আব্বা আমাদেরকে কোনোদিন কটু কথা বলেননি। জীবনের পরতে পরতে অনেক ভুল করেছি কিন্তু তিনি ধমক না দিয়ে কাছে ডেকে নিয়ে বুঝাতেন। আমরা ছোটকালে আব্বার সমসাময়িক যে সকল মুরব্বি পেয়েছি তারা বলেছেন তোমাদের আব্বাকে আমরা ছোটকাল থেকে দেখে আসছি তিনি ছোটকাল থেকেই খুব অমায়িক ভদ্র সদালাপী ছিলেন। আমরা চার ভাই, তিন বোন। আমাদের বোনেরা আমাদের বাড়ীতে আসার সাথে সাথে জিজ্ঞেস করতেন, মাগো দামান্দ কয়দিন থাকার কথা বলেছেন এবং নির্ধারিত দিন ৯টায় যাওয়ার কথা থাকলে ৮ টায় বিদায় দিয়ে দিতেন আর বলতেন মাগো আল্লাহর হাওয়ালা এখন তুমি স্বামীর ঘরে আছো। স্বামীর মন মর্জির খেলাফ যেন কোনো কিছুতে না হয় একথা খেয়াল রেখো। আমি তোমাদের বাবা, তোমরা আমার বাড়ীতে যত বেশি থাকবে আমার আনন্দ শুধুই বাড়বে কিন্তু তোমাদের স্বামীর অখুশীতে আমি ১ ঘণ্টাও বেশি রাখতে রাজি নই। হ্যাঁ, দামান্দ খুশী মনে দিলে সারা বছরই আমার বাড়ীতে থাকো। আব্বা একজন স্বার্থক বাবা হিসেবে মেয়েদের সংসার জীবনে সুখকর হওয়ার ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থেকে তাঁর দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতেন। আমরা চার ভাইয়ের স্ত্রী সন্তানের নিয়মিত অবিভাবক হিসেবে খোঁজ খবর নিতেন, কোনো ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা, অসুস্থতা ইত্যাদি উপলব্ধি করলে সাথে সাথে তিনি নিজে থেকে সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা করতেন।

পাঁচ

আব্বা মেহমানদের খুব সেরা যত্ন করতেন। তাঁর সাথে বসিয়ে খাওয়াতেন, কোনো মেহমান রাতে আমাদের বাড়িতে থাকলে আমাকে দিয়ে বিছানা ঝাড়াতেন, প্রয়োজন মতো তিনি নিজে আমাকে দিয়ে বিছানার চাদর পরিবর্তন করাতেন, রুম পরিপাটি করার পর তিনি গিয়ে দেখতেন সব কিছু ঠিকঠাক মতো হয়েছে কিনা। চার্জার লাইট অথবা হারিকেন নিয়ে দিতে বলতেন, যাতে রাতে কারেন্ট চলে গেলে আর মেহমানের ওয়াশ রুমে যাওয়ার প্রয়োজন হলে কোনো প্রকার কষ্ট না হয়। আমাদের মেহমানদারী শিখাতেন তিনি সামনে বসে। কোনো দিন তিনি বাড়ীতে না থাকা অবস্থায় কোনো মেহমান এলে বার বার খবর নিতেন ঠিকমত মেহমানদারী হচ্ছে কিনা। তাঁর সফর সঙ্গী ড্রাইভারসহ অন্যরা বলতেন বাড়ীতে ঠিকমত মেহমানদারী হচ্ছে কিনা নিয়ে তিনি এক প্রকার অস্থির থাকতেন।

ছয়

আব্বা ছিলেন মুর্শিদকে মেনে চলার এক জীবন্ত নমুনা। ছাহেব কিবলার সামনে আব্বাকে যতদিন দেখিছি ততদিনই চূড়ান্ত বিনয়ী ভাবেই দেখেছি। আব্বা ছাহেব কিবলাহর সামনে হাজির থাকা অবস্থায় নির্ধারিত খাদিমসহ অন্যরা সামনে থাকলেও আব্বা-ই ছাহেব কিবলাহর প্রয়োজনীয় বা ইশারাকৃত জিনিস এগিয়ে দিতেন। ছাহেবজাদাদের মধ্যে বড় ছাহেব ও মেজ ছাহেব ছাড়া বাকি সবাই আব্বার ছাত্র হলেও আব্বা তাদেরকে এমন তাজিম ও সম্মান করতেন বুঝা যেতো তিনি ছাত্র আর উনারা তাঁর উস্তায। এমনকি ছাহেব কিবলাহর নাতিদের সাথে যে সম্মান প্রদর্শন করতেন তা এক বিরল উদাহরণ। অন্যদিকে ছাহেবজাদাগণ এবং নাতিরা আব্বাকে যে মায়া করতেন তার উদাহরণ বিরল। আর একারণে আব্বা হারানোর পর হতে উনারা সকলেই আমার খোঁজ খবর নিয়মিত নেন। আল্লাহ যেন এর বদলা উনাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে দান করেন। আব্বার রুমের দরজার সামনে একটা চেয়ার সব সময় উত্তরমূখী করে রাখা থাকতো। মাঝে মাঝে নীরবে লম্বা সময়ে চেয়ারে বসে থাকতেন। মনে প্রশ্ন জাগতো আব্বাতো তাসবিহ বা কিতাব হাতে না নিয়ে বসে সময় পার করেন না। একদিন তিনি বললেন বাবা, আমি অনেক সময় এভাবে নীরবে চেয়ারে এমনিতে বসি না। আমি উত্তর দিকে মুখ করে আমার ছাবের দিকে খেয়াল করে বসি, আমার অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যায় এবং আমি অনেক কিছু হাসিল করতে পারি। আব্বা কোনোদিন তাঁর মুর্শিদের বাড়ীর দিকে পা দিয়ে শয়ন করেননি। এমনকি ইন্তেকালের আগে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় চিকিৎসার সুবিধার্থে খাটের অবস্থান পরিবর্তন করায় কিছুদিন উত্তর দিকে পা দিয়ে শয়ন করতে হয়েছে। এজন্য তার খুব অনুশোচনা ছিল। মাঝে মাঝে বলতেন অপারগতার কারণে ছাবের শানে বেয়াদবী করে যাচ্ছি জানি না আল্লাহ আমার এ বেয়াদবী মাফ

করবেন কিনা। আব্বা কাউকে কোনো তালিম বা নসিহত দিতে গেলে এভাবে বলতেন ছাহেব কিবলাহ এভাবে তালিম দিতেন, এরপরে বলতেন অমুক কিতাবে বিষয়টা লিখা আছে। আব্বাকে কেউ হজ্জে বা ওমরায় পাঠানোর কথা বললে তিনি জবাবে বলতেন আমি তো যেতে ইচ্ছুক তবে ছাহেব কিবলাহর ইজাজত পেলে যাব নতুবা যাব না। ১৯৯৬ সালে আব্বা হজ্জের সফরে ছিলেন। মদীনা শরীফ একদিন থাকার পর ছাহেব কিবলাহর পক্ষ থেকে খবর পৌছলো ছাহেব কিবলার সিদ্ধান্ত মোতাবিক আব্বাকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে, তখন আব্বা মদীনা শরীফ আটদিনের বদলে একদিন থেকে দেশে চলে আসেন। নির্বাচনের পরে নির্বাচনী ব্যয় বাবত ঋণ পরিশোধের জন্য উপশহরে থাকা আব্বার একটি প্লট বিক্রি করতে হলো। শুভার্থী কেউ কেউ মনক্ষুন্ন হলেন। আব্বা তাদেরকে বললেন, জীবনে আল্লাহ আমাকে যত নিয়ামত দিয়েছেন, তা কেবল ছাহেব কিবলাহর কদমের বরকতে দিয়েছেন আর ছাহেব কিবলাহর হুকুম মানতে বা বাস্তবায়নে শুধু উপশহরের প্লট কেনো প্রয়োজনে আমার সমুদয় সম্পদ বিক্রি করে দেবো। বর্তমান সময়ে বলা যায়, আব্বা ছিলেন মুর্শিদকে মান্য করার এক বাস্তব নমুনা।

আব্বার জীবনের সর্বক্ষেত্রের স্মৃতিচারণ করলে বুঝা যায় তিনি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষকতা, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, তাসাউফ, ওয়াজ নসীহত সকল ক্ষেত্রে অনন্য কৃতিত্বের নজীর স্থাপন করে গেছেন। আর আমাদের জন্য রেখে গেছেন উৎকৃষ্ট ও অনুপম শিক্ষা। হে আল্লাহ! চলার পথে তাঁর জীবন থেকে পাওয়া আদর্শ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করো। আমীন।

লেখক: মুহাদ্দিস ছাহেবের চতুর্থ পুত্র।

আমার চোখে বাবা

সায়মা খাতুন

আমার আব্বা, সবাই যাকে মুহাদ্দিস ছাহেব নামেই জানে। আমি বাবা-মা এর কনিষ্ঠ সন্তান। আব্বা তাঁর সব সন্তানকেই ভালোবাসতেন। কিন্তু আমার সব সময়ই মনে হতো, তিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। আব্বা সব সময় চাইতেন তাঁর সন্তানগণ ইসলামী ও জাগতিক শিক্ষায় সর্বোচ্চ শিক্ষিত হয়ে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত থাকবে। আমরা হয়তো তাঁর সেই আশা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছি। তবে তাঁর পক্ষ থেকে চেষ্টার কোন কমতি তিনি করেননি। কেবল নিজের সন্তানগণ নয় বরং আমাদের দাদা এবং নানার বংশের সবাইকে ইসলামী শিক্ষায় পরিপূর্ণ শিক্ষিত করতে উনার আন্তরিক চেষ্টা সব সময় অব্যাহত ছিলো। ফলে আমাদের বংশ ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেক আলিম এবং হাফিযে কুরআন সৃষ্টি হয়েছেন, যারা নিজ নিজ পরিমণ্ডলে বিভিন্ন খিদমতে নিয়োজিত আছেন।

আব্বা সব সময় আমার সন্তানদের লেখা পড়ার খোঁজ খবর রাখতেন। কেবল আমি নয় বরং আমাদের সবাইকে সন্তানদের লেখা পড়ার প্রতি সর্বোচ্চ যত্নশীল থাকতে উপদেশ দিতেন। আমাদের সন্তানদের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলের সময় হলে তিনি অপেক্ষায় থাকতেন। ভালো ফলাফলের খবর শুনলে খুব খুশি হতেন। বিশেষ করে আমার ছেলে খুবায়ব এর বিভিন্ন সাফল্যের সংবাদ দিলে তাঁর চেহারা খুশিতে আলোকিত হয়ে যেতো।

আব্বা ছিলেন আমাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। যেকোন সমস্যা, রোগ শোক দেখা দিলে মনের মধ্যে একটি ভরসা থাকতো, আব্বা দুআ করলে ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে কেনো জানি অনেকটা ভীত হয়ে পড়েছি। তবে মনে ভরসা রাখি আব্বার রূহানী দুআ আমাদের মাথার উপর ছায়া হয়ে আছে।

গরীব অসহায় মানুষের প্রতি আব্বার দরদ ছিলো ভিন্ন মাত্রার। পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা গরীব তিনি সব সময় সবার খোঁজ খবর রাখতেন। কার ঘর নেই, কার ঘরে খাবার নেই, কার ঘরে বিবাহ উপযুক্ত কন্যা সন্তান রয়েছে ; এসব নিয়ে তিনি ভাবতেন। আমাদের জানার মধ্যে অনেকের সেমিপাকা ঘর করে দিয়েছেন। অনেকের সন্তানের লেখাপড়ার ব্যয়ভার মিটিয়েছেন। অনেক কন্যা সন্তানের বিয়ের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করেছেন। বিশেষ করে এতীমদের প্রতি তাঁর দরদ ও ব্যাকুলতা চোখে পড়ার মত ছিলো।

আব্বা সব সময়ই চরম ব্যস্ত সময় কাটাতেন। এত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি পরিবার এবং বাড়ির অন্যান্য পরিবারের যেকোন প্রয়োজনে সময় দিতেন। যেকোন প্রয়োজনে বাড়ির

সবাইকে নিয়ে বসে পরামর্শ করতেন। সবার কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিতেন। মূলতঃ আব্বার সম্পূর্ণ জীবনই ছিলো অনুসরণীয়।

আমাদের জন্য চরম আফসোস হলো মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে আমরা আম্মা-আব্বা উভয়কে হারিয়েছি। আল্লাহ তা'লা আমাদের আব্বা আম্মাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমাদেরকে তাঁদের দেখানো পথে জীবন পরিচালনার তাওফিক দিন।

লেখিকা: মুহাদ্দিস ছাহেবের কনিষ্ঠ মেয়ে।

তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ অভিভাবক

জুবায়ের আহমদ

শিশুকাল থেকে বেড়ে উঠার প্রত্যেক ধাপে যার স্মৃতি জড়িয়ে আছে, কোনটা রেখে কোনটা লিখবো সেটাই খুঁজে পাচ্ছি না। আমি শব্দহীন, আমি বাকরুদ্ধ। স্মৃতির সাগরে ডুব দিয়ে রিক্ত হাতে ফিরলাম শুধু অশ্রুসিক্ত নয়নে। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২, দিনের আলো শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইলমে নববীর যে মহান তারকা দুনিয়ার জিন্দেগী ত্যাগ করেন, তিনি আমার চাচা (মুহাদ্দিস ছাব)। যার স্নেহ-ছায়ায় আমার বেড়ে ওঠা। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে যার কাছে সময়ে অসময়ে আমরা আবদার করতাম, তিনি তা পূরণ করতেন আনন্দচিত্তে। উনার কোন প্রয়োজন হলে ভাতিজাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমাকে কাছে নিতেন, আর একথা বলতেন যে, আমাদের সবার মধ্যে তিনি আমাকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। তখন নিজেকে নিয়ে গর্ব হতো। আহ! আজ তিনি নেই। এতো দূরে যে, আর কোনো আবদার করতে পারবো না। কীভাবে মেনে নেই এই কঠিন সত্য।

আজ আমরা অভিভাবকহীন, ছায়া নেই মাথার উপর। ছোট বেলা থেকেই যিনি পরম মমতায় আমাদেরকে আগলে রেখেছিলেন, দুনিয়ার কোনো আচড় লাগতে দেননি, বুঝতে দেননি কোন কষ্ট, আজ আর তিনি আমাদের মাঝে নেই। পারিবারিক, সামাজিক সব গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাকে ডাকতেন এবং দিকনির্দেশনা দিতেন কীভাবে কী করতে হবে। উনার ব্যক্তিগত অনেক কাজে আমার উপর আস্থা রাখতেন। শেষ কয়েক বছর খুব কাছে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বিশেষ করে উনার যাবতীয় চিকিৎসার কাজে আমি কাছে থাকতাম। আত্মীয়-স্বজন যেকোন কাজে তাঁর পরামর্শ নিতেন। তিনি পারিবারিক সামান্যতম ছোটখাটো কোন কাজ করতে হলেও সবার পরামর্শ নিয়েই করতেন।

ক্ষুদ্র এ জীবনে আমি যতটুকু দেখেছি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সুন্নতে নববীর পরিপূর্ণ অনুসারী। আমার জীবনে যা শিখেছি উনার কাছ থেকে তার সবটুকু উনার সাথে উঠায় বসায়, উনাকে দেখে-দেখে। বিশেষ কোনো বয়ানের প্রয়োজন হয়নি কখনো। এতটাই আদর্শ জীবন পরিচালনা করতেন তিনি। কেউ তাঁর কাছে কোনো ইলমি বিষয়, কোন জিজ্ঞাসা নিয়ে গেলে তিনি খুবই খুশি হতেন।

ব্যক্তিগত একটা বিশেষ স্মৃতি তুলে ধরতে চাই। আমার কামিল ভাইবা পরীক্ষার তিন দিন আগে থেকে উনার সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলাম। পরীক্ষার দিন সকালে সফর থেকে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। গাড়িতে ভাইবা প্রসঙ্গে কথা উঠলে তিনি কিছু প্রশ্ন

জিজ্ঞেস করলেন, যেসব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল না তিনি বলে দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরলেন। যে প্রশ্নগুলো গাড়িতে তিনি আমাকে করেছিলেন পরীক্ষায় পরীক্ষক আমাকে হুবহু সেসব প্রশ্ন করলেন। কামিল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর যেদিন পাগড়ি বিতরণ করা হয় এর পরের দিন সকালে পাগড়ি নিয়ে উনার কাছে গেলাম। তিনি নিজ হাতে আবার আমাকে পাগড়ি পরিধান করিয়ে দিলেন। আমার কপালে চুমু দিয়ে ৫০০ টাকা হাদিয়া দিলেন।

২০১৭ সালের রমজান মাসে উনার পিত্তথলির অপারেশন হয়। তখন আমি সার্বক্ষণিক উনার খাদিম ছিলাম। হাসপাতাল থেকে ফিরে উনার দ্বিতীয় জামাতা মাওলানা ইমাদ উদ্দিন সাহেবের বাসায় কিছুদিন থাকলেন। একদিন ইফতারের পর তিনি শুয়ে ছিলেন হঠাৎ এমন অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন যে, ওনার চেহারা লাল হয়ে গেছে, পানি পড়ছে দুচোখ গড়িয়ে। এই অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম শারীরিক কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা। আমার প্রশ্নে মনোযোগ না দিয়ে একাধারে শুধু অশ্রু ঝরাচ্ছিলেন। আমার মনে হলো, হয়তো অপারেশনের কারণে উনার শারীরিক কোন সমস্যা হচ্ছে। অনেকবার জিজ্ঞেস করার পর একপর্যায়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কুত্তার সমানও নয়। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আমাকে দেখতে এসেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মত অধমের খবর নিচ্ছেন।' একথা শুনে আমি চমকে উঠলাম।

একদিন আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলেন। তিনি বললেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম যে বিশ্বের দশজন মানুষকে সিলেক্ট করা হয়েছে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। দশ জনের মধ্যে আমিও একজন। আর পরীক্ষক হচ্ছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দশজনের মধ্যে আমিই একমাত্র কামিয়াব হয়েছি।" এরপর সতর্ক করে বললেন, "আমার এই স্বপ্নটি কারো কাছে বলবে না। কথায় কথায় তোমাকে হঠাৎ বলে ফেলেছি।"

আজ তিনি ইহজগতে নেই। আমার মনে হয় এসব অজানা বিষয় সবার সামনে আসা উচিত। একজন মকবুল মানুষের এসব বিষয় আমাদের মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাব্বাত সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস করি।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছোটখাটো কোন বিষয় হলেও গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করতেন। সাধারণত যে সকল বিষয় আমাদেরকে ভাবায় না, তিনি ঐ সকল বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা এবং তাহকিক করতেন। ২০১৭ সালের অপারেশনের সময় উনার শরীরে রক্তশূন্যতার কারণে রক্ত দিতে হয়। উনার ব্লাড গ্রুপের সাথে আমার ব্লাড গ্রুপের মিল থাকায় আমি এক ব্যাগ রক্ত দেই। বাড়িতে আসার পর একদিন জিজ্ঞেস

করলেন, "মানুষের রক্ত পাক না নাপাক?" আমি বললাম, শরীরে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পাক, আর শরীর থেকে বের হয়ে গেলে নাপাক। পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে রক্ত দেয়ার জন্য তোমার শরীর থেকে রক্ত যে বের করলে ঐ রক্ত পাক না নাপাক? নাপাক রক্ত আমার শরীরে দিলে, ঐ রক্ত দেয়া জায়েয কি?" আমি নিরুত্তর হয়ে গেলাম। সাথে সাথে এই মাসআলা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, "আমি বলব কেন? তুমি একজন আলিম, কিতাব দেখো, মুতাআলা করো।" এরপর মাকতাবা থেকে 'জাদিদ ফিকহি মাসাইল' কিতাবটি নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। কিতাব নিয়ে এলে মাসআলাটি বের করে আমাকে ইবারত পড়তে বললেন। ইবারত পড়েও যখন বুঝলাম না তখন মাসআলার খোলাসা করে এক কথায় বললেন, "চিকিৎসার জন্য একজনের শরীরের রক্ত আরেকজনের শরীরে দেয়া জায়েয আছে।"

মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছোট-বড়, ধনী গরীব সকল মানুষকে খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং সম্মানের চোখে দেখতেন। একদিন এক মুরুব্বী ব্যক্তি বড়লেখা থেকে একটি বেল ওনার জন্য হাদিয়া হিসেবে নিয়ে এলেন। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ওই মুরুব্বী যখন তাঁকে হাদিয়া হিসেবে বেল ফলটি দিলেন তখন আমি অবাক হয়ে দেখলাম, তিনি বসা থেকে দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে বেলটি গ্রহণ করলেন। মুরব্বি ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর আমি কৌতুহল বশত জিজ্ঞেস করলাম, "উনি আপনার জন্য একটি মাত্র বেল নিয়ে এসেছেন আর আমি দেখলাম আপনি দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে তা গ্রহণ করছেন।" বললেন, "দেখো, ফলটি ধরেছে বড়লেখায় আর এটি আমার আল্লাহ আমার জন্য এই মুরুব্বির মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। মূলত এটি আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিয়া। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হাদিয়া এসেছে সেটা কি আমি বসে বসে গ্রহণ করব? আমি দাঁড়িয়ে এজন্য গ্রহণ করেছি যাতে আমার আল্লাহ খুশি হন এবং ওই মুরুব্বীও খুশি হন।" এই উত্তর থেকে তাঁর চিন্তার উচ্চতা ও খোদাভীরুতা স্পষ্ট বুঝা যায়।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমার প্রতি উনার প্রবল আস্থা ছিল। যখন কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হতো তখন আমাকে ডাকতেন এবং আমার সাথে পরামর্শ করতেন। শেষবারের মতো যখন তিনি লন্ডন সফরে যান তখন করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে সমগ্র বিশ্ব ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য দীর্ঘদিন সেখানে থাকতে হয়। দেশে ফেরার পর শারীরিক নানা সমস্যার কারণে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই ডা. আলমগীর চৌধুরীর শরণাপন্ন হই। সেই সময় থেকে উনার লিভারে বড় একটি সমস্যা দেখা দেয়। এরপর ঢাকায় আনোয়ার খান মর্ডান হাসপাতালে ডাক্তার মবিন খানের তত্ত্বাবধানে উনাকে নিয়ে এডমিশন হই। হসপিটাল থেকে যেদিন রিলিজ নিলাম সেদিন তিনি বললেন, "আমি

আজ রাত্রে হাফিজ আহমদ জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখেছি। তাই ঢাকা থেকে যাওয়ার আগে উনার যিয়ারত করতে চাই। এটা হয়তো আমার শেষ ঢাকা সফর। আর কোনদিন হয়তো উনার যিয়ারতের সুযোগ নাও পেতে পারি।" এ কথা শুনে মনে কষ্ট পাই কিন্তু উনার আদেশ তো মানতেই হবে, তাই আমরা যিয়ারতের ব্যবস্থা করি। এ সময় সাথে ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক ড. সৈয়দ শাহ এমরান সাহেব।

ঢাকা থেকে ফেরার পর উনার শারীরিক অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে যান। শয্যাশায়ী অবস্থায়ও ইলমে হাদীসের দারস দেয়া বন্ধ হয়নি। উনার দ্বিতীয় জামাতা মাওলানা ইমাদ উদ্দিন সাহেবের বাসায় থাকাকালীন সময়ে একদিন আমাদের মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল হযরত আল্লামা কমরুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী তাঁর ছেলে হাফেজ মাওলানা মারজান আহমদ চৌধুরীকে হাদীস শরীফের দারস দেয়ার অনুরোধ করেন। আমার মনে আছে, আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন বলেছিলেন, "আমার জীবনের প্রথম কোন বাবা তাঁর ছেলেকে হাদীস শরীফের সনদ দেওয়ার কথা অনুরোধ করছেন।" তিনি আমাকে নির্দেশ দেন যেন একটা সময় নির্ধারণ করে হাফেজ মাওলানা মারজান আহমদ চৌধুরীকে জানাই। এই দারসে অংশগ্রহণ করেছিলেন মুহাদ্দিস ছাহেব বড় ছাহেবজাদা মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল, হাফিজ মাওলানা মারজান আহমদ চৌধুরী, মাওলানা রেদ্বওয়ান আহমদ চৌধুরী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবু সালেহ কুতবুল আলম, মাওলানা মাসউদ আহমদ এবং আমি অধম। একটানা প্রায় সপ্তাহখানেক বুখারী শরীফ দারস দেন। উনার শারীরিক এই অবস্থা সত্বেও প্রতিদিন টানা দুই থেকে তিন ঘণ্টা দারস দিয়ে শেষ দারসের দিন সনদ প্রদান করেন। এছাড়া এ বাসায় বিভিন্ন তারিখে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত উলামা ও ছাত্রদেরকে মুসালসাল হাদীসের দারস দিয়েছেন। এভাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাদীসে নববীর খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন তিনি।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অওলাদে রাসুলগণকে কতটুকু তা'জিম করতেন তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একদিন উনার সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় কোন এক প্রসঙ্গে বলেন, "আমি ঢাকায় বিভিন্ন সফরে চিফ-জাস্টিস মরহুম সৈয়দ মাহমুদ হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বাসায় থাকার সুযোগ হতো। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। সৈয়দ মাহমুদ হোসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অভ্যাস ছিল তিনি তাঁর কানের লতির মধ্যে আতর মিশ্রিত তুলা রাখতেন। তিনি একদিন আমাকে আতর মিশ্রিত তুলা কানের লতির মধ্যে রাখার কথা বললেন। আমি বললাম, আমি তো তুলাটি যথাস্থানে ঠিকমত রাখতে পারি না, তাই আপনিই বরং আমার কানের মধ্যে রেখে দেন। এরপর তিনি আমার কান ধরে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে তুলাটি রেখে

দেন। এরপর আমি তাঁকে বললাম, আমি কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বিচার দেবো যে, আপনার এক আওলাদ আমাকে কান মলা দিয়েছেন। আমি আজ এর বদলা চাই। সৈয়দ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি বদলা চাইবেন? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবো আপনার এক আওলাদ আমাকে কান মলা দিয়েছেন এর বদলা হিসেবে আজ আমি শাফায়াত চাই। তখন সৈয়দ সাহেব বলেন, সারাজীবন বিছার খরিয়াও এক মোল্লার ফেসর লগে পারলাম না, আমারে দিয়া তুলা তোয়াইয়া এখন এর বিছার চায়।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব একদিন সফরে বের হলেন, ঐ দিন আমি উনার সফরসঙ্গী ছিলাম। যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে সৈয়দ হিফজুর রহমান মিশকাত সাহেবকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোথায় যাবেন?" সৈয়দ সাহেব বললেন, "আমি বিয়ানীবাজার যাব।" মুহাদ্দিস ছাহেব উনাকে মোহাব্বতের সহিত বললেন, "আমার গাড়িতে উঠেন, আমিও ঐদিকে যাব।" মুহাদ্দিস ছাহেব গাড়ির সামনের সিট থেকে নামলেন এবং সৈয়দ সাহেবকে সামনের সিটে বসার জন্য অনুরোধ করলেন। সৈয়দ সাহেবও সামনের সিটে বসতে অস্বীকৃতি জানালেন। আবার মুহাদ্দিস ছাহেবও সামনের সিটে বসছেন না আদবের খেলাফ হবে ভেবে। এক পর্যায়ে মুহাদ্দিস ছাহেব অনুরোধ করে বললেন, "আপনি সামনের সিটে বসলে আমি খুশি হব।" সৈয়দ সাহেব সেই অনুরোধ ফেলতে পারলেন না, তিনি সামনের সিটে বসতে বাধ্য হলেন। যাওয়ার সময় মুহাদ্দিস ছাহেব বিয়ানীবাজার খতমে বুখারীর দোয়া মাহফিলে শরিক হবেন। সৈয়দ সাহেবও মুহাদ্দিস ছাহেবের সাথে দোয়ায় শরিক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দোয়া মাহফিলে গিয়ে মুহাদ্দিস ছাহেব সৈয়দ সাহেবকে দোয়া করার অনুরোধ করলেন। তিনি চাইলেন সৈয়দ সাহেব দোয়া করবেন আবার সৈয়দ সাহেবও রাজি হচ্ছেন না। তখন মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমতুল্লাহি আলাইহি উনাকে একটি কাহিনী শোনালেন, তিনি বলেছিলেন, "একজন গরিব সৈয়দ সাহেবকে এক ব্যক্তি প্রতিদিন কিছু হাদিয়া প্রদান করতেন। আর সৈয়দ সাহেব ওই টাকা দিয়ে মদ পান করতেন, একদিন তিনি দেখতে পেলেন উনার দেয়া হাদিয়ার টাকায় তিনি মদ পান করছেন। তখন ওই ব্যক্তি সৈয়দ সাহেবকে হাদিয়া দেয়া বন্ধ করে দিলেন। এরপরে একদিন রাত্রে ওই ব্যক্তি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,তুমি তো আমার রক্তের এক ব্যক্তিকে হাদিয়া দিতে। কিন্তু হঠাৎ কেন হাদিয়া দেয়া বন্ধ করলে। পরের দিন ওই ব্যক্তি সৈয়দ সাহেবকে ডেকে এনে উনার কাছে মাফ চান এবং স্বপ্নের ঘটনাটি বলে দেন। আজকে যেহেতু আমরা এক আওলাদে রাসূলকে পেয়েছি তাই আজকের দোয়া অবশ্যই সৈয়দ সাহেব করবেন আর আমরা সবাই আমিন আমিন বলব।" এভাবেই তিনি আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আদব প্রদর্শন করতেন।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি যে শুধু মুহাদ্দিসই ছিলেন তা নয়, তিনি একজন আদর্শ অভিভাবক, সমাজসেবক এবং জনদরদী ব্যক্তিও ছিলেন। নিরবে নিভৃতে গরীব দুঃখীদের সাহায্য করতেন, সবসময় আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করতেন।

২০২২ সালের ১৫ই জানুয়ারি ফুলতলী ছাহেব কিবলার বার্ষিক ঈসালে সাওয়াব মাহফিলের পর থেকে উনার শারীরিক অবস্থার খুব বেশি অবনতি হতে থাকে। ইতিমধ্যে একটা স্বপ্ন দেখলাম, স্বপ্নটির বিবরণ মুহাদ্দিস ছাহেবকে অবহিত করলাম। তিনি ভূমিকা-উপসংহার ছাড়াই নির্দেশ দিলেন যেন উনার ইন্তেকালের সময় আমি উনাকে কালিমা পড়ে শুনাই। তিনি একটু বর্ণনা করে বললেন, "আমাকে কালেমা পড়ে শুনাবে, কারণ ঐসময় শয়তান ঈমান থেকে গাফেল করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। আর কালেমা না পড়ে আমি কবরে যেতে চাই না।"

অসুস্থতার সময় আমরা তিন ভাই সবসময় উনার খেদমতের সুযোগ পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ। সেই সুবাদে উনার জীবনের শেষদিন ভোর চারটা থেকে উনার খেদমতে ছিলাম। বিকাল তিনটা থেকে শারীরিক অবস্থার বেশ অবনতি হতে থাকে। সেই সময় থেকে উনার অসিয়ত মোতাবেক আমি কালিমা শোনাতে থাকি। আস্তে আস্তে সবাই জড়ো হন। ২০২২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬. ১০ মিনিটে যুগের শ্রেষ্ঠ নাকিব শায়খুল হাদীস ছাহেব ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মুহূর্তেই চতুর্দিকে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হতে থাকে। সেদিন পৃথিবীতে নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছিল। বুক জুড়ে কান্না কিন্তু কাঁদতে পারি না, গলায় কে যেন পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। মনে হচ্ছিল শূন্যতায় যেন ভরে গেছে পুরো পৃথিবী। উনার অসিয়ত ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোসল দেওয়ানো। তাই তাড়াতাড়ি আমরা গোসলের ব্যবস্থা করি। পরদিন জানাযার প্রস্তুতি নেওয়া হলো। ঐতিহাসিক ও নজীর বিহীন একটি জানাযা অনুষ্ঠিত হলো। প্রিয়জনকে হারানোর বেদনায় মানুষের হাহাকারে আকাশ বাতাস ভারী হল। উনার বিয়োগ ব্যথায় লাখো মানুষ অশ্রুসিক্ত হলো। পৃথিবীর দিকে দিকে মানুষের স্নেহ মমতা রেখে আল্লাহর এই মহান ওলী তাঁর মাওলার সান্নিধ্যে চলে গেলেন। অসিয়ত অনুযায়ী তাঁর প্রতিষ্ঠিত রারাই আল হাবীব জামে মসজিদের উত্তর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

তিনি একজন মুর্শিদ,আলেম, নবী প্রেমিক লেখক ছিলেন। অগনিত মসজিদ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা, পৃষ্ঠপোষক, হাদীস শরীফের উস্তায ও মুহাদ্দিস হিসেবে যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন, ঠিক তেমনি একজন পিতা, চাচা, দাদা কিংবা অভিভাবক হিসেবেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অসংখ্য মানুষকে বলতে শুনেছি, তাকেই তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তাহলে আমি নিজের ক্ষেত্রে যা ভাবি তা সবার ক্ষেত্রেই সত্য। এটা আল্লাহর ওলীর একটি

কারামত ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে গুণীজন মূল্যায়ন করবেন। তাদের কলমের ছোঁয়ায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠবে। তবে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অভিভাবক ছিলেন অকপটে এই সত্য প্রকাশ না করা আমার জন্য চরম নিমক হারামি হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি, তিনি আমাকে একজন যুগশ্রেষ্ঠ মাকবুল মুহাদ্দিস ছাহেবের ভাতিজা হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

লেখক: মুহাদ্দিস ছাহেবের ভাতিজা। শিক্ষক, হযরত শাহজালাল দারুসসুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, সিলেট।

কিছু স্মৃতি, কিছু অনুভূতি

সালওয়া জান্নাত লুৎফা

পৃথিবীতে এমন অসংখ্য মানুষ আছে যারা শুধু একটা ভালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে সম্মানিত, গৌরবান্বিত। আমিও তাদের মধ্যে একজন (আলহামদুলিল্লাহ)। হাদীস জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আমাদেরকে আলোকিত করেছেন। বলছি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান- মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর কথা। উনার স্পর্শধন্য পরিবারের অংশ হওয়ায় নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে হয়। কী এক বিশাল পাওয়া তা পরতে পরতে মনে নাড়া দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে এই জগৎ। উনার ভাতিজী হতে পারার সৌভাগ্য দান করেছেন মহান রব, শুকরিয়া জ্ঞাপন করি তাঁর প্রতি।

পরম শ্রদ্ধেয় চাচা, শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছেন প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেল। কিন্তু ওনার মায়া ভরা কণ্ঠ প্রতিটি মুহূর্তে স্মৃতির মনিকোঠায় ভেসে উঠে, মস্তিষ্কে সাড়া জাগায়। যিনি পুরোটা জীবন ইলমে হাদীসের খেদমতে উৎসর্গ করেছেন। যা আমাদের জন্য অনেক বড় নিয়ামত, অনেক বড় শিক্ষা। তিনি হাদীসে নববী চর্চার মাধ্যমে নিজের জীবনকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ অনুসারে সাজিয়েছিলেন। প্রতিটি কাজেই সুন্নাহ অনুসরণ করতেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি সমাজ ও জাতিকে নববী আদর্শ শিখিয়েছেন, শিখিয়েছেন নবী প্রেম, মহব্বত, শ্রদ্ধা।

যার নূরানী চেহারা দেখলে মুমিন হৃদয়ে নবী প্রেম জাগ্রত হতো। তিনি যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতেন ঠিক তেমনি তাঁর কোন নিদর্শনকে খুবই ভালোবাসতেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না'ল মোবারকের (পাদুকা) নকশা করা একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় বসে ছিলেন। তখন গায়ের চাদরের দিকে ইঙ্গিত করে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই নকশাটি চিনতে পারছো'? আমরা বললাম, 'জি এটা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাল মোবারকের নকশা'। তিনি বললেন, 'চাদরটা অনেক ছোট। এই চাদরটি মিশরের সৈয়দ সাহেব আমাকে হাদিয়া দিয়েছিলেন। একদিকে চাদরটা সৈয়দ সাহেবের দেয়া হাদিয়া, অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না'ল মোবারকের বরকত হাসিল করার জন্য চাদরটা ছোট হওয়া সত্ত্বেও আমি পরিধান করি'। এরপর তিনি বসা থেকে উঠে গিয়ে দুইটা না'ল মোবারকের নকশা বের করে আমরা দুই বোনকে দিয়ে বললেন, 'এগুলো সাথে রাখার চেষ্টা করবে। না'ল মোবারকের নকশা সাথে থাকলে আল্লাহ তায়ালা বিপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করেন'। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের না'ল বা পাদুকা শরীফের মুগ্ধতায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল মুকরী (ওফাত: ১০৪১ হি.) প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত বিশাল একটি কিতাব প্রণয়ন করেন। কিতাবটির নাম- 'ফাতহুল মুতাআল ফি মাদহিন নিয়াল'। মরক্কোর বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং ধর্মবেত্তা ইমাম ইবন রুশাইদ আল-ফিহরি (৬৫৭-৭২১ হি.) না'ল শরীফের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে লিখেন-

هنيئًا لعيني إن رأت نعل أحمد فيا سعد جدي قد ظفرت بمقصد

وقبلتها أشفي الغليل فزادني فيا عجبًا زاد الظما عند مورد

প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো তরিকা অনুসারে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব ব্যক্তিগত জীবনে খুবই পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন ছিলেন এবং পরিছন্নতাকে ভালবাসতেন। তিনি কথাবার্তা ও চলাফেরায় খুবই সৌখিন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। পরিচিত অপরিচিত সকল মানুষকে সম্মানের চোখে দেখতেন। সবসময় তিনি আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেন, "গতকাল সফর থেকে আসার সময় রাস্তায় একটি পাগলকে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখতে পেলাম। ঐ পাগলকে দেখে কেমন জানি আমার হৃদয়ে নাড়া দিল। এত ঠান্ডার সময় বস্ত্রহীন অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। আল্লাহ চাইলে মানুষকে কত ভাবে সৃষ্টি করতে পারেন। ঐ পাগলকে আল্লাহ তায়া'লা হাত, পা, নাক, মুখ সবকিছু দিয়ে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন। বাহ্যিক ওর কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু কত অবহেলিত জীবন। আল্লাহ আমাদের সমানভাবে সৃষ্টি করেও কত সম্মান দিয়েছেন। যদি আমরা জীবনভর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি তাহলে কি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হবে"?

এরপর তিনি বলেন,"প্রত্যেক শিশু নিষ্পাপ অবস্থায় এই দুনিয়াতে আগমন করেছে। এরপর মা- বাবার প্রভাবে মুসলিম অথবা অমুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করে। আমরা যে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি এজন্য যদি সারা জীবন সেজদায় লুটিয়ে শুকরিয়া আদায় করি তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

অর্থাৎ, প্রত্যেক নবজাতকই ফিতরাতের উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা বা মাজুসী (অগ্নিপূজারী) রূপে গড়ে তোলে। যেমন-চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে কোন (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও"? (বুখারি-১৩৫৯, মুসলিম- ২৬৫৮)।

এখনো প্রতিদিন সকালবেলা উনার পড়ে থাকা খালি চেয়ারখানা দেখে বড়ই আফসোস হয়। হায়! যদি এই মোবারক চেহারাটা দেখতে পারতাম, শুনতে পারতাম মমতাভরা, মায়ামাখা কথাগুলো! উনি যখন বাড়িতে থাকতেন, কত মানুষের আনাগোনা থাকতো, ভীড় থাকতো। আমাদের হক আদায় করার পরেও বাড়িতে আসা মেহমানদের যথেষ্ট সময় দিতেন, দেখা করতেন, মাহফিল করতেন।

প্রতিদিন ফজরের পর আমি এবং আমার ছোট বোন উনার সাক্ষাতে চলে যেতাম। দেখতাম হয়তো উনার হাতে কিতাব আছে না হয় তাসবীহ। একটা মুহূর্ত তিনি অযথা কাটাতেন না। আমরাও দেখে দেখে শিখতাম কীভাবে সময়কে কাজে লাগাতে হবে। আবার কখনো কখনো দেখতাম উনি হাঁটাহাঁটি করছেন। তখন মনে হতো তিনি তাসবীহ বা কিতাব না পড়ে সময় নষ্ট করছেন। হয়তো তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলান, তাই সংশয় দূর করার জন্য নসীহত করেছিলেন, "তোমরা ভোরবেলা হাঁটাহাঁটি করবে, কারণ ভোরের বাতাস স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, ভোরের বাতাসের মধ্যে হাজার রোগের শিফা রয়েছে"। সাথে সাথে সুন্দর একটা কথা যোগ করেছিলেন- "দিন কা বালিশ, রাত কা চালিশ, ভোর কা হাওয়া...। যা আমার মনে মুক্তার মতো গেঁথে রয়েছে, এখনো মনে পড়ে উনার মুক্তোমাখানো বাণীগুলো।

তিনি যখন ফ্রি থাকতেন, দীর্ঘ সময় কাছে বসার সুযোগ হতো আমাদের। উনার প্রতিটি কথা, ইশারা ছিল আমাদের জন্য শিক্ষা। কথার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন নসীহত করতেন। লেখাপড়ার বিষয়ে অনুপ্রেরণামূলক কথা সবসময়ই বলতেন। উনার ছাত্র জীবনে পড়াশোনার জন্য কঠোর পরিশ্রমের গল্প আমাদেরকে শোনাতেন। বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী শোনাতেন, পড়তে বলতেন। এসব কথা আমাদেরকে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী করে তুলতো বহুগুণ। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্য উৎসাহিত করতেন। পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হলে তিনি অনেক খুশি হতেন।

ক্লাসের পড়ার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার প্রতি তাগিদ দিতেন। বিশেষভাবে আরবি ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি অনেক খুশি হতেন, কখনো সরাসরি উত্তর দিতেন আবার কখনো সংশ্লিষ্ট কিতাবাদি পড়ার নির্দেশ দিতেন। পারিবারিক আলোচনা থেকে এসবই বেশি হতো আমাদের মাঝে। তা থেকে বুঝতে পারতাম, এই পরিবারের অংশ হতে পেরে কতই না ভাগ্যবতী আমি। এমন একজন মানুষ পাশে থাকলে জীবন সুন্দর হওয়ার জন্য আর কিছুই লাগবে না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর প্রতিষ্ঠিত দারুল কিরাতের বদৌলতে অনেক ছোট বয়সে দারুল কিরাত পড়া শেষ করি। কিন্তু তাজবীদ নিয়ে কিছু বিষয় অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছিল, ভালো করে পড়া হয়নি তখন। কেননা, পরিপক্ক জ্ঞান

হয়নি সেই সময়। একদিন মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরকে أَعْجَمِيًّا শব্দের তিলাওয়াত নিয়ে প্রশ্ন করতে মনস্থ করলাম। কিন্তু ভয় হচ্ছিল যদি বলেন যে, আমি ক্বারিয়ানা পাশ করেছি, তখন কেন শিখলাম না। এসব সংশয় দূর করে একদিন সাহস করে প্রশ্নটা করেই ফেললাম। তিনি খুবই আগ্রহ সহকারে বিষয়টি এতো সহজে বুঝিয়ে দিলেন। সেদিন থেকে উনাকে প্রশ্ন করতে আর ভয় করতো না।

তিনি আমল-আখলাক সংশোধনের উপর বেশ গুরুত্ব দিতেন। নিয়মিত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, ইস্তেগফার, দরুদ শরীফ এবং বিভিন্ন তাসবীহ এর প্রতি তাগিদ দিতেন। শুক্রবারে সূরা কাহাফ এবং সূরা মুজাম্মিল তেলাওয়াতের নির্দেশ দিতেন। দরুদ শরীফ বেশি করে পাঠ করার নির্দেশ দিতেন এবং দরুদ শরীফের বিভিন্ন ফজিলত বর্ণনা করতেন। তিনি বলতেন, "দরুদ শরীফ বেশি করে পাঠ করা দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য মঙ্গলজনক, দরুদ শরীফ বেশি করে পাঠ করলে জেহেন পরিষ্কার হয়। তাই কমপক্ষে রোজ ৩০০ বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে"।

তিনি ইলমে হাদীসের একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন যা শুরুতেই উল্লেখ করেছি। পুরোটা জীবন ইলমে হাদীসের দারস-তাদরিসে কাটিয়েছেন। জীবনের শেষ সময়টাতে তিনি বাংলাদেশর গৌরবময় দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুননাজাত মাদ্‌রাসার শিক্ষক-ছাত্রদের হাদীসের সনদ প্রদান করেছিলেন খুবই আগ্রহ নিয়ে। আমরা কষ্ট হবে মনে করে যখন উনার সাথে কথা বলতাম না, শারিরীক অবস্থা যখন নাজুক, তখন তিনি অবলীলায় হাদীসের দারস দিয়ে গিয়েছেন। যা আমাদের অবাক করতো! একজন মানুষ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি কতটুকু ভালোবাসা দেখাতে পারেন। আর আমরা এতো গাফেল!

অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি বাইরের মানুষদেরকে হাদীসের দারস দিচ্ছেন দেখে আমাদের মনে হলো, ঘরের মানুষ হয়ে এই মহামূল্যবান দারস থেকে মাহরুম হওয়া ঠিক হবে না। তাই শেষ সময়ে উনি যখন শয্যাশায়ী ছিলেন তখন আমরা হাদীস শরীফের দারসের আবদার করি। তিনি এত অসুস্থ ছিলেন যে, আমরা ভাবছিলাম না করে দেবেন। কিন্তু হাদীস শরীফের দারসের কথা শুনে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন। আমাদের বড় ভাইয়েরা সবকিছুর ব্যবস্থা করে আমাদেরকে দারসের সুযোগ করে দেন। কিন্তু সমস্যা হয়েছিল যে, দারসের জন্য যে দিনটি নির্ধারণ করা হয় সেদিন উনার শারীরিক অবস্থা এত খারাপ ছিল যে, তিনি বসতে প্রায় অক্ষম। হাদীসে নববীর প্রতি আদব দেখিয়ে তিনি বললেন, "শুয়ে শুয়ে হাদীস শরীফের দারস দেবো এটা আদবের খেলাফ হবে।" তাই উনাকে বসানোর জন্য আদেশ করলেন। এরপর তিনি কষ্ট করে বসে দারস শুরু করলেন। আমরা তো অবাক হয়ে তাকিয়েই ছিলাম। শুরুতে তিনি বললেন, "হাদীস শরীফ শিক্ষাদানের সর্বোত্তম পন্থা হলো উস্তায হাদীস বর্ণনা করবেন আর ছাত্র শুনবে।

কিন্তু আমি তো অক্ষম, তাই তোমরা একজন একজন করে হাদীস পড়ো আর আমি শুনবো"। সেদিন তিনি বুখারী শরীফ থেকে হাদীসের দারস দিয়েছিলেন। এই দারস শেষে তিনি আমাদেরকে সনদ এবং ইজাযাত দিয়েছিলেন।

একটা ঘটনা বলে শেষ করি। যে সফরে উনি অসুস্থ হয়েছিলেন অর্থাৎ উনার শেষ সফরে যাচ্ছিলেন, সেদিন রীতিমতো উনার কাছে সকালে উপস্থিত হই। তবে সেদিন একটু দেরি হয়েছিল। তিনি অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। সালাম দিতেই স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন, "তোমরা আসছ? আমি তো তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি। আমি চার-পাঁচ দিনের জন্য সফরে যাচ্ছি। তাই তোমাদের সাথে এই চার-পাঁচ দিন আর দেখা হবে না। তোমাদেরকে না দেখলে আমার তোমাদের জন্য টানবে, আবার তোমরাও আমাকে না দেখলে আমার জন্য তোমাদের ও টানবে।" এই কথা শোনার পর বুঝতে পেরেছিলাম যে, তিনি কোনো কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছেন। কিন্তু তখন পরিষ্কার বুঝতে পারিনি কিছুই। জ্ঞানের স্বল্পতা যাকে বলে। তিনি এই সফরে যাওয়ার জন্য গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এর মাঝেই অনেক সময় দিয়েছিলেন আমাদেরকে। এই সফরেই তিনি অসুস্থ হন। উনার হঠাৎ এই অসুস্থতা সবার কাছে অবিশ্বাস্য ছিল। বিশেষ করে আমার আব্বা অনেক ছটফট করছিলেন। তাই আব্বাকে নিয়ে আমরা সিলেট চলে গেলাম উনাকে দেখতে। প্রথমে আমাদেরকে দেখার পর চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে যা বলেছিলেন তা আজও মনে হলে আঁতকে উঠি! তিনি আবেগমাখা কণ্ঠে বলেছিলেন, "আমার এই দুইটা মেয়ে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার মুখ না দেখলে তো তারা শান্তি পায় না। এখন এদের কী হবে!" এরপর আফসোস করে বললেন, "তোমাদের বাবাও তো অসুস্থ। তাকে নিয়ে আসার কী দরকার ছিল! আমি তো কিছুদিন পরে এমনিতেই বাড়িতে ফিরব ইনশাল্লাহ।"

উনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়িতে ফেরার সময় আবার চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, "যাও আল্লাহর হাওলা, আল্লাহ ছাড়া তোমাদেরকে রেখে যাওয়ার মতো আমার আর কোনো মুরুব্বি নাই। আর আমাকেও আল্লাহর হাওলা করে যাও।" তখন আবার মনে একটা নাড়া দিল, উনি হয়তো কোনো কিছুর ইশারা দিচ্ছেন। অসুস্থতার সময় তিনি এই কথাটি প্রায়ই বলতেন।

যেদিন উনাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো সবাই দেখার জন্য ভীড় করেছিলাম। সবার চোখে পানি দেখে তিনি নিজেও চোখের পানি ছেড়ে বললেন, "আল্লাহর হুকুমের উপর সবাই সন্তুষ্ট থাকো। আল্লাহ আমাকে এতদিন অনেক দেশ বিদেশ ঘুরিয়েছেন এবং নানা ধরনের খাবার খাওয়াইছেন। এখন মহান আল্লাহর মনসা আমার হাঁটাচলা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং রিযিক সংকীর্ণ করেছেন। আমি চাই যে আমার অসুস্থতার বদৌলতে আল্লাহ যেন আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।"

তিনি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাকওয়ার উপর অটল ছিলেন। যেকোনো পরিস্থিতিতে তিনি আল্লাহর আদেশ পালন করতেন। শারীরিক অবস্থা যতই নাজুক হোক না কেন, তিনি আল্লাহর হুকুম ছাড়তেন না, অবহেলা করতেন না। তিনি আজীবন কিতাব প্রেমিক ছিলেন। শয্যাশায়ী অবস্থায়ও দেখতাম প্রায়ই কিতাব হাতে নিয়ে শুয়ে আছেন। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার শারীরিক এই অবস্থার মধ্যেও কিতাব পড়তে পারেন? তিনি বললেন, "আগের মতো কিতাব পড়ে এখন আর বুঝি না, চোখেও দেখি না। সারাজীবনের অভ্যাস তাই হাতে নিয়েছি।" হাতের কিতাবের দিকে ইশারা করে বললেন- "এক মাওলানা সাহেব এইমাত্র কিতাবটি হাদিয়া দিয়ে গেলেন তাই কিতাবটি এখনো দেখা হয়নি।" এমনই ছিল আমাদের সাথে আমাদের সবার মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের কাটানো সময়। পরিবারের মানুষ থেকে হাদীসপ্রেমী মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন, সময় দিতেন। কিন্তু আমাদেরকে কখনো কোনোভাবে অসন্তুষ্ট করেননি। ইলমে হাদীসের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র ২০২২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি আমাদেরকে ছেড়ে আপন রবের সান্নিধ্যে পাড়ি জমান। মহান আল্লাহ তাঁর এই প্রিয় বান্দার দরজাকে বুলন্দ করুন। আমাদেরকে উনার যোগ্য উত্তরসূরি এবং তাঁর জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

লেখিকা: মুহাদ্দিস ছাহেবের ভাতিজী। শিক্ষার্থী, মাস্টার্স - আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদ্‌রাসা, সিলেট।

যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীর সান্নিধ্যে শেষ কয়েক মাস

মাহফুজ আহমাদ মিনহাজ

উস্তাযুল উলামা, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর স্নেহের কনিষ্ঠ ভাতিজা আমি। তিনি আমার বাবা অধ্যক্ষ মাওলানা শুয়াইবুর রহমান হাফিযাহুল্লাহ এর সহোদর বড় ভাই। সেই সুবাদে বাল্যকাল থেকে চাচার আদর পেয়ে কাছে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। বছরের বেশিরভাগ সময়ই তিনি দেশ-বিদেশে দারস-তাদরীস, ওয়াজ-নসীহত ইত্যাদিতে খুবই ব্যস্ত সময় কাটাতেন। তাই একান্তভাবে তাঁর সান্নিধ্যে সময় কাটানোর সুযোগ তেমন একটা পাইনি।

দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হওয়ার পর থেকে ছুটির সময় বাড়িতে অবস্থানকালে সুযোগ পেলে তাঁর সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করতাম। আমার ছোট্ট জীবনে প্রেরণার সবচেয়ে বড় উৎস ছিলেন মুহতারাম চাচা। মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের সাত ভাইয়ের মধ্যে আমার আব্বা সপ্তম, আর আমি আমার বাবার কনিষ্ঠ সন্তান। অর্থাৎ, এই বংশে আমাদের প্রজন্মে আমিই সর্বকনিষ্ঠ। তাই আমি মায়া-মমতার ভাগ একটু বেশিই পেয়েছি সবসময়।

আমার শিক্ষাজীবন শুরু হয় স্কুলে পড়ার মাধ্যমে। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম পর্যন্ত স্কুলেই পড়ি। শার্ট-প্যান্টই ছিল আমার নিত্যদিনের সঙ্গী। চাচার একান্ত ইচ্ছায় আমাকে স্কুল থেকে মাদ্‌রাসায় স্থানান্তর করা হয়। এতোদিন যাকে স্কুলের পোশাকে দেখতেন তাকে মাদ্‌রাসার লেবাসে দেখে যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন। দেশে বা বিদেশে যেকোনো যায়গায় থাকেন না কেন পড়ালেখার খবর ঠিকই নিতেন। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলে কখনো হাদিয়া দিয়ে আবার কখনো অনুপ্রেরণা দিয়ে পড়ালেখার প্রতি উৎসাহিত করতেন। ২০১৪ সালে জেডিসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলেও সামান্য পয়েন্টের জন্য 'A+' পাইনি। ফলাফলের খবর প্রথমেই তাঁকে জানালে খুশির সাথে সাথে আফসোসর সুরে বলেছিলেন, "ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়লে সামনে ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবে।"

২০১৫ সালে দাখিল নবম শ্রেণিতে ভর্তি করার জন্য দারুননাজাত স্থানান্তরিত করা হলো। সেখানে কিছু দিন অবস্থান করার পর আমার মুহতারাম চাচা সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় অনুধাবন করতে পারি। এতদিন যাকে শুধু চাচা হিসাবে চিনতাম আস্তে আস্তে তাঁর আসল পরিচয় জানতে শুরু করি। ছুটিতে আসলে বেশি সময় তাঁর সান্নিধ্যে থাকার চেষ্টা করতাম। প্রতিটা সময় কিছু না কিছু শিখাতেন। সময় গড়িয়ে যখন দাখিলের ফলাফল প্রকাশ হলো প্রতিবারের মতো তাঁকেই আগে জানাই। উনার শারিরীক অবস্থা তখন

নাজুক ছিল। আমার A+ পাওয়ার খবর শুনা মাত্র তাঁর চেহারায় পরিবর্তন আসলো। খুশিতে বিছানা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। আফসোসের সুরে জানালাম গোল্ডেন মিস হয়েছে অল্পের জন্য। উৎসাহ দিয়ে বললেন, "শুকরিয়া আল্লাহর দরবারে গোল্ডেন না হোক A+ তো পেয়েছো। আজ থেকে নিয়ত করো সামনের পরীক্ষায় গোল্ডেন পেতে হবে, তুমি চেষ্টা করো সেই সাথে আমিও দুআ করি।" রাব্বে কারিমের দরবারে শুকরিয়া আলিম জামাতেও A+ পেয়েছিলাম। ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সময়ে চাচা ছিলেন জকিগনজ মাদ্‌রাসার মাহফিলে। বহুবার কল করে তারপর জানাতে সক্ষম হই। বাড়িতে ফেরার পরে আল-হাবীব জামে মসজিদের সামনে আছরের নামাযের উদ্দেশ্য দুইজন দুই দিক থেকে এসে সামনাসামনি দেখা হলে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার খবর শুনে দিল বড় খুশ হইছে।" তারপর সাথে সাথেই বলেছিলেন, "দাখিলের ফলাফলের পরে না বলেছিলাম ভালো ফলাফল করবে, দেখেছো, আল্লাহ কবুল করেছেন।" এর থেকে সুন্দর কথা আর কী হতে পারে!

আমি আলিম বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করছি তিনি তা জানতেন না। আলিম পরীক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয় কোচিং এ ভর্তি হই। তখন রমজান মাস ছিলো। আমি দুই দিন আগে জানাই যে, আমি ঢাকা চলে যাবো। বিস্তারিত জানতে চান কীভাবে কী করা হবে। এটা বুঝতে উনার আর বাকি রইলো না যে, আমি জেনারেল জ্ঞানের লাইনে স্থির হতে চাইছি। অনুমতি চাইলে তাঁর মাঝে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই। তিনি অনুমতি দেন কিন্তু তা কেমন জানি মনে হচ্ছিল। আমার মনে খটকা লাগার পর পরিবারের সবাইকে জানালে সবাই চাচার খুশি মনে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকলেন। তিনি আমাকে কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিলেন না। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কোচিং ক্লাসের সময় কাছাকাছি চলে আসে। একদিন তারাবিহ নামায শেষে ঢাকা যাওয়ার উদ্দেশ্যে রেডি হয়ে চাচার কাছে হাজির হলাম। সালাম কুশলাদি বিনিময় করার পরে কাতর কণ্ঠে উনাকে বলেছিলাম, "আমি রেডি হয়ে ঘর থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি। এই যে দেখুন আমার পিঠে ব্যাগ। এখন আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তবেই আমি ঢাকা যাব, না হয় এখান থেকেই আবার ঘরে ফিরবো।"

আমার এমন কথা শুনে উনার মুখে খুশির বন্যা বয়েছিল যা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। কিছু সময় চুপ থেকে বললেন, "আল্লাহর হাওলা, তুমি ঢাকা যাওয়ার চিন্তা বাদ দাও, ইলমে দ্বীনকে অন্য সকল জ্ঞানমালার উপরে প্রাধ্যান্য দাও এবং এ পথেই থাক।" ব্যাস! আমার জীবনের চিত্রপট পরিবর্তিত হয়ে গেল নিমেষেই। সবচেয়ে মূল্যবান কথা বলেছিলেন, "দেখো, আল্লাহপাক আমাদের কলবকে এক জায়গায় রেখেছেন, ব্রেইনকে এক জায়গায় এবং পেটকে এক জায়গায় রেখেছেন। তোমার ক্ষেত্রে হয়েছে কি, এই তিনটা এক হয়ে গেছে।" তারপর চাচা বলেন, তিনি কামিল পর্যন্ত

রিযিকের কোন চিন্তা ই করেন নাই। আল্লাহ সুখে রেখেছেন আজীবন। নির্দেশ দিলেন- 'যাও, ঘরে ফিরে যাও'। চাচার কথা অমান্য করিনি। বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক চিন্তা বাদ দিয়ে দারুননাজাত মাদ্‌রাসায় অনার্সে ভর্তি হই।

বিশ্ব ব্যাপী করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার কিছু দিন আগে তিনি লন্ডন সফরে যান। দেশে দেশে লকডাউন ঘোষিত হলে তিনি সেখানে আটকা পড়েন। অনার্সে ভর্তির কিছুদিন পর কোভিড এর কারণে মাদ্‌রাসা বন্ধ হয়ে যায়। বাড়িতে চলে আসি। নিয়মিত মোবাইলে তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখি। কথা বললে বুঝা যেতো তিনি লন্ডনে আছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর মন পড়ে আছে বাড়িতে। ফ্লাইট বন্ধ থাকায় দেশে ফিরতে পারছেন না। লকডাউন কিছুটা শিথিল হলে সীমিত পরিসরে লন্ডন সিলেট ফ্লাইট চালু হয়। এসময় তিনি দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। আলহামদুলিল্লাহ! নির্ধারিত তারিখে তিনি বাড়িতে পৌঁছেন।

প্রতিদিন সকালে উনার খিদমতে যেতাম। দেখতাম তিনি বারান্দায় উত্তরমুখি হয়ে বসে তিলাওয়াত করছেন নতুবা কোন কিতাব পড়ছেন। প্রায় সময় আমি খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে নিয়ে পারিবারিক গোরস্থানে যিয়ারতে যেতেন। চলার পথে হাঁটতে হাঁটতে এমন কিছু কথা বলতেন যাতে নতুন কিছু জানা হতো। একবার সকালে একরকম আফসোসের সুরে বললেন যদি আমার বাড়ির উঠানে কোন লাউ গাছ বা শাকসবজি থাকতো তাহলে সকাল বেলা বের হয়ে দেখতে পারতাম। মনে মনে তৈরি হই চাচার ইচ্ছে পুরণ করার জন্য এবং পরদিনই তাঁর উঠানে উত্তর পাশে লাউ গাছ লাগাই এবং মাচা তৈরি করে দেই। যতটুকু সময় কাজ করতাম তিনি আমার সাথে সাথে থাকতেন, কখনো চেয়ার বসে বসে কাজ দেখতেন, আবার কখনো সাথে সাথে হাঁটতেন। সবুজ শাকসবজির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অন্যরকম। কয়েকদিন পরে ভালো ফলনও হয়। ভোরবেলা দেখা যেতো মাথায় সবুজ পাগড়ী এক হাতে তাসবীব আর অপর হাতের লাঠি দিয়ে লম্বা হওয়া লাউ শাকের ডগাকে উপরে তুলে দিচ্ছেন, এই দৃশ্য এখনো হৃদয়পটে ভেসে ওঠে।

সারা জীবন তিনি দাওয়াতি মাহফিলে তালিম তরবিয়ত দিয়ে সময় কাটিয়েছেন। প্রতি সপ্তাহে ২-৩ দিনের জন্য সফর থাকতো। সফরের সিরিয়াল জেনে আগেভাগে বিদায় দেয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকতাম। প্রতিবারের মতো ২০২১ সালের আগস্ট মাসের একটি সফর সম্পর্কে নিজে থেকে অবগত করেন। ফজর পরেই উনার সাক্ষাতে হাজির হই। সেদিনও সেই চিরচেনা রূপে ছিলেন। মাথায় সবুজ পাগড়ী এবং হাতে কিতাব। কিছুক্ষণ কথা বলার পর বললেন, "এবারের সফরটা আমার একটু দীর্ঘ হতে পারে। সবাইকে দুআ করতে বলবে।" ঠিক তার পরেই বললেন, "তোমাদের একজন ভাতিজা দুনিয়ায় আগমন করেছে। আমি তার নাম 'হাসসান আল হাবীব' রাখব ইনশাআল্লাহ। আমার মন

বলছে, আমার এই নাতি আমাকে নিতে আসছে। হয়তো আমার সময় শেষ হয়ে আসছে।" বিস্ময়ের কথাগুলো শোনে খানিকটা হারিয়ে গেলাম। সকাল ১১ টার দিকে বাড়ি থেকে প্রস্থান করলেন। মেহমান হলেন সিলেট শহরে তাঁর বড় মেয়ের বাসায়। দিনটি ছিল মুহাররাম মাসের ১০ তারিখ আশুরা। রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত সুস্থ ছিলেন। মধ্য রাতে তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য মিসওয়াক করতে ওয়াশ রুমের দিকে রওয়ানা হলে তখনই শারীরিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং সোজা অবস্থান থেকে ফ্লোরে লুটিয়ে পড়েন। পড়ে যাওয়ার শব্দ শোনে মুহূর্তে সবাই জড়ো হন। শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় পরদিন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেদিনই তিনি দাঁড়ানোর সক্ষমতা হারান। হাসপাতাল থেকে উপশহরস্থ তাঁর মেজো মেয়ের বাসায় অবস্থান করেন। দুর্ভাগ্যবশত রাতে হাজত সারতে যাওয়ার পথে আবারো পড়ে যান। সমস্যার পরিমান বেড়ে যায় এবং খুব দ্রুতই নিজে নিজে বসার সক্ষমতা হারান। স্বাভাবিকভাবেই শারীরিক অবস্থা অবনতির দিকে যেতে থাকে। একদিন সন্ধ্যায় খবর আসে শারীরিক অবস্থা বেশি খারাপ। আমরা যোগাযোগ করার মতোও কাউকে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছিল যেকোন সময় দুঃসংবাদ পেতে পারি। তখন রাত আটটা, আমরা সবাই বাড়িতে। রওয়ানা হই তাঁর সাথে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে। আমরা পৌঁছাতে পৌঁছাতে শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। এতরাত করে প্রিয় মানুষগুলো দেখে বিস্ময়ের সুরে শুকরিয়া আদায় করেন। অবাক কণ্ঠে জানতে চাইলেন, এই সময়ে আমরা কেন? আমরা জানান দিলাম তাঁর শারীরিক অবস্থার খবর শোনে এসেছি। বাড়িতে অসুস্থ আব্বা তাঁর কঠিন অবস্থার কথা শোনে পেরেশান ছিলেন। আব্বাকে চাচার সাথে ভিডিও কলে কথা বলিয়ে দিই। আব্বা ভিডিও কলে চাচাকে দেখে কেঁদে একাকার। চাচা তাকে সান্তনা দিলেন। বললেন, "শুয়াইব আমার বেমার তোমারে কে কইলো? ওউ দেখো আমি সুস্থ পুরোপুরি। আমার তুড়া বেমার, ভালা অইলে বাড়িত আইমু।"

চিকিৎসা সুবিধার জন্য তাঁকে মেয়ের বাসায় রাখা হয়। ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি হতে থাকে। প্রথমত দাঁড়াতে পারতেন না তারপর হঠাৎ বসে থাকার সক্ষমতা হারান। তারপর থেকে বিছানাই উনার সঙ্গি। ইতোমধ্যে দেশব্যপী তাঁর অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে যায়। আমার দুর্ভাগ্য অসুস্থতার প্রথম দুই সপ্তাহ উনার পাশে থাকতে পারিনি। আমার আব্বার শারীরিক অবস্থাও সুবিধাজনক ছিল না। আমরা তিন ভাই এর মধ্যে দুইজন ইতোমধ্যে তাঁর খেদমতে।

অসুস্থ আব্বাকে দেখাশোনার জন্য বাধ্য হয়ে আমাকে বাড়িতে থাকতে হলো। কিছুদিন পর তাঁর খেদমতে যাওয়ার জন্য বড় ভাইদের কাছে আবদার করলাম। সবার পরামর্শে রারাই থেকে সিলেটে তাঁর খেদমতে হাজির হলাম।

আল্লাহর অশেষ রহমতে ২০২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। উঠে

বসার মতো সক্ষমতা নেই। শারীরিক অবস্থা দেখে অস্থির হলেও খেদমতে উপস্থিত থাকতে পারার সুযোগ পেয়ে শুকরিয়া আদায় করলাম। সেদিন থেকে শেষ সময় পর্যন্ত খেদমতে থাকার সুযোগ হয়েছিল। বাড়িতে এসে সবার সাথে দেখা করে তাঁর মন উৎফুল্ল হয়ে যায়। বাড়িতে ফিরার পর প্রথম দিকে তাঁর শারীরিক সমস্যাগুলো অনেক বেশি কষ্ট দিত। দুই পায়ের রগে টান দেওয়া ছিল একটি বড় সমস্যা। যখন পায়ের পেশিতে টান দিত পা দুটো একবারে জড়ো হয়ে যেত। এতে তিনি কষ্টে চিৎকার করতেন। তখন উপস্থিত সেবা হিসেবে আমরা যারা খেদমতে থাকতাম পায়ের মাংস পেশি একটু নাড়া চাড়া করে দিলে স্বাভাবিক হয়ে যেত। হাটুর ভাজে একটা রগ ছিল যেটাতে হাত দিয়ে ধরলেই সাময়িক আরাম অনুভব করতেন। ধীরে ধীরে খাওয়া দাওয়ার রুচি কমে আসে। শেষ কয়েকমাসে তিনি ভাত খেতে পারেননি, তরল জাতীয় খাবার খেতেন। সময় এবং দায়িত্বের প্রতি এত বেশি গুরুত্বারোপ করতেন যে, শেষ সময়ে যারা খেদমত করত তাদেরকে তিনি প্রত্যেকটা কাজ বুঝিয়ে দিতেন, কোন কাজ কীভাবে করতে হবে। আল্লাহর অশেষ রহমত, সেই প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর খেদমতে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছি। ধীরে ধীরে শারীরির অসুবিধা বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন আত্মীয়-স্বজন তাঁকে এক নজর দেখতে জড়ো হতে থাকেন। তিনি এমনভাবে বিদায় নিতে শুরু করেন যাতে মন বলছিল হয়তো আমরা তাঁকে হারাতে যাচ্ছি। আমার আব্বা দেখতে আসলে, দুইভাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। একদিন আব্বা তাঁকে দেখতে আসলে তিনি কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, "আমাদের বংশে মাত্র দুইভাই আছি। আমি বিছানায় পড়ে গেছি। আমার অবুঝ ছেলে ভাতিজা ভাতিজিদের কোন মুরব্বি নাই। শুয়াইব তোমার বেমার সব আমারে দিলাও আর তুমি আমার অতা হুরুতা নিয়া কয়টা দিন সুস্থ অবস্থায় তারার মাথার ছায়া হয়ে থাকো।" এমন হৃদয়স্পর্শি কথায় উপস্থিত সবার মাঝে কান্নার রোল পড়ে যায়। বিছানায় শোয়ে শোয়ে উপস্থিত সবাইকে নিয়ে দুআ করেন। আস্তে আস্তে দেখতে আসা মেহমানদের ভীড় বাড়তে থাকে। প্রতিদিন শত শত মানুষের সমাগম হতো। সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখ আল্লামা গিয়াস উদ্দিন ফুলতলী (মুফতি ছাব) তাঁকে দেখতে আসেন। আগের রাত থেকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত তিনি নির্ঘুম ছিলেন। দুপুরের পরে একটু ঘুম লাগে, ঠিক তখনি মুফতি সাহেবের আগমন ঘটেছিলো। তাঁকে জানানো হলো মুহাদ্দিস ছাব ঘুমাচ্ছেন। তারপরও মুফতি সাহেব হুজুর ঘুমন্ত অবস্থায় একবার দেখতে চাইলেন। মুফতি সাহেব হুজুর ঘুমন্ত অবস্থায় মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরকে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন। পাশের রুমে বসে মুফতি সাহেব হুজুর উপস্থিত সবাইকে নিয়ে দোয়া করলেন। দোয়ায় কান্নার আওয়াজ শুনতেই চাচার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ডান পাশে মাটিতে বসা ছিলাম। জিজ্ঞেস করলেন, "কান্না করছে কে?" জানালাম মুফতি সাহেব হুজুর আপনাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে গেছেন। বাহিরের রুমে আপনার জন্য সবাইকে নিয়ে দোয়া করছেন। আদেশ করলেন তাঁকে বিছানা থেকে হুইল চেয়ারে উঠাতে। এই

অবস্থায়ই হুইল চেয়ারে বসে পাশের রুমে মুফতি সাহেব হুজুরের দুআয় শরিক হলেন। মুফতি সাহেব বিদায়ের পরে রাগত স্বরে জানতে চাইলেন কেন তাকে ঘুম থেকে জাগানো হয়নি। তাঁর মুর্শিদের সন্তান আগমন করেছেন এই অবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে থাকা বেয়াদবি মনে করেন। সেদিন আমাদেরকে বললেন, কোন মানুষ তাঁর সাথে সাক্ষাতে এসে যেন অপেক্ষা করতে না হয়। যেই সাক্ষাত করতে আসুক না কেন তাকে সাথে সাথেই যেন নিয়ে আসা হয়। শেষ সময় পর্যন্ত সেই নির্দেশ আমরা অমান্য করিনি।

সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত তিনি হুইল চেয়ারে বসে নামায আদায় করতেন। শারীরিক অক্ষমতায় সেজদার ইশারা তিনি নিজে নিজে দিতে পারতেন না। দুই কাঁধে হাত দিয়ে ধরে রাখতাম। সিজদার সময় হলে সামনের দিকে ঝুকিয়ে দিতাম। ১১ তারিখ থেকে নামাযের জন্য বসা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে বিবেচনায় শোয়ে শোয়ে নামায পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিপত্তি ঘটে তিনি ঘুমাতেন পশ্চিমে মাথা রেখে পূর্ব দিকে মাথা রেখে। পূর্ব পশ্চিম দিকে পা দিয়ে ঘুমাতেন, কাত হলে উত্তর দক্ষিণ হয়ে কিবলামুখী হয় না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিই খাট উত্তর দক্ষিণমুখি করার। আসরের পরে আমরা খাটকে দক্ষিণমুখি করি। তাতে তাঁর মাথা দক্ষিণ দিকে এবং পা উত্তর দিকে যায়। আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি ফরিয়াদ করতে লাগলেন, "আল্লাহ আমার গুনাহ ক্ষমা করো। আমি বেআদব হয়ে গেছি। আজ তোমরা আমাকে উত্তর দিকে পা দিয়ে শুইয়ে রেখেছো অথচ আমি সারা জীবন উত্তর দিকে পা দিয়ে শুইনি। আমার মুর্শিদের বাড়ি আমার বাড়ি থেকে উত্তর দিকে। তাই এদিকে আমি কোনদিন পা দেইনি।" এরপর থেকে তিনি বিছানায় শোয়ে শোয়ে নামায আদায় করেছেন। আল্লাহর দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া সিংহভাগ সময়েই আমি তাঁকে নামাযের জন্য প্রস্তুত করে দিতাম। নামাযের সময় হলেই তায়াম্মুম করিয়ে দিতাম। তিনি নিজ হাতে তায়াম্মুম করতে পারতেন না। তারপর তাঁকে বালিশ দিয়ে পশ্চিম দিকে কাত করে দিতাম এবং আমি চাচার পায়ের কাছে নামায আদায় করতাম। নামাযের সময় হলে সবাইকে মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন এবং আমাকে বলতেন 'আমার মসজিদের ইমাম ছাব আইয়ো আমরা নামায পড়িলাই।'

আমরা সবাই উনার হাদীসের জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে অবগত। দারুননাজাত মাদ্‌রাসার আমার শ্রদ্ধেয় উস্তায ফরিদগঞ্জি হুজুর অনেকবার চাচার কাছে মুসালসাল হাদীসের সনদ নিতে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। বারবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেও আসতে পারেননি। চাচার অবস্থা হুজুরকে জানালে তিনি আসতে চাইলেন। চাচা হাদীসের কথা শুনতেই রাজি। তারা মেহমান হয়ে আসবে কিন্তু তিনি অসুস্থ, তাদেরকে মেহমানদারি করাতে পারবেন না এই বিষয়ে তিনি শংকিত ছিলেন। চাচার বড় ছেলে মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল (বড় ভাই'র) মাধ্যমে তাঁকে রাজি করাই। সে অনুযায়ী ফরিদগঞ্জি হুজুর আসলে ১২ সেপ্টেম্বর রাত নয়টায় তাদেরকে চারটি মুসালসাল হাদীস

পড়িয়ে সনদ প্রদান করেন। সেই সাথে প্রত্যেককেই দালাইলুল খাইরাত এবং হিযবুল আযম পড়ার অনুমতি দেন। অসুস্থতার তীব্রতার কারণে তিনি শোয়ে শোয়েই দারস সম্পন্ন করেন এবং দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে বিদায় জানান। হুজুর যেহেতু আমার উস্তায তাই আমকেই মেহমানদারি করতে বলেন।

ইতোমধ্যে অসুস্থ অবস্থায় তাঁর কাছ থেকে হাদীসের সনদ ও ইজাযাত নেয়ার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সারাদেশ থেকে অনেকেই হাদীসের ইজাযাত নিতে তাঁর কাছে আসার ইচ্ছা পোষণ করেন। বিষয়টি চাচাকে জানালে তিনি খুশি হয়ে বলেন, "তুমি এতসুন্দর এক বিদয়াত চালু করছ যা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। অসুস্থ অবস্থায় আমি এত সময় কথা বলতে পারব?" সপ্তাহ খানেক পর দারুন্নাজাতে অধ্যয়নরত সিলেটি ছাত্রদের একটি কাফেলা আসে। তাদেরকেও তিনি হাদীস পড়িয়ে ইজাযাত প্রদান করেন। ফরিদগঞ্জি হুজুর সনদ নিয়ে যাওয়ার পর অন্যান্য উস্তাযগণ আমার কাছে তাদের সনদ নেয়ার ইচ্ছা ফোনে জানান। ততদিনে চাচার শারিরিক অবস্থার আরো অবনতি হয়।

একদিন বিকালে একজন মেহমান এলে তিনি সবার থেকে তাকে বেশি গুরুত্ব দেন। মেহমানকে তাঁর পাশে বিছানায় বসতে দেন। আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন তিনি হচ্ছেন ফুলতলী ছাহেব কিবলার গাড়ির ড্রাইভার। বিদায়ের সময় মেহমান বললেন, গতরাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি অনুমতি দিলে বলতে চাই। অনুমতি ক্রমে তিনি বলতে শুরু করলেন, "আমি ছাব বাড়ির টংগি ঘরের সামনে একটি টেবিলে ছাহেব কিবলাহ এবং আপনাকে আলোচনা করতে দেখেছি। আমি আপনাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষমান, ভিতরে যাচ্ছি না কারণ আপনাদের আলোচনা শেষ হয়নি।" চাচা সাথে সাথে বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ ভালো স্বপ্ন দেখেছ।" তিনি কখনো এত তাড়াতাড়ি স্বপ্নের তাবীর করতেন না। যত তাড়াতাড়ি এটা করেছেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমাদের জন্য খোশ খবর, আমার মনে হয় এখনো সময় শেষ হয়নি। আরো কিছুদিন তোমরা আমাকে পাবে। আমাদের মনে বাধ ভাঙ্গা আনন্দ, প্রিয় মানুষকে আরো কিছুদিন পাবো। বাস্তবে তাই হয়েছিল।

জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি হাদীসের খেদমত করে গেছেন। বিছানায় মাথার পাশে সবসময় বিভিন্ন কিতাব থাকতো। মাঝে মধ্যেই তিনি কিতাব ধরে রাখতে পারতেন না। আমরা আলোতে কিতাব ধরে রাখতাম আর তিনি পড়তেন। শারীরিক এই খারাপ অবস্থায়ও কিতাব পড়লে তাঁর মধ্যে আলাদা একটা শক্তি ফিরে আসতো। ২০ সেপ্টেম্বর দারুননাজাত মাদ্‌রাসার আমার মাথার তাজতুল্য উস্তাযগণ আসবেন। ঢাকা থেকে তাদের সিলেট আসতে বিকেল হয়ে যাবে। তাই সন্ধ্যায় দারসে হাদীসের সময় নির্ধারিত হয়। সেদিন সন্ধ্যায় মরহুম মাগফুর মাওলানা শাহজালাল হামিদি র., মাওলানা বদরুল

আমিন (কুষ্টিয়া হুজুর), মাওলানা মুহাম্মাদ ফরিদ (ফরিদগঞ্জি হুজুর), মাওলানা মুযাক্কির হুসাইন (ঝিনাইদাহ হুজুর), মাওলানা নূরুল আমিন (আমজাদী হুজুর), মাওলানা নিজাম উদ্দিন (চৈতা হুজুর), মাওলানা শরফুদ্দিন (টুমচরি হুজুর) সহ অন্যান্য উস্তাযগণের নেতৃত্বে ৬০ জনের ইলম পিপাসু এক কাফেলা দারুননাজাত মাদ্‌রাসা হতে আগমন করেন। রাত ৮টা থেকে এক ঘণ্টা সময় তাদেরকে দারস দিয়ে তাদেরকে সনদ প্রদান করেন। সেদিনের দারস আল হাবীব ফাউন্ডেশন ফেসবুক পেজে লাইভ সম্প্রচার করা হয়। দারসের পর তিনি বললেন, "কতদিন পর দারসে হাদীসে বসলাম। আমার দিল খুশ হয়েছে তোমার আয়োজন সফল ওইলো।" চাচার এমন দোয়া পেয়ে সত্যিই আমি ভাগ্যবান।

দুপুরের নাস্তায় তিনি টক জাতীয় যে কোন খাবার পছন্দ করতেন। কখনো জাম্বুরা, কখনো টক আপেল, চা এরকম নাস্তা করতেন। এদিকে পায়ের পেছনে বসে বসে আমি অনলাইন ক্লাস করতাম। অন্য একটি মোবইল দিয়ে আল্লামা ড. মুহাম্মাদ তাহের আল কাদেরী, আল্লামা তাকী উসমানী, কখনো তাঁর মুর্শিদের আলোচনা চালিয়ে দিতাম। তিনি এগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনতেন। কখনো আরবের বিখ্যাত দাঈ হাবিব আলী জিফরি সাহেবের আলোচনা শোনাতাম। প্রত্যেকটি আলোচনার সারাংশ অনেক সময় আমাকে বলতেন। আমি উর্দু ভাষা বুঝতাম না ফলে বেশ কিছু আলোচনা তিনি আমাকে বাংলায় বুঝাতেন এবং বলতেন এগুলো মনোযোগ দিয়ে শোন। বেশ কিছুদিন শোনার পর তিনি জানতে চাইলেন এখন উর্দু বুঝি কিনা? আমি বললাম- বুঝি। তিনি বললেন, তাহলে আজকের আলোচনার সারাংশ তুমি আমকে শোনাবে। সত্যি তাই হলো।

একদিন ইন্টারনেট সমস্যার কারণে আলোচনা শোনাতে পারিনি। দুপুরের নাস্তার সময় বললেন, আজ কিছু শিখা হলো না। নাস্তা তো করবো কিন্তু কিছু শিখা হলো না। পাশ থেকে একটা কিতাবের দিকে ইশারা করে হাতে দিতে বললেন। কিতাবটি ছিল মরক্কোর শায়খ সায়্যিদ আব্দুল্লাহ সিদ্দিক গুমারী রাহিমাহুল্লাহ এর রচনা সমগ্র। যা মিশরের ড. সাঈদ মাহমুদের তাহকিকে موسوعة العلامة المتحدث المتفنن سيدي الشريف عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسني শিরোনামে ১৮ খণ্ডে ছাপা হয়েছে। সেই কিতাবের একটি খণ্ড থেকে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর রেওয়ায়েতকৃত একটি হাদীস পড়ে দীর্ঘ ব্যাখ্যা করলেন। এরপর বললেন, এবার আজকের নাস্তা হালাল হলো। কোন কিছু না শিখে কীভাবে নাস্তা করা যায়?

সেদিন তাঁর পঠিত হাদীসটি হল-

إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الأَمْوَاتِ فَإِنْ كَانَ خَيْراً اسْتَبْشَرُوا بِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُمْ حَتَّى تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا

অর্থাৎ. তোমাদের আমলগুলো তোমাদের মৃত নিকটাত্মীয়দের কাছে পেশ করা হবে।

যদি তা কল্যাণকর হয় তাহলে তা দ্বারা তারা সুসংবাদ গ্রহণ করবে। আর যদি সেরূপ না হয়, তাহলে তারা বলবে-হে আল্লাহ, তুমি হেদায়াত না করে তাদের মুত্যু দিও না যেরূপ তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছ। (মুসনাদে আহমদ- ১২৬৮৩)।

শয্যাশায়ী অবস্থায়ও যখন ছাহেব কিবলার কোন আলোচনা ইউটিউব এ শোনতেন তখন চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ করা যেতে। মনে হতো যেনো আলাদা শক্তি ফিরে পেয়েছেন। ইউটিউবে ছাহেব কিবলার যত ভিডিও পেয়েছি দেখিয়েছি। তিনি মনোযোগ সহকারে শোনতেন। কখনো কোন মোনাজাতে হাউমাউ করে কাঁদতেন এবং রেকর্ডেড দোয়ায়ও নিজ হস্তদ্বয় তুলে দোয়া করতেন। অন্যান্য সকলের সাথে হাবিব আলি জিফরির আলোচনাও খুব মনোযোগ সহকারে শোনতেন। বিশেষ করে উনার আলোচনা শোনতেন বৃহস্পতিবারে। কারণ আল্লামা জিফরি সাহেবের সকল আলোচনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত কেন্দ্রীক।

বৃহস্পতিবার আসলেই আমাকে বেশি বেশি দরুদ শরিফ পড়ার নির্দেশ দিতেন। একদিন আসরের পর আমাকে নসীহত করেন, "বেশি বেশি দরুদ শরীফ পড়। দরুদ শরীফ আমাদের আখেরাতের সম্বল হবে। কিয়ামতের দিনে যখন আমাদের হিসাব হবে মিজানে আমলনামার হিসাব হবে তখন নেকির পাল্লা পাতলা হয়ে যাবে এই সময় একজন এসে একটুকরা কাগজ এনে মিজানে রাখবেন নেকির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে, ঐ বান্দা নাজাত পাবে। সে জিজ্ঞেস করবে,আমার প্রতি এত দয়া দেখালেন আপনি কে? জবাবে বলবেন, তুমি চিন নাই? রাহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সারা জীবন আমার উপর যত দরুদ পড়েছিলে আজ তা তোমাকে নাজাত দিলো। সুতরাং বেশি বেশি দরুদ শরীফ পড়ো। সারাদিন আমার পাশে বসে কাটাও, মনে মনে দরুদ শরীফ পড়িও। যে কোন একটা দরুদ শরীফকে অভ্যাস করে নাও। কোন জায়গায় যাচ্ছ এই যাওয়ার সময় দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে যাও।" তিনি আরো বলেন, "চাইলে আমার লেখা একটা দরুদ শরীফ আছে যেটা পড়তে পারো। একটু লম্বা, প্রয়োজনে কম পড়বে তারপরও একটা অভ্যাস করে নিলে ভাল।" দরুদ শরীফটি নিম্নরূপ -

اللهم صل على سيدنا محمد منبع الجود والكرم، وصل علي سيدنا محمد مخزن العلوم والحكم وصل علي سيدنا محمد مطلع الأنوار وصل على سيدنا محمد مظهر الأسرار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত কোন ইস্যু নিয়ে মাসয়ালা মাসায়েল তাঁর সামনে আসলে কিতাবাদি খুলে তা দেখতেন তা নিয়ে আলোচনা করতেন। অনেকেই তাঁকে মাশরুম খাওয়ার পরামর্শ দিতেন। তিনি হাদীসের কিতাবে মাশরুম খুজতে লাগলেন। জানালেন, মাশরুমের কথা হাদীসে নববীতে আছে। তিনি হাদীসখানা খুঁজতে

কুতুবখানায় একজনকে পাঠালেন। তখন আমি মোবাইলে সার্চ করে হাদীসখানা তাঁকে পড়ে শুনালাম। জানতে চাইলাম এই হাদীসটি কিনা। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল। জানতে চাইলেন কীভাবে আমি জানতে পারলাম? আমি বললাম, অনলাইন থেকে আমি খুঁজে পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, 'মোবাইল কাজে লাগাতে জানলে অনেক ভালো কিছু করা সম্ভব। সারাজীবন মোবাইলের বদনাম শুনলেও আজ শেষ সময়ে তার সুফল দেখলাম'। মেশকাত শরীফের ৪২৩৫ নাম্বার হাদীসটি হল-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ وَالْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وماؤُها شفاءٌ للعينِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-'আজ্ওয়া জান্নাতের ফল, তার মধ্যে বিষ প্রতিষেধক রয়েছে। আর মাশরুম মান্ন জাতীয়, তার পানি চক্ষু রোগের উপশম রয়েছে। (তিরমিযী-২০৬৬)।

অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় থাকাকালীন সময়ে তিনি অনেক পুরোনো ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনার কথা শোনাতেন। যেমন- একদিন তাঁর কাছে একটা টাকাও নেই, এদিকে বিকেল গড়িয়ে আসছে তাই কাজের মানুষ বাজারে যাওয়ার জন্য বারবার টাকা নিতে আসছে। তিনি বলেননি যে তার কাছে টাকা নেই। টাকা কোথা থেকে দেবেন তা ভাবতে ভাবতে বারান্দায় চেয়ারে বসে বসে কিতাব পড়ছেন। সেই ব্যক্তি আবারো আসলো। পাঞ্জাবীর পকেটে হাত দিয়ে ৫০০ টাকা বের করে তাকে দিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বললেন, একটু আগে পকেটে একটা টাকাও ছিল না, কীভাবে পকেটে টাকা আসলো তিনি নিজে জানেন না।

আমি শেষ সময়ে দেখেছি,যে সময় যা প্রয়োজন কোন না কোন ব্যক্তির মাধ্যমে তা পুরণ হয়ে যেতো। মুহাদ্দিস ছাহেব প্রতিষ্ঠিত হিফজুল কুরআন মাদরাাসায় হাফেজদের যোগ্য এবং তাড়াতাড়ি হিফয সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আবাসিক ব্যবস্থা চালু করেন। সবই ঠিক ছিল কিন্তু পানির আয়রণের সমস্যা থাকায় কষ্ট হচ্ছিল। যখন এই সংবাদ পরিচালক সাহেব তাকে জানালেন তখন সকাল ১১ টা। দুপুর ১২টা বাজে আমাদের পাশের গ্রামের এক ব্যক্তি বেশ কিছু টাকা নিয়ে হাজির হলেন। তার একজন আত্মীয় করোনায় মারা গেছেন। টাকা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, এই টাকা মুহাদ্দিস ছাহেবের মাদ্রাসার যেকোন কাজে লাগাতে পারবেন। চাচা জানালেন পানির সমস্যার কথা, তারা সাথে সাথে খুশি হয়ে পানি ফিল্টারিংয়ের সকল ব্যবস্থা করার জন্য টাকা দিয়ে গেল। তাদের বিদায়ের সাথে সাথে বললাম, এটা কেমনে সম্ভব! এই জিনিসটার প্রয়োজন এক ঘণ্টা আগে জানতে পারলেন, তার কিছু সময় পরেই পূরণ হয়ে গেল। মুচকি হেসে বললেন,

"আল্লাহ পাঠালে আমাদের কী করার আছে!" এভাবে দেখা গেছে শেষ সময়ে অন্য কিছুর প্রয়োজন হলে কোন না কোন ভাবে সেটা হাজির হয়ে যেত।

শেষ সময়ের খাদেম যারা ছিল তাদেরকে ভাগ-ভাগ করে দেওয়া হয় কে কোন সময় খেদমতে থাকবে। যেদিন খেদমতকারীদের নাম ভাগ করা হয় সেদিনই বলেছিলাম যে, আমাকে এই হিসেবে রাখবেন না আমি রুটিনের বাইরে। আমি সারা সময় আপনার সাথে থাকতে চাই। ইতোমধ্যে তখন চাচার কাছে বেশ কিছুদিন থাকা হয়েছে, তাই তিনি মুচকি হাসি দিলেন তারপরও ভাগ করে দেওয়া হল। ফজরের পর থেকে আমি এবং জিল্লুর রহমান, আমরা প্রথম ধাপে ফজর থেকে নয়টা পর্যন্ত থাকতাম। ৯ টার দিকে জিল্লু মাদ্‌রাসায় যেতেন এবং আমি সকালের নাস্তা করে দশটার দিকে চাচার খিদমতে ফিরতাম। সকাল ১০টা থেকে আমার সাথে জাহেদ এবং তারেক দুইজন থাকতো। জোহরের নামায শেষে উনাকে রেখে আমি গোসল, খাওয়া-দাওয়ার বিরতি শেষে আবার চাচার কাছে ফিরে আসতাম। তিনি রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত আমি থাকতাম। রাত দশটার দিকে আমি ঘরে চলে যেতাম, আমার ভাই জোবায়ের আহমদ এবং জুহায়ের আহমদ হাসনাত তখন আসতেন। রাত দশটা থেকে ফজর পর্যন্ত আমার ভাই এবং হাফিয শামছুদ্দিন সাবেল খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন। আমার বড় ভাই জুবায়ের আহমেদ ছিলেন চাচার সবচেয়ে কাছের। চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল দিকের দেখাশোনা করতেন তিনি। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে,আমরা তিন ভাই শেষ কয়েক মাস ধারাবাহিকভাবে উনার খেদমতে শরিক থাকতে পেরেছি।

অসুস্থ কালীন শেষ কয়েক মাসে উনার বাইরে চলাচলের জন্য একমাত্র মাধ্যম ছিল হুইল চেয়ার। হুইল চেয়ার যুগে প্রতিদিন বাইরে একটু সময় আলো বাতাসে ঘুরে বেড়াতেন। আমি সেই প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলাম চাচার হুইল চেয়ারের ড্রাইভার। আসর নামায শেষ হলেই মজা করে বলতেন, "ড্রাইভার সাব আপনার গাড়ি নিয়ে আসুন,বাইরে বের হতে হবে।" তারপর বাড়ির উঠানে এবং সামনের রাস্তায় ঘণ্টাখানেক ঘুরাঘুরি করতেন। প্রতিদিনের রুটিনে ছিল, পুকুর পাড়ে গিয়ে তাঁর বাবা মা এবং ভাইগণের কবর যিয়ারত করা। তারপর মাঝে মাঝে বাড়ির সামনের ত্রিমোহনায় গিয়ে উত্তরমুখী হয়ে হযরত আহসান মুন্সী রাহিমাহুল্লাহ এর জিয়ারত করতেন। হুইল চেয়ার চালানোর ব্যাপারে আমার প্রতি উনার এত আস্থা ছিল, এমনও হয়েছে যে আমি না থাকলে কয়েকদিন তিনি ঘরের বাইরে বের হতে চাননি। একবার দুই দিনের জন্য অনুমতিক্রমে আমার আম্মার সাথে সফরে গিয়েছিলাম। চাচার কাছে দুই দিনের কথা বললেও আমি তিনদিন পরে বাড়িতে ফিরেছিলাম। আসার পর বললেছিলেন, "এখানে যে একজন মুরুব্বীকে এই অবস্থায় রেখে গেছ তা কি ভুলে গেছো? তার দুনিয়ার আলো-বাতাসে বের হওয়ার প্রয়োজন তা কি তোমার মনে নেই?" প্রথমত বুঝতে পারিনি। পরে কথায় কথায়

বললেন, "তারা আমাকে বাইরে নেয়ার প্রস্তাব দিছিল কিন্তু আমি যাইনি। আসলে আমার ভয় ছিলো ওরা ঠিকমত হুইল চেয়ার চালাতে পারবে কিনা? নতুন কেউ যদি কোন অ্যাক্সিডেন্ট করে তাই বাইরে যাওয়া হয়নি।" হুইল চেয়ার চালানো এত কঠিন কাজ না, কিন্তু চাচার এমন এক বিশ্বাস ছিল যে, এই কাজ যাকে করার কথা তাকেই করতে হতো, তিনি ভরসা পেতেন। একদিন বিকেলে আমি খেয়াল করিনি যে,আমার আব্বা চাচাকে দেখতে এসেছেন। আমি উঠানে কিছু সময় ঘোরাঘুরি করার পর ঘরের দিকে যাব ঠিক তখনই বললেন, "এই যে দেখো, আমার শুয়াইব আমাকে দেখার জন্য আসতেছে। তার হাঁটাচলা করতে কষ্ট হয়, উঠান থেকে ঘরে যেতে অনেক কষ্ট হবে। তাই এখানেই দেখা করি।" কিন্তু আব্বা এত আস্তে আস্তে হাঁটতেন যে অনেক সময় লেগে যাচ্ছিল। চাচা আমাকে আদেশ দিলেন আমি যেন পুরাতন বাড়ির রাস্তায় দিকে উনাকে নিয়ে যাই। কারণ হিসেবে তিনি বললেন, "আমি তো হুইল চেয়ারে বসে আছি, আর আমার ভাই তো হেঁটে হেঁটে আসতেছে। তাইলে একটু তার জন্য আগাই।" ওখান থেকে আমাদের ওইদিকে রাস্তা কাঁচা হওয়াতে স্বাভাবিকভাবে হুইলচেয়ারে উনার কষ্ট হবে। এই শঙ্কা থেকে বললাম, "এই রাস্তায় গেলে তো আপনার কষ্ট হবে।" চাচা আমাকে সাধারণভাবেই বললেন, "একদিন আমার ভাইয়ের জন্য না হয় একটু কষ্ট হলো।" দুই ভাইয়ের মহব্বত ছিল অনেক গভীর। আব্বা যখনই দেখা করতে যেতেন চাচা উনাকে একদম পাশে বসাতেন। নিজের খাওয়া যে কোন কিছুর অল্প হলেও বাকিটুকু আব্বার জন্য দিয়ে দিতেন। আব্বাও খুশি মনে তা গ্রহণ করতেন। সন্ধ্যার আগেই আমরা হুইল চেয়ারে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতাম এবং মাগরিবের নামায জামাতের সাথে আদায় করতাম। নিয়মিত জামাতে নামায পড়তে পারছেন না বলে তিনি আফসোস করতেন। তাই মাঝে মাঝে এভাবে মাগরিবের নামায জামাতের সাথে আদায় করতেন। মাগরিবের নামাযের পর ৩৩ আয়াতের আমল করতেন। কিন্তু শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তিনি তেলাওয়াত করতে পারতেন না। পাশে বসে বসে কেউ তেলাওয়াত করত তিনি শুনতেন। এমনিভাবে এশার পরে সূরা মুলক তেলাওয়াত করাতেন। যারাই সাক্ষাতে আসতো সবাইকে এশার পর সূরা মূলক পড়ার তাগিদ দিতেন, সেই সাথে এটার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুরের জীবনের শেষ হাদীসের দারস ছিল ২০২১ সালের ১৭ নভেম্বর। এটাও আমার আয়োজন করা দারুননাজাতের উস্তাযগণের জন্য। তখন শারীরিক অবস্থা অনেক বেশি অবনতি হয়। ভালোভাবে কথা বলতে পারছিলেন না। ১৭ নভেম্বর ২০২১, এই দিন ছিল বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ এর ওফাত দিবস। এ উপলক্ষে আল হাবীব জামে মসজিদে খতমে বুখারীর আয়োজন করা হয়। এদিনই তিনি হাদীসের শেষ দারস এবং খতমে বুখারীর দোয়া পরিচালনা করেন। ১৩ নভেম্বর ২০২১, দারুননাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্‌রাসার দ্বিতীয় মুহাদ্দিস মুফতি মাওলানা মোঃ

শাহজালাল হামিদী মুহতারাম পিরোজপুরী হুজুর এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তাঁর অ্যাক্সিডেন্টের পর পর যখন মুহাদ্দিস হুজুর জানতে পারেন তখন আমার কাছ থেকে বারবার খবর নিতেন। তাঁর ওফাতের পরে অনেক আলেমদের কাছে তাঁর জন্য দোয়া চেয়েছেন। নিজেও দোয়া করেছেন। সেদিন দারস শেষে মোনাজাতে মুহতারাম পিরোজপুরী হুজুরের নাম ধরে তিনি দোয়া করেছিলেন।

ছোটবেলায় চাচা হাদীসে মুসালসাল পড়িয়ে আমাদের পুরো পরিবারকে তাঁর সনদে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মূল সনদ পাওয়ার আশায় আমিও একটা আবদার করেছিলাম সেদিন যে, আমাদের জন্যও যেন একটা দিন সুযোগ করা হয়। আমিসহ কয়েকজন ভাই-বোন হাদীস পড়তে চাই এবং নিজেকে তাঁর সনদে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। চাচা রাজি হলেন এবং ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখ তিনি আমাদের হাদীস পড়িয়ে তাঁর মূল সনদে অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল ভাই-সহ আমরা ছয় ভাই বোন এবং বাড়ির বেশ কয়েকজন ভাতিজা ভাতিজি চাচাতো ভাই-বোন।

শারীরিক অবস্থা মারাত্মক অবনতি হয় ২০২২ সালের ১৫ জানুয়ারির পর থেকে। ১৫ জানুয়ারি হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলার বার্ষিক ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে উনার ভয়েজ রেকর্ড শোনানো হয়। পরদিন মাহফিলে আগত মেহমানরা তাঁকে এক নজর দেখতে বাড়িতে ভিড় জমান। এদিকে তখন উনার সহধর্মীনিও মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। একই সাথে দুইজনের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। বড় আম্মা (মুহাদ্দিস ছাহেবের সহধর্মীনি) দীর্ঘদিন যাবত জটিল কঠিন অসুখে ভুগছিলেন। অবস্থা এমন হয়ে পড়ে যেন যেকোনো সময় বড় আম্মার কোন খারাপ সংবাদ শোনা যেতে পারে। মাঝে মাঝে এমন সময় হতো, আমি দুই রুমের মধ্যখানের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। একবার চাচার দিকে দেখতাম, একবার চাচীর রুমের দিকে লক্ষ্য রাখতাম। চাচা নিজ থেকে খেদমতের জন্য মাঝে মাঝে আমাদের জন্য দোয়া করতেন। একবার বলেছিলেন, "মাহফুজ তোমারে দেয়ার মত আমার কাছে কোন কিছুই নেই, আমি আল্লাহকে বলছি, তিনি চাইলে অনেক কিছু দিতে পারেন। দুই রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার আমাকে একবার তোমার বড় আম্মাকে দেখছো আল্লাহ তোমাকে উত্তম জাযা দান করুন।"

২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বড় আম্মার শারীরিক অবস্থা মারাত্মক অবনতি হয়। মাগরিবের আজানের সময় একবার মনে হচ্ছিল তিনি হয়তো এখনই দুনিয়ার মায়া ছেড়ে চলে যাবেন। আমি আমার সেই চিরচেনা জায়গা, চাচার পায়ের পেছনে বসা। আমাকে আদেশ করলেন পাশের রুমের অবস্থা দেখে আসার জন্য। গিয়ে দেখলাম বড় আম্মা আশঙ্খাজনক অবস্থায় আছেন। সবাই পাশে বসে সুরা ইয়াসিন পাঠ করছেন। আমি তাড়াতাড়ি করে তিনবার সূরা ইয়াসিন পড়ে চাচার কাছে ফেরত গেলাম। তিনি জানতে

চাইলেন কী অবস্থায় দেখে আসলাম। অবস্থা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন,আল্লাহ তাঁর বান্দীকে হেফাজত করুন। চাচা মাগরিবের নামায আদায় করলেন। নামায শেষে আদেশ করলেন, "কেউ একজন আমার পাশে বসে বদরী সাহাবীগণের নাম পাঠ করো।" সেক্রেটারি শামসুদ্দিন সাবেল আসহাবে বদরীনের নাম পাঠ করলেন। পড়া শেষ হতে না হতে পাশের রুম থেকে খবর এলো বড় আম্মা আল্লাহর জিম্মায় চলে গেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

চাচা উপস্থিত সবাইকে নিয়ে জরুরী মিটিং করেন, কীভাবে কখন দাফন করতে হবে তা জানিয়ে দিলেন। পরদিন দুপুর ২ ঘটিকায় জানাযার নামায সম্পন্ন করে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। বড় আম্মা বিদায়ের সময় পর্যন্তও মোটামুটি তিনি কথা বলতে পেরেছিলেন। তাঁর নির্দেশনা মতে কাফন দাফন হয়েছে। কিন্তু বড় আম্মা গত হওয়ার পরে আস্তে আস্তে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। মূলত সমস্যা শুরু হয় বড় আম্মা বিদায়ের সেই রাত থেকে। তিনি দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটিয়েছেন কিন্তু এই রাত থেকে বিছানায় শুয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল, বসে থাকতেও পারছিলেন না। অসহ্য যন্ত্রণায় সারারাত ছটফট করছেন। বড় আম্মার দাফনের পরে চাচার কাছে ফিরে দেখি তিনি শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন। এই ঘুম থেকে শুরু করে তাঁর শারীরিক অবস্থা অনেক বেশি পরিবর্তন হয়ে যায়। আস্তে আস্তে তিনি বসার মতো সেই শক্তিও হারিয়ে ফেলেন। ড্রপারের সাহায্যে শেষ সময় উনাকে তরল জাতীয় খাবার খাওয়ানো হতো। বিকেল হতে হতে শ্বাসকষ্টের পরিমাণ বেড়ে যায়। শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হতে শুরু হয় সন্ধ্যা নাগাদ। অক্সি মিটারে অক্সিজেন লেভেল সত্তরের কোটায় চলে আসে। যেখানে একজন স্বাভাবিক মানুষের অক্সিজেন লেভেল ৯০ থেকে ১০০ এর মধ্যে থাকা প্রয়োজন। অবস্থা বিবেচনায় তাঁকে অক্সিজেন মাস্ক পরিয়ে দেওয়া হয়। গলায় কফ আটকে থাকার কারণে তিনি কথাও বলতে পারছিলেন না, আবার এরকম শক্তিও ছিল না একটু জোরে কাশি দিয়ে কফটুকু বের করবেন। জরুরী ভিত্তিতে স্থানীয় উপজেলা চিকিৎসক ডা. মোয়াজ্জেম চৌধুরীকে বাড়িতে আনা হয় এবং তিনি সেকশন মেশিনের মাধ্যমে গলা থেকে কফ বের করেন। সাময়িক আরাম হলেও পিঠের বেদনার কারণে বিছানায় শুয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিলো।

তিনি পুরো অসুস্থতাকালীন সময়ে আর কোন কিছু খেতে না পারলেও পান ঠিকই খেয়েছেন। এদিন সকালে মুখ নাড়তে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি কখনো আমাকে তুই, আপনি আবার কখনো তুমি বলে সম্বোধন করতেন। আমি দেখছি যে মুখ নাড়াচড়া করার মত সে শক্তিটুকুও নেই। তাই কানে কানে বললাম, "আপনার পান খাওয়ার মত শক্তি নাই আর। কয়েকদিন থেকে পান চাবাতেও পারছেন না ভালো করে। আর পান খাওয়া ছেড়ে দেন।" মুচকি হেসে জবাব দিলেন, "আপনার কাছে যদি আর কোনো নসীহত থাকে

তাহলে সেটা আমাকে করুন। আমি পান খাওয়া ছাড়বো না। আমার ছাব কিবলাহ ইন্তেকালের ১ ঘণ্টা আগ পর্যন্ত পান খেয়ে কুলি করে মুখ পরিষ্কার করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমি আমার ছাহেব কিবলার তরিকা রক্ষার্থে পান মুখের ভিতর দিয়ে রাখি।" শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। মুর্শিদের প্রতি ভক্তির এক অনন্য নজির তিনি। তিনি জীবনের শেষ পান খেয়েছেন ৩ ফেব্রুয়ারি। পান খাওয়ার পর কুলি করার মতো সেই শক্তি ছিল না। পান খাওয়া শেষে ইশারা দিলেন মুখ থেকে অবশিষ্ট অংশ বের করতে। আমি হাত দিয়ে মুখ থেকে পানের অবশিষ্ট অংশ বের করে দেই। দুপুরের দিকে হঠাৎ লক্ষ করি তিনি হাতের নখগুলো এক হাত দিয়ে অন্য হাতে টানছেন। যদিও নখগুলো তেমন লম্বা ছিল না,তারপরও আমি হাতের নখ কেটে দেই। তখন ইশারা করলেন পায়ের নখের দিকে,আমি পায়ের নখও কেটে দিলাম। এটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ পান খাওয়া এবং নখ কাটা।

২০২২ সালের ফাযিল ফাইনাল পরীক্ষা আমার জীবনের এক অভিশাপের নাম। করোনা ভাইরাসের কারণে নভেম্বর থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বেশ কয়েকবার পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন হয়। প্রত্যেকবার পরীক্ষার তারিখ আসলেই চাইতাম পরীক্ষাটা একটু পিছিয়ে যাক। কারণ পরীক্ষা দিতে হলে আমাকে যেতে হবে ঢাকায়। আর আমি চাইতাম না তাঁর খেদমত ছেড়ে যেতে। তিনিও চাইতেন না আমি কোথাও সরে যাই। দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস বিছানায় ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে আমি ধারাবাহিকভাবে দিনে ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা সময় তাঁর পায়ের পেছনে ফ্লোরে বসে থাকতাম। এর মধ্যে একবার পরীক্ষার জন্য ঢাকা চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নোটিশ আসতেই আমি রাতারাতি বাড়িতে চলে আসি। আসার পর আমাকে দেখেই প্রথম কথা ছিল, "আমারে ফালাইয়া আর যাইতায়নি? যাও পরীক্ষা দেওয়াত! হাসিনা মাইয়ে দিছইন সব বন্ধ করিয়া। বেটা অইলে আমারে পালাইয়া যাওগি।"

আমি উনার কাছে ফিরতে পেরে যেমন খুশি ছিলাম তেমন তিনিও। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যেই পরীক্ষার তারিখ পেছানোর জন্য চাইতাম সেই পরীক্ষা এসে দাঁড়ায় ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ তারিখে। আর এদিকে চাচার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার আস্তে আস্তে শারীরিক অবস্থা আরো অবনতি হয়, জিব্বা নাড়াচড়া করতেও কষ্ট হচ্ছিল। ইতোমধ্যে ফুলতলীর মুফতি সাহেব হুজুর তাঁকে দেখতে আসেন। দুপুরে আসেন ছাহেবজাদা মাওলানা শিহাব উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী। সন্ধ্যায় হঠাৎ করে আল্লামা নজমুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী (মাইজম সাহেব) হুজুরও দেখতে আসেন। তিনি আসলেন চাচাকে দেখলেন, কিন্তু কথা বলতে পারেননি। পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দোয়া করে প্রস্থান করলেন। যাওয়ার সময় তিনি বললেন, "আমি গত রাতে উনাকে স্বপ্নে দেখেছি। মনে সন্দেহ হয়েছিলো হয়তো আমরা তাঁকে হারাতে যাচ্ছি। তোমরা একটু

সতর্ক থেকো।" মনে ভয় লাগছিল হয়তো চাচার সময় শেষ হয়ে আসছে। আমরা আমাদের রত্ন হারাতে যাচ্ছি। তখন অক্সিজেন লেভেল খুবই কম থাকায় সবসময় অক্সিজেন মাস্ক দেওয়া হতো। তিনি কখনো ঘুমাচ্ছিলেন আবার কখনো অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন।

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ শারীরিক অবস্থা আরো অবনতি হয়। আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। একদিকে চাচার খারাপ অবস্থা, অন্যদিকে আমার মাথায় পরীক্ষার চিন্তা। চাচার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার মতো সেই সুযোগটাও নেই। যদিও আমি আগে থেকে জানিয়ে আসছিলাম আমার এই পরীক্ষার কথা। তখন বলছিলেন, "তুমি চলে গেলে আমাকে দেখবে কে?" অনেক সময় চাচা নিশ্চুপ হয়ে থাকলেন সাথে আমিও। একটু পরে বললেন, "কি আর করার! পরীক্ষা কি না দিলে হবে না?" বললাম, "আমি আপনাকে ছেড়ে যেতে চাই না, না দিলে ক্ষতি হবে না, আগামী বছর দিতে পারব। কিন্তু আমার পরিবার থেকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বলছেন। আমি আপনাকে ছেড়ে যেতে চাই না।" মাথায় হাত রেখে বললেন, "পরিবারের কথা শোনা জরুরী, তুমি পরীক্ষা দাও।" আমার ঢাকা যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে। সৌভাগ্যবশত সেদিন দুপুরে একটু সময় কিছুটা আরাম পান। আমি মনমরা হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভাঙ্গা কণ্ঠে জানতে চাইলেন খাওয়া দাওয়া করেছি কিনা। তখন সুযোগ বুঝে আস্তে করে কানের কাছে গিয়ে বললাম, "আমি আগামীকাল চলে যাব।" ফিসফিস আওয়াজে বললেন, "আল্লাহর হাওলা আমারে আইয়া পাইতায় নায়।" এদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ করে মাগরিবের সময় আল্লামা বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলি (মা.জি.আ) আগমন করেন। স্বাভাবিকভাবে বড় ছাব আগমন করলে আমরা আগে থেকে খবর জানতে পারতাম। এদিন হঠাৎ করে আসাটা আন্দোলিত করে তোলে। বড় ছাব রুমে প্রবেশ করলেন। চাচার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন বহু সময়। একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে থাকলেন অপলক দৃষ্টিতে। কিন্তু কেউ কারো সাথে কথা বলেননি। তখন চাচা কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন বড় ছাহেব কিবলাহ এসেছেন। সব দেখছেন কিন্তু কথা বলতে পারছেন না। কিছু সময় পর বড় ছাব কিবলাহ উপস্থিত সবাইকে নিয়ে দোয়া করে চলে গেলেন। ফিরে এসে পাবোনা অনেকটা নিশ্চিত জেনেও ভরাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ৫ তারিখ ঢাকার পথে রওনা হই।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ চাচার জীবনের শেষ দিন। তখন আমি দারুননাজাত কামিল মাদ্‌রাসায়। প্রতিটা মুহূর্ত আমার জন্য এক বিষাদ মাখা স্মৃতির মত। যদিও আমি ঢাকায় কিন্তু মন আমার বাড়িতে। প্রতি মুহূর্তে কারো না কারো সাথে ফোনে কথা বলে অবস্থার খবর জানছি। যোহরের পর থেকে উনার অবস্থা একদম আশঙ্কাজনক হয়ে যায়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এতটা সময় কাছে থেকেও শেষ বিদায়ের মুহূর্তটা সামনে থাকা আমার কপালে নেই। আমার অসুস্থ বাবাসহ শতাধিক আত্মীয়-স্বজন ইতোমধ্যে তাঁর পাশে

জড়ো হন। সবাই উপস্থিত থাকলেও সেই সময়ে আমি ঢাকায়। সন্ধ্যা সাতটার দিকে আমার মরহুমা আম্মার ফোন রিসিভ করে হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আম্মু বললেন, 'তোমার চাচা নিজ মুখে উচ্চস্বরে আল্লাহ আল্লাহ জপতে জপতে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'।

রাত আটটার গাড়িতে ঢাকা থেকে রওনা হই। ভোররাত চারটার দিকে চাচার কাছে পৌঁছাই। নিজের মনকে বারবার ধিক্কার দিতে থাকি, কেননা চাচা নিজে বলেছিলেন, 'আমারে আইয়া ফাইতায় নাই'। বড় সাহেব কিবলার আসা এবং মোনাজাত করাসহ, চোখের সামনে আরো কিছু ইশারা ছিল যেগুলো দেখে মনে হচ্ছিল আমি ফিরে এসে পাবো না। তারপরও বাড়ি থেকে চলে গেছিলাম। চাচার কাছে ফিরলাম, তিনি তাঁর সেই চিরচেনা বিছানায় শুয়ে আছেন। কিন্তু আগের মত নেই, নেই কোন পায়ের রগের টান! নেই পিঠের বেদনা। দুনিয়ার সকল রকম অসুবিধা থেকে তিনি মুক্ত। সংবাদ শুনার পর থেকে বাড়িতে আসার এই সময়টুকু আমার কাছে হাজার বছরের চেয়ে লম্বা ছিল। গাড়ি খুব জোরে চলছে, কিন্তু আমার রাস্তা যেন শেষই হচ্ছিল না। অবশেষে যখন কাছে থেকে এক নজর দেখলাম অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়ে গেল।

উনার ওসিয়াত মত গোসল করানো হয়েছিল। তিনি ওসিয়াত করে গিয়েছিলেন যে, উনাকে যেন মসজিদের উত্তর পাশে দাফন করা হয়। গোসল কারা কারা করাবেন তাও তিনি সিলেক্ট করে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি অধম এই লিস্টের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু আমি ঢাকায় থাকার কারণে গোসলে শরিক হতে পারিনি। কিন্তু রব্বে কারীমের দরবারে শুকরিয়া, পরদিন কাফন পরানোর পূর্বে যখন আবারো ধৌত করার প্রয়োজন হয় ভাইদের মধ্যে সবাই আমাকে সেই সুযোগ দেন।

তিনি কিছু টাকা রেখে ওসিয়ত করেছিলেন তাঁর জানাযায় দূর দূরান্ত থেকে আগত মানুষদের যেন মেহমানদারী করা হয়। তাদের সাথে যেন ভালো ব্যবহার করা হয়। তাঁর কথামতো সবকিছুই করা হয়।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২, থানাবাজারের উত্তর পাশের বিলে তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার মুরিদীন মুহিব্বিন এর সমাগম হয় জানাযায়। প্রিয় মানুষের অশ্রুতে সিক্ত হয়ে তিনি আল হাবীব জামে মসজিদের উত্তর পাশে চির নিদ্রায় শায়িত হন। আল্লাহ পাক রহমের চাদর দ্বারা তাঁর কবরকে ঢেকে রাখুন। আমিন।

লেখক: মুহাদ্দিস ছাহেবের ভাতিজা। শিক্ষার্থী, দারুননাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্‌রাসা,ঢাকা।

স্মৃতিতে মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ
উসওয়াতুন হাসানার সর্বোত্তম প্রতিচ্ছবি

মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ

উপমহাদেশের প্রখ্যাত শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ স্মরণে প্রকাশিতব্য স্মারকে কিছু লেখার কল্পনাই ছিল না। লন্ডন থেকে প্রিয় মামা মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল (মুহাদ্দিস ছাহেবের বড় ছাহেবজাদা) স্মারক প্রকাশের কাজে সামান্য দায়-দায়িত্ব অর্পণের পাশাপাশি আমাকেও স্মৃতিচারণমূলক লেখার নির্দেশ দেন। কয়েকবার বিনয়ের সাথে অপারগতা প্রকাশের পরও ছাড় না পাওয়ায় কলম হাতে নিলাম।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ সৃষ্টি করেছেন যারা জীবনের সর্বস্ব বিলিয়ে দেন আল্লাহর রেজামন্দিতে। যাদের জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের বাসনা ছাড়া চাওয়া পাওয়ার কিছুই থাকে না। যাদের জীবনের মূল প্রতিপাদ্য হয়ে থাকে "লা আ'ইশা ইল্লা আ'ইশুল আখিরাহ"। তেমনি একজন মানুষ ছিলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ। মহান এই মানুষটিকে আমি আর রকমারি বিশেষণে বিশেষায়িত করছি না। কারণ, তিনি যেমন ছিলেন, যা ছিলেন, সবগুলোর বিশেষত্ব সামনে রেখে পদবী লেখা শুরু করলে অনেক পদবীই লেখা যাবে। কোন প্রয়োজন নেই। ইলমে হাদীসের একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে তিনি ছিলেন একজন শায়খুল হাদীস এবং মুহাদ্দিস, এটাই হচ্ছে আমার কাছে উনার সবচেয়ে বড় পদবী। ইলমে হাদীসের প্রচার ও প্রসারে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন ক্ষণজন্মা এই মহামনীষী। যার জলন্ত প্রমাণ রোগ শয্যায় থেকেও তিনি দেশ বিদেশ থেকে আগত অসংখ্য আলেম উলামাদের হাদীসের দারস দিয়ে সনদ প্রদান করেছেন। ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে ও হুইল চেয়ারে বসে তালিবে ইলিমদের হাদীস শোনার চাহিদা মিটানোর চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন।

শৈশব থেকেই 'মুহাদ্দিস ছাহেব' সম্পর্কে আলোচনা শুনতাম। আমার নানা মরহুম মাওলানা আনজব আলী চানপুরী (রহঃ) ও আমার আব্বা মরহুম মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক উদয়পুরী (রহঃ) আমাদের বাড়িতে বসে কী একটা বিষয়ে খোশ মেজাজে আলাপ আলোচনা করতেন। আম্মাও শরীক হতেন আলোচনায়। পরে বুঝতে পারলাম নানা ছাহেব মুহাদ্দিস ছাহেবের মেয়েকে একমাত্র পুত্রের বধু হিসেবে কীভাবে ঘরে আনা যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ করতেন স্বীয় দামান্দের সাথে। পরে জেনেছি আব্বা ছিলেন এ বিবাহের অন্যতম পরামর্শদাতা বা ঘটক। ১৯৮৪ ইং সনের এক বর্ষা মৌসুমে ছাতক

উপজেলার দোলার বাজার ইউনিয়নের চানপুর গ্রামের নানার বাড়ীতে শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহঃ) ও আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব (রহঃ) কে জীবনের সর্ব প্রথম দেখা। তখন আমি ৫ম শ্রেণির ছাত্র। মুহাদ্দিস ছাহেব স্বীয় পীর ও মুর্শীদ আল্লামা ফুলতলী ছাহেবকে সাথে নিয়ে চানপুর গিয়েছিলেন বড় মেয়ের সাথে বিবাহের প্রস্তাবিত জামাই আমার মামা মাওলানা আব্দুছ ছালাম আল-মাদানী ছাহেবের গ্রাম ও বাড়ীর অবস্থানসহ ঘর পর্দা পুশিদা ইত্যাদির বাস্তবতা পরিদর্শন করার জন্য। অবশ্য নানা ছাহেবের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে আগে থেকেই বাড়ী-ঘর, পুকুর-ঘাট, বাথরুম, পর্দা-পুশিদা ইত্যাদির সাধ্যানুযায়ী মনোরম ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন মুহাদ্দিস ছাহেবের মেয়েকে পুত্র বধু হিসেবে ঘরে তোলার খাহিশ থেকে। আলহামদুলিল্লাহ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলার পরিদর্শন পরবর্তী সম্মতিক্রমে একজন বিখ্যাত আলেমের মেয়েকে একমাত্র পুত্রের বধু হিসেবে ঘরে তোলার নানা ছাহেবের সেই আশা পূরণ হয়েছিল।

সেই ১৯৮৪ ইং থেকে ২০২২ইং সনের ৭ ফেব্রুয়ারি প্রায় ৩৮ বছর মুহাদ্দিস ছাহেবকে নানা হিসেবে দেখেছি এবং তিনি নাতি হিসেবে স্নেহ মমতা করতেন। ইন্তেকালের দিন ৭ ফেব্রুয়ারি বাদ জোহর আমরা উদয়পুর থেকে রারাই ৮ জনের এক কাফেলা গিয়েছিলাম তিনিকে দেখার জন্য। বিকাল ৪ ঘটিকায় শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে যখন দেখলাম চোখ বন্ধ অবস্থায় আল্লাহু আল্লাহু জবান দিয়ে উচ্চারণ করেছেন তখন মামা বলছিলেন আব্বাজান আব্দুল আজিজ এসেছে, তখনই চোখ খুলে চেয়েছিলেন সেই স্মৃতি জীবনে ভুলতে পারব না। অতঃপর বিদায় নিয়ে সিলেট আসার পথে গোলাপগঞ্জে আসা মাত্রই জানতে পারলাম মুহাদ্দিস ছাহেব মাওলায়ে হাকীকীর ডাকে সাড়া দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সুদীর্ঘ ৩৮ বছর মুহাদ্দিস ছাহেব (রহঃ) কে দেখেছি হাদীসে নববীর একজন নিরলস খাদিম হিসেবে। হায়াতে জিন্দেগীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চারিত্রিক গুনাবলী হুবহু ধারন করে চলেছেন। তিনি সকলের সাথে কোমল ব্যবহার করতেন এবং আন্তরিকতা পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। যে কেউ বিনা দ্বিধায় তাঁর কাছে আসত এবং মনের কথা প্রকাশ করতে পারতো। কারো ভুল ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে তিনি পরম আন্তরিকতার সাথে তা শোধরে দিতেন। নিম্ন আওয়াজে কথা বলতেন, মুচকি হাসতেন, কখনও হা হা করে হাসতে দেখিনি। আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। আগে সালাম দিতেন, মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতেন। বিশেষত: বিনয়ী ও নম্রতার গুণ ছিল সর্বজন স্বীকৃত। আত্মীয়তার সুবাদে যে বিষয়টি আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি তা হলো মেজবান হিসেবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর স্বতঃস্ফুর্ত মেহমানদারী, আন্তরিকতা পূর্ণ পরিবেশে আদর আপ্যায়ন করানো ছিল অন্যতম একটি

গুণ। এক্ষেত্রে যেন আল্লাহর রাছুলের সেই হাদীস 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে সে যেন মেহমানদের সমাদর করে।' এর বাস্তব শিক্ষা তার জীবনে বাস্তবায়ন করেছিলেন।

সহকর্মী ও অধীনস্তদের সাথে সহনশীল সম্পর্ক রাখতেন। বৃহত্তর সিলেটের মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের প্রাচীন সংগঠন বাংলাদেশ আনজুমানে মাদারিছে আরাবিয়ার চেয়ারম্যান পদে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি সুবহানীঘাট হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার পাশাপাশি (১৯৯৭-২০০৪) উক্ত সংগঠনের অফিস সম্পাদকের পদে দায়িত্ব পালন করেছি। সেই সুবাদে লতিফিয়া বৃত্তি পরীক্ষা, প্রশ্ন, সিলেবাস প্রণয়ন, সনদ, রেজুলেশন লেখাসহ অনেক কাজে তিনির দ্বারস্ত' হয়েছি। কিন্তু কাজে ভুল পরিলক্ষিত হলেও অসন্তোষ প্রকাশ করেননি বরং মনোরমভাবে শোধরে দিতেন। এক্ষেত্রেও যেন খাদিমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সেই কথা "আমি দশ বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। তিনি কোনোদিন উফ শব্দটি পর্যন্ত আমাকে বলেননি। এমনকি এ কাজটি কেন করেছ? বা এটা কেন করনি? এমন কথা কোনো দিন বলেননি।' এর বাস্তব প্রতিফলন মুহাদ্দিস ছাহেবের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে উসওয়াতুন হাসানার সর্বোত্তম প্রতিচ্ছবি ছিলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ। লিখনীর কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় মুহাদ্দিস ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ এর জীবনের অন্যান্য দিকের আলোচনায় না গিয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ করি তিনি যেন মুহাদ্দিস ছাহেবকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন। আমীন।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গোবিন্দনগর ফজলিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ।

দূর হতে দেখা

সহুল আহমদ

আল্লামা মো. হবিবুর রহমান, তামাম দুনিয়ায় যিনি হাদীসশাস্ত্র বিশারদ হিসেবে মশহুর, তিনি সম্পর্কে আমার নানা, আরও নির্দিষ্ট করে বললে আমার চাচার শ্বশুর। কুটুম্বিতার এই সুতো দিয়ে ঘনিষ্ঠতার মাত্রা বিচার করা অসম্ভব। প্রচলিত সমাজ এই কুটুম্বিতার জন্য যতটুকু সীমা বেঁধে দিয়েছে, তাঁর ক্ষেত্রে তা ছড়িয়ে গিয়ে অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে। অন্যদিকে, কুটুম্বিতা তাঁর সাথে পরিচয়ের মাত্র একটা দিক। তিনি আমার ওস্তাদ (কোরান শরিফের প্রথম তালিম তাঁর থেকেই পেয়েছিলাম), আমার আম্মার ওস্তাদ, আমার আব্বার ওস্তাদ। তাঁর মত একজন নামজাদা ওস্তাদকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করা, এমনকি দুয়েকটা নোক্তা পেশ করাও, আমার মতো কারোর জন্য বেয়াদবির সামিল। বেয়াদবি, এই কারণে যে, নানার নাতি-নাতনিদের মধ্যে এতোটা বেপথে বোধহয় আর কেউই যায়নি, যতটা এই অধম গিয়েছে। অদ্ভূত কারণে, বিচিত্র 'পথে' চলার বাসনা থাকা সত্ত্বেও, আমার অনুমান নানা তা আন্দাজও করেছিলেন, তবু আমাকে তাঁর উদার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেননি। আরেকটা কারণে বেয়াদবি: নানার সকল নাতি-নাতনিদের মধ্যে, সময়ের দিক থেকে, সর্বাধিক কম চিন্তার আদান-প্রদান বোধহয় আমার সাথেই হয়েছে। সময়ের পরিমাণে সেটা এতো অল্প যে তাতে স্মৃতিচারণ করার মতো কিছুই ঝুলিতে নেই। নানার অজস্র মুরিদান যেমন ওয়াজ শুনেছেন, আমল করেছেন, পায়ের ধারে বসে ক্লাস করেছেন, তার কোনোটাই আমার ভাগ্যে ঘটেনি। আমার আছে কেবল দূর হতে মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে দেখার স্মৃতি। তবে, সান্তনা হচ্ছে যে, নানার সাথে যতটুকু সময় কাটিয়েছে, সেটার একবিন্দুও নষ্ট করিনি। এই লেখার একমাত্র সম্বল ওই নিদারুণ সময়টুকু।

নানার সাথে আমার যতবার কথা হয়েছে, নানা প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে আমাদের বাৎচিত এগিয়েছে। আমার বে-আমলি জিন্দেগি এবং 'ইহজাগতিক' শিক্ষার সাথে আমার রুটিরুজির যুক্ততা এমনসব সওয়াল করতে আমাকে বাধ্য করতো, যা নানার অন্যান্য মুরিদানের কাছে হয়তোবা কায়দা-সিফারার মতো। নানার মুখে ওসব নিয়ে বিরক্তির ছিটেফোঁটাও দেখিনি, বরঞ্চ ধৈর্য ধরে বিচিত্র কিসিমের 'উদ্ভট' সমস্ত সওয়ালের জবাব দিয়েছেন। কখনো কখনো তার পাশে থাকা আরও ঘনিষ্ঠ স্বজন, হয়তো জরুরি কথা বলার এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বিরক্ত মুখে শ্যোণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তবে নানা কখনো আমাকে অতৃপ্ত অবস্থায় উঠতে দেননি। বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট এমন সওয়াল জবাবের ভেতর থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি, বা এখন পিছনের দিকে তাকিয়ে যে শিক্ষাটা নিতে চাই, সে বিষয়ে দুটো নোক্তা পেশ করতে চাই। এর সাথে নানার বিষয়ে আমার

দুটো পর্যবেক্ষণ যেমন ফুটে উঠবে, তেমনি এই শিক্ষা যে আমাকে এখন পর্যন্ত প্রভাবিত করে যাচ্ছে তার কিছুটা আলামত হয়তোবা ফুটে উঠবে।

'আপন' বনাম 'পর'

সাল, তারিখ কিছুই মনে নেই; গল্পে গল্পে নানার সাথে গবেষণামূলক কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করার আগ্রহ প্রকাশ করেছি। নানা শুনে খুশি হলেন কিনা বোঝা গেলো না। আরও কয়েক বছর পর, তখন কাজে যুক্ত হয়ে গিয়েছি। নানা জিজ্ঞেস করলেন, কোন ধরনের গবেষণার কাজে যুক্ত আছি। সবকিছুর আদ্যোপান্ত শুনতে চাইলেন। আমি যতটা পারি নানাকে বললাম। আমার কাজের ক্ষেত্র বোঝানোর চেষ্টা করলাম। এরপর তিনি আমাকে 'অরিয়েন্টালিজম' নিয়ে বলা শুরু করলেন। বেশ আগে, তখন সবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি, একবার গল্পোচ্ছলে প্রাচ্যবাদ বা অরিয়েন্টালিজম নিয়ে বলেছিলেন। সত্য কথা তখনো কিছু বুঝিনি! কিন্তু এইবার যখন বললেন, আমি বেশ অবাক হলাম বিদ্যায়তনিক জগতের হালফিল সংবাদ বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল।

ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদ আঠারো-উনিশ শতকে নির্মিত এক প্রকাণ্ড পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ড যার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল প্রাচ্য বলতে যাকে বোঝানো হয় তার ভাষা, শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ, ইতিহাস নিয়ে অধ্যয়ন। এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাইদ ১৯৭৮ সালে এই নামে একখান কিতাব লিখে বাজিমাত করলেন। তিনি দেখালেন, প্রাচ্যবাদ কোনো নিরীহ জ্ঞানকাণ্ড নয়, বরঞ্চ প্রাচ্যের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ছড়ি ঘুরানোর পশ্চিমাদের আরেক কায়দা। এটা এক দৃষ্টিভঙ্গি, একধরনের রেপ্রিজেন্টেশন; প্রাচ্যের মানুষ, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে পশ্চিমাদের স্টেরিওটাইপিং। এবং এটা প্রাচ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের এক শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার। সাইদের এই কাজের পর একদিকে যেমন উত্তর-উপনিবেশবাদী সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি এশিয়া, আফ্রিকা বা মধ্যপ্রাচ্যের সমাজ ধর্ম সংস্কৃতি ভাষা নিয়ে নতুন ধরনের গবেষণার ঢেউ লেগেছে। প্রাচ্যবাদ যে 'আপন' বনাম 'পর' এর খেলা চালিয়ে যেতে থাকে, নতুন ধরনের গবেষণা সেই 'আপন' ও 'পর' বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে চায়। প্রাচ্যবাদের কাছে পশ্চিমা 'আপন' এর বিপরীতে সর্বদা রয়েছে 'পর' প্রাচ্য। এই নির্মাণে পশ্চিমা যদি হয় 'প্রগতিশীল' তাহলে প্রাচ্য অবধারিতভাবে 'প্রতিক্রিয়াশীল'; পশ্চিম যদি হয় 'শক্তিশালী', প্রাচ্য হবে 'দুর্বল'।

সাইদের কাজ প্রকাশের পর প্রাচ্যবাদ সম্পর্কে সচেতনতা ছাড়া সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে ইসলাম নিয়ে কাজ করছেন, তাদেরকে প্রাচ্যবাদ নিয়ে বেশ সচেতন বলে মনে হয়। তবে পশ্চিমের বিদ্যায়জগতের লোকমাত্রই প্রাচ্যবাদী এমন কিছু সরলীকরণ অনুমানও কাজ করে আমাদের মধ্যে। এই ধরনের সংস্কার আসলে পরিহার করা উচিৎ। আমি এখানেই নানার কথা বলবো। নানা আমাকে বারেবারে বলতেন, গবেষণার পদ্ধতির দিকে খেয়াল রাখতে যেন পদ্ধতিতে প্রাচ্যবাদের

আছর না পড়ে। পদ্ধতির দিকে যখন আপনি নজর দিবেন, তখন কে কোথাকার লোক সেটা অনেক বেশি গৌণ হয়ে 'টেক্সট' মূখ্য হয়ে উঠবে। প্রাচ্যবাদের সাথে ইসলামের এক জটিল সম্পর্কের কারণেই বোধহয় নানা গবেষণার আর কোনো দিক নিয়ে আমাকে না বলে কেবল প্রাচ্যবাদ বিষয়ে সতর্ক করতেন। এই বিষয়ে আরও বহুত আলাপের দরকার ছিল নানার সাথে। কিন্তু, এগুলো অপূর্ণই রয়ে গেলো।

আল্লাহ ভালো জানেন

এখন যে বিষয়টা বলবো, এটা নানার সাথে আমার বিশেষ কোনো স্মৃতি নয়। কিন্তু এটা আমার একেবারে দৈনন্দিন জীবনেও কাজে লাগে। নানাকে যখন কোনো ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে গিয়েছি যেমন ব্যাংকে কাজ করা হালাল হবে নাকি হারাম হবে? ইত্যাদি তখন নানা সরাসরি হ্যাঁ বা না এমন কোনো উত্তর দিতেন না। নানা প্রচুর দলিল দিয়ে কথা বলে একটা রায় দিতেন এবং বলতেন 'বাকিটা আল্লাহ ভালো জানেন'। আমি খেয়াল করেছি এটা নানা প্রায় সকলের বেলাতেই বলতেন। এর উপস্থিতি এতো প্রবল ছিল যে কখনো আলাদা করার জরুরতও পড়েনি। কিছুটা বুঝ হওয়ার পর বুঝি ইসলামি আইনশাস্ত্রের অন্যতম জ্ঞানতাত্ত্বিক প্যারাডাইম হচ্ছে কোনো বিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছার সর্বোত্তম প্রকাশ মানুষের দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। ফলে, ইসলামি ধ্রুপদী জ্ঞানজগতের ভাষার মধ্যেই এই 'অনিশ্চয়তা'র প্রবণতা রয়েছে, অর্থাৎ সর্বদা 'সম্ভাবনা'র উপস্থিতি রয়েছে। ফলে, অনেক বুজুর্গরা যখন ফতোয়া দেন তখন শেষে এই 'আল্লাহ ভালো জানেন' বলে ক্ষান্ত দেন। এই দিক থেকে নানা, কোনো সন্দেহ নেই, ইসলামের জ্ঞানজাগতিক দীর্ঘ সিলসিলার আরেকজন উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি।

এর আরেকটা ফজিলত আছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। বলা যায়, আমি ফজিলত খুঁজে পাই। 'আল্লাহ ভালো জানেন' এর যেমন ঐতিহাসিক জ্ঞানতাত্ত্বিক ও ধর্মতাত্ত্বিক সিলসিলা রয়েছে, তেমনি এটাকে একটা প্রবণতা হিসেবে পাঠ করতেও আমি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী করার যে প্রবাদ লোকমুখে আমরা শুনে আসি, এটা তারও একটা আলামত। এই প্রবণতা নিজেকে বা নিজের মতকে 'বেহতর' বলে গণ্য করতে মানা করে। উপরে যে 'আপন' বনাম 'পর' এর প্রাচ্যবাদী নির্মাণের কথা বলা হয়েছে সেটাও ছিল আপনকে শ্রেষ্ঠ বা বেহতর ভাবার বিপরীতে 'পর'কে 'কম ভালো" বা "মন্দের ভালো" ভাবা। কিন্তু আমি যে প্রবণতার কথা বলছি সেটা এই নির্মাণকেই নস্যাৎ করে দেয়। বর্তমান দুনিয়াতে, যখন কিনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের খাতিরে, একটি অসম্পাদিত জনপরিসর বিরাজ করছে, তখন আমরা নানাবিধ মাধ্যমে দেদারছে ফতোয়া শুনতে পাচ্ছি। প্রতিটি ফতোয়া যেন একেকটি 'নিশ্চিত' বাণী। একেক মহল যেন আরেক মহলকে 'বিনাশ' করতেই বেশি উদ্যোত। ইসলামি জ্ঞানজগতের যে বিরাট সিলসিলা তার ন্যূনতম আছরও এসব ফতোয়াবাজির মধ্যে থাকে

না। কিন্তু আমরা যদি ন্যূনতম মানবিক সমাজ গড়তে চাই, যেখানে একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসবাস করতে চাই, কেউ কাউকে বিনাশ না করে নিজেদের মতকে বাঁচিয়ে রেখে নিজেদের আমল করতে চাই, নিজেদের জ্ঞানজাগতিক কর্মকাণ্ডকে ক্রিয়াশীল রাখতে চাই, তাহলে ঐ 'আল্লাহ ভালো জানেন' এর মধ্যে যে প্রবণতা লুকিয়ে আছে সেটাকে ব্যবহার করা শিখতে হবে।

আজকের এই বিপজ্জনক দুনিয়ার চলতি পথে আমি নানার এই দিকটাকে সর্বাধিক স্মরণে রাখি বা রাখতে চাই। এটা দুঃখজনক যে, নানার সহবত আমি বেশি পাইনি। আমার স্মৃতির ভাণ্ডার অতি অল্প। কিন্তু যে দুটোর কথা বললাম, সেগুলোর প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা আকলমান মাত্রই ঠাহর করতে পারবেন বলে আমি অনুমান করি। আল্লাহর কাছে নানার বেহেশতের জন্য দোয়া করি।

লেখক: গবেষক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

তারিখে দিমাস্কের আফসোস রয়ে যাবে আজীবন....

মাসউদ আহমদ

জ্ঞান চর্চার হাজার বছরের ঐতিহ্য বহন করে যারা পৃথিবীতে চিরভাস্বর তাঁদের মধ্যে অবশ্যই মহান হয়ে থাকবেন শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান। আমার নিকট তাঁর ভিন্ন আরেকটি পরিচয় হল বইয়ের প্রতি পরম মমতাবান, বাহুল্য মনে না করলে এরকম বলতে পারি তিনি ছিলেন ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি। এটা দাবি করছি না, ঠোটের আগায় নিজ দলীয় দলীল প্রমাণাদি বহনকারী প্রচলিত মঞ্চ কাপানো হস্তীদের মত ছিলেন। বরং এখানেই ছিল তাঁর স্বাতন্ত্র এবং স্বকীয়তা। পূর্বসূরিদের জ্ঞান ঐতিহ্যের তলদেশ থেকে মুক্তা গুলো জমা করে নিজ ললাটে লিপিবদ্ধ করতেন, পাছে অহংকার পেয়ে না বসে সেজন্য প্রায়ই নিজেকে কাঠ-মৌলভী দাবি করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। বরং দীপ্তভরে তাঁর দরাজ কণ্ঠে বহুবার শুনেছি- 'এই মাসয়ালা (জিজ্ঞাসা) আমার জানা নেই, অথবা 'এই বিষয়ে আমার তাহকীক (নিরিক্ষণ) নেই'। ইতিহাস চষে এরকম মাণিক্যের দেখা হার হামেশাই পাবেন আমাদের সালাফদের মধ্যে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তো অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরেই বলতেন- 'লা আদরী' বা আমি জানি না।

শায়খুল হাদীসের চেহারা স্মৃতিতে আসলেই প্রথমেই উনার শয়ন কক্ষের অবস্থা স্মরনে আসে। কয়েকটি পুরাতন আলমারিতে কিতাবের স্তুপ, বিছানার ডান পাশে কিতাব, বাম পাশেও কিতাব। একমাত্র টি-টেবলও কিতাবে ভরপুর। কখনো এমন হয়েছে উনার রুমের কিতাবগুলো এক নজর শুধু শিরোনাম পড়তেই ক্লান্তি অবসাদ শরীরে নেমে এসেছে। একবারের ঘটনা (সম্ভবত ২০১৩ সালের), রমজান মাস। শায়খুল হাদীস (রহ) অসুস্থতার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। যথারীতি অনুমতি নিয়ে সাক্ষাৎ লাভের জন্য যোহরের পর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সারল্যে যারপরনাই অবাক হই। প্রচণ্ড গরমে একা একা মাটিতে শুয়ে আছেন। তাঁর কণ্ঠে ডাক আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষায় রইলাম ছোট বৈঠকখানার প্রকোষ্ঠে। যথাসময়ে রুমে ডাক পড়ল এবং তটস্থ অবস্থায় মাটিতে তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। কুশলাদি বিনিময়ের পর মন থেকে মোটেও আশি বছর পেরোনো বৃদ্ধ অসুস্থ এই মহীরুহকে বিরক্ত করতে মন চাচ্ছিল না। তখন আমার হাতে থাকা দুইটি কিতাব তাঁর করকমলে উপস্থিত করি। এরপর থেকেই আমার সামনের এই বটবৃক্ষ তাঁর মতন শারীরিক কসরত বদলাতে থাকেন। অসুস্থতার মলিন বদন ক্রমান্বয়ে বিলীন হতে থাকে।

তন্মধ্যে একটি কিতাব ছিল- আব্দুর রশিদ নোমানী (রহ)'র 'ইমাম ইবন মাজা ওয়া কিতাবুহুস সুনান', যেটির তাহকীক এবং তা'লীক করেছেন শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু

গুদ্দাহ (রহ)। আরেকটি হল বাংলাদেশের উলুমুল হাদীসের উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা আল-মুতাফান্নিন শায়খ আব্দুল মালিক (আল্লাহ পাক উনার খেদমতকে আরো বিস্তৃত করুন এবং হেফাজত করুন) এর 'আল মাদখাল ইলা উলুমিল হাদীস আশ-শরীফ'।

হাদীসের প্রত্যেক ছাত্র এবং উস্তায মাত্রই শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ এবং তাঁর ছাত্র মাওলানা আব্দুল মালিক সম্পর্কে কম-বেশ জানেন। শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ এর হাতে আবুল মালিক সাহেবের কিতাব তুলে দেয়া মাত্রই স্বীকারোক্তি দিলেন 'বড়ই আ'জীম এক কিতাব' এবং 'ফাওয়ায়েদে ভরপুর'। জানালেন কিতাবটির অদ্যোপ্রান্ত কীভাবে পড়েছেন এবং কিতাব পড়ার সময় তিনি বুঝতেই পারেন নি একজন বাংগালী আলেমের কিতাব পড়ছেন। মাওলানা আব্দুল মালিক সাহেব স্বাভাবিক বয়সের হিসেবে মুহাদ্দিস সাহেবের যেকোন ছাত্রের বয়সী হবেন। কিন্তু আহলে ইলমের শান তো এটাই মানুষকে ইলমের দিক থেকে যাচাই করবেন, নিজের শতবর্ষী মস্তক ঝুকিয়ে দিতে দ্বিধা করবেন না সদ্য যৌবনে উপনীত হওয়া যুবকের কদমে। যেমনটি করেছেন আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম যুহরী, হাটুর বয়সী ইমাম মালেক বিন আনাস থেকে হাদীসের দারস নেয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন ইলম এবং বিনয়ের নতুন দিগন্ত।

দ্বিতীয় কিতাবে শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করলেন। পাঠক মাত্রই জানা প্রয়োজন, আবু গুদ্দাহ সাহেবের সাথে হেরেমের পবিত্র আঙ্গিনায় সাক্ষাত হয়েছিল আমাদের মুসনিদ, সনদ আলোকিত করা সূর্য সন্তান আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী আল বারাকাতী (রহ)। মুফতি সাহেবের হাত ধরে সেদিনের যুবা আবু গুদ্দাহ দাবি করেছিলেন হাদীসের ইজাযাত এবং সনদ লাভের। মুফতি সাহেব উম্মাহর সহস্রাদিক বছরের আমানত দিয়ে এসেছিলেন সিরিয়ান যুবক আবু গুদ্দাহকে। এই যুবকই পরবর্তীতে হয়েছিলেন শায়খুল ইসলাম যাহিদ কাওসারীর যোগ্য উত্তরসূরি। ইমামুল হিন্দ আবুল হাসানাৎ আব্দুল হাঈ লাখনৌয়ী (রহ) এর তাসনীফাতের পুনরীজ্জবনকারী। এছাড়াও ফিকহে হানাফী এবং হাদীস শাস্ত্রের আযহারী এই শায়খের মাধ্যমে আল্লাহ পাক কী পরিমাণ খেদমত করিয়েছেন উম্মাহ কখনোই সেটা থেকে গাফেল থাকতে পারবে না। মুহাদ্দিস ছাহেব (রহ) শায়খ আবু গুদ্দাহ'র কিতাব হাতে নিয়েই নিজের জীবনের একটি স্মৃতিচারণ করলেন। দুবাই বিচারক থাকাকালীন সময়ে অফিসের কলিগ ছিলেন কট্টর লা-মাযহাবী সালাফী মাসলাকের এক আলেম। উনার মাধ্যমে শায়খ আবু গুদ্দাহ বরাবর একটি চিঠি পাঠিয়ে নিজের মুগ্ধতা জানান দিয়েছিলেন। আমি গভীর বিস্ময়ে শুনছিলাম তাঁর কথা গুলো। হাদীসের ছাত্রদের জন্য আবু গুদ্দাহকে অধ্যায়ন করা কতটুকু অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে তাও শুনিয়ে দিলেন। জানালেন তাহকীক করে পড়ার গুরুত্ব এবং গায়র তাহকীকের কুফল।

আসরের আযানে আমার মোহভঙ্গ ঘটলো এবং বিদায় নিলাম। আবছা অন্ধকারে নির্জন

রুমে বর্ষীয়ান শায়খুল হাদীস তখন তাঁর অমূল্য পাঠ আমাকে দিলেন- 'কিতাবের সাথে আমার সময়টাকে আনন্দময় করার জন্য আমার পক্ষ থেকে প্রতিদান দেবার কিছু নেই, আমি গরীব মানুষ তবে আমার আল্লাহ গরিব নন (এটা তাঁর কমন ডায়লগ ছিল, যারা চিনেন ধরতে পারবেন)। তাঁর খাযানা থেকে কিছু পাওয়ার আর্জি করলাম'। চিত্তকে প্রশান্ত করে বের হলাম, মুহাদ্দিস ছাহেব আমার সাথে সাথে হেটে হেটে বর্তমান তাঁর বাড়ির মসজিদ পর্যন্ত আসলেন এবং বিদায় জানালেন। যখন প্রবেশ করেছিলাম অসুস্থতার মলীনতায় ছিলেন অবসন্ন, আর ফিরে আসার সময় তাঁর চেহারা উজ্জ্বল ইলমের নূরানী আভায় এবং অসুস্থতার লেশ মাত্র নেই। হ্যাঁ! এরাই আমাদের সালাফ, উনারাই আমাদের বুযুর্গ। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইরাকের বিখ্যাত কবি 'আল-ফারাযদাক' এর প্রতি যিনি বলেছিলেন-

أُولَئِكَ آبَائِي، فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ، = إذا جَمَعَتْنا يا جَرِيرُ المَجَامِعُ

উনারা আমাদের পূর্বসূরী, পারলে তাঁদের মত কাউকে নিয়ে আসো।

শায়খুল হাদীসের ইলমী মেজাজ কেমন ছিল? সাধারণের যেকোন জিজ্ঞাসায় তিনি যথাসম্ভব সহজ ভাবে উপযোগী করে যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন। কিন্তু তালেবে ইলমদের জন্য তাঁর সমাধান এতটা সহজ ছিল না। চার-পাঁচটা কিতাবের নাম বলে দিতেন এবং মুতায়ালার উৎসাহ সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকতেন। অধম ব্যক্তিগতভাবে কখনো দেখিনি তাঁকে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিতে বরং সালাফদের মুক্তামালা ছড়িয়ে দিতেন, 'এবার যাও কুড়িয়ে নাও মানিক রতন'- অনেকটা এরকম ছিল তাঁর অভ্যাস। একবার কুতুবখানায় জকিগঞ্জের এক মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস আরজ করলেন- 'হুজুর, সময়ের বরকত পাচ্ছি না। কিছু আমল শিখিয়ে দিন'? প্রত্যুত্তরে জানালেন- 'ইমাম বায়হাকী'র 'ফাদায়েলে আওকাত' মুতায়ালা করুন'। আরেকজন জিজ্ঞেস করলেন- 'ইমাম আযমের উপর আমাদের ভিন্ন ঘরনার কিছু অবুঝ ভাইগণ শানের খেলাফ কথা বলেন, কীভাবে জবাব দেব'? প্রত্যুত্তরে বললেন- 'মুহাম্মাদ কাসেম আব্দুহু হারেসী'র 'মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন', ড. তাহেরুল কাদেরীর 'ইমাম আযম আওর ইলমে হাদীস' পাঠ করুন ইনশাআল্লাহ্ পরিষ্কার হয়ে যাবে'। শরয়ী সিদ্ধান্তে প্রথাগত কোন দল-উপদল বা মাসলাক প্রীতি থেকে ছিলো যোজন যোজন দূরত্বে তাঁর অবস্থান।

ছাত্রজীবনে কামিলে বুখারী শরীফের সাথে একত্রে ফাতহুল বারী এবং উমদাতুল কারী উভয়টি পাশাপাশি মুতায়ালা করার গল্প বহুবার তাঁর জবান থেকে শুনা হয়েছে। মিশর থেকে বহু শখ করে কিনেছিলেন ড. সাঈদ মামদুহ'র তাহকীক করা موسوعة العلامة المتحدث المتفنن سيدي الشريف عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسني গ্রন্থটি, যা উনিশ খণ্ডে ব্যপৃত এবং প্রতিটি খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠা বা ততোধিক। ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যখন

আর শরীরকে নিজের অধীনস্ত রাখতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন প্রতিনিয়ত, তাঁর পূর্বে প্রায় ১১-১২ খণ্ড সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একবার আফসোস করে বলেছিলেন- 'আগের মত পড়তে পারি না, চোখে দেখি না, স্মরনে থাকে না কিছু, উসুলী বা কালামী কঠিন আলোচনা বুঝে আসে না, একাধিকবার ইবারত পড়েও মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারি না'। আশি বছর বয়স্ক বৃদ্ধের মুখে অবলীলায় নিজের অক্ষমতার সহজ স্বীকারোক্তি পেয়ে অন্ততপক্ষে এটা অনুধাবন করেছিলাম যে, এরা এই যামানায় হয়তো জন্মগ্রহণ করছেন কিন্তু তাঁদের শিখড় ইমাম যাহাবী, ইবন কাসীর বা মিযযিদের যামানায় প্রোথিত।

দামেস্ক সফরে শায়খুল হাদীস (রহ) গিয়েছিলেন সপ্তম শতকের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, হাফেজে হাদীস, ইমামুদ দুনিয়া, রিজালের বিখ্যাত কিতাব 'তাহযীবুল কামাল'র মুসান্নিফ জামাল উদ্দিন মিযযী (রহ) এর গ্রামের বাড়ি 'মিযযা' তে। যদিও পূর্বেই উমাইয়ি মসজিদে যামানার আরেকজন আশ্চর্য প্রতিভা তকী উদ্দিন ইবন তাইমিয়া এবং ইমাম মিযযির পাশাপাশি কবর হওয়ায় জিয়ারত সম্পন্ন করেন। সেখানে ইমাম মিযযির অধস্তন বংশধর নাতির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ইলমি ইস্তেফাদা হাসিল করেন। মুহাদ্দিস ছাহেব অসুস্থাবস্থায় আমার সাথে ঘরোয়া পরিবেশে এই অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। ইমাম মিযযী'র নাতি ছিলেন ভার্সিটির প্রফেসর। তিনি নাকি প্রায়ই কথার ফাকে জিজ্ঞেস করেছেন- 'তোমাদের বাংলাদেশের মানুষ কীভাবে আরবী কথা বলতে পার'? মুহাদ্দিস ছাহেব তাঁর সীরাতের 'হাদিয়াতুল লাবীব' গ্রন্থটি ইমাম মিযযীর নাতির হাতে উপহার দিয়েছিলেন। তিনি তখন কিতাবটি হাতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আশ পাশের লোকদের জড়ো করে দেখাতে লাগলেন যে, 'এই কিতাবটি সিরাতে মুস্তাফার এবং এটি বাংগালী এক আলেম আরবী ভাষায় লিখেছেন'।

অসুস্থ অবস্থায় মুহাদ্দিস ছাহেব (রহ) এর অবস্থা যারা অবলোকন করেছেন তারাই জানেন কী পরিমাণ মর্মন্তুদ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এবং নিদারুন যাতনায় দিনাতিপাত করেছেন। তখন ঢাকা থেকে এক তালিবে ইলম তাঁর জন্য শায়খ সাঈদ মামদুহের চতুর্দশ শতাব্দীর মুহাদ্দিসগনের জীবনী সংলগ্ন কিতাব 'আল-ইত্তেজাহাতুল হাদীসিয়া' কিতাবটি হাদিয়া পেশ করলেন। তাঁর শারীরিক মাজুরির কারনে চোখেও দেখেন না ঠিকমত, আবার উটে বসতেও পারেন না। পাশে তাঁর সেবায় নিয়োজিত খাদেমকে অনুরোধ করলেন কিছু সময় তাঁকে ডান কাথে শোয়ানোর জন্য এবং আলো ধরে রাখার জন্য কিতাবের উপর। নিবিস্ট মনে পড়তেই থাকলেন বহু সময় পর্যন্ত। অসুস্থতা, ক্লেশ নিমিষেই দূর হয়ে গেল তাঁর থেকে। কেমন যেন সালাফদের উজ্জ্বল একটি পাঠ সম্মুখে লাভ করলাম। ইমাম ইবন তাইমিয়া কে অসুস্থ অবস্থায় বৈদ্যগণ বই পুস্তক পড়তে নিষেধ করলেন।

শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ এর অপূরনীয় একটি শখ ছিল তারিখের বিশাল কিতাব ইমাম ইবন আসাকীর রাহিমাহুল্লাহ এর তারিখে দিমাস্ক সংগ্রহ করা। বৈরুতের দারুল

ফিকর থেকে আশি খণ্ডে ছাপা হয়েছিল এই কিতাব। প্রায় ৩৭ হাজার পৃষ্ঠার সমন্বয়ে এই কিতাবটির মহা সমারোহ। সিলেটের আরেক প্রথিতযশা আলেমে দ্বীন বিলপাড়ি ছাহেবের ক্রয়ের সংবাদ শুনে তিনি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন (মুহাদ্দিস ছাহেবের ভাষ্যে কিতাবের জিয়ারত)। কিন্তু কোন এক কারনে সেটিও সম্ভবপর হয় নাই। পরবর্তীতে শায়খুল হাদীসের মাকতাবায় বহু কিতাবের যুগলবন্দী ঘটলেও তারিখে দিমাস্কের আগমন ঘটেনি। বিভিন্ন সময়ে বলতেন- 'আমার ঘর দুয়ারে ইমাম ইবন আসাকীর এর এই মূল্যবান রত্নকে ইজ্জত করে সাজিয়ে রাখারও তো কিছু নেই। কীভাবে এই ভাঙ্গা ঘরে তারিখে দিমাস্কের পদার্পন ঘটবে'? মানুষের বহু কিছুর আফসোস থাকে। গাড়ি, বাড়ি বা সম্পদ অথবা প্রহেলিকায় আচ্ছাদিত কোন কিছুতে। তবে মহা মানবদেরই বোধহয় এমন আফসোস থাকে... তারিখে দিমাস্কের জন্য আফসোস।

আসমান উনকি লাহদ পর শবনম আফসানি করে
সবজায়ে নওরাস্তা ইস ঘর কি নিগাহবানি করে....

আসমান তাঁর কবরে শিশির বর্ষণ করুক
সবুজ গালিচা এই ঘরকে ঢেকে রাখুক..

লেখক: মুহাদ্দিস ছাহেবের নাতি।

আজ মঙ্গলবার

মোঃ জিল্লুর রহমান

সকল প্রশংসা মহান সৃষ্টিকর্তার। অতঃপর সালাত ও সালাম হাবীবে খোদা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি। আল্লাহ তা'লা মানুষকে জমিনে প্রেরণ করেছেন শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য। আর তাঁর এই এবাদত বন্দেগীর পদ্ধতি মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য যুগে যুগে অনেক নবী ও রাসূল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলগণের পরবর্তীতে তাঁদের এই দ্বীন প্রচারের কাজ চালিয়ে গেছেন ধারাবাহিকভাবে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, সালফে সালেহীন, মুহাদ্দিসিন, ওলামায়ে কেরামগণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যে সকল উলামায়ে কেরামগণ এইসব দাওয়াতি দায়িত্ব পালন করেছেন, ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস ইলমে হাদীসের খেদমত করেছেন তাঁদের মধ্য থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম হাদীস বিশারদ, উসতাযুল মুহাদ্দিসীন, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যতম। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, তিনি আমাদের দাদা (আমার দাদার ছোট ভাই)। উনার সম্পর্কে লিখার আমার জ্ঞান বা যোগ্যতা কোনটিই আমার নেই। তবে উনার জীবনের শেষ কিছু দিন সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কিছু উপলব্ধি তুলে ধরতে চাই।

জীবনের শেষ কয়েকটি দিন উনাকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে কয়দিনে আমি তাঁকে দেখেছি একজন জ্ঞানপিপাসু পাঠক হিসেবে এবং হাদীস শরীফ এর দারস প্রদানের প্রতি একজন পিপাসাকাতর ব্যক্তি হিসাবে। জীবনের শেষ দিকে বাড়ির পাশে উনার প্রতিষ্ঠিত মসজিদে প্রতি মঙ্গলবার দারসে হাদীসের আয়োজন করা হয়েছিল। আমি অধম ছিলাম সেই দারসে হাদীস লাইভ সম্প্রচার করার এবং স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থাপনা করার দায়িত্বে। মঙ্গলবার আসলে দেখা যেত উনি যেনো দারসে হাদীসের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। মঙ্গলবার বিকেল বেলা বা আসরের নামাজের সময় উনার সাথে দেখা হলেই বলতেন, জিল্লু আইজ আমার পড়া নু, তোমার মনো আছেনি (জিল্লু আজ আমার পড়ার দিন, তোমার মনে আছে?) উনার এই কথা থেকে বুঝা যায় উনি যেনো মঙ্গলবার হাদীস পাঠদানের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। হাদীসের দারস প্রদানের প্রতি এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে, জীবনের একদম শেষের দিকের দারসগুলোতে প্রায়ই সবার কাছে দোয়া চাইতেন, জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত যেনো قال رسول الله صلى الله عليه وسلم বলে যেতে পারেন। জীবনের একদম শেষের দিকে যখন তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন, কারো সাহায্য ছাড়া শোয়া থেকে উঠে বসতে পারতেন না তখন বিগত কয়েক বছরে বাড়ির যারা কামিল উত্তীর্ণ হয়েছি অথচ কোন

প্রতিষ্ঠানে তাঁর কাছে সরাসরি হাদীস পড়ার সুযোগ হয়নি, সবাই মিলে উনার কাছে আরজি করলাম হাদীস পড়ার জন্য। উনি এই অবস্থায়ও সানন্দে আমাদেরকে বুখারী শরীফের কিছু হাদীসের দারস দিয়ে সনদ প্রদান করলেন। উনার অসুস্থতার এই অবস্থায়ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক লোক, অনেক উলামায়ে কেরাম উনার কাছে হাদীসের দারস নেওয়ার জন্য আসতেন। এত অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনো কাউকে না বলতেন না। কখনো কারো সাহায্য নিয়ে বসে, কখনো হুইল চেয়ারে বসে হাদীসের দারস এবং সনদ প্রদান করতেন।

দাদার অনন্য একটি গুণ ছিলো বই কিতাব পড়ার প্রতি সীমাহীন আগ্রহ। জীবনের শেষ দিকে শয্যাশায়ী অবস্থায়ও যখন নিজ হাতে বই কিতাব ধরে রাখার সামর্থ্য ছিল না তখনো পড়ার চেষ্টা করতেন এবং পড়তেন। একদিনের একটি ঘটনা, আমি দাদার খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন একটি বই পড়ার প্রতি উনার আগ্রহ হলো। কিন্তু নিজে বসে থাকার কিংবা শোয়ে বইটি ধরে রাখার মত শারীরিক অবস্থা ছিল না। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি আমাকে বইটি পড়ে শোনাও। আমি বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উনার পাশে বসে পড়ে শুনালাম। পড়ার মাঝে মাঝে আমাকে থামিয়ে যেখানে ব্যাখ্যা করে বুঝানোর প্রয়োজন ছিল আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। আমিও পড়ার মাঝে যেখানে কোন শব্দ বা কোন বাক্য বুঝতে পারলাম না দাদাকে প্রশ্ন করলাম দাদা আমাকে আনন্দে বুঝিয়ে দিলেন।

আজও মনে পড়ে সেই দিনের কথাগুলো। কথায় আছে, নেয়ামত থাকতে নেয়ামতের কদর বুঝা যায় না। দাদাকে হারিয়ে ফেলার পর বুঝতে পারছি কত বড় নেয়ামত আমরা হারিয়েছি। দাদা যখন জীবিত ছিলেন তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি। দাদার জীবনের শেষ কিছু দিন অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। তখন উনার খেদমতে থাকার সুযোগ হয়েছিল। দাদাকে আল্লাহ তায়ালা অসুস্থতা নেয়ামত দিয়ে আমাদেরকে জগৎ বিখ্যাত এক হাদীস বিশারদকে খুব কাছে থাকে দেখার এবং সামান্য কিছু খিদমাত করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সৌভাগ্য আমাদের জন্য বেশি দিন স্থায়ী ছিল না। ইলমে হাদীসের জগৎ বিখ্যাত এক খাদিম মহান মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদেরকে এতিম করে চলে গেলেন ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সোমবার।

আল্লাহ তা'লা দাদাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। দাদাকে যখন শেষ বিদায় দিয়ে আসলাম দিনটি ছিল মঙ্গলবার, বিকেলের শেষের মুহূর্ত। এই তো কিছু দিন আগেও মঙ্গলবার বিকেলে যে মনীষীর দারসে হাদীসের আয়োজন করতাম; অথচ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ মঙ্গলবার তাঁকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিলাম। মঙ্গলবার বিকেল আসলে আজও কানে বাজে দাদার সেই কথা "জিল্লু আইজ আমার পড়ানু, তোমার মনো আছেনি"।

লেখক: মুহাদ্দিস ছাহেবের নাতি (ভ্রাতষ্পুত্রের ছেলে)। শিক্ষক, থানাবাজার লতিফিয়া ফুরকানিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, জকিগনজ, সিলেট।

নানার স্মৃতি

হুমায়রা যাকিয়া

পৃথিবীর সকল প্রাণীই মরনশীল। এ দুনিয়ায় জন্ম নিয়ে আসলে আবার চলে যেতে হয়, এটাই চিরন্তন সত্য। কিন্তু কিছু মানুষ এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে গেলেও মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকেন। তাঁর কৃত মহৎ কাজ মানুষ সর্বদা স্মরণ রাখে। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যুগ যুগ ধরে। তেমনি একজন মহৎপ্রাণ মানুষ ছিলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় নানা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ।

আমাদের নানা ছিলেন একজন কামেল আলেমে দ্বীন, বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব, সুন্নতে রাসূলের পূর্ণ অনুসারী, দাঈ ইলাল্লাহ। যিনি তাঁর সারাজীবন ইলমে হাদীসের খেদমতে নিবেদিত করেছেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি একজন মিষ্টভাষি, হাসিখুশি, নরম হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। আমরা কখনোই তাঁকে কারো সাথে উঁচুগলায় রাগারাগি, কটুকথা বলতে শুনিনি। কারো গিবত করতে শুনিনি। সব মতাদর্শের মানুষের প্রতি তাঁর সম্মান ছিল, এজন্যই সর্বস্তরের মানুষ তাঁকে পছন্দ করতেন, ভালোবাসতেন।

বড় নাতনি হবার সুবাদে নানা-নানুর অকৃত্তিম আদর ভালোবাসা আমি সবচেয়ে বেশিই পেয়েছিলাম। আমার জন্ম হয়েছিল নানাবাড়িতে, আব্বা তখন মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিলেন। আমার নামকরণ ও আকিকা আমার নানাই করেছিলেন।

বেশিরভাগ সময়ই আমরা নানাবাড়িতে নাইওর যেতাম নানার সাথে। সাধারণত সিলেটে রাতে মাহফিল শেষে বাদ ফজর এসে আমাদের নিয়ে যেতেন উনার সাথে। বড়ো উৎসবমুখর ছিল সেইসব সকাল। আম্মার হাতের কিছু রান্না নানার খুব পছন্দের ছিল, আম্মা সেসব বানাতেন।

সিলেট থেকে জকিগন্জ যাওয়ার লম্বা সফরে নানা গাড়ির সামনের সিটে বসে বসে কিতাব পড়তেন। সেই সুন্দর দৃশ্য প্রায়ই আমার চোখে ভাসে। বই-কিতাবের প্রতি নানার ভালোবাসা তো সবার জানা।

সন্ধ্যার পরে পরে নানা ঘরে থাকলে আমাদের নানু, আম্মা, খালা-মামা, আমরা সব ভাইবোন নানার বিছানায় জড়ো হয়ে বসতাম। নানা তখন আমাদের পড়ালেখার খোঁজ নিতেন, আমাদের ভালো কোনো অর্জনের কথা শুনলে আনন্দিত হতেন, উৎসাহিত করতেন আরো বেশি এগিয়ে যাবার। বিভিন্ন দোয়া-দরূদ এবং ভালো আমল শিখিয়ে দিতেন।

মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে আমাদের নানা-নানু এই পৃথিবীর সফর শেষ করে চলে

যান। সেসময়টুকু আমাদের জীবনের এক বেদনা-বিধুর অধ্যায় ছিল। প্রবাসে থাকার দরুন সেসময় নানা-নানুর পাশে থাকতে পারিনি, যে ভালোবাসা আমাকে দিয়েছেন তারা তার কিছুই ফিরত দিতে পারিনি, কোনো হক আদায় করতে পারিনি, এটা আমাকে সবসময় মর্মপীড়া দেয়। আমাদের জীবনে নানার যে শুন্যতা তা কখনোই পুরণ হবার মতো নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দুয়া করি, তিনি যেনো দ্বীনের জন্য করা আমার নানার সকল খেদমতকে সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। তাঁকে যেনো প্রিয় বান্দাদের সাথে জান্নাতুল ফেরদৌসের আ'লা মাকাম দান করেন। আমাদের সবাইকে যেনো নানার মতো দ্বীনের খেদমতে কবুল করেন। আমিন।

লেখিকা: মুহাদ্দিস ছাহেবের বড় নাতনি, যুক্তরাজ্য প্রবাসী।

কামিল বুযুর্গের প্রতিচ্ছবি

লবীব আনওয়ার

মানুষ মরণশীল, কিছুদিনের জন্য পৃথিবীতে আসে। হায়াত শেষ হলেই আবার চলে যেতে হয়। কিছু মানুষ এমন আছেন, যাঁরা দুনিয়া থেকে চলে গেলেও পরবর্তীরা তাঁদের ভুলে না। আসা যাওয়ার ফাঁকে তারা এমন কিছু কাজ করেন, যা তাঁদের অমরত্ব এনে দেয়। যুগযুগ ধরে মানুষ তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। তাঁদের কীর্তিমাখা উপাখ্যান প্রজন্মের পর প্রজন্ম সংরক্ষণ করে রাখে। তেমনি এক ক্ষণজন্মা কিংবদন্তি হলেন- আমাদের শ্রদ্ধেয় নানা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

তাঁর সান্নিধ্য আমাদেরকে মুগ্ধ করত। বট বৃক্ষের ন্যায় ছায়া দিত। আমরা যারা তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি আমাদের হৃদয়ের অভিব্যক্তি কবি চমৎকার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন-

فما راقَني مَنْ لاقَني بعْدَ بُعْدِهِ

ولا شاقَني مَنْ ساقني لِوصالِهِ

অর্থাৎ, তাঁর পরে যতজনের সঙ্গেই আমার সাক্ষাত হয়েছে, কেউ আমাকে তাঁর মতো মুগ্ধ করতে পারেনি। যতজনই আমাকে কাছে টেনেছে, তাঁর মতো কেউ আমার মৃত মনে আগ্রহের জোয়ার জাগাতে পারেনি।

তিনি এক অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বিনয় ও নম্রতা তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিলো। আস্তে আস্তে কথা বলতেন। চলতেনও ধীরে ধীরে-মাটির সাথে মিশে। নিভৃতচারী ছিলেন। নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। বেহুদা কথাবার্তা থেকে বিরত থাকতেন। খাওয়া-দাওয়া করতেন হিসাবমতো।

উলামায়ে কিরামদের শানের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতেন। একান্ত ঘরোয়া পরিবেশেও তাঁকে কখনো কোনো আলিমের গিবত করতে শোনিনি। ইখতেলাফী বিষয়ে আলোচনা করলে খুবই সতর্কতা ও ইনসাফের সাথে আদাবুল ইখতিলাফ বজায় রেখে দালিলীক আলোচনা করতেন। সর্বাবস্থায় ব্যক্তিগত আক্রমণ, খোঁচাখুঁচি পরিহার করে চলতেন।

কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমানভাবে কর্মতৎপর, দায়িত্বশীল ও নিষ্ঠাবান। বিশেষ করে

ইলমে হাদীসের খেদমত তথা শিক্ষকতা ও শিক্ষা বিস্তারে জীবনভর তাঁর নিমগ্নতা ছিল সবচেয়ে বেশি।

তিনি কথাবার্তায়, আচার-আচরণে স্বেচ্ছায় কোনোদিন কাউকে কষ্ট দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। যেকোনো মানুষ তার প্রয়োজনের কথা তাঁর সাথে শেয়ার করা মাত্রই তিনি নিজের সব কষ্টকে বেমালুম ভুলে গিয়ে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। তিনি পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং ছাত্র-শিক্ষকদের খোঁজ রাখতেন।

তিনি আল্লাহর সেই সমস্ত মকবুল বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যারা যশ-খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি থেকে সর্বদা নিরাপদ দূরে অবস্থান করতেন। তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখার মধ্যেই পরম তৃপ্তি অনুভব করতেন। তাঁর খুলুসিয়াত ও সততার বিষয়ে কারো মনেই কোনো সন্দেহ ছিল না।

من تواضع لله رفعه الله

প্রিয় নবীজীর ﷺ এই হাদীসের বাস্তব নমুনা ছিলো তাঁর জীবন।

মদিনা তায়্যিবা এবং এতে শায়িত রাসূলে আরাবী ﷺ এর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিলো। প্রায় সকল আলোচনাতেই রাসূলে কারীম ﷺ মহব্বত, আজমত, দরুদ শরীফ পাঠের ফজিলত প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত হলেও কিছু কথা থাকতো।

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

من كان منكم مستنا فليستن بمن قدمات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যদি কারো আদর্শে আদর্শবান হতে চায়, তাহলে সে যেনো চলে যাওয়া ব্যক্তিদের আদর্শ অনুসরন করে। কারণ, জীবিতরা ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়।

তাঁর মাঝে যে অসাধারণ সব মানবিক গুণাবলীর উপস্থিতি ছিল, দয়াময় আল্লাহ যেনো আমাদেরকেও তা ধারণ ও চর্চা করার সক্ষমতা দেন।

আল্লাহ পাক তাঁর যাবতীয় খেদমতকে কবুল করুন। তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।

জীবনভর যেভাবে হাদীস শরীফের খিদমত করেছেন, কিয়ামতের ময়দানে যেন সাহিবুল হাদীসের ﷺ লিওয়ায়ে হামদের নিচে তাঁর জায়গা হয়, আর আমাদরকেও যেন মহান আল্লাহ সে সমস্ত সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত করেন। আমীন।

লেখক: যুক্তরাজ্য প্রবাসী, শায়খুল হাদীস ছাহেবের বড় নাতি।

নানার হিরণ্ময় স্মৃতি

গালিব আশরাফ

নানাকে নিয়ে কিছু লিখতে হবে, বড় মামার এমন নির্দেশের পর থেকেই এক মধুর সমস্যায় পড়লাম। একদিকে নানার মতো মহান এক মানুষকে নিয়ে লেখা যেন এই অধমের জীবনের 'সবচেয়ে বড় অ্যাসাইনমেন্ট', অন্যদিকে শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে লেখার মতো যোগ্য নিজেকে মনে না করা এবং লিখতে গিয়ে কোনো ভুল করে বসি কী না সেই দুশ্চিন্তা। সত্যি বলতে এই চিন্তায় মাসখানেক কেটে যায় যে, উনার মতো একজনকে নিয়ে কী লিখব, শুরু করব কোথায় আর শেষই বা কোথায়। অবশেষে ভাবলাম নিজের অভিজ্ঞতা ও অগোছালো কিছু স্মৃতিচারণই হোক ভরসা। সেখান থেকে যদি কেউ নানার অনন্য মানবিক গুণাবলির খোঁজ পান, সেটাই হবে এই লেখার সার্থকতা।

নানাবাড়ি মানেই আমাদের কাছে এক দুর্নিবার আকর্ষণের জায়গা। এখনো আট-দশটি শৈশবস্মৃতি লিখতে বসলে সেখানে নানাবাড়িই সবচেয়ে বেশি জুড়ে থাকবে। নানার নরম সুরে 'ভাইয়া' ডাকা, দস্তরখানে বসে খাওয়ার সময় নিজের প্লেট থেকে ভাজা মাছ আমাদের পাতে তুলে দেওয়া, নানা বাড়িতে থাকলে সন্ধ্যার পর নানার কামরায় বসে উনার কাছ থেকে গল্প শোনা। না থাকলে সন্ধ্যার পর খালা-মামাদের গল্পের আসর আর মজার কোনো গল্প শুনে নানুর নিঃশব্দে শরীর কাঁপিয়ে হাসি, আর সমবয়সী মামা-মামাতো ভাইদের সাথে দিনমান দুরন্তপনা।

নানা বাড়িতে থাকতেন খুব কম দিনই। তিনি থাকলে আমাদের রুটিন যেতো বদলে। আমাদের খুব ছোটবেলার সেসব সন্ধ্যায় আম্মা আমাদেরকে নানার পা টিপতে পাঠাতেন। হারিকেনের টিমটিমে আলোয় নানা আধশোয়া হয়ে বই পড়তেন আর বিভিন্ন নবী-রাসুল বা সাহাবিদের গল্প করতেন।

বাইরের ঘরে (পুবের ঘর) নানার সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থীর ভিড় লেগেই থাকত। আম্মা হাতপাখা দিয়ে নানাকে বাতাস করতে পাঠাতেন। মানুষের কত আবদার শুনতেন নানা। কারো মাহফিলের দাওয়াত, কারো এলাকার কোনো সমস্যা থেকে শুরু করে সাংসারিক ঝামেলা পর্যন্ত। কেউ ছোটখাটো কোনো মাস'আলা জিজ্ঞেস করলেও ফলভারে নত গাছের মতো হয়ে মুহাদ্দিস সাহেব শুরু করতেন এভাবে: 'আমার স্বল্প জ্ঞান অনুযায়ী মনে হয়...।' এই কথাটা ছিল নানার সিগনেচার। আজকাল সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে নিজেকে বড় করে দেখানোর এক দৃষ্টিকটু চল শুরু হয়েছে, অথচ বিশাল জ্ঞানের ভান্ডার হয়েও নানাকে কখনো অহংকার করতে আমরা দেখিনি, এমনকি তেমনটি

দেখেছেন বলে কেউ দাবি করতে পারবেন না বলে আমার বিশ্বাস।

নানা মানুষকে সম্মান দিতেন। দর্শনার্থীদের মধ্যে অনেক বড় ব্যক্তিত্বদের যেভাবে সম্মান দিতেন এলাকার হতদরিদ্র কেউ আসলেও নানার কাছ থেকে একই ব্যবহার পেতেন।

নানার সময়ানুবর্তিতা ছিল প্রবাদপ্রতিম। ২০১৫/১৬ সালে নানা ধানমন্ডিস্থ হারুন আই হসপিটালে এসেছেন চোখের ডাক্তার দেখাতে। আমি তখন ধানমন্ডির কাছেই মোহাম্মদপুরে থাকি, আর নানা উঠেছেন সম্ভবত পল্টনের ক্যাপিটাল হোটেলে। দূরত্বে আমার অবস্থানের চেয়ে নানার অবস্থান প্রায় দ্বিগুণ। আমি নানার সময় সচেতনতার বিষয় মাথায় রেখে চ্যালেঞ্জ নিলাম যে, নানার আগেই আমি পৌঁছাব। অনেক আগে বের হয়েও আমি নানার আগে পৌঁছাতে পারলাম না, যথারীতি নানা উনার সফরসঙ্গীসহ আমার আগেই হাজির। আমাকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে নানা বললেন, 'গালিব, তুমিতো মাগলুব অইগেলায় ভাইয়া।' এত মধুমাখা সুরে আমাদের 'ভাইয়া' ডাকতেন নানা!

নানার এই সময়ানুবর্তিতার জন্য ছোটবেলায় নানাকে খানিকটা নিষ্ঠুরও মনে হতো! সাধারণত আমরা গ্রীষ্মের ছুটি বা বার্ষিক পরীক্ষার পর লম্বা ছুটিতে নানাবাড়ি বেড়াতে যেতাম। আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি পাঠাতেন নানা, সিলেট ফেরার সময়ও নানা নিজের গাড়িতেই আমাদের পাঠাতেন। ঘড়ির কাঁটার আগে চলা নানা সাধারণত খুব ভোরে আমাদের আসার ব্যবস্থা করতেন। গাড়ি আমাদের সিলেট দিয়ে আবার নানাকে নিয়ে উনাকে নিয়ে মাদ্‌রাসায় যাবে। তাই ফজর পরেই আমাদের রওনা দিতে হতো। আবার কখনো কখনো নানাকে মাদ্‌রাসায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ি আমাদের নিয়ে সিলেট আসত। ১০-১৫ দিনের লম্বা সফর শেষে আবার বাড়ি ফিরতে হবে, নানুর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না আবার গলা দিয়ে সকালের নাশতাও নামছে না, কিন্তু নানা ঠিকই তাড়া দিচ্ছেন যাতে আমরা দ্রুতই বের হয়ে যাই। আমার কিশোর মনে তখন অভিমানের মেঘ জমত। মনে হতো আরো কয়েকটা মুহূর্ত কেন থাকতে দিচ্ছেন না নানা, একদিন মাদ্‌রাসায় একটু দেরি হলে কি এমন হয়, উনাকে তো আর কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু না, নানা ছিলেন এমনই। সময়ের কোনো হেরফের করা যাবে না।

নানার মধ্যে রসবোধ বা সেন্স অব হিউমার ছিল প্রখর। কাছের মানুষেরা জানতেন, নানা নিজের গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে প্রায়ই অনেক মজার মজার কথা বলতেন, সেখানেও থাকত শিক্ষণীয় অনেক কিছু।

কিতাবের প্রতি নানার দুর্নিবার আকর্ষণের কথাতো সবারই জানা। আমি ২০০৬/০৭ সালে একবার কয়েক দিন একা নানাবাড়িতে থাকার সময় নানার পাশের ছোট কামরায় ঘুমিয়েছি। নানা কোনো কারণে দুই-তিন দিন বাড়ির বাইরে খুব একটা যাননি। সেসময় একবার হিসেব করে দেখলাম নানা দিনে অন্তত ১২-১৩ ঘণ্টা বই পড়েই কাটাচ্ছেন।

সফরে, বাড়িতে বা আমাদের সাথে গল্পের সময় নানাকে কখনো বই ছাড়া দেখিনি। একবার নানা গল্প করেছিলেন গাছবাড়ি মাদ্‌রাসার ছাত্র থাকার সময় মাত্র দুই তিন ঘণ্টা ঘুমাতেন। নানাকে সর্বভুকের মতো পড়তে দেখে এক শিক্ষক উপদেশ দিলেন, 'অত কম ঘুমাইলে তো অসুস্থ অইজিবায়, তোমার বই পড়া তুড়া কমাইতে অইবো।'

২০২১ সালের ১৭ ডিসেম্বর নানা-নানুকে দেখতে গেলাম। নানা-নানু দুজনই তখন শয্যাশায়ী। সেদিন নানা বললেন, মসজিদের পাশে আমার লাইব্রেরি আর এতিমখানা দেখে আসো। ইতিমধ্যেই দেখে এসেছি বলার পর নানা বললেন, 'আমারতো সারা জীবনে সম্পদ করার কোনো ঝোঁক ছিল না, আমি এক ফকির বেটা। এই কিতাবগুলোই আমার সম্পদ। কত দেশ থেকে কত কষ্ট করে বইগুলো সংগ্রহ করা। আমার ছেলেরা আছে, ভাতিজা জুবের লাইব্রেরিয়ান আছে, তারা দেখবে। আলিম-বেআলেম কেউ আর বই পড়ে না, তবুও কিছু অনুসন্ধিৎসু মানুষ যদি এসে কিতাব নেড়েচেড়ে কিছু উপকার পায় সেটাই সার্থকতা।"

বইয়ের পাগল নানা দুনিয়ার খোঁজও রাখতেন সবার চেয়ে বেশি। ২০২১ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে নানা ৩/৪ দিন ঢাকায় থাকলেন চিকিৎসার জন্য। আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালে ২/৩ দিন ছিলেন নানা। অসুস্থ শরীর, তবুও কত গল্প। গাছবাড়ির ছাত্র থাকার সময়কার গল্প, দেওয়ান আব্দুল বাছির সাহেবের গল্প, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গল্প, সৎপুরের অধ্যক্ষ থাকাকালীন গল্প, চিফ জাস্টিস সৈয়দ এবি মাহমুদ হোসেন সাহেবের সাথে মধুর সম্পর্কের গল্প, আমার দাদার (রহঃ) গল্প, ফুলতলী পীর সাহেবের (রহ.) নির্দেশে একদিনের নোটিশে মক্কা শরীফ থেকে দেশে ফিরে এসে শেষ দিন নমিনেশন জমা দিয়ে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণের গল্প, ইছামতী মাদ্‌রাসার কামিল গ্রান্ট হওয়ার সময়কার গল্প, কত শত গল্প করলেন নানা এই কয়দিন!

অসুস্থ অবস্থায়ও এত আগের সব গল্পই নানা বলে গেলেন একজন মাস্টার স্টোরিটেলারের মতো। তখন নানা কিন্তু বেশ অসুস্থ। ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত সে অসুস্থতা থেকে তাঁর আর সেরে ওঠা হলো না। সেই অসুস্থতার মধ্যেও সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে খবর রাখতেন নানা। একদিন তো একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করে আমাকে আটকেই দিলেন। নানার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় মজা করে বললেন, 'ইয়ে তে তুমি সাংবাদিকর চেয়ে আমার গেছেনু দেখি বেশি খবর আছে।' আমার মনে আছে ঢাবিতে চান্স পাওয়ার পর সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে উঠেছি শুনে নানা স্বাধীনতার পূর্বে এই হলের নাম কি ছিল সেটিসহ বেশ কিছু ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন।

নানা মানুষের প্রশংসা করতেন দিলখোলাভাবে। তিনি খাসির গোশত পছন্দ করতেন, আম্মার কাছে সেটা জেনে হাসপাতালে নানার জন্য খাসির গোশত রান্না করে নিয়ে গেলেন আমার স্ত্রী। সেদিনের পর যতবার দেখা হয়েছে নানা সেই খাসির গোশতের

প্রশংসা করেছেন, নানার সাথে থাকা মানুষেরা বললেন, প্রায়ই তিনি অন্যদের কাছে এই গোশতের গল্প করতেন। কত ছোট ও স্বাভাবিক কাজ, অথচ এমনভাবে মানুষকে বলতেন যে লজ্জাই লাগত। সব মানুষের প্রশংসা করতেন মন থেকে, উদারভাবে।

নানার মেহমান নওয়াজি ছিল অতুলনীয়। আমরা বলতাম নানাবাড়ির লাকড়ির চুলা নানার তাহাজ্জুদের পানি গরম করা দিয়ে দিন শুরু করে আর ঘুমাতে যায় রাত ১০/১১ টায়। বাড়িতে কেউ আসলে নানা মেহমানদের সাথে খাবার খেতেন, শারীরিক কারণে নিজে যেতে না পারলে মামাদের বারবার নির্দেশনা দিতেন যাতে আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি না থাকে। এই সেদিনও আমাদের কুমারগাঁওয়ের ফারুক ভাই, যিনি তাঁর গাড়িতে আমাদের প্রায়ই নানাবাড়ি নিয়ে যেতেন, স্মরণ করলেন নানার মেহমানদারির কথা। নানা কবে কীভাবে প্লেটে খাবার তুলে দিয়েছেন, কী কী বলতেন সব মুখস্থ বলে গেলেন তিনি। আমি নিশ্চিত এ রকম হাজারো মানুষ নানার মেহমানদারির হিরণ্ময় স্মৃতি বুকে লালন করে রাখবেন সারা জীবন।

দানশীলতায়ও নানার হাত ছিল সদা প্রশস্ত। আমার মনে পড়ে নানার বিছানায় বালিশের কাছে একটি ডায়েরি থাকত। প্রায়ই নানা কাছের-দূরের আত্মীয়/অনাত্মীয়দের গৃহ নির্মাণসহ নানা খাতে সহায়তা করতেন। নিজে সদকা করার পাশাপাশি অনেক মুরিদীন-শুভাকাঙ্খী নানার কাছে সদকা বণ্টনের জন্য অর্থ দিতেন। ডায়েরিতে সেগুলোর হিসেব নানা লিখে রাখতেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

নানার মন ছিল আকাশের মতো উদার। কাউকে কখনো ছোট করে কথা বলেছেন এমনটি কখনো দেখিনি। ভিন্নমতের আলেম-উলামাদের সম্পর্কে কোনো সমালোচনা করতে চাইতেন না, কদাচিৎ যৌক্তিক সমালোচনা করলেও যথাযথ আদবের সাথে দালিলিকভাবে করতেন।

এখতেলাফ হয় এমন বিষয় সাধারণত এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন। এ জন্য নানাকেও মানুষ দলমতের গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠে শ্রদ্ধা করতেন। সেটার প্রমাণ আমরা পেয়েছি নানার মৃত্যুর পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা মত-পথের মানুষের শোক প্রকাশ আর হাহাকার দেখে।

নানার মৃত্যুর মাসখানেক পর সব মত-পথের আলেমদের নিয়ে 'মাজলিসুল উলামা বাংলাদেশ' নামের সংগঠন সিলেটের ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ মিলনায়তনে একটি স্মরণসভা আয়োজন করে। সেখানে যথার্থই বলা হয়, 'শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছিলেন সিলেটের সকল মত-পথের আলেমদের অভিভাবক।'

ভালো অভিভাবক হতে হলে ভালো শ্রোতা হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের প্রথম

বর্ষে ক্লাস নিতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। গণযোগাযোগের সেই কোর্সে তিনি বারবার যোগাযোগ শাস্ত্রে ভালো শ্রোতা হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতেন। আরেফিন স্যার নিজে একজন অত্যন্ত ভালো শ্রোতা। ক্যাম্পাসে স্যারের কাছাকাছি যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ছোটবড় সকলের কথাই তিনি প্রচণ্ড মনযোগ দিয়ে শুনতেন, অপর প্রান্তে কথা শেষ করতে দিতেন। এত বড় পদে থেকেও গভীর রাত অবধি তিনি মানুষের কথা শুনতেন। এরপরও স্যার আমার ক্ষুদ্র জীবনে দেখা সবচেয়ে ভালো শ্রোতার তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকবেন। প্রথম স্থানে অবশ্যই নানা। নানা যেভাবে মানুষের কথা মনযোগ দিয়ে শুনতেন, এমনটি এখন পর্যন্ত কারও ক্ষেত্রে আমি দেখিনি। বক্তার সামাজিক অবস্থান বা বয়স এ ক্ষেত্রে তাঁর বিবেচ্য ছিল না। এটাও নানার এক অনন্য গুণ ছিল, যা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে।

শুধু মধুর ব্যবহারই নয়, নানার নুরানি চেহারাটাও পরিচিত-অপরিচিত মানুষকে কাছে টানতো। এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে আমার এক বন্ধুর সাথে নানার দেখা হয়। উল্লেখ্য যে, সে ঢাকার বাসিন্দা এবং নানার সম্পর্কে আগে থেকে তার কোনো ধারণাও ছিল না। নানার সাথে দেখা হওয়া মাত্রই সে নানাকে কদমবুসি করে ফেলল। একটু পর আমাকে বলল, 'দোস্ত আমি নিজের মা-বাবা, দাদা-নানা ছাড়া কাউকে পায়ে ধরে সালাম করিনি। কিন্তু নানার চেহারায় এমন একটা নুরানি ব্যাপার আছে যে আমি নিজের অজান্তেই উনাকে কদমবুসি করে ফেললাম।' নানার মানবিক গুণাবলি আসলে বলে শেষ করার মতো নয়, সেটা আমার মতো অভাজনের কাজও না।

মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রথমে আমাদের মহীয়সী নানু ও পরে নানাকে হারানো আমাদের জন্য বিয়োগান্ত ঘটনা। নানা-নানুর স্নেহের পরশ আমরা প্রতিনিয়তই অনুভব করি, উনাদের স্মরণ করি।

২০২২ সালের ১৭ মে বিএসএমএমইউতে আমার মেয়ে জন্ম নিল। জন্মের পর মেয়েকে আমার কোলে দিয়ে আম্মা আমাকে আজান দিতে বললেন। সেসময় আমার হঠাৎ করেই মনে পড়ল আম্মার কাছে শুনা, আমার জন্মের পর নানা আমার কানে আজান দিয়েছিলেন। আমি নাকি জন্মের অনেকক্ষণ পরও চোখ খুলে তাকাইনি, নানা আজান দেয়ার পরপরই চোখ মেলে পৃথিবী দেখি। সে হিসেবে আমার জীবনে দেখা প্রথম মানুষ আমার নানা। তো মেয়ের কানে আজান দেয়ার সময়, এমন সুখের মুহূর্তেও নানাকে মনে পড়ল, তেমনি যেকোনো কষ্টের সময়ও নানাকে মনে পড়বেই।

আমাদের মতো আরো হাজারো মানুষেরও নিশ্চয়ই এ রকম সুখে-দুঃখে শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস সাবকে মনে পড়ে। তিনি ছিলেন তাঁদের কাছে মুহাদ্দিস ছাব।

২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি জকিগঞ্জের রারাই গ্রামে প্রিয় মুহাদ্দিস ছাব'কে দেখার জন্য যে লাখো শোকার্ত মানুষের ঢল নেমেছিল তার মধ্যে একজন মানুষকে আমার খুব মনে পড়ে। নানার লাশ খাটিয়ায় তোলার ঠিক আগ মুহূর্তে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হওয়া সুদূর চান্দগ্রামের সেই জনাব তেরা মিয়াকে। একবার নানাকে দেখার জন্য সেই মুরব্বি মানুষটার যে আকুতি, বুকফাটা আর্তনাদ দেখেছিলাম সেটি আমি কখনোই ভুলব না। এ রকম হাজারো মানুষের হৃদয় নিংড়ানো দোয়ায়, ভালোবাসায় আর আপনার কাজে আপনি বেঁচে থাকবেন নানা।

২০০৮ সালের এক প্রত্যুষে আল্লামা ফুলতলী সাহেবের ইন্তেকালের দিন নানা সিলেট সদরে কোনো এক প্রোগ্রাম থেকে আমাদের বাসায় এসে উঠেছিলেন। নানাকে এত মুষড়ে পড়তে আমরা আগে কখনো দেখিনি। সেদিন ফুলতলী যাওয়ার পথে কাকে যেন ফোনে নানা বলেছিলেন, 'আমরারে আল্লায় বড় কঠিন পরীক্ষাত ফালাইদিলা।' আব্বা তখন লন্ডনে, বড় ভাই আর আমি সেই ঐতিহাসিক জানাযায় অংশ নিলাম নানার হাত ধরে।

এর ১৪ বছর পর জকিগন্জ দেখল আরেকটি ঐতিহাসিক জানাযা। যেখানে হাজারো মানুষের কণ্ঠে ফুটে উঠে স্বজন হারানোর তীব্র হাহাকার। ২০২১ সালের ১৭ ডিসেম্বরে নানা নিজেকে 'ফকির' বলেছিলেন, কিন্তু বিদায়ের দিন আমরা দেখলাম তিনি লাখো মানুষের ভালোবাসায় রাজার মতো বিদায় নিলেন।

নানাকে নিয়ে লেখা কবি মাজেদ আহমেদ চঞ্চল সাহেবের একটি কবিতা আমার খুবই প্রিয়। সেটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দিয়ে শেষ করি: ....এই জনপদের প্রতিটি ধূলিকণায়, আকাশে-বাতাসে, পাখ-পাখালিতে, গাছ-গাছালিতে, ছড়িয়ে আছে আপনার সুবর্ণ স্মৃতি/ আপনার হৃদয়ছোঁয়া বিনীত বিনম্র অভিভাষণ, উপদেশ-নসিহত, কথামালা ও ক্ষুরধার লেখনী/ এখানে অনুরণিত হবে, পঠিত হবে, মথিত গ্রথিত হবে কাল মহাকাল/ এবং আমাদের চরম ও পরম শ্রদ্ধা/ আমাদের আন্তরিক ভালোবাসা আমাদের আকাশছোঁয়া দোয়া ও অনাগত কাল থাকবে আপনার প্রতি.../ আল বিদা....!/ বিদায় হে কালের সাক্ষী/বিদায় হে পিতা, বিদায় হে বন্ধু, বিদায় হে দার্শনিক, বিদায় হে চিরায়ত উপদেশক...। '

লেখক: মুহাদ্দিস ছাহেবের নাতি; সহসম্পাদক, প্রথম আলো ইংরেজি বিভাগ।

এক অনন্য নানার নাতনি আমি

ডা. বুশরা নাবিলা

আমরা ছয় ভাইবোন অতীব সৌভাগ্যবান। কারন আমাদের নানা সাহেব হাদীস জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, উস্তাযুল উলামা ওয়াল ফুকাহা আল্লামা হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ। শুধু নানা নয় আমাদের দাদা সাহেবও হচ্ছেন আলহাজ হযরত মাওলানা আঞ্জব আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি সেই বৃটিশ আমলে হিন্দুস্তান রামপুর মাদ্‌রাসা থেকে টাইটেল সনদ প্রাপ্ত। আব্বা অধ্যক্ষ আব্দুস সালাম আল মাদানীর স্মৃতিচারণ মুলক বই "আমার আব্বা আমার আম্মা' পড়ে জেনেছি তিনি রামপুর মাদ্‌রাসায় হজরত ফুলতলী ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বছর সিনিয়র ছিলেন।

লিখার মতো অনেক কিছু আছে ঝুলিতে। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে তিনি ছিলেন সার্বিক দিক দিয়ে একজন আদর্শ মানব। আমাদের বাসায় প্রায়ই আসতেন, খোজখবর নিতেন, ব্যাগভর্তি করে আমাদের জন্য ফলফলাদি নিয়ে আসতেন। নানাবাড়িতে বেড়াতে গেলে আমাদেরকে নিয়ে একসাথে খাওয়া দাওয়া, গল্প গুজব, শিক্ষামূলক আলোচনা, পড়াশোনার খোজখবর, উতসাহ প্রদান ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নানা-নানুকে নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি। এর মধ্যে যে স্মৃতি আমাকে তৃপ্তি দেয় তা হলো, ২০১৬ সালে আমি এমবিবিএস শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী। ইতোমধ্যে নানার গলব্লাডারে স্টোন ধরা পড়েছে। ওয়েসিস হাসপাতালে ডা. শায়েক আজিজ অপারেশন করবেন। নির্ধারিত তারিখে অপারেশন সুসম্পন্ন হলো। আমি ডা. শায়েকের সহকারী হিসেবে OT তে ছিলাম। এটি ছিল আমার চিকিৎসক হিসেবে প্রথম অপারেশনে অংশ নেয়া। নানার OT তে আমি থাকায় তিনি খুব খুশি ও নির্ভার ছিলেন।

নানা-নানু উভয়ই একসাথে অসুস্থ হন। নানুর দেখাশোনা ও চিকিৎসার ভার আম্মার উপর ন্যস্ত হলো। নানা চিকিৎসাধীন অবস্থায় বড়খালার উপশহরস্থ বাসায় থাকলেন। মাঝে কদিন তিনি আমাদের বাসায়ও ছিলেন। আমার ব্যস্ততার মাঝেও তাঁদের খেদমত ও দোয়া নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

নান-নানু এক সপ্তাহের ব্যবধানে ইহ জগৎ ছেড়ে চলে যান আমাদের কাঁদিয়ে। আজ তাঁরা শুধুই স্মৃতি।

পরওয়ার দিগার মাওলা, তাদেরকে জান্নাতের বাসিন্দা বানিয়ে রাখো। বিচার শেষে জান্নাতুল ফেরদাউসে সবাইকে আবার একত্রিত হবার সুযোগ দিও। আমিন।

লেখিকা: মুহাদ্দিস ছাহেবের নাতনী; সহকারী রেজিস্টার, গাইনি এন্ড এনেস্থেসিয়া, বিভাগ, পার্কভিউ মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিলেট।

আমার নানা

মারজানা আক্তার পান্না

শ্রদ্ধেয় নানা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন মহান ব্যক্তিত্ব। নানাকে ঘিরে কত শত স্মৃতি। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখলেও শেষ হবে না।

নানাকে দেখেছি তাঁর কাছে আসা খুব সাধারণ মানুষের সাথেও কতটা সহজে মিশে যেতে পারতেন। মানুষের বিভিন্ন সমস্যার কথা খুবই আন্তরিকতার সাথে শুনতেন। সমস্যা সমাধানের পথ বাতলে দিতেন। নানা যখন যে মানুষের কথা শুনতেন অথবা তাদের সাথে কথা বলতেন, মনে হতো যেনো এই লোকটি তাঁর সবচেয়ে আপন। নানার সাথে সাক্ষাত করে কথা বলে বিদায় নেয়ার সময় সবার চেহারায় একটা ভরসা ও তৃপ্তি ফোটে উঠতো। আলিম উলামা, অন্য কোন শ্রেণি পেশার হাই প্রোফাইল কেউ অথবা একেবারে সাধারণ কোন মানুষ, সবার ভরসা স্থল ছিলেন আমাদের নানা। আমার কেনো জানি মনে হয় মানুষের আস্থা, ভালোবাসা আর ভরসা স্থল হয়ে উঠতে পারাটাই একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

আমার জানা মতে বহু বছর আগেই শারীরিক কিছু সমস্যার কারণে ডাক্তার নানাকে মাইকে কথা বলতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি বছরের পুরোটা সময় জুড়ে দেশে বিদেশে ছুটে বেড়িয়েছেন দাওয়াতী কাজে। প্রায় প্রতিদিনই কম বেশি তাঁকে মাইকে কথা বলতে হয়েছে। দ্বীনের স্বার্থে এই যে ছুটে চলা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানবাহনে সফর, কিন্তু তাঁর চেহারায় ক্লান্তির ছাপ দেখা যেতো না। এই যে এতো ব্যস্ত একজন মানুষ তারপরও নানাকে দেখেছি নিজ পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি কতটা দায়িত্ববান ছিলেন। যেকোন সমস্যা, দুঃখ মুসিবতে সবার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াতেন তিনি।

নানা সব সময় আমাদের লেখাপড়ার খোঁজ খবর নিতেন, উৎসাহ দিতেন। পরীক্ষার সময় এলে আমরা নানার কাছে দুআ চাইতাম। তিনি বলতেন, ঠিক মত পরীক্ষার প্রস্তুতি না নিলে কেবল দু'আয় তো হবে না।

দূর-দূরান্তের সফরে কোন কোন সময় নানা আমাদের বাসায় বিশ্রাম নিতেন। একবার দুপুরের খাবার পর আমি তরমুজ কেটে নানার জন্য নিয়ে গেলাম। আব্বা আম্মাও সেখানে আছেন। নানার সামনে এগিয়ে দিতেই তিনি বললেন, আমি এরচেয়ে বেশি স্বাদের জিনিস খাচ্ছি। তখন তিনি পান চিবুচ্ছেন। নানার কথায় আব্বা আম্মা হেসে উঠলেন। সুস্থ থাকাকালীন এটিই ছিলো নানার সাথে আমার শেষ স্মৃতি।

এক বটবৃক্ষের ছায়ায় কাটছিলো আমাদের নির্বিঘ্ন জীবন। কখনো ভাবিনি নানা আমাদের

ছেড়ে চলে যাবেন না ফেরার দেশে। হঠাৎ করে নানা অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতাকালীন চিকিৎসা সুবিধার জন্য আমাদের বাসায় ছিলেন অনেক দিন। এসময় তাঁকে একান্ত কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে কিছু দিন। চির ব্যস্ত একজন মানুষ বিছানায় পড়ে আছেন। ক্রমান্বয়ে শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে, নিজে থেকে উঠে বসারও শক্তি নেই। দেখে অনেক সময় নিজের অজান্তেই চোখে পানি চলে আসতো।

এক সময় নানাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। এদিকে নানুও আগে থেকেই বেশ অসুস্থ। আম্মার সাথে আমিও গেলাম নানাবাড়িতে। কিন্তু এবার নানাবাড়িতে যাওয়া আগের মতো আনন্দঘন ছিলো না। অজানা একটা উৎকণ্ঠার ছাপ সবার চোখে মুখে। বড় খালা, ছোটখালা সবাই এসেছেন। অন্যান্য আত্মীয় স্বজন নিয়মিত আসছেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র আনন্দ কোলাহল নেই। সবাই নিরব নিস্তব্ধ, আতংকিত। ৩১ জানুয়ারি ২০২২ সোমবার প্রাকৃতিক নিয়মে সন্ধ্যা হলো। সেই সাথে আমাদের জীবনে নেমে এলো প্রথম অন্ধকার। বড়খালা, বড়মামা, আম্মা এবং আমি নানুকে ঘিরে বসে আছি। অক্সিজেন মাস্ক লাগানো মুখে স্পষ্ট আল্লাহ, আল্লাহ উচ্চারণ করে করে নানু হঠাৎ নিরব হয়ে গেলেন। চোখের সামনেই এক মমতাময়ী মহীয়সী নারী পৃথিবীর সব মায়া মমতা পেছনে ফেলে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। নানা এত বেশি অসুস্থ যে, উঠে বসে নানুকে শেষ বিদায় দিতে পারেন নি। কাফন মোড়ানো নানুকে নানার বিছানায় রাখা হলো কিছুক্ষণ। তিনি শোয়ে শোয়ে হাত তুলে মুনাজাত করে নানুকে শেষ বিদায় দিলেন। সেই করুণ দৃশ্য আজো বিষাদ স্মৃতি হয়ে চোখ ঝাপসা করে।

এবার সকলের একক উৎকণ্ঠা নানাকে ঘিরে। একদিন একদিন করে তিনি কেবল দুর্বল হচ্ছেন। ঘনিয়ে এলো বিষাদ ঘেরা সেই দিন। নানুর ইন্তেকালের এক সপ্তাহ পেরিয়েছে মাত্র। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২, দিন শেষে সন্ধ্যা নামলো। আমাদের জীবনেও নেমে এলো ঘোর অমানিশা। বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ইতিহাসে এক প্রবাদ পুরুষ, আমাদের শ্রদ্ধেয় নানা, সকলের প্রিয় মুহাদ্দিস ছাহেব হুজুর নশ্বর এ পৃথিবীকে বিদায় জানালেন। আমার পিতা মাতা, মামা খালাগণ এবং বিশাল এক জনগোষ্ঠী নিমিশে অভিভাবক শূণ্য হয়ে গেলেন। অন্তিম মুহূর্তে আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে ছিলাম। নিজ চোখে প্রত্যেক্ষ করলাম কালজয়ী এক মহামানবের রাজকীয় প্রস্থান। ছাব্বিশ বছরের জীবনে এই প্রথমবার আমার মায়ের পরিবারের সবাইকে একসাথে একত্রিত হতে দেখলাম। সবার বুকের ভেতরের অন্তহীন শূন্যতায় বিষাদমাখা করুণ চেহারাসমূহ দেখে বড় বেশি মায়া লাগছিলো।

নানা আর বেঁচে নেই, একথাটি এখনো মন মানতে চায় না। মনে হয় বরাবরের মতো হয়তো ইউরোপ আমেরিকার কোথাও দাওয়াতী সফরে গেছেন। একদিন দুপুরবেলা সিলেট এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে করে আমাদের বাসায় কিছু সময় বিশ্রামের জন্য ফিরে আসবেন।

নানার কর্মব্যস্ত জীবনের শেষ সাক্ষী তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশাল গ্রন্থাগার। তাঁর জীবনের সঞ্চিত সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ, বিশাল বই কিতাবের সংগ্রহ এখানে রক্ষিত রেখে গেছেন আমাদের জন্য, অনাগতকালের জ্ঞান পিপাসুদের জন্য। আল্লাহতা'লা নানার রেখে যাওয়া সব খিদমাত অনন্তকাল টিকিয়ে রাখুন। এসব খিদমাতের সাথে আমাদেরকে আমৃত্য জড়িত রাখুন।

লেখিকা : মুহাদ্দিস ছাহেবের নাতনি।

আমাদের নানা

সাকিব আদনান

'মুহাদ্দিস ছাব' উপাধির মানে বুঝার আগেই শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহকে আমরা নানা হিসেবেই চিনেছি, বুঝেছি। নিশ্চয়ই এই স্মৃতিস্মারকে অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্ব মুহাদ্দিস ছাব রাহিমাহুল্লাহ এর জীবন ও কর্মকে স্মরণ করবেন, উনার সাথে তাদের কাটানো অমুল্য মুহুর্তগুলোর স্মৃতিচারণ করবেন, উনার আচার-আচরণ ও কথাবার্তা থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলো উল্লেখ করবেন। আমি আমার এই সামান্য লেখাতে না হয় আমাদের প্রিয় নানাকেই স্মরণ করি।

ছোটবেলায় নানাবাড়িতে যাওয়া আমাদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় ঘটনাগুলোর একটি ছিল। নানা আমাদের জন্য গাড়ি পাঠাতেন এবং আমাদের পৌঁছতে যত দেরীই হোক না কেন আমরা ঘুমঘুম চোখে তাকিয়ে দেখতাম তিনি আমাদের রিসিভ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। সেই ছোটবেলা থেকে একদম যতদিন পর্যন্ত নিজে দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্য নানার ছিল - এই রীতির ব্যাত্যয় দেখিনি।

সবার খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো হলো কি না, থাকার ব্যবস্থা যথাযথভাবে করা হলো কি না এসব তদারকি করতেন। এমনকি যখন একদম মৃত্যুশয্যায় তিনি তখনো এসব ব্যাপারে বেখেয়াল হতে দেখিনি।

নানার সাথে সাক্ষাৎ এর জন্য প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আসতেন নানাবাড়িতে। তাদের মেহমানদারিতে যাতে কোনরকম ত্রুটি না হয় সে সম্পর্কে সজাগ থাকতেন তিনি। অগাধ ইলমের অধিকারী হয়েও সে সম্পর্কে জীবনে কোনদিন কোন ধরনের তাকাব্বুরি প্রকাশ হতে দেখিনি, যে গুণটির চরম অভাব আজকালকার অনেক সেলিব্রিটি আলেমদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

'সর্বজন শ্রদ্ধেয়' কথাটি আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। নানা ছিলেন এই উপাধিটির সবচেয়ে উপযোগী ব্যক্তিত্ব। ইসলামপন্থী যত ধারা আছে সব ধারার মানুষজন নানাকে শ্রদ্ধা করতেন। নানাও তাদেরকে যথাযথ মূল্যায়ন করতেন। পরমতসহিষ্ণুতার এক বাস্তব উদাহরণ ছিলেন তিনি। ইখতেলাফি বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে নানা যখন কোন মতামত দিতেন তখন বলতেন, "আমার যতটুক বুঝে এসেছে" বা "আমার সামান্য পড়াশোনায় যা পেয়েছি"।

কিতাবের সাথে নানার সখ্যতা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে সবসময় কিতাব খুলতেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত যতদিন চোখ খুলার সামর্থ্য ছিল ততদিন নানার এ অভ্যাসটির পরিবর্তন দেখিনি। জীবনের একদম শেষপ্রান্তে নানার যখন

উঠে বসার সামর্থ্য নেই তখন একদিন নানাকে দেখতে গেলাম নানাবাড়িতে। তখন নানার জীবনের শেষ প্রজেক্ট লাইব্রেরীর কাজ শেষের পর্যায়ে। স্বভাবসুলভ সব খোজখবর নেয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন লাইব্রেরী দেখে এসেছি কি না। তারপর বললেন, "মানুষের জীবনে অনেক শখ থাকে। কারো থাকে বাড়ির শখ, কারো গাড়ির আর কারো দেশ-বিদেশ ঘুরার। আমার এসব শখ নেই আর। আমার জীবনের এখন একমাত্র শখ এই লাইব্রেরীটা করা। যাতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে এখানে সময় কাটায়, পড়াশোনা করে"।

নানার শখের সেই 'মাকতাবাতুল হাবীব' অসংখ্য দূর্লভ কিতাবের সংগ্রহশালা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সগৌরবে তাঁর কবরের পাশেই। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নানার কবরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাগান বানিয়ে দিন। আমাদেরকে তাঁর জীবন, কর্ম ও চরিত্রের কিয়দংশ হলেও নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করার তৌফিক দান করুন।

লেখক: শায়খুল হাদীস ছাহেবের নাতি। হাফিয, পিএইচডি গবেষক।

নানার স্মৃতি

নাকিব আফজাল

২০২২ সালের প্রথম দিকটা আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাময় স্মৃতিবহ সময়। এ বছরের ৩১ জানুয়ারি আমাদের মহীয়সী নানি ইন্তেকাল করেন। ৭ ফেব্রুয়ারি আমাদের গর্বের প্রতীক নানা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল করেন। সেই শৈশব থেকে নানাকে কেন্দ্র করে কতশত স্মৃতি মনে জমা হয়ে আছে, কিন্তু লেখায় অভ্যস্ত না থাকায় ধারাবাহিক সব লেখা অসম্ভব। এলোমেলো কিছু স্মৃতি নিম্নে উল্লেখ করছি।

সিলেটে কোন মাহফিল বা অন্য কোন জরুরী কাজে আসলে নানা কম সময়ের জন্য হলেও আমাদের বাসায় আসার চেষ্টা করতেন। নানা বেশিরভাগ সময় বাদ ফজরই আমাদের বাসায় আসতেন। সাধারণতঃ এত ভোরে দোকানপাট খোলা থাকে না, কিন্তু নানাকে কখনও খালি হাতে আসতে দেখিনি। সফরকালীন সময়ে নানার সাথে তাঁর পানের বাটা থাকতো। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন নানা আমাদের বাসায় এলে নিজ হাতে পানের বাটা থেকে তাঁর জন্য পানের খিলি তুলে দিতাম। নানাও বিষয়টি খুব পছন্দ করতেন।

নানা ছিলেন সময়ানুবর্তিতার এক অন্যতম উদাহরণ। যেকোনো মাহফিলে সময়ের আগে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। নানার সাথে আব্বার মাদ্‌রাসায় (গোবিন্দগঞ্জ) কয়েকটি মাহফিলের সফর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। মাহফিলের সময় ঘনিয়ে এলে মাহফিলে পৌঁছার জন্য তাঁর মধ্যে এক অন্য ধরণের ব্যস্ততা দেখা দিতে লক্ষ্য করেছি। আমাদের বাসা থেকে গোবিন্দগঞ্জ ৩০/৪০ মিনিটের রাস্তায় অন্তত ২/৩ বার আমার গাড়িতে বসতে কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না সেটি জিজ্ঞেস করতেন। মাহফিল থেকে ফেরার সময় লোকজনের হুড়োহুড়ির মধ্যেও আমার হাত ধরে গাড়িতে উঠার স্মৃতি আজো মনে পড়ে।

নানা সব সময়ই আমাদের ভাই/ভাইয়া বলে সম্বোধন করতেন। ছোটবেলায় প্রতি ঈদের ছুটিতেই আমাদের নেওয়ার জন্য গাড়ি পাঠাতেন। নানাবাড়িতে থাকাকালীন সময় আমাদের যত্ন ঠিকমতো নেওয়া হচ্ছে কিনা তা নিজে থেকে খেয়াল করতেন। নানা যতো দিন হাটা চলায় সক্ষম ছিলেন ততোদিন পর্যন্ত নানাবাড়িতে গেলে খাবার টেবিলে এসে ঠিকমতো খাবার খাচ্ছি কিনা সেই বিষয়ে তদারকি করতেন।

নানা ছিলেন অত্যন্ত উদারপন্থী মানুষ। দল মত নির্বিশেষে সবাই নানাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। নানাও তাঁর সাথে কেউ দেখা করতে এলে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সময়

দিতেন। ভিন্ন মতাদর্শীদের ব্যাপারে কোন বিরূপ বা কটু মন্তব্য করতে তাঁকে কখনো শুনিনি। অসুস্থ থাকা অবস্থায় একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁকে বলতে শুনেছি 'আমার যেলা মছলকি দোস্ত অখল আছইন, অলা জামায়াতি দোস্ত অখলও আছইন। তারাও আমারে ভালা ফাইন, আমিও তারারে ভালা ফাই'।

অঢেল জ্ঞানের অধিকারী হলেও নানা ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। কেউ থাকে কোন মাসয়ালা বা অন্য যেকোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলে তিনি 'আমার জানামতে' এই কথা বলে উত্তর দিতে শুনেছি। বই পুস্তকের প্রতি তাঁর অন্য ধরনের ভালোবাসা ছিল। অসুস্থ থাকাকালীন সময়েও তাঁকে দীর্ঘ সময় কিতাব নিয়ে সময় কাটাতে দেখেছি।

মূলতঃ আমাদের নানা ছিলেন সবদিক থেকে অনুকরণীয় এক মহান ব্যক্তিত্ব। আল্লাহপাক আমাদেরকে নানার দেখানো পথে চলার তাওফিক দিন। নানা নানুকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মাকাম দান করুন।

লেখক: মুহাদ্দিস ছাহেবের নাতি। শিক্ষার্থী- গ্রিনউইচ ইউনিভার্সিটি, ইউকে।

এই আফসোস থেকেই যাবে

মো. মকছুদ আহমেদ

নানার কথা মনে হলেই ভাবি তিনি এখনো আমাদের মাঝে আছেন, শুধু আমাদের সাক্ষাৎ হচ্ছে না।

সেই ছোটবেলার প্রিয় স্মৃতিগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তারপরও বলতে হয়, আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে নানা চলে গেছেন। আমরা যারা বেচে আছি তারা এক বিশাল সমুদ্রে জাহাজ ছাড়া, অথবা মরুভূমিতে পানি ছাড়া মুসাফিরের মত আটকা পড়েছি। আমাদের দোয়ার জায়গা, আদেশ উপদেশের জায়গা সীমিত হয়ে এসেছে।

নানার শেষ সময়ের বেশ কিছু দিন কেটেছে আমাদের বাসায়। শত শত ছাত্র, ভক্ত এবং আত্মীয় স্বজনরা দেখতে আসতেন প্রতিদিন। বিছানায় শোয়া অবস্থায়ও খবর নিতেন উনাকে দেখতে আসা মেহমানরা খেয়েছেন কি না। এই তদারকি নতুন কিছু না, যারাই রারাই মুহাদ্দিস ছাহেবের বাড়িতে গিয়েছেন উনার জীবদ্দশায়, মেহমানদারীর কমতি হয়েছে বলে কেউ দাবী করতে পারবেন না আমার বিশ্বাস।

নানাকে কোনদিন রাগান্বিত অবস্থায় দেখিনি। সাধারণত ভাই বলে ডাকতেন নাতিদের। সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় কি যেন একটা শান্তির ছায়া ছিলো। ভারী মনটা হালকা হয়ে যেত উনার পাশে বসলে, উনার দিকে তাকালে। অন্য ধরনের একটা প্রশান্তি কাজ করত। আল্লাহর মায়ার বান্দাদের হয়তো এটা একটা গুণ।

কিছু স্মৃতি

সময়টা ছিলো আগস্ট। নানার শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিলো না। আমাদের বাসায়ই উনার অবস্থান তখন। আমাদের একমাত্র বোনের বিয়ের লাইটিং এর দায়িত্ব পড়ে আমার উপর। আমি আমার ভাই মাছরুর আহমদ এবং মাসউদ আহমেদের সাথে পরামর্শ করি। বৈঠক শেষে সিদ্ধান্ত হলো আব্বার সাথে আমরা কথা বলবো। যেহেতু আব্বার এসব মোটেও পছন্দ না, উনাকে রাজি না করে এই কাজ করা যাবে না। ইশারা ইংগিতে এইসব এইবার হবে না এইটা জানিয়েও দিয়েছেন আগে। আমার বড় চাচারও বেশ আপত্তি নানাকে রেখে আমরা এইরকম কিছু একটা করবো। বিষয়টি নিয়ে আব্বার সাথে দীর্ঘ আলাপ করি, তিনি নানার কাছ থেকে পারমিশন নিতে বললেন। আমরা চলে গেলাম নানার কাছে। নানা তো আমাদের জন্যে কোনো হুজুর ছিলেন না, আমাদের নানা ই ছিলেন শুধু, তবু এ বিষয়ে কথা শুরু করার সাহস যেন আমরা ৩ ভাইয়ের কেউ-ই করতে পারলাম না। পরে আব্বা এসে নিজেই কথা বললেন। নানা আপত্তি না

করে বললেন, লাইটিং হবে বিয়ে বাড়িতে এইটা স্বাভাবিক, কিন্তু অতিরঞ্জিত করা যাবে না। আমরা তাঁর এই কথা হ্যাঁ বাচক হিসেবেই নিলাম।

নানার মত বই প্রেমী আমি এ জীবনে কাউকে দেখিনি। এমন কোনো সফর ছিলো না যেই সফরে তাঁর সাথে কিতাব ছিলো না। নানার ঘরের সবচেয়ে বড় অলংকার ছিলো এই বইগুলোই। এই অমূল্য সংগ্রহ দিয়ে নানা নিজ হাতে এক বিশাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। জ্ঞানের এই বটবৃক্ষ কথা বলতেন অমায়িকভাবে। বিন্দুমাত্র অহংকার ছিলো না। আমি মালয়েশিয়া থেকে এলেই আমার সাথে বিভিন্ন গল্পে সময় পার করতেন। উনি কি জানতেন না? আমার বিশ্বাস আমার থেকেও ঐ দেশ সম্পর্কে ভালো জানতেন তিনি, তারপরও যে আগ্রহের সাথে আমর সাথে আলাপ করতেন এটাই ছিলো নানার বিনয়ের পরিচয়।

বিদায়

মানুষের জীবনে কষ্টের স্মৃতি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। মানুষ সময়ের বিবর্তনে অনেক মানুষকে বিদায় দেয়, দিতে হয়। তবু বিদায় দেওয়াতে কেন জানি অভ্যস্ত হতে পারে না। নানাকে বিদায় দিতে হবে এটা আমরা সবাই জানতাম, তবু যেন কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। আপার বিয়ের কয়দিন পরই নানা আমাদের বাসা থেকে বাড়ি চলে যান। আমাদের ঘরের পরিবেশ এত গম্ভীর এর আগে দেখিনি। আত্মীয় স্বজনরা সবাই নানাকে দেখতে প্রায়ই আসতেন, ঐদিনও ব্যতিক্রম ছিলো না। আমাদের বাসা থেকে নানার বিদায়ের দিন কিছু কারণে মন অত্যন্ত ভারি ছিলো। নানা তখনও বিছানায় শুয়ে আছেন, মসউদ ভাই, সাবেল ভাই, ইকবাল চাচা ছিলেন পাশেই। আমি আমার বড় মামাকে বললাম যাওয়ায় আগে নানা যেন একটা দোয়া করে যান। আমরা একসাথেই ঢুকলাম রুমে। আমি আর মামা ফ্লোরে বসলাম। মামা বললেন, সবাই চাই আপনি একবার সবাইকে নিয়ে হাত তুলেন। নানা আমার দিকে তাকালেন, আমি বললাম আমরা কিছুই করতে পারিনি আপনার জন্য। নানা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি আমার অনেক মায়ার। এখনো সেদিনের দিনের কথা মনে হলে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। নানা মামাকে ইশারা করলেন দোয়া করার জন্য। মামা শুরু করলেন। বাসার সবাই এসে যোগ দিলেন। একটু পরে নানা নিজেই দোয়া করলেন। নিজেও কাঁদলেন, সবাইকে কাঁদলেন। এর আগেও আত্মীয় স্বজনরা অনেকেই একসাথে দোয়া নিয়েছেন এসে, কিন্তু কেন জানি মনে হল নানা নিজে হাত তুলে আমাদেরকে দোয়া দিয়ে গেলেন। এটাই ছিলো নানার আমাদের বাসায় শেষ দিন, শেষ দোয়া।

তারপর নানার দোয়া পেলাম যেদিন আমাদের নানু আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে যান। জানাযায় নেয়ার আগ মুহূর্তে নানুকে নেয়া হয় নানার পাশে। নানা এতটাই দুর্বল ছিলেন যে, উঠে বসতে পারলেন না। তাও সবাইকে নিয়ে হাত তুলে

দোয়া করে অর্ধাঙ্গিনীকে বিদায় দিলেন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ও নানা সবাইকে নসিহত করে বললেন, তোমাদের সবার উপর আমার দোয়া রইলো।

বেশি করে সবাই

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

এই আয়াত পড়বে।

শূন্যতা

নানা এবং নানু চলে যাওয়ার পর এক বিশাল শূন্যতা ঘিরে ধরে আমাদের সবাইকে। বেঁচে থাকাকালীন হয়তো আমরা কিছুই করতে পারিনি, কিন্তু চলে যাওয়ার পর তাঁদের শূন্যতা ঠিকই বুঝতে পেরেছি। নানাবাড়ি যেন চিরশূন্য হয়ে গেল এই দুই মানুষের অভাবে। আমরা গিয়েছি, সবাই গিয়েছেন, কিন্তু এই শূন্যতা কাটেনি। পুরোপুরি কাটবেও না জানি কোনদিন।

আমরা দোয়ার, মায়ার এবং আদেশ উপদেশের জায়গা হারিয়ে ফেলেছি। নানার কবরের পাশে যতবারই যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, চুপ করে দাঁড়িয়ে শুধু উনার কথাই ভেবেছি। আমার জ্ঞান খুবই সীমিত, সবার মতো কবরের পাশে গিয়ে হয়তো কিছুই পড়তে পারি না, কিন্তু কি এক বিশালতা চেপে বসে, নানার পাশে দাঁড়ালে বৃষ্টি নামে চোখের কোণ। ভাবি, হায়! আর কবে পাব তাঁর দেখা। আমি দেখছি না তাঁকে। কিন্তু তিনি ঠিকই দেখছেন। হাশরের ময়দানে আল্লাহ পাক যখন তাঁর মায়ার বান্দাদের ডেকে নেবেন তখন আর নানার দেখা কি পাবো? যখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় উম্মতদের পাশে নিয়ে যাবেন, তখন এই নাদানের ওই কাতারে শামিল হওয়া সম্ভব হবে?

এখনও মনে পড়ে নানা বাসায় থাকলে বা আমরা নানাবাড়িতে গেলে ঘুমানোর আগে বলে যেতাম, নানা ফু দিয়ে দিতেন। পরীক্ষা আসলে নানার কাছে দোয়া চেয়ে ফোনে কথা বলতাম। ২০১৮ সালে যখন পড়ার উদ্দেশ্য মালেশিয়া পাড়ি জমাই, তখন খুব সম্ভবত নানার এক চোখে অপারেশন হয়ে, ওই সময়েরই নানার সাথে ফেইসটাইমের একটা স্ক্রিনশট এখনো মাঝেমধ্যে যখন দেখি, মনে হয় নানা এখনো আছেন।

আফসোস

৭ই ফেব্রুয়ারি। পরেরদিন কিছু জরুরী কাজ থাকায় আমি, আব্বা এবং আমার চাচাতো ভাই মসউদ আহমদ নানার কাছে বিদায় নিয়ে সিলেটের উদ্দেশ্য রওয়ানা দেই। আমরা তখনও জানতাম না আর নানাকে জীবিত অবস্থায় দেখার সৌভাগ্য আমাদের কারো হবে না। বিকেলে বাসায় পৌঁছানোর পর নানার অবস্থার অবনতি হতে থাকে। আমরা

আবারও নানাবাড়ির উদ্দেশ্য রওয়ানা দেই। পথেই আকাশ বাতাস ভারী করে খবর আসে নানা আর নেই। বুঝতে পারছিলাম না কি করবো। নিজেকে দোষারোপ করবো না কাজকে। সবাই পেল, অনেক দূর দুরান্ত থেকে আসা আত্মীয় স্বজনরাও নানার শেষ সময়টা পাশেই ছিলো। শুধু আমরা পারিনি। এই আফসোস হয়তো এক জীবনেও শেষ হবে না।

আমি আব্বাকে হাতেগোনা কয়েকবার কাঁদতে দেখেছি। আব্বা খুবই শক্ত মানুষ, মন অনেক নরম হলেও বুঝতে দেন না। মুহাদ্দিস ছাহেবের ছাত্র এবং দ্বিতীয় জামাতা, খবরটা শুনে বারবার ভেঙে পড়ছিলেন। গাড়িতে সামনের সিটে ছিলেন বলে দেখতে পারছিলাম পরিস্কার। পরদিন জানাযার সময় পর্যন্ত আব্বাকে নিরবে চোখের পানি ফেলতে দেখেছি বারবার। অবশেষে যখন গাড়ি নানাবাড়ি গিয়ে পৌছায়, তখন মানুষের সমুদ্রে রুপান্তরিত হয়েছে রারাই। এক পা এক পা করে যখন বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করছি, ভাবতে থাকলাম আর কেউ পথ চেয়ে থাকবে না আমাদের। আর কেউ আমরা বাড়ি গেলে কি খাবো, কই থাকবো এটা নিয়ে ভাববে না। নানুর রুম আগে থাকায়, সবসময়ই আমরা নানুর সাথে দেখা করে নানার কাছে যেতাম। এরকম আর হবে না। আর পাব না এই মায়া। এরকম কত কথা তখন বারংবার মনে ইতি দিচ্ছে। এমনি সময় বড় মামা এসে ধরলেন, নিয়ে গেলেন নানার রুমে। বাইরে থেকেই কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছিলো। সবাই ঘরে, কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন। চিরচেনা ঘরটা কেন জানি অচেনা মনে হতে লাগলো আমার। নানা শোয়ে আছেন, নিস্তেজ। আমাদের হাসিমুখে রিসিভ করলেন না, বুঝতে পারলাম তাহলে সত্যি সত্যি আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেলেছি।

নানার কাছে আমি ঋণী, আমারা ঋণী। আমরা যেন তাঁর দেখানো পথে চলতে পারি, ঈমান নিয়ে মরতে পারি। আল্লাহ পাক যেন আমার নানা ছাহেবের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে, রাসূলে পাকের রওজা মুবারকের পর্দা তুলে দেন। হাশরের ময়দানে আল্লাহ পাক যেন আমাদের পরিবারের আবার পুনর্মিলনীর আয়োজন করে দেন।

লেখক : মুহাদ্দিস ছাহেবের নাতি। শিক্ষার্থী-রোহাম্পটন ইউনিভার্সিটি, লন্ডন।

My memories of my Dadazi

Nabeela Al- Habib

I have many memories of my Dadazi, including from the many times when he came to stay in London over the years and when I visited Bangladesh in the summer of 2015 with my parents and siblings.

One early memory I have of Dadazi from when I was little is of him telling me the story of the miraculous Night Journey of the Prophet Muhammad peace be upon him. I was amazed when he told me about each of the remarkable steps undertaken in the voyage, particularly by the part of the story where the Prophet (SAW) received the message to do with the creation of the daily prayers.

Another of these memories was when he taught me the Hadith:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

which highlights the importance of having pure and faithful intentions whenever undertaking any action. Learning this Hadith from Dadazi and keeping it in mind has helped me to stay calm and focused whenever I have something important to do, because I know that it will go well as long as I have the correct intentions before beginning the task.

Some of the most vivid memories I have of Dadazi are of reading the Holy Quran in front of him several times as a child, including when he stayed at our house in London. He always listened to me very patiently and corrected my flaws in Tajweed, helping me to perfect my recitation and strengthen my connection to the verses of the Holy Quran.

My Dadazi inspired me in many facets of life and remains with me in everything that he taught and showed me in the time we spent together. I miss him greatly.

Writer: granddaughter of Muhaddis Saheb. Student of City University of London

আমি সৌভাগ্যবান

সাফওয়ান আল হাবীব

মানুষ হিসেবে আমি খুবই সৌভাগ্যবান। কারণ মুহাদ্দিস ছাহেবের মত একজন যুগের নকীব আলোকিত মানুষ আমার দাদা। আমার জীবনটা জড়িয়ে আছে দাদার সাথে। সেই বুঝতে শেখার বয়স থেকে কত কথা, কত স্মৃতি দাদার সাথে। সব স্মৃতি বলে শেষ করার সাধ্য নেই। অফুরন্ত সেই ভান্ডার থেকে কিছু কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

দাদা যখন বাড়িতে থাকতেন সূর্যোদয়ের পর থেকে রাত অবদি মানুষের আনাগুনা লেগে থাকতো। দাদা সব মানুষকে সময় দিতেন। খুবই গুরুত্ব সহকারে সবার কথা শুনতেন। কোন কোন সময় অসুস্থ শরীর নিয়েও মানুষকে সময় দিতেন।

গরীব মিসকিন মানুষের প্রতি দাদার অপরিসীম দরদ ছিলো। পাড়া প্রতিবেশী গরীব মানুষের সব সময় খোঁজ খবর রাখতেন। এরকম কেউ তাঁর কাছে এলে চাওয়ার আগেই কিছু টাকা দিয়ে দিতেন।

মনে পড়ে একট বড় হওয়ার পর থেকে দেখেছি দাদা ফজরের অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে যেতেন। আজানের সময় ঘনিয়ে এলে উঠানে হাঁটতেন, আর আজান হওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে ডেকে তুলতেন। ফজরের পর নিয়মিত তিলাওয়াত করার জন্য দাদা জোর তাগিদ দিতেন। আমি যখন তিলাওয়াত করতাম কোন কোন সময় আড়াল থেকে শুনতেন। কোন ভুল হলে কাছে এসে শুদ্ধ করে দিতেন।

সেই অল্প বয়স থেকে আমি দাদার সাথে খেতে বসতাম। খেতে বসলে তিনি খাওয়ায় বসার নিয়ম, আদব ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতেন। কোন সময় দাদার সাথে খেতে না বসলে বড় মাছের মাথা আমার জন্য রেখে দিতেন। মসজিদে যাওয়ার সময় আমাকে নিয়ে যেতেন। এসময় রাস্তায় হাঁটার সুন্নত পদ্ধতি, রাস্তার আদব নিয়ে কথা বলতেন।

দাদাকে দেখতাম একা হলেই হয়তো কিতাব পড়ছেন নতুবা তাসবীহ হাতে মনে মনে কি যেনো পড়তেন। আমি কাছে গেলে পাশে বসিয়ে লেখাপড়া করার গুরুত্ব, মানুষের সাথে মার্জিত ভাষায় কথা বলা ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলতেন। কীভাবে মেহমানদারী করতে হয়, মেহমানের সামনে খাবার, পানির গ্লাস, চায়ের কাপ কীভাবে পরিবেশন করতে হয় হাত ধরে শিখিয়ে দিতেন।

দাদা বাড়িতে থাকলে প্রতিদিন আমি মাদ্‌রাসায় যাওয়ার সময় তাঁকে বলে যেতাম। এসময় পোষাক পরিচ্ছদ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আছে কি না দেখে নিতেন। প্রয়োজনীয় বই খাতা সাথে নিচ্ছি কি না জিজ্ঞেস করতেন। কোনদিন মাদ্‌রাসা থেকে ফিরতে দেরী হলে

আমার খুঁজে কাউকে পাঠিয়ে দিতেন। মাদ্‌রাসা থেকে ফিরলে সব ক্লাশ ঠিকমত হয়েছে কি না খোঁজ নিতেন।

আসলে এমন মহান মানুষ, মহান শিক্ষক, কামিল ওলীকে ঠিকমত বুঝার বয়স হওয়ার আগেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে দাদা দাদীকে হারিয়ে আমার কিশোর মনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা কোন দিন পূরণ হবে না।

লেখকঃ মুহাদ্দিস ছাহেবের নাতি। শিক্ষার্থী, আলিম প্রথম বর্ষ, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদ্‌রাসা।

বয়স নয় মানুষ বেঁচে থাকে আপন কর্মে

খুবায়ব আহমদ

শ্রদ্ধেয় নানা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ এর স্মৃতিচারণে কিছু লিখতে গিয়ে শিরোনামের কথাটি মনে পড়ে গেলো।

সত্যি আপন কর্মে বেঁচে থাকা একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন আমাদের নানা।

শুরু করি নিজের পরিচয় দিয়ে। আমি হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব এর নাতি খুবায়ব আহমদ। আমার মা হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব এর ছোট মেয়ে শায়মা খাতুন, বাবা মাওলানা ছালিক আহমদ, দাদা মানিকপুর ইউনিয়নের সাবেক সুনামধন্য চেয়ারম্যান মরহুম বসারত আলী। তিন ভাই ও এক বোনের আমি সবার বড়।

ছোটবেলা থেকে নানা-নানুর অপার আদর স্নেহে আমার বড় হয়ে ওঠা। আমার জন্মের বহু আগেই দাদা- দাদী পরপারে চলে গেছেন। তাই উনাদের আদর সোহাগ পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। নানা আমাকে খুবই আদর করতেন। আমার মা বলতেন, নানা আমাকে অন্যদের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তখন মনে করতাম আম্মু আমাকে খুশি করার জন্য এমনটি বলেন। কিন্তু কিছুটা বড় হলে কথাটির বাস্তবতা সবটুকু না হলেও কিছুটা বুঝেছি। নানাবাড়ি গেলে নানার রুমে দেখতাম অনেক কিতাব। তখন আমার মধ্যে একটা কৌতুহল কাজ করতো, ভাবতাম কোন একদিন জিজ্ঞেস করবো, নানা এত বই কিতাব দিয়ে কী করেন? কিন্তু কখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি। নানা বাড়িতে থাকলে প্রতিদিন সকাল থেকে তাঁর কাছে বিভিন্ন বয়সের প্রচুর মানুষ আসতেন। আমি পাশের রুম থেকে লক্ষ করতাম তিনি প্রত্যেকের কথা খুব মনযোগ দিয়ে শুনতেন। মানুষের চাহিদা মত ফুঁ, পানি, তেল, কালোজিরা ইত্যাদি পড়ে দিতেন। বেশিরভাগ সময় তিনি মানুষকে হাদীস শরীফ থেকে বিভিন্ন দুআ শিক্ষা দিতেন। দেখেছি আমাদের মামা-খালাগণ যখন বাড়িতে একত্রিত হতেন তখনও নানা সবাইকে বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় দুআ শিক্ষা দিতেন। নানার দিকে তাকালে ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যেতো। আমাদের নানা ইসলামের বিধি বিধান পালনে খুবই কড়া ছিলেন। তিনি নিজে কুরআন সুন্নাহ যথাযত মেনে চলতেন, অন্যদেরকেও তাগিদ দিতেন।

আমার ক্ষুদ্র এ জীবনে নানার কাছ থেকে অনেক অনুপ্রেরণা পেয়েছি। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিলো বই কিতাব পড়ার প্রতি তাঁর অপার আগ্রহ। নানা বাড়িতে থাকলে যখনই কাছে যেতাম দেখতাম তিনি কোন না কোন কিতাব পড়ছেন। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের বিছানায় শায়িত অবস্থায়ও তাঁকে বই কিতাব পড়তে দেখা যেতো। বই পড়ার প্রতি নানার নিষ্ঠা ও আগ্রহ দেখে জ্ঞানার্জনের মর্ম বোঝা যেতো।

স্কুলের যেকোন পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছি শুনলে নানা খুশি হতেন। লেখা পড়ার যেকোন অর্জনের খবর শুনলে তিনি খুবই খুশি হতেন এবং আরো ভালো করার প্রেরণা দিতেন। ২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি নানা ইন্তেকাল করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল নানাকে শুনাতে পারিনি। আমার বিশ্বাস তিনি আমার ফলাফল শুনলে খুবই খুশি হতেন। প্রসঙ্গত, এসএসসি পরীক্ষায় আমি সরকারী বৃত্তিসহ জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হই। আম্মু সব সময় বলেন, নানা আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই আশাবাদী ছিলেন। সবাই দুআ করবেন আমি নানার অব্যক্ত আশা যেনো পুরণ করতে পারি।

আমাদের নানা বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা প্রবীণ আলিম ও শায়খুল হাদীস ছিলেন। তাঁর জীবনের সিংহভাগ সময় শিক্ষকতার মত মহান পেশায় ব্যয় হয়েছে। ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা ও সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্‌রাসা পূর্ব সিলেট এবং পশ্চিম সিলেটের এ দু'টি বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো নানার হাদীস শিক্ষা দানের মূল কেন্দ্র। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের বাইরেও দেশে বিদেশে বিভিন্ন স্থানে হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন আজীবন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের উম্মুল কুওয়াইন এ আদালতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন কয়েক বছর। একজন অনারব মানুষ একটি আরবিয়ান দেশে বিচারকের দায়িত্ব পাওয়া অনেক গৌরবের বিষয়। আজকাল দেখা যায় জীবনের কোন পর্যায়ে গৌরবজনক কিছু অর্জন করতে পারলে মানুষ এটা আজীবন বলে বেড়ায়। অথচ আমাদের নানা ছিলেন ব্যতিক্রম। কেবল নিজের নয় বরং গোটা দেশের জন্য গৌরবজনক এ বিষয়টি তাঁর জীবনে বিন্দু মাত্র প্রভাব ফেলতে পারেনি।

নানার ইন্তেকালের পর থেকে আমার ভীষণ একা লাগতে শুরু করে। নানার একসপ্তাহ পূর্বে নানুর ইন্তেকাল হয়। সেই থেকে শূন্যতার ছায়া আমাদের ঘিরে ফেলে। এখন নানা বাড়িতে গেলে কেমন জানি খালি খালি লাগে, আগের মত ভালো লাগে না। নানার জানাযায় লক্ষ মানুষের আগমন ঘটেছিলো। আপনজন হারানোর ব্যথায় প্রতিটি মানুষের চেহারা ছিলো মলিন। সেই বিষাদ মাখা চেহারাগুলো আমার স্মৃতিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিলো। আপন মহিমায় একজন মানুষ কী করে যে লাখো মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারেন এর বাস্তব উদাহরণ আমাদের নানা।

নানা-নানুর কবর যিয়ারত করলে আমার মনে এক অপার্থিব শান্তি অনুভূত হয়। বিভিন্ন সময়ে নানার দেয়া বিভিন্ন উপদেশ স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সবাই দুআ করবেন নানার দেখানো পথ অনুসরণ করে আমরাও যেনো মহৎ কর্মের মাধ্যমে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারি।

লেখক: মুহাদ্দিস ছাহেবের নাতি। শিক্ষার্থী-একাদশ (বিজ্ঞান), জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট।

My memories of my Dadazi

Wali un nabi Alawi Al Habib

When I visited Dadaji while he was in London he was very happy to see me every time and hugged me .

When dadaji stayed in our house sometimes I read him the surahs I learned and he was very proud of me.

I remember one time when I was 3 years old, I couldn't sleep because I had a stomach ache and I was crying. In the middle of the night Dadaji came to my room asked me why I was crying. He blowed on some oil and my mum massaged it on my stomach and I felt much better.

Once in 2019 Dadaji stayed in London during Eid and I remember going to Eid jamath with him.

I wish I had more time with him so I could get to know him more.

I love him and miss him lots and lots .

Alawi is a Year Five student and he is the grandson of Muhaddis saheb.

নানার শানে

সাওদা আছিমা

আমার নানা সেরা নানা
তার জুড়ি নেই
দেশের সেরা যোগের সেরা
সেরা বলে সবাই।

সবাই ডাকতো হুজুর বলে
আমার তিনি নানা
তাঁর ইশারায় সাওদা আমার
নাম রাখলো বাবা।

নানার হাতে বাইআত হতে
আসতো অনেক জন
দারসে হাদীস খতমে হাদীস
কত আয়োজন।

নানাবাড়ি কানায় কানায়
বই কিতাবে ঠাসা
সকল বই পড়ে নিবো
এইতো মনের আশা।

নাই বা হলাম লেখক আমি
নাই বা হলাম কবি
নানার শানে ছড়ায় লিখি
আমার মনের ছবি।

লেখিকা: মুহাদ্দিস ছাহেবের নাতনী, ৪র্থ শ্রেণি, মাতারগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

নিবেদিত
কবিতা

মুনাযাত

মোফাজ্জল করিম

বিশ্ববরেণ্য আলেম তিনি
বরের পেয়ারা বান্দা
তাঁর তরে আমি মুনাযাত করি
দিশাহারা এক আন্ধা।

ও মাবুদ তুমি দান করো তাঁকে
ওপারে তখতে তাউস
শেষ ঠিকানা হয় যেন তাঁর
জান্নাতুল ফেরদৌস।

একজন প্রাণপুরুষ

ফয়সাল মাহমুদ

জকিগন্জ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়েছেন যিনি গোলাপ ফুলের ঘ্রাণ,

ন্যায়বান,

নীতিবান,

আদর্শবান,

দায়িত্ববান,

নিষ্ঠাবান,

বিবেকবান,

হৃদয়বান,

শিক্ষায়, দীক্ষায়, দক্ষতায়, আন্তরিকতায় ভরিয়ে দিয়েছেন সকলের প্রাণ,

প্রাণচাঞ্চলে, প্রাণপ্রাচুর্যে, প্রাণসম্পদে সদা ভরপুর প্রাণময় প্রাণপুরুষ মো. হাবিবুর রহমান।

শত সহস্র কণ্ঠে শুনি আপনার গুণগান,

মহান আল্লাহ আপনাকে করুন জান্নাতুল ফেরদাউস দান।

ভালোবাসার সাক্ষ্য

জগলুল হায়দার

আলেম তিনি কামেল ছিলেন
জ্ঞান সাধনার কর্মে
মগ্ন ছিলেন সব ভালো আর
নিজের প্রিয় ধর্মে।

ঈমান আমল ভরা ছিলো
তার জীবনের পৃষ্ঠা
ধর্ম সেবায় দেশবিদেশে
দেখিয়ে গেছেন নিষ্ঠা।

বাংলাদেশের সবুজ থেকে
আরব মরু প্রান্তে
তার অছিলায় দিশা পেলো
কতো যে বিভ্রান্তে!

ছড়িয়ে গেছেন শুভতাকে
শাহাদাতের বাক্যে
সেই কথাটাই বলছে লোকে
ভালোবাসার সাক্ষ্যে।

রুবাইয়াত

আরিফুর রহমান

শিক্ষা এবং প্রজ্ঞার আলোয় আলোকিত যিনি,
সবার মাঝেই অকাতরে আলো বিলান তিনি।
নবীপ্রেম আর আল্লাহভীতি যাঁহার হৃদয় জুড়ে-
গ্রন্থ লেখেন, বিচার করেন, সবটাই যার দ্বীনি।

রূহানি ফয়েজ চাই

আখলাকুল আম্বিয়া বাতিন

এই কঠিন সময়ে আপনার বড় প্রয়োজন ছিল জনাব
কথা রাখা আর না রাখা মানুষের ভিড়ে
কে সে জহুরি চিনিয়ে দিবে তলোয়ার আর কুরসির মহিমা

এই ইদি আমিনের দেশে
মৌ লোভীদের ভিড়ে
আপনার রূহানি ফয়েজ চাই জনাব।

ক্ষণজন্মা

শায়খ তাজুল ইসলাম

ক্ষণজন্মা আলেম তিনি
আলেম তিনি প্রীতির
আজকে তিনি রবের কাছে
সুধুই মনের স্মৃতির।

কতো প্রীতি কত স্মৃতি
কতো বলবো আর
আল্লহ'র ওলী নবীর প্রেমিক
তুলনা নেই তাঁর!

নামের সাথে কর্মগুণের
ভীষণ ছিলো মিল
শুভ্র এবং মায়ায় ভরা
প্রশস্ত তাঁর দিল!

হিংসা বিভেদ গীবত করা
ছিলনা তাঁর সাথে
আমায় পেলে জড়িয়ে ধরে
চুমু খেতেন হাতে!

প্রিয় তিনি সবার কাছে
প্রিয় তিনি মনের
প্রিয় তিনি সিলেটবাসির
বিজ্ঞ আলেম গণের।

প্রিয় করো মালিক তুমি
তোমার প্রিয় বেশে
জান্নাতে ঠিক জায়গা দিও
পরম ভালোবেসে।।

আপনি ছিলেন, থাকবেন হৃদয়ে অনন্তকাল..

(হযরত মুহাদ্দিস সাহেব শ্রদ্ধাভাজনেষু)

মাজেদ আহমেদ চঞ্চল

কল্পনার সোনালী পথে আমি হেঁটে চলি
দেখি আপনার মায়াবী ছায়া চলে আমার
আগে আগে।
আপনার কুজনসম কথামালা
আজো কানে বাঁজে
অনুক্ষণ।

আপনার সাথে আমার অনেক স্মৃতি....!
কখনো আপনার সেই স্মৃতিময় হুজরায়
কখোনা বা কোনো ওয়াজ মাহফিলে সভায়, ঘরে, শহরে বন্দরে।

আমি কেমন আছি?
কেমন আছেন আমার ভাইবোন?
কেমন আছেন আমার স্নেহময়ী মা।
কেমন ছিলেন আমার বাবা
কেমন ছিলেন আমার দাদা চাচারা সব
আপনি গল্পের মত বলে যেতেন সব
কারণ আপনার নখ দর্পণে।

আমাদের ঘর, আমাদের বাড়ি, আমাদের ঘর পর প্রতিবেশী, আমাদের পাড়া, মহল্লা, গ্রামের পর গ্রাম সব-ই ছিল আপনার বড়-ই আপন।
আপনিও ছিলেন ছোট বড় সবার
স্বজনের চেয়েও স্বজন
একান্ত আপনজন।

আমাদের স্মৃতির কালীগঞ্জ ছিল আপনার বিনম্র চারণভূমি।
এই জনপদের প্রতিটি ধুলিকণায়, আকাশে বাতাসে, পাখ-পাখালীতে,
গাছ গাছালীতে, ছড়িয়ে আছে আপনার
সুবর্ণ স্মৃতি।
আপনার হৃদয়ছোঁয়া বিনীত বিনম্র অভিভাষণ, উপদেশ-নসিহত, কথামালা ও ক্ষুরধার
লেখনী এখানে অনুরণিত হবে, পঠিত হবে, মথিত, গ্রথিত হবে
কাল মহাকাল
এবং
আমাদের চরম ও পরম শ্রদ্ধা
আমাদের আন্তরিক ভালোবাসা
আমাদের আকাশছোঁয়া দোয়া
ও অনাগত কাল থাকবে আপনার প্রতি...।

আল বিদা...!
বিদায় হে কালের সাক্ষী
বিদায় হে পিতা,
বিদায় হে বন্ধু,
বিদায় হে দার্শনিক,
বিদায় হে চিরায়ত উপদেশক।
আপনার আগামীর ঠিকানা হোক নুরে মোহাম্মদীর আলোকে
উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল-আলোকিত,
যে আলোর ফেরিওয়ালা হয়ে কেঁদে কুটে আপনি কাটিয়েছেন
দিনের পর দিন, শত সহস্র বিনিদ্র রাত,
আদি অন্তের একক মালিকের কাছে দোয়া করি
পাতি এই নালায়েক দু'টি হাত....।

রূহের চিকিৎসক তিনি

বাছিত ইবনে হাবীব

(উৎসর্গ : মরহুম মাওলানা মুহাদ্দিস হাবিবুর রহমান সাহেবকে)

রূহের চিকিৎসক তিনি পুরোটা জীবন।
অনেকটা একমাত্রিক উজ্জলতায়
পরিপূর্ণ জীবন। দ্বীনের
শিষ্য থেকে দ্বীনের নকিব হয়ে দ্বীন
প্রচারক।
রাসুলের অনুসারী উচ্চতম মানের।
হাদীস চর্চা
আর প্রচারে ব্যাকুল। এই তো জীবন
তার স্নিগ্ধ
জীবন।
শুদ্ধতম পথ ধরে পদক্ষেপগুলো।
কথার প্রক্ষেপণ
আরো শুদ্ধতরো। জ্ঞানের জাহাজ
বুকে মাঠে
ময়দানে। সত্যের রশ্মিকণা মানুষের -
কানে।
যারা তাকে জানে খুব ভালো জানে, -
তাঁর উপমা
ছিলেন তিনিই নিজে। তাঁর স্মৃতিতে
তাই যত
চোখ ভিজে। সবাই মানে তিনি বড়ো
মুহাদ্দিস।
তার মাকাম হোক উচ্চ,
উচ্চতরো। আমার
পিতার নাম তার নামে বলে।
বাবার স্মৃতিগুলো
তার নামে জ্বলে। জান্নাতে
মোলাকাত হোক
এই দুই জনে।

ইলিম আমল আখলাক ও আধ্যাত্ম্যবাদের এক বিস্ময়কর সুলতানাত

মহিউদ্দিন হায়দার

উনিশশত বিরাশির মধ্য ফেব্রুয়ারির কোনও এক সুবর্ণসকালে
ভাগ্যে জুটেনি। শ্বাস নিকট থেকে অনিন্দ্য মোহময় এক মুখমণ্ডল দর্শনের
অবিশ্বাস্য সম্মোহনী শক্তিধর সেই প্রদীপ্ত চেহারা
তাঁর সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া সাথের মুরব্বি কানেকানে বললেন -
'ইনিই মুহাদ্দিস ছাব'
হ্যাঁ, ইনিই প্রজ্ঞাদীপ শায়খুল ইসলাম আল্লামা হবিবুর রহমান
শতধাবিভক্ত আলেম সমাজের মতানৈক্যের আঁধারে
পরমতসহিষ্ণুতার আলোকবার্তা নিয়ে
তিনিই এগিয়েছিলেন অনুপম রাহনুমা হয়ে
তাঁর অমিয়বাণী - 'তাকলিদ তাসাউফের সংশ্লেষহীন পাণ্ডিত্যে আমরা বিমোহিত হব না'
তাঁকে সুলতানে আহলে ইলিম মেনে
জাতশত্রুকেও শ্রদ্ধাবনত হতে দেখেছি বহুবার
স্বীয় যোগ্যতা ও মহিমা দিয়েই তিনি গড়েছিলেন -
ইলিম আমল আখলাক ও আধ্যাত্মবাদের এক বিস্ময়কর সালতানাত
পুত্রবৎ স্নেহাবরণের অতুল পারঙ্গমতায় -
শিষ্য-সহচরদের তিনি দেখিয়েছিলেন কীভাবে
নিরাপোষ-নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণই হতে পারে
হুব্বে রাসূলের পরম পরাকাষ্ঠা
এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন -
ইলমি জগতের যেকোনও বাহ্যিক দ্বিনীতি সুরাহার এক সর্বগ্রাহ্য ভাষ্যকার
মধ্যপ্রাচ্যের আদালতপাড়া থেকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের খ্যাতিমান গুণীমণ্ডলে তাঁর
বহুমাত্রিক প্রতিভার স্বীকৃতি ও সুখ্যাতির বিভা ছিল
সর্বজনবিদিত ও দীপ্তিময়
এমন ক্ষণজন্মা কীর্তিমান প্রবাদপুরুষ হয়েও তাঁর - নিভৃতচারিতা অন্তরালপ্রিয়তা এবং অতিসাদামাটা
জীবনাচার ছিল আরেক বিস্ময়াবিভূত দীক্ষানামা
দোলনা থেকে করব পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের ব্রতে তাঁর

জুড়িহীনতা ছিল ধ্রুবতারাতুল্য
প্রজন্মের জন্য তাঁর জ্ঞানস্পৃহার নমুনা
কালকালান্তরে দীপ্তি ছড়াবে আলোকবর্তিকা হয়ে
চরম উৎপীড়ন সয়েও কী করে
ধৈর্য ত্যাগ ও উদারতা দিয়ে অন্যের মুখে হাসি ফুটানো যায়
সে সবক নিতে হলে যে -
তাঁকেই দেখে নিতে হয় আদ্যোপান্ত
তাঁর নিঃস্পৃহ জাগতিকতার পানে তাকালে
তাবৎ জৌলুশ ও ভোগবাদিতাকে মনে হয় মৌনব্রত গোরস্থান
তাঁর মতো কীর্তিমানকে মাপা সিকি-আধুলির বাটখারায়
এ যে কালের বেয়াকুফ, চোখে যার শর্ষের বিদ্যুৎ চমকায় তাঁকে ততোটুকুই চেনেন
তিনি, যিনি সুপ্রসন্নে তাঁকে করেছেন সৃজন তাঁকে নিয়ে এ অধমের আলাপন, জ্ঞাতজন
কহে এ যে অর্বাচীন কৃপণ
শান্তনা শুধু এই - আমার কালে তিনি ছিলেন, তাঁর কালে আমি
-
সাহচর্যের নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন অন্তর্জামি

হে মহান কীর্তিমান

সৈয়দ মিসবাহ্ উদ্দিন

উম্মুল কুওয়ান আমিরাতের
মহামান্য বিচারক
ন্যায়ের প্রতীক ছিলে তুমি
ইনসাফেরই ধারক।

দ্বীনি শিক্ষায় অনন্য এক
মানুষ গড়ার কারিগর
লোকমুখে মশহুর আজও
জকিগনজের বাতিঘর।

ছাত্র শিক্ষক সবার কাছে
ছিলেন তিনি আপনজন
উচ্চমানের আল্লাহর ওলীর
লেবাস ছিল সাধারণ।

চন্দ্র সূর্য আসমান জমিন
রবে যতদিন
শেষ হবেনা মান্যবরের
আছে যত ঋণ।

দু'আ করি রবের কাছে
দয়াল মেহেরবান
কবুল করে নিও তাঁকে
জান্নাতের মেহমান।

হুজুর

(শায়খুল হাদীস আল্লামা হযরত হাবিবুর রহমান - মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের ইন্তেকালের শোকে)

মু. শাহ আজহার হোসেন

হুজুর

আপনি যখন অসুস্থ হয়েছিলেন

তখন আমাদেরকে অন্ধকার এক রাত্রি এসে

গ্রাস করেছিল।

অন্ধকারের মোচড় এবং গভিরতার ভয় আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল।

অনেক চেষ্টা তদবির করেও কোন কুল কিনারা পাচ্ছিলাম না ঐ ভয়ংকর নির্জন অন্ধকার থেকে বাঁচার।

একদিন তুফান এল, অন্ধকার রাত্রির বুকে জুড়ে মৌজ এসেছিল।

বহু গাছ পালা এলোমেলো হয়ে গেল।

মানুষ ভিটেমাটি রাস্তা ঘাট কেমন লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল।

তুফান শেষে আমাদের আশ্রয় স্থলের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম আপনি নেই।

তখন বুঝতে পারলাম এসব লিলা খেলার

উদ্দেশ্য কি ছিল।

আমরা কি সম্পদ হারিয়েছি।

চার পাশের বিদ্যুৎ এর খুঁটিগুলোতে বৈদ্যুতিক বিস্ফোরন ঘটতে লাগল

আর স্ফুলিঙ্গ উড়তে থকল।

আমরা হতভম্ব হয়ে যে যার জায়গায় যে ভাবে বসে পড়েছিলাম

এখন পর্যন্ত সে অবস্থায়ই আছি।

জানি না কবে সম্বিত ফিরে আসবে?

আমরা এখনও আপনার তরতাজা কালা কালা শব্দ শুনতে পাই।

পূবের আলোকবিন্দু

সালমান ফরিদ

একদা বরাক উপত্যকার ঢালে একটি আলোকবিন্দু জন্মালো

শুরু সেই ত্রিমোহনার ঠিক কাছাকাছি
দিগন্ত উন্মোচিত করে, নদীর ফোয়ারার মত গড়িয়ে
গড়িয়ে গেলো তেপান্তরের শেষ বৈঠকখানায়!

পূবের আলোকবিন্দু হয়ে উঠলো জ্যোতির্ময়
পূবের আলোকবিন্দু হয়ে উঠলো ঐতিহ্যময়
পূবের আলোকবিন্দু ভেতরের অমানিশার মাঝে
ভেতরের ঘোর কালিমার মাঝে
ভেতরের অজ্ঞতায়
হয়ে উঠলো সফেদ আধার!

ত্রিমোহনার ঠিক কাছাকাছি
বরাক উপত্যকার ঢালে
আমাদের আলোকবিন্দু ঝলঝল করে
এখনও সফেদ আধার হয়ে ছড়িয়ে থাকে
আমাদের মনের ভেতরে ও বাইরের সকলখানে!

ওলিয়ে কামেল

আহমদ সিদ্দিক চৌধুরী হাসান

মুহাদ্দিস সাব ওলিয়ে কামেল
হারিয়ে মোরা নিঃশ্ব
যার খ্যাতিটা ছড়িয়ে ছিলো
সারা মুসলিম বিশ্ব।

শামসুল উলামার পরে যে নাম
ছিলো সবার ছাঁয়া
তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস ছাহেব
করে যেতেন মায়া।

ছাহেব ক্বিবলার স্পর্শে ছিলেন
ছিলছিলার এক প্রাণ
হাদীস বিশারদ এই মনিষীর
অশেষ গুণগান।

ইলমে দ্বীনে দক্ষ এ হাত
দ্বীন কায়েমে বীর
হাজার লাখো ছাত্র যাহার
রাখেন উচু শীর।

দরসে হাদীস তাফসিরে যার
বেশ অবদান বেশ
মহফিল এবং মাদ্‌রাসাতে
করে যেতেন পেশ।

ন্যায় বিচার করে তিনি
বিচারপতি হন
এ সুনামটা সবার জানা
নীতির আপনজন।

ইছামতি দারুল উলুম
যাহার হাতে গড়ে
আমি সহ লাখো ছাত্র
মানুষ হলেন পড়ে।

এই মোবারক চেহারাটা
দেখতে পেতাম রোজ
আদর করে কাছে রেখে
সদায় নিতেন খোঁজ।

আজ আমাদের মুহাদ্দিস ছাহেব
ধরার মাঝে নাই
মাওলা তোমার মকবুল ওলির
রূহের দোয়া চাই।

যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস

(আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রহ.)

হাসান স্বজন

নবীর প্রেমের সুন্নতী
যাঁর বয়ানে দিশাহীনের
হতো অনেক উন্নতি।

জ্ঞানে গুণে উন্নত শির
ছিলেন হাদীস বিশারদ
আমিরাতের বিচারপতি
দিতেন সদা সঠিক পথ।

ইলমে হাদীস সবক দিয়ে
করেছিলেন জীবন পার
যাঁর তুলনা তিঁনিই নিজে
তাঁর তুলনা হয় না আর।

সহবতে যাঁর সুআচরণ
লক্ষ জ্ঞানীর রূপকার
এমন করেই নিজকে গড়ে
করেন দ্বীনের উপকার।

যাঁর বিরহের হয় না পূরণ
অন্তঃ পুড়ে ছাঁই করে
ও.... মহীয়ান ও.... দয়ালু
জান্নাতে দাও ঠাঁই করে।

বুলন্দ করো দরজা তাঁরই
নেক ফয়েজের চাই আশা
আমি পাপীর কবুল করো
অশ্রু মাখা এই ভাষা।

কিংবদন্তি শায়খুল হাদীস

লুৎফা রনি

একজন কিংবদন্তি আলোর দিশারী
বঙ্গের এই উত্তর - পূর্ব ভূ-খণ্ডে জন্মেছিলেন।
জকিগঞ্জের রারাই গ্রামের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন
নাম যার- মাওলানা হাবিবুর রহমান।।

ষাট- বছর ইলমে হাদীসের খেদমতে যিনি
যুক্তরাষ্ট্র -যুক্তরাজ্য, মক্কা, সিরিয়ায় করলেন ভ্রমন।
মসজিদ - মাদ্‌রাসা, পত্রিকা- গ্রন্থ প্রকাশনীতে
দ্বীনি খেদমতের চিহ্ন নিরলসভাবে রেখে গেলেন।।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও যিনি
আগ্রহীদের দিলেন সবক, সনদ, নসীহত।
ছাহেব কিবলা ফুলতলির যিনি অন্যতম খলীফা
বর্ণাঢ্য যার জীবন ইতিহাসের প্রতিটি দিন- রাত।।

বহু উস্তাদের উস্তাদ যিনি
অসংখ্য অনুসারী - অনুগামীদের ছেড়ে গেলেন।
পৃথিবী ঘনিয়ে আঁধারের মাঝেও সান্তনা
দ্বীনের শত কৃতি- স্মৃতি রেখে গেলেন।।

কল্যাণকামী, মুহাদ্দিস, শায়খুল হাদীস সাহেবকে প্রভু
জান্নাতেরি খুশবোতে মাতোয়ারা রাখুন।
উনার জীবনীর আদর্শের ধারায়
সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে কবুল করুন।।

দেখব না আর কোন দিন

(মুহাদ্দিস ছাহেব স্মরণে মর্সিয়া)

তানহা জনি

এতিম করে তুমি চলে গেলে
মাওলার ডাকে সাড়া দিলে
বিদায় জানাতে করেছে ভিড়
আশেক্বীন দেখি ঝাঁকে ঝাক
দেখব না আর কোন দিন
তোমারই চেহারা মুবারাক।

হাদিসের নববীর ছিলে খাদিম
করতো তাজিম সকল লোকে
স্মৃতি স্মরে আজ কান্না করে
মর্সিয়া গায় প্রিয় তোমার শোকে
মুহাদ্দিস ছাব এই নামখানি
উভয় জাহানে অমর থাক।

সদা সর্বদা তুমি ছিলে মশগুল
আল্লাহ নবীজির থাকতে ধ্যানে
আলোকিত হয়েছে কত পথিক
সহীহ্ আকিদায় তোমার জ্ঞানে
ভ্রমরেরা খুঁজে আজ ব্যাকুল হয়ে
ভুলে গেছে যেন মুখের বাক।

হে মদিনাওয়ালার প্রেম

শাহ মোঃ কামরুজ্জামান

তুমি কোথায় হারালে আজি
হে মদিনাওয়ালার প্রেম
তোমার বিচ্ছেদে জ্বলি প্রতিদিন
যখন তখন তোমাকে খুঁজি হেথায় হোথায়।
মনে হয় তুমি আছো ভেতরে বাহিরে অনুভবে সবখানে পাই তোমাকে
আমাকে বেঁধেছি তোমার প্রেমের সুতোয়।
ভুলিনি তোমায় হে আশিকে রাসুল
তোমাকে ভুলার সে ক্ষমতাও নাই
বিচার দিনের ভয়ে কাঁদে মন
হাশরের মাঠে তব সাথী হতে চাই।

কিংবদন্তি

ফারিহা জাহান মেহজাবিন

খূলুক্বে নববীর প্রতিচ্ছবি
ইলমে হাদীসের সূদুরপ্রসারী।
সত্য-ন্যায়ের বীর সিপাহী
ইলমে দ্বীনের বাহক

অর্ধ শতাব্দীর খাদিম
তিনি হাদীসে নববীর।
ব্যয় করেছেন অন্তিমলগ্ন
খিদমাতে দ্বীনের

দ্বীনের জ্যোতি ছড়িয়ে
দিতে করলে ভ্রমণ পৃথ্বী জুড়ে।
অমর রবে'ন চিরন্তন
মুমিন হৃদয় ঘরে

রবের শান হাতে নিয়ে
এগিয়ে ছিলেন অগ্র পথে।
সাজিয়ে ছিলেন দ্বীনের বাগান
দীপ্ত-ধারায় স্নাত হতে।

দ্বীনি কর্মে উৎসর্গ করলে
পুরো জীবন-ভর
হাদীসে জগতে উচ্চ তব শান
যুগ হতে যুগান্তরে থাকবে তব নাম

অপারে প্রশান্তিময় চিরনিদ্রায়
আছেন শোয়ে এক মনিষী
তিনি'ই মোদের "মুহাদ্দিস ছাহেব"
দ্বীন-ইসলামের কিংবদন্তি!

প্রিয় রাহবার

রাদিয়া রহমান মান্না

প্রিয় রাহবার,
আজও মনে পড়ে আপনাকে হারানোর সেই দিন
হাজারো মুরিদানের হাহাকারে বিষন্ন ছিল আকাশ,
জানাজায় লাখো মানুষের উপস্থিতি আর কান্নাই ছিল
আপনাকে ভালোবাসার বিশুদ্ধ প্রকাশ

প্রিয় রাহবার,
সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ দেখাতে এই ফিতনার পৃথিবীতে,
আপনাকে আমাদের বড্ড প্রয়োজন ছিল
আমরা তো এমনিই রাসুলের এতিম উম্মত,
আপনাকে হারিয়ে এতিমেরা আরো একবার
এতিম হলো।

প্রিয় রাহবার,
আল্লাহর জন্য আপনাকে ভালোবাসি,
আপনার নসিহত আমাদের দূর্গম চলার পাথেয়।
দয়াময় রবের কাছে শুধু একটাই কামনা,
কিয়ামতে আমাদের আরো একবার একত্র করিও।

আল্লামা মুহাদ্দিস ছাহেব

আবু আওসাফ

বছরের পর বছর যুগের পর যুগ
যিনি খিদমত করে গেছেন
রাসুলের হাদিসের,
শ্রদ্ধাভাজন পরমাত্মীয় হে মহান
মুহাদ্দিস ছাহেব নামে যিনি
পরিচিত সকলের।

মুফাসসির মুহাদ্দিস ফকীহ
ইতিহাস বেত্তা বিজ্ঞ সালিস
ছিলে দূরদর্শী,
আরবি উর্দু বাংলা ভাষা
ফার্সিতেও ছিলে তুমি
খুবই পারদর্শী।

তোমার জ্ঞানের প্রখরতা বিশাল
ছিলে তুমি ভাবুক মহানজন
তোমার তুলনা তুমি,
বেহেশত কাননে শ্রেষ্ঠ আসনে
করবেন সমাসীন রবে
তিনিই অন্তর্যামি।

ইউরোপ আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্য
এবং বিশ্বের নানা দেশ সহ
আরব আমিরাতে,
হেদায়তের বানী পৌছিয়ে দিয়ছো
হে আশিকে রাসুল
দিন কিংবা রাতে।

হাজার হাজার আলেম ওলামা
মুফতি মুহাদ্দিস মুত্তাকী জন

গড়েছো তোমার হাতে,
তোমারই ছোহবতে কতো নাকিছ
কামিল হয়েছে রাহবার
দেখিবে রোজ কিয়ামতে।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তে ধ্বনিত
হচ্ছে তোমার কবরের
দক্ষিন কিনারে,
আজানের সুর শুনি সেই
আল হাবীব জামে মসজিদের
সুউচ্চ মিনারে।

লক্ষজন সরিবে হৃদয়ে শতাব্দী কাল
বরেণ্য ইলমের কারখানা
হে মহান ওলী,
ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহ বলে
ইন্তেকাল হোক এ ছিলো
আপন বুলী।

গুচ্ছ কবিতা

মুজাহিদ বুলবুল

শায়খুল হাদীস

এখনও মুহূর্ত ঘুরে মুখোমুখি সময়ের ফ্রেমে
কতটা বিলিয়ে দিলে ভালোবাসা হয় কারামাত
তৃষিত পথিক খুঁজে বারেবার পথে আসো নেমে
উষ্ণ মাথায় আজও টের পাই মোবারক হাত।

সহসা দিয়েছে ডুব কত চেনা সাঁতারুর দল
কুঁড়িয়ে প্রাণের খনি কেউ কেউ রাজার দুলাল
অথচ বিবাগী মন অকারণে ঢেলে দিয়ে জল
ভাঙলো, ভাবলো হায় কতদূর তোমার নাগাল

হারিয়ে এখন বুঝি কত কাছে সুখের মিছিল
ডেকে গেছে, চারদিকে উড়ে গেছে বধির সময়
সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তোলপাড় বিক্ষত দিল
আফসোসে জড়ো করে ফেলে আসা সমস্ত ক্ষয়!

যদিওবা দিশেহারা তবু দেখি তোমার আশীষ
হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে হে মহান শায়খুল হাদীস।

একে একে নিভে যায় বাতি

একে একে নিভে যায় বাতি,
আমরা অন্ধকারে থেমে থেমে চলি
কী করে সামাল দিই চতুর আঁধার!
একে একে নিভে যাচ্ছে বাতি...

নিখাঁদ আলোর কথা অতপর কে বলবে আর
শেখাবে আলোর পথ হাত ধরে ধরে;
আমাদের মনঘরে হারানোর ভয়!
এখনো কিছুটা আলো মেঘেদের ভিড় ঠেলে হাসে
যেটুকু সম্বল জানি তাও নিভে গেলে
তারপর ধীরে ধীরে আঁধারেই নামবে সড়ক?

যায় দিন; দিনে দিনে টের পাই ক্ষয়,
একে একে নিভে যায় বাতি আর
আমাদের ঘিরে ফেলে ভয়...

যাওয়া মানে

গাফিল রাখে না খোঁজ যত ঢেউ শব্দহীন ভাঙে
অথচ কত সে মরু মিশে গেছে ইশকের গাঙে!
কোথায় পাবণ দেখি একবার ভাসাও শহর
দমকা হাওয়ার ভিড়ে উড়ে গেছে মেঘের খবর।

যাওয়া মানে আরও বেশি হৃদয়ের কাছাকাছি বাস
মিলনের আশা বুকে দিন রাত বিরহের চাষ;
সময়ের ঘড়ি ধরে নিয়মের দেখি প্রস্থান
অমর-উজ্জ্বল তুমি আল্লামা হবিবুর রহমান।

এজেএম শিহাব

শুধুই আছো কান্নাতে

আজকে তুমি সামনে তো নেই
শুধুই আছো কান্নাতে
কাল-হাশরে সঙ্গ তোমার
চাই মাবুদের জান্নাতে।

তুমি কেবল তুমিই ছিলে
তোমার সম নেই যে কেউ
বুকের পাজর ভাঙ্গছে রোজই
বিচ্ছেদেরই ভয়াল ঢেউ।

এই বিরহী মনটা আমার
গুমরে কাঁদে নিত্য যে
তুমি বিহীন শুন্য আমি
নিঃস্ব আমার চিত্ত যে।

মর্শিয়া

আমি জানি
তুমি জান্নাতে আছো
জান্নাত থেকে তুমি দেখছো মোরে গোপনে
ওগো কামিল ওলী
ওগো মাথার ছায়া
মাঝে মাঝে দেখা দিও মোরে স্বপনে॥

তোমার সে হাসি হাসি মুখটি
নিষ্পাপ চাহনি ও চোখটি
মনের আয়নায় ভাসে ক্ষণে ক্ষণে
ওগো কামিল ওলী
ওগো মাথার ছায়া
মাঝে মাঝে দেখা দিও মোরে স্বপনে॥

ছিলো না তোমার কাছে ছলনা
বলো নাই কারে কিছু হলো না
যোগাতে সাহস তুমি অবোধেরে
ভালোবাসতে তুমি সকলেরে
বড় একা-নিঃস্ব লাগে আজ তুমি বিহনে
ওগো কামিল ওলী
ওগো মাথার ছায়া
মাঝে মাঝে দেখা দিও মোরে স্বপনে॥

তব বিদায়ের দিনে-বড়ছাব হেসে হেসে বলেছেন
গেছো তুমি রাসুলের বাড়িতে
আছো তুমি রাসুলের জলসায়
আজ তব কবরের পাশে গেলে মনে হয়
তুমি চেয়ে আছো আমার পাণে
ওগো কামিল ওলী
ওগো মাথার ছায়া
মাঝে মাঝে দেখা দিও মোরে স্বপনে॥

তুমি আজ পৃথিবীতে নেই

তুমি আজ পৃথিবীতে নেই
সেই কথা মনে হলে
বুক ভাসে লোনা জলে
বুকের সাগরে উঠে সাইক্লোন-ঝড়
সাথে সাথে হিয়া উঠে করে ধড়ফড়।

কান্নায় ভাসে বুক
গতিহারা হয় শোক
হাহাকার অশান্তি শুরু হয় দীলে
ভ্রমরের গুঞ্জন
পাখিদের কলতান
কিছুতেই মনে আর শান্তি না মিলে।

তুমি আজ পৃথিবীতে নেই
অথচ তুমি আছো হৃদয়ের অলিগলি জুড়ে
স্মৃতির শহরে নিজেকে হারাই
বেদনায় কলিজাটা ছাঁই হয় পুড়ে।

তোমাকে হারিয়ে ভেতরে ভেতরে
মজনুন আমি আজ
জান্নাতে তুমি চির সুখে থেকো
আমাকেও দেখো শিরোতাজ।

আলিম উদ্দিন আলম

এতিম হলো সিলেটবাসি

ইলমে দিনের ফুল তুমি ইলমে দিনের ফুল
সারাজীবন শিক্ষা দিলেন হাদীসে রাসুল।

এতো সুন্দর চেহারা ছিলো মিষ্টি মুখের বুল
চিন্তাধারায় ছিলো তোমার পাক মদিনায় মূল।

তোমার বয়ান হাদীস- কোরআন ভেঙে দিতো ভুল
যে শুনিত শীতল হতো প্রাণ হতো আকুল।

খলিফায়ে ফুলতলী ছাব ফুল বাগনের ফুল
মুর্শিদ কিবলার হৃদয়ের ধন নেইতো সমতুল।

জকিগঞ্জের রারাই গ্রামের ফুটন্ত এক ফুল
উস্তাযুনাল মুহাদ্দিসিন ওলীয়ে মকবুল

সাত ফেব্রুয়ারি সোমবার দিন ডাকিলেন রাব্বুল
জানাজাতে লাখো মানুষ ব্যতিত ব্যাকুল

এতিম হলো সিলেটবাসি কাঁদে ভক্ত কুল
জান্নাতের ঐ উঁচু মাকাম হয় যেন কবুল॥

একটি আলো নিভে গেলো

ইলমে দ্বীনের খনি তুমি ইলমে দ্বীনের খনি
উলামায়ে কেরামগণের দুই নয়নের মণি।

দুই নয়নের মণি তুমি সঠিক পথের দিশা
হারিয়ে তোমায় দেশজুড়ে আজ আসলো অমানিশা।

অমানিশার আধার কালো নিভলো আলোর বাতি
যেই আলোতে ধন্য ছিল এই সিলেটের মাটি।

প্রখ্যাত একজন শায়খুল হাদীস উপমহাদেশে
দরসে হাদীস দান করেছেন দেশে- বিদেশে।

চেহারাটা এক জান্নাতি মুখ যেন নূরের আলো
কথায় ছিলো মিষ্টি অতি শুনতে লাগে ভালো।

ইতিহাসে থাকবে অমর এমন একটি নাম
সবার প্রিয় মুহাদ্দিস ছাহেব হবিবুর রহমান।

এমন একজন আশিকে রাসুল আর পাবনা কভু
জান্নাতের সু-উচ্চ মাকাম দিও ওগো প্রভু।

আমি অধম আলিম উদ্দিন কী লিখিব আর
চোখে ভাসে শান্তিপ্রিয় চেহারা আপনার।

২২ সালের সাত ফেব্রুয়ারি সোমবার এই দিন
লক্ষ কোটি ভক্তজনকে করেছ এতিম।

সয়না মনে খবর শুনে আজ আপনি নাই
রোজ হাশরে আল্লার ওলীর দেখা যেন পাই॥

ওগো উস্তাযুল উলামা

পাবোনা তোমাকে আর
মনে পড়ে বারে বার
তুমিই তোমার উপমা
ওগো উস্তাযুল উলামা।

স্মৃতিগুলো ফিরে আসে
চেহারাটা চোখে ভাসে
মধুমাখা কথাগুলো আর পাবো না
ওগো উস্তাযুল উলামা।

ইলমে হাদীসের আলোক তারা
তোমাকে পেয়ে ওগো ধন্য মোরা
জান্নাতে আলা হউক শেষ ঠিকানা
ওগো উস্তাযুল উলামা ওগো উস্তাযুল উলামা॥

একটি নক্ষত্র ঝরে গেলো

দুই হাজার বাইশ সালের সাতই ফেব্রুয়ারি
লাখো লাখো মানুষের নিরব কান্না ও আহাজারি।

হাদীস জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ঝরে গেলো
শোক নিঃশ্বাসে সিলেটের আকাশ- বাতাস ভারী হলো।

অবিশ্বাস্য খবরে সাধারণ মানুষ বাকরূদ্ধ
অশ্রুসিক্ত নয়নে আলেম উলামাগণ নিস্তব্ধ।

মানচিত্রে ইলমে দ্বীনের এই শুন্যতা
হয়তো পাবে না আর কোনদিন পূর্ণতা।

সারাজীবন আলো দিলেন আলোকিত হতে
আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলেন জান্নাতের পথে।

দুই হাজার বাইশ সালের সাতই ফেব্রুয়ারি
মুহাদ্দিস ছাহেব চলে গেলেন আমাদের ছাড়ি॥

أرجو لقاءَك

عبد العزيز عبد المتين

ومن الجدير ثناءُ شيخى مرشدى
والشكرُ للعَلَمِ الجليل المُسنِد

هو عالم ومحدث ومحقق
متفنن روض صفي المورد

زار البلاد مشرِّقا ومغرِّبا
فحوى المعارف وانجلى كزَبَرْجَدِ

يقضى المعيشة بالدراسة أنه
بالعرف يأمر، يَنهَيَنَّ عن الردي

وقضى الإلهُ بِأَن يُناهِز عُمرُه
التسعين نعم العيش من مُتَعبِّدِ

نال الإجازة فى العلوم مُوجِّهًا
كلَّ العناية للحديث المسنَد

ياربِّ متِّعْ شيخَنا بسلامةٍ
جِسمًا ورُوحا ذاك أعلى مقصدى

لا مالَ يَعدِلُ ما بذلتَ من النُّهَى
والعلمِ حتى لو أَتَيتُ بعَسْجَد

فجزاك رب العرش خيرا وافرا

فى هذه الدنيا وآخِرةِ الغدِ

يا سيدى شيخى، محمد إسمه
حبيبُ رحمانِ سِمِيُّ محمَّدِ

نورٌ يضيءُ به الإلهُ قلوبَنا
وعُقولَنا، من ظلمةِ المتشَدِّد

أرجو لقاءَك فى الجِنان مع النبِّي
والأنبيا والأولياءِ السُّجَّدِ

[আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত নাইজেরীয় নাগরিক আবদুল আযীয ইবন আবদুল মাতিন উস্তাযুল উলামা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে আরবী ভাষায় রচিত কবিতায় নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন।]

আর পাবোনা ফিরে

তাহমিদ আহমদ

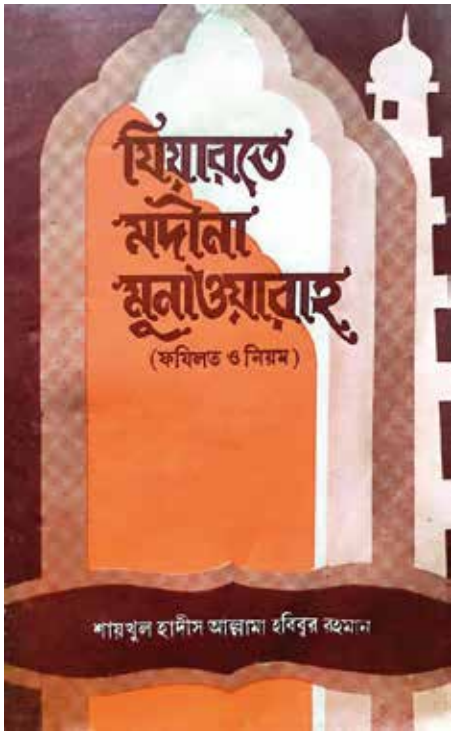
২২ সালের সাত ফেব্রুয়ারি সোমবার
মোদের ছেড়ে চলে গেলেন প্রিয় রাহবার।

ঐ দিন সন্ধ্যাবেলায় বসে আছি ঘরে
খবর পেলাম মুহাদ্দিস ছাহেব
গেছেন মোদের ছেড়ে।

শায়খুল হাদীস ছাহেব
প্রণীত
গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র
ও
সার্টিফিকেট

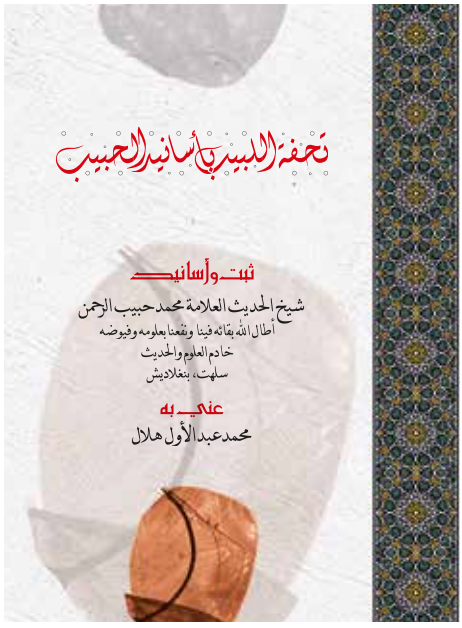

দু'আয়ে মাছনুনা
ও
৩৩ আয়াতের ফযীলত
شیخ الحدیث العلامۃ محمد حبیب الرحمن
আয়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রহ.

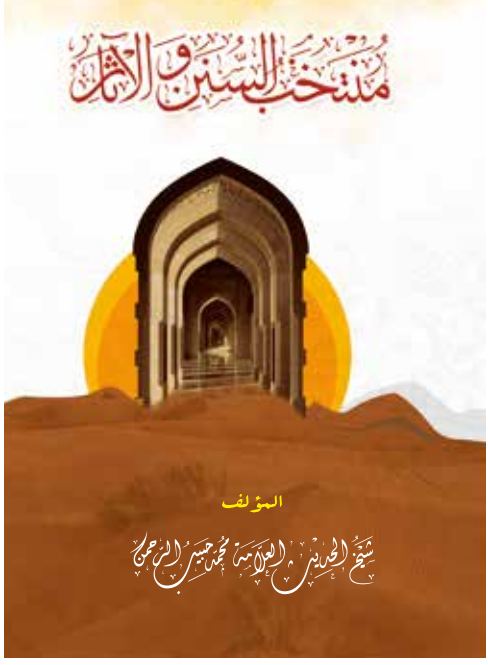

القول المقبول فی میلاد الرسول
مع
برزنجی شریف
মীলাদ
শরীফের
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান

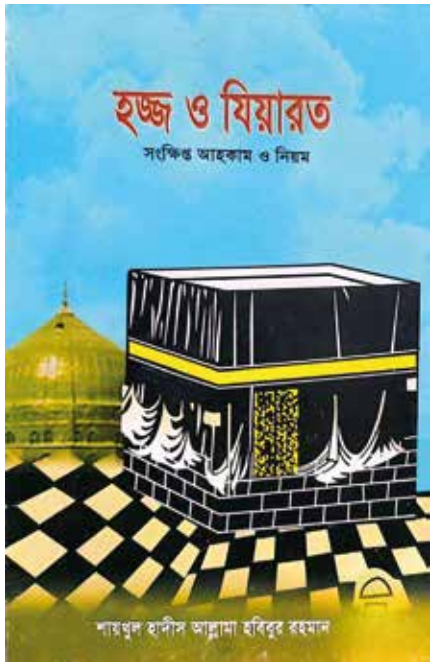

যিয়ারতে
মদীনা
মুনাওয়ারাহ
(ফযিলত ও নিয়ম)
শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান


القول المقبول
فی
میلاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم
(حصہ اول)
مؤلفہ:- حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مدظلہ
سابق شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ شاہپور و دار الحدیث
عیسیٰ امتی - سلہٹ۔
ناشر:- محمد عبد الجبار گوگاوگرامی سپرنٹنڈنٹ مدرسہ عالیہ
عیسیٰ امتی - سلہٹ۔


التحفة اللطيفة
في الاحاديث
المسلسلة المنيفة
اسانيد
محمد حبيب الرحمن
خادم العلم والحديث
سلهت- بنغلاديش

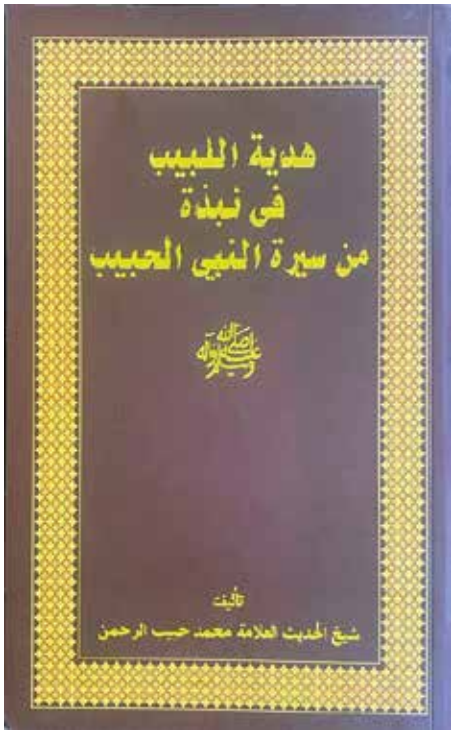

تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب
ثبت وأسانيد
شيخ الحديث العلامة محمد حبيب الرحمن
أطال الله بقائه فينا ونفعنا بعلومه وفيوضه
خادم العلوم والحديث
سلهت، بنغلاديش
عني به
محمد عبد الأول هلال

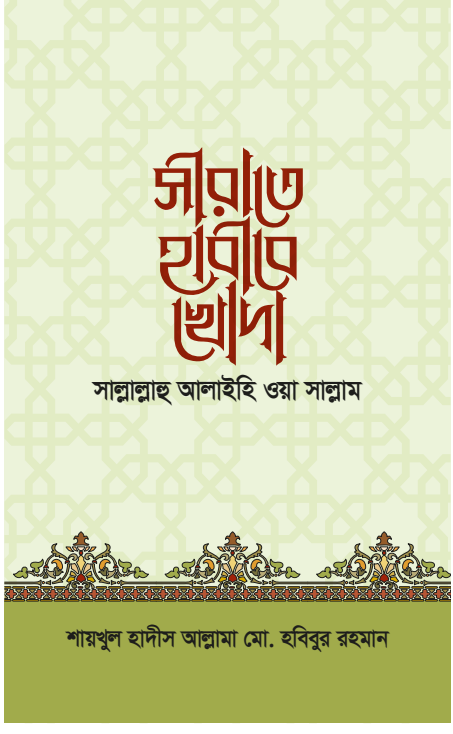

منتخب السنن والآثار
المؤلف
شيخ الحديث العلامة محمد حبيب الرحمن

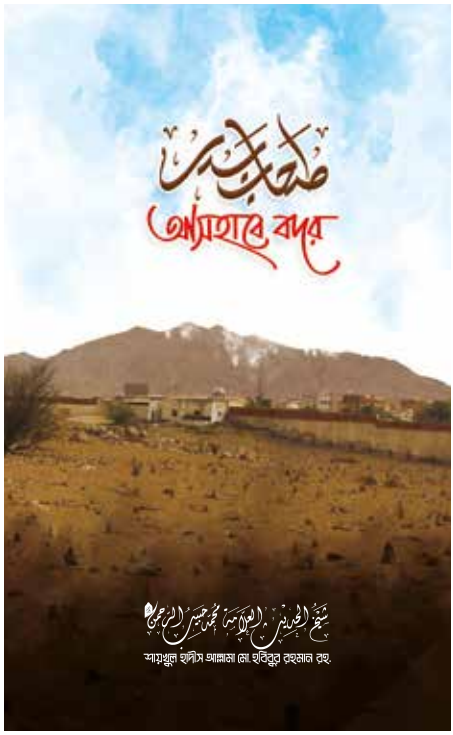

হজ্জ ও যিয়ারত
সংক্ষিপ্ত আহকাম ও নিয়ম
শায়খুল হাদীস আল্লামা হাবিবুর রহমান


كنز الأحاديث الأربعين
في
مناقب اهل بيت النبي الأمين
صلى الله عليه وسلم
আহলে বাইতের মানাকিব বিষয়ে চল্লিশ হাদীস
شيخ الحديث العلامة محمد حبيب الرحمن
শায়খুল হাদীস আল্লামা মোঃ হবিবুর রহমান

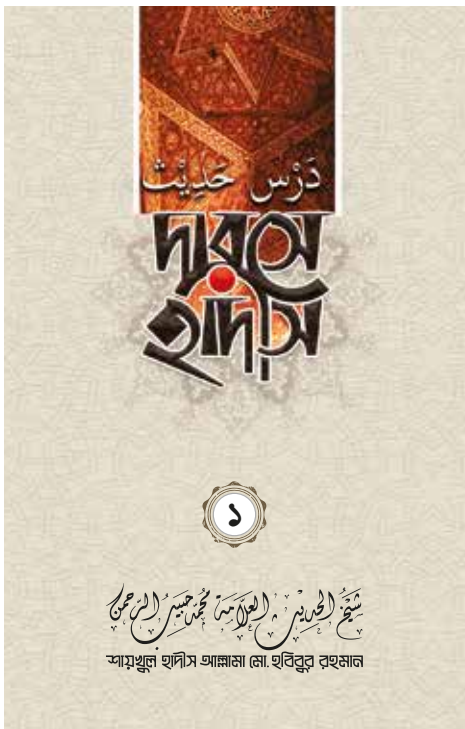

ذخيرة الأحاديث الأربعين في فضائل سيد المرسلين
صلى الله عليه وسلم
সায়্যিদুল মুরসালীন
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
ফাযাঈল বিষয়ে
চল্লিশ হাদিস

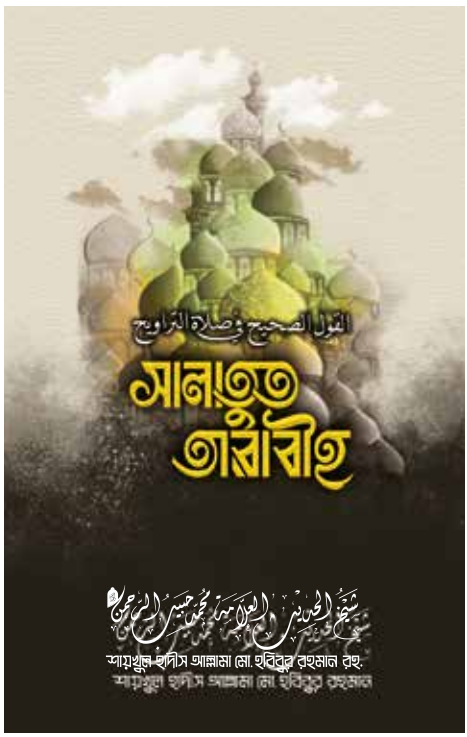

هدية اللبيب
في نبذة
من سيرة النبي الحبيب
تأليف
شيخ الحديث العلامة محمد حبيب الرحمن


সীরাতে হাবীবে খোদা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান

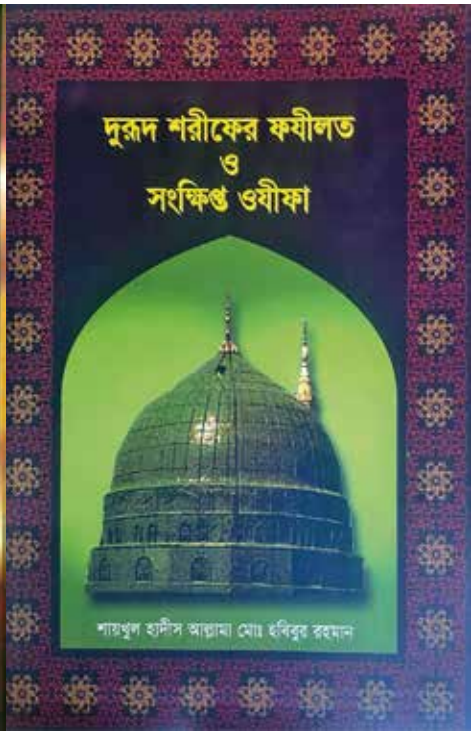

আসহাবে বদর
শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রহ.

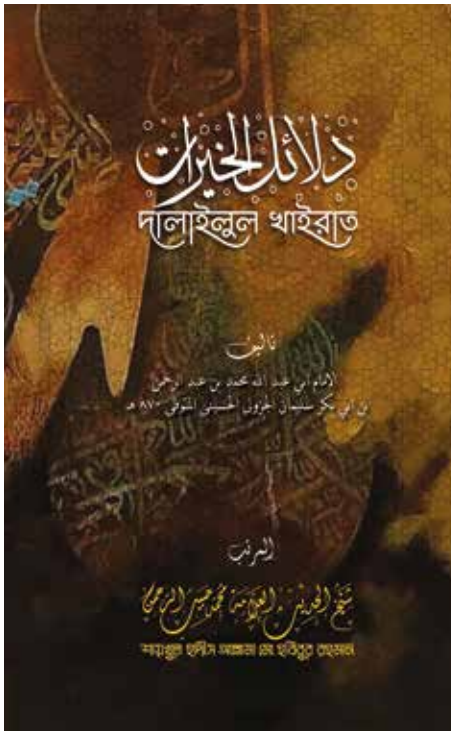

মাসয়ালায়ে উশর
প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রহ.


দরসে হাদীস
১
শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান


সালাতুত তারাবীহ
শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রহ.


الحزب الأعظم
والورد الأفخم
আল হিযবুল আযম
للامام علي بن سلطان القاري رحمه الله تعالى
المتوفى ١٠١٤هـ
اعتنى به
شيخ الحديث العلامة محمد حبيب الرحمن
শায়খুল হাদীস আল্লামা মোঃ হবিবুর রহমান


দুরূদ শরীফের ফযীলত
ও
সংক্ষিপ্ত ওযীফা
শায়খুল হাদীস আল্লামা মোঃ হবিবুর রহমান

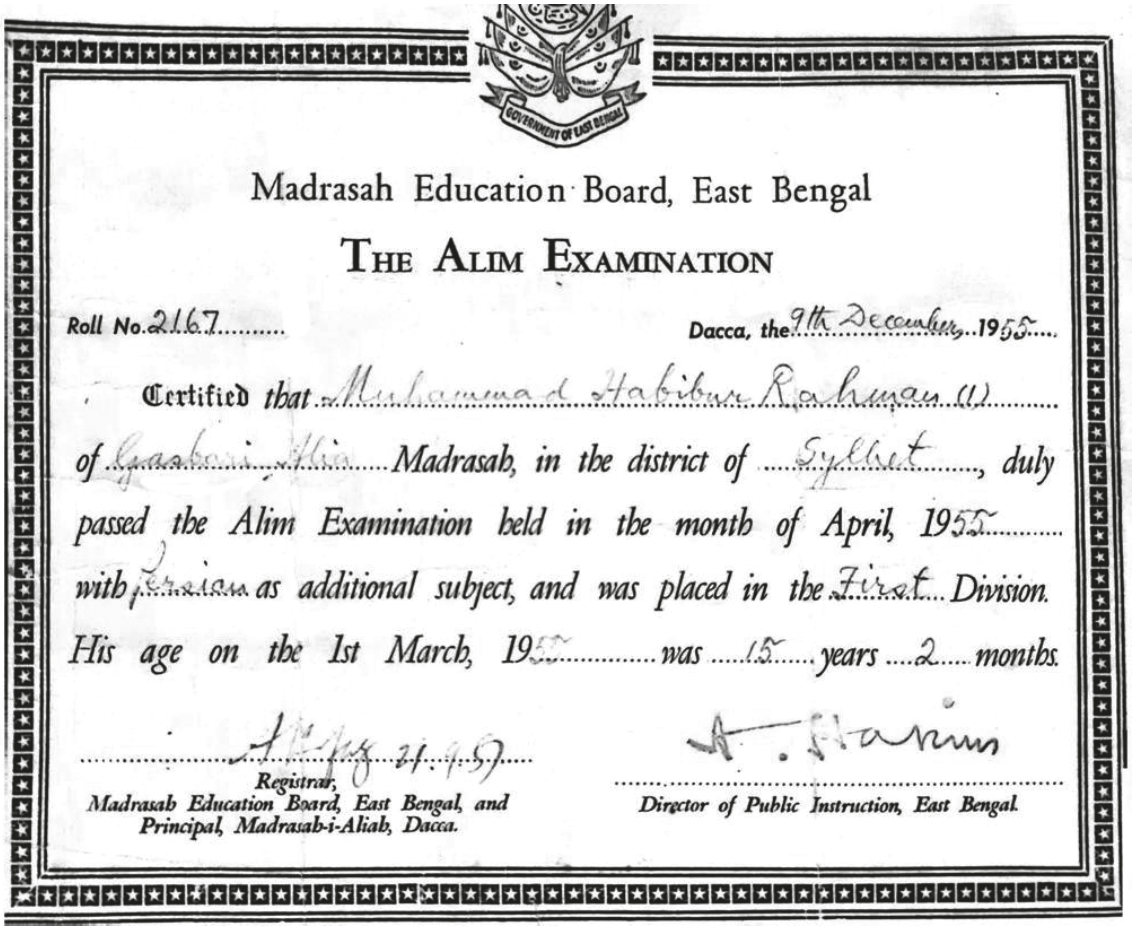

دلائل الخيرات
দালাইলুল খাইরাত
تأليف
الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن
بن أبي بكر سليمان الجزولي الحسني المتوفى ٨٧٠ هـ
الشرح
شيخ الحديث العلامة محمد حبيب الرحمن
শায়খুল হাদীস আল্লামা মো: হবিবুর রহমান


তেত্রিশ আয়াত, মাছনূন দোয়া ও দরূদ শরীফের
وظيفة
ওযীফা
شيخ الحديث العلامة محمد حبيب الرحمن
শায়খুল হাদীস আল্লামা মো: হবিবুর রহমান

শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে







Madrasah Education Board, East Bengal

The Alim Examination

Roll No. 2167 ..... Dacca, the 9th December, 1955.....

Certified that Muhammad Habibur Rahman (1) .....

of Gyasbari Alia Madrasah, in the district of Sylhet, duly passed the Alim Examination held in the month of April, 1955 ..... with Persian as additional subject, and was placed in the First Division. His age on the 1st March, 1955 was 15 years 2 months.

21.9.55

Registrar,
Madrasah Education Board, East Bengal, and
Principal, Madrasah-i-Aliah, Dacca.

A. Hasan

Director of Public Instruction, East Bengal.

East Pakistan Madrasah Education Board, Dacca

THE FAZIL EXAMINATION

Roll No 1414 Dacca, the 30th December, 1957

Certified that Muhammad Habibur Rahman

of [illegible] Madrasah, in the district of Sylhet

duly passed the Fazil Examination held in 1957 with additional subjects marked M & E on reverse, and was placed in the First Division.

M. Ghulam Husain

Registrar,
East Pakistan Madrasah Education Board, Dacca and
Principal, Madrasah-i-Aliah, Dacca

Director of Public Instruction, East Pakistan



مجلس التعليم للعلوم العربية في باكستان الشرقية

شهادة الكامل المحدث

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى آله واصحابه اجمعين

اما بعد فقد نال الفاضل البارع _____ بن _____

من المدرسة العالية _____ شهادة الكامل في الحديث بعد ان قرأ علينا من كتب التفسير و اصوله انوار التنزيل المعروف بتفسير البيضاوي والكشاف للزمخشري والاتقان للامام السيوطي ومن كتب الحديث واصوله الصحيحين للبخاري و مسلم والسنن الثلاث لابي داؤد والنسائي وابن ماجة والجامع للترمذي وشرح نخبة الفكر لابن حجر وتاريخ الاسلام قرأة صحيحة ودرسها درسا متقنا وادى الامتحان فيها سنة ١٩م وفاز في الدرجة

فلقبناه بالمحدث

وقد اجزنا له رواية الكتب المذكورة عنا مراعيا للشروط المعتبرة المعروفة عندنا وها نحن نوصيه بتقوى الله تعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم وارشاد الطلبة الى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

تحريرا في _____ سنة ١٩٠ م

اعضاء مجلس التعليم للعلوم العربية في باكستان الشرقية

اعضاء لجنة الامتحانات للصفوف النهائية

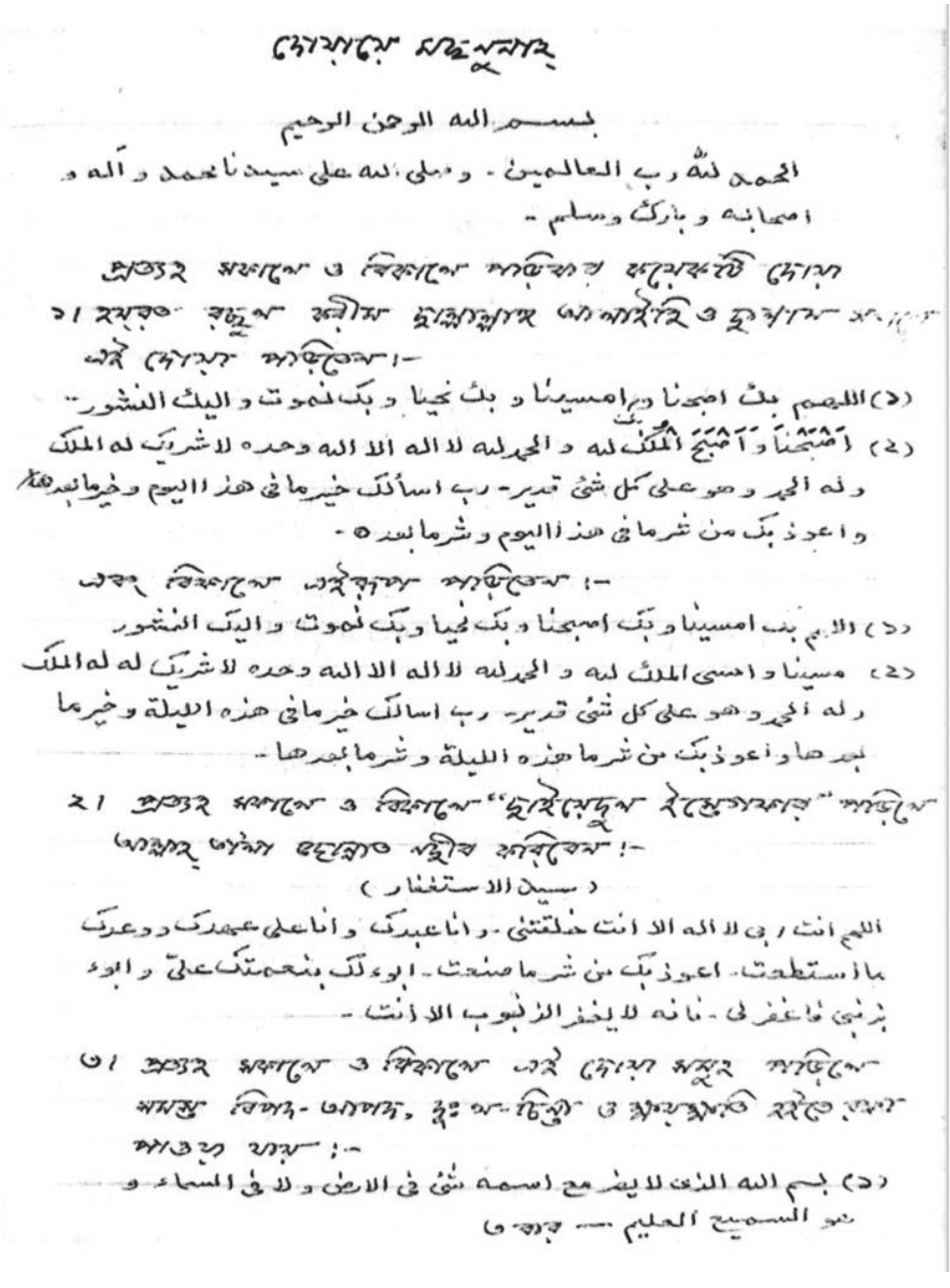
محمد شفيق الحق عفا الله

Registrar, East Pakistan Madrasah Education Board, Dacca.

اعضاء مجلس التعليم للعلوم العربية في باكستان الشرقية

President, East Pakistan Madrasa Education Board, Dacca

শায়খুল হাদীস ছাহেবের হস্তলিপি



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين - وصلى الله على سيدنا محمد وآله و
اصحابه و بارك وسلم -

(১) اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور -

(২) اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك
وله الحمد وهو على كل شئ قدير - رب اسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده
واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ٥ -

(১) اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور

(২) امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك
وله الحمد وهو على كل شئ قدير - رب اسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما
بعدها واعوذ بك من شر ما هذه الليلة وشر ما بعدها -

(سيد الاستغفار)

اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني - وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك
ما استطعت - اعوذ بك من شر ما صنعت - ابوء لك بنعمتك علي وابوء
بذنبي فاغفر لي - فانه لا يغفر الذنوب الا انت -

(১) بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو
السميع العليم ---

১৯৭৪ সালে লিখিত দু'আয়ে মাছনুনা ও ৩৩ আয়াতের ফযীলত পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা

میلاد شریف قرون ثلثہ میں

حدیث اور سیر کی کتابوں میں ایسی روایات بکثرت موجود ہے جن سے صراحۃً معلوم ہوتا ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ولادت نبویہ کے احوال اور حسبی و نسبی فضائل کبھی تو اتفاقی طور پر اور کبھی مجمع بلاکر بیان فرمایا ہے چنانچہ بطور نمونہ یہاں چند روایتیں لکھی جاتی ہے ہیں، صحیح مسلم میں حضرت واثلۃ بن الاسقع سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالےٰ نے حضرت ابراھیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی اولاد میں بنی کنانہ کو اور ان میں سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھکو برگزیدہ فرمایا، سنن ترمذی میں حضرت عباس رض سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں لوگوں نے عرض کیا آپ رسول اللہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ محمد بن عبداللہ ابن عبدالمطلب ہوں، اللہ تعالےٰ نے خلق کو پیدا کیا اور مجھکو ان کے بہترین میں سے کیا پھر ان کو دو فرقے بنائے اور مجھکو بہترین فرقہ میں کیا پھر ان کو مختلف قبیلے بنائے اور مجھکو بہترین قبیلہ میں بنایا پھر ان کو کئی خاندان بنائے اور مجھکو بہترین خاندان میں بنایا پس میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں، (۳) فقیہ ابو اللیث رح نے تنبیہ الغافلین میں اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت علی رض سے روایت کی ہے کہ سورۂ اذا جاء نصر اللہ نازل ہونے کے بعد آپ جمعرات کے روز باہر تشریف لائے اور منبر پر بیٹھے اور حضرت بلال رض کو بلاکر فرمایا کہ مدینہ میں اعلان کردو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سننے کیلئے جمع ہوجاؤ چنانچہ بلال نے پکار دیا اور چھوٹے بڑے سب جمع ہوگئے، آپ نے کھڑے ہوکر حمد وثنا اور صلوٰۃ علی

১৯৭৭ সালে লিখিত আল কাউলুল মাখবুল ফী মীলাদির রাসূল পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা

مسئلة حلق الرأس

اما حلق جميع الراس فقال الغزالي لا بأس به لمن اراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن اراد دهنه وترجيله. هذا كلام الغزالي وكلام غيره من اصحابنا في معناه. وقال احمد بن حنبل رحمه الله لا بأس بقصه بالمقراض وعنه في كراهة حلقه روايتان والمختار ان لا كراهة فيه ولكن السنة تركه فلم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم حلقه الا في الحج والعمرة ولم يصح تصريح بالنهي عنه

المجموع للنووي ج ١ ص ٣٥٣

مسئلة طهارة الصبيان لمس المصحف

اما الصبي فان كان غير مميز لم يجز لوليه تمكينه من المصحف لئلا ينتهكه وان كان مميزا فهل يجب على الولي والمعلم تكليفه الطهارة لحمل المصحف واللوح ومسهما ؟ فيه وجهان مشهوران اصحهما عند الاصحاب لا يجب للمشقة. وقطع الجرجاني بأنه لا يمنع من مس المصحف واللوح في المكتب -

المجموع للنووي ج ٢ ص ٧٥ و ٧٦

الدعاء عند ختم القرآن

يستجاب الدعاء عند الختم وتنزل الرحمة. وكان انس بن مالك رضي الله عنه اذا اراد الختم جمع اهله وختم ودعا واستحبوا الدعاء بعد الختم استحبابا متأكدا وجاء فيه آثار كثيرة. ويلح في الدعاء ويدعو بالمهمات ويكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح ولاة المسلمين ويختار الدعوات الجامعة -

المجموع للنووي ج ٢ ص ١٨٣

فتویٰ دربارۂ وقف

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الاستفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اور مفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے کچھ کھیت کی زمین ایک مسجد میں وقف کیا تھا اور وقف کرتے وقت یہ شرط لگائی تھی کہ یہ موقوفہ زمین کبھی فروخت نہیں کی جا سکتی بلکہ تا آبد مسجد پر وقف رہیگی اور کسی حال فروخت یا دوسرے کسی طریقہ سے بھی اس زمین کو کسی کی ملکیت میں منتقل نہیں کی جائیگی واقف کی طرف سے دستخط کردہ رجسٹرڈ وقف نامہ میں بھی یہ شرط صراحت کے ساتھ مذکور ہے چند سالوں کے بعد اہل محلہ نے اس مسجد کو پختہ بنانے کا ارادہ کیا اور اس موقوفہ زمین کو بیچکر اس کی قیمت مسجد کی تعمیر میں لگادی، بیچنے کے بعد یہ اراضی موقوفہ چند سالوں تک خریداروں کے تصرف میں رہی اور اس کی کل آمدنی اور پیداوار خریدار ہی لیتے رہے، اب سوال یہ ہے کہ مذکورہ اراضی موقوفہ کو بیچنا شرعاً جائز ہوا یا نہیں؟ اور ناجائز ہونے کی تقدیر میں ایک مدت تک زمین جو خریداروں کے تصرف میں رہی اور وہ اس کے غلہ جات لیتے رہے اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟

بینوا بالدلیل توجروا بالجزیل۔

الجواب

صورت مذکورہ بالا میں اراضی موقوفہ کو بیچنا شرعاً جائز نہیں ہوا کیونکہ وقف کا حکم اور موجب وجوب یہی ہے کہ شئی موقوفہ کو بیچنا جائز نہیں ہے جیسا کہ تمام کتب فقہ میں بالتفقہ بالتصریح مذکور ہے، اگر وقف کرتے وقت

واقف نے یہ شرط لگائی کہ موقوفہ زمین کو بیچکر اس کے بدلہ میں دوسری
زمین خریدکر وقف کردیگا یا مصلحتِ وقف کی تقاضا سے قاضی مجبور
ہو کہ اس زمین کو بیچکر اس کے بدلہ میں دوسری زمین خریدکر
وقف کردے تو صرف ان دو صورتوں میں وقف کو بیچنا جائز ہے اور باقی
کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، کما فی کتاب تکاثون العدل والانصاف نقلا
عن رد المحتار المختار انما یجوز بیع الوقف لیشتری بثمنه ما یکون وقفا بدلا
عنه اذا شرط الواقف استبداله سواء شرط له او لغیره او سوغت الفورت والمصلحة
القاضی بیعه والاستبدال به - وفیما عدا ذلک لا یصح بیع الوقف ولو کان غیر مسجل
فاذا باعه الواقف کله او بعضه او الوارث او الضح او باعه القاضی بدون مسوغ
شرعی فالبیع باطل اصلا، صورت مذکورہ بالا میں چونکہ واقف نے بیچنے کی
کوئی شرط نہیں لگائی بلکہ نہ بیچنے کی شرط لگائی تھی نیز مصلحت
وقف کی تقاضا بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ بیچنا ہرگز جائز نہیں ہوا، نیز واقف
نے وقف میں نا بیچنے کی جو شرط لگائی وہ شریعت کے عین مطابق اور
مصلحت وقف کے عین موافق ہے لہذا یہ شرط شرعا معتبر ہے اور اسکی پابندی
ضروری ہے۔ کما فی رد المحتار والفتاوی الخیریة کل شرط لا یخل بحکم
الوقف ولا یوجب فساده فهو جائز معتبر وشرط الواقف المعتبر
کنص الشارع فی الفهم والدلالة ووجوب العمل به، پس ثابت ہوا کہ

بہ بیع کسی طرح بھی جائز نہیں ہوا، لہذا مذکورہ اراضی موقوفہ وقف کی بنا پر مسجد کی ملکیت میں رہی اور بیع مذکورہ واجب النقض ہے۔ کما فی الدر المختار۔ اذا ثبت بطریق شرعی وقفیۃ مکان وجب نقض البیع۔ اور خریداروں سے جو قیمت لی گئی بلا کم وبیش وہ واپس کی جائیگی، کما فی عامۃ کتب الفقہ۔ مثلا فی رد المختار۔ حان لم یکن المشتری حفر وبنی بان کان عالما وقف شرکۃ الدار انہا وقف فلا یرجع الا بالثمن۔

اور جس مدت میں یہ اراضی موقوفہ خریداروں کے قبضہ میں رہی اور اس آمدنی اور پیداوار زمین جیسی زمین رجارہ دینے سے جتنی اجرت ملتی ہے اتنی ہی اجرت اس حد موقوفہ زمین کے پیداوار اور آمدنی کے بدلہ میں ادا کرنا خریداروں پر لازم ہے۔ کما فی الدر المختار رد المختار۔ اذا ثبت بطریق شرعی وقفیۃ مکان وجب نقض البیع والمتون ان یاخذ اجر مثل المکان المذکور فی مدۃ وضع المشتری یدہ علی القول المختار وفی تنقیح الحامدیۃ۔ ویلزم ویلزم المشتری اجر مثل الدار والارض الموقوفہ عن المدۃ الماضیۃ والمستقبلۃ۔ یعنی نرعما للوقف من یدہ سواء اشتراھا وھو مقرور او غیر مقرور ولا ینفعہ الاحتجاج بتاویل الملک ولیس المشتری حبس الدار والارض الموقوفہ بالثمن۔ وھذہ خلاصۃ ماسنح لی من کتب الفقہ فی شان المسئلۃ المذکورۃ فی السوال واللہ اعلم والیہ المرجع المال۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین۔ کتبہ الراجی

স্মৃতি এলবাম



১৯৭৮ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের
উম্মুল কুওয়াইন আদালতে বিচারপতি থাকাকালীন।



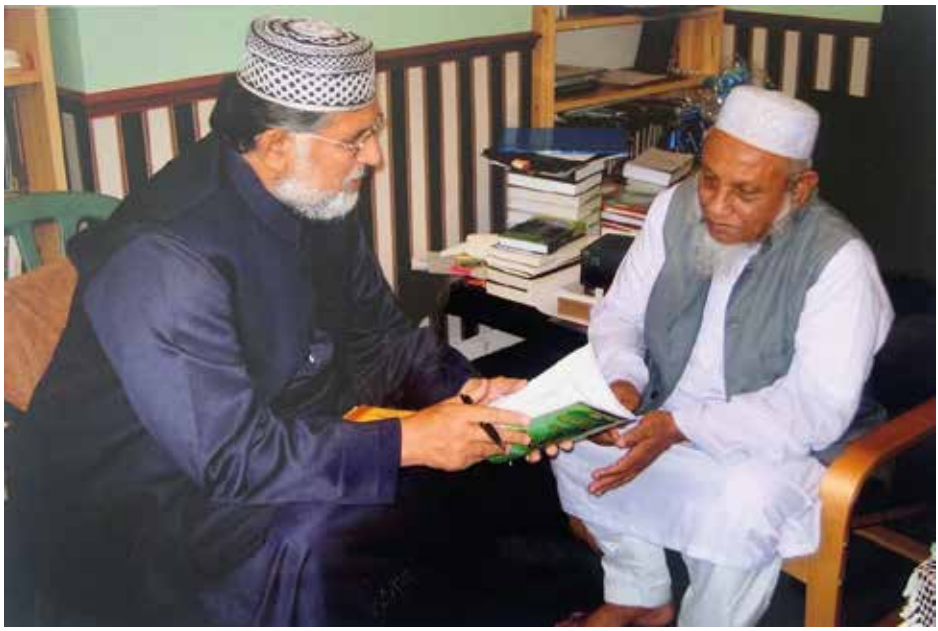
২০০৪ সালে সিলেটে ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শানে রিসালাত সম্মেলনে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ এর সাথে মঞ্চে।



ফুলতলীতে অনুষ্ঠিত ছাহেব কিবলাহ এর হাদীস শরীফের সনদ বিতরণ মাহফিলে।



২০১৯ সালে উমরা সফরকালে মদীনা শরীফে হোটেল কক্ষে বহুগ্রন্থ প্রণেতা
শায়খ মানসুর আল বুখারী নিজের লেখা একটি কিতাব হাদিয়া দিচ্ছেন।



২০০৫ সালে লন্ডনে শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহির আল কাদিরী
এর সাথে মত বিনিময়।



২০০৮ সালে দামেশক সফরকালে শায়খ হিশাম বুরহানী রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে।



বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ এর বংশধর এবং ওয়াকফ এস্টেটের বর্তমান মুতাওয়াল্লী শায়খ ড. সায়্যিদ আফীফ উদ্দিন জিলানী এর সাথে।



মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে নবী হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালাম এর রওযা যিয়ারতে প্রবেশ পথে।



কায়রো শহরে ইমাম বদরুদ্দিন আইনী ও ইমাম কুসতুল্লানী রাহিমাহুল্লাহ এর মাযার যিয়ারতে।



লন্ডনে মুহাদ্দিস ছাহেবের সান্নিধ্যে বাহরাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের
সহকারী অধ্যাপক শায়খ ড. নাজী বিন রাশীদ আল মালিকী।



কায়রো শহরে ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ এর
মাযার প্রাঙ্গণে দারসে বুখারী।



২০১৮ সালে উমরা সফরে মক্কা শরীফের শায়খ সায়্যিদ উমার বিন হামিদ জিলানী হাফিযাহুল্লাহ এর বাসায় দারসে বুখারীতে অংশগ্রহণ শেষে।



২০২০ সালে জীবনের শেষ উমরা সফরকালে মদীনা শরীফের শায়খ সায়্যিদ আসিম বিন আদী হাফিযাহুল্লাহ এর বাসায়।



২০০৮ সালে দামেশক সফরকালে বহুগ্রন্থ প্রণেতা
ড. সায়্যিদ আজ্জাজ আল খাতীব রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে তাঁর বাসায় একান্ত মত বিনিময়।



২০০৮ সালে দামেশক সফরকালে বহুগ্রন্থ প্রণেতা শায়খ ড. আসআদ সাগিরজি রাহিমাহুল্লাহ
হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব এর কাছ থেকে সনদ গ্রহণ করেন।



২০১৮ সালে কায়রো সফরকালে মসজিদে হুসাইন এ
শায়খ ড. সায়্যিদ ইউসরি রুশদীর সাথে সাক্ষাৎ।



২০০৫ সালে লন্ডন দারুল হাদীস লাতিফিয়ায় শায়খ ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদিরী হাফিযাহুল্লাহ এর সাথে।



বাহরাইন এর শায়খ ড. নাজী মুহাদ্দিস ছাহেব এর সাথে একান্ত আলাপচারিতায়।



২০১২ সালের ১৪ মার্চ বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ এর কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্য।



১৯৮১ সালে প্রথমবার ব্রিটেন সফরকালে হিথ্রো বিমানবন্দরে।

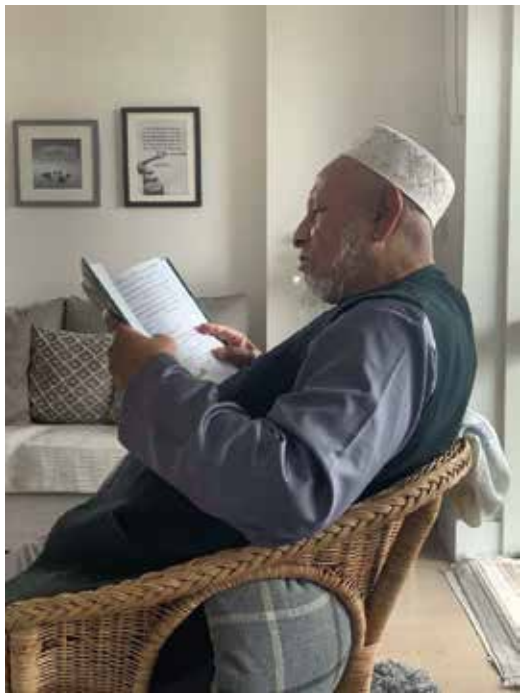




আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।



২০১২ সালে জকিগন্জ লেখক পরিষদ আয়োজিত ৩দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য।



২০১৩ সালে পূর্ব লন্ডনের একটি বাসায়।



২০২০ সালে জীবনের শেষ উমরা সফর।



শয্যাশায়ী অবস্থায় কিতাব পড়ছেন।





নিজ প্রতিষ্ঠিত আল হাবীব জামে মসজিদে সাপ্তাহিক দারসে হাদীস।



চরম অসুস্থ অবস্থায়ও সিলেট শহরে মেজো মেয়ের বাসায়
মুসালসাল হাদীসের দারস প্রদান করছেন।



বিশাল জানাযার একাংশ।



জানাযা শেষে দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।



নিজ প্রতিষ্ঠিত আল হাবীব জামে মসজিদ ও আল হাবীব গ্রন্থাগারের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত।

Shaykh-ul-Islam
Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri
Founding Leader Minhaj-ul-Quran International
Chairman BoG, Minhaj University Lahore

Date: February 2, 2024

Shaykh al-Hadith al-Allama Habib al-Rahman (rahimahullah) was a renowned scholar from Bangladesh. He dedicated more than sixty years of his life to the noble cause of teaching the Ahadith of the Holy Prophet ﷺ in various parts of the world, particularly in the Indian subcontinent. His profound insights, erudition, and mastery of various Islamic sciences earned him the esteemed position of a distinguished judge in the emirate of Umm al-Quwain of the United Arab Emirates.

I had the privilege of knowing Shaykh al-Hadith personally for many years, and my admiration for him goes beyond his scholarly insight and towering intellect. It is also a result of his extensive contributions and selfless services to the Din. Besides meeting him in the United Kingdom at various conferences and seminars, I had the pleasure of meeting him on several occasions in different settings. Despite being the teacher of thousands of students, he maintained a sense of humility and dignity, embodying all the qualities of a true 'Alim of the Din.

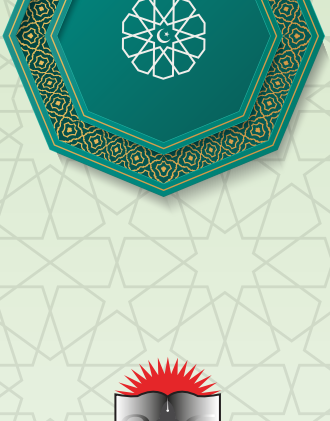
On the 7th of February 2022, he concluded the journey of this temporary abode and transitioned to the 'Alam al-Barzakh. I pray that Almighty Allah bestows upon him a higher and more exalted Maqam (station) in the Hereafter than he was blessed with in this Dunya. Furthermore, I pray that those whom he left behind—his offspring, students, and followers—are granted the ability and the Tawfiq to follow in his footsteps in a befitting manner, upholding his distinguished life and legacy.

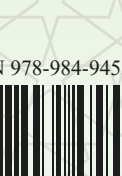
Muhammad Tahir-ul-Qadri

MINHAJ-UL-QURAN INTERNATIONAL
Central Headquarters:
365-M, Model Town, Lahore-Pakistan.
UAN: +92 (42) 111-140-140
www.minhaj.org **email:** qadri@minhaj.org

London Office: 292-296 Romford Road, Forest Gate
London, UK. E7 9HD
Ph: +44 (20) 8257 1786/7
www.minhajuk.org **email:**trustee@minhajuk.org

নোট: শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ স্মৃতিস্মারক বাইন্ডিং প্রায় সমাপ্ত হওয়ার পর শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহির আল কাদিরী হাফিযুল্লাহ এর অনুভূতিপত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে প্রাপ্ত অনুভূতিপত্র হুবহু সংযুক্ত করা হলো। - সম্পাদক





Al Habib Foundation

www.alhabibfoundation.com

ISBN 978-984-94552-4-0

